ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১১, সংখ্যা ২৭, সেপ্টেম্বর ২০২৪

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
Vol. 11th Issue 27th, September, 2024

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 11th Issue 27th, 9th September, 2024, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১১ তম বর্ষ ও ২৭ তম সংখ্যা
৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম. আর. মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ, পি. কে. কলেজ, কাঁথি)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। ২০০০ - ২৫০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডিএফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

ভসেভোলোদ পুদোভকিনের মন্তাজ তত্ত্ব : কৌশল ও অনুশীলনে একটি গভীর অন্বেষণ
আরাফাতুল আলম ১৫

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার ইতিবৃত্ত
নম্রদ্বীপ বালা ২৫

রবীন্দ্র ছোটগল্পে নৌকা : একটি সমীক্ষা
সুপ্তি ভট্টাচার্য ৩৫

সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের আলোকে উপরূপকরূপে রবীন্দ্রনৃত্যনাটিকা চিত্রাঙ্গদা
অরিজিৎ গুপ্ত ৪৫

আনসারউদ্দিনের 'গো-রাখালের কথকতা'য় গো-রক্ষকদের জীবনযাপন : একটি বিশ্লেষণী পাঠ
মহঃ গিয়াসউদ্দিন ৫৫

রামমোহন ও তৎকালীন বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা
সেলিম বক্স মণ্ডল ৬৪

শৈবাল মিত্রের বয়ানে 'চৈতন্য আখ্যান'-এর পুনর্নির্মাণ : একটি মূল্যায়ন
মৃত্যুঞ্জয় কুমার মণ্ডল ৬৮

ওরাওঁ জনজীবনে বিবাহ : প্রথা ও সংস্কার
চন্দনা সাহা ৭৪

বৈষ্ণব-সাহিত্য সমালোচক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নৈপুণ্য বিচার
ইমরান আলি মুনশী ৮৫

সমাজতত্ত্ব ও সমাজবাস্তবতা : প্রথম প্রতিশ্রুতি
আশীষ কুমার সাউ ৯২

নজরুল প্রতিভা ; ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে তার পরিবেশগত প্রভাব : একটি সমীক্ষা
মো: আফতাব উদ্দিন ৯৯

মঙ্গলকাব্যের আখ্যানে বিদ্যাচর্চার স্বরূপ : একটি অনুসন্ধান
সুজয় অধিকারী ১০৮

সংরক্ষণের পর্যালোচনা
গৌরী মণ্ডল ১১৫

অমর মিত্রের গল্পে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম,
অবহেলা ও অপ্রাপ্তি ; প্রসঙ্গ ছিটমহল
মৌসুমী পাল ১২০
নারীহরণ : কাব্য ও পুরাণ প্রসঙ্গ
(নির্বাচিত পাঠ অবলম্বনে একটি বিশ্লেষণ)
পারমিতা হালদার ১৩০
ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে পরিযায়ী শ্রমিকের আখ্যান
রূপম প্রামাণিক ১৪০
রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে প্রান্তিক চরিত্র
সমীরণ বেরা ১৫০
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ‘অগ্নিপর্ণী শালপিয়াল’ : প্রসঙ্গ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী
পায়েল সিংহ ১৫৬
স্বাধিকার বোধে রবীন্দ্রগল্পের তিন নারী
শিপ্রা দত্ত (ঘোষ) ১৬১
বাংলা লিটল ম্যাগাজিন ও সত্য গুহ
সফিয়ার রহমান ১৬৯
শিশু-কিশোর সাহিত্য : নারায়ণ দেবনাথের ‘বাঁটুল দি গ্রেট’
মৌসুমী পাল ১৭৪
বঙ্গ-ভঙ্গ প্রসঙ্গে নমঃশূদ্র আন্দোলন
তন্ময় জোদ্দার ১৮১
সাঁওতাল বিদ্রোহ : পাঠ ও বিশ্লেষণ
রামকৃষ্ণ মণ্ডল ১৮৭
সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘একটি মোরগের কাহিনী’ : বহুমাত্রিক অন্বেষণ
তাপস মণ্ডল ১৯৮
বেদান্ত ও ব্রহ্মতত্ত্ব
সুদীপ্তা ভকত ২০৫
ইতিহাস ও কল্পনার মেলবন্ধন : আফসার আমেদের
‘হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা’
আলমগীর সরকার ২১২
ট্রিলজির প্রাথমিক ইতিহাস ও বিশ্ব সাহিত্যে ট্রিলজি
ফর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
মৌমিতা দাস ২২১

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি : তিনশো বছরের সন্ধিক্ষণে
ভীষ্মদেব মুখোপাধ্যায় ২৩৪
কোচবিহার জেলার নদ-নদীর মিথকথা ও পূজা-পার্বণ
প্রসেনজিৎ রায় ২৪২
জীবনানন্দ দাশের জীবনীমূলক উপন্যাসে কবির অন্তর-জীবনের
অতলান্তিক অন্বেষণ
রোমিও সরকার ২৫২
ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সিন্দুক' : লাটদার-জমিদারের
আক্রান্ত আখ্যান
মুঈদুল ইসলাম ২৬৩
যোগদর্শনালোকে সমাধি লাভের উপায়
আল জুলিয়াস হক ২৭০
নাট্যকার হর ভট্টাচার্যর 'অদ্ভূত আঁধার' : ক্ষমতার বিরুদ্ধে
প্রতিবাদী বয়ান
রবিউল শেখ ২৭৯
নিমজ্জন - এক অভিশপ্ত শহরের আখ্যান
কৌষেয়ী ব্যানার্জি ২৮৮
বীরভূম জেলায় সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রভাব
নির্মল হাঁসদা ২৯৪
ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কি আদৌ যুক্তিযুক্ত ?
একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
দীপা রবিদাস ৩০৩
কল্পবিজ্ঞানের আলোকে উপন্যাস ও চলচ্চিত্র : পাতালঘর
চিরঞ্জিত ঘোষ ৩১২
পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের নিরিখে বিভূতিভূষণের
'আরণ্যক' : একটি পুনঃপাঠ
অদিতি ব্যানার্জী ৩২০
পারস্পরিক সম্পর্কের ভাষা : বিষয় ও বৈচিত্রতার নিরিখে
স্বপন সুতার ৩২৭

বঙ্গীয় কবিদের রূপকে প্রতিফলিত ধনী-দরিদ্র সম্পর্কের চিত্র
বিশ্বময় বেরা ৩৩৫
'সুখলতার ঘর নেই' উপন্যাস ; হরিশংকর জলদাসের
একটি অন্য জেলেজীবন
খুকুমণি বাগ ৩৪৪
লোকসংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতায় সাঁওতাল জনজাতির জীবনচর্যায়
অতিপ্রাকৃত শক্তির ভূমিকা : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
করম চাঁদ মান্ডি ৩৫০
সাম্যবাদী চেতনায় উদ্ভাসিত : কবি কাজী নজরুল ইসলাম
পুতুল বৈদ্য ৩৫৬
শ্রী অরবিন্দ'র দর্শনে রাষ্ট্রের ধারণা : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
তাপস পাটোয়ারী ৩৬৩
শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' উপন্যাসে অন্য এক কাঞ্চন
অন্নপূর্ণা মাহাত ৩৭২
শিকড়ের খোঁজে : শচীন দাশের দুটি উপন্যাস
দুর্লভ শীল ৩৭৯
সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের ভাষা প্রবণতা
শুভদীপ দেবনাথ ৩৮৩
মুসলিম নারী জাগরণের প্রাসঙ্গিকতায় সওগাত
পত্রিকা (১৯১৮-১৯৪৭) : একটি পর্যালোচনা
মহ. আজিম আলি ৩৯৩
বিরোধী ভাবধারা ও প্রতিবাদের ভাষায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
কবিতা : একটি বিশ্লেষণী পাঠ
মো: সিদ্দিক হোসেন ৪০৪
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী" উপন্যাসে
বিভূতিভূষণের বাসস্থান বারাকপুর, তৎসংলগ্ন অঞ্চল ও তাঁর
বিচরণ-ক্ষেত্রগুলির প্রভাব
মনোজ কুমার মণ্ডল ৪১৫
সার্ত্রের দর্শনে ঈশ্বর
পারমিতা দত্ত ৪২৬

সাগরদ্বীপের লোকসমাজ ও লোকউৎসব
হরিপদ মহাপাত্র ৪৩২
নেপালের রাজতন্ত্রের বিবর্তন এবং গণতন্ত্রে উত্তরণ পর্বের
এক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণমূলক আলোচনা
রাজীব প্রামানিক ৪৩৬
সামাজিক অবস্থানের নিরিখে মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক কথ্যভাষা
রাকিব ৪৪৬
গণমাধ্যমের ভাষা : কৌম সমাজ থেকে সম্ভ্রান্ততা
প্রণব ঘোষ ৪৫৬
ভারতের পরিবেশ আন্দোলন : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা
বাগবুল সেখ ৪৬৬
অবিভক্ত বাংলায় রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের
আদি পর্ব : ১৯৪০র দশক - একটি মূল্যায়ন
চিরঞ্জীব কোনার ৪৭৫
সুকুমার মাইতির উপন্যাসে বিষয় বৈচিত্র্য
সুরজিৎ মণ্ডল ৪৮৪
GST-এর পাঁচ বছর : ভারতে GST-এর রাজ্যভিত্তিক কার্যকারীতার
একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
সুব্রত মজুমদার ৪৯১
মাটির শহর কৃষ্ণনগর ও শিল্পীসমাজ
ইন্দ্রাণী দত্ত ৪৯৮
'মানুষের হৃদয়ের প্রীতির মতন এক বিভা' : জীবনানন্দের
কবিতায় রবীন্দ্রনাথ
অনন্যা ঘোষ ৫০২
উৎপল দত্তের জালিয়ানওয়ালাবাগ : নির্মম হত্যার দলিল
মজিবুর রহমান সেখ ৫১১
ছিন্নমূল মানুষের অস্তিত্বের সংকট : অমর মিত্রের ছোটগল্প
সৌমেন দেবনাথ ৫১৭
বনফুলের 'বিদ্যাসাগর' নাটক একটি বটগাছসম
রাকেশ চন্দ্র সরকার ৫২৫

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে নারীবিশ্ব
নিলুফা খাতুন ৫৩২
অন্নদাশঙ্কর রায়ের পারিবারিক নারীসমস্যা :
একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
সন্তু ঘোষ ৫৩৮
মহাপ্রান লালন ফকিরের জীবনী ও সাধনা
হিমাংশু কুমার মণ্ডল ৫৪৭
Chittaprosad Bhattacharya : Art, Activism and socialist
realism in India, 1939-1948
Priyanka Das ৫৫৬
Aranyak an exceptional Bengali Novel on the
geographical context of Bihar
Ujjal Roy ৫৬৮
Migration and citizenship : A study on the based of
hampering internal politics of the country
Nila Kesh ৫৭৫
Governance Reforms for Quality Enhancement in Indian's
Higher Education System
Shubhra Singha Chowdhury
Asheesh Srivastava ৫৮২
An analytical study on Information Literacy
among the students of Vivekananda Central Library,
J.K. College, Purulia
Basana Das ৫৮৯
Computer phobia among educators in the age of
digital living
Sunil Kumar Baskey
Pallabi Banerjee ৫৯৯
An Indian Foster Child in The West : A Study of Select
Poems of A.K. Ramanujan
Arunima Karmakar ৬১৩

'Value Education' in Schools : An Overview of
Value Education in School in India from the
Vedic Era to the Present
Soma Bhattacharya ৬২৫
Cartesian Dualism and Category Mistake : A Critical
Analysis of Mind-Body Problem
Pranab Ghosh ৬৩৭
Sarvepally Radhakrishnan and the Teachers' Day
Dipankar Kaibartya ৬৪৬
Causes of Crimes and Punishment : A Fervent Inquiry
Rana Das ৬৫৬

সম্পাদকীয়

চিন্তাশ্রীত আলোকে বিশ্লেষীত করতে কে না চায়। নিজের মত করে। কথার পিঠে দুটো কথা জুড়ে। হোক না গভীর অথবা গভীরে না গিয়ে। কিন্তু বাসনা থেকেই যায়। বিচার বিশ্লেষণ করার। সবটা মধুরতা ছড়ায় না। মাঝে মাঝে অমধুরতাও ছোঁওয়াও মেলে। প্রয়োজনবোধে গ্রহণ বা বর্জন। ঠিক ভুলের হিসাবটাও কোন সময় হয়ে পড়ে বেঠিক। আলোকোজ্জ্বল জীবনেও ছায়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে কখনো কখনো। সবটা নিয়েই পরিপূর্ণতা। এবারের সংখ্যাতে সেই স্বাদই মিলবে।

ভসেভোলোদ পুদোভকিনের মন্তাজ তত্ত্ব : কৌশল ও অনুশীলনে একটি গভীর অন্বেষণ

আরাফাতুল আলম
সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: চলচ্চিত্র হল একটি চলমান জাদুকরী বিনোদন ক্যানভাস। যেখানে মানুষ নিজেকে বড় করে দেখতে পায় এবং বহু-গুণ বড় করে মানুষকে দেখাতে চায়। বিশ্ব চলচ্চিত্রের ক্যানভাসে এরূপ দেখতে ও দেখাতে যাওয়া শিল্পীদের মধ্যে সোভিয়েত সিনেমার অন্যতম পথিকৃৎ 'ভসেভোলোদ ইল্লারিওনোভিচ পুদোভকিন' এর অবদান অনন্য। বিশেষ করে তাঁর 'মন্তাজ তত্ত্ব' অন্বেষণ ও প্রয়োগ অনস্বীকার্য। সিনেমাটিক ভাষার বিকাশে পুদোভকিনের কৌশল, উদ্ভাবনী শক্তির ব্যবহার যেকোন চলচ্চিত্র অনুরাগী ও শিল্পীর জন্য 'প্যান্ডোরা বাক্সে'র মত বিস্ময়কর। বিশ্ব চলচ্চিত্র অঙ্গনে যে ক'জন দূরদর্শী চলচ্চিত্র নির্মাতা এই শিল্প আঙ্গিকে অগণিত অদম্য চিহ্ন রেখে গেছেন; সিনেমার গতিপথকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অদ্বিতীয় হলেন সোভিয়েত চলচ্চিত্র নির্মাতা ভসেভোলোদ পুদোভকিন। তাঁর উদ্ভাবনী কৌশল এবং আখ্যান উপস্থাপনা সিনেমা জগতে একটি সুদৃঢ় প্রভাব ফেলেছে। তাই আলোচ্য এই নিবন্ধটিতে বিশ্ব চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে পুদোভকিনের মন্তাজ তত্ত্ব এবং তাঁর চলচ্চিত্রে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ অন্বেষণ ও প্রাপ্ত চিন্তন তুলনামূলক সহজভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল শব্দ : পুদোভকিন, মন্তাজ, মেট্রিক, রিদমিক, টোনাল, ওভারটোনাল ও ইন্টেলেকচুয়াল মন্তাজ।

১. ভূমিকা : আমরা যখন চলচ্চিত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করি, তখন কিছু কিছু ব্যক্তির নাম বারবার দৃষ্টিগোচর হয়; যাঁরা তাঁদের উদ্ভাবন ও শৈল্পিক দক্ষতার কারণে চলচ্চিত্র জগতের আলোকবর্তিকা হিসেবে নিরন্তর দেদীপ্যমান। আলফ্রেড হিচকক, স্ট্যানলি কুব্রিক, আকিরা কুরোসাওয়া'র মতো পরিচালকরা তাঁদের অবদানের জন্য বিশ্বব্যাপী যেমন সমাদৃত; ইতিহাসের পাতায়ও তেমন স্বীকৃত। তবুও, ইতিহাস প্রায়শই এক বহুমাত্রিক প্রতিভাকে বারংবার করেছে উপেক্ষিত। চলচ্চিত্র নির্মাণে যাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। যিনি বিশ্বে চলচ্চিত্র নির্মাণের মূল সারর্মমকে দিয়েছেন নতুন আকার। তিনি আর কেউ নন 'ভসেভোলোদ পুদোভকিন'। যিনি একজন সোভিয়েত চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার এবং তাত্ত্বিক; যাঁর অবদান চলচ্চিত্র জগতে একজন বিপ্লবীর চেয়ে কম নয়। মন্তাজের প্রতি পুদোভকিনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর সমসাময়িকদের থেকে আলাদা। যেমন সের্গেই আইজেনস্টাইন যেখানে মন্তাজকে সংঘাত বা মতাদর্শিক ব্যাখ্যা

তৈরির হাতিয়ার হিসেবে দেখতে চেষ্টা করেছেন। সেখানে পুদোভকিন বরং চিত্রের বা দৃশ্যের যত্নশীল বিন্যাসের মাধ্যমে দর্শকের আবেগ এবং উপলব্ধিগুলোকে উপস্থাপন করার একটি উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে দেখেছিলেন। অর্থাৎ তিনি দর্শকের আবেগীয় ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের উপর গুরুত্ব দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। তাইতো তাঁকে বলতে দেখা যায়-"Film is the greatest teacher because it teaches not only through the brain but through the whole body."[১]

২. পুদোভকিন : ১৮৯৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, রাশিয়ার পেনজায় শহরে জন্মগ্রহণ করেন 'ভসেভোলোদ ইল্লারিওনোভিচ পুদোভকিন' এবং পরলোক গমন করেন ৬০ বছর বয়সে ৩০ জুন ১৯৫৩ সালে জুরমালা, লাটভিয়ায়। পিতার অপেশাদার অভিনয় সাধনা প্রাথমিক জীবনে তাঁকে শিল্পকলার সাথে পরিচয় ঘটালেও একাডেমিক জীবন-যাত্রা শুরুতে চলচ্চিত্রের জগৎ থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দেয়। অধিকন্তু, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং থিয়েটারের সাথে পরিচিত পুদোভকিনকে মঞ্চের শৈল্পিক বিভ্রম ও চলচ্চিত্রের জাদুকরী ক্যানভাস শীঘ্রই তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল। কেননা-"সিনেমা বা চলচ্চিত্র অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়। এর রয়েছে সহজাত সম্মোহনী শক্তি।"[২] পুদোভকিন মস্কো চলে যান, সেখানে কিংবদন্তি থিয়েটার পরিচালক কনস্তানতিন স্তানিস্লাভস্কির অধীনে অভিনয় শিক্ষা লাভ করেন। অভিনয় ও নাট্যে গল্প বলার কৌশল চলচ্চিত্রে তাঁর ভবিষ্যতের কাজের ভিত্তি তৈরি করে দেয়। পুদোভকিনের বয়স যখন সবেমাত্র ২৭, তখন গ্রিফিথের 'ইনটলারেন্স' (১৯২০) দেখে চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠে। প্রারম্ভিকেই তিনি নিউজরীল ক্যামেরা ম্যান ও অভিনেতা হিসেবে মস্কো স্টেট ফিল্ম স্কুলে কাজ শুরু করেন। পরে বিখ্যাত নির্দেশক লেভ ভ্লাদিমিরোভিচ কুলেশভের তত্ত্বাবধানে শুরু করেন চলচ্চিত্রের দীক্ষা লাভ। আর এরই মাঝে বিভিন্ন চলচ্চিত্রের ছোটো খাটো কাজে যুক্ত হয়ে অর্জন করতে থাকলেন নানা ধরনের অভিজ্ঞতা। ফলস্বরূপ ভ্লাদিমির গার্দিন পরিচালিত 'হাংগার হাংগার হাংগার' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনার সুযোগ পান। আর এভাবেই ১৯২১ সালে 'সিকল অ্যান্ড হ্যামার' এ দরিদ্র কৃষকের চরিত্রে অভিনয়, ১৯২৫ সালে 'দি ডেথ রে' তে একাধারে চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা, সহকারী পরিচালক ও শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে 'চেস ফিভার', 'মেকানিক্স অব দি ব্রেন', 'মাদার' সহ জগৎ বিখ্যাত বহু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। সত্যিকার অর্থে চলচ্চিত্র জগতে তাঁর রূপান্তরমূলক যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন তিনি একজন সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাই যুদ্ধকালীন আবেগ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তিনি অনুসন্ধান করছিলেন চলচ্চিত্রের মতো ক্ষমতাধর ও বিস্তৃত মাধ্যমের। ফলস্বরূপ যুদ্ধোত্তর ক্রমবর্ধমান সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পে তিনি প্রবেশ করেন, প্রবেশ করেন একটি ঐতিহাসিক যুগে; যা ছিল বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সৃজনশীলতার আকর।

৩. মন্তাজ : "সমস্ত শিল্পে, সমস্ত আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, আগে অভিজ্ঞতা, তারপর নিয়মনীতি। কালক্রমে, আবিষ্কারের রীতির ক্ষেত্রেও একটা পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে।"[৩]

গোলদোনির এই সর্বেসর্বা কথাটির সার্থক ও প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত হলো-"মন্তাজ"। চলচ্চিত্রের ভাষায় মন্তাজ এক অনন্য সৌন্দর্যালোকে অভিষিক্ত কৌশল। ইংরেজি "Montage" শব্দটি ফরাসি শব্দ "Monter" থেকে এসেছে। যার অর্থ- "To assemble" অথবা "To put together", অর্থাৎ-"একত্র করা বা একত্রীকরণ"। বাংলা পরিভাষায় যা "মনতাজ" বা "মন্তাজ" হিসেবে অধিক পরিচিত। সাধারণত সম্পাদনায় একাধিক ইমেজ, শট বা দৃশ্যাংশকে গ্রথিত করে যখন উপাদান অতিরিক্ত ভিন্ন কোন ভাবনা সৃজন করা হয়, তখন তা মন্তাজ নামে পরিগণিত। "Montage, in its most basic form, is the editing together of different pieces of film to create meaning not inherent in any single shot."[৪] অন্যভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রেক্ষাপটে মন্তাজ হলো এমন একটা কৌশল, যেখানে ছোট ছোট শটগুলোকে সম্পাদনা করে স্থান, সময় ও তথ্যকে আরো সংকুচিত করে একটি সমন্বিত ব্যাখ্যা ও মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব তৈরি করা হয়। এক কথায়-"মনতাজ হল 'a particular process in creative assemblage of shots from which the greatest, finest and furthest result comes out'."[৫] এ প্রসঙ্গে আইজেনস্টাইনের কথাটিও স্মর্তব্য-"Montage is an idea that arise from the collision of independent shots-shots even opposite to one another."[৬] "খুব সহজ করে বললে মনতাজ হল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা আপাতত সম্পর্কহীন দুই বা ততোধিক উপাদান একত্র করে নতুন কোনো একটি ভাব সৃষ্টি যে সৃষ্টিতে অবশ্যই ঘাতের পরিবর্তন ঘটবে।"[৭] যেমন: A+B=C বা AB=C কিংবা 1+1=3 প্রভৃতি। অর্থাৎ-পরস্পর সম্পর্কহীন দুই বা ততোধিক দৃশ্যকে পাশাপাশি সাজিয়ে তৃতীয় একটি দৃশ্য বা অর্থ তৈরির নামই হলো মন্তাজ। মনে রাখতে হবে- "Montage is the nerve of cinema, for it is the means by which the director creates a rhythm, guides the viewer's emotions, and controls the psychological impact of the film."[৮] মন্তাজের আবিষ্কারক হিসেবে যাঁর নাম প্রথমেই আসে, তিনি হলেন-'লেভ ভ্লাদিমিরোভিচ কুলেশভ'। মন্তাজ নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দরুন মন্তাজকে "কুলেশভ এফেক্ট" নামেও অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য কুলেশভ ছিলেন আলোচ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা পুদোভকিনের একজন শিক্ষক। বিংশ শতকের পূর্ব থেকে মন্তাজ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হলেও আইজেনস্টাইন প্রবর্তিত পাঁচ ধরনের মন্তাজ বহুলভাবে স্বীকৃত। যথা: মেট্রিক, রিদমিক, টোনাল, ওভারটোনাল এবং ইন্টেলেকচুয়াল মন্তাজ। যদিও পুদোভকিনের মন্তাজ তত্ত্বটি তিনটি মৌলিক রীতিতে প্রতিষ্ঠিত। যথা-মেট্রিক, রিদমিক এবং টোনাল মন্তাজ। অর্থাৎ পুদোভকিন তাঁর চলচ্চিত্রে মেট্রিক, রিদমিক ও টোনাল মন্তাজের বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ করেছেন তুলনামূলক বেশি। অধিকন্তু বোঝার সুবিধার্থে নিম্নে মন্তাজ'র বহুল চর্চিত পাঁচটি প্রকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

৩.১ মেট্রিক মন্তাজ: মেট্রিক বা মাত্রিক মন্তাজের মূল ভিত্তি হলো-প্রতিটি শটের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য বা স্থায়িত্বকাল। অর্থাৎ মেট্রিক মন্তাজের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফ্রেমে শটগুলোতে সুনির্দিষ্ট পরিমাপ বা সময়ের বিষয়টি বিবেচ্য। পুদোভকিনের মতে মেট্রিক মন্তাজ হল চলচ্চিত্র সম্পাদনার মৌলিক 'বিল্ডিং ব্লক'। এটি সম্পাদনার গতির মাধ্যমে একটি ছন্দময় প্যাটার্ন স্থাপন করে। কেননা "The rhythmic consistency of metric montage can create a certain tempo or mood, often leading to a sense of inevitability or tension."[৯] অর্থাৎ পুদোভকিনও বিশ্বাস করতেন যে শটের সময়কালের সুনির্দিষ্ট পরিমাপ একটি ছন্দ তৈরি করতে সক্ষম। যা দর্শকের উপলব্ধি ও আবেগকে প্রভাবিত করতে পারে। তাঁর বিখ্যাত 'মাদার' (ম্যাক্সিম গোর্কির জগজ্জয়ী উপন্যাসের জগজ্জয়ী চলচ্চিত্রায়ন) চলচ্চিত্রে লক্ষ্য করা যায়, যেখানে উত্তেজনা বা সংঘাতের মুহূর্তে সম্পাদনার গতিও তীব্রতর হয়; যাতে উত্তেজনার অনুভূতি তৈরি করে। যেহেতু ছোট শটগুলি জরুরি, আর দীর্ঘ শটগুলি শান্ত বা প্রলম্বিতের অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে। তাই "By using metric montage, filmmakers can manipulate time and tension through the consistent timing of cuts, making the structure of the edit itself a key element in the viewer's experience."[১০]

৩.২ রিদমিক মন্তাজ: রিদমিক বা ছান্দিক মন্তাজ একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে শট সাজিয়ে ভিজ্যুয়াল ও মানসিক ছন্দ সৃজনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন শট বা খন্ডিতাংশগুলোর দৈর্ঘ্যের সাথে সাথে বিষয়বস্তুর ছান্দিক স্পন্দনকে বিবেচনা করতে হয়। কেননা-"By aligning cuts with the natural rhythms of movement, rhythmic montage helps to maintain a dynamic flow, subtly guiding the viewer's emotional response."[১১] পাশাপাশি প্রয়োজন অনুসারে গতিকে তীব্র বা শিথিল করে, আখ্যানের সাথে দর্শকের মানসিক সম্পৃক্ততাকে আরো তেজস্বী করতে পারে। রিদমিক মন্তাজ নিছক শটের সময়কাল অতিক্রম করা নয়; বরং একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং মানসিক ছন্দ তৈরিতে শটের বিন্যাসে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত। পুদোভকিন মনে করতেন যে, শটগুলির গতি এবং প্রবাহকে যত্ন সহকারে সাজানোর মাধ্যমে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা দর্শকের মানসিক অভিজ্ঞতাকে পরিচালিত করতে পারেন। 'মাদার' চলচ্চিত্রে ছন্দময় মন্তাজ স্পষ্ট হয় যখন পুদোভকিন উচ্চ আবেগের মুহূর্তের সময় চরিত্রের মুখের ক্লোজ-আপ এবং প্রেক্ষাপট প্রতিষ্ঠার জন্য বিস্তৃত শটগুলির মধ্যে পরিবর্তন করেন। এই পরিবর্তন একটি গতিশীল মানসিক ছন্দ তৈরি করে দর্শকদের আখ্যানের গভীরে নিমগ্ন হতে সহযোগিতা করে।

৩.৩ টোনাল মন্তাজ: পুদোভকিন প্রদত্ত মন্তাজ তত্ত্বের সবচেয়ে বিমূর্ত ও আবেগীয় শক্তিশালী দিক সম্ভবত টোনাল মন্তাজ । এক্ষেত্রে সংবেদনশীল বা বৌদ্ধিক থিম বা ধারণা প্রকাশ করতে শটগুলিকে একত্রিত করে একটি যৌগিক আবেগপূর্ণ, বিমূর্ত বা প্রতীকী অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। যেহেতু "Tonal montage is driven by the

emotional tone of the scene, using the visual atmosphere-light, shadow, and color-to evoke a particular feeling."[১২] তাই পুদোভকিনও মনে করতেন যে, নির্দিষ্ট শট সমূহ একত্রিত করে একটি যৌগিক সংবেদনশীল সুর তৈরি করা সম্ভব। 'মাদার' চলচ্চিত্রে পুদোভকিন ছেলেকে হত্যা করার সময় দুর্দান্ত দৃশ্যের জন্য টোনাল মন্তাজ ব্যবহার করেছেন। অত্যাচারীর কারখানার যন্ত্রপাতির শটগুলির সাথে মায়ের যন্ত্রণার শটগুলিকে একত্রিত করে, তিনি শিল্পায়নের অমানবিক দিকটির উপর একটি শক্তিশালী সিনেমাটিক ভাষ্য তৈরি করেছেন, যা চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে সদা জাজ্বল্যমান।

৩.৪ ওভারটোনাল মন্তাজ: ওভারটোনাল মন্তাজ অনেকের কাছে 'ওভারটোনাল এডিটিং' হিসেবে পরিচিত। সোভিয়েত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও তাত্ত্বিক সের্গেই আইজেস্টাইন কর্তৃক প্রবর্তিত চলচ্চিত্র সম্পাদনার একটি বিশেষ ধারা বা কৌশল হলো-ওভারটোনাল মন্তাজ। এটি এমন এক ধরনের মন্তাজকে বোঝায়, যা বিভিন্ন ধরনের মন্তাজ থেকে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলোকে একত্রিত করে। যেমন-মেট্রিক, রিদমিক, টোনাল মন্তাজের কৌশলগুলোর ক্রমবর্ধমান সন্নিবেশে জটিল মানসিক প্রতিক্রিয়া বা একটি নতুন অর্থ সৃষ্টি। তাই এ প্রসঙ্গে পুদোভকিনও বলেন- "Over tonal montage synthesizes metric, rhythmic, and tonal elements to achieve a more nuanced emotional impact, reflecting the cumulative effect of the scene."[১৩] ওভারটোনাল মন্তাজের সবচেয়ে ভালো উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হল আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' (১৯২৫), বিশেষ করে 'ওডেসা স্টেপস' সিকোয়েন্সে। এখানে, আইজেনস্টাইন বিভিন্ন ধরনের মন্তাজ ব্যবহার করে একটি শক্তিশালী মানসিক প্রতিক্রিয়া-ভয়, আতঙ্ক এবং বিশৃঙ্খলার উদ্রেক করেন। ওভারটোনাল মন্তাজ সিনেমাটিক অভিব্যক্তির একটি উচ্চ স্তরকে প্রতিনিধিত্ব করে; যেখানে ভিজ্যুয়াল, রিদমিক এবং ইমোশনাল উপাদানগুলির সংমিশ্রণে সাধারণ গল্প হয়ে ওঠে অসাধারণ।

৩.৫ ইন্টেলেকচুয়াল মন্তাজ: ইন্টেলেকচুয়াল মন্তাজ হলো সোভিয়েত চলচ্চিত্র নির্মাতা সের্গেই আইজেনস্টাইনের তাৎপর্যময় একটি চলচ্চিত্র সম্পাদনা কৌশল। এতে শুধু ঘটনার একটি ক্রম দেখানোর পরিবর্তে, বিমূর্ত ধারণা, আবেগ বা আদর্শিক বার্তা প্রকাশ করার জন্য ভিন্ন চিত্রগুলিকে 'জুক্সটাপোজ' বা পাশাপাশি স্থাপন করে। অর্থাৎ দুটি সম্পর্কহীন শট একসাথে রেখে, চলচ্চিত্র নির্মাতা একটি নতুন অর্থ বা অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে শটগুলি যুক্ত করে দেন। এই কৌশলটি দর্শকমনকে সম্পৃক্ত করার বিপরীতে সমালোচনামূলক চিন্তা করতে ও বৌদ্ধিক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলেতে উৎসাহিত করে। কেননা-"The goal of intellectual montage is to convey abstract ideas often by juxtaposing seemingly unrelated images to create new meanings and the associations in the viewer's mind."[১৪] আইজেনস্টাইনের এই বৌদ্ধিক মন্তাজের ব্যবহার সিনেমায় ছিল এক বৈপ্লবিক

অনুশীলন। কারণ এটি সম্পাদনার ক্ষমতাকে শুধুমাত্র একটি গল্প বলার জন্য নয়, জটিল ধারণাগুলিকে সংযোগ করতে এবং চিন্তাকে উস্কে দিতে সহায়তা করে। আইজেনস্টাইনের 'অক্টোবর' (১৯২৮) চলচ্চিত্রে বৌদ্ধিক মন্তাজের একটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে তিনি রাজতন্ত্রের অসারতা এবং ফাঁপা মহিমার প্রতীক হিসাবে একটি যান্ত্রিক ময়ূরের শট এবং জার এর চিত্রগুলিকে ইন্টারকাট করেছেন।

৪. পুদোভকিনের মন্তাজ তত্ত্ব : চলচ্চিত্র ইতিহাসের একজন আলোকিত ব্যক্তি ভসেভোলোদ পুদোভকিন ও তাঁর মন্তাজ তত্ত্ব চলচ্চিত্র শিল্পে নির্মাণের পদ্ধতিতে এক অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। চলচ্চিত্রে তাঁর অনিঃশেষ অবদান থাকা সত্ত্বেও, ভসেভোলোদ পুদোভকিন প্রায়শই তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় কম প্রশংসা পেয়েছেন; তারপরও উদ্ভাবনী কৌশল এবং মন্তাজ নিয়ে তাঁর অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে সবসময়। কেননা "চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সোভিয়েত ফিল্মের যে-গুরুত্ব তার একটা বড় কারণ এই মনতাজ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির জন্ম, বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে সোভিয়েত দেশেই।"[১৫] আলোচনার এই ক্ষণে 'মাদার' (১৯২৬), 'দ্য এন্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ' (১৯২৭), এবং 'স্টর্ম ওভার এশিয়া' (১৯২৮) এই তিনটি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দৃষ্টান্তকে উপজীব্য করে পুদোভকিনের মন্তাজ তত্ত্ব এবং তাঁর চলচ্চিত্রগুলিতে এর ব্যবহারিক কৌশল ও অনুশীলনের গভীর অন্বেষণের প্রয়াস পাই এভাবে- বিশ্ব চলচ্চিত্রে, বিশেষত সম্পাদনা ও গল্প বলার ক্ষেত্রে তিনি যুগান্তকারী কাজে রেখে গেছেন এক দুর্দমনীয় ছাপ। চলচ্চিত্র নির্মাণে যার প্রভাব তীব্র, গভীর ও স্থায়ী। তিনি লেভ ভ্লাদিমিরোভিচ কুলেশভের কাছ থেকে চলচ্চিত্রের পাঠ গ্রহণের পাশাপাশি তৎকালের অন্য সিনেমাটিক জায়ান্ট সের্গেই আইজেনস্টাইনের সাথে গড়ে তোলেন সখ্যতা ও উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা। এই সখ্যতা যেমন ছিল পারস্পরিক সহযোগিতার, তেমন ছিল সৃজনশীল প্রতিদ্বন্দ্বিতার। এতদস্বত্তেও তাঁরা উদ্ভাবন করলেন 'মন্তাজ' নামক চলচ্চিত্রের সবচেয়ে তাৎপর্যময় ও স্থায়ী তত্ত্বের। যা পরবর্তীতে আমাদের চলচ্চিত্রের বোধ ও নির্মাণের পদ্ধতিকে করে তোলে বৈচিত্রময়। পুদোভকিনের মন্তাজ তত্ত্বের মূলে ছিল একটি ছবিতে বহু শটের সংমিশ্রণ এবং তাদের মিথষ্ক্রিয়ায় আবেগ ও নতুন নতুন অর্থ সৃজন। তাছাড়া তাঁর তত্ত্বের মূল ধারণাগুলির মধ্যে ছিল 'সৃজনশীল ভূগোল'র ধারণা। তিনি ক্রমানুসারে বিভিন্ন শট সাজিয়ে চরিত্র, বস্তু বা ঘটনার মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে দর্শকদের একটি বিশেষ উপলব্ধি অনুভব করান। সম্পাদনার মাধ্যমে এরূপ উপলব্ধি পরিবর্তনের কৌশলটি তাঁর মন্তাজ তত্ত্বের মৌলিক নীতিতে পরিণত হয়েছিল। এককথায়, মন্তাজ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আরো সূক্ষ্ম এবং মনস্তাত্ত্বিক।

পুদোভকিন তাঁর বিখ্যাত 'মাদার' চলচ্চিত্রে নিপুণভাবে মন্তাজ তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। যেমন-মায়ের মুখের ক্লোজ-আপ : মায়ের মুখের একটি আঁটসাঁট শট দিয়ে, উদ্বেগ ও ভয় দেখানো হয়। এই প্রাথমিক শটটি দর্শককে তাদের অভিজ্ঞতার সাথে চরিত্রের মানসিক অবস্থার সংযোগ ঘটায়। বিক্ষোভকারীর মিছিল : পুদোভকিন ছেলের নেতৃত্বে রাস্তায় বিক্ষোভকারীর শট দেখান, যা প্রতিবাদের

সাথে মায়ের মুখের অভিব্যক্তির সংযোগ প্রকাশ করেন। ফ্ল্যাগ আঁকড়ে ধরা : মায়ের কাঁপা কাঁপা হাতে ফ্ল্যাগের কাপড় ধরার একটি ক্লোজ-আপ শট দর্শককে মায়ের অভ্যন্তরীণ উদ্বেগ পুনরায় অনুভব করান। পুলিশের মুখোমুখি : প্রতিবাদ যখন বাড়তে থাকে এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়, তখন পুদোভকিন মায়ের ক্ষুব্ধ মুখের শট দিয়ে ছেলের বিপদের দৃশ্যগুলোকে ইন্টারকাট করেন এবং উভয়ের মধ্যে একটি গভীর শক্তিশালী মানসিক যোগসূত্র ফুটিয়ে তোলেন। মায়ের সংকল্প : অবশেষে শটটি মায়ের মুখে ফিরে আসে। কিন্তু এবার, তার অভিব্যক্তি ভয় থেকে সংকল্পে রূপান্তরিত হয়। এই সংবেদনশীল পরিবর্তনটি শুধুমাত্র সম্পাদনার মাধ্যমে চরিত্রের বিকাশ এবং মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে মন্তাজ তত্ত্বের শক্তিকে চিত্রিত করে। এছাড়া বিক্ষোভ যখন দানা বাধে, তখন জমাট বাধা বরফের টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে চলা এবং বরফ গলে অজস্র ধারায় পানি বয়ে যাওয়ার দৃশ্য বারংবার দর্শককে যেমন পরিস্থিতির চূড়ান্ত পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছে, তেমনি আবার সিনেমাটিক অ্যাকশনের নান্দনিক ভাষা তৈরির পাশাপাশি দর্শক-শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করেছে। 'মাদার' চলচ্চিত্রে মন্তাজের উদাহরণগুলি নিছক কতগুলো শট বা চিত্রের সংগ্রহ নয়, বরং একটি গল্পের আবেগগত গভীরতা এবং সামাজিক রূপান্তরকে বোঝানোর একটি গতিশীল ও শৈল্পিক প্রচেষ্টা।

পক্ষান্তরে-'দ্য এন্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ' চলচ্চিত্রটি সামাজিক থিমকে কেন্দ্র করে পুদোভকিনের আকর্ষণীয় আখ্যান বোনার দক্ষতা ও গভীর চিন্তনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চলচ্চিত্রটি একজন কৃষকের জীবনকে কেন্দ্র আবর্তিত হয়। যেখানে সে একটি উন্নত জীবনের সন্ধানে শহরে চলে যায়; কিন্তু শিল্পায়ন এবং শোষণের কঠোর বাস্তবতায় হতাশ হয়ে পড়ে। পুদোভকিন দক্ষতার সাথে নায়কের ব্যক্তিগত যাত্রাকে বৃহত্তর সামাজিক সমস্যাগুলির সঙ্গে যেমন অন্তর্ভুক্ত করেছেন; তেমন ঐতিহ্যগত জীবনধারায় আধুনিকীকরণের প্রভাবের উপর একটি মর্মস্পর্শী আখ্যান তৈরি করেছেন। 'দ্য এন্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ'-এ পুদোভকিন তাঁর মেট্রিক মন্তাজ কৌশল কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেন। যেমন-প্রারম্ভিক দৃশ্যে, গ্রামাঞ্চলের প্রশান্তি দেখাতে গতি ইচ্ছাকৃতভাবে ধীর করা; নায়ক যখন শহরে প্রবেশ করে এবং কারখানার কাজের বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হয়, তখন দৃশ্য আরও তীব্র করে বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতার অনুভূতি তৈরি করা প্রভৃতি। নায়কের আবেগময় যাত্রা বোঝাতে কঠোর পরিশ্রমের দৃশ্য এবং কারখানার মালিকদের নির্মমতা, শ্রমিকদের দুর্ভোগ এবং বুর্জোয়াদের ঐশ্বর্যের মধ্যে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যকে জোর দিতে ছন্দময় মন্তাজের প্রয়োগ। এছাড়াও 'দ্য এন্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ'-এর গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যগুলো বোঝাতে টোনাল মন্তাজের ব্যবহার ছিল চমৎকার। ক্রমান্বয়ে একটি ধর্মঘটে নায়কের অংশগ্রহণ; জড়ো হওয়া শ্রমিকদের গুলি করা; তাদের মুখ দৃঢ়সংকল্পে ভরা, কারখানার মালিক এবং পুলিশের বিক্ষোভ দমন করার প্রস্তুতির দৃশ্যগুলোতে টোনাল মন্তাজ কার্যকরভাবে শ্রেণী সংগ্রাম এবং আসন্ন দ্বন্দ্বকে চিত্রায়নের মাধ্যমে আসন্ন বিপ্লবের অনুভূতি তৈরি করে।

'স্টর্ম ওভার এশিয়া' পুদোভকিনের মন্টেজের দক্ষতার আরেকটি অসাধারণ উদাহরণ। ছবিটি একটি মঙ্গোলিয়ান পশম ট্র্যাপারের গল্প নিয়ে নির্মিত, যে রাশিয়ান গৃহযুদ্ধের রাজনৈতিক অস্থিরতায় জড়িয়ে পড়ে। মঙ্গোলিয়ান ল্যান্ডস্কেপের বিশালতা এবং স্বদেশের সাথে নায়কের সংযোগের কারণে এই ছবিতে পুদোভকিনের মন্তাজ ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সময় ও দূরত্বের অনুভূতি তৈরি করতে, বিস্তৃত মঙ্গোলীয় ল্যান্ডস্কেপের বিশালতা এবং ভ্রমণের অগম্যতা বোঝাতে মেট্রিক মন্তাজের ব্যবহার দর্শকদের মাঝে মঙ্গোলিয়ার দুর্গম ও রুক্ষ ভূখণ্ডে অবস্থান করার উপলব্ধি তৈরি করে। অন্যদিকে, নায়কের যাত্রার মানসিক উত্থান-পতন বোঝাতে, বিদেশি দখলদারদের মুখোমুখি হওয়া, বিজয়ের মুহূর্তগুলি অনুভব করা, সম্পাদনায় ছন্দ দ্রুত হয়ে ওঠার দৃশ্যগুলির বিপরীতে একাকিত্বের মুহূর্তগুলিতে সম্পাদনার গতি কমে যাওয়া রিদমিক মন্তাজের উৎকৃষ্ট প্রতিফলন। যা নিগূঢ়ভাবে দর্শকদের চরিত্রের সাথে গভীর স্তরে সংযোগ ঘটিয়েছে। তাছাড়া শক্তিশালী অনুক্রমের মধ্যে একটি লুকানো মন্দিরে পশম ট্র্যাপারের আবিষ্কার এবং পরবর্তীকালে চেঙ্গিস খানের বংশধর হিসাবে তার আসল পরিচয় উন্মোচন; মঙ্গোলিয়ান শিল্পকর্ম এবং প্রতীকগুলির চিত্রের সাথে ট্র্যাপারের মানসিক জাগরণের শটগুলিকে জুক্সটাপোজ করতে যথার্থভাবে টোনাল মন্তাজ ব্যবহার করেন পুদোভকিন। ফলে সাংস্কৃতিক পুনরাবিষ্কারের গভীর অনুভূতি তৈরি, পুনরুত্থান, ঐতিহ্য এবং মঙ্গোলিয়ান স্বাধীনতার বৃহত্তর সংগ্রামের সাথে চরিত্রের সংযোগ এই চলচ্চিত্রে সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং প্রতিরোধের বিষয়বস্তুকে আরো শক্তিশালী করেছে।

পুদোভকিন ও সের্গেই আইজেস্টাইন মন্তাজ তত্ত্বের বিকাশে একে অপরের সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও মন্তাজের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। বিপরীত শটের সংমিশ্রণে দর্শকমনে প্রায়শই বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক স্ফুলিঙ্গ তৈরিতে আইজেনস্টাইন ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' (১৯২৫) সহ তাঁর চলচ্চিত্রগুলি গতিশীল ও দ্বন্দ্বমূলক সম্পাদনার জন্য ছিল বেশ পরিচিত। তিনি ভিন্ন চিত্রের মধ্যে সংযোগ আঁকতে বাধ্য করার মাধ্যমে দর্শকের বুদ্ধিকে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে, পুদোভকিন আরো ধীর, সূক্ষ্ম ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে কাজ করে গেছেন। সম্পাদনার মাধ্যমে আবেগীয় গভীরতা সূক্ষ্ম চরিত্রের বিকাশের উপর তাঁর জোর ছিল বেশি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সম্পাদনা কেবল একটি প্রযুক্তিগত বিষয় নয় বরং একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া যা দর্শকের উপলব্ধি গঠন করতে সক্ষম। তাই তিনি বলেন-"Editing is not merely a method of the junction of separate scenes or pieces, but is a method that controls the 'psychological guidance' of the spectator."[১৬] ফলত তাঁর চলচ্চিত্রগুলো যেমন 'মাদার', 'দ্য এন্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ' এবং 'স্টর্ম ওভার এশিয়া' সহানুভূতি জাগিয়ে তোলায় ও জটিল মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি প্রকাশে হয়ে ওঠে জগৎ বিখ্যাত। প্রকৃতির বিশাল ক্যানভাসে বসে মন্তাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সূক্ষ্ম-মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষণে। তিনি বলেন "প্রাকৃতিক পরিবেশে সিনেমা তোলাই আমি পছন্দ করে থাকি এবং স্টুডিওর কৃত্রিম সেটে কাজ করা আমার

একেবারেই ভালো লাগে না। আমি কোন দৃশ্য কৃত্রিমভাবে গড়ে তোলার চাইতে বাস্তব জগতে সেটাকে খুঁজে নেওয়াটাই (অর্থাৎ লোকেশন নির্বাচন করে) বেশী পছন্দ করি। স্টুডিওর ভেতরে তৈরী জঙ্গলের সেট আমাকে ক্লান্ত করে তোলে। এতে ছবি তোলার মজাই নষ্ট হয়ে যায়। অন্য অনেকে স্টুডিওতে ছবি তুলে যে তৃপ্তি পান আমি তা পাই না। স্টুডিওর ভিতরে আমি কোন কিছুই আবিষ্কার করতে পারি না।" [১৭] এই প্রাণবন্ত, স্বাধীনচেতা উদ্ভাবক দর্শককে কেবল পর্দায় উন্মোচিত গল্পগুলো দেখতে নয়, বরং গভীরভাবে অনুভব করাতে চেয়েছিলেন। তাই পুদোভকিনের গুরুত্ব ও প্রভাব শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের ইতিহাসের পাতায় নয়, বরং চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও টিকে থাকবে। পাশাপাশি চলচ্চিত্রের মনোবিজ্ঞানে তাঁর স্থায়ী অবদান নিশ্চিত করে যে, চলচ্চিত্র জগতের একজন 'আনসাং হিরো' হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন চিরকাল । যিনি বড় পর্দায় আবেগ ও আখ্যান গঠনকল্পে সম্পাদনার শিল্পকে রূপান্তরিত করেছিলেন একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে। আর মন্তাজের উদ্ভাবনী ব্যবহার, বর্ণনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাষ্য যোগ করার ক্ষমতা; ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নির্মাতাদের জন্য নতুন গল্প বলার পথকে করেছেন প্রশস্ত।

উপসংহার : পুদোভকিনের কৌশল কেবল তাঁর চলচ্চিত্রেই পাওয়া যায় না বরং তাঁর তত্ত্বগুলি বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্র নির্মাণে বিস্তৃত ও সর্বজন স্বীকৃত। মন্তাজের মনস্তাত্ত্বিক দর্শন প্রতিষ্ঠা, সম্পাদনায় অভিনবত্ব আনায়নে চলচ্চিত্রের অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে শক্তিশালী ও অনন্য। তাই পুদোভকিন ও তাঁর কাজ চলচ্চিত্র অনুরাগী, শিক্ষার্থী, নির্মাতা এবং পণ্ডিতবর্গের কাছে সবসময় প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িক। তাঁর প্রভাব অগণিত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাজে দেখা যায়; যাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। আকিরা কুরোসাওয়া এবং সত্যজিৎ রায়ের মতো পরিচালকরা তাঁর তত্ত্ব এবং কৌশলগুলি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। মেট্রিক, রিদমিক এবং টোনাল মন্তাজের উপাদানগুলিকে তাঁদের নিজস্ব চলচ্চিত্রগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এক কথায়, চলচ্চিত্র শিল্পে মন্তাজের স্থায়ী তাৎপর্য তুলে ধরতে তাঁর চিন্তন ও শিল্পগুলো গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বা নির্দেশিকা হিসেবে সর্বজন গৃহীত। পরিশেষে তাই এটাই উপলব্ধি হয় যে, চলচ্চিত্রের বিকাশমান ঐন্দ্রজালিক ক্যানভাসে একজন সিনেমাটিক স্বপ্নদর্শী নির্মাতা হিসেবে ভসেভোলোদ পুদোভকিনের মর্যাদা আরও সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১. https://www.azquotes.com/quote/684899

২. হায়াৎ, অনুপম, চলচ্চিত্রনাট্য: তত্ত্ব ও রচনা নিদর্শন, ঝিনুক প্রকাশনী, ২০১৩, ঢাকা, পৃ-১১

৩. আইজেনস্টাইন, সের্গেই, ফিল্ম ফর্ম, (ধীমান দাশগুপ্ত), অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ২০০৭, কলকাতা, পৃ-৬৬

৪. Bordwell, D. & Thompson, K. Film Art: An Introduction, MacGraw-Hill, 2010, United States, P-188

৫. দাশগুপ্ত, ধীমান, চলচ্চিত্রের অভিধান, অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ২০০৬, কলকাতা, পৃ-৩৫৬

৬. Eisenstein, S. Film Form: Essays in Film Theory, (J. Leyda, Trans.), Harcourt Brace Jovanovich, 1949, United States, P-72

৭. দাশগুপ্ত, ধীমান, চলচ্চিত্রের টেকনিক ও টেকনোলজি, অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ২০০৬, কলকাতা, পৃ-৫২

৮. Pudovkin, V.I, Film Technique and Film Acting: The Cinema Writings of V.I. Pudovkin. (I. Montagu, Trans.), Bonaza books, 1958, United States, P-79

৯. Pudovkin, V.I, Film Technique and Film Acting: The Cinema Writings of V.I. Pudovkin. (I. Montagu, Trans.), Bonaza books, 1958, United States, P-117

১০. Brown, B. Cinematography: Theory and Practice (2nd ed.), Focal Press, 2011, United States, p-101

১১. Pudovkin, V.I, Film Technique and Film Acting: The Cinema Writings of V.I. Pudovkin. (I. Montagu, Trans.), Bonaza books, 1958, United States, P-123

১২. Pudovkin, V.I, Film Technique and Film Acting: The Cinema Writings of V.I. Pudovkin. (I. Montagu, Trans.), Bonaza books, 1958, United States, P-128

১৩. Pudovkin, V.I, Film Technique and Film Acting: The Cinema Writings of V.I. Pudovkin. (I. Montagu, Trans.), Bonaza books, 1958, United States, P-134

১৪. Pudovkin, V.I, Film Technique and Film Acting: The Cinema Writings of V.I. Pudovkin. (I. Montagu, Trans.) Bonaza books, 1958, United States, P-143

১৫. দাশগুপ্ত, ধীমান, চলচ্চিত্র সম্পাদনা, অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ২০১১, কলকাতা, পৃ-৬২

১৬. https://www.azquotes.com/quote/684900

১৭. মোকাম্মেল, তানভীর, চলচ্চিত্র নন্দনতত্ত্ব ও বারোজন ডিরেক্টর, অনার্য পা. লি. ২০১৯, ঢাকা, পৃ-৬৫

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার ইতিবৃত্ত

নম্রদ্বীপ বালা
স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা একটি বিরাট বড় সমস্যা। বিশেষত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা। আরো বিশেষভাবে বললে হিন্দু-মুসলিম মধ্যেকার বিরোধ ও বিদ্বেষ ক্রমাগত ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে। যার ফলে সংকুচিত হচ্ছে মানবতার পরিসর, বিপর্যস্ত হচ্ছে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক। বাংলাদেশ ভারতের অন্যতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং উভয় দেশেই আজ সাম্প্রদায়িকতার মলিন পরিবেশ। তাছাড়া এক দেশের কোনো ঘটনার প্রভাব অন্য দেশের উপর অতি সহজেই পড়ে। অতি সম্প্রতি কোটা-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া অচলাবস্থা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশত্যাগ, নতুন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন এবং এসবের মধ্যে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় ৭১-এর সেই বাংলাদেশটা কি কোথাও হারিয়ে গেল? কারণ অতীতের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িকতা কে পরাস্ত করে বাংলাদেশের মানুষ ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত সংগ্রামে স্বাধীনতা এনেছিল। ৭২-এর সংবিধানে লেখা হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা। কিন্তু সংবিধানে এখন ধর্মনিরপেক্ষতা নেই, সমাজতন্ত্র-ও নেই। গণতন্ত্র আছে নামমাত্র, কাজে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। ৭৫-এ মুজিব হত্যার পর দেশে সামরিক শাসন জারি, সংবিধান পরিবর্তন সহ ইত্যাদি বিষয় সাম্প্রদায়িকতার পুনর্জাগরণকে নিশ্চিত করেছে। একই সাথে ঘটেছে মৌলবাদের অভ্যুত্থান। ১৯৮৯, ১৯৯০, ১৯৯২ -এর সাম্প্রদায়িক সহিংসতা; ২০০১- এর নির্বাচন পরবর্তী সংখ্যালঘুদের ওপর ভয়ানক অমানবিক অত্যাচার এর মত নানান ঘটনা তার প্রমাণ দেয়। আর একেবারে তাজা প্রমান তো বর্তমানে আমাদের সামনেই রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে বারংবার এই সাম্প্রদায়িক চোখ রাঙানির কারণ কি? কীভাবে অতি দ্রুত এবং অতি সহজে সাম্প্রদায়িকতা সমাজে প্রভাব বিস্তার করছে? তাছাড়া সেদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সহ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর তার প্রভাব কতটা? এর সমাধানই বা কি? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে আমাদের যেতে হবে একেবারে গোড়ায়। কারণ বাংলাদেশ তৈরীর বহু আগেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়েছিল।

মূলশব্দ : উপমহাদেশ, সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বঙ্গভঙ্গ, দ্বিজাতি তত্ত্ব, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, সংখ্যালঘু, বামপন্থা, মৌলবাদ।

ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতাকে সাধারণত ঔপনিবেশিক পটভূমিকার সাথে যুক্ত করে দেখা হয়। ব্রিটিশ শাসনের যুগে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসক নিজেদের শাসন কাঠামো সঠিক ভাবে বজায় রাখতেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, এমন ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে দেখিয়েছেন হিন্দু মুসলমানের নিজেরই ভেতরকার বিচ্ছেদের নগ্ন চেহারাটা। ঔপনিবেশিক আমল থেকে সাম্প্রদায়িকতার বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করা যায় ঠিকই, তবে তার আগে থেকেই সাম্প্রদায়িকতা বর্তমান ছিল।

"হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া ও ইতিহাস সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উভয়ের মধ্যে মৌলিক বিরোধও ছিল। বিরোধের মূল উপাদান দুটি... এর প্রথমটি হল ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রের দ্বিতীয় ধারাটি ছিল হিন্দুদের ইসলামের প্রভাব এড়ানোর জন্য নিজেদের চতুর্দিকে বিধি-নিষেধের প্রাচীর তুলে কমঠ বৃত্তি গ্রহণ করা।"[১]

ফলত আমরা দেখব হিন্দু সমাজ মুসলমানদের বিধর্মী-বিভাষী-বিদেশী হওয়ার কারণে তাদেরকে যবন, ম্লেচ্ছ মনে করে সর্বতোভাবে বর্জন করেছে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত অভিজাত বর্গের মধ্যে এই মানসিকতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ধীরে ধীরে সমাজের উপরি স্তরের ভেদাভেদ ও পৃথক থাকার মানসিকতা চুঁইয়ে নিচের স্তরে প্রবেশ করে। এই একই ঘটনা আমরা মুসলিম সমাজেও দেখতে পাবো।

"ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও বারবার নিজেদের পৃথক গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে ইসলামের শুদ্ধ শরীয়তী রূপে তন্নিষ্ঠ থাকার প্রবণতাও দেখা দিয়েছে। এই মানসিকতার জন্য মরমিয়া সুফিরা ধিক্কৃত হয়েছেন, আকবরের সঙ্গে সঙ্গে দীন-এ-ইলাহির অকালমৃত্যু ঘটেছে, সর্বধর্ম সমভাবের সাধক শহাজাদা দারাশুকো উত্তরাধিকারের লড়াই-এ মোগল ওমরাহের সমর্থন পাননি, সরমদকে ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং এমনকি তৈমুরের আক্রমণের সময়ই (১৩৯৮ খ্রী) ভারতের তদানীন্তন মুসলমানদের ভিতর প্রশাসন ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা এবং পৃথক থাকার প্রবণতাকে প্রোৎসাহিত করেছে।"[২]

এছাড়াও শাসক-শাসিতের সম্পর্কের মধ্যে সর্বদা একটা বিরোধ-সংঘাতের সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব এবং প্রসারের প্রাথমিক যুগ থেকেই হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সম্প্রদায় দুই বিপরীত শিবিরে বিভক্ত হয়ে পাশাপাশি বসবাস করছিল। ফলে ইংরেজ আগমনের পূর্ব থেকেই নানান স্থানে দাঙ্গা লক্ষ্য করা যায়। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দাঙ্গার ইতিহাস' বইতে জানাচ্ছেন হিন্দু-মুসলমান সর্বপ্রাচীন দাঙ্গার প্রথম বিস্তারিত নিদর্শন মেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায়। মোগল-শাসনের শেষ ভাগে গুজরাত ও কাশ্মীরে দুটি ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। বিখ্যাত ইতিহাস 'সিয়ারুল মোতা আখেরীন'-এ তার উল্লেখ

পাওয়া যায়। নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পর্বে ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার কালে লালকেল্লার সামনে জামা মসজিদ এলাকায় এক প্রচন্ড দাঙ্গার বিবরণ দিয়েছেন। এরপর ইংরেজ আমলে প্রথম দাঙ্গা আমরা দেখতে পাই ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বারানসী'র লাট ভৈরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায়। তারপর ১৮১৩ তে আজমগড়, ১৮২০ তে কলকাতায় দাঙ্গা হয়। বর্তমান সময়ে রামনবমীকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা ঘটার দৃশ্য সামনে এসেছে। এর পূর্বসূত্র আমরা দেখব রোহিল খন্ডের বেরিল শহরে। সেখানে ১৮১৬, ১৮৩৭, ১৮৫০, ১৮৭০, ১৮৭১, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে রামনবমী ও মহরমের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা হয়। অর্থাৎ পুরো উনিশ শতক জুড়ে প্রচুর দাঙ্গা সংগঠিত হচ্ছে এবং এই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। কারণ ভারতীয়দের মধ্যেকার এই যাবতীয় বিভেদ ইংরেজ তার প্রশাসনিক স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। ভারতে ভাষা, প্রদেশ, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি যাবতীয় বিভেদের ধারাকে তারা কাজে লাগিয়েছে, এর প্রমাণ ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ, এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ এর দেশভাগ।

এবার আসা যাক বাংলাদেশের কথায়। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের শেষে 'বাংলাদেশ' নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় ঠিকই, কিন্তু পূর্ববঙ্গের একটা বড় অংশের জনগণ বহু আগে থেকেই নিজেদের মানস-পটে একটা নতুন দেশের নির্মাণ শুরু করেছিল। এর নানান আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কারণ রয়েছে। অখন্ড বাংলাই ছিল হিন্দু-মুসলমানের দেশ। ১৯৪৭-এর আগে পর্যন্ত অখন্ড বাংলার মধ্যেই নদী ও খাল-বিলের দেশ হিসেবে পূর্ববঙ্গের একটা পৃথক ভৌগোলিক সত্তা ছিল। ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান। দেশভাগ হয়েছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে, যেটা পরে ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে । ২৫ বছর পর পাকিস্তান ভেঙ্গে তৈরি হলো বাংলাদেশ। একটা বিস্তীর্ণ সময় ধরে, নানান স্তর ভেদে এই যে একটা দেশের নির্মাণ তা কখনোই সরল ছিল না। এর একটা সুদীর্ঘ ও জটিল ইতিহাস রয়েছে। আবার এই ইতিহাসের সাথেই ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে সাম্প্রদায়িকতার ইতিবৃত্ত। বলা যায় পূর্ববঙ্গ থেকে পূর্ব-পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার এই যাত্রা পথে সাম্প্রদায়িকতা চলেছে পাশাপাশি, একেবারে সমান্তরাল ভাবে। এমনকি এই দেশের সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতার ভূমিকাও রয়েছে যথেষ্ট।

বাংলাদেশে সুদীর্ঘ কাল ধরে চলে আসা এই সাম্প্রদায়িকতার কারণ নিয়ে মতানৈক্য আছে। একটি দল মনে করে এই সাম্প্রদায়িকতার পিছনে রয়েছে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই দলের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিরিশের দশকে বরিশালের শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক। "কমিউনিস্টদের অনেক আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, 'দ্যা পলিটিক্স অফ বেঙ্গল ইজ রুটেড ইন দ্যা ইকোনমি অফ বেঙ্গল' অর্থাৎ বাংলার অর্থনীতির মধ্যেই বাংলার রাজনীতির আসল প্রাণ শক্তি নিহিত।"[৩] অন্য দল মনে করে সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি ইংরেজ শাসকদের ভেদনীতির

পরিণাম। এই দলের অন্যতম জহরলাল নেহেরু। কিন্তু উভয়ের ধারণাই সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়।

“হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ সহস্রাধিক বছরের পুরানো। হিন্দুদের ওপর মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, ধর্মান্তকরণ ইত্যাদি তার আদি কারণ। আসল কারণ অবশ্য আরও মূলে নিহিত। সামাজিক ক্রিয়া-কানুনের দিক থেকে হিন্দু সমাজ অনমনীয়, কিন্তু ধর্মের বিষয়ে হিন্দুরা উদার। মুসলমানদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা তার বিপরীত। তারা ধর্মের ক্ষেত্রে কঠোর, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে উদার। শহুরে হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের সামাজিক প্রাচীর ভাঙ্গা অতি সামান্য শুরু হলেও মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের কোন ক্ষেত্রেই সামাজিক সম্পর্ক, অর্থাৎ খানাপিনা ও বিবাহ সম্পুর্ণ অচল। তাছাড়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গোমাংস পারস্পরিক সংমিশ্রণের (fusion) এক মস্ত বাধা।”[৪]

অর্থাৎ এই সমস্ত বিভেদমূলক সমস্যা নিয়েই অখন্ড বাংলায় হিন্দু মুসলমান একত্রে বসবাস করছিল। ইংরেজ যেমন নিজেদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে এই বিভেদকে কাজে লাগিয়েছে, তেমনি আমরা দেখব এদেশের এক শ্রেনীর মানুষ নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে এই বিভেদকে কাজে লাগাবে। এই নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের হাতে ছিল দুটি অস্ত্র। একটি অর্থনৈতিক বৈষম্য, আরেকটি ‘Pan-Islamism’ বা নিখিল ইসলাম। কখনো কখনো আবার এই দুটি অস্ত্রের একত্র প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়।

এখন প্রথমে আসা যাক ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের কথায়। সে সময় ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ এবং কিছু মুসলিম নেতা পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় লোকেদের একটা বড় অংশকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, বাংলাকে দুভাগে ভাগ করলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন। একথা সত্যি যে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে জমিদারদের মধ্যে একটা বড় অংশ ধর্ম পরিচয়ে ছিল হিন্দু। ফলত মানুষকে এটা বোঝানো খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু একথাও সত্য যে ওই সমস্ত জমিদারদের নিচে ছিল একশ্রেণির জোতদার সম্প্রদায়, যারা ধর্ম পরিচয়ে মুসলমান। তারা আশা করেছিল বঙ্গভঙ্গ হলে সেই জমিদারি আসবে তাদের হাতে। এখানে সাধারণ মানুষ তথা কৃষক সম্প্রদায়ের কোন প্রকার স্বার্থ ছিল না। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক লাভের কথা বলে ভুল বোঝানো হয়েছিল।

এরপর ১৯৪০ এর লাহোর প্রস্তাব এবং পাকিস্তান আন্দোলন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জোরালো ভাবে দ্বিজাতি তত্ত্বের দাবি তুললেন। মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হলো – ‘পাকিস্তান’ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই মুসলিমদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতারা বাঙালি মুসলমানদের বোঝাতে পেরেছিলেন হিন্দু জমিদাররা যেভাবে মুসলমান প্রজাদের শোষণ-পীড়ন করছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তা হবে না। একই সাথে ছিল ‘pan-Islamism’ বা নিখিল ইসলামের ভাবাদর্শ। যা উনিশ শতকে মুসলমান জগতকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। ধীরে ধীরে এই তত্ত্বের অপব্যবহার শুরু হয়, ক্রমশ তা উগ্র-জাতীয়তাবাদের স্বার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং

সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের পথ সহজ হয়। ফলস্বরূপ ১৯৪৬-এ গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ও ৪৭'-এ দেশভাগ।

১৯৪৭ এর ১৪ই আগস্ট সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পর পাকিস্তান সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানদের মোহভঙ্গের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৮-র ২৩ শে ফেব্রুয়ারি, যখন পাকিস্তানের আইনসভায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই দাবিকে হিন্দু ও ভারতের পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেন। প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব-বাংলায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এবং ১৯৫৪-এর নির্বাচনে বাংলাদেশের মাটিতে মুসলিম লীগের রাজনীতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দলীয় রাজনীতির শোচনীয় বিপর্যয়ের পর পাকিস্তানি শাসকদের অবলম্বন ছিল সশস্ত্র বাহিনী। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্র ও রাজনীতির মেলবন্ধনের পরিণতি ভয়ংকর। ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে তাই একাত্তরের বাংলাদেশে নেমে আসে পাশবিক অত্যাচার।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছিল মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ সময় পর্বে সাম্প্রদায়িকতা ছিল প্রশমিত। ৭২-এর সংবিধানে ছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের কথা। কিন্তু ৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়াউর রাহমান সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'সমাজতন্ত্র' ও 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' মুছে ফেলেন। তার দৌলতে সংবিধানের প্রস্তাবনার শীর্ষদেশে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজিত হল। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় এল 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে নতুন করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আমদানি হল এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পেল। মোটকথা সাম্প্রদায়িকতার পুনর্জাগরণের পথ প্রশস্ত হল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এমন ঘটল কেন? মাত্র চার বছরের ব্যবধানেই কি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ উবে গেল?

"স্থূল সত্য হলো এটা যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব সমাজতন্ত্রীরা দেয়নি, পুঁজিবাদে বিশ্বাসীরাই দিয়েছে। সমাজতন্ত্রীদের এ এক ঐতিহাসিক ব্যর্থতা। আওয়ামী লীগের চেতনায় সমাজতন্ত্র ছিল না কখনো, তবু তাকে সমাজতন্ত্রকে মেনে নিতে হয়েছিল, স্বেচ্ছায় নয়, জনগণের চাপে। নেতৃত্বের কেউ কেউ সমাজতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন অবশ্য, আগাগোড়াই; যেমন তাজউদ্দিন আহমদ। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে এ ঘটনা যে, তিনি পরিত্যক্ত হয়েছেন, স্বাধীনতার পরে। শক্তিশালী হয়েছে দলের সমাজতন্ত্র বিরোধী অংশ, যার প্রধান নট ছিলেন খন্দকার মোস্তাক আহমদ; মুজিব হত্যার পর যিনি রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়েছিলেন এবং পেয়ে রাষ্ট্রকে বাম থেকে ঘুরিয়ে দক্ষিণ দিকে চালিয়ে দিলেন। জিয়াউর রহমানও ছিলেন পুরোপুরি দক্ষিণপন্থী"।[৫]

ফলস্বরূপ আড়ালে থাকা সাম্প্রদায়িকরা প্রকাশ্যে বেরিয়ে এল। গ্রাম ও শহরের সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনায়াসে তাতিয়ে তুলল ধর্মীয় বিষবাষ্প। অরাজকতার মধ্যে সমস্ত আবহাওয়াটাই বিষিয়ে গেল। এই গোটা প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন জেনারেল এরশাদ। যিনি ১৯৮২ তে ক্ষমতা দখল করেন।

"বিএনপি যদি বাংলাদেশে ইসলামকে ফিরিয়ে আনার দাবিদার হয় এবং জামায়াত যদি বাংলাদেশকে আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তিনি তাদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো ব্যবস্থা নেবেন। ১৯৮৮ সালে তিনি সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনলেন। তাতে বলা হলো: 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে'। ইসলামের সঙ্গে অন্য ধর্মের কি বিপুল পার্থক্য করা হলো, সংশোধনীর ভাষা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংবিধানে সকল নাগরিককে যে-সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং আইনের দৃষ্টিতে যে-সমতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, এভাবে তা লঙ্ঘন করা হলো। অমুসলমানেরা কেবল যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হলেন, তা নয়; তাঁদের পক্ষে সংবিধান-রক্ষার এবং এর প্রতি অনুগত থাকার শপথ নেওয়ার অর্থ হয়ে দাঁড়ালো বিসমিল্লাহর প্রতি আনুগত্য-ঘোষণা"।[৬]

১৯৯০ সালে সামরিক শাসক জেনারেল এইচ এম এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপরের ইতিহাস মৌলবাদের জাগরণের ইতিহাস। আশ্চর্য মনে হলেও মৌলবাদ অতি দ্রুত এবং অতি সহজে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। "কারণ সহজ। প্রথম কারণ মানুষের মনে হতাশা। দ্বিতীয় কারণ মৌলবাদীদের হাতে দেশী-বিদেশি টাকার জোর। তৃতীয় কারণ বিএনপির নমনীয়তা। চতুর্থ কারণ জনগণের সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা।...মৌলবাদকে শাসক দল গুলো শত্রু মনে করেনি। বরঞ্চ কোনো না কোনোভাবে প্রশ্রয় দিয়েছে সব দলই কম আর বেশি এমনকি ওই যে অন্তসারশূন্য রুশ ভারত বিরোধিতার নাম করে বামপন্থীদের একাংশ মৌলবাদীদের কে মিত্র ভেবেছে।"[৭]

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার পুনর্জাগরণের পথে বামপন্থীদের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এ কথা সত্যি যে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে একদল কমিউনিস্টের বড় অবদান ছিল। সে সময় বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টি, ৭০ দশকের প্রথম ভাগে জাসদ সহ বেশ কয়েকটি উগ্র বামপন্থী দল মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে কাজ করেছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেখা যায় মুজিব সরকার কমিউনিস্ট-নিধন যজ্ঞে মেতে উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে সেই সমস্ত দলের কর্মীরা ঘরে ও বাইরে উভয় জায়গায় বিপন্ন। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মদতে মৌলবাদীদের হাতে দেশি-বিদেশি টাকার পাহাড়। যা কমিউনিস্টদের আদর্শ চ্যুত হওয়ার অন্যতম কারণ। ফলস্বরূপ তারা যোগ দেয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম পার্টিতে। এই পার্টি ১৯৯১ সালে গোলাম আযম কে তাদের দলের 'আমীর' নির্বাচন করে। সেই গোলাম আযম, যে কিনা স্বাধীনতা বিরোধী এবং আলবদর ও রাজাকার বাহিনীর স্রষ্টা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তাকে

নির্বাসনে পাঠানো হয় পাকিস্তানে। কিন্তু জিয়াউর রহমান সরকার তাকে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসার অনুমতি দেয় এবং ১৯৯৪ সালে তার নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ একটি সক্রিয় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি হওয়ার ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও, ২০০৪ সালের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল চালু না হওয়া পর্যন্ত গোলাম আযম এর জামায়াতে ইসলামী দল, আওয়ামীলীগ ও বিএনপি'র সাথে জোটবদ্ধতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা উপভোগ করে।

অর্থাৎ ১৯৭৫ এর পর এই সব অতি বিপ্লবীদের আসল চেহারা উন্মোচিত হতে থাকে। এক সময় যারা ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, তারা সমাজতন্ত্রের চাদর ছেড়ে রাতারাতি হয়ে ওঠে একনায়কতন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িকতার ধারক ও বাহক। এই সময়কে আমরা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার পুনর্জাগরণ কাল হিসেবে চিহ্নিত করব। কারণ এর মধ্যেই ঘটেছে স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনঃপ্রবর্তন, উগ্র-মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিস্তার। বদরুদ্দীন উমর এর মতে –

"এই সুযোগে অনেক প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি দল ও উপদল বামপন্থী মুখোশ পরে জনগণের চিন্তাকে সামগ্রিকভাবে অগণতান্ত্রিক পথে চালনা করার চক্রান্তে সূক্ষ্মভাবে নিযুক্ত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক আওয়াজ তুলে তারা জনগণকে ভারত-বিরোধী (অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে ভারত সরকার বিরোধী হলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জনবিরোধী) 'সংগ্রামে'র দিকে পরিচালনা করতে 'উদ্বুদ্ধ করছে।...এসব কথার অর্থ এই নয় যে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে পর্যালোচনার সময় ভারতের কোনো সমালোচনা করলেই সেটা সাম্প্রদায়িক হয়ে দাঁড়াবে। তা কখনো হতে পারে না। এখানে শুধু এ কথাটাই একটি গণতান্ত্রিক দায়িত্ব হিশেবে স্মরণ রাখতে হবে যে, ভারতবিরোধী প্রচারণা অতি সহজেই সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় পরিণতি লাভ করতে পারে এবং সেটা হলে তার রাজনৈতিক ফলাফল অগণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের হাতকে জোরদার করতে বাধ্য।"[৮]

সাম্প্রদায়িক আওয়াজ তুলে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণকে ভারত-বিরোধী করে তোলার এই চক্রান্ত যে সফল হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইদানিংকালে সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমগুলিতে। সেখানে দুই দেশের জনগণের মধ্যে ক্রিকেট খেলা সহ নানান বিষয়কে কেন্দ্র করে যে ধরনের বাদানুবাদ লক্ষ্য করা যায় তা মোটেও ইতিবাচক নয়। ভারত-বাংলাদেশের সম্প্রীতির সম্পর্ককে নষ্ট করা হয়েছে ধাপে ধাপে এবং এই প্রক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িকতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক।

এই সবকিছুর ফলে সাম্প্রদায়িকতার যে বাড়বাড়ন্ত তা আমরা লক্ষ্য করব ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত হওয়া অষ্টম জাতীয় নির্বাচনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাক্রমে। সে সময় সংখ্যালঘুদের উপর নেমে আসা নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আসলে উগ্র মৌলবাদের চরমতম বহিঃপ্রকাশ। ২০০১ এর নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

ক্ষমতা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনে যে ব্যাপক রদবদল ঘটে তাতে জনসাধারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। "অভিযোগ রয়েছে নিজেদের পছন্দের বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে রেখে নির্বাচনের সময় সুবিধা আদায়ের জন্য এই কাজ করেছিল বিএনপি সরকার। নির্বাচনের পরে নতুন আরেক পরিস্থিতি তৈরি হয়। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে হিন্দুদের উপর হামলা, বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এবং লুটপাটের অভিযোগ আসতে থাকে। এসব ঘটনার সাথে বিএনপি'র কর্মী-সমর্থকরা জড়িত বলে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। তখনো বিএনপি ক্ষমতা গ্রহণ করেনি তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিদায়কাল।"[৯]

নির্বাচন শেষে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপি'র জোট ক্ষমতায় আসার পরেও এই নির্যাতন অব্যাহত ছিল। সহিংসতা বেশিরভাগই ঘটেছে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশ যেখানে বৃহৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। বাগেরহাট, বরিশাল, ভোলা, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, গাজীপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, নাটোর, নারায়ণগঞ্জ প্রায় কোন জেলাই বাদ যায়নি। এই সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন এর নির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এমনকি পরবর্তীকালে ওই ঘটনাগুলির যে বিচারবিভাগীয় তদন্ত হয়েছে তাও আশাপ্রদ নয়। উইকিপিডিয়ার তথ্য বলছে- "১৬ই নভেম্বর ২০০১ সালে ভোলা জেলার চড়ফ্যাসন উপজেলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সদস্যদের দ্বারা প্রায় ২০০ হিন্দু নারী গণধর্ষণের শিকার হন। সবচেয়ে ছোটটির বয়স ছিল ৪ বছর এবং সবচেয়ে বড় টির বয়স ৭০ বছর।"[১০]

এমন ঘটনার ২৩ বছর পর আজ ২০২৪ সালে দাঁড়িয়েও কিন্তু পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। আজও রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী সরকারের পতন এবং নতুন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের মাঝে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সমানে নির্যাতিত হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা তখনও যেমন ছিল এখনো তেমনি রয়ে গেছে।

এ পর্যন্ত হওয়া আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় বর্তমানে যেমন ম্যান মেড বন্যা দেখা যায় তেমনি বাংলাদেশের এই সাম্প্রদায়িকতা আসলে ম্যান মেড সাম্প্রদায়িকতা। মানুষ যেহেতু এই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টিকর্তা তাই মানুষকেই এর সমাধান করতে হবে। প্রশ্নটা হচ্ছে কোন মানুষ এর সমাধান করবে?

একথা বলাই বাহুল্য যে বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল এই কাজ করবে না। তাই তাদের কাছে কোন রকম আশা না রাখাই ভালো। এই দুটি দলকে বাদ দিলে বাংলাদেশে পড়ে থাকে আরও দুটি শ্রেণী। একটি শ্রেণী রাজনৈতিক দল বহির্ভূত নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী সমাজ। আরেকটা শ্রেণী হল বাংলাদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। ইতিহাস বলছে রাজাকার গোলাম আযম এর বিচার করার জন্য গণআদালত বসিয়েছিলেন রাজনৈতিক দল বহির্ভূত বুদ্ধিজীবী জাহানারা ইমাম। এবং সেই গণআদালতে যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। এই

দুই শ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বুদ্ধিজীবী সমাজের কথা আমরা বলছি তাদের অবশ্যই রাজনৈতিক মোহমুক্ত বুদ্ধিজীবী হতে হবে, যারা আসলেই বাংলাদেশের কল্যাণ চান। তা না হলে শাসকের পরিবর্তন হবে ঠিকই কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার কোন পরিবর্তন হবে না। একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের সেই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, তার গৌরবময় ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত অতীতেও হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে। এই চক্রান্ত যদি সফল হয় তাহলে কিন্তু কোন আশা নেই।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, দাঙ্গার ইতিহাস, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ২০

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০

৩. ছফা, আহমেদ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, 'বিকল্প উন্নয়ন কৌশল', নির্বাচিত প্রবন্ধ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃষ্ঠা ৪০৩

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রোমোহন, জুলাই ২০১৩, রাজনীতির অভিধান, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩১

৫. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, জানুয়ারি ২০২২, 'ভবিষ্যতের বাংলা', দ্বিজাতি তত্ত্বের সত্য-মিথ্যা, ঢাকা, বিদ্যাপ্রকাশ, পৃষ্ঠা ১১৫-১১৬

৬. আনিসুজ্জামান, জানুয়ারি ২০১২, 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশ', ইহজাতিকতা ও অন্যান্য, কলকাতা, কারিগর, পৃষ্ঠা ২২৪

৭. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, জানুয়ারি ২০২২, 'ভবিষ্যতের বাংলা', দ্বিজাতি তত্ত্বের সত্য-মিথ্যা, ঢাকা বিদ্যাপ্রকাশ, পৃষ্ঠা ১১৮

৮. উমর, বদরউদ্দীন, ১৯৮৯, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন, পৃষ্ঠা. ১০

আর্কাইভ্যাল ও বৈদ্যুতিক তথ্য

৯.

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A6%E0%A7%A7-%E0%A6%8F_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0

%A6%A4%E0%A7%80_%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%BE
(অনুসন্ধান – ০৭. ০৪. ২০২৪, সময় ১০ : ৫০)
২০০১ – এ বাংলাদেশে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা

১০.
https://www.bbc.com/bengali/articles/clkjw8k1773o.amp#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17205414138120&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
(অনুসন্ধান – ০৯. ০৪. ২০২৪, সময় ০৯: ০১)
BBC NEWS বাংলা
১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত পাঁচটি নির্বাচন যেভাবে হয়েছিল

রবীন্দ্র ছোটগল্পে নৌকা : একটি সমীক্ষা

সুপ্তি ভট্টাচার্য
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ : মানব সভ্যতার উন্মেষলগ্ন থেকেই নৌকা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আবার নৌকা মানব সভ্যতার উন্নতির জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ পশুকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু তার আসীম চাহিদা সেই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বর্তমান অতি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতায় নিয়ে এসেছে। তার ফলে মানব সভ্যতাও আজকের এই উন্নত সভ্যতায় পৌঁছে গেছে। সাহিত্য যেহেতু মানব সভ্যতার বাইরে নয়, তাই এই পশুতে টানা গাড়ি থেকে বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় রূপান্তর সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্র ছোটগল্পেও তাই নৌকা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কখনো কখনো এই নৌকা ছোটগল্পের একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নৌকাকে কেবলমাত্র গল্পের ঘটনায় ব্যবহার করেননি, কখনো কখনো নৌকা তাঁর গল্পের নিয়ন্ত্রক শক্তি রূপে পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি ছোটগল্পে বহুধরনের যানবাহন ব্যবহার করেছেন ঠিকই, তবে নৌকা তাঁর ছোটগল্পে এক অসাধারণ মাত্রা যোগ করেছে। নৌকা তাঁর ছোটগল্পে ঘটনার চালিকাশক্তি ও গল্পের পরিণতিতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই প্রবন্ধে নৌকা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে কিভাবে এসেছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
মূলশব্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছোটগল্প, যানবাহন, নৌকা, চিত্রকল্প।

মূল আলোচনা :

১২৯৭ বঙ্গাব্দের **১১**ইমাঘ (ইং ২৩ জানুয়ারি **১৮৯১**) রবীন্দ্রনাথ পতিসর ত্যাগ করে সাজাদপুর রওনা হন। পতিসর থেকে কালিগ্রাম হয়ে সাজাদপুরের দিকে বোটে করে যাওয়ার সময় ইন্দিরা দেবীকে চিঠিতে তাঁর এই যাত্রাপথের বিবরণ দিয়েছেন-

"ভোরের বেলা বোট ছেড়ে দিয়ে কাঁচি – কাঠায় গিয়ে পড়া গেল। কাঁচি কাঠা ব্যাপারটা হচ্ছে একটি বারো তেরো হাত সংকীর্ণ খালের মতো, ক্রমাগত এঁকেবেঁকে গেছে – সমস্ত বিলের জল তারই ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে নিস্ক্রান্ত হচ্ছে – এর মধ্যে আমাদের প্রকাণ্ড বোট নিয়ে বিষম বিপদ—জলের স্রোত বিদ্যুতের মতো বোটটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দাঁড়িরা লগি হাতে করে সামলাবার চেষ্টা করছে, পাছে ডাঙার উপর বোটটাকে আছড়ে ভেঙে ফেলে। ......এক একবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও বোটটা ডাঙায় ঠেকে মড়মড় শব্দে একেবারে কাত হবার উপক্রম করছে –এমনিতর 'গেল গেল' শব্দ

করতে করতে খোলা নদীতে এসে পড়লুম”।[১] নৌকা নিয়ে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ ছিন্নপত্রগুলির পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে।

জমিদারি কাজের জন্য শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর প্রভৃতি স্থানে রবীন্দ্রনাথ বোটে করে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দূর থেকে দেখেছেন নিকটস্থ পল্লিগ্রাম ও পল্লিগ্রামস্থ মানুষ। নৌকা থেকেই নিবিড়ভাবে লক্ষ করেছেন তাদের জীবনশৈলী। কবির এই পর্বের অনন্য সাহিত্যকীর্তি তাঁর ছোটগল্পগুলি। দৈনন্দিন জীবনচর্যায় নদীময় পূর্ববঙ্গে সাধারণত নৌকা, ডিঙি, বজরা প্রভৃতি জলযান খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। তার প্রভাব পড়েছে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে। জমিদার রবীন্দ্রনাথ নৌকায় চেপে জমিদারি পরিদর্শনের সময় লোকজীবনের নিত্যজীবনচর্যা প্রত্যক্ষ করেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গল্পগুলিতে নৌকার প্রভাব অনেক বেশি। এখানে নৌকা কেবলমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবেই নয়, কোথাও কোথাও চরিত্রগুলির নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে তীব্র ব্যঞ্জনাবাহী হয়ে উঠেছে। কোথাও এগুলি নিজেই চরিত্র হয়ে উঠেছে। কাহিনি নিয়ন্ত্রণে ও ঘটনাপ্রবাহ সংস্থানে নৌকা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উপমা হিসাবেও নৌকার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। গল্পগুচ্ছের মোটামুটি পনেরোটি গল্পে নৌকার বহুল ব্যবহার আছে।

প্রথমেই ‘ঘাটের কথা’ গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। গল্পটি ‘ভারতী’ পত্রিকায় **১২৯১** সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এখানে নদীর ধারে একটি পুরাতন ঘাটের কথা বর্ণিত হয়েছে ঘাটের মুখ দিয়ে। জোয়ারের জলে দোদুল্যমান নৌকাগুলির মাধ্যমে দুরন্ত যৌবন জোয়ারে দোদুল্যমান জীবনকে বুঝিয়েছেন। এই তুলনা গোটা গল্পের মূল ঘটনাটি ইঙ্গিতে পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছে। “জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙ্গার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে— দুরন্ত যৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে”।[২] এই গল্পে কিন্তু পদ্মার কথা নেই, আছে গঙ্গার কথা। শরতের কাঁচা সোনার মতো রঙের আভায় আভাসিত প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই চিত্রটির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে নৌকা। পালতোলা নৌকার সঙ্গে পাখির তুলনা করেছেন। রাজহাঁস যেমন জলের উপর ভেসে বেড়ায় নৌকাগুলিও তেমনি জলের উপর ভেসে চলেছে, শুধু আনন্দে পাখাদুটি আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে— “রাম রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখিরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে, ছোট ছোট নৌকাগুলি তেমনি ছোট ছোট পাল ফুলাইয়া সূর্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখি বলিয়া মনে হয় ; তাহারা রাজহাঁসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখাদুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে”।[২] অনেক জীবনের সাক্ষী পুরোনো বাঁধাঘাট অনেকের জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবই ঘটেছে এই ঘাটের সামনে তাই ঘাটটি মনে করে বলে দিতে পারে চক্রবর্তীদের বাড়ির খুতঁখুঁতে বৃদ্ধার মাতামহীর

খুব প্রিয় খেলা ছিল ঘৃতকুমারীর পাতাকে নৌকা করে গঙ্গার জলে ভাসানো। “আমার দক্ষিণবাহুর কাছে একটা পাকের মতো ছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত,”[৩] ঘৃতকুমারীর নৌকাটিকে কেন্দ্র করে শিশুমনের যে খেলাধূলা বর্ণিত হয়েছে এগুলি চিরন্তন শিশুমনের প্রতীক। তাই এই বালিকাটি তার বৃদ্ধা অবস্থায় যখন অন্য বালিকাদের দুরন্তপনায় তীব্র শাসন করতেন এবং ভদ্রোচিত আচরণ করার শিক্ষা দিতেন তখন ঘাটটি ঘৃতকুমারীর নৌকার কথা মনে করে মুচকি হেসে নিত। ঘাটের উপর যে মনুষ্যধর্ম আরোপ করেছেন তাকে পূর্ণতা দিয়েছে নৌকাটি।

‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে পোস্টমাস্টার রতনের কথা রাখতে পারেননি। রতন পোস্টমাস্টারের সঙ্গে চলে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি রতনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। এরপর পোস্টমাস্টার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এগিয়ে চললেন। “ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।”[৪] গল্পে নৌকাটি এক অমোঘ শক্তিরূপে উদভাসিত হয়েছে। এখানে নৌকা ছাড়া অন্য কোন যান যথাযোগ্য ছিল না। স্থান কাল পরিবেশ সব দিক থেকে নৌকাটি হয়ে উঠেছে গল্পের নিয়ন্ত্রক শক্তি। পোস্টমাস্টার নৌকায় চেপে বসলেন, নৌকা ছেড়ে দিল। ঠিক তখনই হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। মনে পড়তে লাগল রতনের করুণ মুখ, একবার মনে হল “ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি”[৫] তখনই নৌকার পালে বাতাস পেয়েছে, নদীতীরে শ্মশান দেখা দিয়েছে। বিষয়টিকে চিত্রবৎ কল্পনা করলে দেখতে পাই নৌকাটি যেন নিজে অগ্রণী হয়ে ঘটনাটি ঘটিয়েছে। যতক্ষণ পোস্টমাস্টারের হৃদয় রতনের জন্য কাতর হয় নি তখনো পর্যন্ত নৌকার কোন দ্রুততা ছিল না বরং সাধারণ কাজের মতো এই নৌকা অভ্যাসজনিত কাজ করছিল। কিন্তু নৌকা অদৃশ্য বিধির রূপধারণ করেছে পোস্টমাস্টারের হৃদয়ের দুর্বলতার সুযোগে। নৌকার দ্রুতগতিতে আসার ফলে নদীতীরে শ্মশান দেখা দেওয়া যেন পাঠককে জানিয়ে দিচ্ছে পোস্টমাস্টার ও রতনের সম্পর্কের অবসানের।

‘দালিয়া’ ১২৯৮ সালের ‘সাধনা’ পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। চারিদিকের ঐতিহাসিক আবহে হিংস্রতা ও অস্ত্রের তীব্র ঝঞ্ঝনার মাঝে খুব সুন্দর করে বেড়ে ওঠা একটি প্রেমের গল্প হল ‘দালিয়া’। গল্পের প্রথমেই ধারাবিবরণীর মতো মোগল রাজপুত্রদের বিবাদ বর্ণিত হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের কাছে শাসুজা পরাজিত হয়ে আরাকানরাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। শাসুজার তিন সুন্দরী কন্যার সঙ্গে আরাকানরাজের রাজপুত্রদের বিবাহ দিতে চান। শাসুজা এতে অমত প্রকাশ করেন। তখন রাজ আদেশে ছলক্রমে শাসুজাকে নৌকাযোগে নদীমধ্যে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। তখন শাসুজার বড়কন্যা আত্মহত্যা করে মরে, মেজকন্যা জুলিখা কর্মচারী রহমত আলির সঙ্গে পালিয়ে যায়। ছোটকন্যা আমিনাকে শাসুজা নিজেই নদীতে ছুঁড়ে দেন।

আমাদের গল্পপিপাসু পাঠকের মনে সেই সাংঘাতিক বিপদের দিনে জীবনদাতা পিতার কাছে নবজীবন প্রাপ্তির বদলে মৃত্যু পাওয়ার ঘটনা আমাদের শিহরিত করে তোলে। নেপথ্যে থাকা টলোমলো নৌকার চিত্রটিও আমরা ভুলতে পারিনা।

'একটা আষাঢ়ে গল্প' গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়। গল্পটি রূপকধর্মী। রাজপুত্র, সদাগরপুত্র ও কোটালপুত্র তিনজনে দ্বাদশতরীতে চেপে ভ্রমণে বের হয়েছে। রাজপুত্র তার মা দুয়োরানীর দুঃখমোচন করতে চায়। নৌকাগুলির গতির সঙ্গে রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার তুলনা করা হয়েছে। "সমুদ্রে সদাগরের দ্বাদশতরী প্রস্তুত ছিল, তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল, নৌকাগুলা রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।"[৬] এরপর রূপকথার গল্পের মতোই শঙ্খদ্বীপে এক নৌকা শঙ্খ বোঝাই করা হয়েছে। শুধু তাই নয় চন্দন দ্বীপে এক নৌকা চন্দন, প্রবালদ্বীপে এক নৌকা প্রবাল বোঝাই হয়েছে। এরপর আরো চারবৎসর পর্যন্ত গজদন্ত, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জায়ফলে বাকি চারটি নৌকা পূর্ণ হয়ে উঠল। নৌকাগুলি যেন জীবনের প্রতীক। জীবন যেমন ধীরে ধীরে নানা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তেমনি নৌকাগুলি দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চলমান সুস্থ জীবনে যেমন হঠাৎ ঝড় আসে, তেমনি নৌকাগুলি ঝড়ের মুখে পড়েছে। সব ভরা নৌকা ডুবে গেছে, কেবলমাত্র একটি নৌকা তিন বন্ধুকে একটা দ্বীপে আছড়ে ফেলে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। ফিরে আসার রাস্তাও নেই। তবে এখানেই শেষ হয়ে যায় নি, রাজকুমার অনেক বিপত্তি পার হয়ে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সঙ্গে রাজকন্যাও লাভ করেছেন। সমুদ্রপারের দুঃখিনী দুয়োরাণী পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করেছেন সোনার তরীতে চড়ে। গোটা গল্পের সর্বত্রই তরীর কথা বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। এই গল্পে তরীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। রাজপুত্রের মা দুয়োরানী স্বামীর কাছে তার যোগ্য সম্মান পাননি, বহু কষ্টে বড় করে তোলা রাজপুত্র যখন সমুদ্র পার হয়ে ব্যবসা করতে যান তখনও তার কাছ দিনগুলি মোটেই সুখকর ছিল না। আজ সেই দুঃখিনী মায়ের আদরের ধন রাজ্য ও রাজকন্যা নিয়ে ফিরে আসছেন, এর চেয়ে সোনায় বাঁধানো ক্ষণ আর হতে পারে না। মূল্যের নিরিখে সোনা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাই যেন দ্বাদশ তরী থেকে সোনার তরীতে উত্তরণ দুয়োরানীর জীবনের চরম প্রাপ্তিকে সূচিত করেছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, গল্পগুলিতে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রবাসীদের ঘরে ফেরার ছবি সুনিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। 'স্বর্ণমৃগ' গল্পেও এই চিত্র আছে। "চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা লাগিতে লাগিল।"[৭] খুব নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় নৌকাটি যেন প্রবাসীদের ঘরে ফেরার চিত্রটি সম্পূর্ণ করেছে। বৈদ্যনাথ শিল্পীস্বভাবের মানুষ। বড় ছেলে অবিনাশ বাবার কাছে পুজোর উপহার হিসেবে একটা নৌকা চেয়েছে। সে তো অন্য খেলনা চাইতে পারত কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে শিশুদের খেলনা বলতে অধিকাংশ সময় নৌকার ব্যবহার করা হয়েছে। সুদূরের ডাকে সাড়া দেওয়ার সঙ্গী যেন এই নৌকা। আর "বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড

কাটিয়া, কুন্দিয়া, জোড়া দিয়া, দুইখানি খেলনার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া পাল আঁটিয়া দিলেন, লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন; একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না"।[৮] বৈদ্যনাথের তৈরি খেলনার নৌকা শিশুদের মনোহরণ করতে সক্ষম কিন্তু স্ত্রী মোক্ষদার কাছে এর কোনো গুরুত্ব নেই, তার আছে কেবল স্বর্ণতৃষা। তাই পিতার দেওয়া খেলনা দুটি মোক্ষদা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, খেলনা নৌকাদুটি যেন বৈদ্যনাথের সহজ সরল হৃদয়ের সমধর্মী। যেখানে খেলনার নৌকার মতো কোনো কার্পণ্য নেই।

ছোটগল্পগুলি লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। নদীময় বাংলাদেশে নৌকা স্বাভাবিক জলযান। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার পরিবেশ, প্রকৃতি বর্ণনার সময় নৌকা সম্পর্কিত জিনিসপত্রের বহুল ব্যবহার আছে। নৌকা তৈরি করার জন্য উপাদান, বা নৌকার কোন অংশের নাম সমাজে খুব সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। 'ছুটি' গল্পের প্রথমেই ফটিক নদীর ধারে শালকাঠটি দেখে গড়িয়ে নিয়ে দূরে ফেলতে চায় এতে কাঠটির মালিক বিরক্ত হবে, এই ছিল খেলার বিষয়। এই কাঠটি নৌকার মাস্তুল তৈরি করার জন্য রাখা ছিল। ছোটভাই মাখনের সঙ্গে মারামারি হওয়ার পর ফটিক গোটাকতক কাশ ছিঁড়ে নিয়ে একটা আধডোবা নৌকার গলুইয়ের উপর বসে কাশের গোঁড়া চিবিয়েছে। ফটিকের মাথায় একরাশ চিন্তা, বাড়ি ফিরে গেলে মায়ের বকুনি আর অন্যদিকে নিজের দুর্জয় অভিমান একরকম পরিস্থিতিতে একটি বিদেশী নৌকা ঘাটে এসে লাগল। ফটিকের নিস্তরঙ্গ জীবনে ধীরে ধীরে একটি পাপগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কাহিনি সূত্র এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে নৌকাটি। নৌকা থেকে বের হয় একটি আধবয়সী ভদ্রলোক। তিনি ফটিককে চক্রবর্তীদের বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু ভদ্রলোকটি ফটিকের কাছে কোনো সদুত্তর পেলেন না। পরে আমরা জানতে পারি এই ভদ্রলোকটি ফটিকের মামা। ফটিক তার মামার বাড়ি এল পড়তে। ফটিকের বাড়ির নদীকেন্দ্রিকতা এখানে নেই। সত্যি কথা বলতে কি এখানে কোথাও জল নেই। এখানকার কোনো কিছুই ফটিককে টিকতে দেয়নি। ছোটো থেকে যে বিষয়গুলি ফটিকের অন্তরাত্মার সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছে শহরের কঠিন ইষ্টকময় পরিবেশে তার অবকাশ নেই। ফটিকের মন সেই নৌকা, সে নদী, গ্রামের সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য মন কেমন কেমন করেছে। ফটিকের অন্তিমসময়ে তার চাহিদার যেন পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। গ্রামের পরিবেশ থেকে শেষবারের মতো আসার সময় শোনা স্টীমারের জল মাপার সুর সে আকণ্ঠ পান করেছে। স্টীমারের খালাসীদের মতো সুর করে বলেছে –"এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে-এ-এনা।"[৮]এখানে কোনো জলযানের প্রত্যক্ষ উত্থাপন করা হয় নি তবে খালাসিদের জলযাত্রার সুরটি আমাদের সুদূর অনন্তলোকে নিয়ে গেছে। বৈতরণীর উপর অনন্ত যাত্রা আমাদের নিয়ে অনন্তলোকে।

'সমাপ্তি' গল্পে অপূর্বকৃষ্ণের সঙ্গে মৃণ্ময়ীর প্রথম সাক্ষাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে নৌকা। আধুনিক যুবক অপূর্ব ছুটিতে কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে আসার সময় নৌকা থেকেই নেমেই নদীতীরের পিচ্ছিল কাদায় পড়ে যায়। অপূর্বর এই অসতর্ক মুহূর্তে মৃণ্ময়ী অট্টহাস্য করে হেসে ফেলে। অপূর্ব লজ্জিত হয়। মৃণ্ময়ীর হাসি অপূর্বের অন্তর্লোকে তার পৌরুষকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে। মৃণ্ময়ীর কাছে এই অপমান মেনে নিতে পারে না। এইভাব থেকেই অপূর্বর মৃণ্ময়ীর প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়। মৃণ্ময়ী প্রথমদিকে মেনে নিতে পারে নি তার বিবাহিত জীবন। কিন্তু অপূর্ব তীব্র ঔদার্যবলে মৃণ্ময়ীর মনের উপর অধিকার কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে তীব্র সহায়ক হয়েছে জলযানগুলি। মৃণ্ময়ী তার শ্বশুরবাড়িতে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ইচ্ছা জানায় কিন্তু তা সহজেই নাকচ হয়ে যায়। এরপর সে পালিয়ে যায় রাত্রিবেলা। গ্রামের মাঝি বনমালি এই চঞ্চল মেয়েটিকে চিনত তাই তাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবে এই মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে নৌকায় চাপিয়ে নিয়ে আসে। নৌকার দুলুনিতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। পরে জাগ্রত অবস্থায় নিজেকে শ্বশুরবাড়ির খাটে দেখতে পায়। এরপর মৃণ্ময়ী কি ঘরের বন্দী জীবনে আটকে যাবে তা হয় না, তাকে মুক্তি দেয় অপূর্ব সবাই যখন মৃণ্ময়ীকে বুঝতে পারে তখন মৃণ্ময়ি অন্তর্লোকে অপূর্বর আগমন নৌকায় চেপে। গল্পের পরের কাহিনি টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে নৌকাযাত্রা অপরিহার্য ছিল। অপূর্ব এই সুযোগে মৃণ্ময়ীর অনেক কাছাকাছি চলে আসে তারা দুজনেই কাওকে না জানিয়ে চলে যায় মৃণ্ময়ীর বাবার কাছে -"অপূর্ব চুপিচুপি কহিল "তবে এসো, আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।"[৯] মৃণ্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য গ্রামের রাস্তায় প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সঙ্গে স্বামীর হাত ধরে যাত্রা করেছে। এরপর নৌকায় চেপে তারা মৃণ্ময়ীর বাবার কাছে পৌঁছেছে। অপূর্ব ও মৃণ্ময়ীর সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধনের ক্ষেত্রে এই নৌকাযাত্রার গুরুত্ব অপরিসীম।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে দুবার নৌকার ঘটনা এসেছে। প্রথম সপ্তম পরিচ্ছেদে গিরিবালার বিবাহে অনিমন্ত্রিত শশিভূষণ নৌকা করে কলকাতা ফিরে যাচ্ছিলেন। নৌকা থেকেই শশিভূষণ দেখতে পায় মহাজনের নৌকা ও স্টিমারের মধ্যে রেশারেশি। এরপর হঠাৎ ইংরেজ ম্যনেজারসাহেব দ্রুতগতিসম্পন্ন দেশী পালতোলা নৌকার গতি মেনে নিতে না পেরে বন্দুকের গুলিতে মহাজনী নৌকার পাল ফাটিয়ে দেয়। পূর্ণবেগ প্রাপ্ত নৌকাটি ডুবে যায়। নৌকাবোঝাই পাটসমেত নৌকার মধ্যে মশলা কুটতে বসা ব্যক্তিটি মারা যায়। বাকিরা অবশ্য প্রাণে বেঁচে যায়। শশিভূষণ নৌকা নিয়ে গিয়ে সবাইকে উদ্ধার করে আনেন। নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, স্টিমারটি যেন মদগর্বিত ইংরেজ রাজশক্তির প্রতীক, যে কিনা আমাদের দেশী পালতোলা নৌকার এগিয়ে যাওয়া পছন্দ করে না। যাই হোক, গল্পের দিক থেকে এই ঘটনা শশিভূষণের মনোজগতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। এই পরিচ্ছেদেই গিরিবালার বিদায় দৃশ্য দেখতে পাই। শশিভূষণ গ্রামে ফিরে আসার দিনই নৌকা সাজিয়ে গিরিবালাকে

শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কেউ শশিভূষণকে ঘাটে ডাকে নি তবুও শশিভূষণ ঘাটে উপস্থিত হলেন। "নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মতো একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে।"[১০]নৌকায় করে কন্যা বিদায় বাংলাদেশে স্বাভাবিক ঘটনা, তবে গল্পের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। শশিভূষণের জীবনের চরম পরিণতির জন্য গিরিবালার বিদায় চরম দরকারি। এরপরেই গ্রামের সঙ্গে শশিভূষণের কোন মায়ার সম্পর্ক ছিল না। গিরিবালার নৌকায় করে বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শশিভূষণের গ্রাম থেকে বিদায়ের ঘন্টা বেজে ওঠে। অষ্টম পরিচ্ছেদে শশিভূষণ আবার একবার কলকাতা যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছেন। এবারও নৌকায়, তিনি রেলপথ ব্যবহার করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা পরিহার করলেন। এরই মাঝে বৃষ্টি যখন আর থামে না। তখন একটি প্রশস্ত মোহনার মতো স্থানে নৌকা লাগিয়ে আহারের উদ্যোগ করতে লাগলেন। ঠিক তখনই ঘটনাটি ঘটে গেল। দুই নদীর মোহনার মুখে বাঁশ বেঁধে জেলেরা প্রকাণ্ড জাল পেতেছে। কেবল একদিক দিয়ে নৌকা চলাচলের স্থান রেখেছিল। সুপারিন্টেন্ডেন্টের বোট আসতে দেখে তারা সাবধান করে দেয়, কিন্তু ইংরেজ সাহেবের মাঝি সেই অনুরোধ না মেনে জালের উপর দিয়ে বোট চালিয়ে দেয়। জালে বোটের হাল আটকে যায়। সেই হাল ছাড়িয়ে নিতে কিছুটা সময় ব্যয় হয়, এই অপরাধে ইংরেজ সাহেব জেলেদের সাত-আটশ টাকার জাল কেটে দেন। সঙ্গে আদেশ দেন যে চারজন জেলে এই জাল দিয়েছে তাদের ধরে আনতে। তাদের না পাওয়া গেলে সামনে নিরপরাধ যাদের পাওয়া গেল তাদের উপর নির্যাতন শুরু হয়। এরপর শশিভূষণের আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিছুটা উঁচু স্থান থেকে বোটের উপর ঝাঁপ দিয়ে সাহেবটিকে মারতে শুরু করে। বিচারে শশিভূষণ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নৌকো যেন গোটা কাহিনি ও শশিভূষণের চরিত্রের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নৌকাকে কেন্দ্র করে গোটা ঘটনাকে সাজানো হয়েছে।

'আপদ' গল্পে শরৎ ও কিরণময়ীর জীবনে নীলকান্তর আগমন ঘটেছে নৌকাডুবিকে কেন্দ্র করে। নীলকান্ত সিংহ বাবুদের বাড়িতে যাত্রা করার জন্য আহূত হয়েছিল কিন্তু পথে নৌকাডুবি হয়ে তার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে ভালো সাঁতার জানত তাই প্রাণে বেঁচে যায়। গল্পটির গোঁড়াতেই নৌকাডুবির কথা আছে। আবার নীলকান্ত ও সতীশের বিবাদের সময় সতীশ নীলকান্তর দোয়াতদানটি চুরি করে। এই দোয়াতদানের দুই পাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াত বসানো। হয়তো এটি মামুলি খেলনা, কিন্তু নৌকার ধরনের তাই বুঝতে আসুবিধা হয় না যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঝোঁক নৌকার দিকে ছিলই। শিশুর খেলা বলতে কাগজের নৌকা, বা নৌকা জাতীয় খেলনা তার খুবই প্রিয় ছিল। তবে এক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাঁর ছোটগল্প বা উপন্যাস নয় কবিতাতেও শিশুর খেলনা মানে নৌকা।

'দিদি' গল্পে নীলমণির দিদি শশী ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিজের দাম্পত্য সম্পর্ক এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করে দিয়েছে। এখানে নৌকার কথা একবার এসেছে। 'অতিথি' গল্পে কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু নৌকা করে সপরিবারে স্বদেশে যাচ্ছিলেন। তখনই তারাপদর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এখানে নৌকা যেন তারাপদর সমগোত্র, নৌকা যেমন ঘাটে ঘাটে গিয়ে পৌঁছে দেয় যাত্রী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কোনো ঘাটে স্থিতি করলে শ্যাওলা পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নৌকার পক্ষে স্বাভাবিক তেমনি তারাপদরও কোনো ঘাটে স্থিতি করা সম্ভব নয়। বিধাতা তাকে এভাবেই তৈরি করেছেন। এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে ভেসে বেড়ানোই তার পক্ষে খুব স্বাভাবিক।

'দুরাশা' গল্পে বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী নূরউন্নীসা সৈন্যাধিকারী ব্রাহ্মণ কেশরলালের ব্রাহ্মণোচিত আচারধর্মকে স্বধর্ম বলে বিশ্বাস করেছিল। কেশরলাল যুদ্ধক্ষেত্রে সাংঘাতিক আহত হলে সৈনিকের প্রাণ বাঁচাতে নূরউন্নিসা তার মুখে জল দেন। মুসলিম হয়ে ব্রাহ্মণের ধর্ম নষ্ট করেছে এই অপরাধে কেশরলাল খেয়ানৌকায় চেপে চলে যায়। গল্পে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে "সেখানে একটি খেয়ানৌকা বাঁধা ছিল। পার হইবার লোকও ছিল না,নৌকা দেখিতে দেখিতে মধ্যস্রোতে গিয়া ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া গেল"।[১১] গোটা গল্পের শেষপর্যন্ত নবাবপুত্রীর মনশ্চক্ষে স্পষ্টভাবে গাঁথা ছিল জীর্ণ নৌকার চিত্র। এই জীর্ণনৌকায় চেপে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন কেশরলাল। এই চিত্রটির মোহ আটত্রিশ বছর ধরে নবাবপুত্রীকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। গল্পের শেষে কেশরলালের বাস্তব জীবনের চিত্রের পাশে উত্থিত হয়েছে ধর্মরক্ষার জন্য জীর্ণনৌকায় করে ভেসে যাওয়ার দৃশ্যটি।

'অধ্যাপক' গল্পটি উত্তমপুরুষের জবানীতে ব্যক্ত হয়েছে। গল্পের কথক প্রতিবেশিনীকে কৌশলে দেখার জন্য ছোট একটি নৌকা ভাড়া করেছে। এখানে নদী অবশ্য পদ্মা নয়, গঙ্গা। কথক নিজেই বলেছেন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সম্পর্কে জানার জন্য একটি নৌকা ভাড়া করেছে ।"পরদিন মধ্যাহ্নে একখানি ছোটো নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম, মাল্লাদিগকে দাঁড় টানিতে নিষেধ করিলাম।"[১২] অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে চুরি করে তথ্য সংগ্রহ করা কোন সভ্য সমাজে শোভন নয়, একথা তিনিও জানেন ।নৌকার মাঝিদের কাছেও তাই ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। উজানে দাঁড় টেনে ফিরে আসার শব্দে নায়কসহ নায়িকা ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন। নৌকার ঘটনাটি নায়কের অন্তর্লোকের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছোটগল্পে কেবলমাত্র কাহিনির উপাদানরূপে গ্রহন করেননি। নৌকা নিয়ে প্রবাদের ব্যবহারও করেছেন। 'রাজটীকা' গল্পে নবেন্দু ইংরেজ তোষামোদকারী কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা ইংরেজবিদ্বেষী। একদিকে নবেন্দু সাহেবের তোষামোদ করে রায়বাহাদুর উপাধি পেতে চায়, অন্যদিকে শ্যালীরাও

অপরিত্যাজা। এরকম পরিস্থিতিতে নবেন্দু শ্যালীদের কাছে নানারকম মিথ্যা কথা বলতেন। বড়সাহেবের কাছে গেলে বলতেন সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছেন। মেজসাহেবের কাছে গেলে বলতেন, মেজমামার কাছে চললাম। নবেন্দুর এই পরিস্থিতি আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য লেখক বাংলা প্রবাদ 'দু নৌকোয় পা'এর সাহায্য নিয়েছেন। "সাহেব এবং শ্যালী এই দুই নৌকায় পা দিয়া হতভাগা বিষম সংকটে পড়িল।"[১৩] শেষ পর্যন্ত শ্যালীরা তার সাহেব নৌকায় ফুটো করে দিয়েছিল।

"মণিহারা' গল্পটি বোটেই শুরু হয়েছে। "সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধা ঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল।"[১৪] প্রথমেই যে জীর্ণপ্রায় বাঁধা ঘাটটি সেই বলে নির্দেশিত হয়েছে। আসলে ঘাটটি পূর্বপরিচিত। এই বোটের উপর থেকে অস্তায়মান সূর্যের বিবরণ দিয়েছেন। এইরকম আলো আঁধারি পরিবেশে কোলরীজ সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের মতো ইস্কুলমাস্টার মহাশয় মণিমালিকার কাহিনি শুনিয়েছেন। গল্পের কাহিনি থেকে জানতে পারি মণিমালিকা আর্থিকভাবে বিপন্ন স্বামীর হাত থেকে নিজের অলংকারগুলিকে বাঁচানোর জন্য স্বামীর অজান্তে মধুসূদনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে নৌকায় করে। দুঃসম্পর্কের ভাই মধুসূদন মণিমালিকাকে তার স্বামীর হাত থেকে গহনাগুলি রক্ষার জন্য এই পরামর্শ দিয়েছিল। মধুসূদনের পরামর্শমতো "আষাঢ় শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘন মেঘাচ্ছন্ন প্রত্যুষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল । মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।' মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।"[১৫] এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। নৌকাটি খুলে দেওয়ার পর নদীর খরস্রোতে হু হু করে ভেসে গেছে। এরপর মণিমালিকার সঙ্গে কী হয়েছে তা জানা যায় না বোটের সঙ্গে সঙ্গে তার বিদায়, আবার একদিন সন্ধ্যার আলোতে বোটের উপর আবার মণিমালিকার গল্পের অবতারণা করা হয়েছে। গোটা গল্পে নৌকা বা বোটের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গল্পটিতে নাটকীয় মুহূর্ত আনার জন্য বিশেষ সাহায্য করেছে নৌকাটি। এখানে অন্য কোন যান যথাযোগ্য ছিল না।

'দুর্বুদ্ধি' গল্পে ডাক্তারবাবুর আপাত বৈষয়িক দুর্বুদ্ধির অন্তরালে মানবিক সুবুদ্ধি বলীয়ান হয়ে উঠেছে। সবকিছুর ঊর্দ্ধে ডাক্তারি সত্তা নয় পিতৃহৃদয়ই বড় হয়ে উঠেছে। কন্যা শশীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর কন্যা সমস্ত পিতৃহৃদয়ের জ্বালা হাহাকার তিনি অনুভব করতে পেরেছেন। প্রথমে তিনি ছিলেন জমিদার দারোগাবাবুর তোষামোদকারী কিন্তু পরে তার মানবসত্তা প্রকাশ পেয়েছে। তাই যখন জমিদার বাড়ি থেকে ডাক পাঠিয়ে পানসি পাঠানো হয় তখন তিনি দেখেন "নৌকোয় উঠিবার সময় দেখি, থানায় ঘাটে ডোঙা বাঁধা, একজন চাষা কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে।"[১৬] কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানতে পারেন গতরাত্রে সর্পদংশনে তার মেয়েটি মারা গিয়েছে থানায় রিপোর্ট করবার জন্য হতভাগ্য তার মৃতদেহটিকে দূরগ্রাম থেকে বহন করে এনেছে।

এতে ডাক্তারবাবু দুঃখ পেলেও জমিদার কাছারির মাঝির কাছে এসবের কোন গুরুত্ব নেই। গোটা গল্পের প্রেক্ষিতে মানুষ ডাক্তারবাবুর যে গুরুত্ব ফুটে উঠেছে তার নেপথ্যে আছে নৌকা।

'শুভদৃষ্টি' গল্পে কান্তিচন্দ্র দুচারজন শিকারি বন্ধুবান্ধব নিয়ে আঘ্রাণের মাঝামাঝি নৈদিঘির বিলের ধারে শিকার করতে গিয়েছিল। এইসময় নদীতে দুটো বড়ো বোটে তারা বাস করছিল। এই বোটে বসে বন্দুকের চোঙা পরিষ্কার করার সময় বোবা কালা মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়। এই বোটেই নরেন বাড়ুজ্যে তাঁর কন্যা সুধার সঙ্গে কান্তিচন্দ্রের বিয়ের ঠিক করেন। গল্পের পটভূমি হল বোট।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রায় প্রতিটি গল্পেই কোন না কোন ভাবে যানবাহনের প্রসঙ্গ এসেছে ।'শাস্তি' গল্পে চন্দরার দেহের গঠন বর্ণনার ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে 'একখানি নূতন তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই।"[১৭] নৌকার এই রকম আলংকারিক ব্যবহার প্রতিটি গল্পগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে ।পরিশেষে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে চরিত্র চিত্রণে, পরিবেশ সৃষ্টিতে, ঘটনার পরিণতিতে নৌকার এমন অনন্য ব্যবহার আমাদেরকে মুগ্ধ করে।

তথ্যসূত্র :

১. ছিন্নপত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্রসংখ্যা ১৯
২. ঘাটের কথা, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ১
৩. তদেব, পৃ: ২
৪. পোস্টমাস্টার, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ২১
৫. একটি আষাঢে গল্প, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ৮২
৬. স্বর্ণমৃগ, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ১০০
৭. তদেব, পৃ: ১০১
৮. ছুটি, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ১২৮
৯. সমাপ্তি, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ১৮২
১০. মেঘ ও রৌদ্র, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ২১৭
১১. দুরাশা, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ৩২৫
১২. অধ্যাপক, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ৩৪৪
১৩. রাজটীকা, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ৩৫৫
১৪. মণিহারা, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ৩৬২
১৫. তদেব, পৃ: ৩৬৭
১৬. দুর্বুদ্ধি, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ৩৯৭
১৭. শাস্তি, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ১৬৮

সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের আলোকে উপরূপকরূপে রবীন্দ্রনৃত্যনাটিকা চিত্রাঙ্গদা

অরিজিৎ গুপ্ত
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ

সারাংশ : সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে দুই সহস্রাব্দেরও বেশি সময় জুড়ে। নাট্যবিশ্লেষণের দুটি দিক- প্রথমতঃ রচনাকৌশল, যা নাট্যকারের প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার সূচক এবং দ্বিতীয়তঃ অভিনয়, যা নটনটীদের কৃতিত্বসাপেক্ষ। প্লটরচনা, চরিত্র চিত্রণ ও রসনিষ্পত্তি- এই তিনটির মানদণ্ডে নাট্যবিচার করা হয়েছে অধিকাংশ সাহিত্যশাস্ত্রকারদের মতে। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে- প্লট অর্থাৎ ইতিবৃত্তই রূপক অথবা উপরূপকের শরীর অর্থাৎ মূল-

"শরীরং নাটকাদীনামিতিবৃত্তং প্রচক্ষতে।"[1]

যে কোন কাহিনীর মুখ্যফল অর্থাৎ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল কয়েকটি ক্রমোন্নত পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি। সুতরাং কাহিনীর পর্ব, চরিত্রগুলির প্রচেষ্টার পর্যায় ও ক্রমিক অগ্রগতির মধ্যবিন্দুগুলির নির্ণয়- যে কোন ইতিবৃত্ত গঠনের আবশ্যক প্রস্তাব।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য এমন একটি উপরূপক, যেখানে মহাভারতের অতি পরিচিত চরিত্রকেন্দ্রিক কিছু ঘটনা ও বিষয় নৃত্যগীতিময়তায় আবর্তিত হয়েছে বিশ্বকবিপ্রতিভাবলে। সনাতনী সাহিত্যশাস্ত্র অনুসারে যে কোন দৃশ্যকাব্যের যে বিধিসম্মত গঠনশৈলী- যার মধ্যে পঞ্চ সন্ধি, পঞ্চ অবস্থা ও পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি তথা অর্থোপক্ষেপক একাদিক্রমে সবিশদ চর্চিত হয়েছে। যেইগুলির যথাযথ সুপ্রয়োগের দ্বারাই আদর্শ একটি নাটিকা রূপলাভ করে, যেমন সংস্কৃত সাহিত্যে কবি শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী'কে অধিকাংশ নাট্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থে উদাহৃত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনৃত্যনাটিকা চিত্রাঙ্গদায় নায়ক ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। নায়িকা মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা, যিনি আজীবন পুরুষের অধ্যেয় বিদ্যা অধ্যয়ন করে পুরুষের মত জীবনযাপন করে এসে, অকস্মাৎ ই অর্জুনের আবির্ভাবে নিজের প্রচ্ছন্ন নারীত্বকে অনুভব করেন। 'রমণীর মন-ভোলাবার ছলাকলা' সম্পর্কে অনভিজ্ঞতায় অর্জুন কর্তৃক সরাসরি প্রত্যাখ্যাতা চিত্রাঙ্গদার মদনের আশীর্বাদে এক বৎসরের জন্য পুষ্পলাবণ্যময় স্বর্গীয় রূপলাভ, মোহমুগ্ধ অর্জুনের সঙ্গে সাময়িক মিলনের আনন্দ উপভোগ এবং একটি

[1] শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন, *বেদব্যাস প্রণীত অগ্নিপুরাণ- ৩৩৯/১৭*, কোলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৭৬

সময়ের পর অর্জুনের মোহমুক্তি ও রূপশ্রান্তি, পুনরায় মদনের কাছ থেকে ধার করা রূপলাবণ্য তাঁকেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে অবশেষে প্রকৃত মণিপুরদুহিতা চিত্রাঙ্গদার স্বপরিচয়ে এবং সসন্মানে পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে চিরমিলন- এই ঘটনাই বিশ্বকবির অনন্যসাধারণ মৌলিকতার দ্বারা সাক্ষরিত হয়ে লীলায়িত হয়েছে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাটিকায়। 'চিত্রাঙ্গদা'র সঙ্গীত ও সংলাপরূপ গীতিময় আবহে গঠনশৈলীমূলক সন্ধি, অবস্থা, অর্থপ্রকৃতি প্রভৃতি কতখানি সার্থকভাবে প্রযুক্ত ও দর্শিত হয়েছে, যাতে করে নির্দ্বিধায় চিত্রাঙ্গদাকে একটি উপরূপকের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যায় – বর্তমান গবেষণাপত্রে এই বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস করা হবে।

সূচকশব্দ : চিত্রাঙ্গদা, নায়িকা, ধীরললিত, পঞ্চসন্ধি, নাট্য, অর্থপ্রকৃতি, অবস্থা, অর্জুন, উপরূপক

• দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে কাব্যের দ্বৈবিধ্য স্বীকৃত। রূপক বা উপরূপক অনুকরণাত্মক, যেহেতু নট নটীরা চতুর্বিধ অভিনয়কে আশ্রয় করে অভিনীয়মান চরিত্রগুলির অনুকরণ করে, তাই নট-নটীর উপর নায়ক-নায়িকার রূপের আরোপ হয়। দৃশ্যকাব্যের অপর নাম তাই রূপক।

'তদ্রূপারোপাত্তু রূপকম্।'[2]

রূপকের সাথে উপরূপকের বিষয়গত বা রূপগত পার্থক্য বিশেষ না থাকার জন্য রূপকের মতই উপরূপকের ঘটনা বিন্যাস বা পরিণতির জন্য যে কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়েছে, তার মধ্যে সন্ধি, অর্থপ্রকৃতি, অবস্থা, অর্থোপক্ষেপক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপরূপকের বিশিষ্টতা এই যে, উপরূপকগুলিতে মূলতঃ নায়ক ধীরললিত অর্থাৎ ললিতকলার চর্চায় পারদর্শী একজন মানুষ, আর নায়িকা নৃত্য-নিপুণা কলাবতী। তাই উপরূপকে নৃত্যগীতময় আবহের মধ্যেই দৃশ্যকাব্যের বিষয়গুলিকে উপন্যস্ত রূপে দেখা যায়। একটু লক্ষ্য করলে নাটিকা বা ত্রোটকের মত উপরূপকগুলিতে চরিত্র রস বিষয়বস্তু প্রভৃতি দিক থেকে অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র অনুসারে, অধিকাংশ সাহিত্যশাস্ত্রকারেরা দৃশ্যকাব্যের নির্মাণে ইতিবৃত্তের পাঁচটি ভাগকে পঞ্চসন্ধি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই পাঁচটি সন্ধি হোল- মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও নির্বহণ। মূল ঘটনার সাথে অবান্তর ঘটনাগুলির সম্পর্কই একেকটি সন্ধি বলে কল্পিত হয়েছে-

"অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিঃ একান্বয়ে সতি।"[3]

---

[2] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ-৬/১,* কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮ পৃঃ ২৩৯

উপরূপকের মূল ফলসিদ্ধি বা পরিণতিলাভের জন্য যে মুখ্য ও অবান্তর হেতুগুলি কার্যকরী হয়, সেইগুলিকে বলা হয় অর্থপ্রকৃতি। অর্থাৎ অর্থপ্রকৃতি হল প্রয়োজনসিদ্ধির হেতুসমূহ। আর ফললাভের অভিলাষী ব্যক্তি অর্থাৎ মুখ্য নায়ক-নায়িকার প্রারব্ধ কার্য র অবস্থা হলো পঞ্চ কার্যাবস্থা। পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি হল- বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য। পঞ্চ অবস্থা হল- আরম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম।
এই পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি ও পাঁচটি অবস্থার মিলনস্থলে পাঁচটি সন্ধি কল্পিত হয়েছে-

যথাসাংখ্যমবস্থাভিরাভিযোগাত্তু পঞ্চভিঃ।
পঞ্চধৈবেতিবৃত্তস্য ভাগাঃ স্যুঃ পঞ্চসন্ধয়ঃ।।[4]

এর মধ্যে পতাকা বা প্রকরী নামক দুটি অর্থপ্রকৃতি কখনো কখনো থাকে না, এরা না থাকলেও সেখানে দুটি সন্ধির সৃষ্টি হতে পারে।

- রবীন্দ্রনৃত্যনাটিকা চিত্রাঙ্গদা অবশ্যই একটি অভিনেয় উপরূপক, নৃত্য গীত ও সংলাপময় আবহের মধ্য দিয়ে মহাভারতের পরিচিত চরিত্রকেন্দ্রিক ঘটনাগুলি আবর্তিত হয়েছে। নায়ক যদিও অর্জুন, কিন্তু গীতিময় ভাবে চরিত্রটি পরিবেশিত হয়েছে, নায়কসুলভ গাম্ভীর্য বা কাঠিন্যের আড়ালে লালিত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। নায়িকা এখানে যদিও চিত্রাঙ্গদা একজনই, তাও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা কে দ্বিতীয়া বলে চিত্রিত করা হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে উপরূপক নাটিকার মত দুইজন নায়িকার অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রথমা চিত্রাঙ্গদা অভিজাতকুলজা মণিপুরনৃপদুহিতা, মানবতী এবং প্রগলভা, দ্বিতীয়া চিত্রাঙ্গদা মায়াময়ী, মোহকরী এবং নারীসুলভ ছলাকলায় পারদর্শী। নৃত্যনাটিকার প্রথম দিকে চিত্রাঙ্গদার রূপ কিছুটা বুঝতে পারলেও শেষ দৃশ্যে আমরা তাঁর স্বরূপ অনুধাবন করতে পারি আরও স্পষ্ট ভাবে। সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের মানদণ্ডে যেমন আমরা সংস্কৃত কোন দৃশ্যকাব্যের মূল্যায়ন করে থাকি, তেমনই রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যগুলিও অভিনেয় হিসেবে উপরূপকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, যদিও এই ধরণের গবেষণা এ যাবত খুব বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয়নি, 'চিত্রাঙ্গদা'র সঙ্গীত ও সংলাপরূপ গীতিময় আবহে গঠনশৈলীমূলক সন্ধি, অবস্থা, অর্থপ্রকৃতি প্রভৃতি কতখানি সার্থকভাবে প্রযুক্ত ও দর্শিত হয়েছে, যাতে করে নির্দ্বিধায় চিত্রাঙ্গদাকে একটি উপরূপকের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যায় – বর্তমান গবেষণাপত্রে এই বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস করা হবে।
- **বীজ + আরম্ভ = মুখ সন্ধিঃ**

---

[3] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ-৬/১,* কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, পৃঃ ২৬৪

[4] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ-৬/৭৪,* কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮ পৃঃ ২৬৪

বীজ হলো ফলসিদ্ধির আদি কারণ। আরম্ভ হোল সেই জায়গা যেখানে নাট্যপরিণতির জন্য ব্যগ্রতা বা উৎসুকতা দেখা যায়।

অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যদ্বিসর্পতি।
ফলস্য প্রথমো হেতুর্বীজং তদভিধীয়তে।।
ভবেদারম্ভ ঔৎসুক্যং যন্মুখ্যফলসিদ্ধয়ে।।[5]

নৃত্যনাটিকা চিত্রাঙ্গদায় অর্জুনসন্দর্শনে মৃগয়াবিহারী চিত্রাঙ্গদার অনভ্যস্ত নারীত্বের আকস্মিক উন্মেষে শিকারে অনীহা দেখা দিল। সঙ্গের সখীরা বারংবার মৃগয়ায় যেতে প্রণোদিত করল, কিন্তু রাজকন্যার তখন "জীবনে এল বিতৃষ্ণা, আপনার পরে ধিক্কার।"[6] সেখানে তাঁর আত্মউদ্দীপনার গানে খুঁজে পাওয়া যায়, অর্জুনের আবির্ভাবে নারীত্বের নব-আবরণে শূন্য হৃদয়া চিত্রাঙ্গদার মানসিক অভিব্যক্তি। এখানেই অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মিলনরূপ পরিণতির আদি কারণ হিসেবে নৃত্যনাট্যের বীজ উপ্ত-

"আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে।
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।।"[7]

কিম্বা চিত্রাঙ্গদার অন্যতম প্রধান একটি গানে-

"সুন্দর হে, সুন্দর হে বরমাল্যখানি তুমি আন বহে।
অবগুণ্ঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে।"[8]

এখানে বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার অন্তঃকরণের রমণীসত্তার মধ্যে প্রেমাস্পদের সাথে একত্রিত হওয়ার উৎসুকতা ব্যক্ত। তাই এখানে 'আরম্ভ' নামক অবস্থা। 'বীজ' অর্থপ্রকৃতি আর 'আরম্ভ' অবস্থার সমন্বয়ে এখানে মুখসন্ধির ব্যাপ্তি। মুখসন্ধির লক্ষণ-

যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।
প্রারম্ভেন সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্তিতম্।। [9]

- **বিন্দু+প্রযত্ন = প্রতিমুখসন্ধিঃ**

অবান্তর কথার দ্বারা অর্থবিচ্ছেদ হলে যা প্রধান বস্তুর অবিচ্ছেদের সূচক তাই হল বিন্দু নামক অর্থপ্রকৃতি। নাটকীয় ফলপ্রাপ্তিতে অতিদ্রুতগতিতায় সক্রিয়তাই হলো প্রযত্ন নামক অর্থপ্রকৃতি।–

---

[5] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ ৬/৬৫,* কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, পৃঃ ২৬১

[6] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ১৩

[7] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ১৪

[8] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ১৫

[9] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ- ৬/৭৬,* কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, পৃঃ ২৬৫

অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্।
প্রযত্নস্তু ফলাবাপ্তৌ ব্যাপারোऽতিত্বরান্বিতঃ।

অর্জুনের সাথে বন্য অনুচরদের নৃত্য একটি অবান্তর ব্যাপার। প্রণয়ের নব অঙ্কুরণ নিয়ে চিত্রাঙ্গদার প্রস্থানের পরমুহূর্তেই অর্জুনের নৃত্য একটি কথাচ্ছেদের কারণ, কারণ তাতে মূল ঘটনাপ্রবাহ যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে। এই দৃশ্য শেষ হলেই সখীসহ চিত্রাঙ্গদাকে স্নানে আসতে দেখা যায়। স্নানের শেষে সখীদের উদ্দেশ্যে চিত্রাঙ্গদা বলছে তাঁকে নতুন করে নতুন রূপে নারীত্বের সাজে সাজিয়ে দিতে-

"শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক পল্লব-আবরণে।"[10]

এই উক্তিটি প্রধান কাহিনীর সাথে অর্থাৎ অর্জুন চিত্রাঙ্গদার মিলনের ক্ষেত্রে আবার সূত্রের কাজ করল। এর মধ্যে একই সাথে প্রেমাস্পদের জন্য নায়িকার মানসিক সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ধ্যানাসনে উপবিষ্ট অর্জুনকে চিত্রাঙ্গদার প্রেম নিবেদন দৃশ্যে মন ভোলাবার ছলাকলা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ চিত্রাঙ্গদাকে প্রত্যাখ্যান-অংশে বিন্দু নামক অর্থপ্রকৃতি। প্রতিমুখ সন্ধির মতই এখানে-

' ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ লক্ষ্যালক্ষ্য ইব উদ্ভেদঃ'-[11]

প্রত্যাখ্যাতা বিরহবিধুরা চিত্রাঙ্গদার একটি বিখ্যাত গান 'রোদন ভরা এ বসন্ত'-তে অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার পূর্ণ মিলনরূপ ফল তাঁর সানুরাগ অভিপ্রায়ে কিছুটা প্রকাশিত হচ্ছে, আবার সখীদের দ্বারা চিত্রাঙ্গদাকে তাঁর নিজস্ব বীরাঙ্গনা সত্তার স্মরণ   যাতে আকস্মিক নারীত্বের উন্মেষে অর্জুন দ্বারা প্রত্যাখ্যানের গ্লানি কিছুটা ম্লান হয় যেমন চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে। মূল পরিণতির ঘটনা এখানে কিছুটা প্রকট আর কিছুটা প্রচ্ছন্ন থাকছে-

"হায়, হায় নারীরে করেছি ব্যর্থ
দীর্ঘকাল জীবনে আমার।
ধিক্ ধনুঃশর, ধিক্ বাহুবল।
মুহূর্তের অশ্রুবন্যাবেগে
ভাসায়ে দিল যে মোর পৌরুষসাধনা।
অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে বসন্তেরে করিল ব্যাকুল।।[12]

আবার, সখীদের উক্তিতে-

"মৃগয়া করিতে বাহির হল যে বনে
মৃগী হয়ে শেষে এল কি অবলা বালা। "

---

[10] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ১৭

[11] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ-৬/৭৭,* কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, পৃঃ ২৬৫

[12] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ১৮

অথবা,

"যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে
কার পায়ে আনে হার মানিবার ডালা।"[13]

এরপর মদনের কাছে চিত্রাঙ্গদার পূজানিবেদন, মদনের আবির্ভাব তথা চিত্রাঙ্গদাকে এক বৎসরের জন্য স্বর্গতুল্য অমূল্য পুষ্পলাবণ্যময় রূপ প্রদান- এই সবকিছুই অর্জুনকে লাভ করবার উদ্দেশ্যে চিত্রিত ঘটনা। তাই এই সর্বত্রই 'প্রযত্ন' নামক অবস্থাই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

- **পতাকা+প্রাপ্ত্যাশা= গর্ভসন্ধিঃ**

প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত- মদন চরিত্র আর চিত্রাঙ্গদার সখীবৃন্দ কেন্দ্রীয় চরিত্র না হয়েও গুরুত্বের অংশীদার এবং সমানভাবে নৃত্যনাট্যের শেষ অংশ পর্যন্ত নিজের প্রয়োজনীয়তা বজায় রেখেছে। অতএব মদন এবং সখীরা পতাকা চরিত্র। শেষদৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার স্বমর্যাদায় স্বরূপে অর্জুনের সাথে স্থায়ী মিলনে সখীরা সক্রিয় সহযোগিতায় পতাকা। পতাকা লক্ষণ হলো-

ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভিধীয়তে।[14]

এরপর আসে গর্ভসন্ধির প্রসঙ্গ। দৃষ্ট-নষ্ট নাট্যবীজের পুনরায় অন্বেষণ ই গর্ভসন্ধির সত্তা-

ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।
গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ।।[15]

এক বৎসরের জন্য মায়া লাবণ্যময়ী সুবর্ণকিরণরঞ্জিত ছায়াময়ী চিত্রাঙ্গদাকে দেখে রমণীমুগ্ধ অর্জুন তাঁকে অকাতরে সম্ভাষণ জানান—

"এস এস, যে হও সে হও,
বল বল তুমি স্বপন নও।
অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা
বহে সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা।"[16]

কিন্তু কাংক্ষিত প্রেমাস্পদকে ছলনার আশ্রয়ে লাভ করেও নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদার মন থেকে দূর হয় না সংশয় আর দ্বিধা-

"লজ্জা, লজ্জা হায় এ কি লজ্জা

---

[13] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ১৯

[14] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ-৬/৬৮,* কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮ পৃঃ ২৬২

[15] বিমলাকান্ত *মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ-৬/৭৮,* কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮ , পৃঃ ২৬৫

[16] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ২৫

মিথ্যা রূপ মোর মিথ্যা সজ্জা।
এ যে মিছে স্বপ্নের স্বর্গ
এ যে শুধু ক্ষণিকের অর্ঘ্য
এই কি তোমার উপহার
ধিক্ ধিক্ ধিক্।।“[17]

চিত্রাঙ্গদার প্রণয়পাশে রূপমুগ্ধতায় ব্রহ্মচর্য বন্ধন ছিন্ন হয় অর্জুনের। তাঁর দুঃসাহসী আহ্বানে সাড়া দিলেও চিত্রাঙ্গদা যেন অনিশ্চয়তার দোলাচলে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে পারে না। নিজের অচিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সে অবহিত -

“কিন্তু মনে রেখো......
যারে তুমি করিছ কামনা
সে এমনি শিশিরের কণা
নিমিষের সোহাগিনী।।“[18]

মিলনের ফুলমালা যা এখন দুইজনের গলায় দোদুল্যমান, মোহভঙ্গের পর প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হলে নির্দিষ্ট সময়ের পরে ধূলিতলে পড়ে অবহেলিত হবে- এই আশঙ্কায় চিন্তিত চিত্রাঙ্গদা। তাই বারবার অর্জুনের মুগ্ধতাময় সম্ভাষণের উত্তরে তিনি বলছেন-

“যাও যাও ফিরে যাও বীর।
শৌর্য বীর্য মহত্ব তোমার
দিও না মিথ্যার পায়ে।
যাও যাও ফিরে যাও।“[19]

মিথ্যা মরীচিকার রূপভারে ক্লান্ত চিত্রাঙ্গদা মদনের কাছে নিজের মুহ্যমানতা আর ক্লান্তি নিবেদন করে, যেখানে মদনের পুনরাবির্ভাব হয় আর তিনি আশ্বস্ত করেন- এই যে আনন্দবিহ্বল ভাবে কেটে যাওয়া একটি বছর কিছু না কিছু জীবন শিক্ষা বা ছন্দোময়তা রেখে যাবে। কারণ ফলোদয় হলে তবেই তো ফুলের সার্থকতা। এরপর মদনকর্তৃক আশ্বস্ত নূতনা চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের নির্বিঘ্ন মিলন রচনা করেছেন কবিগুরু অপূর্ব গীতিময়তায় একটি অবিস্মরণীয় গানের মধ্যে দিয়ে।

“কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথ এসে মিশে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে, নয়নে নয়নে।।“[20]

---

[17] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ২৬

[18] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ২৬

[19] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ২৮

[20] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ৩০

এখানে চিত্রাঙ্গদার আকস্মিক রূপক্লান্তিতে মদনের কাছে নিবেদন যেন মূল পরিণতির দিকে যেতে যেতে নাটিকার গতিকে থমকে দেয়। আবার মদনের আশ্বাসে দুজনের একত্রিত মিলন ও ভ্রমণ- গর্ভসন্ধিকে স্পষ্ট করেছে। মদন এখানে পতাকা বৃত্তান্ত।
নৃত্যনাট্যের দর্শকদের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের মিলনের সার্থকতা সম্পর্কে সংশয় বাধা ও তারপর আবার তাদের একত্রে মঞ্চে দেখা- এই হোল প্রাপ্ত্যাশা- উপায় ও অপায়ের শঙ্কা।

এইখানে যে প্রাপ্ত্যাশা নামক অবস্থা, সেটিও যথেষ্ট স্পষ্ট বোধগম্য হয়-

উপায়াপায়াশংকাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তিসম্ভবঃ। [21]

অবসন্ন অর্জুন যখন চিত্রাঙ্গদার রূপে বিতৃষ্ণ, ঠিক তখনই গ্রামবাসীদের আবির্ভাব ঘটে। হঠাৎ এদের প্রবেশের পিছনে রবীন্দ্রনাথের দুটি উদ্দেশ্য কাজ করছে। মিথ্যা লাবণ্যময়ী চিত্রাঙ্গদার থেকে প্রকৃত রূপের বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জুনের আগ্রহ জন্মানো। আবার মণিপুরের রাজকন্যার আচমকাই রাজধানী থেকে অদৃশ্য হওয়া এবং প্রজাদের কাছে প্রচার করা যে তিনি তীর্থক্ষেত্রে গেছেন। এই দৃশ্য দিয়ে যেমন চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের দুটি দিক উন্মোচিত-

"তীর্থে গেছেন কোথা তিনি
গোপনব্রতধারিণী
চিত্রাঙ্গদা
স্নেহবলে তুমি মাতা, বাহুবলে তুমি রাজা।"[22]

পূর্বাপর ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করাও এর উদ্দেশ্য। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে একেই বলা হয়েছে অর্থোপক্ষেপক।

অঙ্কেষ্বদর্শনীয়া যা বক্তব্যৈব চ সম্মতা।
যা চ স্যাদ্বর্ষপর্যন্তং কথা দিনদ্বিয়াদিজা।
অন্যা চ বিস্তরা সূচ্যা সার্থোপেক্ষকৈর্বুধৈঃ।। [23]

নৃত্যনাট্যের অভিনীয়মান বিষয়বস্তুর মধ্যে দেখানো যায় না অথচ মূল ঘটনাপরম্পরায় যে বর্ণনা বা ঘটনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে; অথবা দীর্ঘদিন ধরে ঘটা কোন ঘটনাবলীকে অর্থোপক্ষেপকের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এখানে 'জনপদবাসী বৃত্তান্ত' সেই ঘটনাযোগসূত্রস্থাপনকারী অর্থোপক্ষেপক হয়ে উঠেছে।

---

[21] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ*- ৬/৭২, কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, পৃঃ ২৬৪

[22] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ৩২

[23] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ*-৬/৫১, কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, পৃঃ ২৫৭

- **প্রকরী+নিয়তাপ্তি =বিমর্শ সন্ধিঃ**

নৃত্যনাটিকার সীমিত একটি অংশেই গ্রামবাসীদের সাথে অর্জুনের বাক্যালাপের চিত্রণ হয়েছে, তাই গ্রামবাসীবৃত্তান্ত প্রকরীচরিত্রের উদাহরণ- -

প্রাসঙ্গিকং প্রদেশস্থং চরিতং প্রকরী মতা। [24]

প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত কোন একটি অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ হলে তাকে প্রকরী বলে। গ্রামবাসীদের থেকে চিত্রাঙ্গদার অমিতশক্তি ও স্নেহময়তা একাধারে অরূপ রূপের পরিচয় পেয়ে অর্জুন যখন তাকেই আবার আকাঙ্ক্ষা করেন তখন দর্শকরা বুঝতে পারেন যে, এবারে সত্যিকারের চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের প্রেমের পরিণতি নিশ্চিত। কারণ যে অর্জুন রূপমোহে বীরাঙ্গনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেইই আজ রূপক্লান্ত হয়ে বীর্যবতীকে ক্ষত্রিয়বাহুর ভীষণশোভা বলে আখ্যায়িত করে তাঁকে প্রার্থনা করেছে, ভোগের আবেশ থেকে যুদ্ধস্রোতে ঝাঁপ দিতে তিনি তখন বদ্ধপরিকর। চিত্রাঙ্গদা নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে এতদিনের এত কিছু ছলনা, মিথ্যা, যার জন্য মিথ্যা রূপের ভার বয়ে বেড়ান সেই অর্জুন আজ প্রকৃত বীরাঙ্গনাকে কামনা করছে দেখে 'মায়া অবগুণ্ঠন' ঘুচিয়ে দিতে সে-ও তখন সক্রিয় হয়। মদনকে আবার আহ্বান করে এই 'চুরির ধন' মিথ্যা রূপমহিমা ছলনাময় রূপ ফিরিয়ে দেয়। মদনও শুভকামনার সাথে তাঁকে আশীর্বাদ করে তাঁর প্রকৃত রূপ উন্মোচিত করেন। এখানে উভয়ের চিরস্থায়ী মিলন নিশ্চিত হয়- এখানে নিয়তাপ্তি নামক অবস্থা লক্ষিত-

অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তির্নিয়তাপ্তিস্তু নিশ্চিতা। [25]

বিঘ্নের অপসারণের দ্বারা ফলপ্রাপ্তি বা পরিণতিলাভ নিশ্চিত হলে সেখানে নিয়তাপ্তি নামক অবস্থা হয়। বিমর্শ সন্ধির ব্যাপ্তি এই অবধিই।

- **কার্য + ফলযোগ = নির্বহণ সন্ধি**

শেষদৃশ্যে বীরাঙ্গনার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে সাদরে সসম্ভ্রমে চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করেছেন। সঙ্গীত ও নৃত্যময় পরিবেশের মধ্যে তাদের বিবাহ বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে ফলাগম নামক অবস্থায় কার্য নামক অর্থপ্রকৃতির সাথে নির্বহণ সন্ধির ব্যাপ্তি-

অপেক্ষিতন্তু যৎ সাধ্যমারম্ভো যন্নিবন্ধনঃ।
সমাপনন্তু যৎসিদ্ধ্যৈ তৎকার্যমিতি সম্মতম্।।[26]

---

[24] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ*-৬/৬৮, কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, পৃঃ ২৬২

[25]বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ*-৬/৭২, কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, পৃঃ ২৬৪

[26] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ* -৬/৬৯, কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, পৃঃ ২৬৩

সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাদ্যঃ সমগ্রফলোদয়ঃ।। [27]

মূল্যায়ন

উপরের আলোচনা থেকে 'চিত্রাঙ্গদা'-র সমগ্র পরিসরে পঞ্চসন্ধির যথার্থ ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। "পুরুষের বিদ্যা" শিক্ষা করে মৃগয়াবিহারী ছদ্মবেশী চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুনের উপেক্ষা চিত্রাঙ্গদার মনে প্রথম নারীত্বের উন্মেষ হওয়া থেকে শুরু করে চিত্রাঙ্গদার প্রথম আত্মউদ্দীপনার গানের মধ্য দিয়ে প্রস্থান পর্যন্ত **মুখসন্ধি**।

সখীসহ চিত্রাঙ্গদার স্নানে আগমনের দৃশ্য থেকে শুরু করে মদনকর্তৃক চিত্রাঙ্গদার নবরূপদান ও দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে চিত্রাঙ্গদার নতুন রূপপ্রাপ্তি- এই পর্যন্ত **প্রতিমুখ সন্ধি**।

এরপর নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদার সাথে অর্জুনের সাক্ষাৎকার ও প্রণয়সম্ভাষণ থেকে শুরু করে তৃতীয়দৃশ্যের শেষ পর্যন্ত মায়ালাবণ্যময়ী চিত্রাঙ্গদার অর্জুনের প্রতি সাময়িক পরাঙ্মুখতা আর অর্জুনের প্রেমোন্মাদময় উচ্ছ্বাস পর্যন্ত **গর্ভসন্ধি**র বিস্তার।

চতুর্থদৃশ্যের শুরু থেকে মিথ্যারূপভারক্লান্তা চিত্রাঙ্গদাকে মদনের সুপরিণতিলাভের আশ্বাসপ্রদান থেকে শুরু করে পঞ্চমদৃশ্যের শেষে যেখানে চিত্রাঙ্গদার প্রার্থনায় মদন আবার পূর্বরূপে ফিরিয়ে দেয়- এই পর্যন্ত **বিমর্ষ সন্ধি**।

শেষ দৃশ্যে সখীদের দ্বারা সাদর সম্ভাষণে আহ্বান জানায় সখিরা। বীরাঙ্গনা রাজেন্দ্রনন্দিনী মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা "আপন শক্তির অভিমান ছিন্ন করে" অর্জুনের "দৃপ্ত ললাটে" "বীরের বরণমালা" পরিয়ে স্বরূপে অবতীর্ণ হলেন। সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত অর্জুন ও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। সঙ্গীত নৃত্যময় আবহে সখীদের উপস্থিতিতে তাঁদের বিবাহ বর্ণনা করেছেন কবিগুরু- এই পর্যন্ত **নির্বহণ সন্ধি**।

- এইভাবে দেখা যাচ্ছে, চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যতে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের শৈলীগত বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। 'চিত্রাঙ্গদা'র বিভিন্ন অংশগুলি লক্ষ্য করে আমরা নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত ও সংলাপরূপ গীতিময় আবহে গঠনশৈলীমূলক সন্ধি, অবস্থা, অর্থপ্রকৃতি প্রভৃতি সার্থকভাবে প্রযুক্ত ও দর্শিত হয়েছে- দেখতে পারলাম। এই ভিত্তিতে নির্দ্বিধায় "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা" যে একটি উপরূপকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে, সেই বিষয়ে আর সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

---

[27] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ*-৬/৭৩, কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, পৃঃ ২৬৪

আনসারউদ্দিনের 'গো-রাখালের কথকতা'য় গো-রক্ষকদের জীবনযাপন : একটি বিশ্লেষণী পাঠ

মহঃ গিয়াসউদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম

সারসংক্ষেপ : একবিংশ শতকের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম গ্রামবাংলার কথাকার আনসারউদ্দিন। ঔপন্যাসিকরূপে আত্মপ্রকাশ একবিংশ শতকের একের দশকে 'গো-রাখালের কথকতা' হাতে নিয়ে। আমাদের আলোচ্য এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন গ্রামের গোরক্ষকবৃত্তিকেন্দ্রিক জনজীবনের ছবি। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির কাছে এই জনজীবন প্রায় অস্তমিত। উপন্যাসে আমরা দেখতে পায় দরিদ্র পিতা-মাতার চিন্তাভাবনা সন্তানের লেখাপড়ার নিয়ে নয়, বরং 'পেটের ভাতের রাখাল' হওয়া নিয়ে। দরিদ্র অনাহারে আক্লিষ্ট গ্রাম্য এই মানুষজনদের কাছে গৃহস্থের গরুই হচ্ছে পেটের ভাতের একমাত্র অবলম্বন। বাল্যকালে গো-রাখাল হাকিমুদ্দিন ধীরে ধীরে শিখে ফেলে গো-জীবনের আদ্যপান্ত। সে ধীরে ধীরে রাখালগোষ্ঠীর উচ্চপদশ্রেণীর যোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু উচ্চপদলাভ করার আগেই আধুনিক প্রযুক্তি দানবীয় প্রকাশে তার সে স্বপ্ন ভেঙে যায়। ঔপন্যাসিক আনসারউদ্দিন এই উপন্যাসে রাখাল জীবনের এক করুণ বাস্তবতাকে পরম মমতায় নির্মাণ করলেন যা বাংলাসাহিত্যে ইতিপূর্বে এমনভাবে কেউ দেখাতে সক্ষম হননি।

সূচক শব্দ : গো-রাখাল, কথকতা, হাকিমুদ্দিন, পেটের-ভাতের রাখাল।

মূল আলোচনা :

একবিংশ শতকের নুতন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে কথাকার আনসারউদ্দিন এক অন্যতম নাম। অন্যভাবে বলতে গেলে, উনিশ শতক তথা উপন্যাসের সূচনা লগ্ন থেকে একবিংশ শতকের বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত ঔপন্যাসিক গ্রামসমাজের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন বা এখন পর্যন্ত ধরছেন তাঁদের থেকে ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক আনসারউদ্দিন (জন্ম: ১৯৫৯)। ব্যতিক্রমী হতে পেরেছেন গ্রামীণসমাজকে ভিন্ন চোখে দেখার কারণেই। তাঁর সমকালের কথাকারদের মধ্যে আছেন শচীন দাশ, নলিনী বেরা, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, অনিল ঘড়াই, আফসার আমেদ, শরদিন্দু সাহা, অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, সোহরাব হোসেন প্রমুখ কথাসাহিত্যিক। এঁদের মধ্যে সোহরাব হোসেন ছাড়া প্রায় সকলেই আনসারউদ্দিনের অনেক পুর্বেই লেখালেখির জগতে পদার্পণ করেন, পরিচিতি লাভ করেন। সে অর্থে একটু বেশি বয়সেই কলম ধরেছেন কথাকার আনসারউদ্দিন। তাঁর প্রথম গল্প 'আবাদ' প্রকাশিত হয় 'বনামি' পত্রিকায় ১৯৯১ সালে। প্রথম গল্পগ্রন্থ

'আনসারউদ্দিনের গল্প' ধ্রুবপদ প্রকাশনী থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় 'আনসারউদ্দিনের ছোটগল্প'। সুতরাং বিংশ শতকের শেষ দশকে তাঁর মাত্র দুটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলি হল 'আনসারউদ্দিনের গল্প' (২০০৩), 'শোক তাপের কথামালা' (২০১৪), 'গণিচাচার খেত খামার' (২০১৭), 'শিমুল তুলোর বালিশ' (২০২১), 'হারানো গন্ধের খোঁজে (২০২৪)। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'গো-রাখালের কথকতা' নন্দন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে ২০১৫ সালে অভিযান পাবকিশার্স থেকে পত্রিকার থেকে কিছুটা পরিমার্জিত হয়ে বের হয়। এরপর প্রকাশিত হল আরও তিনটি উপন্যাস 'মাটির মানুষ মাঠের মানুষ' (২০১৬), 'জনমুনিষ' (২০১৮) ও 'হেঁশেল জীবন' (২০২০)। কথাসাহিত্যিক আনসারউদ্দিন আদ্যোপান্ত গ্রামসমাজের কথাকার। নিজেও আদ্যোপান্ত একজন নিষ্ঠাবান কৃষক। গ্রামের মাটির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগের কারণেই তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী। এবিষয়ে তিনি নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছেন এইভাবে -

> 'গ্রামজীবনের নানান গল্পগাথা লিখতে লিখতে মনে হয়েছে, নিজে কৃষক না হলে গ্রামের একজন ভূমিপুত্র না হলে আমার পক্ষে কখনোই এমন গভীরভাবে গ্রামীণ মানুষের অন্তরাত্মা ছুঁয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। সম্ভব হত না অধুনালুপ্ত কিছু গৎ, ধুয়োগান জারিগানের অনুষঙ্গগুলোকে ধরে রাখার। সম্ভত হয়ত না মাঠের রাখালের জীবনেতিহাসের তত্ত্বতালাস করার।...'[১]

গ্রামীণ সমাজের ভূমিপুত্র না হলে ভাসাভাসা কিছু বিষয় জেনে কল্পনার ডানায় ভর করে কিছু মুখরোচক কাহিনি লেখা যেতে পারে কিন্তু তাতে যথার্থ অর্থে গ্রামসমাজের বাস্তবতা উঠে আসে না একথা প্রায় বেশিরভাগ গ্রামীণসমাজের কথাকাররা বিশ্বাস করেন, যেমন বিশ্বাস করতেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আব্দুল জব্বার, আবুল বাসার, অনিল ঘড়াই প্রমুখরা। কথাকার আনসারউদ্দিনও একটি সাক্ষাৎকারে[২] জানিয়েছেন, যে তিনিও চান চান খাঁটি গ্রামের কথা বলতে, নিম্নবিত্ত মানুষের কথা বলতে। তাঁর সমস্ত রচনাগুলিতেই একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য 'গো-রাখালের' কথকতা'ও তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলে কৃষিখেতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত থাকা গো-জাতির অনেক গুরুত্ব ছিল, সেই সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা ছিল গোরক্ষকদেরও। ধীরে ধীরে কৃষিকাজের গুরুত্ব কমে গেলে গোরক্ষকদেরও গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। সেজন্য সম্ভ্রান্তসূচক শব্দ 'গো-রক্ষক' পরিবর্তিত হয়ে যায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও হীনকর অর্থে 'রাখাল'। আবার অনেক ক্ষেত্রে শব্দটি গালিগালাজের নামান্তর। আধুনিক যান্ত্রসভ্যতার নিরন্তর দহনে তার অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্তির পথে। আনসারউদ্দিন একবিংশ শতকে বসে বিলুপ্ত হওয়া গোরক্ষকদের জীবনবৃত্তান্ত বৃহৎ প্রেক্ষাপটে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ করলেন এই উপন্যাসে।

ঔপন্যাসিক আনসারউদ্দিনের 'গো-রাখালের কথকতা' উপন্যাসটিতে দেখতে পায়, নাবাল অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জিলার জলঙ্গী নদী ও তার পার্শবর্তী অঞ্চলের মধ্যে মূলত সীমাবদ্ধ এবং ডাঙাল অঞ্চল জলঙ্গী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। উপন্যাসটিতে বিধৃত রয়েছে হত-দরিদ্র, অভাবী, খেটে-খাওয়া মেহেনতি মানুষ, গুটি কয়েক হাতে গোনা স্বচ্ছল হেরস্থ পরিবার। 'গো-রাখাল' তো হত-দরিদ্র ঘরের ছেলেরাই হয় না-খেতে পেয়ে যাদের শরীর হাড়-জিরজিরে, যাদের হত-দরিদ্র বাবারা অসামর্থ্য হয় স্ত্রী-পুত্রদের একবেলা পেটের ভাত জোগাড় করতে। আমরা উপন্যাসের কাহিনিতে দেখতে পায়, জলঙ্গী থেকে অনেক দূরে ডাঙাল দেশের কচ্ছোপের পিঠের মতো ভূভাগ তথা শালিগাঁয়ের হাকিমুদ্দিনকে নাবাল দেশের জলঙ্গীর তীরবর্তী টানাপুরে 'রাখালের' কাজে চলে আসতে। হাকিমুদ্দিন এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র, তার শৈশব কৈশোরে অতিক্রান্তকালে জীবনের স্বাভাবিক অভিমুখগুলি স্পর্শ করেছে, সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে গো-পালকের। প্রসঙ্গত শালিগাঁয়ের দরিদ্র হাকিমুদ্দিন চরিত্রটি তিনি নিজেকেই কল্পনা করে চিত্রায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য -

> '... আর এই যে হাকিমুদ্দিন আমাদের মূল চরিত্র যে শালিগাঁইয়ের বাড়ি শালিগাঁইয়ের খালি পেট ভুখা মানুষের হেঁট। অর্থাৎ আমাদের শালিগ্রামে প্রচণ্ড অভাব ছিল, অভাব আমাদেরও ছিল। তা সে খালি পেটও দেখেছি—মানুষের মাজা নুইয়ে যেত। এ কারণে হাকিমুদ্দিন নিজেকে ধরেই এগিয়েছি।'[৩]

উপন্যাসটিতে হাকিমুদ্দিন ছাড়াও গো-রক্ষক জীবনের ইতিবৃত্তে রয়েছে ফকির আলি, হিসাব আলি, ইস্তর ইত্যাদি চরিত্রগুলি। শালিগাঁয়ের দরিদ্র জনমজুর আবজেলের স্ত্রী ও তিনপুত্র- হাকিম, উকিল, মোক্তার এবং বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে তার দরিদ্র পরিবার। একা কায়িক পরিশ্রম করে পরিবারের মুখে দুবেলা খাবার পর্যন্ত তুলে দিতে পারে না। শুধু আবজেল নয় প্রায় সমস্ত 'জন মুনিষ'রাই অর্ধাহারে টিকে থাকে। অভাবমোচন করতে, ছেলেদের দুবেলা পেটের ভাতের জোগাড় করতেই ডাঙালির দরিদ্র খেতমজুরেরা ছেলেদের রাখালি করতে পাঠিয়ে দেয় গৃহস্থদের ঘরে। যেমন কাবাতুল্লা পুত্র ইস্তরকে বিছানায় প্রস্রাব করার বয়সেই ছাগল চড়ানোর কাজে পেঁচোখালিতে দিনু মোড়লের বাড়িতে রেখে আসে। আবজেলও সব দুধদাঁত স্খলনের আগেই হাকিমুদ্দিনকে শালিগাঁ থেকে দূরে জলঙ্গীর ধারে টানাপুরের বড় গৃহস্থ খানদার ফরাজির ঘরে পেট-ভাতের রাখালের কাজে পাঠিয়ে দেয়।

গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার একটি অন্যতম উপাদান গোরক্ষকগোষ্ঠী। ঔপন্যাসিক আনসারউদ্দিন আলোচ্য উপন্যাসটিতে কল্পনা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে গোরক্ষকজীবনের বৃত্তান্তটি বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। গৃহস্থের ঘর থেকে যাতে পালিয়ে আসতে না পারে তার জন্য পথের হদিশ গোপন করতে বালকদের চোখে বেঁধে দেওয়া হয়

কাপড়ের পটি। যেমন বাঁধা হয়েছিল ইস্তরের চোখে, হাকিমুদ্দিনের চোখে। হাকিমুদ্দিনের চোখে ফেটি বেঁধে আবজেল পৌছে গিয়েছিল টানাপুর গ্রামে। সেখানে সে রাখালের ফেরিওয়ালা হয়ে গৃহস্থের ঘরে ঘরে চিৎকার করে হাঁকতে থাকে—'রাখাল নিবা গো রাখাল, প্যাট ভাতের রাখাল।' শেষ পর্যন্ত নানা অনুনয় বিনয়ে খানদার ফরাজির ঘরে 'প্যাট-ভাতের' রাখাল হিসাবে হাকিমকে রেখে আসে। আবজেল বুভুক্ষু পুত্রকে সাবধান করেছে এই বলে -

> দেখিস বাপ, খবরদার ছুট-রাখাল হবিনে। ছুট-রাখাল হওয়া বড়ো দোষ। ছূট-রাখাল হলে কেউ তোকে বিশ্বাস করবে না। কেউ যেন না বলে ছালুন-চাখা রাখাল।

প্রসঙ্গত, 'ছুট-রাখাল' হল রাখালি অবস্থায় পালিয়ে যাওয়া রাখাল। ঔপন্যাসিক আনসারউদ্দিন 'গো-রাখালের কথকতা' উপন্যাসে গোরক্ষকগোষ্ঠীর অলিখিত বিভিন্ন শ্রমস্তরের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। যেমন-

'পেট-ভাতের রাখাল': গেরস্থের ঘরে দু-মুঠো খাবার আর পরনের কাপড়ের বিনিময়ে যে রাখালেরা গৃহস্থের গৃহস্থ কাজ করে তাদের বলা হয় 'পেট-ভাতের রাখাল'। উপন্যাসে হাকিম পেট-ভাতের রাখালরূপে নিযুক্ত হয় খানদার ফরাজির গৃহে। গৃহস্থের ঘরে রাখালের প্রথম যোগদানের পূর্বে রাখালদের ক্ষীর খাওয়ানোর প্রথা প্রচলিত ছিল টানাপুরে। হাকিমুদ্দিনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। নতুন রাখাল হাকিমুদ্দিনকে রাঙামাটি দিয়ে জট পাকানো মাথা পরিষ্কার করে নতুন গামছা ও লাল ডোরা পরিয়ে গোয়ালমুখী হয়ে বসানো হয়। কাটা গোঁফালি কোমরের ডোরার সাথে বেঁধে দেওয়া হয়। চোখে দেওয়া হয় কাজলরেখা, কপালে কাজলের টিপ। এরপর গেরস্থ খানদার ফরাজি তার মাথায় হাত দিয়ে দীর্ঘ ছড়া বলতে থাকে—

'রাখাল রাখাল গো-রাখাল সামনে গোহাল গোহাল গোরুর ঘর
সকালবেলা হুড়কো টানি তাজা গোরুর সয় না তর।
ছুটে বেড়ায় ঘাসের খোঁজে জাবর কাটায় দু-চোখে বুজে
চরতি গোরু ফিরতে বাড়ি সময় লাগে বিকেল পর।...'

প্রসঙ্গত এই ছড়াটি কোনো লৌকিক ছড়া নয় এটি ঔপন্যাসিকের নিজস্ব সৃষ্টি, তিনি নিজেই এই বিষয়ে বলেছেন -

> 'যে ছড়াগুলো আছে সেই ছড়াগুলো কিন্তু অধিকাংশই আমি নিজেই তৈরি করেছি। 'রাখাল রাখাল গো-রাখাল' এরকম একটা ছড়া আছে— ওই ছড়াটা বরণ করে নেওয়ার যে ছড়া। ওগুলো লেখা হয়েছে।'[৪]

তবে রচনাগুণে ছড়াগুলো লৌকিক হয়ে উঠেছে। যাইহোক ছড়ার নির্দেশ বুঝতে না পেরে ফরাজির নির্দেশে হাকিম আস্তে করে কেশে নিলে ফরাজি সর্বপ্রথম তার মুখে পায়েস তুলে দেয়। তারপর একে একে সমস্ত রাখালের মুখে পায়েস তুলে দেওয়া হয়।

এই ক্রিয়াকলাপের পরেই হাকিম নিযুক্তি পায় 'প্যাট-ভাতের রাখাল'রূপে। পেট-ভাতের রাখালের কাজ বাড়ির কুকুর, মেকুর ও ছাগলের দেখাশুনা করা, বাড়ির বৌ-ঝিদের রান্না-বান্নায় সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

'গো-রাখাল': 'পেট-ভাতের রাখাল' 'গো-রাখাল' হলে তার কাজ হয় পালের সঙ্গে 'গাঁথি গোরু'গুলিকে নিয়ে আসা। 'গাঁথি গোরু' হল যে সব গরু নির্দিষ্ট গৃহস্থের নিজস্ব গোরু নয়, বরং বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বাড়ি থেকে আসা গোরু।

'পাশি রাখাল': 'পাশি' গোরক্ষকদের কাজ গৃহস্থের ঘর থেকে গোরুগুলি মাঠ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং মাঠে বিচরণকালে তাদের প্রতি খেয়াল রাখা। এদের হাতে থাকে তৈলাক্ত বাঁশের লাঠি, মুখে থাকে অকথ্য গালিগালাজ। গোরু কারোর খড়ের গাদায় বা ফসলে মুখ দিলে নির্দ্বিধায় বেরিয়ে পাশি রাখালের মুখ –নিসৃত গালিগালাজ -

> খানকির বাচ্চা, ফড়ে আগুন নেগেছে না? এবার যদি কারও গাদায় মুখ দিবি তো তোর মায়েরে -

'কাঁধি রাখাল': 'কাঁধি' গো-রক্ষকদের দৈহিকভাবে শক্তিশালী হতে হয়। এদের কাজ মাচানের ওপর বসে থাকা শির-রাখালকে কাঁধে করে গৃহস্থের ঘর থেকে মাঠ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া। এই উপন্যাসে খাস্তার আলি, আবদার, জাব্দার, ছাব্দার হল কাঁধি রাখাল।

'মোড়ল রাখাল': গোরক্ষকদের মধ্যে যারা মোড়ল তারা থাকে গো-পালের সামনে। তাদের খুব সাবধানে গোরুগুলিকে নিয়ে যেতে হয়। অসাবধান হলে খুরের আঘাতে মোড়ল থেঁতলে যেতে পারে। উপন্যাসের হিসাব আলি হল 'মোড়ল রাখাল'। মোড়ল বলেই তার মাথায় থাকে তালপাতার ছাতা। অন্যদিকে অন্যান্য রাখালদের থাকে শুধুমাত্র গামছার ফেটি। গো-চারণকালে চারণভূমিতে সর্বাগ্রে পা পড়ে মোড়ল নামক গোরক্ষকদের।

'শির রাখাল': গোরক্ষকগোষ্ঠির মধ্যে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী 'শির' নামক গোরক্ষক। 'শির-রাখালের' মাথায় গামছার পাকের মধ্যে গোঁজা থাকে ষাঁড়ের গোঁফালি, পায়ে পানাই। রাখালরা কোনো গর্হিত কাজ করলে গোঁফালি ছুঁইয়েই শপথ করতে হয়। সমস্ত রাখালের ভালোমন্দের বিচারও থাকে এই শির রাখালদের ওপর। ফলত গোরক্ষকগোষ্ঠীর মধ্যে এদের মান্যতা বেশি। এরা মাচানের উপর বসে হুকো টানতে টানতে কাঁধিদের কাঁধে চেপে মাঠে আসে। মাঠে আসার পর সমস্ত রাখালের দিকে নজরদারি চালান এদের কাজ। উপন্যাসে 'শির রাখাল' ফকির আলি সমস্ত গোরক্ষকের শিক্ষক। গৃহস্থের অর্ধেক সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার থাকে 'শির রাখাল' ফকির আলির। গোচারণভূমি অন্বেষণের কাজ এদেরই করতে হয়। গোবিদ্যার সমস্ত রকম কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারলেই 'শির রাখালের' পদলাভ সম্ভব। হাকিমুদ্দিন, হিসাব আলি প্রত্যেককেই শিখিয়ে পরিয়ে নিয়েছে শির রাখাল ফকির আলি। আর এটিই পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে গোরক্ষকগোষ্ঠীর জীবনাচরণে। গোরুর সবরকমের রোগ

ও তার নিরাময়ের ভেষজ উপায় বা অন্য কোনো উপায় ফকির আলির জানা আছে। বর্ষার জলে ডুবে থাকা ঘাস খেলে গরুর পাণ্ডু, টুঁটি ফোলা,ঝাঁকা, বাদল খোঁড়া ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বর্ষায় দেখা যায় গরুর খুরের পচন-ধরা রোগ। গোরুর এসমস্ত রোগের নিরাময়ের উপায় ফকির আলির করায়ত্ত। ঝাঁকা রোগ হলে তার দাওয়াই ঝাল পোড়া। শুকনো লঙ্কা ঝিঙের খোলের মধ্যে রেখে তাতে আগুন জ্বালিয়ে বের হওয়া ঝাঁঝালো ধোঁয়া গরুর নাকে ঢুকিয়ে দিলে গরুর ঝাঁকা রোগ প্রশমিত হয়। আবার 'শোষ' রোগ তথা জিভে রসাল ঘা হলে তপ্ত বটি গরম করে জিভে ছ্যাঁকা দেওয়া হয় ও বাঁশের পাতলা আঁশে থকথকে ঘা চেঁছে ফেলা হয়। বটি পোড়ার পরে লাগিয়ে দেওয়া হয় হলুদ, লঙ্কা ও বাটা সর্ষের প্রলেপ। গোরুর প্রজনন ক্রিয়ার বিশেষজ্ঞও হতে হয় শির রাখাল ফকির আলিদের। কখন গোরুর মিলনের সময়, গোরুর পেটে কেমনভাবে বাছুর আসে, বাছুর কীভাবে খালাস করতে হয় সমস্ত বিষয়ে সে প্রাজ্ঞ। আর এই সমস্ত গো-বিদ্যার খুঁটিনাটি হাকিমকে শিখতে হয় শির-রাখালের কাছ থেকে। 'পাল-খাওয়া'র পর গাইগোরুর পিঠে পাঁচনবাড়ি মেরে 'শরীরে যে পাল' বসাতে হয় গো-বিদ্যার সে পাঠও শিখে নেয়। বুনেদ গোরুকে সরষের তেল মাখানো, খোল খাওয়ানো নিষেধ কারণ তাতেও শরীর গরম হয়ে 'মইল' ভেঙে যেতে পারে 'চোনাঘর' দিয়ে। প্রয়োজনে গোরুর বাছুর খালাস করতে গিয়ে গোরক্ষক ফকিরকে হতে হয় কঠোর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। গোরুর পেটে বাছুর মারা গেলে সে পাটের দড়ির এক প্রান্ত গর্ভে হাত ঢুকিয়ে বাছুরের গলায় বাঁধে ও অপরপ্রান্ত বাবলা গাছে বেঁধে শরীরের প্রবল জোরে মরণাপন্ন গোরুকে পাচনবাড়ি মাড়ে। প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে রক্ত বের হলেও সে থামে না বরং লাঠির বাড়ি দ্বিগুণ হয়। যন্ত্রণায় গোরুটি একটু সরে গেলে গর্ভ থেকে বের হয়ে আসে মরা বাছুর। বাছুর মরলেও গৃহস্থের গাইগোরু মরণের হাত থেকে বেঁচে যায়। নির্মম হয়ে শির-রাখাল ফকিরকে গোরু পিটিয়ে বাছুর খালাস করতে হয়। শির-রাখাল হতে হাকিমকে উৎসাহিত করেছে ফকির আলি -

> জানবি ডাঙালি থেকে এই নাবালে তুই তো এমনি এমনি আসিসনে। এটা তোর খালা, ফুফুর দেশ না হাকিম। এখানে এলি তুই খিদের আগুন নিয়ে। ... খানদার ফরাজির বাড়িতে যত একা একা থাকবি ততই দুঃখ পাবি। তার চে আমাদের সঙ্গে মাঠে যাবি। গোরু চরাবি। তাহলে গো-রাখাল হবি। গো-রাখাল হলে তুই মাসকাবারি পাবি। ফি বছর মাসকাবারি বাড়বে। তাতে তোদের অভাব ঘুচবে কিছুটা।

একথা শুধু স্বপ্নে ভাসানোর কথা নয়, এ হল হত-দরিদ্র রাখালদের জীবনের আশার কথা। আলো-বাতাস, মুক্ত আকাশের হাতছানি হাকিমকে টানে।

হাকিম বাল্য থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে শির রাখালের পারদর্শীতায় পেট-ভাতের রাখাল থেকে গো-রাখালে পদার্পণ করে, শিখতে থাকে গো-বিদ্যার নানা অধ্যায়। কৈশোরধর্মের স্বাভাবিক গুণেই হাকিমের হৃদয়ে প্রেমর

সঞ্চার ঘটে সোনাভানুকে কেন্দ্র করে। একই সঙ্গে ফারাজির ছোটপুত্রবধূর সঙ্গে দেহজ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে আয়ত্ত করে নারীর শরীরের গোপন রহস্য। নারীর নগ্ন শরীরকে তার মনে হয় চারণভূমি। মোড়ল রাখাল হিসাব আলিও একটি ধাপের পরেই শির রাখালের স্বপ্ন দেখে, শির রাখাল ফকির আলির হালসামা হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। মাঠে গরু বিচরণ কালে মনের আনন্দে চাষিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুক্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে জারি গান, ধুয়োগান, বঁদগান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রাণবন্ত মানুষটির শির-রাখালের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায় পেটান্তিপুরের চারণভূমিতে বজ্রাঘাতে। মাঠে রাখাল, খেতমজুরদের বজ্রাঘাতে মৃত্যু সচরাচর ঘটেই থাকে। হিসাবের অকস্মাৎ মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে ব্যাকুল হয়ে ওঠে গোরক্ষকেরা। হিসাব চরিত্রটি শুধু এই উপন্যাসেই নয়, গোরক্ষকের জীবন-ইতিহাসে চরিত্রটি চিরকালীন হয়ে উঠেছে।

শির-রাখালের গোরক্ষণাবেক্ষণসহ গোরক্ষকদের প্রতিও থাকে অনেক দায়দায়িত্ব। প্রবল গ্রীষ্মে কিংবা বর্ষায় অথবা শীতে গোরক্ষকদের জীবনে নেমে আসে নানারূপ ঝরঝঞ্ঝাট। বর্ষায় প্রবল বৃষ্টিতে নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যা আসে। প্রবল বন্যায় গোরুদের বাঁচানো কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। তখন শির রাখালের হুকুমে যে যেদিকে পারে গোরু নিয়ে ডাঙার উদ্দেশে রওনা দেয়। বন্যার জল আবার কমে আসলে দেখা যায় অনেককেই গোরু নিয়ে ফিরে আসতে। যেমন মোড়ল হাকিম পেরেছিল গোরুগুলি ফিরিয়ে আনতে, পেরেছিল নবজাত বাছুরকে কাঁধে নিয়ে আসতে। বন্যার জলে দিগন্তজোড়া মাঠে পলি জমে যাওয়া পতিত জমিতেও চাষাবাদ হয়। প্রকৃতির সাথে লড়াই করে যদিওবা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির কাছে কখনই নয়। খাতির আলির ট্রাক্টর চষে ফেলে পতিত জমি, কমে যেতে থাকে চারণভূমি। ফলে আশে পাশের গ্রামের গো-পালের অত্যাচারও বেড়ে যায়। ফলত খানদার ফরাজির গোরুগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস পায় না। তার জন্য খানদার ফরাজি দোষারোপ করে মোড়ল হাকিমুদ্দিনকে। গোবর সারের পরিমান দেখেই ফরাজি বুঝতে পারে গোরু বুবুক্ষু। অন্যদিকে দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হয়ে কাঁটাখোচা খেয়ে শির রাখাল আবিষ্কার করে অনেক দূরে পাথরঘাটার চারণভূমি। সেখানে স্থায়ীভাবে কয়েকদিন থেকে গোচারণ করবার অভিপ্রায়ে প্রয়োজনীয় খাবার নিয়ে রওনা দেয় গোরক্ষকের দল। পাথরঘাটায় প্রচুর পরিমাণ ঘাস দেখে আনন্দে উৎফুল্লিত হয় তারা। কিন্তু পরোক্ষণেই দেখা যায় 'প্রকাণ্ড একটা যন্ত্রদানব' তথা ট্রাক্টরের অভিঘাত -

> ক্ষুধার্ত একপাল গোরু ঘাসে মুখ দিয়ে চরতে চরতে টেকটারের ভয়ানক শব্দ শুনে ভয় পায়। ভয় পেয়ে সরে যায় মাঠের কিনারে। হাকিমের চোখের সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠটা উধাও হয়ে গেল। সেখানে শুধু বাতাসে পাক খেয়ে ভেসে থাকা ধুলো আর বিবর্ণ ঢেলার আস্তরণ।

শুধু পাথরঘাটা নয়, সমস্ত নাবাল অঞ্চলে ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে থাকে ট্রাক্টরের দানবীয় আগ্রাসন। এমনকি ফারাজিও স্থির করে, আদিকাল থেকে চলে আসা গো-পালকেন্দ্রিক ব্যবস্থার সংহার করে দানব-ট্রাক্টরকেন্দ্রিক চাষাবাদ করা। সেজন্য গো-পাল বিক্রির বন্দোবস্তো করে ফেলে। অন্যদিকে হাকিমের ঔরসে ছোটভাবি সন্তানসম্ভবা জেনে হাকিমের মনে যে উৎকণ্ঠার সঞ্চার হয় তা আরও বেড়ে গিয়ে তাকে বিমর্ষ করে তোলে গো-পাল বিক্রির দুঃসংবাদ -

> আজ থেকে তুমাদের ছুটি। বলতে খারাপ লাগছে হাকিম। এতদিন তুমরা আমার বাড়িতে থাকলে, আজ আর রাখতে পারছি কই? গোটা পাল বিক্রির বন্দোবস্ত হয়েছে।

এক ট্রাক্টর নষ্ট করেদিল হাকিমুদ্দিনের শির রাখাল হওয়ার স্বপ্নকে। সে দেখতে পেল কাদায় মাখামাখি হওয়া শির-রাখাল ফকির আলির মাথার পাক আর গোঁফালি। হাকিম স্বপ্নভঙ্গে মর্মাহত হয়ে পাড়ি দিল ডাঙালির উদ্দেশে, নিজের গ্রামের দিকে।

ঔপন্যাসিক আনসারউদ্দিন পরম মমতায় চিত্রায়িত করলেন এক বিরাট ক্যানভাসে প্রায় বিলুপ্ত হওয়া গোরক্ষকজীবনের বাস্তবতাকে। কিংবদন্তী অভিনেতা-নাট্যকার-কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাসের পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় যে মন্তব্য করেছেন আমাদের এই আলোচনা তাকেই সমর্থন করে -

> রাখাল গোষ্ঠীর জীবনযাপনের চিত্র প্রায় মহাকাব্যিক রূপ নিয়েছে ‘গো-রাখালের কথকতা’য়।...
>
> শির রাখাল ফকির আলি, হিসাব আলি, কাঁধি রাখাল, পাশি রাখাল, পেটভাতের রাখালের জীবন গড়িয়ে চলেছে যে জনপদ দিয়ে তাকে ঘিরে রয়েছে প্রকৃতি। তাকে ছুঁইয়ে বয়ে চলেছে জলঙ্গি নদী— সৃষ্টি আর সংহারের মূর্তি সেখানে অর্ধনারীশ্বর হয়ে রয়েছে। নদী, নদীর বাঁধ, নদীর বন্যা আর নদীকূলবর্তী গোচারণ ভূমিতে নিত্য বহমান রাখালের জীবন-মৃত্যু এসবই মহাকাব্যকে মনে করিয়ে দেয়— মনে করিয়ে দেয় সেই পুরাণ বিবৃত সময়কে যখন গোধন ছিল অমূল্য সম্পদ- যখন রাজপুত্র শিখতো গো-বিদ্যা।[৫]

কৃষির সঙ্গে গোরু সম্পর্ক, গোরুর সঙ্গে গোপালকের সম্পর্ক সেই আদিমকাল থেকে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা এক নিমেষেই শেষ করে দিল গোরক্ষকগোষ্ঠী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে। তবে এই উপন্যাস পাঠে আমাদের মনে হয়েছে যন্ত্রসভ্যতার দানবীয় আগ্রাসনটি আরও বৃহৎ প্রেক্ষাপটে চিত্রায়িত করলে মহাকাব্যের ট্রাজিক পরিণতিটি আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। মনে হল যেন উপন্যাসের শেষ অংশটুকু হঠাৎ করেই কারোর দ্বারা ট্রাক্টরনামক তীরে বিদ্ধ হয়ে ‘গো-রাখাল’ মহাকাব্যের ট্রাজিক চরিত্রটি নিহত হয়ে ছোটোগল্পের রূপ পেয়ে গেল। তা সত্ত্বেও আমরা নির্দ্বিধায় বলতে

পারি গ্রামজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের ধারায় আনসারউদ্দিনের 'গো-রাখালের কথকতা' অনন্য সংযোজন।

তথ্যসূত্র:

১) পাল, শ্রাবণী , প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পরিবর্তমান গ্রামসমাজ : গল্পকারদের ভাবনা, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী। পৃষ্ঠা : ৮৪ ।

২) ঘোষ, ব্যাসদেব, দাস, সুব্রত (সঃ), প্রথম প্রকাশ : ২০১৮, একুশ শতকের বাংলা উপন্যাস, নদীয়া। ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পৃষ্ঠা : ১৫৯ ।

৩) সাহা ,গৌতম সাহা (সঃ), প্রথম প্রকাশ : ২০২২। আনসারউদ্দিন : অনন্য সন্ধান, কলকাতা। নান্দনিক, পৃষ্ঠা : ২৭৬।

৪) তদেব, পৃষ্ঠা : ২৭৭।

৫) বিশ্বাস, চপল (সঃ), ২০১৯, অনন্য সৌমিত্র, চেতনা (৩৯ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা), নদিয়া। পৃষ্ঠা : ৫৫-৫৬।

রামমোহন ও তৎকালীন বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা

সেলিম বক্স মণ্ডল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৩ সালে রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার পুরাতন সিনেট হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ভাষণ 'ভারতপথিক রামমোহন' নামে পরিচিত। সেখানে দীর্ঘ একশো বছরের ব্যবধানে রামমোহনের মূল্যায়ন ও আত্মবিস্মৃত জাতি হিসেবে বাঙালির আক্ষেপ দুই-ই প্রকাশ পেয়েছে। উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে রামমোহন রায়ের কর্মপ্রচেষ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'বাংলার রেনেসাঁস' নিয়ে যতই মতপার্থক্য থাকুক না কেন প্রত্যেকটি মতবাদের শুরু নিঃসন্দেহে রামমোহনকে দিয়ে। তাঁর সংকল্পিত ধর্মীয় ও সামাজিক মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরবর্তী সময়ের 'ব্রাহ্মসমাজ' শুধুমাত্র বাংলা ও বাঙালির চৈতন্য-বিকাশের ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র দেশীয় প্রেক্ষিতে এমনকি পাশ্চাত্যেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই উনিশ শতকচর্চা 'ব্রাহ্মসমাজ' ও 'ব্রাহ্ম-আন্দোলন' ছাড়া সম্ভবই নয়। তাছাড়া রামমোহনের লেখাপত্র সামান্য মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে 'সেকালে'-র ('মধ্যযুগ') সঙ্গে তাঁর ব্যবধানটা কতদূর। তাঁর 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা, বেদান্ত পাঠ, বাংলাভাষায় বেদান্তের ভাষ্যব্যাখ্যা ও 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' প্রচার এই ব্যবধানের দর্শন ও বোঝাপড়াকে স্পষ্ট করে দেয়। তাই বলতেই হয়েছে, 'তাঁর খ্যাতিতে আধুনিকতা, সমাজ-সংস্কার এবং জাতীয়তাবোধ পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে আছে।'[১] এই বিখ্যাত মন্তব্যে 'আধুনিকতা' ও 'সমাজ-সংস্কারে'র সঙ্গে 'জাতীয়তাবোধে'র ধারণাটি যে যুক্ত তা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমাদের বর্তমান আলোচনায় তা ক্রমে আলোচিত হয়েছে।

উনিশ শতকের প্রায় শুরু থেকে রামমোহন 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য'-কে হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ বলে ঘোষণা করেছিলেন। পাশাপাশি ডিরোজিও-র ছাত্ররা প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও তার বিভিন্ন আচারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। বোঝা যায়, রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা যেমন নিজেদের হিন্দু বলতেন তেমনই হিন্দুত্বের কোনো কিছু সেইভাবে বর্জন না করে তাঁরা ছিলেন সংস্কারের পক্ষপাতী। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ছিল পুরোপুরি বর্জনের পক্ষে। এমনকি খ্রিস্টধর্মের প্রতিও তাঁদের মনোভাব খুব অনুকূল ছিল না। উল্টোদিকে রক্ষণশীল হিন্দুরা ধর্মরক্ষার জন্য ১৮৩০-এ গঠন করলেন 'ধর্মসভা'।

এদেশে রামমোহনের কর্মময় জীবন মাত্র পনেরো বছরের, ১৮১৫-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ। এর মাঝে 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭) ও 'সংস্কৃত কলেজ' (১৮২৪) প্রতিষ্ঠা

হয়েছে। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'-র প্রতিষ্ঠা ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। বলা বাহুল্য ততদিনে রামমোহনের ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার সম্পর্কিত মানসিকতা সমাজের উঁচু স্তরের মানুষদের প্রভাবিত করতে পেরেছিল। বিশেষ করে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে (১৭৯৪-১৮৪৬), যিনি ছিলেন রামমোহনের অন্তরঙ্গ। 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা বা তার সামান্য আগে থাকতেই তাঁদের অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত। দ্বারকানাথ কখনো কখনো রামমোহনকে অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন।[২] দ্বারকানাথকে পাশে রেখে রামমোহন তাঁর নিরাকার একেশ্বরবাদী ধর্মপ্রচারের জন্য যে ধরনের পদ্ধতি বেছে ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পুস্তক প্রব এর পাশাপাশি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন।

'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠাকালে রামমোহনের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল *বেদান্তগ্রন্থ বেদান্তসার*। এরপর পাঁচটি উপনিষদের তর্জমা প্রকাশিত হয়। তারপরেই পাব তাঁর সেইসব কালজয়ী তার্কিক রচনা। *উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার* (১৮১৬-১৭), *ভট্টাচার্যের সহিত বিচার* (১৮১৭), *গোস্বামীর সহিত বিচার* (১৮১৮), *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ* (১৮১৮), *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮১৯)।

১২২৬ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ সমাচার দর্পণ পত্রিকায় 'আত্মীয় সভা'র অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে লেখাটি বেরিয়েছিল সেখান থেকে রামমোহনের চিন্তা-চেতনার তিনটি মোক্ষম বিষয় জানা যায়-[৩] ১. জাতির প্রতি বিধি-নিষেধ বিচার, ২. সহমরণ বিষয়ে বিচার, ৩. বেদান্তের অর্থ-বিচার। তবে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি রামমোহনের মনোযোগও লক্ষ করবার মতো। 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে তাঁর পূর্ণ সম্মতি ছিল। কিন্তু রক্ষণশীল ও গোঁড়া হিন্দুদের আপত্তির কারণে তাঁর উৎসাহ বিশেষ জায়গা পায়নি। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণ নিজের খরচায় 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায়। এই স্কুলের মাধ্যমে রামমোহন সমকালের উপযোগী শিক্ষা অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার প্রচার চেয়েছিলেন, তা স্কুলের নামকরণ থেকেই প্রাথমিকভাবে বোঝা যায়।

মুদ্রণপূর্ব কালে আমাদের দেশে শিক্ষাপদ্ধতি কেমন ছিল তা বিস্তারিতভাবে বলতে চাওয়াটা বাহুল্য। সেকালের টোল-চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ-স্মৃতি-ন্যায়-কাব্যের চর্চা হত। বিশেষ করে 'স্মৃতিশাস্ত্র'ই কাজে লাগত বেশি- হিন্দুধর্মের নানা বিধি-বিধানের জন্য। তবে এদেশে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের প্রথম শুরু হয়েছিল একজন খ্রিস্টান মিশনারির দ্বারা, তিনি উইলিয়াম কেরি। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'দেশীয় পাঠশালা' স্থাপন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উল্লেখ্য, এর পূর্বে বিদেশীদের চেষ্টায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত (১৭৮৪) হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠা করেছেন স্যার উইলিয়াম জোনস। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সদস্যদের মধ্যে স্যার জোনাথন ডানকান

(১৭৫৬- ১৮১১) ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে হিন্দু আইন ও সংস্কৃত বিষয়ে লেখাপড়ার জন্য সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) অন্যতম কাজ ছিল ভারতবিদ্যাচর্চা। তাঁর 'বিবিধার্থসংগ্রহ' (১৮৫১) উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শুরুর দিকে কোনো বাঙালি ছাত্রের যোগ ছিল না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশ থেকে আসা সিবিলিয়ানদের রাজকার্যের সুবিধার্থে দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত করা। অবশ্য ইতিহাসের কালচক্রে দেশীয় পণ্ডিতদেরই অবদান অধিক স্মরণীয়। এরপর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হল 'হিন্দু কলেজ' ও 'সংস্কৃত কলেজ'। রামমোহন এই সময় ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষা কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় সে-বিষয়ে বড়োলাট লর্ড আমহার্স্টকে একটি চিঠি লিখলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থে সেই চিঠির বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত আছে। সেখান থেকে জানতে পারি, রামমোহন সংস্কৃত কলেজের পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাব দিচ্ছেন।[৫] তাঁর মতে, সংস্কৃতশিক্ষাকে জিইয়ে রেখে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীগণকে চিরকালের জন্য অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে রেখে দিতে চান।[৬]

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দু কলেজ'-এর পাশাপাশি কলকাতায় 'স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপিত হয়েছিল। দেশীয় বালকদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা ছিল এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৮) সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এর অধীনে গড়ে ওঠা স্কুল-কলেজগুলিতে ইংরেজি শিক্ষা ছিল অনিবার্য। তবে তাঁদের পক্ষ থেকে পাঠ্যপুস্তক প্রচার ও সরবরাহের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মানসিকতা কাজ করলেও ইংরেজি শিক্ষা দেশীয় বালকদের জন্য সময়োপযোগী ছিল। রামমোহন সেসব খুব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃত শিক্ষাকে যুগোপযোগী মনে করেননি। আলেকজান্ডার ডাফের ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের উদ্যোগে তাঁর পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান সে-বিষয়ে আরও নিশ্চিত করে তোলে। ফলত 'যুগনায়ক' ও 'আধুনিকতার পথিকৃৎ' এই ধরনের বিশেষণ তাঁর জন্যই যে প্রযোজ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র:

১. রণজিৎ গুহ, *দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা,* কলকাতা: আদম, অক্টোবর ২০২১, পৃ. ৯০।

২. বারিদবরণ ঘোষ, *ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৪৯, পৃ. ৭।

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা,* প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪৪, পৃ. ৩০০।

৪. মনোতোষ চক্রবর্তী, হিন্দু কলেজ ও উনিশ শতকের বাংলার সমাজ, কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৭৯, পৃ. ২৩-২৪
৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা: এস কে লাহিড়ী এন্ড কো., ১৯০৯, পৃ. ৮০
৬. শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, 'সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ', বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭০

ঋণ: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৩৯৪

শৈবাল মিত্রের বয়ানে 'চৈতন্য আখ্যান'-এর পুনর্নির্মাণ : একটি মূল্যায়ন

মৃত্যুঞ্জয় কুমার মণ্ডল
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: পুনর্নির্মাণ শব্দটি সাহিত্যে এসেছে নির্মাণের হাত ধরেই। যখন কবি, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রথম কোনো কিছু সৃষ্টি করেন তখন তাকে আমরা নির্মাণ বলতে পারি। সাধারণত উপাদান ও প্রকাশের সমন্বয়ে কোনো কিছু সৃষ্টি হয়। বাল্মীকির রামায়ণ, বেদব্যাসের মহাভারত, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, কবি কঙ্কন চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল, রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রত্যেকটি হল এক একটি নির্মাণ। অর্থাৎ সাহিত্যে নির্মাণ হল প্রথম লিখিত পাঠ্যবস্তু যার একটি নির্দিষ্ট কাহিনি আছে। একটি এক রৈখিক অর্থ আছে। আর পুনর্নির্মানে সেই লিখিত পাঠ্যবস্তুর নির্মিত অর্থ ভেঙে দেওয়া হয় এবং এক রৈখিক অর্থ ভেঙে বহুরৈখিক অর্থ তৈরি হয়।[১] 'গোরা' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শৈবাল মিত্র সেই কাজটিই করেছেন। মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদে আজীবন দৃঢ় বিশ্বাসী ঔপন্যাসিক শৈবাল মিত্র (জন্ম ১৯৪৩ – মৃত্যু ২০১১) তাঁর 'গোরা' (প্রথম প্রকাশ ২০১২) উপন্যাসে এতদিন ধরে জনমানসে প্রচলিত চৈতন্য আখ্যানের পুনর্নির্মাণ ঘটিয়েছেন। আর পুনর্নির্মান করতে গিয়ে অনেক বিতর্কিত বিষয় উত্থাপন করেছেন। বিতর্কিত বিষয়গুলি হল 'গোরা'-র (চৈতন্যের) জন্ম রহস্য, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নারায়ণীর গর্ভধারণজনিত কারণে গোরার সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ ও গোরা-গদাধরের সমকাম সম্পর্ক এবং সর্বশেষ গোরার অন্তর্ধান রহস্যের এক নতুন পরিণাম। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিতর্কিত বিষয়গুলিকে যৌক্তিকভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি।
মূল শব্দ: পুনর্নির্মাণ, চৈতন্যদেব, বিতর্কিত জন্মরহস্য, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ, সমকাম, অন্তর্ধান রহস্য।

'গোরা' উপন্যাসের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় হচ্ছে গোরার জন্ম রহস্য। গোরার জন্মরহস্যটি তাঁর দাদা বিশ্বরূপ পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। যদিও বিশ্বরূপের লেখা কোনো পুঁথির কথা চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলোতে পাওয়া যায় না। এটি ঔপন্যাসিকের স্বকল্পিত। বিশ্বরূপের জন্মের দশ বছর পর নবদ্বীপ থেকে পাঁচ নদী পেরিয়ে পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়িতে যাওয়ার পথে শ্রীহট্টের লাউড়ে (বুরহানউদ্দিনের মাজারে) আটত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মা শচীদেবী গর্ভধারণ করে। আর এই গর্ভজাত সন্তান স্বয়ং গোরা। পরপর আটটি কন্যাসন্তান হারানোর শোকে পাগলিনী শচী প্রথম পুত্রসন্তান বিশ্বরূপের দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা করে বুরহানউদ্দিনের মাজারে সিন্নি চাপাতে এসেছিল।

তখন মাজারের মুজাভির সন্তানের মাথায় "আসান চামর" বুলিয়ে শচীদেবীকে বলেন যে তাঁকে "আরো একবার সন্তানবতী হতে হবে"[২]। সেজন্য মাজারের গর্ভগৃহে তাঁকে একা তিনদিন তিনরাত "সিন্নি আর আবে জজমজ"[৩] (মক্কার কুয়ো থেকে আনা জল) খেয়ে ধর্না দিতে হবে। তবেই তিনি সন্তাবতী হবেন। পুঁথিতে বিশ্বরূপ লেখেন যে মাজারের গর্ভগৃহে তাঁর মায়ের হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা দুর্যোগের ওই তিন রাতে স্বয়ং কৃষ্ণ দুই দেবতা বরুণ ও পবনের বেশে এসে হাজির হয়েছিলেন। তাই গোরা হলেন কৃষ্ণের সন্তান। আর এই জন্ম রহস্য থেকেই পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে গোরার একপ্রকার দুরত্ব তৈরি হয়। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় বিশ্বরূপ সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কয়েক বছর পরেও অন্তর্জলি যাত্রায় পিতা জগন্নাথ মিশ্র বড়ো ছেলে বিশ্বরূপের হাতের আগুন পাওয়ার জন্য হা-হুতাশ করছেন অথচ ছোটো সন্তান গোরার প্রতি একবারের জন্যও আগ্রহ দেখায়নি। কারণ জগন্নাথ মিশ্র জানতেন যে গোরা মিশ্র বংশরক্ষার অধিকারী নন। তাই বড়ো ছেলেকে তড়িঘড়ি বিয়ে দিয়ে সংসারের চলন্ত ধারাকে অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন। এই জন্য প্রতিলোমজাত সন্তান গোরা যাতে জগন্নাথ মিশ্রের পারলৌকিক কাজে অংশ না নেয় সেটিও সতর্ক করে দেন স্ত্রী ও বড়ো সন্তানকে।

এই পুঁথিসূত্রে গোরা জানে যে তাঁর বংশপরিচয়, কুলপরিচয়, ব্রাহ্মণত্ব, নিজের যত পরিচয়, যত সম্পর্ক এতদিন বহন করে এসেছে সব মিথ্যে। তাঁর অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, তাঁর কুলাচার মিথ্যে, উপবীত মিথ্যে, গায়ত্রী মন্ত্র মিথ্যে, স্ত্রী, সংসার, আত্মীয়স্বজন সবকিছু মিথ্যে। "তাঁর একজন মা থাকলেও বাবা নেই, দেশ নেই, জাতি নেই, নামগোত্রহীন ঈশ্বর পরিত্যক্ত এক বিশাল নেতির অধম সন্তান সে।"[৪] স্বর্গবাসী দুই দেবতা বরুণ পবনের কেউ তাঁর জন্মদাতা হলে গোরা স্বর্গচ্যূত অভিশপ্ত এক মানুষ। আর শ্রীহট্টের মুজাভিরের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক থাকলে আর্যাবর্তের সীমানা ছাড়িয়ে দেশান্তরে রয়ে গেছে তার ঠিকানা। আবার বরুণ, পবন, মুজাভির একই সত্তা হলে গোরা নির্বিশেষ, অনাবৃত বিশ্বমানব সমাজের এক সামান্য মানুষ। আসলে এই অলৌকিক গর্ভসঞ্চারের কথা বললেও মার্ক্সবাদ ও লেলিনবাদে বিশ্বাসী শৈবাল মিত্র পরোক্ষভাবে মুজাভিরের সঙ্গে গোরার দেহগত ও মানসিক সাদৃশ্য দেখিয়ে লৌকিকতার প্রেক্ষাপটটি বুনে দিয়েছেন। গোরা "মুজাভিরের মতোই শক্ত, সমর্থ, সমান উচ্চতার মানুষ"[৫]। কাজেই অলৌকিকতার মোড়কটি খুলে পাঠক ধরেই নিতে পারেন যে মুজাভিরই হল গোরার আসল পিতা। কারণ সেই স্বাধীনতা পাঠকের আছে। প্রসঙ্গত এইখানে বলে রাখা প্রয়োজন চৈতন্যের মনের ওপর শুধুমাত্র হিন্দু ভাবধারা নয় ইসলাম আরবি-ফার্সি সংস্কৃতি ভাবধারারও প্রভাব আছে বলে লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই উপন্যাসের 'গৌরচন্দ্রিকা'-তে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন শরীরে, কল্পনায়, ইতিহাসে বাঙালির গঠনে প্রথম থেকেই পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের এবং বাহিরের সঙ্গে অন্দরের মিলন। আর সে পশ্চিম হল "কখনও কনৌজ, কখনও আর্যাবর্ত, কখনও

আরবদেশ, কখনও তুর্কিস্থান বা পারস্য, কখনও বা ইউরোপ”[৬]। আর বাহির হল কখনও “ব্রাক্ষণ্য সভ্যতা, কখনও ইসলাম, কখনও খ্রিস্ট, কখনও বা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ”[৭]। যে-কারণে উপন্যাসের শুরু থেকেই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী শৈবাল মিত্র রবীন্দ্রনাথের গোরার মতো চৈতন্যের ওপর সাম্যবাদ আরোপ করে গ্লোবালাইজড ম্যান অর্থাৎ বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসে লেখক সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের নেপথ্যে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নারায়ণীর গর্ভধারণজনিত বিষয়কে মূল কারণ বলে মনে করেছেন। লেখকের এই যুক্তিকে অগ্রাহ্য করা যায় না কারণ একজন ব্যক্তি যিনি প্রেমভক্তির স্রোতে ধর্ম-বর্ণ, জাতপাতের ব্যবধান মুছে দিয়ে যবন-চণ্ডাল-মুচি-ডোম সবাইকে একটা ছাতার তলায় নিয়ে এসেছিলেন, নামসংকীর্তন করে চাঁদ কাজিকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন। যাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখন গগনচুম্বী অথচ সেই সময়ে মাত্র চব্বিশ বছরে তিনি সংসারধর্ম ত্যাগ করছেন ব্যাপারটি মোটেই সহজ সমীকরণ ছিল না। সুলতান হোসেন শাহের দরবার থেকে গোপনসূত্রে গোরা জানত শ্রীবাসের দাদা নলিনীকান্তের বিধবা মেয়ে নারায়ণীর গর্ভসঞ্চারের অভিযোগে তাঁকে একডালায় ধরে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ একরকম পাকা। কারণ তাঁর সাংগাঠনিক ক্ষমতায় ভয় পেয়ে গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা ও গৌড় সুলতান সুযোগের অপেক্ষা করছিল। তাই নারায়ণীর গর্ভবতী হওয়ার ঘটনার সঙ্গে গোরাকে জড়িয়ে তাঁর ব্যভিচারের বৃত্তান্ত ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নবদ্বীপের গোড়া ব্রাহ্মণরা গোরাকে শূলে চড়ানোর জন্য ফুঁসতে থাকে। কারণ গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা গোরার জনপ্রিয়তায় ভয় পাচ্ছিল। ফলত মান ও জীবন বাঁচানোর জন্য একরকম বাধ্য হয়েই গোরা সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছেন - এরকমই ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। গোরার মুখে বলতে শোনা যায় “আমার প্রিয় জন্মভূমি এই নবদ্বীপ ছেড়ে তাড়াতাড়ি হয়তো চলে যেতে হবে আমাকে... নবদ্বীপ কেন ছাড়তে হচ্ছে, তোমাদের অজানা নয়”[৮]। আর উপন্যাস মধ্যে বলা হয়েছে পৃথিবীর এই গোপনতম সত্যটি জানতেন গোরা ও তাঁর মা। তাই গোরা যাতে খুন না হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে প্রাণে বেঁচে থাকে এই আশায় মা শচীদেবী সম্মতি দিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর আর কোনও বিকল্প পথ ছিল না। প্রসঙ্গত এখানে নারায়ণীর গর্ভধারণ বৃত্তান্তটি বলা প্রয়োজন। নারায়ণীর গর্ভধারণের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে “রাতের তিনপ্রহরে পরপর তিন রাত গৃহ দেবতা বিষ্ণু, নিজের বিছানা ছেড়ে তার শয্যাশঙ্গী হয়েছিল, আদরে ভাসিয়ে দিয়েছিল তাকে, লম্পটের মতো তার সর্বস্ব লুটেপুটে নিয়েছিল তার প্রাণের ঈশ্বর”[৯]। নারায়ণী ওই তিনরাতে অনুভব করেছিলেন “কাঁটা দিয়ে উঠছে তার শরীর স্নায়ু, শিরা প্রতিটা কোষ শিরশির করছে”[১০]। এছাড়াও গর্ভলক্ষণের আরো একটি কারণ হল যে শ্রীবাসের বাড়িতে সংকীর্তন মহোৎসবের সময় গোরার চিবোনো পান এবং গোরার ভাতের থালার ভুক্তাবশেষ খাওয়া। কিন্তু আধুনিক যুক্তিবাদী মন এই অলৌকিক গর্ভধারণকে মান্যতা দেবে না বরং পাঠক খুঁজে নিতে চাইবেন আসল কারণ। সেক্ষেত্রে অনেক পাঠক যদি

ধরে নেন যে গৃহদেবতা বিষ্ণু ও গোরা আসলে অভিন্ন। তাঁর প্রমাণ নারায়ণীর কথাতে পাই "বিষ্ণুর বিছানার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা আলোকিত মেঘের মতো অন্ধকারে গোরার দিকে তাকিয়ে নারায়ণীর মনে হল, গৃহদেবতার বিগ্রহ রক্তমাংসের শরীরে খাটের ওপর বসে রয়েছে ... একজন মানুষ হয়ে গেছে ভগবান"[১১]। অর্থাৎ নারায়ণীর ভ্রমবশত গোরাকে বিষ্ণু বলে মনে হতে পারে যেহেতু সেটা ছিল প্রবল ঝড়বৃষ্টির অন্ধকার রাত। আর গোরা যেহেতু বিষ্ণুর অবতার এবং তাঁর ভগবৎ সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তাই গোরাকে আড়ালে রেখে বিষ্ণুর নাম বলা হয়েছে কৌশলে যাতে নারায়ণী প্রমাণ করতে পারে তিনি কোনো পুরুষের সঙ্গে পাপ সম্পর্কে জড়াননি। অর্থাৎ নারায়ণী দেখাতে চান তিনি গৃহদেবতা বিষ্ণুর সেবাদাসী। বিষ্ণুর কল্যাণেই তিনি সন্তানসম্ভবা হয়েছেন। মনে রাখতে হবে ঔপন্যাসিক রক্তমাংসের চৈতন্যকে নির্মাণ করছেন।

সমপ্রেম বা সমকাম সম্পর্ক আজকের নয়, এই ইতিহাস সুদীর্ঘ। মধ্যযুগের বাংলা চৈতন্যজীবনী সাহিত্যেও সেই ইতিহাস লুকায়িত। কিন্তু বিষয়টি অতি বিতর্কিত। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গোরা ও গদাধরের মধ্যে সমলৈঙ্গিক সম্পর্কের বীজটি নিহিত আছে বলে অনেকেই মনে করেন। জয়ানন্দ 'নদীয়া' খণ্ডে লিখেছেন,

"...গৌরাঙ্গের কেবল গদাধর প্রেমময়।।
গৌরচন্দ্র বলেন মা গদাধরের আমি।
নানা অলঙ্কার দিয়া ঘরে রাখ তুমি ...
গদাধর সঙ্গে রঙ্গে ক্ষিতি অবতার।
গদাধর দেহে মোর সতত বেহার।।"[১২]

অনেক সমালোচক এই শেষ লাইনটিকে সমপ্রেম বা সমকাম সম্পর্কের মূলসূত্র বলে মনে করেছেন। 'গোরা' উপন্যাসে গৌরাঙ্গ ও গদাধরের মধ্যে সমকাম সম্পর্ক নিয়ে ঔপন্যাসিক শৈবাল মিত্র বিস্তারিত ভাবে কিছু লেখেননি। তবে গোরার চারপাশের মানুষের রটনা হিসেবে বিষয়টিকে উত্থাপন করেছেন। উপন্যাসে দেখা যায় গোরার চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করছেন "ছোকরা (গোরা) নিশ্চয় নপুংসক, নপুংসক হওয়ার জন্যেই সে সমকামী। মাধবপণ্ডিতের ছেলে গদাধরের সঙ্গে তার এত ফস্টিনস্টি।"[১৩] চন্দ্রশেখর আচার্য গদাধর সম্পর্কে বলছেন যে গদাধর শুধুমাত্র গোরা ন্যাওটা নয় তার চেয়েও অনেক বেশি। গোরাকে দেখলে গদাধর এলিয়ে পড়ে বলে 'সখি ধরো ধরো'[১৪] বলে।

শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এই বিতর্ক যেমন মৃত্যুর কারণ নিয়ে তেমনই স্থান ও সময় নিয়ে। কারো মতে নীলাচলে জগন্নাথ মূর্তিতে চৈতন্যদেব লীন হয়ে গিয়েছিলেন, কারো মতে পুরীর সমুদ্রে জলে ডুবে মৃত্যু, কারো মতে জগন্নাথ মন্দিরে পড়ে গিয়ে ইটের আঘাতে পায়ে চোট পান আর সেই ক্ষত থেকে গ্যাংগ্রিন হয়, সঙ্গে প্রবল জ্বর আসে, আর এতেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়, আবার কারো

মতে গোবিন্দ বিদ্যাধর ভৈ-এর হাতে নিহত হন। তবে এ বিষয়ে সিজার বাগচী তাঁর ‘গণনায়ক শ্রীচৈতন্য’ প্রবন্ধে বলেছেন যে চৈতন্যদেব ওড়িশা রাজ্যের রাজনীতির একজন ক্রীড়নক হয়ে ওঠেছিলেন। ফলত তিনি গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই-র টার্গেট হয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই তাঁর হাতে শ্রীচৈতন্যের গুপ্তখুন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে শৈবাল মিত্রের ‘গোরা’-তে অন্তর্ধান রহস্যের এক নতুন পরিণাম দেখানো হয়েছে। গোবিন্দ ভোই-র চক্রান্তে শ্রীচৈতন্য হত হননি বরং তাঁর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল লেখক সুস্পষ্টভাবে সেটি বলেছেন। সুলতান হোসেন শাহের নির্দেশে গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই-র ষড়যন্ত্র ছিল আষাঢ় মাসে স্নানযাত্রা মহোৎসবের পরে আকাশভাঙা মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়ের নির্ধারিত শ্রাবণের কৃষ্ণাপঞ্চমীর রাতে জগন্নাথ মন্দিরের পেছনে শবর সেবকদের জন্য “অনসরপিণ্ডি”[১৫] নামক যে গুপ্ত পুজোর চাতাল আছে সেখানে চৈতন্যকে কোতল করা হবে। তার আগে সেখানে তাঁকে কবর দেওয়ার জন্য একটা গর্ত খুঁড়ে রাখা হবে। অতঃপর কোতল করে তার ওপর মাটি চাপা দিয়ে পাথর দিয়ে এমনভাবে গেঁথে দেওয়া হবে যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায়। এরপর ওড়িশাবাসীর কাছে সর্বজন শ্রদ্ধেয় চৈতন্যের প্রাণের বন্ধু জগন্নাথ দাসকে দিয়ে প্রচার করা হবে মন্দিরে দারুব্রহ্ম, জগন্নাথদেবের শরীরে কৃষ্ণের অবতার নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একঝলক আলোর মতো মিশে গেছে। কিন্তু এই চক্রান্ত ব্যর্থ হয় অনন্ত প্রতিহারী, বলভদ্র ভট্টাচার্য তথা সুবুদ্ধি রায়ের সহযোগিতায়। উপন্যাসে দেখানো হয় যে বীরভদ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে চৈতন্যদেব গুপ্ত পথে ঝাড়খণ্ড জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বৃন্দাবনে পৌঁছে ছিলেন অষ্টম দিনে। কিন্তু বৃন্দাবনেও তিনি তিন দিনের বেশিদিন অবস্থান করেননি। “প্রেমভক্তি প্রচারে আর্যাবর্ত থেকে আরও পশ্চিমে তক্ষশীলা গান্ধার হয়ে মহেঞ্জোদরো হরপ্পা নগরের ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে আরও পশ্চিমে পারস্য উপসাগরের ধারে পৌঁছে”[১৬] গেছেন। কারণ পৃথিবী তাঁকে ডাকছে। কৃষ্ণ নামের সুতোয় সব ধর্ম, জাতপাতের মানুষকে ফুলের মতো গেঁথে বিশ্বজুড়ে একটা মালা পরানোর ভার নিতে হবে তাঁকে। তবে উপন্যাসে চৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের নতুন পরিণামটি ঘোষিত হয়েছে একুশ শতকের যুবক গোরার কাকা ত্রিদিবনাথের মুখে। উপন্যাসের শেষে খোলা জানলা দিয়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ত্রিদিবনাথ দেখল “পাঁচশো বছর আগের গোরার সঙ্গে কাল থেকে কালান্তরে হেঁটে চলেছে আরো অনেক গোরা, গোরার মিছিল”[১৭]। বস্তুত শৈবাল মিত্র ‘গোরার মিছিল’ শব্দবন্ধের মাধ্যমে পশ্চিমদেশে প্রধানত ইসকনের মাধ্যমে যে চৈতন্য কনসার্সনেসের প্রসারণ তার দিকেই পাঠককে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. নবেন্দু সেন (সম্পাদিত); ‘পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, কলকাতা, রত্নাবলী, ১৯৬২, নবেন্দু সেনের ‘ডি-কনস্টাকশন’ অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা-৪৬৮-৮৭

২. শৈবাল মিত্র; 'গোরা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা-৪৭
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৭
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০১
৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২১১
৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪
৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৪২
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৪১০-১১
১০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৯৭
১১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৯২
১২. বিমান বিহারী মজুমদার এবং সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত; 'জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০২২, 'নদীয়া-২৯' অংশটি দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা-৩৭
১৩. শৈবাল মিত্র; 'গোরা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা-৩২৮
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০৫
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৬০৩
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৬২১
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৬২৩

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ:

মিত্র, শৈবাল। গোরা। প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর, ২০১২।

সহায়ক গ্রন্থ:

গুপ্ত, ক্ষেত্র সম্পাদিত। শ্রীচৈতন্য: একালের দৃষ্টিকোণ। কলকাতা: যুগ প্রকাশনী, ১৯৫৬।
রায়, দেবেশ। চৈতন্য আখ্যান। প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: স্পার্ক, ২০২১।

ওরাওঁ জনজীবনে বিবাহ : প্রথা ও সংস্কার

চন্দনা সাহা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইস্ট ক্যালকাটা গার্লস' কলেজ, লেকটাউন

সারসংক্ষেপ (Abstract): বিবাহকে কেন্দ্র করে যেকোনো আদিবাসী সমাজেই নানাবিধ প্রথা ও সংস্কারের সমাবেশ লক্ষিত হয়। ওরাওঁ জনজাতির মধ্যে সাম্প্রতিক্ কালেও তা গোষ্ঠীভাবনার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় লালিত। তাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ অর্থাৎ নিজ ট্রাইবের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হলেও ট্রাইবের অন্তর্গত একাধিক গোত্রে বিবাহ অর্থাৎ বহির্বিবাহ রীতি কঠোরভাবে পালনীয়। অর্থাৎ একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বর-কনের জন্মবারে বিবাহ নিষিদ্ধ। ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে কন্যাপণ প্রচলিত। বিবাহে লগ্নবাঁধা, গায়েহলুদ, সিঁদুরদান ইত্যাদি প্রথা প্রচলিত। 'গোত্রমিলন' ও 'সমধিমিলন' বিবাহের ক্ষেত্রে অপরিহার্য একটি নিয়ম।ওরাওঁ সমাজে বিধবা বিবাহ ও বিচ্ছেদ পরবর্তী বিবাহে অর্থাৎ পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। তাদের মধ্যে বিবাহকে কেন্দ্র করে যেসমস্ত রীতি ও সংস্কার রয়েছে তার ভিতর থেকেই খুঁজে পাওয়া যায় ভাঙ্গাচোরা অতীতের প্রতিধ্বনি ও তাৎপর্যপূর্ণ জীবনদর্শন।
সূচক শব্দ (Keywords): নেওতা, আগুয়া, মারোয়া, নাগপুর যাত্রা গোত্রমিলন, দান, সাগাই, উটঠা।

মূল প্রবন্ধ :

ভারতবর্ষের প্রাচীন জনজাতিগুলির মধ্যে দ্রাবিড় শাখাভুক্ত ওরাওঁ সম্প্রদায় তাদের পরম্পরাবাহিত প্রথা-বিশ্বাস-সংস্কার ও সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। পারিপার্শ্বিক আগ্রাসী আধুনিকীকরণের জোয়ারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনজাতির ভাষা, ধর্ম ও বাসস্থানের মত জীবনধারণের প্রয়োজনীয় ও জাতিসত্তার ধারক উপাদানগুলি ভেসে যাচ্ছে খড়কুটোর মত।অস্তিত্ব রক্ষার তীব্র সঙ্কটে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয়েও তারা আপন জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থেকেছে। প্রাচীন ঐতিহ্যলালিত বিরাট সংস্কৃতি ও অফুরন্ত সাহিত্যভাণ্ডারকে উগ্র আধুনিকতার চাপে তারা বিস্মৃত হয়নি। আদিবাসীরা তাদের জীবনে জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহকে কেন্দ্র করে নানাবিধ প্রাচীন প্রথা-সংস্কার এবং তাদের ঐতিহ্য লালিত প্রাচীন বিশ্বাসগুলিকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। কুরুখভাষী জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রথম বিবাহ বা 'বেনজা'কে কেন্দ্র করে যেসমস্ত আচার-বিশ্বাস নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয় তাতে প্রতিফলিত হয় সমস্ত আদিবাসী সমাজের প্রজন্ম পরম্পরায় বাহিত দৃঢ় শৃঙ্খলিত ঐতিহ্য-প্রীতি সর্বোপরি জীবনকে দেখার এক উদার-উন্মুক্ত-মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। অভিজাত সমাজে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্নাসিকতা ও আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণতা যখন সভ্যতাকে ক্রমশ গ্রাস করে চলেছে তখন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উদার মানবিক চেতনা আমাদের যেন সাময়িকভাবে দিশা প্রদর্শন করে। অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মত ওরাওঁ সমাজে 'বিবাহ' কেবলমাত্র বরবধূর ব্যক্তিগত জীবন পরিসরে আবদ্ধ তাৎক্ষণিক প্রথানুষ্ঠান নয়,বরং একটি জনজাতির নিজস্ব বিশ্বাস ও বিস্মৃতপ্রায় অতীতের পুনঃস্মরণে,সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের বিরাট পরিসরে ব্যপ্ত।অগ্রসরমান সময়ের দাবিতে তাদের চেতনাজগতে এবং আনুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্ষীণ পরিবর্তন পুরোপুরি দুর্লক্ষ্য নয়। বলাবাহুল্য, সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণ বা Aculturation এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের বৈবাহিক রীতি-অনুষ্ঠান (যেমন, 'মুণ্ডা' সম্প্রদায়ের বিবাহাচার) তাদের বিবাহানুষ্ঠানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ হলে সেখানেও আনুষ্ঠানিকতায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটে যায়।তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, এইসমস্ত রূপান্তর অবশ্যই বাহ্যিক ও গৌণ।কারণ, আদিবাসী সমাজে প্রচলিত বিবাহের প্রধান শর্তগুলি সবক্ষেত্রেই প্রায় অপরিহার্য। যেমন, ওরাওঁ সমাজে বহির্বিবাহ নিষিদ্ধ অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই নির্বাচন করতে হবে। আবার, নিজগোষ্ঠীর অন্তর্গত সমগোত্রে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। ওরাওঁ জনজীবনে 'বিবাহ' শুধুমাত্র দুটি নরনারীর সর্বাত্মক মিলনেই নিঃশেষিত হয়ে যায় না, বরবধুর সাথে সংশ্লিষ্ট দুই ভিনগোত্র এমনকি ভিনগ্রামের মধ্যেও পারস্পরিক গভীর আত্মীয়তার বন্ধন রচিত হয়।বিবাহ তাদের সমাজে কোনো বাহ্য আরোপিত অসাড় অনড় অপরিত্যাজ্য প্রথামাত্র নয়। কোনো কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক বিবর্ণ হলে কিম্বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারোর মৃত্যু হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিধি অনুসরণ করে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা তাদের মুক্ত জীবনস্রোতকে রুদ্ধ করে না।তাদের স্বভাবমুক্ত চেতনায় এভাবেই ঘটে যায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন।বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ওরাওঁ জনজাতির বিবাহের নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমরা তাদের জাতিসত্তার সাথে জড়িত বিশ্বাস ও সংস্কারের স্বরূপটি ধরার চেষ্টা করব। এখন ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সন্ধান করে প্রাপ্ত ওরাওঁ জনজাতির বিবাহানুষ্ঠানের প্রথা ও পর্যায়ক্রমিক নিয়মাচারগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

পাত্রী দেখা থেকে পাকা কথা

বিবাহের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওরাওঁ সমাজে 'আগুয়া' বা ঘটক প্রথা বহু প্রাচীন।প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতেও বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্বাচনে ঘটক প্রথার উল্লেখ মেলে।সাধারণত,কোনো গ্রামের কন্যা পছন্দ হলে পাত্রের পিতা বা পরিবার তখনই সরাসরি পাত্রীর পিতা বা পরিবারের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেন না কারণ তা তাদের সমাজের প্রথাবিরোধী।এর জন্য গ্রামের 'খামারিপূজা' অবধি অপেক্ষা করাই নিয়ম।পৌষমাসে ফসল ঘরে ওঠার পরে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের দিন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের

কথা ভেবেই বিবাহের কথাবার্তার জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত মনে করে ওরাওঁ জনজাতি।এইদিন পাত্রের পিতা গ্রামের 'দশজনা'কে(গণ্যমান্য ব্যক্তি)ফসল বা পশুর প্রতীকে ইঙ্গিতের দ্বারা পাত্রী পছন্দের বিষয়টি অবগত করে।যেমন- 'অমুকের বাড়িতে দেখলাম একটা মিষ্টি কুমড়ো হয়েছে। ওটা আমার খুব পছন্দ।এখন গ্রামের 'দশজনা'র সম্মতি থাকলে ওই কুমড়োটা আমার ঘরে নেব।' এই প্রস্তাব শুনে গ্রামের দশজনা পাত্রীর পিতার কাছে খবরটা জানায় এবং তিনি রাজি থাকলে একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে উভয়পক্ষের কাছেই মতামত জানতে চাওয়া হয়।দশজনার সম্মতি পেয়ে তাঁরা নিজেদের সম্মতি জানান এবং উভয়পক্ষের সুবিধানুযায়ী আশীর্বাদের দিন ধার্য করেন।বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী পারস্পরিক সাক্ষাতের প্রথা ওরাওঁ সমাজে নেই।

নেওতা

ওরাওঁ উপজাতির মধ্যে বিবাহ তথা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমন্ত্রণ বা নেওতা দেবার একটি বিশেষ রীতি রয়েছে। কলাপাতার উপর একটি পচানি বা হাঁড়িয়াপূর্ণ মাটির হাঁড়ি নিয়ে তাতে আম্রপল্লব সিক্ত করে গ্রামের প্রতিটি গৃহের প্রধান দরজায় গুঁজে দেওয়া হয়। সেইসময় গৃহস্থ ব্যক্তি বাড়ির বাইরে থাকলেও হাঁড়িয়াসিক্ত আম্রপল্লব দেখেই অনুমান করে নেন যে গ্রামে কোনো শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা হতে চলেছে।এই প্রথাকে বলা হয় 'লোটাকির্দানা'।'পচানি' বা 'হাঁড়িয়া' আদিবাসী সমাজে নিছক মাদকসামগ্রীমাত্র নয়,ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে এর অনিবার্য প্রয়োগ একে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। আধুনিককালে অবশ্য পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের চল হয়েছে তবে প্রাচীন প্রথাটিও গ্রামীণ সমাজে সমভাবে আদৃত।

আশীর্বাদ

ওরাওঁ সমাজে বিবাহের সাতদিন, পনেরো দিন একমাস আগে আশীর্বাদের দিন ধার্য হয়। আশীর্বাদ প্রথমে ছেলের গৃহে অনুষ্ঠিত হলেও কন্যার গৃহেই আশীর্বাদের অধিকাংশ নিয়মরীতি পালিত হয়। পাত্রপক্ষ ভোরবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বেই কন্যার গৃহে উপস্থিত হয়। গ্রামের দুরত্ব বেশি হলে পূর্বদিন রাতেই কন্যার গ্রামেই কোনো স্বজনগৃহে আশ্রয় নিয়ে পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে কন্যাগৃহে পৌঁছায় পাত্রপক্ষ।বাড়ির মেয়েরা বরপক্ষের সকলকে সর্ষের তেল মাখিয়ে পা ধুইয়ে সেই জল গৃহের মাচায় ফেলে(বিবাহের মত শুভ অনুস্থানে যেকোনো ধরণের অশুভ শক্তির প্রভাব এড়ানোর বিশ্বাস এক্ষেত্রে কার্যকর)। বিনিময়ে কুটুমরাও তাদের টাকাপয়সা দেয়। এই প্রথাকে বলা হয় 'হেড্ডেআম্মি'। পাত্রপক্ষকে সযত্নে বসার ব্যবস্থা করে তাঁরা পাত্রপক্ষকে নমস্কার,প্রণাম, কোলাকুলির দ্বারা সৌজন্য বিনিময় করে। জলখাবারের পর্ব সমাপ্তির পর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। পাশাপাশি দুটি বড় কাঁসার থালায় (পূর্বে ডালিতে রাখা হত) একটিতে একছড়া কলা, ধান, দূর্বা, মেটেসিঁদুর,হলুদ,ফুল,আতপ চাল,দুটি প্রদীপ ও অপরটিতে মিষ্টি দই,সন্দেশ ও জলের গ্লাস রাখা হয়। মাথায় ছত্র ধরে কন্যাকে আশীর্বাদের স্থানে আনেন মাতৃসমা কোনো মহিলা, কন্যার সামনে রাখা থাকে আম্রশাখা সিঞ্চিত জলপূর্ণ

ঘট। আদিম জনবিশ্বাসে জলপূর্ণ ঘট গর্ভবতী নারীর প্রতীক,fertility cult এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। আম্রশাখা দ্বারা জলসিঞ্চিত করে সম্মুখস্থ থালাদুটির সামগ্রী দিয়ে, টাকাপয়সা, সোনারূপা দিয়ে কন্যাকে আশীর্বাদ করেন বরপক্ষের লোকজন। ওরা ওঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর পার্শ্ববর্তী হিন্দু বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব এখানে অস্বীকার করার উপায় নেই।আবার,মাছ,কলার ছড়া, ধান, জলপূর্ণ ঘট ইত্যাদির ব্যবহার উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা (fertility cult) ধারণার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

নাগপুর যাত্রা

ওরাওঁ সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য শর্ত হল 'নাগপুরযাত্রা' এবং 'সমধিমিলন'। 'মুণ্ডা' বিবাহেও সামান্য পরিবর্তিত রূপে তুলে ধরা হয় নাগপুর প্রসঙ্গ।এইসমস্ত জনজাতির আদি বাসস্থান,অতীত জীবন ও পূর্বপুরুষের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তথা কর্তব্যরক্ষার সংকল্প এইসমস্ত আচার অনুষ্ঠানে প্রতিফলিত। ওরাওঁ জনজাতির বিশ্বাস যে তাদের উৎপত্তিস্থল ও পূর্বপুরুষদের আদিবাসভুমি নাগপুরে।বিবাহের সঙ্গে যেহেতু সান্তান উৎপাদন তথা বংশবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে সেইকারণে অনিবার্যভাবে চলে আসে তাদের পূর্বপুরুষ, গোত্র ও আদিবাসভুমির প্রসঙ্গ। পূর্বে উভয়পক্ষের লোকজন গ্রামের মোড়লসহ নাগপুরে গিয়ে উভয়ের গোত্র, সৃষ্টিদেবতা, গৃহদেবতার নাম পরিচয় জানার পর সেখানেই কথা পাকা বলে আসতেন। বর্তমানে অর্থাভাব ও সময়াভাবের জন্য তারা সশরীরে নাগপুর না গিয়ে বাড়ির দক্ষিণদিকের (যেদিকে নাগপুর অবস্থিত) একটি স্থানকে নাগপুর কল্পনা করে সেখানে যাবার অভিনয় করেন। সেখানেই সমধিমিলনের অভিনয় করে শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করা হয়। সাধারণত আশীর্বাদের দিন উভয়পক্ষ থেকে দুজন বা তিনজন করে অভিভাবক, একজন মোড়ল বাড়ি থেকে নাগপুরের উদ্দেশে যেতেন। মোড়লের হাতে থাকে একটি পচানিপূর্ণ মাটির কলসি, ছয়টি আম্রপল্লব। নাগপুর পৌঁছে মোড়ল বসেন দক্ষিণে, তাঁর সামনে মুখোমুখি উভয়পক্ষের অভিভাবক, সম্মুখে শায়িত তিনটি আম্রপল্লব। অবশিষ্ট তিনটি পচানিতে সিক্ত করে সম্মুখস্থ পল্লবগুলিতে ছিটিয়ে পাশে রাখা হয়। এটি আসলে গৃহদেবতা, গোত্র ও পূর্বপুরুষ পুজা। পাত্রপক্ষের অভিভাবক তাঁর শেষ পাতাটি হাতে নিয়ে কন্যাপক্ষের গোত্র, গৃহদেবতার পরিচয় জানতে চাইলে কন্যাপক্ষের অভিভাবক উত্তরদান করে অনুরূপ প্রশ্ন রাখেন বরপক্ষের কাছে।সেইসময় নিজের এবং গৃহদেবতার নাম নিয়ে পাশাপাশি রাখা পল্লবগুলির ওপর দিয়ে হাতের পল্লবটি বন্ধনের ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে মন্ত্রের মত উচ্চারণ করেন-'জানাম জানাম সি সাগানানা লাগদান, লোহাগি বান্ধান ছুটরো ছুটরো, লেকিন চামড়া সি বান্ধান মালা ছুটরো।' এটি আসলে শপথবাক্য যার অর্থ-'জন্মজন্মান্তরের, যুগযুগান্তের সম্পর্ক গড়ে তুললাম,লোহার বন্ধন ভেঙ্গে যাবে, তবু চামড়ার বন্ধন টুটবে না।' এরপর মোড়ল নিজের তিনটি আম্রপল্লব শায়িত করে অপর তিনটি পল্লব হাতে নিয়ে উভয়পক্ষের গোত্র ও

গৃহদেবতার পরিচয় জেনে উভয়পক্ষের সম্মুখস্থ বারোটি আম্রপল্লবের ওপর বন্ধনের ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে বলেন-'নিঙ্গায় গোতরাং তেইঙ্গা' অর্থাৎ তোমার গোত্র পরিচয় দাও। তারপর উভয়ের গোত্র ও গৃহদেবতার নামোচ্চারণ করে গোত্র মিলনের কথা বলেন। যেমন- 'কুজুর (গোত্র)আসমান(গৃহদেবতা) টোপ্পো (গোত্র)টুনপিডি (গৃহদেবতা)জোড়শুধুই দুতিচান্দি যুগ যুগ সাগানানা লাগদান, ইন্নাবাকি সাগানানা লাগদান,যা জানাম জানাম যুগ যুগ কারনে যুগ যুগ সাগানানা লাগদান'।অর্থাৎ যুগযুগ ধরে আমরা সম্পর্ক গড়ে তুললাম, আজ আমরা সম্পর্ক স্থাপন করলাম।জন্মজন্মান্তরের জন্য যুগযুগান্তের সম্পর্ক গড়লাম।বলাবাহুল্য, এই সম্পর্ক শুধুই দুটি নরনারীর মধ্যে সীমায়িত নয়, দুটি গোত্রের, গোত্রমিলনই সমস্ত ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু।গোত্রমিলনের শেষে সকলে সম্মিলিত হয়ে হাঁড়িয়া পান করে নিম্নলিখিত গানটি গায়-

নাগপুর ভায়া রে নাগপুর ভায়া রে
আয়োরো বাবা রাহনালেখা লাগগি
গিয়ানুপুরু আয়ো রে
নাগপুর ভায়া রে নাগপুর ভায়া রে
আয়োরো বাবা মাললা আননে লাগগি
নাগপুর ভায়া রে নাগপুর ভায়া রে

অর্থাৎ, নাগপুর এসে ভাইরে,বাবা-মা জীবিত থাকাকালীন যেমন ছিল তেমনি লাগছে। নাগপুরের ভাই রে,আজ তো আর বাবা মা নেই, বাড়িঘর তাই অন্যরকম লাগছে। একদিকে বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে সাময়িকভাবে ফিরে পাবার আনন্দ,অন্যদিকে চিরবিচ্ছেদের বেদনা,দুই ভিন্ন অনুভুতির বৈপরীত্য বা contrast গানটিকে এক অনন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। এভাবেই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনন্ত প্রবহমান পটভূমিতে 'বিবাহ'প্রথাকে স্থাপন করেছে এই বিশিষ্ট আদিবাসী সমাজ।

সিঁদুর-তেলে গোত্রমিলন

গোত্রমিলন, বেহাই-মিলন বা সমধি-মিলনের সূত্রপাত ঘটেছিল 'নাগপুর যাত্রা'র মাধ্যমে। গৃহে ফিরে আসার পর তারই আরও বিচিত্র প্রতীকী আচার অনুষ্ঠিত হতে দেখি। গৃহপ্রাঙ্গণে বড়ো একটি খেজুর পাতার চাটাইতে বসে উভয়পক্ষের একজন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তাদের সম্মুখে পৃথকভাবে রাখা থাকে পচানিপূর্ণ গ্লাস, ভাঁড়ে সরষের তেল ও লাল রক্তবর্ণ সিঁদুর। উভয়ে নিজ নিজ ভাঁড় থেকে সরষের তেল নিয়ে উপর-নীচ ও পাশাপাশি তিনটি করে মোট নয়টি ফোঁটা দিয়ে সিঁদুর ও পুনরায় সর্ষের তেলের ফোঁটা দেন। তিনবার বা পাঁচবার পুনরাবৃত্তির পর নিজ নিজ গ্লাস থেকে পচানি ঢালে সেই ফোঁটার ওপর। বরপক্ষের অভিভাবক মাথায় বাঁধা গামছার খুঁট দিয়ে প্রথমে নিজের ও পরে কন্যাপক্ষের ফোঁটাগুলি পচানির রসে মুছে দেন। গ্লাসের পচানি উভয়ে ঢালা উপুড় করে মিশিয়ে কিছুটা ফোঁটায় নিবেদন করে নিজেরা পান করেন। শেষে তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে ডান পা'খানি এগিয়ে এনে পরস্পরের পায়ের পাতা দুটি চেপে রেখে

বিশেষ ভঙ্গিতে আলিঙ্গন করেন। উপস্থিত সমস্ত কুটুমকে নমস্কার বা প্রণাম জানিয়ে সৌজন্য বিনিময় করেন। গোত্রমিলনের এইসমস্ত প্রতীকী আচার-অনুষ্ঠানগুলি অর্থাৎ নাগপুর যাত্রার অভিনয়, উভয়পক্ষের সম্মুখস্থ আম্রপল্লব এলোমেলো করে দেওয়া, তেল সিঁদুরের ফোঁটা মুছে দেওয়া ,দুই গ্লাসের পচানি ঢালা-উপুড় করে খাওয়া-এই সমস্ত আচরণগুলি নিছক আনন্দপূর্ণ সময় কাটানো নয়, এগুলির মধ্যে রয়েছে বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা সাদৃশ্যমূলক জাদু বিশ্বাস বা Like produces like এর ধারণা। তেল ও সিঁদুর পুরুষ ও নারীর যৌনতার প্রতীক। এই দুইয়ের মিলন পাত্রপাত্রীর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তিপূর্ণ দিনগুলিকে যেমন নির্দেশ করে তেমনি বংশবৃদ্ধির দ্বারা দুই গোত্রের মিলনকেও সুচিত করে বলে তাদের বিশ্বাস।

তৈলমর্দনে সমধি মিলন

এই পর্বে একটি বড়ো খেজুরের চাটাইইয়ের উপর আরেকটি সরু লম্বা দুই ভাঁজের চাটাই বিছানো হয়। তাতে বসে উভয়পক্ষের জামাই বা অনুরূপ লঘু সম্পর্কিত ব্যক্তি।উভয়ের পাশে একভাঁড় করে সরষের তেল।প্রথমে বরের জামাইবাবু উঠে দাঁড়িয়ে কন্যার জামাইবাবুকে, তারপর কন্যার জামাইবাবু বরের জামাইবাবুকে আপাদমস্তক তৈলমর্দন করেন। পর্যায়ক্রমে তিনবার এই ক্রিয়াটি সম্পাদনের পরে দুই গ্লাস পচানি ঢালা উপুড় করে মিশিয়ে পান করেন। এইভাবে নানাবিধ প্রাচীন পরম্পরাবাহিত আচার পালনের দ্বারা হাসি-ঠাট্টা-আনন্দের মধ্য দিয়ে দুটি ভিন্ন গোত্রের মানুষ কি চমৎকার ভাবেই না একান্তচিত্তে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হতে চাইছে, কায়মনোবাক্যে মিলনের সেই অন্তরঙ্গ সুর তাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপে কত সহজে স্বতঃস্ফূর্ততায় প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, তা শুধুই অনুভুতিসাপেক্ষ। ‘কোরা’,‘মুণ্ডা’ প্রভৃতি আদিবাসী সমাজেও সমধিমিলন প্রথার স্বতন্ত্র আচার অনুষ্ঠান বিবাহের অপরিহার্য নিয়ম হিসাবে পালিত হয়। সমধি মিলনের পর একটি জ্বলন্ত কাস্তেধারী (কাস্তের গায়ে সলতে জড়িয়ে সরষে তেলে সিঞ্চিত) ব্যক্তি এগিয়ে আসে, তার পিছনে থাকে ‘কানিয়া’ বা কন্যা। প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত খেজুর পাতার চাটাইতে কন্যার পাশেই সে উপবেশন করে, সম্মুখে রাখা থাকে এক ভাঁড় সরষের তেল। কন্যার ক্রোড়ে থাকে একটি ডালা কিম্বা থালা, তাতে বিড়ি, দিয়াশলাই, পয়সা,ফুল থাকে। বরপক্ষের অভিভাবকরা কন্যাকে আশীর্বাদ করে ঐ থালায় টাকাপয়সা দেয়, বিড়ি দিয়াশলাই নেয় কেউ কেউ। প্রতিবার আশীর্বাদের সময় পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিটি কাস্তেতে তৈল সংযোগ করে কারণ অগ্নিকে সাক্ষী রেখেই এই আশীর্বাদ, তাই কোনোভাবে অগ্নি নির্বাপিত হওয়া অমঙ্গলের সূচক।এছাড়া আশীর্বাদের মত মাঙ্গলিক মুহূর্তে যেকোনো অপদেবতার কুপ্রভাব এড়ানোর জন্যও এই অগ্নির উপস্থিতি। আশীর্বাদান্তে কন্যা দান নিয়ে অগ্নিধারী ব্যক্তিটির সঙ্গে উঠে যায়।

পণপ্রথা

ওরাওঁ জনজাতির মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যাপণই প্রচলিত। কন্যাকে আশীর্বাদের সময় পাত্রের পিতা বা ঠাকুরদা ‘সোয়া চোদ্দ টাকা’ অর্থাৎ চোদ্দ টাকা পঁচিশ পয়সা পণ স্বরূপ

দেন।পরে তিনি এর সঙ্গে অন্যান্য সামগ্রী বা টাকাপয়সা দিতে পারেন। তবে এই সুনির্দিষ্ট অর্থমূল্যে কন্যাক্রয় বাধ্যতামূলক বিধি। এর আগে অবশ্য বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ নিজেদের দাবি নিয়ে মুখোমুখি বসেন।মধ্যিখানে একটি থালায় থাকে শ্বেত বস্ত্রখণ্ড।ওই বস্ত্রকে পাঁচটি সাতটি বা তার বেশী টুকরো করে কন্যাপক্ষ পাঠায় বরপক্ষের কাছে।যতগুলো টুকরো ততগুলো শাড়ির দাবি।বরপক্ষ কতকগুলি টুকরো সরিয়ে কন্যাপক্ষের কাছে পাঠিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে অতগুলো শাড়িই তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব।কন্যাপক্ষের মেয়েরা ওই টুকরোগুলিকে আরও ছোটো টুকরো করে তাদের দাবির পরিমাণ বাড়িয়ে চলে।পাত্রপক্ষ পুনরায় কমায়।এইভাবে খেলা-হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সৌজন্যময় দরকষাকষি চলে।একে বলা হয় ‘কয়খাণ্ডকিচরি’ অর্থাৎ কয়খানা শাড়ি লাগবে।বর্তমানে বিবাহে নানাপ্রকার শৌখিন শাড়ি বিনিময়ের প্রচলন হয়েছে, পূর্বে শুধুই লালপেড়ে সাদা শাড়ি দেওয়ার রীতি ছিল। শাড়ি ব্যতীত কন্যার ভাইয়ের জন্য পাঠানো হত ‘শারাধুতি’,এখনও এর প্রচলন আছে।

মারোয়া পূজা

বিবাহের পূর্ববর্তী দিন ‘দুলহা’ গৃহে মারোয়া নির্মাণ করে পূজা অনুষ্ঠিত হয়।চারদিকে কলাগাছ, বাঁশের দণ্ড ও চিরচিট্টী লতা পুঁতে প্রস্তুত করা হয় মারোয়ার খুঁটি। ওপরে ধানের কাঁড়ি,খড় বিছিয়ে মধ্যে মধ্যে লাল লঙ্কা দিয়ে নির্মিত হয় মারোয়ার ছাউনি। লাল লঙ্কা দেবার কারণ হল, অপদেবতার বা শত্রুর কুনজর থেকে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে রক্ষা করার চিরন্তন সংস্কার। মারোয়ার ভিতর মাটিতে রাখা হয় মাটির দুটি কলসি।ধাতু নয়, মাটিই তাদের কাছে অধিকতর পবিত্র। কলসির মধ্যে আতপচাল, ত্রিমুখী বা পঞ্চমুখী হলুদ দিয়ে পূর্ণ করে ওপরে ধান দেওয়া হয়। তার উপর বসানো হয় কলাই, লবণ,সর্ষের তেল ও সলতেযুক্ত পঞ্চপ্রদীপ। এই প্রথাটি মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বিবাহেও লক্ষিত হয়।একটি কলসির পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে মণ্ডপ পূজা দেওয়া হয়।গোত্রের নিয়ম অনুযায়ী মণ্ডপ পূজায় লাল মুরগা কিম্বা পাঁঠা বলি দেবার রেওয়াজ আছে। মারোয়ার কাছেই ‘বলি’ হয়।মণ্ডপ পূজায় গৃহদেবতা ও পূর্বপুরুষের নামে পূজা হয়।পূজান্তে ‘গারাম থানে’(সাধারণত সুনির্দিষ্ট কোনো পিপুল বা বটগাছের নিচে)মহাসমারোহে আত্মীয় প্রতিবেশীসহ পাত্র যায় পূজা দিতে।সঙ্গে থাকে দ্বিতীয় কলসিটি, এছাড়া ধূপ, সিঁদুর, ফুল ইত্যাদি। এছাড়া থাকে একজন জ্বলন্ত কাস্তেধারী ব্যক্তি। সাধারণত সন্ধ্যাকালে গারাম্ থানে যাওয়া হয়, দুর্ভেদ্য অন্ধকারে গ্রাম্যপথ চলতে সাহায্য করা ছাড়াও রাতে কোনো অপদেবতা, অশুভ শক্তির কুপ্রভাব এড়াতেই জ্বলন্ত কাস্তের ব্যবস্থা। থানে গারাম দেবতার পূজা দিয়ে আশীর্বাদ চায় নির্বিঘ্নে বিবাহান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তনের। পরদিন সন্ধ্যায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে, গারাম থানে আশীর্বাদ নিয়ে বিবাহের জন্য যখন রওনা হয়,তখন ‘দুলহা’র হাতে থাকে লোহার কাজললতা। ‘কানিয়া’র গৃহে বিবাহের দিন সকালে একইভাবে মারোয়া নির্মাণ,কলসি প্রস্তুত করে রাখা হয়।বরপক্ষ সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছানোর পরেই শুরু হয় মণ্ডপপূজা, কলসির

পঞ্চপ্রদীপ তখনই প্রজ্বলন করা হয়।'কানিয়া' নদীতে স্নান করে গারাম থানে কলসি, ধূপ, সিঁদুরসহ পূজা দিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে আসে।প্রকৃতি সংলগ্ন আদিবাসী জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে প্রকৃতির প্রতি অন্তরঙ্গতার অনুভূতি।

'বালকালাগওয়ানা'- গায়ে হলুদ এবং সিঁদুরদান

মারোয়া পূজা ও গারামথানে পূজা সমাপ্ত হলে 'আগুয়া' বা ঘটক উভয়পক্ষকে মারোয়ায় আহ্বান জানায়। কানিয়া ও দুলহার সঙ্গে দু'জন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি থাকেন 'মালিকানা' করার জন্য।বিবাহ অনুষ্ঠানে সাধারণত দুলহার মা বাবা যান না।যারা বিবাহের নিয়ম রীতি জানে তারাই যায়। ওরাওঁ জনজাতির বিবাহে তিথি নক্ষত্র বিচার করে লগ্নবাঁধার চল নেই। সাধারণত বর-কনের জন্মবারে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।সেইজন্য আগুয়া উভয়ের জন্মবার জেনে নিয়ে বিয়ের উপযুক্ত লগ্ন নির্ধারণ করেন।বিয়ের দিনটিতেই যদি বরবধু কারও জন্ম 'বার' হয় তবে নাচ-গান-আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত করে রাত বারোটার পরে সিঁদুরদান সম্পন্ন করা হয়।তার আগে মারোয়াতে তিনবার তিনটি করে বাটা হলুদের গুলি কানিয়া ও দুলহাকে মাখানো হয়। কন্যার বৌদি কিংবা দিদি তিনমুখী বা পাঁচমুখী হলুদ বেটে রাখে শিলের উলটো পিঠে। কন্যার সিঁদুরদান সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে শিলপাটার কাছেই মাথায় কাপড় আবৃত করে বসে থাকতে হয়।সেখান থেকে বিয়ে সম্পূর্ণ হওয়ার আগে উঠে যাওয়া নিষিদ্ধ।নৃত্যগীতাদির পর লগ্নক্ষণ উপস্থিত হলে একবারই হয় 'সিঁদুরদান'।এরপর বরবধূকে পৃথক করে বসানো হয়। ওরাওঁ সম্প্রদায়ের বিবাহে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও সংস্কৃত শ্লোক নিষ্প্রয়োজন।গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বিবাহের সর্বময় কর্তা।অবশ্য, বিবাহের নিয়ম পালনে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটলে বংশেরই কোনো ব্যক্তির মধ্যে 'নামান'হয়, অর্থাৎ দেবতার ভর নামে।সেই ভরণপ্রাপ্ত ব্যক্তিই পূজায় ঘটিত ভ্রান্তিগুলি জানিয়ে দেন।

দান

সারারাত নৃত্যগীতসহ আনন্দপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠান চলল, আত্মীয়-স্বজন সকলেই পরম কৌতূহলে দেখল 'বেনজা', সেইসাথে চলল ভরপুর খাওয়াদাওয়া।উপহার দেবার প্রথা কিন্তু বিয়ের পরদিন সকালে। একে বলা হয় 'দান'।খেজুরপাতার চাটাইতে বসিয়ে সদ্যবিবাহিত বরবধূকে তাদের দিদি বা বৌদিরা সরষের তেল মাখায়।একটি থালায় বা ডালায় আতপচাল, দূর্বাঘাস, ও তুলসীপাতা রাখা হয় বরণের জন্য।আত্মীয়-প্রতিবেশী কানিয়া-দুলহাকে বরণ করে 'দান' বা উপহার সামগ্রী দেয়।দান ক্রিয়া সমাপ্ত হলে মোড়ল দুইপক্ষের অভিভাবকদের নিয়ে হিসাব করেন(লিখিত রাখা হয় কে কী উপহার দিল)কন্যা তার সঙ্গে কোনো কোনো দানসামগ্রী নিয়ে যায় স্বামীগৃহে। কোনো কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে নির্বিবাদে সেগুলি ফেরত দেওয়াই নিয়ম।

'দান' এবং দানের 'হিসাব' পর্ব সমাধা হলে বিকেল বা সন্ধ্যায় কন্যা পতিগৃহে যাত্রা করে।সেখানে পৌঁছে নদীতে স্নান সেরে নেবার পর একইভাবে সেখানেও বসে

'দান'। পতিগৃহে পৌঁছতে বিলম্ব হলে পরের দিন দানের আয়োজন করা হয়। সকালে স্নানের পর তেল মাখিয়ে বরণ করে 'দান' সভা বসে। দানের শেষে এখানেও যথারীতি মোড়লের সহায়তায় রাখা হয় দানের হিসাব। এতে কোনো আত্মীয়- প্রতিবেশী কী দিল তার হিসাব রাখা হয়, কারন তাদের অনুষ্ঠানেও অনুরূপ দান দেওয়া কর্তব্য বলেই বিবেচিত হয়।

বিবাহ উপলক্ষে 'বলি'

ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে গোত্রভেদে আচার-নিয়ম-রীতি পৃথক।বিবাহ উপলক্ষে 'বলি'প্রথা যেসমস্ত গোত্রে রয়েছে তাদেরও 'বলি'র সময় ও প্রকৃতিতে রয়েছে পার্থক্য। কোনো কোনো গোত্রে বিবাহের পূর্বে পাঁঠা বলি দিয়ে 'রক্ত'দর্শন করেই বাড়ি থেকে বিবাহ যাত্রা করা নিয়ম। নববধূ নিয়ে প্রত্যাবর্তনের পর সেই মাংস রেঁধে খাওয়া হয়। মারোয়া বাঁধার পর সকালে বা রাতে মারোয়ার পাশে বলি দেওয়া কারো কারো গোত্রে নিয়ম।কোনো কোনো গোত্রে দেখা যায়, নববধূকে নিয়ে গৃহে ফেরার সময় সদ্য দেওয়া 'বলি'র রক্ত দেখে ও সেই রক্ত পায়ে মাড়িয়ে বাড়ি ঢুকতে হয়। তারপর রন্ধন করা হয় বলির মাংস।তবে কন্যার গৃহে সাধারণত বলি হয় না, বরের গৃহেই হয়।বিবাহ পরবর্তী যৌনসম্পর্কের পূর্বাভাস বলির লাল শোণিত ধারার প্রতীকে ঘোষিত হয়।

কনের পিতৃগৃহে যাত্রা ও পতিগৃহে পুনরাগমন

প্রথমবার কন্যা যখন পতিগৃহে আসে (বিবাহের পরের দিন) সেইসময় তার সঙ্গে থাকে দু'চারজন বান্ধবী।সেইদিন সন্ধ্যায় বা পরদিন সকালে দানের পর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকে গ্রামবাসী- আত্মীয়-কুটুম্বদের জন্য।সন্ধ্যায় আসে কনের বাড়ির লোকজন, দাদু-দিদা-বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা। রাত্রে ভোজনের পর সেখানেই অবস্থান করে পরদিন সকালে নববধূকে সঙ্গে নিয়ে নিজ গ্রামে ফেরে কন্যাপক্ষ। কয়েক্ মাস পরে বা কিছুদিন পরে কোনো বিশেষ পরবের সময়, যেমন- খামারিপূজা, গোয়ালপূজা বা যাত্রাপূজার সময় নববধূকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় পতিগৃহে।'দুলহা'র পরিবর্তে তার পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিই নববধূকে তার পিতৃগৃহ থেকে ফেরত আনতে যায়। বিবাহের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে আত্মীয়-প্রতিবেশী নিজগৃহে চলে যাবার পর উভয় গৃহেই ডাণ্ডাখাণ্ডা পূজার মাধ্যমে গৃহশুদ্ধি করা হয়।

সাগাই ও উটঠা

'বেনজা'র পর দ্বিতীয়বার বিবাহ অর্থাৎ পুনর্বিবাহকেই বলে 'সাগাই'।বেনজার পর যেকোনো কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে গেলে গ্রামসভায় মোড়লসহ, গণ্যমান্য দশজনার সালিশির পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে পুনরায় বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।ওরাওঁ সমাজে একেই বলে 'সাগাই'। আবার কোনো বিধবা বা বিপত্নীকের বিবাহকেও বলা হয় 'সাগাই'।'সাগাই'তে 'বেনজা'র মত জাঁকজমকপূর্ণ বিচিত্রানুষ্ঠান হয় না, অর্থাৎ এইধরনের বিবাহে আচার-নিয়মাবলী অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এতে কনেকে শুধু বরণ করে আনা হয়,সিঁদুরদানও হয়। গ্রামের কয়েকজন

গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকেন সাক্ষী হিসাবে। 'বেনজা' ও 'সাগাই' ছাড়াও আরেক ধরনের বিবাহ ওরাওঁ সমাজে প্রচলিত, সেটি হল 'উটঠা'।'রাক্ষসবিবাহের' সঙ্গে আপাত সাদৃশ্যের ক্ষীণ সূত্র পাওয়া গেলেও ওরাওঁদের 'উটঠা' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ছেলেপক্ষ যদি এমন কোনো মেয়েকে বিবাহের জন্য নির্বাচন করে যার পিতার সাধ্য নেই কন্যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ দেবার, শুধু সেই বিশেষ ক্ষেত্রেই ছেলেপক্ষ কন্যাকে নিজেদের বাড়িতে এনে সেখানেই বিয়ের যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করেন। এক্ষেত্রে ভোজনেরও ব্যবস্থা করা হয় পাত্রপক্ষের একক খরচে।

ওরাওঁ জনজাতির মধ্যে 'বিবাহ'কে কেন্দ্র করে যেসমস্ত প্রাচীন প্রথা-বিশ্বাস-সংস্কারের ধারা পারিপার্শ্বিক যান্ত্রিক জীবন ও সভ্যতার মাঝেও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রবহমান তা এই জনজাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও মনন-চিন্তনগত জগতটিকে খুব স্পষ্টরূপে আমাদের সামনে তুলে ধরে।আপন গোষ্ঠী ও সামাজিক ঐতিহ্যের প্রতি তাদের অটুট শ্রদ্ধা ও আস্থা তথাকথিত সভ্য সমাজের কাছে শিক্ষণীয়।বিবাহের আচারগুলির মধ্যে দিয়ে আদিবাসী সমাজের বহু প্রাচীন বিশ্বাস উঠে এসেছে(বিশেষ করে সাদৃশ্যমূলক জাদু বিশ্বাস)। এছাড়া বিবাহকে ঘিরে ওরাওঁ সমাজে প্রচলিত অজস্র ট্যাবু, তাদের টোটেম বিশ্বাস, অপদেবতা- অশুভ শক্তির মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান থেকে দূরীভূত করার নানা প্রথা ইত্যাদি কীভাবে ধরা পড়েছে তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।তাদের বিবাহকেন্দ্রিক অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ রীতি ও প্রথার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া অতীতের ভাঙাচোরা প্রতিধ্বনি ও গূঢ় তাৎপর্যময় জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়। সর্বোপরি, আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং বাগাড়ম্বরের যুগে সমগ্র গোষ্ঠীসমাজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতার সম্পদকে গুরুত্ব দিয়ে ওরাওঁদের এই বিবাহানুষ্ঠানের সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক মূল্যের পাশাপাশি মানবিক মূল্যও অপরিসীম।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। সুর,অতুল ১৪১৯, ভারতের বিবাহের ইতিহাস, আনন্দ, কলকাতা।

২। ঘোষ,প্রদ্যোত ২০০৭, বাংলার জনজাতি (প্রথম খণ্ড),পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৩। Roy, Sarat Chandra 1972, Oraon Religion & Customs, Editions Indian,Calcutta.

৪। Risley, Herbert 1891,Ethnographic Glossary, Bengal Secretarial Press, Calcutta.

৫। Frazer, James George 1958, The Golden Bough : A Study in Magic and Religion, Macmillan, New York.

ক্ষেত্রসমীক্ষণ সহায়ক

১। শ্রীমন্ত ওরাওঁ,পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা।

২। জ্যোতিষ ওরাওঁ,ইংরেজবাজার ব্লক, মালদা।

৩। সুনীল এক্কা, চাঁচল ব্লক, মালদা।

৪। সোধিন্দ্রনাথ টোপ্পো ,রতুয়া-১ ব্লক, মালদা।

৫। রবীন্দ্রনাথ টোপ্পো , পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা।

৬। মালুয়া ওরাওঁ, ইংরেজবাজার ব্লক, মালদা।

প্রকাশিত গ্রন্থ:

১। লোকসংস্কৃতি ও সংস্কৃতির দর্পণে বাংলার মুখ, ২০১৪, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

২। আদিবাসী সংগীতঃ পটভূমি মালদা, ২০১৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

বৈষ্ণব-সাহিত্য সমালোচক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নৈপুণ্য বিচার

ইমরান আলি মুনশী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
বিবেকানন্দ কলেজ, মধ্যমগ্রাম

সারসংক্ষেপ : বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘকাল যাবৎ নানা প্রবন্ধাদি লেখা, গ্রন্থাদি রচনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর রচনারাজির কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি তাঁর সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' সংকলন গ্রন্থটি। এছাড়াও সম্পাদনা করেন- 'জ্ঞানদাসের পদাবলী', 'চণ্ডীদাস পদাবলী'। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচক হিসাবে রচনা করেন- 'পদাবলী পরিচয়', 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা' র মতো বহুমূল্যবান গ্রন্থ। এই সব গ্রন্থের মাধ্যমে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন অজানা তথ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি হলেন জ্ঞানদাস। রাধা-কৃষ্ণ-চৈতন্যকে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের আধার মেনে তাদের পরিধি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি বিশেষ বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনার ধারা নির্মাণ করেছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সূচক শব্দ : শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ , জ্ঞানদাস, খণ্ডকাব্য, কীর্তন, ব্যাঞ্জনা।

মূল আলোচনা :

মধ্যযুগের দীর্ঘ সময়পর্ব জুড়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত থাকলেও, বৈষ্ণব সাহিত্যের নিপুণ বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর সময় থেকে। বৈষ্ণব সমালোচনা সাহিত্যের সমৃদ্ধিকাল এই বিংশ শতাব্দী। এই সময় পর্বে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন অজানা তথ্যও পাঠকের সামনে উঠে এসেছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়য়ের কৃতিত্ব এই ব্যাপারে সন্দেহাতীত, তাঁর আবির্ভাবকালও এই সময়পর্বেই ঘটেছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের একনিষ্ঠ সমালোচক হিসেবে তাঁর নাম আজ একবিংশ শতাব্দীতে স্মরণ করার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য তিনি শুধু সমালোচকই নন, একাধিক বৈষ্ণব পদসংকলক হিসেবেও তাঁর নাম স্মরণযোগ্য। সংকলন গ্রন্থও আসলে একটি নিখুঁত সাহিত্য সমালোচনা হওয়ার দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে আবু সইয়দ আইয়ুব বলেছেন-

"কাব্যসংকলন কাব্য-সমালোচনারই অন্তর্ভুক্ত।"[১]

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বক্তব্যটিকে অবহেলা করার উপায় নেই। সংকলকের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বা নির্দিষ্ট কোন প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ কবিতাগুলিকেই তিনি তাঁর সংকলনে স্থান দেন। সংকলকের সেই দৃষ্টিভঙ্গি উক্ত কবিতাগুলির একটি সমালোচনা এবং অন্য কবিতার সাপেক্ষে সেই বাছাই করা কবিতাগুলি কেন স্বতন্ত্র— তাও পাঠক সেই সংকলন থেকে উপলব্ধি করতে পারেন। সময়-সমাজনীতি-রাজনীতি ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কবিতাগুলির গুরুত্বও আমরা সেই সংকলন থেকেই ধারণা করতে পারি। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধায়ের একাধিক সংকলন গ্রন্থগুলি আসলেই বৈষ্ণব সাহিত্যের সমালোচনার আকর স্বরূপ। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি পদ সংকলন গ্রন্থ হল 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থে কয়েকশো অপ্রধান পদকর্তার কয়েক হাজার পদের সংকলন রয়েছে। গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না, বিভিন্ন সময়পর্বে বিভিন্ন কবির আবির্ভাব ঘটেছে, বিশেষত চৈতন্যোত্তরকালে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই দেড়শো বছরের সময়কালে বিভিন্ন পর্ব জুড়ে অপ্রধান কবিদের আবির্ভাব ও তাঁদের পদ আমাদের বিভিন্ন স্তরের সময়ের অনুষঙ্গকে উপলব্ধি করায়। ফলত ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের প্রতিলিপিটি এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে এক নান্দনিক ভাবনার মধ্য দিয়ে। একইসঙ্গে ইতিহাস ও সাহিত্যের বিমিশ্র রূপে তৎকালীন সমাজকে চিনে নেবার সুযোগ করে দিয়েছে উক্ত সংকলন গ্রন্থটি। এখানে যদিও পাঠককে তার উপলব্ধি দিয়েই বুঝে নিতে হয়, কিন্তু উপলব্ধির প্রাকপরিসরটির নির্মাণের কৃতিত্ব অবশ্যই সংকলকের। তাঁর আর একটি পদ সংকলন গ্রন্থ 'জ্ঞানদাস পদাবলী', এখানে মূলত বিভিন্ন রসপর্যায় ধরে তিনি পদের সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশে তিনি জ্ঞানদাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জ্ঞানদাসের এক ভিন্ন পরিচয় উদ্ধার করেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতায় রোমান্টিক কবিগণ তাঁদের কাব্য-কবিতায় যে মানস সুন্দরীর কল্পনা করেছেন, সেই কল্পনারপ্রেরণা জ্ঞানদাস হতে পারে, তা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। জ্ঞানদাসের 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেওয়া গরজন' কবিতার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবি মানসীর অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি হিসেবে জ্ঞানদাসের নামই বারবার উচ্চারিত হয়। উপরিউক্ত ব্যাখ্যা থেকে তার একটি সুপরিণত যুক্তি হাজির করা যায়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও একথা মেনে নিয়েছেন, তাঁর মতেও জ্ঞানদাস বাংলা কাব্য সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি আরও জানিয়েছেন-

"জ্ঞানদাসের বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কয়েকটি কবিতা ভাবের গভীরতায়, রসের ব্যঞ্জনায়, ছন্দ-সৌন্দর্য্যে ও পদমাধুর্য্যে, মিলের সৌকুর্য্যে ও গঠন কারুকার্য্যে, অনুভূতির প্রখরতায় ও বাচংযমতায় প্রথম শ্রেণীর কবিতা হইয়াছে।.... আমার মনে হয়, কবির বাঙ্গালা ভাষায় রচিত পদে ভাবের আবেগে ভাষা যেন স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছে।"[২]

জ্ঞানদাস সম্পর্কে এমন নির্দিষ্ট উক্তি বৈষ্ণব সমালোচনা সাহিত্যে খুব কম পাওয়া যায়। প্রথম অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্টভাবে তিনি জ্ঞানদাসের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, অপরদিকে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কিছু ভাবব্যঞ্জক ভাবে তাঁর মতকে প্রকাশ করেছেন, এখানে তিনি যেন পাঠকেরও ভাবনাকে অবকাশ দিতে চেয়েছেন। তাঁর এহেন বিশ্লেষণ সমালোচক হিসেবে তাঁর দক্ষতাকে প্রতিপন্ন করে। বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তিভাবনার অন্যতম পন্থা কীর্তন গান। জ্ঞানদাস একটি বিশেষ ধারার কীর্তনের প্রচলন করেছিলেন বলে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য--

"প্রাচীন কীর্ত্তনীয়াগণের মুখে শুনিয়াছি, জ্ঞানদাস কান্দরার শ্যামকিশোরের পুত্র বদন, শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর এবং ময়নাডালের নৃসিংহ মিত্র ঠাকুরের সহায়তায় রাঢ়ের পুরাতন কীর্ত্তন ধারাকে খেতরীর গড়েরহাটী ধারা হইতে স্বাতন্ত্র্য দানে মনোহরসাহী নামে প্রচলিত করিয়াছিলেন।"[৩]

জ্ঞানদাসের এই কৃতিত্ব আমাদের কাছে একপ্রকার অজানা ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন অজানা তথ্য পরিবেশনে জ্ঞানদাসের বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন গ্রন্থ 'চণ্ডীদাস পদাবলী' ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস সমস্যার নিরসন ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। গ্রন্থটি চণ্ডীদাস বিষয়ক এক ঐতিহাসিক দলিল।

কীর্তন বিষয়ে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ নৈপুণ্যতা আমাদের চমকিত করে। উচ্চস্বরে ভগবানের নাম গানই কীর্তন আকারে প্রচলিত হয়ে এসেছে। কিন্তু বাংলায় তার ধরন কিছুটা আলাদা। একাধিক ব্যক্তি মিলে নির্দিষ্ট সুর তালে ভগবানের নাম গুণ লীলাত্ম যে গান বাংলায় তাই কীর্তন। এই কীর্তন দুটি ধারায় বিকাশ লাভ করেছে, নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিশেষত তাঁর গুণ সংক্রান্ত যে গীত তাই নামকীর্তন এবং রাধাকৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করে গীত লীলাকীর্তন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। যে সময়ে যে লীলা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে সেই লীলার গান গীত হয়। এই লীলা কীর্তন চৌষট্টি রসের গান বলে বিখ্যাত আছে।[৪] এই লীলাকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব পদাবলীর রসোপর্যায়গুলি তৈরি হয়েছে। এছাড়াও গড়েরহাটী ও মনোহরসাহী নামের প্রাচীন কীর্তনের ধারাগুলির উপরও তিনি বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করেছেন, যা সচরাচর বৈষ্ণব সাহিত্যের সমালোচনায় অধরা থেকে গেছে। মুর্শিদাবাদের নন্দকিশোর দাস ও কলকাতার রথীন্দ্রনাথ ঘোষ কীর্তনের এই প্রাচীন ধারাগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।[৫] কীর্তন সম্পর্কে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিপুণ ব্যাখ্যা পাঠকের কাছে কীর্তন গানকে সহজলভ্য করে তুলেছে-

"কীর্তনের সাজানো পালাগানগুলি এক একটি খণ্ডকাব্য। রসে, ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে ঝঙ্কারে, এক একটি পদ আপন মাধুর্য-মহিমায় আপনি উজ্জ্বল হইয়া আছে।... পালা গানের রস, ভাবের মর্ম উপলব্ধি করিতে হইবে। গানের ব্যাখ্যায় বা আখরে রসাভাস না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"[৬]

একইসঙ্গে কীর্তনের স্বরূপ নির্ণয় এবং তা পাঠ করার পন্থা নির্দেশ করার মধ্য দিয়ে তিনি কীর্তন সম্পর্কে আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনায় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ কৃতিত্ব, তিনি রাধা-কৃষ্ণ-চৈতন্যকে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের আধার মেনে তাদের পরিধি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি বিশেষ বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনার ধারা নির্মাণ করেছেন। তিনি কৃষ্ণ কথার গোড়া থেকে শুরু করেছেন, নারদের পরামর্শে ব্যাসদেব কৃষ্ণকথার প্রচার শুরু করেছেন। ব্যাসদেবের প্রতি নারদের পরামর্শ-

"কোন কোন পুরাণে বা মহাভারতে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছ সত্য। কিন্তু সুবিস্তৃতভাবে মাত্র কৃষ্ণলীলা আলোচনার জন্যই তো কোন বিশেষ পুরাণ রচনা করিলে না। তোমার নিজের তৃপ্তির জন্য এবং ত্রিলোকের কল্যাণ জন্য তুমি শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা কর।"[৭]

বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস বহু আলোচিত হলেও, শ্রীকৃষ্ণ লীলার ইতিহাস অপেক্ষাকৃত কম চর্চিত— একইসঙ্গে যার ঐতিহাসিক মর্যাদা রয়েছে, আবার অপরদিকে নান্দনিক গুরুত্বও রয়েছে। মহর্ষি নারদ কৃষ্ণ কথার মূল হোতা, তাই তার ইতিহাস সমান গুরুত্বপূর্ণ। নারদের তিন জন্মের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম জন্মে তিনি উপবহন নামে এক গান্ধর্বের জীবন যাপন করেন, অসৎ আচরণের জন্য পরজন্মে তপোবনে এক দাসী পুত্র রূপে জীবন যাপন করেন। এই তপোবনে সর্বদা ঋষি অনুষঙ্গে জীবন কাটানোর ফলে তাঁর মুক্তি লাভ ঘটে এবং হরিকথায় তাঁর রতি লাভ হয়। তারপরে তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন।[৮]দেবদত্ত বীণাযন্ত্রে হরিনাম সংকীর্তন তাঁর মূল বিধেয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় নারদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু নারদের মূল জীবনের সূত্র কোথাও বর্ণিত হয়নি। এখানে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক ভাবনা তাঁর দক্ষতাকেই প্রতিপন্ন করে।

বৈষ্ণব ধর্মে ভাবের মুখ্যত দুই ভেদ, যা স্বকীয়া ও পরকীয়া নামে অভিহিত হয়। পূর্ণ ভগবানের ত্রিশক্তির একটি হ্লাদিনী শক্তি, যার দ্বারা ভগবান স্বকীয়া বা পরকীয়া ভেদে আনন্দ আস্বাদন করেন। যদিও বৈষ্ণব ধর্মে পরকীয়া ভাবের স্থান অতি উচ্চে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই পরকীয়া তত্ত্বের একটি সাহিত্যিক যৌক্তিকতা নির্নাণ করেছেন। বৈষ্ণব ধর্মের মতন সাহিত্যেও ভাবের তিনটি রূপ- ব্যঞ্জনা, লক্ষণা ও অভিধা। যা শব্দের অভিধানগত ভাবকে বিমোচিত করে, তাই অভিধা, মুখ্য অর্থ বাধা প্রাপ্ত হলে সম্বন্ধযুক্ত অন্য ভাব প্রতীয়মান হলে তা লক্ষণা এবং এই সমস্ত ভাব বা অর্থ সমাপ্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত যে ভাবনুভূতি প্রতীয়মান হয়, সাহিত্যে তাই ব্যঞ্জনা রূপে চিহ্নিত হয়। পরকীয়া ভাব এই ব্যঞ্জনা ভাবের সমতুল্য বলে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বৈষ্ণব পদে রাধা-কৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের ভাবটি পাঠকের কাছে সাহিত্যের ব্যঞ্জনা রূপে ধরা দেয়, তাই বৈষ্ণব পদ এত সুমধুর ও রসবহুল। কারণ ব্যঞ্জনাই সাহিত্যের রসের আধার। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন-

"সাহিত্যে রসরূপের ব্যঞ্জনাই পরকীয়া ভাব। বৈষ্ণব সাহিত্য বুঝিতে হইলে ব্যঞ্জনার আশ্রিত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই।"[৯]

সেই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে পরকীয়া ভাবের অবস্থান ও গুরুত্ব একটি পরিপূর্ণ সাহিত্যিক যৌক্তিকতা খুঁজে পেল— এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণত মৌলিক। এর পূর্বে বারংবার পরকীয়া ভাবকে বৈষ্ণব ধর্মের আধারে বিশেষত রাধাকৃষ্ণের ভগবৎ স্বরূপের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রথম হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তার সাহিত্যিক ব্যাখ্যা দিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যকে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা তাঁর নান্দনিক নিপুণতার সাক্ষ্য বহন করে। বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি আধুনিক আবেদন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। তিনি আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে মনুষ্যত্বের অবমাননাকে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর উদ্ধৃতি গুরুত্বপূর্ণ-

"চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছি—একদিকে কাতারে কাতারে নর-নারী ধনীর দুয়ারে উচ্ছিষ্ট প্রত্যাশী, কঙ্কালসার, বুভুক্ষু। অন্যদিকে খ্যাতনামা ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ রাজবল্লভ, সুপরিচিত সমাজপতি, প্রেত পিশাচ ও রাক্ষসের দল সম্মিলিত ভাবে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিতেছে, মহামারীকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে।..... এই দূরবস্থা দূরীভূত করিতে হইবে। জগতের মধ্যে মানুষের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এইজন্য প্রয়োজন মানবতার সাধনা।"[১০]

মানবতার এই সাধনাতে পথ দেখাবে ভাগবতের আচরণ অর্থাৎ কৃষ্ণ কথা অর্থাৎ বৈষ্ণব সাধনা। বৈষ্ণব সাহিত্যের ব্যঞ্জনা রূপী রস সাধানার মধ্যে রয়েছে মানবমুখী জয়গান। বৈষ্ণব সাধনায় পরকীয়া ভাবের উপাসনার মধ্য দিয়ে মানবমনে রসের ব্যঞ্জনা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মে সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা লাভের মধ্য দিয়ে যেমন কৃষ্ণ প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হয়, সাহিত্যে তেমনি অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা ভাবের প্রতীতির দ্বারা কৃষ্ণকথার মাধ্যমে মননের পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাহিত্য যেন পারস্পরিক সহাবস্থান করে চলেছে। সমালোচকের এই ব্যাখ্যার নিপুণতা বৈষ্ণব সাহিত্যকে আধুনিক যুগে এসে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে বৈষ্ণব সাধনাই বা বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মূল ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির কেন্দ্রে পৌঁছানো সম্ভব। আমরা জানি একাধিক মুসলিম, বৈষ্ণব সাধক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন এবং বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চাতেও তাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই বলাই যায় বৈষ্ণব সাহিত্যে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গন্ধ নেই, বৈষ্ণব পদ রাধা-কৃষ্ণকে পরম মেনে তাঁদের লীলাকেই প্রধান মেনেছেন, এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি দের নিয়ে যে পদ রচিত হয়েছে সেখানে তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরা মূলত মানবভাবের উপাসক, তাই তাঁদের মাহাত্ম্য গাথার বর্ণনায় মেলবন্ধনের সুর ধ্বনিত হয়েছে যেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যেও এই সুর শোনা যায়-

"আমাদিগকে কায়মনোবাক্যে ব্রজবাসী হইতে হইবে। সুদৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রজবাসীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে।...ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের পূর্ব গৌরবস্মরণপূর্বক ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধারার অনুসরণ কর।"[১১]

বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের ভাব এই ধারার অনুকূল। এর মধ্যেই রয়েছে মানবতার জয়গান, চৈতন্যদেবও এই ভালোবাসার বাণী প্রচারের জন্যি গৃহত্যাগ করেছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে 'গোপী'র প্রসঙ্গ খুব গুরুত্বপূর্ণ। গোপীর স্বার্থ-গন্ধ হীন প্রেম কৃষ্ণ কথার মূল সম্পদ। এই গোপীদের প্রসঙ্গ অনেক পুরানো বলেই হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মনে করেন। দাক্ষিণাত্যের আড়বারগণ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এঁরা মূলত লক্ষ্মী-নারায়ণের স্তুতি করতেন, কিন্তু তার সঙ্গে এঁরা গোপী প্রেমেরও স্তব করতেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও গোপী কথা আছে, সেখানে গোপী গীত এক অশ্রুতপূর্ব প্রেম কাব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যদিও গোপী কথার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক শ্রীমহাপ্রভু বলে তিনি মনে করেন।[১২] গোপীরাই বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা প্রেমে পুষ্টি দান করেছেন, এই গোপী প্রেমের প্রসঙ্গের গুরুত্বের কথাভেবেই হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তার ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা', গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ থেকে ১৯৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বীরভূমের মানুষ, বাংলার রাঢ় অঞ্চলের মূল কেন্দ্র বীরভূমে বিংশ শতাব্দীতেও বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রদীপ একেবারে নিভে যায়নি এবং খুব স্বাভাবিক কারণেই হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে বৈষ্ণব চর্চার প্রসঙ্গটি জড়িয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি একাধিক বৈষ্ণব বিষয়ক মননশীল লেখাতে নিয়োজিত ছিলেন। সেইসব লেখাকেই একত্র করে এই অমূল্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি মূলত তত্ত্ব গ্রন্থ, গ্রন্থের নামেই তার পরিচয় মেলে। কিন্তু সাধনার প্রসঙ্গেই এসে পড়ে সাধকের প্রসঙ্গ। বিভিন্ন বৈষ্ণব পরিকরদের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস যে সমৃদ্ধ হয়েছে তা বলাইবাহুল্য। এছাড়াও তিনি এই গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর সাধনার ইতিহাস, রাধা-কৃষ্ণের মিলন প্রসঙ্গ এবং শ্রীরাধার ভাবের বিচিত্র প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। একাধিক আলোচনা বৈষ্ণব তত্ত্ব বিষয়ক হলেও, বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অনেকখানি মর্যাদা দিয়েছে এই গ্রন্থ। তত্ত্ব আলোচনার কথনেই কখনো কখনো ইতিহাস এসে প্রবেশ করেছে, সেই ইতিহাসই বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন প্রেক্ষিতকে ঈঙ্গিত করে। তিনি শ্রীচৈতন্যের সাধনার বিভিন্ন সূত্রগুলিকে নথিবদ্ধ করেছেন এবং চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রণেতাদের ইতিহাসকেও লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই সঙ্গে গ্রন্থগুলি সম্পর্কেও কিছু মৌলিক ভাবনার কথা আমাদের জানিয়েছেন। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটি রচনার মূল তিনটি কারণের কথা তিনি বলেছেন- এক. মহাপ্রভুকেই সর্বেসর্বা প্রমাণ করা সঙ্গে অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যান্দকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। দুই. শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম জীবনের নিগূঢ় রহস্যকে প্রকাশ করা, যা এর আগে কেও আলোচনাতেই আনেননি। এতে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিন. সর্বোপরি নিত্যানন্দের প্রেরণা। এর মধ্যে দ্বিতীয় কারণটি

খুব গুরুত্বপূর্ণ, চৈতন্যভাগবতে বাস্তবিক চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে, যাকে আমরা শুধু ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এতদিন দেখে এসেছি। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ দুটির তাত্ত্বিক মিল-অমিলের পরিচয়ও তিনি তুলে ধরেছেন। প্রধান, অপ্রধান বৈষ্ণব পরিকর বা সাধকদের নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন, এখানে মুখ্যত বৈষ্ণব ধর্মের প্রেক্ষিতে তাঁদের তাত্ত্বিক ভূমিকাকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন, কিন্তু বলাইবাহুল্য যে, এই অবসরে তাঁদের ইতিহাস উঠে এসেছে এবং উক্ত তত্ত্বের আলোকে বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাব, গভীরতা লাভ করেছে। এই আলোচনার ফলে ধর্মীয় তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে বৈষ্ণব পদের পাঠ বুঝতে পাঠককে অবশ্যই সাহায্য করবে।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর পদ সংকলন গ্রন্থগুলিতে বৈষ্ণব পদের যেমন নিপুণ ব্যাখ্যা করেছেন, আবার তাঁর সমালোচনামূলক গ্রন্থগুলিতে সামগ্রিকভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল ভাব, তার গুরুত্ব, আধুনিকতা ও প্রাসঙ্গিকতার বিষয়গুলিকেও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনার ছাপ সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব সাহিত্যের চরিত্রগুলির ইতিহাসকে যেমন তিনি সুনিপুণভাবে অনুসন্ধান করেছেন, অপরদিকে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যক্তিত্বদের ইতিহাসের আলোকে উজ্জীবিত করেছেন। এতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক তত্ত্বের আধারে বৈষ্ণব ধর্ম সহজলভ্য হয়েছে, আর এই তত্ত্বের সূত্রে বৈষ্ণব সাহিত্যের সূক্ষ্ম ভাবকে পাঠক উপলব্ধি করতে পেরেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এই কৃতিত্ব অসমান্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের একজন নিপুণ সমালোচক হিসেবে তাঁর দক্ষতা অতুলনীয়।

তথ্যসূত্র :

১. আবু সইয়দ আইয়ুব, 'ভূমিকা: আধুনিক বাঙলা কবিতা', 'পথের শেষ কোথায়', স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃষ্ঠা- ৩৬।
২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'জ্ঞানদাস পদাবলী', ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১লা আষাঢ়, ১৩৬৩, ভুমিকা অংশ।
৩. প্রাগুক্ত সূত্র।
৪. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'পদাবলী-পরিচয়' দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৪৫।
৫. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৪৯।
৬. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৪৯-৫০।
৭. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ ও বৈষ্ণব তত্ত্ব', আশাদীপ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৯।
৮. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ২১।
৯. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ২৬।
১০. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৩০।
১১. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৪১।
১২. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৭৫।

সমাজতত্ত্ব ও সমাজবাস্তবতা : প্রথম প্রতিশ্রুতি

আশীষ কুমার সাউ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
এম. আর. মহিলা কলেজ
ললিত নারায়ণ মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়
দারভাঙ্গা, বিহার

সারাংশঃ- "আমার লেখার উপজীব্য কেবলমাত্র মানুষ। ....শুধুই মানুষ, মধ্যবিত্ত ঘরোয়া মানুষ, যে আমার একান্ত চেনা-জানা। আমি আমার জানা জগতের বাইরে কখনও হাত বাড়াতে যাই না।" (খেলা থেকে লেখা) – এই সহজ অথচ সুদৃঢ় মন্তব্যের অধিকারিণী হলেন সাহিত্যসম্রাজ্ঞী আশাপূর্ণা দেবী। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সমাজ গড়ে তোলে, সেই সমাজের উঁচু-নিচু সব স্তরের মানুষদের কথা লেখিকা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। আশাপূর্ণা দেবীর সমাজচিন্তা বিষয়ক উপন্যাসগুলিতে সমাজশোষণের যে প্রক্রিয়া রয়েছে সেখানে সেই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষত সংগ্রাম, আন্দোলন তেমন না থাকলেও মানুষের চেতনার পরিবর্তনের সংকেত রয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক 'গ্রামসি'র ধারণার মতোই মানবচেতনার আঘাত করে করে সমাজের চেহারা পালটে দেবার ইঙ্গিত রয়েছে। এই সমাজতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে, আশাপূর্ণা দেবীর প্রধানত এই তিনটি উপন্যাসে – 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', ও 'বকুলকথা'র মধ্যে। আসলে তিনি 'বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ' দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।
'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে সত্যবতী সমাজের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধতার মন্ত্র পেয়েছে তার ব্যতিক্রমী পিতা রামকালীর কাছে, যিনি অনায়াসে চালকলাবাঁধা ব্রাহ্মণের মেকি তেজস্বিতাকে অগ্রাহ্য করে কবিরাজি পেশায় নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বস্তুত সামাজিক উপন্যাস ও গল্পে জড়িয়ে থাকে আর্থিক প্রেক্ষাপট। আর্থিক প্রেক্ষাপট যেমন সমাজকে বদলায় তেমনি সামাজিক প্রেক্ষাপট বদলায় অর্থনীতিকে। রামকালীও সত্যবতীর কাহিনির সময়টি মূলত কৃষিনির্ভর বাংলা। নবাবি আমল শেষ। ইংরেজ আমল শুরু। কৃষিভিত্তিক বাংলা যে ইংরেজদের আমলে ব্যাবসা ও চাকরির দিকে ঝুঁকছে তার কিছুটা ইঙ্গিত এখানে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের স্বার্থপরতা ও অন্ধ সংস্কারের নানা চিহ্নও আছে এই উপন্যাসে।

সূচক শব্দঃ- আধিপত্য, ক্ষমতা, শাসকমদতপুষ্ট, লগ্নাভ্রষ্টা, দলাদলি, সামন্ততান্ত্রিক, কৃষিনির্ভর, সমাজশাসন, সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাংলা।

মূল আলোচনাঃ-

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৪) গ্রন্থের ভূমিকায় লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন- "বহির্বিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনি নিয়ে রচিত হয় বিগত কালের ইতিহাস। আলো আর অন্ধকারের পৃষ্ঠপটে উচ্চকিত সেই ধ্বনিমুখর ইতিহাস পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চিত রাখে প্রেরণা, উন্মাদনা, রোমাঞ্চ। কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কি চলে না ভাঙাগড়ার কাজ? যেখান থেকে রং বদল হয় সমাজের, যুগের, সমাজ মানুষের মানসিকতার, চোখ ফেললে দেখা যায় সেখানেও অনেক সঞ্চয়। তবু রচিত ইতিহাসগুলি চিরদিনই এই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি উদাসীন। অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত। বাংলাদেশের সেই অবজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে প্রথম যারা বহন করে এনেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর।"[১]

আশাপূর্ণা দেবী, তাঁর সময় থেকে অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে প্রথম প্রতিশ্রুতির কাহিনি রচনা করেছেন। আমাদের দেশে তখন নারীশিক্ষার প্রসার ঘটেনি। নারীর অধিকার তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু রামমোহন থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত মনীষীরা নারীর অধিকার রক্ষা এবং নারী শিক্ষার বিস্তারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নারীর শিক্ষা-দীক্ষা, ও অধিকারবোধের প্রথম পর্যায়ের কাহিনি হল সত্যবতীর কাহিনি। অন্যভাবে বলা যায়, উপন্যাস কাহিনিটি সেকালের সমাজের একটি নিখুঁত ছবি। তৎকালীন সমাজের আচার প্রথা ও সংস্কারগুলি যেমন এখানে সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে, তেমনি সেইসব কুসংস্কারগুলি পরিবর্তনের চেষ্টাও এখানে লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের কাহিনিটি অত্যন্ত দীর্ঘ। চরিত্র সংখ্যাও এখানে অসংখ্য। চরিত্রগুলি সমাজের সব স্তরেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে।

আশাপূর্ণা দেবীর বেশ কিছু উপন্যাসে সমাজ ভাবনা ও সমাজতত্ত্বের বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে, এর মধ্যে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'ও একটি। এ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে আমরা অতিসংক্ষেপে সমাজ বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হব। সাহিত্যে ক্ষমতা এবং সম্পর্কের বিন্যাস অনিবার্য ভাবে প্রতিফলিত হয় বলেই সমাজ প্রতিফলক সাহিত্যে বিচারে সমাজবিজ্ঞানের কাছে যেতে হয়। সমাজ বিজ্ঞানের মূল কথাই হল সামর্থ্য বা Ability. কার্লমার্কস বলেছিলেন এই সামর্থ্যের (Ability) উৎস হল অর্থনীতি।[২] ক্ষমতাকেই সমাজবিজ্ঞানীরা সামর্থ্য বলেছেন। সমাজ বিবর্তনের ধারাকে ধরার জন্য সমাজের নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা বা Power –এর কথা বলেছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা মোটামুটি ভাবে 'Distribution of Power' বা 'Power' –এর পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে আলোচনা ধরে রেখেছেন যথা – Ability, Relation, Context, Distribution, Pressure। এবং সমস্ত রকম সমাজ বিবর্তনের কারণ (যে কোনো আন্দোলনের, বিপ্লবের উৎস প্রভৃতি) এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে। মেকেয়াভেলী, কার্ল মার্কস, চার্ল বেবে, অন্তিনুগ্রামসি, মিসেল ফুকো প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিকগণ 'Power'-কেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে গ্রাম্‌সি স্বতন্ত্র। তিনি বললেন 'Power' শব্দটি জীর্ণ। Power –এর পরিবর্তে

তিনি ‘Hegemony’ (আধিপত্য) শব্দটি ব্যবহার করলেন। ফ্যাসিস্ট কারাগারে বসে লিখিত ‘Prison note book’ (কারাগারের নোট বই) মধ্য দিয়ে তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশ করলেন। পূর্বতন সমাজতাত্ত্বিকদের ধারণাকে বদলে দিয়ে ক্ষমতার বিন্যাস কৌশলের ধারণা পালটে দিলেন। পূর্বতন ধারণায় সমাজনিয়ন্ত্রণ থাকে একটি ‘Power structure’ উৎপাদিত দ্রব্যের মালিকানা যাদের হাতে থাকে, তারাই ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকে। যা নিয়ন্ত্রিত হয় ‘Base’ এর উপর। ‘Power structure’ থেকে একটি ‘Super power structure’ গঠিত হয়। ‘Super structure’ –ই বলে দেবে জনমানসের কি চেতনা তৈরি হবে। ‘Base’ বদল হলেই ‘Super structure’ বদলে যাবে। গ্রামসি প্রথম বললেন যে ‘Base’ বদল হলে চেতনার বদল হবেই এমন কথা ঠিক নয়; চেতনার বদল হতে পারে আবার নাও পারে। গ্রামসি বললেন মানুষের চেতনার জগতে পরিবর্তন আনা না গেলে সমাজের ক্ষমতা বিন্যাসে কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না। শাসক নির্মিত ‘Power structure’ কে ভাঙতে গেলে জনমানসের চেতনার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। অর্থাৎ শাসকের ‘Hegemony’ কে প্রতিহত করতে গেলে ‘Counter Hegemony’ করতে হবে। গ্রামসি বললেন উন্নত সমাজে ক্ষমতা আদায় বোঝা যায় না। তার কৌশল অতি সূক্ষ্ম, দমনপীড়ন প্রত্যক্ষভাবে সেখানে অনুপস্থিত। সুতরাং শাসকের Hegemony কে বুঝে নিয়ে ‘Counter-Hegemony’ করতে হবে। গ্রামসি বলছেন এই লড়াইটা আসলে চেতনার জগতে। সুতরাং জনমানসের চেতনার জগতে বদল করে Counter Hegemony করতে হবে।

আশাপূর্ণা দেবীর সমাজচিন্তা বিষয়ক উপন্যাসগুলিতে সমাজশোষণের যে প্রক্রিয়া রয়েছে (Power Structure) সেখানে সেই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষত সংগ্রাম, আন্দোলন তেমন না থাকলেও মানুষের চেতনার পরিবর্তনের সংকেত রয়েছে।[৩] গ্রামসির ধারণার মতোই মানবচেতনার আঘাত করে ‘Counter-Hegemony’ করে সমাজের চেহারা পালটে দেবার ইঙ্গিত রয়েছে। এই সমাজতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে, ‘অগ্নিপরীক্ষা’, ‘শশীবাবুর সংসার’, ‘উড়োপাখী’, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘নীল পর্দা’, ‘সুবর্ণলতা’, ‘অন্তর বাহির’, ‘বলয়গ্রাস’, ‘বকুলকথা’ প্রভৃতি উপন্যাসে।

আমরা ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের সমাজ শাসন প্রক্রিয়া – ‘Power structure’ –এর প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করবো। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের সমাজবিন্যাসে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত দুই শ্রেণি রয়েছে। পরাধীন বা স্বাধীন ভারতবর্ষের ‘Power structure’-এ উচ্চবিত্তরাই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। এমনকি নিচুতলার জনমানস চৈতন্য ও তৈরি করা ক্ষমতা বিন্যাসের পক্ষেই ভাসমান। ‘Power’ –এর কেন্দ্রে থাকা শাসক এবং শাসকমদতপুষ্ট উচ্চবিত্তরা নিম্নশ্রেণির চেতনার জগৎটিকেও সুকৌশলে দখল করেছে- সেখানে নিম্নবিত্তদের বোধের জগতে শোষকের ক্ষমতা বিস্তার ও শোষণকে স্পষ্টভাবে ধরা সম্ভব হয়নি। একারণেই কেন্দ্রীয় চরিত্র রামকালী ও সত্যবতী Power –কে হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছেন। সত্যবতী

ও রামকালী চরিত্রের মধ্যে সামাজিক Hegemony –এর প্রভাব অনেক বেশি করে লক্ষ করা যায়।[৪]

এবার আমরা সমাজ বিজ্ঞান ছেড়ে মূল উপন্যাসের দিকে চোখ রাখতে পারি। উপন্যাসের সামাজিক প্রেক্ষাপট আরম্ভ হচ্ছে, নবাবী আমল থেকে। রামকালী গৃহ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ অর্থাৎ মুকশুদাবাদে সে আশ্রয় পেয়েছিল কবিরাজ গোবিন্দ গুপ্তের বাড়িতে। গোবিন্দগুপ্ত ছিলেন নবাব বাড়ির কবিরাজ। নবাবী আমল **১৭৫৭** খ্রিষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে সমাপ্ত হয়। এরপর আরম্ভ হল কোম্পানি যুগ। এ যুগে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। বিদ্যাসাগরই প্রথম স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন। নারীদের মনেও স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। বরং মেয়েদের লেখাপড়া শেখার বিরোধীই ছিল বহু মেয়ে। এমতাবস্থায় সমাজে নারী শিক্ষা প্রচলন ছিল অসম্ভব।[৫]

উপন্যাসে রামকালী ও সত্যবতীর ভূমিকা প্রধান। সত্যবতীর জীবন বিকাশের বর্ণনাসূত্রে এসেছে এলোকেশী এবং নীলাম্বর বাঁড়ুর্য্যের প্রসঙ্গ। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের স্বার্থপরতা ও অন্ধ সংস্কারের নানা চিহ্ন রয়েছে বাঁড়ুর্য্য পরিবারের মধ্যে। এলোকেশীর আধিপত্য (Hegemony) একতরফা। সমাজতান্ত্রিক নিয়মকে গুরুত্ব না দিয়েও রামকালী মুখুয্যের জীবনের তিনটি স্তর। একটি স্তর হল গৃহ বিতাড়িত রামকালীর মুকশুদাবাদে আশ্রয় এবং গোবিন্দ গুপ্তর কাছে কবিরাজি বিদ্যায় শিক্ষালাভ ও পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন। তিনি সমাজে 'Power structure' তত্ত্বটিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি নিজেকে গ্রামের মুরব্বি স্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দ্বিতীয় স্তরটি হল নিত্যানন্দপুরের প্রতিষ্ঠিত কবিরাজ রামকালীর কন্যা সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি গমন এবং ভুবনেশ্বরীর আকষ্মিক মৃত্যু। তৃতীয় পর্যায়টি হল পত্নীর মৃত্যুর পর রামকালীর গৃহবিমুখতা এবং শেষপর্যন্ত তীর্থগমন ও পরিণামে কাশীযাত্রা।

সমাজকে কেন্দ্র করে রামকালীর মতো সত্যবতীর জীবনেরও তিনটি স্তর। একটি স্তর হল – বিবাহের পর তার পিতৃগৃহে অবস্থান। দ্বিতীয় স্তরটি হল – বারুইপুরে শ্বশুর ঘরে অবস্থান এবং তৃতীয় স্তরটি হল কলকাতায় অবস্থান। নবকুমারের জীবনবিন্যাস এতগুলি স্তরে বিন্যস্ত নয়। কিশোর নবকুমার স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত। পত্নীকে বারুইপুরের বাড়িতে পেয়ে সে উচ্ছ্বসিত। আর অসুস্থ হওয়ার পর তার কলকাতায় যাত্রা। তবে কিশোর নবকুমার ভীরু, লাজুক এবং মাতৃভয়ে ভীত। কলকাতায় বসবাসকারী নবকুমার একই রকম রয়ে গেছে। তার খুব বেশি মানসিক পরিবর্তন ঘটেনি। তার মাতৃভীতি পরিণত হয়েছে পত্নীভীতিতে। স্ত্রীর উপর সে কখনও নিজের প্রভুত্ব দেখাতে পারেনি। তাই 'স্ত্রৈণ', কামিখ্যের ভেড়া হিসেবে সে চিহ্নিত হয়েছে।[৬] কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে ভীত নবকুমার সে যখন স্ত্রীর প্রভাব কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে তখন অতি উৎসাহ বশত সে এমন কিছু কাজ করেছে, যার ফলে সত্যবতীর

জীবনটি পুরোপুরি তছনছ হয়ে গেছে। লেখিকা এইসব ঘটনাপরম্পরাগুলিকে অত্যন্ত কৌশলে বর্ণনা করেছেন এবং সমাজতত্ত্বভাবনাকে নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন।

রামকালী গোবিন্দ গুপ্তর বাড়ি থেকে অনেক সম্পদ নিয়ে নিত্যানন্দপুর ফিরেছিল। তার ঘরে ফেরার সময় বয়স দাঁড়িয়েছিল তিরিশ বছর। ন'বছরের ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে রামকালীর বিয়ে হল। তাদের একটিমাত্র সন্তান সত্যবতী। রামকালী, প্রথাগত সমাজের নিয়ম-কানুনকে না মানলেও সমাজের উর্ধ্বে যেতে পারলেন না। সত্যবতীরও বিয়ে হল আট বছর বয়সে। রামকালী দেখেশুনে মেয়ের বিয়ে দিল। যদিও মেয়ের বিয়ের পর রইল বাপের বাড়িতে। নবকুমার বিয়ের রাত্রে বউকে ভালো করে দেখেওনি। সে রয়ে গেল বারুইপুরে নিজের বাড়িতে। নবকুমারের মা এলোকেশী জোর করে রামকালীর অমতেই পুত্রবধূকে ঘরে নিয়ে গেল। এখানেও রামকালী সমাজের নিয়মের উর্ধ্বে যেতে পারলেন না। যদিও পুত্রবধূর সঙ্গে এলোকেশীর বনিবনা হল না। তৎকালীন সমাজের নিয়ম মেনে এলোকেশী পুত্রবধূকে বশ্যতা স্বীকার করাতে না পেরে ছেলের দ্বিতীয়বার বিয়ে দেবার পরিকল্পনা করল। তার পরিকল্পনায় বাধ সাধল সত্যবতী। কেননা বেনামি চিঠি পেয়ে পুণ্যির বিয়ে উপলক্ষ্যে সত্যবতীকে নিতে এসেও রামকালী শূণ্য হাতে ফিরতে বাধ্য হল। সত্যবতী বাপের বাড়ি যেতে রাজি হল না।

তারপর নবকুমার অসুস্থ হল। নবকুমারের অসুখের সময় নানা তুকতাক এবং স্ত্রী আচার পালন করা হয়েছে তার সুস্থতার জন্যে। কিন্তু সত্যবতী বিশ্বাস করেনি যে, ডান হাতের বদলে বাঁ হাতে ভাত খেলে তার স্বামী ভালো হয়ে যাবে। সত্যবতী কলকাতা থেকে সাহেব ডাক্তার আনালো। নবকুমার সুস্থ হবার পর সত্যবতী তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল। সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাংলার ছবিটি পরিস্ফুট হয়েছে নবকুমারের অসুখ এবং কলকাতা যাত্রার সময়। কলকাতায় গিয়ে সত্যবতী একাধিক বার বাড়ি পাল্টালো। প্রথমে উঠেছিল মাস্টামশায়ের দেখে দেওয়া পাথুরেঘাটার বাসাবাড়িতে। তারপর বাসা বদলে উঠে গেল মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে। সেখানে দত্তবাড়ির ঠুনকো অহংকার (Hegemony) সহ্য না হওয়ার সে আবার উঠে এল বাগবাজারের বাসা বাড়িতে। ইতিমধ্যে তার কোলে এসেছে সাধন ও সরল দুই পুত্রের পর একমাত্র কন্যা সুবর্ণ।

মাঝখানে ঘটে গেছে অনেক কাহিনি। পাটমহলের জমিদার লক্ষীকান্ত বাঁড়ুয্যের নাতনি পটলিকে রক্ষা করার জন্যে রামকালী রাসুর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে, সমাজের নিয়ম-মেনে। না হলে পটলি লগ্নাভ্রষ্টা হত। সারদা স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নিতে পারেনি। কাটোয়ার বউ শঙ্করী এসেছিল রামকালীর ঘরে। কিন্তু নগেনের কুমন্ত্রণায় ভুলে বিধবা শঙ্করী তার সঙ্গে ঘর ছাড়ে। শঙ্করীর গর্ভে সন্তান আসার সংবাদ পেয়ে তাকে ফেলে চলে যায় নগেন। শঙ্করী বহুকষ্টে মেয়েকে মানুষ করে। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে দত্ত বাড়িতে সে পানসাজুনির কাজ করে। মেয়েকে সে বিধবা সাজিয়ে রেখেছিল। এই দত্ত বাড়িতেই অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে এসে শঙ্করী ও সুহাসের সন্ধান পায় সত্যবতী।

শঙ্করী ও সুহাসকে সে নিজের ঘরেই আশ্রয় দিতে চায়। সুহাসের আশ্রয় পাবার নিশ্চয়তা বুঝেই শঙ্করী আত্মহত্যা করে। সত্যবতী সুহাসকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। সুবর্ণের জন্মের পর সত্যকে নিয়ে যখন যমে-মানুষের টানাটানি চলছে, তখনি ভাবিনী ও সদুর কথা থেকে সুহাস তার জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারে। সত্যবতীর সঙ্গে আগেই ভবতোষ মাস্টারের ঘরে গিয়েছিল সুহাস। নিজের সমগ্র বৃত্তান্ত জানার পর সে ভবতোষ মাস্টারের গৃহেই আশ্রয় নেয়। নিরুপায় হয়ে ভবতোষ মাস্টার ছুটে আসে সত্যবতীর কাছে। সত্যবতী যখন ভবতোষ মাস্টারকে অনুরোধ করেছিল সুহাসের বিয়ের ব্যবস্থা করতে, তখন ব্রাহ্ম সমাজের অনুদায়তা, ঈর্ষা ও দলাদলির কথা জানিয়েছিল ভবতোষ মাস্টার।[৭] সুহাসকে সমাজে জায়গা করে দেওয়ার জন্য সত্যবতীর যে আপ্রাণ চেষ্টা তা দেখলাম। লেখিকা অবশ্য সুহাসের দাম্পত্যজীবনের কোনো পরিচয় দেননি, তবে সত্যবতী যে সুহাসকে সমাজে একটা জায়গা দিতে চেয়েছিল সেই ইঙ্গিতটি এখানে স্পষ্ট। সত্যবতীও সমাজ নিয়মবর্হির্ভূত কাজ করতে কখনো কখনো বাধ্য হয়েছে বা সমাজ কাঠামোকে মেনে নিয়েছে।

বস্তুত সামাজিক উপন্যাস ও গল্পে জড়িয়ে থাকে আর্থিক প্রেক্ষাপট। আর্থিক প্রেক্ষাপট যেমন সমাজকে বদলায় তেমনি সামাজিক প্রেক্ষাপট বদলায় অর্থনীতিতে। রামকালীও সত্যবতীর কাহিনির সময়টি মূলত কৃষিনির্ভর বাংলা। নবাবি আমল শেষ। ইংরেজ আমল শুরু। কৃষিভিত্তিক বাংলা যে ইংরেজদের আমলে ব্যবসা ও চাকরির দিকে ঝুঁকছে তার কিছুটা ইঙ্গিত এখানে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রামকালী ধনী ব্যক্তি। সে মেয়ে সত্যকে কুড়ি বিঘে জমি দিয়েছে। সারদাকেও দিয়েছে কুড়ি বিঘে খাসের জমি। বাকি সবকিছু দিয়েছে রাসুকে। সমাজ ব্যবস্থার চিত্র এখানে ধরা পড়েছে। কাশীযাত্রার আগে সে গ্রামে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। দুঃস্থ কিছু মানুষকে সাহায্যের ব্যবস্থা করে গেছে। রাসুর দ্বিতীয় বার বিয়ে হয়েছে পাটমহলের জমিদার লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের নাতনি পটলির সঙ্গে। তবে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি যে আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছে তার ইঙ্গিতও আছে। নবকুমার কলকাতায় এসেছে ইংরেজ অপিসে চাকরি নিয়ে। নিতাই চাকরি পেয়েছে রেলি ব্রাদার্স-এ। কলকাতায় তখন বেতনভোগী কর্মচারীদের ঘর ভাড়া নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। আবার এর পাশাপাশি জমিদার স্থানীয় ব্যক্তিদের মিথ্যে আভিজাত্য (Hegemony) এবং চরিত্রহীনতা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরিচয় আছে দত্ত বাড়ির বর্ণনায়। দত্ত বাড়ির পুরুষদের 'দয়ার শরীর'। মাঝে মাঝে সুন্দরী মেয়েরা তাদের চোখে পড়ে যায়। সত্য বিত্ত ও প্রতিপত্তির কাছে মাথা নোয়ায়নি ঠিক কথা কিন্তু অশিক্ষিত সমাজ বিত্ত ও প্রতিপত্তির ('Power structure') কাছে মাথা নুইয়েছে। রামকালীর মেয়ের ঔদ্ধত্যের পশ্চাতে রামকালীর পয়সাকে নিমিত্ত করেছে মোক্ষদা। কারণ সমাজ বিত্তশালী রামকালীর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করতে পারেনি। লেখিকা ঐ সময়কার অশিক্ষা জর্জর গ্রাম্য জীবনের সামাজিক অবক্ষয়ের রূপটিকে তুলে ধরেছেন।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে সমাজের গার্হস্থ্য জীবনের, প্রাত্যহিক গৃহস্থালির দ্বন্দ্ব কলহ, দ্বেষ-হিংসা, উত্তেজনা-অবসাদ, দৈন্য-সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমতা, অসহিষ্ণুতা, সমাজের এক শ্রেণির মানুষের আধ্যপত্য বিস্তার (Hegemony), সুবিধাবাদী মানুষের সমাজ শোষণের চিত্র, কোন কিছুই বাদ পড়েনি। এমনকি ঐ সময়কার আর্থ-সামাজিক কাঠামোর চিত্র বা (Power structure)-ও ধরা পড়েছে। সাহিত্য যেহেতু মানব জীবন সংলগ্ন আলেখ্য, সেহেতু এখানে মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তব অভিজ্ঞতার চরম বহিঃপ্রকাশও ঘটেছে। বাস্তবের সমস্যা ও শিল্পের সমস্যাকে একই প্রেক্ষিতে স্থাপন করে, স্বর মাত্রায় নানা লয়, নানা স্তর আরোপ করে লেখিকা প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন ঐ সময়কে, জীবনের তথা সমাজের চলচ্ছন্দকে।

তথ্যসূত্রঃ-

১। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক, কলকাতাঃ আশাদীপ, ২০১৪।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতাঃ মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিট, ২০১২।

৩। চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। বাংলা সাহিত্য পরিচয়, কলকাতাঃ তুলসী প্রকাশনী, ২০১২, পৃঃ ৭০৯।

৪। মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার। কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতাঃ ২০১০।

৫। রায়, দিলীপ কুমার। প্রথম প্রতিশ্রুতি কিছু ভাবনা কিছু কথা, কলকাতাঃ গ্রন্থবিকাশ, ২০২১।

৬। ঘোষ, সুদক্ষিণা। মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।

৭। রায়, দিলীপ কুমার। প্রথম প্রতিশ্রুতি কিছু ভাবনা কিছু কথা, কলকাতাঃ গ্রন্থবিকাশ, ২০২১।

৮। মণ্ডল, গালিব উদ্দিন। বনফুল ও ডানা, কলকাতাঃ প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৫।

৯। চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। সাহিত্য প্রকরণ, কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫।

১০। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতাঃ রত্নাবলী, ২০০৯।

নজরুল প্রতিভা ; ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে তার পরিবেশগত প্রভাব : একটি সমীক্ষা

মো: আফতাব উদ্দিন
গবেষক, সঙ্গীত ভবন,
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সংক্ষিপ্তসার : মানব ইতিহাসে প্রতিটি মানুষ জন্ম গ্রহণের পর তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। আদিকাল থেকেই মানুষ এই পরিবেশে তার দৈহিক গঠন, আচার-আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, পারিবারিক মূল্যবোধ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সহ সর্বোপরি এর মাধ্যমে শৃঙ্খলিত জীবনমান নির্ধারণ করে। এই সামাজিক পরিবেশ আবার সে অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এই ভৌগোলিক পরিবেশ সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে মানব ইতিহাসের সভ্যতা বিকাশে। মানুষের চিন্তাধারা যত বেশি প্রখর সে সভ্যতা তত বেশি উন্নত । কিন্তু কালক্রমে এই সভ্যতা থেকে এসেছে জাতি এবং জাতি থেকে এসেছে দেশ। প্রতিটি দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ভৌগোলিক পরিমণ্ডল দ্বারা সামাজিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়। যেখানে বহুমুখী এবং বহুজীবী মানুষের সমষ্টিগত পেশা এবং সামাজিক অবস্থান বৈচিত্র্যময়তার স্বাদ এনে একটি ভূ-সামাজিক পরিমণ্ডল গঠন করে। মানুষ এই পরিমণ্ডল থেকে শিখে নিতে পারে অনন্য কিছু। তেমনি একটি বহুজাতিক ভূ-পরিমন্ডলে জন্মগ্রহণ করেন অখন্ড বঙ্গের অন্যতম কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নিঃসন্দেহে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগতভাবে প্রতিভাবান ছিলেন। তবে তিনি যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন কিংবা বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন তা তাঁর প্রতিভাকে আরও অনেক বেশি গুণে গুণান্বিত করেছে। যার ছাপ আমরা পরবর্তীতে কাজী নজরুল ইসলামের সৈনিক জীবন, কর্ম জীবন, রাজনৈতিক জীবন এবং সাহিত্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখতে পাই।
সূচক শব্দ: ভৌগোলিক পরিমণ্ডল, বহুজাতিক, ভাষা দক্ষতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা।

ভূমিকা: কাজী নজরুল ইসলাম তার ২২ বছরের কর্ম জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন কৃষ্ণনগর, কলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকায়। তখন কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের শৈশব কেটেছে আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে। নজরুল নিঃসন্দেহে জন্মগতভাবে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করলেও একাধারে রপ্ত করেন: আরবি, হিন্দি, উর্দু, ফার্সি, ও সংস্কৃত ভাষা। প্রতিটি ভাষার কমবেশি গভীরতায় তিনি বিচরণ করেছেন এবং করতে পেরেছেন। কিন্তু এসব কিছুই যে শুধুমাত্র প্রতিভার গুণে হয়েছে তা বলা

সমীচীন নয়। এর রহস্য লুকিয়ে আছে নজরুলের জন্মস্থান অর্থাৎ তিনি যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বেড়ে উঠেছেন সেখানেই।

মূল আলোচনা:
তৎকালীন সময়ে বর্ধমান ছিল একটি হিন্দু প্রধান জেলা। এ জেলায় ১৯০১ সালের আদমশুমারির হিসেব অনুযায়ী ৮১.৩% ছিল হিন্দু এবং ১৭.১% ছিল মুসলিম জনসংখ্যা। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম যে রাণীগঞ্জ মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন সে মহকুমায় হিন্দু এবং মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত ছিল যথাক্রমে "(হিন্দু) ৩ লাখ ২৭ হাজার এবং (মুসলিম) ২৪ হাজার ১১৫ জন।"[১] তবে, যে চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম সে গ্রামে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল আনুপাতিক ভাবে কিছু বেশি। কারণ সেসব গ্রামে বাস করত কিছু আয়মাদার মুসলিম। আয়মাদার হলেন তারা, যারা নবাবী আমল অথবা মোঘল পূর্ব আমলে পতিত জমি পেয়েছিলেন। কারণ ব্রিটিশ আমলে এ রকম সম্পতি দেওয়ার নিয়ম ছিল না। এই আয়মাদার মুসলিম পরিবারগুলোই চুরুলিয়া গ্রামে একটি মসজিদ এবং একটি মক্তব নির্মাণ করেন। চুরুলিয়া গ্রাম থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে আসানসোল শহর অবস্থিত। আর চুরুলিয়া গ্রাম থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে রাণীগঞ্জ শহর। কাজী নজরুল ইসলামের রাণীগঞ্জ সিয়ালসোল রাজ হাই স্কুল যে অঞ্চলে ছিল তা তৎকালীন সময়ে শিল্প নগরী হিসেবে সারা ভারতে পরিচিত ছিল। এ শহরে অনেকগুলো কয়লা, কাগজ এবং তেলের কারখানা ছিল। যার ফলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ ব্যবসায়িক কাজে এবং শ্রমিক হিসেবে এখানে আসা-যাওয়া করতেন। কাজী নজরুল ইসলাম যে চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার মাত্র তিন কিলোমিটার উত্তরে অজয় নদী। এই অজয় নদীর ওপারেই অবস্থিত বিহার রাজ্য। তৎকালীন সময়ে বিহার রাজ্যের অধীনে ছিল ঝাড়খণ্ড এলাকা। বর্তমানে যা আলাদা রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভৌগোলিক পরিমণ্ডল বিবেচনায় কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একদম পশ্চিম সীমান্তে। এ সম্পর্কে গোলাম মুর্শিদ তাঁর "বিদ্রোহী রণক্লান্ত:নজরুল জীবনী" বইতে উল্লেখ করেন "এই শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবির জন্ম বঙ্গদেশের একেবারে পশ্চিম সীমান্তে, অল্পের জন্যে তিনি বিহারী বলে পরিচিতি হননি।"[২]

অতীতে আসানসোল বর্ধমানের অংশ হলেও এখন তা জেলা হিসেবে উন্নীত হয়েছে। আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের অংশ হলেও পূর্বকাল থেকে সেখানকার মানুষের মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যবসায়িক গভীর যোগসূত্র বিহার এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাথে। আসানসোল একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক এলাকা। এখানে পিট কয়লার ব্যবসার খাতিরে তিন রাজ্যের মানুষের বাস উনিশ শতক থেকেই। আসানসোলের মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বিহারের মুসলিম সম্প্রদায়ের পূর্ব যোগসূত্র আছে। বিহারীদের অনেকেই কথা বলেন উর্দুতে কিংবা উর্দু হিন্দি মিলিয়ে। আবার হিন্দি বলার প্রবণতা এবং দক্ষতা

পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলের থেকে আসানসোলবাসীদের বেশি। মোট কথা আসানসোল বা তার আশেপাশের এলাকার প্রায় অধিকাংশ মানুষ ভাল হিন্দি, বাংলা, উর্দু না বলতে পারলেও তারা এই তিনটি ভাষা বুঝতে সক্ষম। আর অতীতে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে একটা সময় অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলামের জন্মের সময় আরবি এবং (তুলনামূলক কম) ফার্সি শিক্ষার প্রচলন ছিল। আমরা হয়ত জেনে থাকব যে, ব্রিটিশদের তৈরি সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার আগে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। সুপ্রাচীন কালে আবিস্কৃত বিভিন্ন সভ্যতার যে নিদর্শন আমরা পাই তাতে একটা সময় বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষা এবং পরবর্তীতে সনাতন ধর্মের শিক্ষা দানের বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। যার ফলে মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া কাজী নজরুল ইসলাম মক্তবে তার প্রাথমিক পাঠ নেওয়া শুরু করেন। তৎকালীন মুসলিম সমাজে নিজেদের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানে বাংলা ভাষায় আরবি এবং ফারসি শব্দের ব্যবহার ছিল ব্যাপক। এমনকি আসানসোল অঞ্চলে মুসলিম সমাজে বর্তমান সময়েও বাংলা ভাষার সাথে হিন্দি, উর্দু শব্দের ব্যবহারও বেশ লক্ষণীয়। তাছাড়া তৎকালীন সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য। কাজী নজরুল ইসলাম যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে অঞ্চলে ভাষার বৈচিত্র্য ছিল ব্যাপক। যার ফলে কাজী নজরুল ইসলাম ছোটবেলা থেকেই পরিবেশগতভাবে শুনে শুনে বিভিন্ন ভাষা রপ্ত করার কৌশল অর্জন করেন। পাশাপাশি তিনি অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় এই কাজ তার জন্য আরও সহজ হয়ে যায়। কাজী নজরুল ইসলাম ছোটবেলায় পাঠ্য বই পড়ে যতটা না জ্ঞান অর্জন করেছেন, তার থেকে বেশি অর্জন করেছেন পরিবেশগত দিক থেকে। আমরা যারা বাংলাদেশের মানুষ তারা কাজী নজরুল ইসলামের এই প্রতিভাকে একটু বেশি অবাক বিস্ময় নিয়ে দেখি। বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে সীমান্তরেখা আছে তার মধ্যে হিন্দিভাষীদের সাথে সরাসরি কোন সীমান্তরেখা নেই। যারা সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে বাস করে, তারা এপার ওপার দুই বাংলার ভাষাতে কথা বলার পারদর্শিতা অর্জন করে। যেমন, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং বাংলাদেশের কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী অঞ্চলের ভাষাগত সাদৃশ্য রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাট এবং বাংলাদেশের জয়পুরহাট, দিনাজপুরের ভাষাশৈলী প্রায় এক। ওদিকে যশোর এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বনগাঁ, গোবরডাঙ্গা এবং বারাসাত অঞ্চলের ভাষা সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এমনকি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় যেমন, সাঁওতাল, কুচ, গারো এবং রাজবংশীদের ভাষা বৈশিষ্ট্য দুই বাংলাতেই প্রায় এক। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদের সাথে রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভাষা সাদৃশ্য তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়াও উক্ত অঞ্চলগুলোর সাথে অতীতে এবং এখনও পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগের যোগসূত্র রয়েছে। সে হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম শিশু এবং কিশোর বয়সে তৎকালীন বিহার রাজ্যের সীমান্ত ঘেঁষা বাংলা ভাষাভাষী পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি মূলত পারিবারিক এবং

ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিকতায় আরবি, উর্দু এবং হিন্দি সহ আরও কিছু আঞ্চলিক ভাষায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাছাড়া কাজী নজরুল ইসলাম অনেক অঞ্চল ঘুরেছেন এবং সেই সাথে তিনি স্ব ইচ্ছায় ভাষা দক্ষতা বাড়িয়েছেন। তবে, কাজী নজরুল ইসলাম শুদ্ধ বাংলাতেই কথা বলতেন নাকি বাংলা, উর্দু, হিন্দি মিলিয়ে কথা বলতেন তার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে উনার বাংলা সহ অন্যান্য ভাষা জানার আগ্রহ এবং গভীরতা ছিল অবিস্মরণীয়। যা বড় বড় ভাষাবিদদের সমকক্ষ।

কাজী নজরুল ইসলামের বৈশ্বিক জ্ঞান বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল কিশোর বয়সে লেটো দলে যোগদান। ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ায় নিদারুণ দারিদ্র্যতা যেমন দেখেছেন, তেমনি বাবা হারা হওয়ায় শাসনহীন জীবনের স্বাধীনতাও পেয়েছেন। তৎকালীন সময়ে কাজী পরিবারে চাচা বজলে করিম ছিলেন সুবিখ্যাত পালাকার এবং গোদাকবি। মূলত পাঠ্যবই থেকে আরও ফলদায়ী ছিল সে শিক্ষা। যা হাতে কলমে তো ছিলই পাশাপাশি পরিবেশগত ভাবেও তিনি পেয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম যে অঞ্চলে জন্মেছিলেন, সে অঞ্চলে তখন হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি সু-সম্পর্কে বিরাজমান ছিল বলে আমরা ধরে নিতে পারি। আমরা যারা বাংলাদেশের মানুষ তারা হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির বিষয়টি অনুভব করি তুলনামূলক কম। এর কারণ বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যালঘু। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটু এড়িয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে, নিজ ধর্ম এবং ভিন্ন ধর্মের শিক্ষার দর্শন আদান-প্রদান চর্চায় বাংলাদেশের মানুষ অনেকটা পিছিয়ে। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম তার সময়ে সেই সুবিধাটা পেয়েছিলেন। কারণ তখন ধর্মীয় সম্প্রীতি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেয়নি। মূলত ১৯৪৭ সালের পর দুই বাংলায় এটি একটি মারাত্মক বিভেদে রূপ নেয়। যার ফলে ধর্মীয় দর্শন আদান-প্রদানের বিষয়টি আশংকাজনকভাবে কমে যায়। কাজী নজরুল ইসলাম লেটো দলে থাকাবস্থায় হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের নানা পৌরাণিক ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন এবং তিনি নিজেই কিশোর বয়সে পালা রচনা শুরু করেন। যার ফলে তিনি পরিচিত হন পৌরাণিক বিভিন্ন ঘটনার এবং নিত্যনতুন শব্দকোষের সাথে। কাজী নজরুল ইসলামের জানা আগ্রহ ছিল অগাধ। তিনি এই ধারা অব্যাহত রাখেন, যখন তিনি ব্রিটিশ ভারতের হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বর্তমান পাকিস্তানের বন্দর নগরী করাচিতে চলে যান। করাচিতে থাকা অবস্থায় এক মৌলভীর সান্নিধ্যে তিনি ফার্সি সাহিত্যের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং ফার্সি কবি হাফিজের ভাব দর্শনে মুগ্ধ হয়ে ফার্সি শেখা শুরু করেন। তবে তিনি করাচিতে এসে হরফ ধরে ফার্সি শূন্য থেকে শিখেছেন এমন ধারণা রাখা সম্ভবত ভুল। তিনি ফার্সির প্রাথমিক ধারণা পেয়েছিলেন মক্তবে থাকতেই। অতীতে ভারতের মুসলিম শাসনামলে ফার্সি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত। বিশেষ করে, আইন আদালতে।

কাজী নজরুল ইসলাম সচেতনভাবেই অনুকরণ এবং অনুসরণ প্রিয় ছিলেন। তিনি ফারসি সাহিত্যের অনেক কিছুই বাংলা ভাষায় এবং সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনকি তিনি হিন্দু পুরাণের অনেক বিষয়কে উপজীব্য করে গান কবিতায় স্থান দিয়েছেন। তিনি যখন যা দেখেছেন তাকেই অনন্যরূপে সাজানোর চেষ্টা করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক চেতনা হলো সাম্যবাদ। তিনি এই সাম্যবাদকে মানুষের কল্যাণার্থে বিধৃত করেছেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে। এই সাম্যবাদ নজরুলের গান, কবিতা, সাহিত্যে সর্বত্র দেখতে পাই। যেমন কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী কবিতা "বিদ্রোহী"। যেখানে কুরআন, পুরাণ সমস্ত চরিত্রই চিত্রায়ন করে একটি বিপ্লবী স্বাধীন, অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠা করেছেন যা বিদ্রোহী কবিতায় স্পষ্টত ফুটে উঠেছে।

বিদ্রোহী কবিতার বিশেষ কিছু অংশ বিশেষ।

"বল বীর –
বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর –
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতৃর !
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর !
বল বীর –
আমি চির উন্নত শির !
আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর রণ-তূর্য;
আমি কৃষ্ণ-কন্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধীর।
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর –

চির – উন্নত মম শির!
আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক।
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার,
আমি পিণাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দন্ড,
আমি চক্র ও মহা শঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচন্ড !
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।
আমি প্রাণ খোলা হাসি উল্লাস, – আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু গ্রাস !
আমি কভূ প্রশান্ত কভূ অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী !
আমি প্রভোন্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহা কল্লোল,
আমি উদ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছ্বল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল-দোল ! "[৩]

তাঁর অনেক সৃষ্টিকর্মেই উর্দু, হিন্দি, ফার্সি, আরবি, বাংলা এমনকি সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ প্রায় সমানুপাতিক।

বাংলা, হিন্দি এবং উর্দু শব্দ মিলিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের একটি বিখ্যাত গজল হল:

"আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন দিল ওহি মেরা ফঁস্ গয়ি।
বিনোদ বেণীর জরীন ফিতায় আন্ধা এশ্‌ক্ মেরা কস্ গয়ি।
তোমার কেশের গন্ধ কখন,
লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন
বেহুঁশ হো কর্ গির্ পড়ি হাথ মে
বাজু বন্দ মে বস্ গয়ি।
কানের দুলে প্রাণ রাখিলে বিঁধিয়া,
আঁখ্ ফিরা দিয়া চোরী কর্ নিদিয়া,
দেহের দেউড়িতে বেড়াতে আসিয়া
আউর নেহিঁ উয়ো ওয়াপস্ গয়ি।"[৪]

তিনি যখন যে পরিবেশে মিশেছেন তখন সে পরিবেশের মধ্য দিয়েই সৃষ্টির সেরাটা দিয়েছেন। যেমন, পরিবেশগত প্রভাবের কারণেই বেতারে চাকুরি সুবাদে তিনি তার গানে হাল আমলের সুরারোপ করেন। তখন কলকাতা ছিল লঘু শাস্ত্রীয় সংগীতের

স্বর্ণযুগ। ফলে, কাজী নজরুল ইসলাম ও ঠিক সে ভাবেই তার গান রচনা এবং সুরারোপ শুরু করেন। তখন ব্রিটিশ ভারতের অত্যাচার প্রসূত বাংলায় জন্ম নেয় বাঘাবাঘা বিপ্লবী। কাজী নজরুল ইসলাম নিজেও ছিলেন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী। তাঁর বিপ্লব চেতনার স্ফুলিঙ্গ থেকেই তখন সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য বিপ্লবী গান এবং কবিতা। যা আজও অখন্ড বাঙালির ক্রান্তিকালে অনুপ্রেরণা যোগায়।
তার বিখ্যাত একটি কালজয়ী বিপ্লবী গানের কিছু অংশবিশেষ হল:

"দুর্গম গিরি কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার হে
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার !
ফাঁসির মঞ্চে যারা গেয়ে গেল জীবনের জয়গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান ?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কান্ডারী হুঁশিয়ার !"[৫]

কাজী নজরুল ইসলাম প্রায় সারাজীবনই দারিদ্র্যতার সাথে বসবাস করেছেন। তিনি এ দারিদ্র্যতার কষ্ট ভোগ থেকে লিখেছেন তাঁর অমর কবিতা "দারিদ্র্য"
দারিদ্র্য কবিতার প্রথমার্ধ এবং শেষাংশ:

"হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কন্টক-মুকুট শোভা।-দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার !
পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!-মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হ'য়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি! কে বাজাবে বাঁশি ?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব?-ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস !....
আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু-নাই, কিছু নাই !"[৬]

শিল্প সাহিত্যে তার বিচরণ ছিল খাপছাড়া তলোয়ারের মতো বাধাহীন। তিনি একাধারে ছিলেন নির্ভীক, আপসহীন এবং সাম্যবাদী। কাজী নজরুল ইসলাম তার পরিবেশগত প্রভাবের ভেতর দিয়েই সৃষ্টি করেছেন এক একটি অনন্য সাহিত্য। কিন্তু

১৯৪৭ সালে দেশভাগের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রচনার আগেই কবি বাকরুদ্ধ হন। ফলে দেশ ভাগের পর তার কপালেই জুটে সবচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক সর্বনাশ। একদিকে বাকরুদ্ধ জীবনের অভিশাপ অন্যদিকে তার সৃষ্টির ধর্মভিত্তিক বিভেদ নিয়ে শুরু হয় নোংরা রাজনীতির হিন্দু মুসলিম কাটাছেঁড়া। ফলে নিদারুণ শাস্তি জুটে তাঁর এবং তার পরিবারের উপর। শুরু হয় কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে লুটপাট আর দ্বন্দ্ব। কাজী নজরুল ইসলাম যদি সে সময় সুস্থ থাকতেন তবে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষায় কাজী নজরুল ইসলামের অখন্ড বঙ্গের স্বপ্ন ভঙ্গের অনুভূতি কী হত, কি কি প্রভাব বিরাজ করত তা আমরা জানতে পারিনা। সম্ভবত এ কারণেই এ বিষয়ে অনেকেই অতীতে প্রশ্ন তুলেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশে যেভাবে চর্চিত হয়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে কেন হয় না ? একজন ভারতীয় কবি কেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি ?

উপসংহার: মূলত কাজী নজরুল ইসলামের অসাম্প্রদায়িক লড়াইকে সম্মান জানিয়ে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ২৪ মে স্বাধীন বাংলাদেশে কাজী নজরুল ইসলামকে শর্ত সাপেক্ষে ভারত থেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রদান করা হয় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব। জীবনের শেষ সময়টা তিনি কাটান ঢাকা শহরেই। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তৎকালীন ঢাকার পিজি হাসপাতালে সকাল ১০টা ১০ মিনিটে ৭৭ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আর এভাবেই ইতি ঘটে বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জল ধ্রুবতারার। যিনি জন্মেছিলেন এক অসাম্প্রদায়িক, সাম্যবাদী পরিমণ্ডলে, যিনি বহু ভাষার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে, উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে গেছেন কর্মময় সুস্থাবস্থার শেষ দিন পর্যন্ত।

তথ্যসূত্র:

১। Census of India, Vol. VIB, Pt III, Calcutta: Bangla Secretariat Press, 1902, p.18.

২। গোলাম মুরশিদ। বিদ্রোহী রণক্লান্ত। প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৮। প্রথমা প্রকাশনা। ঢাকা। পৃষ্ঠা: ১৭।

৩। কাজী নজরুল ইসলাম। অগ্নি-বীণা। দ্বিতীয় সংস্করণ। আশ্বিন ১৩৩০। আর্য্য পাব্লিশিং হাউস। কলকাতা। পৃষ্ঠা: ০৫।

৪। রশিদুন নবী (সম্পাদনা)। নজরুল সংগীত সংগ্রহ। তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২১। কবি নজরুল ইনস্টিটিউট। ঢাকা। পৃষ্ঠা: ৬৫১।

৫। নজরুল-রচনাবলী। ২য় খন্ড। প্রকাশ কাল ফেব্রুয়ারি ২০০৭। বাংলা একাডেমি। ঢাকা। পৃষ্ঠা: ১২২-১২৩।

৬। সিন্ধু-হিন্দোল। কাজী নজরুল ইসলাম। ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৫। আগামী প্রকাশনী। ঢাকা। পৃষ্ঠা: ২৭।

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

১। আব্দুল কাদির (সম্পাদনা), (নজরুল রচনা সম্ভার), প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৫, প্রকাশক: ইউনিভার্সল বুক ডিপো, কলকাতা।

২। ওয়াকিল আহমদ, (নজরুল: লেটো ও লোক-ঐতিহ্য), প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০১, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

৩। কাজী নজরুল ইসল্ (নজরুল রচনাবলী ১ম-১০ম খন্ড), প্রকাশ কাল:১৯৯৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৪। কাজী নজরুল ইসলাম, (অগ্নি-বীণা) দ্বিতীয় সংস্করণ। আশ্বিন ১৩৩০। আর্য্য পাব্লিশিং হাউস, কলকাতা।

৫। গোলাম মুরশিদ, (বিদ্রোহী রণক্লান্ত) প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৮, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

৬। ড: কাকলি ধারা মণ্ডল (সম্পাদনা), (বাংলা লোকসংগীত কোষ) প্রথম প্রকাশ ২০১৩, অমর-ভারতী, কলকাতা।

৭। ড. মাহবুবুল হক, (নজরুল তারিখ অভিধান), কথাপ্রকাশ সংস্করণ: জুন ২০১৯, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

৮। মুজফফর আহমদ, (কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা) প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২০, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।

৯। রফিকউল্লাহ খান, সৌরভ সিকদার (সম্পাদনা), (স্মৃতিকথায় কাজী নজরুল ইসলাম), প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০১, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা।

১০। রশিদুন নবী (সম্পাদনা), (নজরুল সংগীত সংগ্রহ) তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২১। কবি নজরুল ইনস্টিটিউট। ঢাকা।

১১। শাহাবুদ্দীন আহমদ, (নজরুল সাহিত্য বিচার), প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা।

১২। সিন্ধু-হিন্দোল (কাজী নজরুল ইসলাম), ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৫। আগামী প্রকাশনী। ঢাকা।

১৩। Census of India, Vol. VIB, Pt III, Calcutta: Bangla Secretariat Press, 1902. Calcutta.

মঙ্গলকাব্যের আখ্যানে বিদ্যাচর্চার স্বরূপ : একটি অনুসন্ধান

সুজয় অধিকারী
ভূতপূর্ব গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: সমাজ-জীবনে মূল্যবোধের পাঠ নেওয়ার সবচেয়ে কার্যকারী মাধ্যম হল শিক্ষা। বৈদিকযুগের শ্রুতি-নির্ভর সাহিত্যধারা, তারপর টোলনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার স্তর অতিক্রম করে বর্তমান যুগের প্রযুক্তিচালিত শিক্ষার কাঠামোটি নির্মিত হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে শিক্ষা কেবল গুরুমুখী নয়, তা হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক উভয়মুখী প্রক্রিয়া। আর শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য রচনার গুণগত মানও বর্ধিত হয়েছে। তাই চর্যাগীতি থেকে বাংলা সাহিত্যের যে সার্থক পথচলা শুরু হয়েছিল সেই গতি বর্তমান সময়েও অব্যাহত। সেজন্য প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি কেবল পয়ার ছন্দে লেখা পুচ্ছগ্রাহী আখ্যান নয়। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল - মঙ্গলকাব্যের এই তিন প্রধানশাখা এবং একাধিক অপ্রধান শাখাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিসরকে অনেকখানি খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যের আখ্যানের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলিকে নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।
সূচক শব্দ: বাংলা মঙ্গলকাব্য, মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল-ধর্মমঙ্গল কাব্য, অপ্রধান মঙ্গলকাব্য, সাংস্কৃতিক পরিসর, শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ, স্বরূপ সন্ধান।

মূল আলোচনা:

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যগুলি হল বাংলার সমাজ সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান তিনটি শাখা মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ। কারণ এই সমস্ত কাব্যের আখ্যানে কবিরা দেশ ও জাতির সামগ্রিক পরিচয় আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। আমরা জানি যে, মধ্যযুগের সমাজ পরিবেশ অনেকটাই দেব-দেবী নির্ভর গতানুগতিক। সেই সমাজ পরিবেশে বসে লেখা মঙ্গলকাব্যের আখ্যানের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের সন্ধান করতে হয় জীবনের একাধিক জলছাপকে। যাতে করে আমরা বর্তমান জীবনের সঙ্গে উক্ত সাহিত্য ধারাগুলির সংযোগ বেশি করে উপলব্ধি করতে পারি।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের আখ্যানে বিদ্যাচর্চা তথা শিক্ষা ব্যবস্থার যে রূপটি দেখা গিয়েছিল তা অনেকখানি ধর্মচর্চা হলেও; তাতে বৈষয়িক জ্ঞানের শিক্ষাচর্চাও প্রাধান্য পেয়েছিল। কারণ উপনিষদে বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।'

কিংবা মহাভারতে আছে, 'নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুঃ নাস্তি সত্যসমং তপঃ।' অর্থাৎ বিদ্যার সমান চোখ নেই, সত্যের সমান তপস্যা নেই। বিদ্যাচর্চা হল তৃতীয় নেত্রের মতো। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একাধিক আখ্যানের মধ্যে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে বিদ্যাচর্চার সেই রূপকে। সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসটুকু অল্প পরিসরে জানার চেষ্টা করব। প্রাচীনকাল এবং পরবর্তী সময়ে শিক্ষার ধারা মূলত কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। যেমন, প্রথমত বৈদিক শিক্ষা ছিল তপোবন কেন্দ্রিক। যেখানে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা গুরুকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান করা হতো। অর্থাৎ গুরু যা বলতো শিষ্য তা মন দিয়ে শুনে, গম্ভীর ভাবে চিন্তা করে, একাগ্রতায় সত্যকে উপলব্ধি করতো। গুরুর কাছে বসে অর্জিত এই শিক্ষাকে উপনয়ন বলা হত। 'উপনয়ন' কথার অর্থ সমীপে নিয়ে যাওয়া। গুরুর সমীপে যাওয়া -- এই শিক্ষার বয়সের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য জাতিভেদে তারতম্য ছিল। ব্রাহ্মণদের আট বছর বয়সে, ক্ষত্রিয়দের এগারো বছর বয়সে এবং বৈশ্যদের জন্য বারো বছর বয়সে এই উপনয়ন হতো। তবে তার আগে পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ শুরু হতো। বৈদিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে সমাজে যে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সেখানে কেবল বেদ অধ্যয়ন করা নয়, শিক্ষার পাঠক্রমও ছিল বহুমুখী। বৈদিক পরবর্তী সময়ে তাই পরাবিদ্যা, অপরাবিদ্যার উপর জোর দেয়া হয়। পরাবিদ্যা হল ব্রহ্মবিদ্যা বা আধ্যাত্মবিদ্যা। অন্যদিকে অপরাবিদ্যা ছিল যাবতীয় বিজ্ঞান, শিল্পকলার জ্ঞান। ফলে বোঝাই যায় যে, এই সময় থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বহুমুখী ভাবনার প্রবেশ ঘটতে থাকে। তবে পরবর্তী বৈদিক যুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের বৃত্তির সঙ্গে বেদের সম্পর্ক না থাকাতে, এই দুই সম্প্রদায় ক্রমে তাদের বৃত্তিসম্পর্কিত শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। সেজন্য তারা যেমন বেদ পড়তে অনীহা দেখায় তেমনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেদ পড়ার উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি হয়। ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার উঠে যায়।

বৈদিকযুগ পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারের কারণে বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছিল। বৌদ্ধশিক্ষার মূল লক্ষ্যই ছিল নির্বাণ লাভ। সহজ, সরল পালি ভাষায় সাধারণ মানুষকে জীবনের মূল লক্ষ্য অর্জনের শিক্ষা দেওয়াই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। এরপর আসে ইসলামী তথা মুসলিম শিক্ষার কথা। এই শিক্ষা ছিল মূলত শাসক গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল মক্তব এবং মাদ্রাসা কেন্দ্রিক ধর্মীয় ভাবধারার বাহক। তবে মহামতি আকবরের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ থেকে শিক্ষা সম্পর্কিত যে আধুনিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়, তা যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। শিক্ষকদের ভূমিকা সম্পর্কে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, "The teacher ought especially to look after five things : knowledge of the letters; meaning of words; the hemistitch; the verse; the former lesson." ('Abul Fazal Allami: Ain-i-Akbari' - Tr. H. Block Maan and Jarret H.S)

তবে মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে এটা বলতে হয় যে, মঙ্গলকাব্যের আখ্যানে আমরা খুঁজে পাই শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণ চিত্র নয়, নানা খণ্ড চিত্রকে। যেমন, বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসা বিজয়' কাব্যে লখীন্দরের হাতেখড়ি দেওয়ার অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায়। আমাদের মনে পড়ে যায় বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও গুরুগৃহে যাওয়ার আগে, বাড়িতে এই হাতেখড়ি দেওয়ার অনুষ্ঠান ছিল। এছাড়া এই কাব্যে লখিন্দর ছত্রিশ অক্ষর, ফলা, ধাতুর প্রাথমিক পাঠ এবং সংস্কৃত কাব্য, নাটক, জ্যোতিষ, পুরাণ প্রভৃতি চৌষট্টি বিদ্যা যে উপাধ্যায়ের কাছে শিখে নিচ্ছে সেই বিবরণ পাওয়া যায়,

অলঙ্কার কুমার পড়িল অভিধান
জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান।
অষ্টাদশ পুরাণ পড়িয়া অনিবার
হইল পণ্ডিত বড়ো রাজার কুমার।।[১]

অনুরূপভাবে কবিকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা সেই যুগের সমাজ ও শিক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করি। শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষার প্রসঙ্গে পাওয়া যায় ন্যায়, কোষ শাস্ত্র, ভট্টি কাব্য, অভিধান, জৈমিনীর মহাভারত, রঘুবংশ, অনর্ঘরাঘব, গীতগোবিন্দ, রত্নাবলী, কাদম্বরীর মত গ্রন্থগুলির উল্লেখ,

পড়এ সাধুর বালা   ক খ আঠার ফলা
অঙ্ক আস্ক সিদ্ধ বানান
গুরুবাক্যে দিআ কর্ণ   চিনিল অনেক বর্ণ
অষ্টশব্দি সুবন্ত পানিন।

....
দিবানিশি যত্নবান   পড়ে ভট্টি অভিধান
পুথি শোধে বিবিধ প্রকার।
ক্ষুদ্র কাব্য পড়ি দ্রুত   মাঘ পড়ে মেঘদূত
নৈসধ কুমারসম্ভবে
দিবানিশি নাহী জানি   পড়ে রঘু স্বেত বেনি
ভারবি উদ্ভট জয়দেবে।[২]

দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল কাব্যে শ্রীমন্তের ব্যাকরণ জ্ঞান দৃঢ় করার সংবাদ পাওয়া যায়,

পঠে শিশু সূত্র ধাতু   মাএর আনন্দ হেতু
সন্ধিতে সন্ধান জানে ভালে।
হেলাএ কলাপ পড়ি   সন্ধিতে অবতরি
পত্যন্ত লেখে সেই কালে।।
দৈববাণী কহে কথা   পঠে জ্যোতির্ব্বেদ পোথা
কাব্য শাস্ত্র পঠে অলঙ্কার।

দ্বাদশ বৎসর　　গুরুমুখে পাইয়া কিছু
শাস্ত্রেতে সাগর হএ পার।।[৩]

একইভাবে দ্বিজ মাধবেরর মঙ্গলচণ্ডীর গীতেও শ্রীমন্তের মন দিয়ে সংস্কৃত পড়ার কথা আছে জনার্দন পন্ডিতের কাছে, “ষত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়ে　সংস্কৃতে কথা কহে/ পারগ হইল ব্যাকরণ।[৪]

মঙ্গলকাব্যের অন্যতম আর একটি শাখা হল ধর্মমঙ্গল কাব্য। যেখানে লৌকিক দেবতা ধর্মকে কেন্দ্র করে একাধিক কাহিনির পরত সংযোজন করেছেন কবিরা । ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি হলেন মানিকরাম গাঙ্গুলী। তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষার বিবরণ আছে। সেখানে একজন শিশুর দশ থেকে বারো দিনের মধ্যে ভূমির উপরে বর্ণপরিচয় শেখার মাধ্যমে এবং ক্রম বিবরণে তার পাঠ গ্রহণের দৃষ্টান্তও লক্ষণীয়,

পঞ্চম বৎসর যবে হইল বয়স।
বিদ্যারম্ভে উক্ত কৈল অপূর্ব দিবস।।
....
অকারাদি ক্ষকারান্ত যে যে বর্ণগুলি।
ক্রমিক হইতে ভূমে লেখাইল সকলি।।
বড় পুত্র ধর্মের ধীষণাবান্ হয়।
অনায়াসে দিন দশে বর্ণপরিচয়।।
ব্যাকরণ প্রথমে পড়িল নানামত।
পাণিনি কলাপ ভাষ্য কোষ কতশত।
....
অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
মুরারি ভারবি ভট্টি নৈষধ পিঙ্গল।।
কালিদাসকৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র।।
ছন্দশাস্ত্র পুরাণ পড়িল তার পরে।
উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বৎসরে।।[৫]

এছাড়া ধর্মমঙ্গল কাব্যে পুথিগত বিদ্যার পাশাপাশি সমরবিদ্যা ও রাজনীতি শিক্ষার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের এবং যাদুনাথের ধর্মপুরাণ গ্রন্থে লুইধরের রণনীতি, মল্লবিদ্যা শিক্ষার বিবরণ আছে, “মল্লবিদ্যা সম যম　কেবল অর্জুন সম/ রূপে নিন্দে মীনকেতন।” নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে বাংলা, ফারসি, নাগরী বা হিন্দি, কিংবা উড়িয়া ভাষা শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের আর এক বিখ্যাত কবি রূপরাম চক্রবর্তীকে তাঁর শিক্ষাগুরু কোন কোন স্থান থেকে কী কী শিক্ষা নিতে হবে সে বিবরণ শুনিয়েছেন,

বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য নবদ্বীপে আছে।
ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে।।
নহে জউগ্রাম চল কল আনিদির ঠাঞিঃ।
তাঁর সম ভট্টাচার্য শান্তিপুরে নাঞিঃ।।[৬]

এই কাব্য থেকে আরও জানা যায় যে, রূপরামের পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর একটি বৃহৎ টোল ছিল বর্ধমান জেলার কাইতি-শ্রীরামপুরে। এর কাছাকাছি পাষাণ্ড গ্রামেও একটি টোল চৌপাড়ি ছিল। আবার বর্ধমান জেলার রামবাটি গ্রামের টোলে ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী যে শিক্ষালাভ করেছিলেন, সে তথ্যও জানা যায়। এছাড়া ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে কলিঙ্গা, কানাড়া কিংবা লখা ডোমনির মতো বীরাঙ্গনা নারীদের কথা জানা যায়। কাব্যের মধ্যে সমরবিদ্যা শেখার বিবরণ সরাসরি পাওয়া না গেলেও, তারা যে অত্যন্ত যুদ্ধ-কৌশলী ছিলেন সে বর্ণনা কাব্যের আখ্যানে ধরা পড়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর আর এক কবি দয়ারাম ছাত্রদের জন্য শাস্তিদানের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, ছাত্ররা পড়াশোনা না করতে পারলে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতেন শিক্ষাগুরু এবং তার বুকের উপর চড়ে বসে যন্ত্রণা দিতেন।[৭] বেতের ব্যবহার ছিল খুবই নিয়মিত। রূপরামের কাব্য থেকে জানতে পারা যায়, পুথির পাটা দিয়ে কবিকে তাঁর গুরুর প্রহার করার ঘটনা, 'ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।'[৮] তবে সে যুগের পাঠশালায় শিশুমনের উপযোগী করে যে নানা প্রকার উপদেশ দান করা হত সে তথ্য পাওয়া যায় দ্বিজ দুর্গারামের লেখা 'শিশুজ্ঞানচরিত্র' পুস্তিকায়। কাব্যটিতে আছে, 'পড়ুআ পড়ুআ দ্বন্দ্ব না করিহ কেহ।/ মনে করো সকলে হইবে একগ্রহ।।'[৯]

মধ্যযুগে ইসলামীয় শাসনের কারণে ভারত তথা বাংলায় ফারসি ভাষার বিস্তার প্রভূত পরিমানে ঘটেছিল। বিশেষ করে এই ভাষাতে সমস্ত সরকারী আদেশনামা, ফরমান ও হিসাব-নিকাশ পেশ করা হত। রাজদরবারের কর্মচারী হতে গেলে এই ভাষা শেখা ছিল বাধ্যতামূলক। যেজন্য 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কবি ভারতচন্দ্র ফারসি ভাষা না শিখে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে গৃহে ফিরে এলে অভিভাবকদের কাছে তিরস্কৃত হন। এজন্য তিনি রামচন্দ্র মুন্সির কাছে ফারসি ভাষা শিক্ষা করেন। তাই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে আরবি-ফারসি, বাংলা মিশ্রিত যাবনি-মিশালো ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। একটি সুবচনীয় ব্রত পাওয়া যায়, 'আর্শী, আর্শী, আর্শী। স্বামী পড়ুক ফার্সী।। এই উদ্দেশ্যেই কবি রামপ্রসাদ সেন কিংবা নরসিংহ ফারসি ভাষাতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া সপ্তদশ শতকে বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বর্ধমান শহরের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। উত্তর ভারত থেকেও অনেকে বিদ্যাচর্চার জন্য সেই সময় বর্ধমানে আসতেন। রামপ্রসাদের বিদাসুন্দর কাব্যে সে তথ্য বর্ণিত হয়েছে,

চৌদিকে চৌপাড়িময়   পাঠ্ চায় পড়ুয়াচয়,
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহুত বাড়ী,   বিদেশে স্বদেশ ছাড়ি,

আগমন বিদ্যা অভিলাষী ।।
বেদবেত্তা আগমজ্ঞ, ভূত-ভবিষৎ-প্রাজ্ঞ,
স্বধর্ম্মেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত।।[১০]

চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিতে আদিতে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামটি থাকলেও এগুলিকে মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ এগুলি সন্তজীবনী। তবুও, সমকালীন সমাজ-জীবনের বাস্তব দলিল হিসেবে এই গ্রন্থগুলির উল্লেখ প্রসঙ্গসূত্রে এসে যায়। যেমন, 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে নিমাই পণ্ডিতের শিক্ষক সত্তার যেরূপ ছবি এঁকেছেন কবি বৃন্দাবন দাস, তাতে শিক্ষক চৈতন্যদেবের অন্য এক রূপ আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়,

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
রাত্রি দিন বিদ্যারসে নাহি অবসর।।
ঊষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব শিষ্য করি সাথ।।[১১]

সেকালে বেশিরভাগ পাঠশালা বসতো গুরু মশাইয়ের বাড়িতে অথবা দোকানে। কখনো আবার ধনীব্যক্তির চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা আটচালায় বিদ্যাশিক্ষার কাজ চলতো। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, রামখড়ি দিয়ে চৌত্রিশ অক্ষর শেখার কথা। এছাড়া সেকালে শিক্ষার উপকরণ ছিল ভীষণ নগণ্য। বইপত্রের তেমন বালাই ছিল না। তাই অক্ষর পরিচয় ও বানান শিক্ষার সূচনা হতো ধুলোতে অথবা মাটির উপর বালি ছড়িয়ে। একটু পোক্ত হলে তারপর তালপাতাতে উন্নীত করা হতো ছাত্রকে। এছাড়া ভূজপত্র এবং পরবর্তীতে তুলট কাগজের ব্যবহারও করা হত। দয়ারাম দাসের 'সারদাচরিত' কাব্যের 'ধূলাকুটা পালা'-তে ধুলোর উপর লিপি অভ্যাসের কথা জানা যায়।[১২] মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকেও আমরা এ তথ্য জানতে পারি। এছাড়া গণনা শেখার জন্য পাথরের টুকরো কিংবা সামুদ্রিক শঙ্খ ব্যবহার করা হত।

আলোচনার সমাপ্তিতে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ধারার অন্তর্গত মঙ্গলকাব্যের আখ্যানে শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয়ে বলা যায় যে, সেই সময় পুথিনির্ভর শিক্ষার বাইরেও আর এক ধরনের শিক্ষা ছিল যা কোন প্রতিষ্ঠানের বাঁধা ধরা রীতিতে আবদ্ধ ছিল না। কারণ পুথিনির্ভর শিক্ষা কেবলমাত্র উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষরাই শিখতে পারতো। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায়, কালকেতু জাতিতে ব্যাধ ছিল তাই বিদ্যাচর্চার জন্য হাতেখড়ি দেওয়ার অনুষ্ঠানের বদলে বৃত্তি অনুযায়ী তার হাতে ধনুক দেবার রীতি ছিল।[১৩] তাছাড়া মঙ্গলকাব্যগুলি ছিল কথকতা বা পাঁচালী আকারে লিখিত। তাই বাংলাদেশের অশিক্ষিত বৃহৎ জনমণ্ডলীকে শিক্ষাদানের কাজে কিছু ভ্রাম্যমান পাঁচালী গায়ক সেকাজ করে যেতেন। যে কারণে মধ্যযুগের বাঙালির চিন্তা চেতনার বার্তাবাহক হিসাবে তাদের সেই ভূমিকাকে স্বীকার করতে হয়।

তথ্যসূত্র:

১. সেন, সুকুমার(সম্পা), ১৯৭৮, বিপ্রদাস মনসাবিজয়, কলকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ১৫৩

২. সেন, সুকুমার(সম্পা), ২০১৩, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ.২২২-২২৩

৩. দাস, আশুতোষ(সম্পা), ২০১২, দ্বিজ রামদেব-বিরচিত অভয়ামঙ্গল, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.২৯৯

৪. ভট্টাচার্য্য, সুধীভূষণ(সম্পা), ১৯৬৫, দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.২৩৮

৫. দত্ত, বিজিত কুমার ও সুনন্দা(সম্পা), ২০০৯, মানিকরাম গাঙ্গুলি-বিরচিত ধর্মমঙ্গল, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১১৪-১১৫

৬. কয়াল, অক্ষয়কুমার(সম্পা), ১৯৮৬, ধর্মমঙ্গল রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত, কলকাতা, ভারবি, পৃ.৮

৭. নস্কর, সনৎকুমার, ১৯৯৫, মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, রত্নাবলী, পৃ.১৭৫

৮. কয়াল, অক্ষয়কুমার(সম্পা), ১৯৮৬, ধর্মমঙ্গল রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত, কলকাতা, ভারবি, পৃ.৮

৯. মণ্ডল, পঞ্চানন, ১৯৬৮, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড পূর্বাদ্ধ, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, পৃ.২৩৩

১০. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা), ১৯৭৫, রামপ্রসাদ : জীবনী ও রচনাসমগ্র, কলকাতা, গ্রন্থমেলা, পৃ.৩০

১১. সেন, সুকুমার(সম্পা), ২০১৮, বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ.২২২-২২৩

১২. নস্কর, সনৎকুমার, ১৯৯৫, মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, রত্নাবলী, পৃ.১৬৫

১৩. সেন, সুকুমার(সম্পা), ২০১৩, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ.৪১

সংরক্ষণের পর্যালোচনা

গৌরী মণ্ডল
গবেষক, দর্শন বিভাগ,
ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আজকের সময়ে সংরক্ষণ ভীষণ চর্চিত বিষয়। বলা হয়, সংরক্ষণের কারণে সমাজের সাধারণ বর্ণের জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে। এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, বঞ্চনা সংরক্ষণের ওতপ্রোত অঙ্গ। সংরক্ষণ সমাজের এক চিরাচরিত বিষয়। কখন তা পরোক্ষ ভাবে, বা কখন প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে এসেছে। সমাজের এক শ্রেণী সংরক্ষণের পরোক্ষ সুবিধা ভোগ করলে, অপর শ্রেণী সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেছে। আবার ঐ অপর শ্রেণী প্রত্যক্ষ সুবিধার অধীন হলে, পূর্বোল্লিখিত শ্রেণীটি বঞ্চিত হয়েছে। কাজেই সংরক্ষণের কারণে বঞ্চনা, নতুন কোন বিষয় নয়। সংরক্ষণের ধারণার মধ্যেই বঞ্চনার ধারণা অন্তর্নিহিত হয়ে থাকে। সুতরাং সংরক্ষণকে মেনে নিতে হলে, বঞ্চনাকে সাথে নিয়েই মেনে নিতে হবে।
সূচকশব্দ: সংরক্ষণ, বঞ্চনা, পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ, সমতা।

মূল প্রবন্ধ:

সংরক্ষণ নিয়ে বর্তমান সমাজ ভীষণ ভাবে চিন্তিত। তবে সংরক্ষণ সমাজে বরাবরই ছিল কখনও অলিখিত বা কখনো লিখিত আকারে। যে বর্ণ ব্যবস্থার সংরক্ষণ নিয়ে চারিদিকে এত হইচই সেই সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা, আইনত প্রয়োগ হবার পূর্বে সংরক্ষণ অলিখিত আকারে সমাজে উপস্থিত ছিল। যেমন, মুঘল সম্রাট আকবরের আমলের পূর্বে এবং ঔরঙ্গজেবের সময় মুসলিম প্রজাদের ওপর করের ছাড় দিয়ে অ-মুসলিম প্রজাদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ করা হয়েছিল। অর্থাৎ মুসলিম প্রজারা এক্ষেত্রে মুসলিম হওয়ার জন্য একটি বিশেষ সুবিধা পেয়েছিল। এটাও একধরণের সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণ মুসলিমদের পক্ষে যায় এবং হিন্দুদের বিপক্ষে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, এই জিজিয়া কর ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়, অ-মুসলমানদের জিনিসপত্রাদি ও জীবনের সুরক্ষা হেতু তা দেওয়া কর্তব্য। মুসলমান স্বায়ত্ত শাসনে এটিকে জাকাতের বিকল্প ধারণা বলে মনে করা হয়। তবে বলাবাহুল্য, ঈশ্বরের সৃষ্ট জমি-মাটির উপর সাম্প্রদায়িক কোন ধর্মের জোরপূর্ব্বক কর আদায় তা ঐশ্বরিক নির্দেশ বলে মেনে নিতে অত্যুক্তি হয়। কেননা ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তাঁকে কিছু দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই তাঁর রাজত্বে বসবাস করার জন্য কোন কর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই কর ব্যবস্থা মনুষ্য সৃষ্ট এক ব্যবস্থা, যা মানুষ দিতে বাধ্য হয়। জাকাত জোরপূর্ব্বক নয়। জাকাতের ত্যাগ স্বেচ্ছা ঘটিত বিষয়। ইসলামের অন্তর্গত

জাকাত একটি উৎকৃষ্ট ধারণা যা মানুষের কল্যাণের পক্ষে উচিতার্থক বিধানকে সুস্পষ্ট করে। কাজেই মুসলিমদের জাকাত পালন ও অ-মুসলিমদের থেকে জিজিয়া কর সংগ্রহ করা এক বিষয় নয়। মোঘল সম্রাট আকবরের আমলের পূর্বে, অ-মুসলিম হবার জন্য হিন্দুদের উদ্দেশ্যে, জিজিয়া কর দিতে হবে বলে নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। কিন্তু মুসলিম প্রজাদের তা দিতে হবে না বলে উল্লেখ করা থাকে। কোথাও 'মুসলিম প্রজাদের সংরক্ষণ দেওয়া হবে' - এমন কথন প্রস্তুত করা হয় না। কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করলে এটি মুসলমান প্রজাদের অলিখিত আকারে দেওয়া একটি সংরক্ষণ; বলা চলে পরোক্ষ ভাবে দেওয়া সংরক্ষণ। সংরক্ষণের সাধারণতঃ দু'টি রূপই আমরা দেখতে পাই। এক, প্রত্যক্ষ এবং দুই, পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ সংরক্ষণ, সেই বিশেষ ব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে যেখানে কোন জাতির উদ্দেশ্যে কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়ে থাকে। সেখানে 'সংরক্ষণ' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। আর পরোক্ষ সংরক্ষণ বলতে বলা যেতে পারে সেই ধরণের সংরক্ষণকে, যা সরকারি ভাবে ঘোষণা করা না হলেও, অলিখিত ভাবেই সামাজে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। তবে সংরক্ষণ প্রত্যক্ষ হোক্ বা পরোক্ষ, তা বরাবর যে জাতির পক্ষে থাকে তাকে সুবিধা প্রদান করে। জিজিয়া কর প্রদানের সময় সংরক্ষণ অলিখিত আকারে থাকায় তা পরোক্ষ ভাবে মুসলিম প্রজাদের লাভান্বিত করেছিল। জিজিয়া করের ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হতে বহু অ-মুসলিম, মুসলিম ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

পাশ্চাত্যে যখন শ্বেতকায় সদস্যরা, কৃষ্ণকায়দের ওপর অত্যাচার করত তখন শ্বেতকায় সদস্যরা অনুভব করতে পারেনি যে তারা একটি বিশেষ জাতির সদস্য হওয়ার কারণে, অত্যাচার করার সুযোগ ভোগ করছে। একথা অবশ্যই সত্য যে, এই সুযোগ কখনই সমাজ তাদের দেয়নি। বরং সমাজ থেকে তারা এটিকে হরণ করে নিয়েছিল এবং প্রচলিত প্রথা বানিয়ে ফেলেছিল। সমাজের গঠন স্বরূপে সমাজ কোন জাতির উপর অত্যাচারকে অনুমোদন দেয় না। তার সত্ত্বেও কৃষ্ণকায় সমুদায়ে জন্ম না নিয়ে, শ্বেতকায় জাতির সদস্য হওয়া কোন এক ব্যক্তির পক্ষে পরোক্ষ ভাবে পাওয়া সংরক্ষণ বলা চলে। এই সংরক্ষণও, 'সংরক্ষণ' নামে লিখিত নয়; বরং অলিখিত।

আবার ঋক বৈদিক আর্য যুগে যখন সবর্ণরা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ) এমন দাবি করে যে, কোন একটি রাস্তা, বা নলকূপ, বা মন্দির কেবলমাত্র তাঁদেরই জন্য, কোন অবর্ণের (নিম্নবর্ণীয় শূদ্র এবং অস্পৃশ্য জাতি) অধিকার নেই তা স্পর্শ করার, তখন সেটিও এক ধরণের পরোক্ষ ভাবে পাওয়া সংরক্ষণ। তবে সেই সংরক্ষণ অবর্ণদের পক্ষে নয়; সবর্ণদের দিকে এবং অলিখিত আকারে। কেননা এখানেও 'সবর্ণদের সংরক্ষণ দেওয়া হচ্ছে'- এমন ভাষায় 'সংরক্ষণ' শব্দটির উল্লেখ থাকে না। কাজেই তারা যে একটি বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে অর্থাৎ সংরক্ষণ ভোগ করছে, সে সম্পর্কে তারা অবগত ছিল না; বরং সেটি তারা অধিকার হিসাবে বিশ্বাস করেছিল। এই

বিশ্বাসই তাঁদের উচ্চ-নীচ, ভেদাভেদ মূলক বৈষম্য করতে চারিত্রিকভাবে ইন্ধন যোগায় এবং তারা অবর্ণদের মৌলিক অধিকারকে অগ্রাহ্য করে।

অর্থাৎ সংরক্ষণ প্রত্যক্ষ ভাবে উল্লেখ করে দেওয়া হোক, অথবা পরোক্ষ ভাবে সমাজে প্রয়োগ করা হোক - যাই করা হোক না কেন, সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই বঞ্চনা প্রশ্রয় পায়। জিজিয়া করের আরোপ হলে হিন্দুরা রাজস্ব করের ছাড় থেকে বঞ্চিত হয়। সবর্ণরা বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য ও অর্থ সঞ্চয়ের একচ্ছত্র অধিকার হরণ করলে অবর্ণরা বঞ্চিত হয়। এই একচ্ছত্র অধিকারও, এক ধরণের সংরক্ষণ। যে জাতি এই অধিকার ভোগ করে আসছে এবং তা বংশপরম্পরায় রক্ষা করার দাবি করে চলেছে, তাদের দাবির অনুরূপ ঘটলে সেই জাতির পক্ষে তা সংরক্ষণ এবং যারা এই সংরক্ষণের বাইরে থাকে, তারা বঞ্চিত। কাজেই সংরক্ষণ বরাবরই তার সাথে বঞ্চনাকে নিয়ে এগিয়ে চলে। এটি বঞ্চনার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। মুদ্রার এপিঠ আর ওপিটের মতো। এটি এক গোষ্ঠীকে সুযোগ করে দেয় এবং অপর গোষ্ঠীকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। কখনও সেই পাল্লা সবলের দিকে ভারী হয়, তো কখনও আবার দুর্বলের দিকে। আর্য-বৈদিক কালে সংরক্ষণ সবর্ণের পক্ষে সহায় হয়েছিল। সবর্ণরা ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী। অবর্ণরা ছিল বঞ্চিত। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক দিক থেকে দুর্বল। ডঃ আম্বেদকরের পরবর্তী সময়ে যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা যায়। সংরক্ষণ তার অবস্থান পাল্টে অবর্ণদের পক্ষ নেয়। এত দিন ধরে সবলের পক্ষ ধরে চলে আসা সংরক্ষণের পরোক্ষ নীতি সরকারি ভাবে প্রত্যক্ষ সংরক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে সবর্ণরা বঞ্চনা অনুভব করতে শুরু করে। এই সংরক্ষণ নিয়ে সবর্ণদের মনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায়। তাদের প্রশ্ন, কেন সংরক্ষণের সুবিধা অবর্ণদের দেওয়া হবে? কেনই বা সংরক্ষণ রাখা হবে? সুবিধার সামান্যীকরণ করা হবে না কেন? - এমন প্রশ্ন মনে নিয়ে সবর্ণ সমুদায় Anti-Ambedkar movement আনতে চায়। তারা এর কারণ জানলেও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারে না।

কাজেই সংরক্ষণের নিজস্ব অবস্থান কোথায়? সংরক্ষণের ধারণা কি সমাজের পক্ষে ইতিমূলক? না এর নেতিমূলক ভূমিকাও আছে? এটি কি সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য? এটি যেমন ইতিমূলক, তেমন নেতিমূলকও বলা চলে। যখন এটি প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজের অঙ্গ হয় তখন যেমন এক শ্রেণীকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে দিতে সহায় হয় তেমন আবার, এক শ্রেণীর হঠকারি আচরণকে খর্ব করে। দু’টিই এক্ষেত্রে ইতিমূলক ভূমিকা পালন করে। তবে এক জাতি যদি নিজেদের আধিপত্য স্থাপনে অপরের অধিকারকে খর্ব করে এবং তা শাস্ত্রীয় বিধান বলে লিপিবদ্ধ করতে চায়, তখন সবলের পক্ষে সেই সংরক্ষণ স্বার্থসিদ্ধির উপায় হলেও সমাজের পক্ষে তা নেতিমূলক ভূমিকা গ্রহণ করে। সমাজ সবল-দুর্বল, ধনী-গরিব, ক্ষমতাশালী-ক্ষমতাহীন সকলের জন্য। কাজেই সমাজের উন্নতিতে সকলের অবদান গ্রহণযোগ্য। এক জাতি উপর আরেক

জাতির নিপীড়ন বা প্রভাব ফলানোর প্রচেষ্টাকে সেক্ষেত্রে একেবারেই ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না।

তাছাড়া মনে রাখতে হয়, জিজিয়া কর হোক্ বা, বর্ণ-বৈষম্য - সকল বৈষম্য নীতির মূলে, জমি দখলের লড়াই ছিল প্রধান। যখন যে জাতি ঈশ্বর সৃষ্ট জমি দখল করতে পেরেছে তারা নিজেদের উন্নয়নের স্বার্থ বজায় রেখে অপর জাতিকে হেয় করতে ব্যস্ত হয়েছে। এই অন্তর্দ্বন্ধের মধ্যে দিয়েই সমাজ চিরকাল এগিয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকালে আদি জাতি রূপে আমরা দ্রাবিড়, পল্লব, কিরাত প্রভৃতি জাতির সন্ধান পাই। সুলতান হোক্, বা আর্য - কোনটাই ভারতবর্ষের নিজস্ব জাতি ছিল না। তথাপি তারা ভারতবর্ষের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে ভারতবাসী হয়ে গেলেও তাদের জমি দখলের নীতি এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা, অন্য জাতিকে অপদস্থ করে এসেছে। শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায়দের মধ্যে করা বৈষম্যের ক্ষেত্রেও একই বিষয় লক্ষ্য করা যায়। শ্বেতকায় শ্রেণী তাদের আর্থি-সামাজিক, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে কৃষ্ণকায়দের উপর নিপীড়ন চালায়। তাঁদের লক্ষ্য, কৃষ্ণকায়দের বঞ্চিত করে শ্বেতকায়দের স্বার্থ সুরক্ষিত করা।

সুরক্ষিত করা বলতে বোঝায় সংরক্ষণ দেওয়া। সংরক্ষণের বিষয় কোন বস্তু, কোন নিয়ম বা কোন রীতি-নীতি হতে পারে, বা কোন সামাজিক আচার আচরণও হতে পারে। তেমন এটি কোন জাতি, গোষ্ঠী বা সম্পদ্রায়ের উন্নতিও হতে পারে। আবার কোন জাতি, গোষ্ঠী বা সম্পদ্রায়কে অবলুপ্তির প্রকোপ থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেও হতে পারে। পরোক্ষ ভাবে সমাজে যে সংরক্ষণ প্রচলিত ছিল তা কেবল সবলের উন্নতিকে আরও বর্ধনশীল করে তোলার পক্ষে সহায় হয়েছিল এবং সেই সময় বঞ্চিত অসহায়রা দুর্বল থেকে দুর্বলতর অবস্থায় পরিণত হচ্ছিল। ফলে অসহায় জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক ও মৌলিক অধিকারগুলি বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয়। সেই অবলুপ্তির পথ থেকে সুরক্ষা দিতে সমাজের পরোক্ষ সংরক্ষণের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রত্যক্ষ সংরক্ষণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। পরোক্ষ সংরক্ষণ দুর্বলের উন্নতিতে বাধক হয়ে উঠেছিল। তাই তা পরিবর্তনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, পরোক্ষ সংরক্ষণ কি কেবল সবলেরই পক্ষ নেয়? দুর্বলের পক্ষ কি নিতে পারে না? সংরক্ষণের বাস্তব পরিস্থিতি ও দুর্বলের উন্নতির পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করে আমরা কখনই একথা বলতে পারি না যে পরোক্ষ সংরক্ষণ দুর্বলের পক্ষ নেয়। তবে পরোক্ষ সংরক্ষণ দুর্বলের পক্ষ না নিতে পারলেও প্রত্যক্ষ সংরক্ষণ সর্বদাই দুর্বলের উন্নতিতে সহায় হয়। প্রত্যক্ষ সংরক্ষণ সামাজিক ভাবে সমতার মানদণ্ড বজায় রাখতে চায়। কাজেই সংরক্ষণ তখনই সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা সমাজে উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত, বিত্তশালী-বিত্তহীন, সর্বাধিকারী-সর্বহারা, সবল-দুর্বল, ক্ষমতাশালী-ক্ষমতাহীনদের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে কার্য করবে। সুতরাং যে সংরক্ষণ সমাজে সমতা আনার বিষয়কে প্রশয় দেয়, সেই

সংরক্ষণকে উচিত এবং যে সংরক্ষণ দুর্বলের পরিস্থিতিকে দুর্বলতর করার পক্ষে ইন্ধন যোগায়, সেই সংরক্ষণকে (পরোক্ষ সংরক্ষণ) সমাজে অনুচিত বলে গ্রহণ করতে হয়।

ডঃ আম্বেদকর দলিত তথা অনুন্নত জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধক পরিহারের জন্য যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার চালু করেন তা ঐ জাতির জীবন ধারণের পথকে সুগম করে তোলে এবং সমাজে উন্নত-অনুন্নত বর্ণের মধ্যে সমতা আনার প্রচেষ্টা করে। কাজেই এই সংরক্ষণকে আমরা যথাযথ (Just) বলতে পারি। এই সংরক্ষণের মাত্রা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনার জায়গা থাকলেও, এর বঞ্চনা নিয়ে বর্তমান যুগে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেই বঞ্চনা নতুন কিছু নয়। সংরক্ষণের ধারণার মধ্যে পূর্ব থেকেই তা অন্তর্নিহিত ছিল। অর্থাৎ এটা অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে, আর ভবিষ্যতেও থাকবে - একথা মেনে নিয়েই আমাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে মেনে নিতে হয়।

তথ্যসূত্র:

- Bains R. S (1994): **Reservations policy and Anti-reservationists**, B.R. Pub. Corp.,
- Bhatnagar, V. S (2018): **Emperor Aurangzeb and destruction of temples: conversions, and Jizya**, Literary Circle, Jaipur, Rajasthan
- Narain H (1990): **Jizyah and the Spread of Islam**, Voice of India, New Delhi.
- পাল সুবীরকুমার (২০২৪): **ঔরঙ্গজেব: হিন্দু মন্দির ধ্বংস, ধর্মান্তরীকরণ ও জিজিয়া**, অক্ষর সংলাপ প্রকাশন
- Ray R. M. H (2022): **Structural Racism in America : Sociological theory, Education inequality, and Social Change**, Routledge, Taylor & Francis Group, New York,
- Tripathi A. R (2015): **Manu-Smriti (A Critical Study and Its Relevance in the Modern Times),** D. K. Printworld Pvt. Ltd.

অমর মিত্রের গল্পে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম, অবহেলা ও অপ্রাপ্তি ; প্রসঙ্গ ছিটমহল

মৌসুমী পাল
ফেকাল্টি, বাংলা বিভাগ
ভবনস্ ত্রিপুরা টিচার ট্রেনিং কলেজ
আনন্দনগর, আগরতলা
পশ্চিম ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ : বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের মতোই ভারত-বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিল বহু ছিটমহল। ২০১৫ সালের ১ আগষ্ট রাত ১২ : ০১ মিনিটে দুই দেশই ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির আওতায় একে অন্যের অভ্যন্তরে থাকা নিজেদের ছিটমহলগুলির পরস্পরের সাথে বিনিময় করে নেয়। ছিটমহলে বসবাসকরী সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনযন্ত্রনা, জীবনযুদ্ধ ও অপ্রাপ্তি নিয়ে হাতে গোনা কয়েকটি সাহিত্য নির্দশন রয়েছে বাংলা সাহিত্যে। ছিটমহল সৃষ্টি নিয়ে বহু ইতিহাস–কিংবদন্তি-লোকশ্রুতির প্রচলন রয়েছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে বাঙালি জাতির এহেন বৃহৎ মানবিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিফলন কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত নগন্য। বাংলা সহিত্যের পাঠকদের নিকট এই অন্ধকার পথের দিশারি হলেন সাহিত্যিক অমর মিত্র (জন্ম ৩০ আগষ্ট, ১৯৫১-)। এই প্রসঙ্গে তাঁর সব থেকে জনপ্রিয় ছোটগল্প হল 'যুদ্ধে যা ঘটেছিল' গল্পটি। এটি ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষের অপ্রাপ্তি ও জীবনযন্ত্রণার জীবন্ত দলিল হিসেবেই পাঠক সমাজে অধিক পরিচিত। গল্পটিতে অমর মিত্র অপূর্ব দক্ষতার সাথে অতীত স্মৃতি চারণার মাধ্যমে ছিটমহল সম্পর্কিত ইতিহাস ও প্রচলিত কিছু লোকশ্রুতির অবতারণা করে তৎকালীন সময়ের পরিস্থিতি ও মানুষের অসহায়তার অদ্ভূত বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন।
শব্দ সূচক :- মানুষের জীবনযুদ্ধ, অপ্রাপ্তি, অসহায়তা, যুগযন্ত্রণা ও স্বপ্ন দেখা।

মূল আলোচনা :-

"যথা বিহিত সন্মান প্রদর্শন পূর্বক নিবেদন এই যে, আমার নিম্ন সাক্ষরকারী উল্লেখিত ছিটের বাসিন্দা এই মর্মে অভিযোগ করিতেছি যে, গত শতাব্দীর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হইতে কী এক অজ্ঞাত কারণে ভারতীয় ভূ-খন্ডে অবস্থিত উল্লেখিত মৌজাগুলিকে পাকিস্তান বলিয়া দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তীকালে সেই পাকিস্তান বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার পর আমরা উল্লেখিত ছিটের বাসিন্দাগন বাংলাদেশি হইয়াছি।

কেন হইয়াছি, তাহা আমাদিগের কপাল। কপাল না হইলে পাশের গ্রাম মদানগুড়ি ইন্ডিয়া হয়, সেইখানে গ্রাম পঞ্চায়েত হয়, ভোটার কার্ড হয়, ঠিকানা হয়, চিঠি হয়, কিন্তু আমাদের কিছুই হয় না।"[১] (যুদ্ধে যা ঘটেছিল,/ অমর মিত্র)

-ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষের জীবনের নিদারুণ বেদনা ও অপ্রাপ্তির জীবন্ত দলিল হিসেবে অগ্রগণ্য অমর মিত্রের 'যুদ্ধে যা ঘটেছিল' গল্পটি। গল্পকার অমর মিত্র আলোচ্য এই গল্পটিতে ছিটমহলে বসবাসকারী দরিদ্র সাধারণ জনগনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কী ভয়াঙ্কর অপমান, অস্বস্থি ও আশঙ্কা নিয়ে কাঁটে তার একটি নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন।

আলোচনার শুরুতে 'ছিটমহল' বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনার আবশ্যকতা রয়েছে। কারন- "ভারত আর বাংলাদেশের ছিটমহলের সমস্যা সাড়ে ছয় দশকের পুরানো হলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই সমস্যা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সাহিত্যিক বা গবেষক বা চিত্র নির্মাতাদের কাছে ছিল অজানা। তাই ইন্টারনেটে সার্চ করলেও হাতে গোণা কিছু তথ্য পাওয়া যায় ; আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা একেবারেই নগন্য।"[২] শুধু তাই নয়, দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত (ছিটমহল সমস্যা কেন্দ্রিক তথ্যচিত্র নির্মিতা)- র মতে প্রথম পর্যায়ে ছিটমহলের মতো কোনো বিষয় যে আদৌ থাকতে পারে তা অনেককেই তিনি বিশ্বাসই করাতে পারেননি। তাঁর কথায় "বিদেশীদের কথা তো বাদই দিলাম, দিল্লি, মুম্বাই এমনকি কলকাতাতেও যখন আমার তথ্যচিত্রের প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলতে গেছি, সবার কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকেছে যে এক দেশের মধ্যে অন্য দেশ কীভাবে থাকে! অনেকে মনে করতেন আমি হয়তো বানিয়ে গল্প বলছি।"

খুব সাধারণ ভাবে ছিটমহল প্রসঙ্গে বলা যায়, এ হচ্ছে কোনো দেশের মূল ভৌগোলিক সীমানা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অন্য একটি দেশের মূল ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে বিরাজমান ভূ-খন্ড বা জনপদ। ছিটমহল দেশের মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন বলে, ওখানে যেতে হলে অন্য দেশের ভূ-খন্ডের ওপর দিয়ে যেতে হয়। একটু অন্যভাবে বলতে গেলে, ছিটমহল শব্দটি দ্বারা কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভূগোল অনুসারে সত্য এমন কিছু অঞ্চল বা ভূ-খন্ডকে বোঝায়, যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মূল ভূ-খন্ডের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থিত অন্য কোনো একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত এলাকা বা ভূ-খন্ড। তথা ছিটমহল হল- "a country or especially, an out lying portion of a country, entirely or mostly surrounded by the territory of another country."[৩]

বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের মতোই ভারত-বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও ছিল এ ধরনের বহু ছিটমহল। ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের সর্বমোট ১৬২টি ছিটমহল ছিল। তবে ২০১৫ সালের ০১ আগষ্ট রাত ১২ : ০১ মিনিটে দুই দেশই ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্ডিরা চুক্তির আওতায় একে অন্যের অভ্যন্তরে থাকা নিজেদের ছিটমহলগুলি পরস্পরের সাথে বিনিময় করে। এই ঐতিহাসিক চুক্তির ফল

স্বরূপ বাংলাদেশ পেয়েছে লালমনির হাটে ৫৯টি, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, কুড়ি গ্রামে ১২টি, নীলফামারীতে ৪টি সহ-মোট ১১১টি ছিটমিল। অপরদিকে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলে মধ্যে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৪৭টি কুচবিহার ও ৪টি জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়।[৪]

প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে তথা অখন্ড ভারতবর্ষের প্রায় ৪০ শতাংশ ভূমিই কিন্তু ছিল তথাকথিত 'স্বাধীন রাজ্য' বা 'নেটিভ স্টেট বা 'প্রিন্সলি স্টেট'। অর্থাৎ এই সমস্ত রাজ্যগুলি কার্যত ব্রিটিশদের অধীনেই ছিল, রাজ্যগুলি রাজা বা জামিদারদের কর দিতে হতো ব্রিটিশ সরকারকে, তবে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়দিতে কর্তৃত্ব ছিল সেই রাজ্যের রাজা বা জমিদারদেরই। তাই ভারত ভাগের সময় এরূপ রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া বা ভাগ করার অধিকার ব্রিটিশ সরকারের না থাকায়, ১৯৪৭ সালের ১৫ জুলাই 'ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট – ১৯৪৭'- পাশ করার পর, সেই আইন অনুসরন করে ওই বছরই ১৫ আগষ্ট ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ রাজের চিরতরে বিলুপ্তি ঘটে এবং পাশাপাশি ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টির সময় – সেই সমস্ত 'স্বাধীন রাজ্যগুলির' স্ব-ইচ্ছায় (রাজা-জমিদার কিংবা কখনো চা বাগানের মালিকদের ইচ্ছানুযায়ী পর্যন্ত) ভারত বা পাকিস্তানকে বেছে নিয়ে নিজের রাজ্যকে সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ছিটমহল সমস্যা বৃহদাকার ধারণ করেন সেই থেকে।[৫]

ছিটমহল সমস্যা কিন্তু মূলত অখন্ড ভারতের কোনো সমস্যা ছিল না, স্বাধীনতা লাভের সময় দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করার সময়ই ছিটমহল সংকটের মতো এক বৃহৎ অসহনীয় মানবিক সমস্যার জন্ম হয়েছিল। আর এই বৃহৎ মানবিক সমস্যার কর্ণধার ছিলেন ব্রিটিশ সিরিল র‍্যাডক্লিফ। র‍্যাডক্লিফ প্রদত্ত ভারত-পাকিস্তান মানচিত্রে ভারতের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহার অঞ্চলের বেশ কিছু অংশ চলে যায় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে, আবার উল্টো ভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের অনেক অংশ চলে আসে ভারতে। এই ঢুকে পড়া ভূমিগুলিই হলো এক একটা ভিন্ন ভিন্ন ছিটমহল। যেমন- "কুড়িগ্রাম ছিটমহলের ভেতরে রয়েছে দাশিয়ারছড়া। আবার এই দাশিয়ারছড়ার মধ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের ছিটমহল চন্দ্রখানা।"[৬] আর এই ছিটের বাসিন্দারা পরিচিত হলেন 'ছিটের মানুষ' রূপে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহলের লোকসংখ্যা ছিল ১৪ হাজার আর বাংলাদেশের অভ্যন্রে ভারতের ছিটমহল বসবাসকারী ছিল ৩৭ হাজার। অর্থাৎ মোট ৫১ হাজার ছিটমহলবাসীরা ৬৮ বছর ধরে উত্তরাধিকার সূত্র পূর্বপুরুষ কাছ থেকে পেয়ে চলেছিল শুধুমাত্র হতাশা আর অপ্রাপ্তিতে ভরা এক 'না-মানুষের' জীবন।

এই ছিটমহল সৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন ইতিহাস ও বহু লোকশ্রুতির প্রচলন রয়েছে। যেমন"এই ছিটমহলগুলার অধিকাংশই প্রাচীন কুচবিহার রাজ্যের অংশ ছিলো। আর অনেকটা মোগল আমল থেকেই এই এলাকাগুলোর এই অবস্থা, জনশ্রুতি আছে, সে

সময় কুচবিহার রাজ্যের রাজা, আর রঙপুর রাজ্যের রাজার মধ্যে পাশা খেলায় বাজির পুরস্কার হিসেবে এই এলাকাগুলা আদান-প্রদান হতো। ফলে কুচবিহার রাজ্যের অংশ হয়ে পড়ে এমন অনেক এলাকা যা আসলে রঙপুর, আর উল্টোটাও।”[৭] আসলে, ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় থেকে ছিটমহল একটা বড় রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন থেকেই জাতীয়তাবাদী সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য রাষ্ট্রের অনুমতি সাপেক্ষ প্রয়োজনীয় হয় এবং পাসপোর্ট-ভিসা অবিচ্ছেদ্য উপাদান হয়ে পড়ে। সেই থেকেই ছিটমহলবাসীরা কার্যত হয়ে পড়ে নিজ দেশেই অবরুদ্ধ নাগরিক আর ধীরে ধীরে ছিটমহল হয়ে ওঠে অপরাধীদের অভয়ারণ্য। কারণ বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারণে কোনো রাষ্ট্রের পুলিশই ছিটমহলে প্রবেশ না করায়, নারী, শিশু ও মাদক পাচারের গতিপথ হয়ে ওঠে এই সমস্ত ছিটমহলগুলি। শুধু তাই নয়, ধষণ, খুন, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি সমস্ত সন্ত্রাসিদের মূল আস্তানা হয়ে ওঠে এই ছিটমহলগুলি। আর এদিকে ছিটমহলবাসীরা নামমাত্র নাগরিকত্ব পেয়ে, রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে, অস্বাস্থ্য নামমাত্র শিক্ষা বা নিরক্ষতা(কখনো আবার শিক্ষার জন্য নিজ ঠিকানা বা পিতৃ পরিচয়টুকু পর্যন্ত গোপন করে চলা), অবিশ্বাস, কুসংস্কার, শুধুমাত্র বেঁচে থাকা বা টিকে থাকার তাগিদে অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদহীন হয়ে একমাত্র ‘ছিটের মানুষ’ পরিচয়টুকু নিয়ে জীবনের ৬৮টি বছর কাটিয়ে দিয়েছে।

এহেন এক বৃহৎ মানবিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিফলন কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যে নিতান্তই নগন্য। যা বাংলা সাহিত্যপ্রেমী ও পাঠকদের নিকট অত্যন্ত বেদনাদায়ক। দেশভাগের এই অমানবিক ও জ্বলন্ত ক্ষতচিহ্ন সরূপ বয়ে চলা এই ৬৮ বছরের দূর্ভাগ্য ‘ছিটমহল’ সমস্যা নিয়ে বাংলা ভাষায় বর্তমান সময় পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকটি ছোটগল্প (এর মধ্যে অনেক গল্পে শুধুমাত্র ‘ছিটমহল’ প্রসঙ্গটুকুই এসেছে) ও মাত্র দু’টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। একটি উপন্যাস হল বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় লেখিকা সেলিনা হোসেনের ‘ভূমি ও কুসুম’ (ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন,২০১০) এবং অন্যটি হল এপার বাংলার(পশ্চিমবঙ্গের) বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কথা সাহিত্যক অমরমিত্রের ‘কুমারী মেঘের দেশ চাই’ (দে’জ পাবলিশং, ২০১৭) এক্ষেত্রে উভয় ঔপন্যাসিকই উপন্যাস দু’টি রচনা প্রসঙ্গে নিজের মতামত দিতে গিয়ে বলেছেন-

ক) সেলিনা হোসেন-“যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, তখনই শুনেছি ছিটমহলের কথা, তবে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সে সময় ছিল না। আমার মাথায় সে সময় একটাই বিষয় ছিল- রাষ্ট্রের ভেতরে আরেকটি রাষ্ট্র কী অদ্ভূত ব্যাপার। নিজের রাষ্ট্র থেকে আবার নিজের রাষ্ট্রে আসতেই নাগরিকদের পাসপোর্ট-ভিসা লাগছে, অন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে ভেতর বিপন্ন এই মানুষগুলো বেদনাহত করতে থাকে আমায়”।[৮]

খ) অমর মিত্র-“আমি কলকাতায় মানুষ। তাই ছিটমহলের বিষয়টা জানতামই না। গত বছর দিনহাটায় একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে ছিটমহলের ব্যাপারটা জানতে পারি আর

সেখানে প্রথম যাই। এতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার- এত বছর ধরে এত মানুষ যে নিরালম্বু হয়ে ঝুলে থাকতে পারেন, রাষ্ট্র বিহীন হয়ে, নাগরিকত্ব বিহীন হয়, না গেলে জানতামই না। তারপরই ছিটমহল নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করেছি।”[৯]

মোটকথা উল্লেখিত দুই বাংলার দুই ঔপন্যাসিকই যেন নিজেদের এই বক্তব্যে দুই বাংলারই সমস্ত সাধারণ নাগরিকদের প্রতিনিধি হয়ে, ছিটমহলবাসীদের ৬৮ বছরের অভিশপ্ত জীবনের অবহেলা, বেদনা ও অপ্রাপ্তির প্রসঙ্গকেই স্পষ্টীকরণ করেছেন এবং এই বৃহৎ সমস্যাটিকে সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইছেন।

কথাসাহিত্যিক অমরমিত্র (জন্ম-১৯৫১ সালের ৩০ আগষ্ট, পূর্ববঙ্গের সাতক্ষীরা উপজেলার ধূলিহর গ্রামে) তাঁর বেশ কয়েকটি সাহিত্য সৃষ্টিতে ছিটমহল প্রসঙ্গ এবং ছিটমহলের বাসিন্দাদের জীবনের বেদনাও অপ্রাপ্তির প্রসঙ্গে আলোচনায় রত হয়েছেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির, বিশেষত ছোটগল্প রচনায় প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল বিষয় বৈচিত্র। বাঙালির জাতীয় জীবনে অর্ধ-শতাব্দী ধরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সমাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমস্তদিকের পরিবর্তনই তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তুতে স্থান পেয়েছে। তাঁর বিভিন্ন গল্পে শহুরে একঘেয়েমি, রুক্ষ ও জটিল জীবন অবিজ্ঞতার পাশাপাশি সহজ-সরল-শান্ত-কুসংস্কার ও দারিদ্রতায় ভরা গ্রাম্য জীবনও সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয় ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ, বিশেষত জাতির জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশভাগের প্রতিফলন, স্বাধীনোত্তরকালে সৃষ্ট উদ্বাস্তু ও শরনার্থী সমস্যা, দেশভাগের চরম হতাশা ও বিষাক্ত ক্ষত চিহ্ন রূপে পরিচিত ছিটমহল সমস্যা তাঁর গল্পলোকের মূল বিষয় হিসেবে বার বার বিবেচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ভারতের ছিটমহল সমস্যা ও ছিটে বসবাসকারীদের অভিশপ্ত জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে রচিত অমরমিত্র ছোটগল্প প্রসঙ্গে প্রধানত তাঁর ‘যুদ্ধে যা ঘটেছিল’ গল্পটিই মনে পড়ে। এছাড়া তাঁর ‘চোখ আর নদীর জল’ গল্পটিতেও বাংলাদেশের শাহবাগ অন্দোলন এবং তিস্তা জলবন্টন সমস্যা ও তার সাম্প্রতিকতম চুক্তির পাশাপাশি ছিটমহল সমস্যার প্রসঙ্গ রয়েছে। ‘যুদ্ধ যা ঘটেছিল’ গল্পটির আলোচনার সূচনাতেই এর রচনা শৈলীর আঙ্গিকের ভিন্নতার কথা বলা আবশ্যক। কথাশিল্পী অমরমিত্র আলোচ্য গল্পের মূল বিষয়কে উওম পুরুষের কথনরীতিতে, এবং একটি আবেদন পত্র লেখার আঙ্গিকে, সৃষ্টি করেছেন। গল্পের শুরু-

“মাননীয় জেলা শাসক মহোদয়,
কোচবিহার জেলা
পশ্চিমবঙ্গ
ভারত।
বিষয় : মশালডাঙ্গা, মুন্সির ছিট, বাতৃগাছ, গয়াবাড়ি
ছিটমহলের নাগরিকগণের নিবেদন পত্র।

মহাশয়, - - -"[১০]

-গল্পটির এই অপূর্ব বৈচিত্রময় ও ব্যতিক্রমী সূচনাই পাঠকমহলের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ বলা যেতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে, অমর মিত্র এমনই একজন দক্ষ সাহিত্যিক যে, তিনি বিভিন্ন গল্পে তাঁর অপূর্ব ও সুরুচিসম্পন্ন শব্দচয়ন এবং অসামান্য বক্তব্য উপস্থাপনের দক্ষতায় সমস্ত পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যেতে পারেন। শুধু তাই নয়, মানুষের জীবনের কোনো মৌল সত্যের পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধু মাত্র কালের ব্যবধানের হাত ধরে তিনি সমকালকে পুরাকালের সঙ্গে নিখুঁত ভাবে মিশিয়ে দিতে পারেন। রুশতী সেনের ভাষায় – "সমকালকে রূকথায় বাঁধবার স্বপ্ন অবশ্য অমর মিত্রের অরো পুরনো"।[১১] 'যুদ্ধে যা ঘটেছিল' গল্পটিতেও এই সমস্ত ভাবনা সমূহ সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে তিনি ছিটমহল সমস্যার কিছু নিষ্ঠুর ও নির্মম ইতিহাসকে নিজের কল্পনার কিছু রং মিশিয়ে হৃদয়গ্রাহী সাহিত্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন।

'যুদ্ধে যা ঘটেছিল' গল্পটিতে আমরা স্পষ্টই দু'টি ভাগ লক্ষ করতে পারি। প্রথম ভাগে অর্থাৎ গল্পের শুরুর দিকে রয়েছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও স্বাধীনোত্তর সময়কালের ছিটমহল কেন্দ্রিক কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা এবং গল্পের দ্বিতীয় ভাগে দেখা যায়, গল্পকার ইতিহাসের সাথে বাস্তব ও বাস্তবের সঙ্গে নিজের কল্পনার রঙ মিশিয়ে ছিটমহলের একেবারে সমকালীন বাস্তব চিত্রকে নিখুঁত ভাবে চিত্রিত করেছেন। গল্পের শুরুতে পত্রলেখক মশালডাঙা, মুঙ্গিরহাট, বাতৃছিট, গয়াবাড়ি প্রভৃতি ছিটমহলের নাগরিকবৃন্দের মুখপাত্র স্বরূপ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহার অঞ্চলের জেলা শাসককে লেখা নিবেদনপত্রে, তার নিজেদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য দুর্ভাগ্যের কথা জানাতে গিয়ে, সেই মোগল আমলের ইতিহাস টেনে বলছে- মোগল প্রতিনিধি রংপুরের ঘোড়াঘাটার নবাব সৌলৎ জং এবং কোচবিহারের মহামান্য নৃপতি উপেন্দ্রনারায়নের লড়াইয়ের কথা। যে লড়াইয়ের সূত্র ধরেই সেখানকার প্রজাদের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হয়েছিল- "জয় হয় বটে কিন্তু কিছু মৌজার প্রজা নাকি সাবেক মোগলদের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য বজায় রাখেন। কেন, না তাঁহারা নাকি মোগল সৈন্য ছিলেন। - - - আমাদের পূর্বপুরুষ মোগল সৈন্য ছিল কি না জানা নাই, কিন্তু কৃষিই ছিল তাঁহাদের মূল জীবিকা তা আমাদিগের অবগত। স্বাধীনতার পর রংপুরের নবাব যেহেতু পাকিস্তানে মত দান করেন, সেই কারণে ভারতে থাকিয়াও আমরা পাকিস্তানি হইয়া গেলাম"।[১২]

গল্পে উল্লিখিত গ্রামের বাসিন্দাগন স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তানি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তা তারা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেনি- "মাননীয় জেলা শাসক মহাশয়, আমাদিগের জেলা শাসক আপনি হয়েন, বাংলাদেশের লালনির-হাট, নীলফামারি কিংবা রংপুর কোনো জেলার জেলা শাসক আমাদের জেলা শাসক হইতে পারেন না। আমরা তাহা মানিব না। কেন না সে বহুদূর। একটা দেশ পেরিয়ে

কাঁটাতাবের বেড়া পেরিয়ে আর একটা দেশ। আমরা বাংলাদেশের ছিটের বাসিন্দা হইলেও সেই বাংলাদেশ অন্য দেশ। আমরা তাহা দেখি নাই।"[১৩]

গল্পকার অমর মিত্র এখানে খুব সুন্দর ভাবে অতীত স্মৃতি চারণার হাত ধরে ছিটমহল সম্পর্কিত অতীত ইতিহাসের অবতারণা করেছেন। কীভাবে কোচবিহারের রাজা ও রংপুরের নবাব নিজেদের মৌজাগুলির বাজি রেখে অদ্ভুত এক দ্যূত ক্রীড়ায় রত হতেন, গল্পে তার বর্ণনা রয়েছে। পাশাপাশি আরো বর্ণনা আছে যে, খেলায় নিজেদের জয়ের উল্লাসে কীভাবে তারা গুলি ও কামানের আঘাত এনে শীতের তামাক ও সরিষার ক্ষেত নষ্ট করেছে এবং নীলাকাশ ফেটে বজ্রপাত সহ বৃষ্টি এনে অনেক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। "তাঁহারা পাশা খেলিতে বসিলেন, দুই ভাগ্য বিধাতা। - - - তাঁহাদের খেয়ালে আমাদের এই ভাগ্য রচিত হইয়াছে। - - - আনন্দ খুব এই খেলায়। ধন-সম্পত্তি, ভূমি ও নারীকে বাজি রাখা যায়। - - - আমাদিগের ভাগ্য যেই পাশা খেলায় নির্ধারণ হইয়া গিয়াছিল। এখন যে আমরা ভারতের ভিতরে বাংলাদেশী হইয়া আছি এবং ওপারে অনেক মৌজা বাংলাদেশের ভিতরে ভারত হইয়া রহিয়াছে, তাহার কারণ সেই, সেই বন্দুক এবং কামানের উল্লাস।"[১৪]

'দাদি কহিতেন' বলে রূপকথার মতো গল্পকার ছিটমহল সৃষ্টির কারণ ও ইতিহাস বর্ণনা শুরু করার একটু পরই তিনি চলে এসেছেন একেবারে সমকালে। প্রসঙ্গত, সময় বা কাল নিয়ে এইভাবেই খেলা করাতে অমর মিত্রের স্বকীয়তা। সমকালের বর্ণনায় এসে গল্পকার ছিটমহলবাসীদের জীবনের নিদারুণতা, হতাশা আর অপ্রাপ্তির কথা স্পষ্ট ভাষাতেই বর্ণনা করেছেন- " মাননীয় মহোদয়, আমাদিগের দেশ নাই। দেশ নাই তাই কিছুই নাই। হাসপাতাল, ইস্কুল, ব্লক আপিস, পঞ্চায়েত, থানা, চৌকি, রেশন কার্ড, ইলেকট্রিক, জল কিছুই নাই। মোবাইলের সিমও নাই। ফলে গ্রাম হইতে বাহির ইন্ডিয়া গেলে ভয় হয় কখন অনুপ্রবেশের দায়ে ধরা পড়ি। - - - ইন্ডিয়ার ইস্কুল কলেজে পড়ার কোনো উপায় নাই মিথ্যা পরিচয় গ্রহন করা ব্যতিত। ছিটমহলের কন্যার জন্য ইন্ডিয়ার বা বাংলাদেশ, কোথাও পাত্র পাইবার উপায় নাই। ছিটমহলের পাত্রকে কেহ কন্যাদান করিতে চাহে না। - - - জানি দেশ পাইলে ইহা আর থাকিবে না। অনাথের নাথ হইবে।"[১৫]

শুধুমাত্র বিভিন্ন বাস্তবিক সমস্যা বা অপ্রাপ্তির প্রসঙ্গই নয়, ছিটমহলগুলির যে বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারনে ধীরে ধীরে অপরাধীদের অভয়ারন্যে পরিণত হচ্ছে, গল্পকার সেই সমস্যার দিকেও অলোকপাত করতে ভুলেননি। বিভিন্ন কূটনৈতিক মতপার্থক্য ও রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতার আড়ালে কীভাবে মানুষের মধ্যে চরম অমানবিকতার প্রকাশ পায়, গল্পকার এখানে একটি ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সমস্যার একটি বাস্তব রূপদান করেছেন। গল্পানুসারে, ভারতের দিনহাটা গ্রামের তিন ব্যক্তি তিনটি মোটর সাইকেলে করে ঘোমটায় মুখ ঢাকা ও ক্রন্দনরতা অবস্থায় এক তরুণীকে নিয়ে বাংলাদেশের ছিটমহলে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রশ্ন হল-"কী

করিয়া আনিল কে বলিবে ? পুলিশ সীমান্তরক্ষী থাকিতেও ইহা হইয়া থাকে।"[১৬] তারা গ্রামে গিয়েই তরুনীটিকে নিয়ে ফসলের ক্ষেতের দিকে চলতে চলতে, চীনা পিস্তল দিয়ে আকাশের দিকে গুলি ছুড়তেই "আমাদিগের বুক হিম হইয়া গেল। দাদি নানিরা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। যুবতীরা ঘরের কোনে গিয়ে আত্মাগোপন করিল। পুরুষেরা কপাল চাপড়াইতে লাগিল। আবার যুদ্ধ, মানুষ মরিবে বজ্রাঘাতে।"[১৭]

যাদের নিজেদের পায়ের নিচের মাটিটাই কাঁচা, তার প্রতিবাদের ভাষা বা প্রতিরোধের অধিকার পাবে কোথায়? তাই দেশহীন নাগরিকত্বহীন এই সমস্ত অসহায় ছিটদেরবাসিন্দাগন প্রতিবাদে সাহসী হয়ে না ওঠে, শুধুমাত্র জীবনটাকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে। তারপর যখন সেই পাপে ভরা অপরাধের ঘোরা অন্ধকারকে বির্দীণ করে ভোরবেলা সূর্যোদয় হয়, তখন ছিটের বাসিন্দারা আবিস্কার করে 'ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ক্ষেতের ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে" সেই তরুণীটির লাশ। "সমস্ত রাত ধরিয়া ধর্ষণ করিয়া অতঃপর হত্যা করিয়া মধ্যরাতে চলিয়া যায় তিনটি মোটর সাইকেলে।"[১৮]

এখানেই এই উচ্ছিন্ন ও উদ্বাস্ত জীবনের চরম ও নির্মমতার সর্বোপরি অপরাধীদের অরাজকতার শেষ নয়, বরং সূত্রপাত। ঘটনাটি ঘটবার চারদিন পর্যন্ত সেখানেই লাশ পচতে শুরু করল। ভারত না বাংলাদেশ কোনো রাষ্ট্রই এসে লাশটা পর্যন্ত নিয়ে যায়নি, সুবিচার তো অনেক দূরের কথা। " শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের পুলিশ ও কর্তাব্যক্তিদের লইয়া ইন্ডিয়ার পুলিশ ভিতরে আসিয়া লাশ লইয়া গেল এবং সঙ্গে লইয়া গেল ছিটের নিরীহ তিন যুবক-নইম, রহিম, আর মইনকে। তাহাদের বর্ডারের নিকট অবধি লইয়া গিয়া কী মনে হওয়ার ছাড়িয়া দিতে ইন্ডিয়ার পুলিশ ধরিল অনুপ্রদেশকারী হিসাবে। তাহারা কী করিল যে আলিপুরদুয়ার জেখানায় বন্দী রহিল ?"[১৯] ছিটেরবাসিন্দাদের অসহায়তার এখানেও সমাপ্তি ঘটেনি। কারন- "ইহার সাতদিন পর দুই ব্যক্তি আসিয়া শাসাইয়া গেল, যদি কিছু বলি কাহাকেও, গ্রামে আগুন দিয়া ঘর পুড়াইয়া-দিবে। 'ডবকা' মেয়েছেলে যা আছে কেউ রক্ষা পাবে না। তুলে নিয়ে যাবে অন্য ছিটে।"[২০]

গল্পের বর্ণনানুসারে ধর্ষিতা ও মৃতা তরুণীর পিতা ভারতের নীলকন্ঠ আঁধিয়ার একদিন সেই ছিটের গ্রামে পৌঁছায়। মা মরা মেয়েটির জন্য তাঁর হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। সে বলে- "ইহা যদি ইন্ডিয়া হইত, তবে তাহার এইখানে আসিয়া পরম নিশ্চিন্তে মেয়েটিকে ধর্ষণ ও হত্যা করিতে পারিত না।"[২১] সে আরো জানায় যে, দুষ্কৃতিরা মেয়েটিকে নিয়ে যে ছিট বাতৃগাছে প্রবেশ করেছে, সে খবর পাওয়া সত্যেও আইনি জটিলতার কারণেই পুলিশ ছিটে প্রবেশ করতে সাহস পায়নি। "যেহেতু ঘটনাটি বাংলাদেশ ছিটে ঘটিয়াছে বিচার বাংলাদেশের আদালতে হইবে। অপরাধী যেহেতু ইন্ডিয়ার অথবা বাংলাদেশের তা পরিষ্কার ভাবে জানা যায় না, সেই কারণে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদিবে।"[২২]

স্ব-ইচ্ছায় দেশহীন, ঠিকানাহীন, পরিচিতিহীন হয়ে শুধুমাত্র এক ধর্ষিতা ও মৃতা কন্যার পিতা পরিচটুকু নিয়ে মামরা মেয়ের স্মৃতি আকড়ে এক অসহায় পিতা নীলকন্ঠ, ছিটের সেই গ্রামে(কন্যার মৃত্যুস্থান) আপন মৃত্যু অপেক্ষায় বসে দিনগুনতে থাকে। পুরাকালে নকল যুদ্ধের আনন্দ ও প্রমোদ-মহড়ার ক্ষণ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতি ও কূটনীতির সমস্ত অশুভ ফল ছিটের এই উদ্বাস্ত মানুষের অস্তিত্বের অধিকারকে প্রতি মুহূর্তেই হনন করে চলেছে। গল্পটির প্রতিটি লাইনে প্রতিটি শব্দে গল্পকার ছিটের সমস্ত অসহায় মানুষদের গ্লানি ও অপ্রাপ্তি বর্ণনা পাশাপাশি গল্পের শেষে এই অসহায় মানুষদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের স্পষ্ট ব্যাখা দিয়েছেন- “পুনশ্চ নিবেদন এই যে,- - - মেয়ে মরেছে যেখানে সেখানে যে পরিচয়হীন হয়েই মরবে,মারবেই। সে জানে সেই ধর্ষক তিন ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া যাইবে একদিন না একদিন। কেন না সে হত্যাকারীদের চেনে। আর নীলকন্ঠ আধিয়ার হত হইলে সেই চারদিন ধরিয়া তাহার লাশ পচিবে এখানে। সে তো ইন্ডিয়ার লোক, কিন্তু বাংলাদেশে যাইয়া মরিবার অধিকার তাহার আছে কি ? --- নির্বিঘ্নে হত হইবার জন্য সে দেশহীন হইয়াছে”।[২৩]

“অমরের গল্পরা তো বিভিন্ন পাঠকের পাঠে-পাঠান্তরে নিজেদের কথা নিজেরাই বলবে।”[২৪] -অমর মিত্রের গল্প সমালোচনা প্রসঙ্গে রুশতী সেনের এই উক্তির সত্যি কোনো বিকল্প হবে না। কথাসাহিত্যক অমর মিত্র কখনোই নিজের রচনায় কোনো প্রতিষ্ঠত সাহিত্যতত্ত্বকে বা সাহিত্যের প্রচলিত কোনো নির্মাণ কাঠামোর ধারণাকে গ্রহন না করে, বরং নিজের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অবিজ্ঞতাকে মূল্যায়ণ করে বিভিন্ন আখ্যানের রূপায়ণ করেছেন। বাংলা কথা সাহিত্যের নির্মানশৈলীর প্রতিটি অনুষঙ্গে যথা-শব্দসৃজন-শব্দচয়ণ-বাক্য গঠন-বাক্য বিন্যাস ও সংলাপ নির্মান, আখ্যান নির্মান এবং অপূর্ব সব চিত্রকল্পের প্রয়োগ প্রভৃতি প্রতিটি পর্যায়ে তিনি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তাই আবারও রুশতী সেনের সুরে সুরে মিলিয়ে বলা যায় তাঁর “গল্পগুলির ভিতরেই তৈরি গল্পকে ভাঙার আখ্যান মিশে আছে। এই ভাঙনের অনুষঙ্গেই যে বাস্তবের সন্ধানে অবাস্তবের পরিক্রমা বিন্যস্ত হয়েছে, ভাষা পেয়েছে বাস্তববাদের খোঁজে রূপকথার পথ যাত্রা, তা মনোযোগী পাঠক মাত্রেই টের পাবেন।”[২৫] অমর মিত্র বিভিন্ন লেখায় নিজের লেখনী শক্তির দ্বারা এমন এক অপূর্ব চেতনালোকের সৃষ্টি করে থাকেন, যার পথ ধরে পাঠকমহল অনায়াসেই নিজেদের দায়-দায়িত্বকে সঙ্গে করে জাতীয়তাবাদী চেতনার গন্তব্য-স্থলে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। তাঁর ‘যুদ্ধে যা ঘটেছিল’ গল্পটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

উল্লেখপঞ্জি :

১) www.golpath.com/2016/11, কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র সংস্কলন, সংগ্রহের তারিখ ১৫/০৭/২০২৪

২) www.bbc.com/bengali, 'ছিটমহল নিয়ে তৈরি হচ্ছে গবেষণা কেন্দ্র', অমিতাভ ভট্রশালী, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি ২০১৫, সংগ্রহের তারিখ – ১৫/০৭/২০২৪

৩) ঐ, 'ছিটমহল নিয়ে তৈরি হচ্ছে গবেষনা কেন্দ্র'

৪) "6 results for ; enclave" www.dictionary.com, সংগ্রহের তারিখ – ২৫/০৭/২০২৪

৫) বি.সি.এস তথ্য সম্ভার, প্রকাল কাল – ২৪ এপ্রিল, ২০১৭, ৬.০১ pm, facebook.com, সংগ্রাহের তারিখ –২৫/০৭/২০২৪

৬) 'বাংলাদেশ প্রতিদিন', ঢাকা, ২৮ আগষ্ট,২০১৮,১৩:২৮ – এ প্রকাশিত হাসান ইবনে হামিদ – এর "ছিটমহল বিনিময় : এক ঐতিহাসিক অর্জন" প্রতিবেদনটি, সংগ্রহের তারিখ – ২২/০৭/২০২৪

৭) ঐ, বি.সি.এস তথ্য সম্ভার।

৮) দৈনিক প্রথম আলো'র শিল্প ও সাহিত্য পাতা থেকে সংগৃহীত করেছে 'মধ্যবিত্ত', তারিখ – ১৪ জুন ২০১৯, ১২ .৪১ P.M, www.facebook.com, সংগ্রহের তারিখ – ২৫/০৭/২০২৪

৯) ঐ, ছিটমহল নিয়ে তৈরি হচ্ছে গবেষনাকেন্দ্র

১০) ঐ, golpoth.com

১১) অমর মিত্র, 'শ্রেষ্ঠগল্প', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ-ভূমিকা অংশ-XI

১২) ঐ, golpopath.com

১৩) ঐ, golpopath.com

১৪) ঐ, golpopath.com

১৫) ঐ, golpopath.com

১৬) ঐ, golpopath.com

১৭) ঐ, golpopath.com

১৮) ঐ, golpopath.com

১৯) ঐ, golpopath.com

২০) ঐ, golpopath.com

২১) ঐ, golpopath.com

২২) ঐ, golpopath.com

২৩) ঐ, golpopath.com

২৪) ঐ, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃ-ভূমিকা অংশ – XV

২৫) ঐ, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃ – ভূমিকা অংশ – IX

নারীহরণ : কাব্য ও পুরাণ প্রসঙ্গ

(নির্বাচিত পাঠ অবলম্বনে একটি বিশ্লেষণ)

পারমিতা হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: 'হরণ'- ছোট্ট এই শব্দটি ব্যাপক অর্থের পরিচয়বাহী। 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এ 'হরণ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে- 'বলে গ্রহণ', 'কাড়িয়া লওন', 'আকর্ষণ', 'অপহরণ', 'চুরি', 'বঞ্চিতকরণ' ইত্যাদি। নারী হরণের ইতিহাস বহু প্রাচীন। কাব্যে, পুরাণে তার প্রমাণ মেলে। মানব সভ্যতার বয়স বেড়েছে। কিন্তু নারীহরণের ঘটনা থেকে সভ্যতা মুক্ত হয়নি। এই ঘটনার মোকাবিলা করতে সমাজকে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। ভারতীয় আইনেও যুক্ত হয়েছে একাধিক ধারা(section 359 to 369 IPC)। কেমন ছিল অতীত ভারতে 'নারীহরণ' সংক্রান্ত বিচার-পদ্ধতি ?–এ বিষয়ে বিশদভাবে জানা সম্ভব না হলেও, আমাদের প্রাচীন কাব্যে, পুরাণে ছড়িয়ে থাকা কাহিনিগুলি থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তারই কিছু ঝলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশিত হল উক্ত নিবন্ধে।

সূচক শব্দ: নারীহরণ, বিচার-ব্যবস্থা, পলিটিক্স, শাস্তি।

'পরের দ্রব্য পরের নারী হরণ করো না
পারে যেতে পারবে না।
যতবার করিবে হরণ
ততোবার হবে জনম।

সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন'... (লালনগীতি) – সাধক লালন তাঁর সাধনার দ্বারা মনকে বশীভূত করে সুপথে চালিত করলেও, আমাদের মনুষ্য সমাজের অসাধু মনগুলি সত্যের পথে চলতে অসমর্থ। তারা সর্বদাই ষড়-রিপুর দ্বারা চালিত হয়ে পরের দ্রব্য লুণ্ঠন করতে, নারী হরণ করতে উৎসাহী; তাতে যদি তাদের 'পারে' যাওয়া না-ও হয় 'কুছ পরোয়া' নেই। ইহজন্মে ইহজাগতিক লাভের অঙ্কটা একটু বাড়াতে তারা 'নারী হরণে'র মত ঘৃণ্য কাজ ক'রে বারবার জন্মচক্রের আবর্তে আবর্তিত হতেও রাজি। সুপথে চলার সদুপদেশ যখন ব্যর্থ হয়, তখন প্রয়োজন হয় আইনের; আয়োজন হয় শাস্তির। 'হরণে'র মত অপরাধ রুখতে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ভারতীয় আইনেও যুক্ত হয়েছে একাধিক ধারা (section 359 to 369 IPC)[১]। বর্তমানে অপহরণ বিশেষ করে নারী হরণ রোজকার ঘটনা, দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রাখলেই তা বোঝা যায়। 'নারী হরণ' বললেই স্বাভাবিক ভাবে 'পাচার' শব্দটাও এসে পড়ে। আর 'নারী

হরণ ও পাচার'- শব্দগুলি একসাথে এক বৃহৎ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রকে তুলে ধরে, যে বাজারের অন্যতম পণ্য নারী।

নারীহরণের ইতিহাস বহু প্রাচীন। কাব্যে, পুরাণে তার প্রমাণ মেলে। এরও আগে, গোড়ায়, যখন মানুষের জীবন ছিল অন্যান্য প্রাণীদের মত অনিয়ন্ত্রিত, তখনও নারীকে 'বলে গ্রহণ' করা চলত, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কামের উপশম (মনুষ্যেতর ইতর প্রাণীদের জীবন-যাপন পর্যবেক্ষণ করলে এটা ধরা পড়ে)। যখন প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ দলবদ্ধ হল, সেই দলবদ্ধ জীবনেও এক দল কর্তৃক অপর দলের নারী হরণ চলত। রাবণকৃত সীতা-হরণের প্রেক্ষিতে রাম, রাবণের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আর্য-অনার্যের লড়াই দেখিয়েছেন আদিকবি। 'মহাভারত'[২]-এর 'বনপর্ব'-এ জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণের মধ্যেও একদল কর্তৃক অপর দলের নারী হরণের একটা চিত্র প্রতিফলিত হয়। 'দ্রৌপদী হরণ' এবং 'জয়দ্রথের নিগ্রহ ও মুক্তি'[৩] অংশের পূর্বাপর আখ্যানভাগ বাদ দিয়ে কেবল ওই অংশটুকু পাঠ করলে, এক দল কর্তৃক অপর দলের নারী-হরণের তুলনাটি উপলব্ধ হয়। উল্লেখ্য, মানুষের দলবদ্ধ জীবনের একটা পর্যায়ে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত নারীরা সেই দলের পুরুষদের যৌনসঙ্গী হত এবং তা কোন 'একক যৌনসঙ্গী' নয়[৪]; পঞ্চ পান্ডব ও দ্রৌপদীর জীবন-চর্যার সঙ্গে বিষয়টির সাদৃশ্য মেলে। আবার, Group system-এ দলের সমর্থ পুরুষরা খাদ্য সংগ্রহে বের হত; বৃদ্ধ, নারী, শিশুরা গৃহে থাকত। 'বনপর্ব'-এ কাম্যকবনে অবস্থানরত পান্ডবদেরও দেখা গেছে কুটীরে দ্রৌপদী, ধৌম পুরোহিত, বালিকা(দ্রৌপদীর ধাত্রীকন্যা) রেখে মৃগয়ায় যেতে। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে সদলবলে জয়দ্রথ তাদের নারী হরণ করেছেন। অতএব মৃগয়া শেষে আস্তানায় ফিরে দলের অন্যান্যদের মুখে নারী হরণ শুনে, তাকে ফিরিয়ে আনতে অপহারক দলের সঙ্গে লড়াই আবশ্যক। ঘটেছেও তাই। পান্ডব ও সিন্ধুরাজের দলের মধ্যে যুদ্ধ দেখিয়েছেন আখ্যানকার। লড়াই শেষে পান্ডবরা নিজেদের নারীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। দল বা Group System থেকে মানব সভ্যতার বয়স আরও বেড়েছে । কিন্তু নারীহরণের ঘটনা থেকে সভ্যতা মুক্ত হয়নি। এই ঘটনার মোকাবিলা করতে সমাজকে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। কেমন ছিল অতীত ভারতে 'নারীহরণ' সংক্রান্ত বিচার-পদ্ধতি ?-এ বিষয়ে বিশদভাবে জানা সম্ভব না হলেও, আমাদের প্রাচীন কাব্যে, পুরাণে ছড়িয়ে থাকা কাহিনিগুলি থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। শব্দের সীমিত সংখ্যা ও অপরিসরতার কথা মনে রেখে পুরাণে, কাব্যে উত্থাপিত নির্বাচিত কয়েকটি হরণ বৃত্তান্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের একটা প্রয়াস থাকল এই নিবন্ধে।

'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এ 'হরণ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে- 'বলে গ্রহণ', 'কাড়িয়া লওন', 'আকর্ষণ', 'অপহরণ', 'চুরি', 'বঞ্চিতকরণ' ইত্যাদি।[৫] 'আইনে নারীর অধিকার'[৬] সম্বলিত গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে কোন জায়গা থেকে বলপূর্বক অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য বাধ্য করে বা কোন রকম প্রতারণাপূর্ণ পদ্ধতির

মাধ্যমে প্ররোচিত করে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে হরণ করা হয়েছে বলে ধরা হবে। হরণের প্রকৃতি অনুসারে নানান শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে ভারতীয় আইনে।

কোন ব্যক্তি যদি কোন স্ত্রীলোককে হরণ করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে বাধ্য করে কিম্বা কোন ব্যক্তির সাথে যৌন সহবাস করতে বাধ্য করে বা প্রলুব্ধ করে, তাহলে অপরাধীর দশ বছরের কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের কথা বলা হয়েছে।[৭] হরণের মাধ্যমে বিবাহ বর্তমানে ভারতীয় আইনে দন্ডনীয় অপরাধ হলেও, প্রাচীন ভারতে এই বিশেষ বিবাহ রীতি প্রচলিত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য ও মনু স্মৃতিতে উল্লিখিত আট প্রকার বিবাহ রীতির অন্যতম 'রাক্ষস বিবাহ'।[৮] কন্যাপক্ষীয় লোকদের হনন করে বা প্রহার করে বলপূর্বক রোরুদ্যমানা কন্যাকে হরণের মাধ্যমে যে বিবাহ তা 'রাক্ষস বিবাহ'[৯]; কাব্যে, ইতিহাসে এর প্রমাণ মেলে। বসুদেবের সঙ্গে বিবাহের জন্য শিনি কর্তৃক দেবকী হরণ, কৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ ও বিবাহ, স্বয়ম্বর সভা থেকে মিত্রবিন্দাকে হরণ করে কৃষ্ণের বিবাহ, অর্জুনের সুভদ্রা-হরণ ও বিবাহ, ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য ভীষ্ম কর্তৃক কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা হরণের বৃত্তান্ত প্রায় সকলেরই জানা। মহাভারতে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষস বিবাহ 'শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি' বলা হয়েছে।[১০] কাশীরাজের তিন কন্যা হরণকালে ভীষ্মের মুখে শুনি- বিপক্ষদের পরাজিত করে যে কন্যা হরণ করা হয়, সেই কন্যা ভার্য্যা হিসেবে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত।[১১] দুষ্মন্তের কথায়ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 'রাক্ষস বিবাহ' ধর্মোচিত, এই বক্তব্য উঠে এসেছে— "গান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ ক্ষত্রে ধর্ম্ম্যৌ তৌ মা বিশঙ্কিথাঃ/পৃথগ্বা যদি বা মিশ্রৌ কর্ত্তব্যৌ নাত্র সংশয়ঃ।।"[১২]

কন্যা হরণের মাধ্যমে ভার্য্যা গ্রহণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশংসনীয় হলেও, পর-পত্নী হরণ সর্বদাই নিন্দনীয় হয়েছে। শুধু নিন্দনীয়ই নয়, 'পাপাচার' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কাব্য, পুরাণে উল্লিখিত নানা কাহিনিতে এই পাপাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক পন্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। সীতাকে হরণ করায় রাক্ষসপতি রাবণকে কীভাবে সবংশে বিনাশ করা হয়েছে তার সবিস্তারে বর্ণনা রামায়ণে পাই। ইন্দ্রের গুরু-পত্নী হরণের শাস্তি হিসেবে ইন্দ্রের কলেবর সহস্র যোনি-প্রাপ্ত হতে দেখা যায়। প্রশ্ন ওঠে এই হরণের শাস্তি কি সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য হত? জাতি, বর্ণ, ক্ষমতা নির্বিশেষে কি হরণের বিচার করত তৎকালীন সমাজ? প্রসঙ্গত কয়েকটি হরণবৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাক—

ইন্দ্রের গৌতম-পত্নী হরণের প্রসঙ্গ রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন অনুষঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে। অহল্যা-হরণের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্তমান ভারতীয় আইনের দু-একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।–যদি কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে স্বামীর নামে ছলনা করে যৌন সহবাস করতে চায় সেটা যৌন হেনস্থা বা ধর্ষণ বলে বিবেচিত হবে।[১৩] যদি কোন সরকারি আধিকারিক বা কর্মীবৃন্দের দ্বারা যৌন নির্যাতনের মত অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে, সেই অপরাধীদের দশ বছরের কারাদন্ডের কথা বলা

হয়েছে, যা সর্বাধিক যাবজ্জীবন পর্যন্ত যেতে পারে।[১৪] ইন্দ্রকেও সরকারী আধিকারিক হিসেবে তুলনা করা যেতে পারে। ‘স্বর্গ’রাজ্য তাঁর অধীনে; তিনি ‘দেবরাজ’। কাম-মোহিত হয়ে গুরুর অনুপস্থিতির সুযোগে গুরুর ‘রূপ’ ভাঁড়িয়ে গুরুপত্নীকে হরণ করেন(‘গুরুরূপ ধরি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরে’)[১৫] । গৌতমের কার্যকারিতায় এই অধর্মোচিত কর্মের লজ্জাজনক শাস্তি হিসেবে ইন্দ্রের দেহ সহস্র যোনি প্রাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য পরপত্নী হরণ, কৌশলে তাকে সম্ভোগ করার মত নিকৃষ্ট কাজ করলেও, তাঁকে রাজপদ থেকে চ্যুত করা হচ্ছে না। সেই ‘দেব’ সমাজের তৎকালীন ক্ষমতায় আসীন আধিকারিকরা(‘দেবতারা’) তাঁর শাস্তি লঘু করতে এবং শাস্তির মেয়াদ অন্তে তাঁকে রাজপদে ফেরাতে উদ্যোগী-- ‘কশ্যপ সহিত আসি কমল-আসন/গৌতম সকাশে আসি উপনীত হন/গৌতমে বিনয়ে মুনি কহে বহুতর/শুনহ গৌতম মুনি আমার উত্তর/আমারে দেখিয়া ক্রোধ কর সম্বরণ/ অজ্ঞানে গুরুর পত্নী করিল হরণ/পাইল উচিৎ শাস্তি ক্ষমা দেহ মনে/কৃপায় শাপান্ত কর অদিতি-নন্দনে’।।[১৬]--কশ্যপ, ব্রহ্মার অনুরোধে ইন্দ্রের সহস্রযোনি সহস্র চক্ষুতে রূপান্তরের ‘বর’ দেন গৌতম। যাইহোক, পিতা কশ্যপ ও ব্রহ্মার তৎপরতায় ইন্দ্রের শাস্তি লাঘব করা হয়েছে এবং তাঁকে ‘অনুচিত কর্ম’ বিষয়ে সাবধান করে উপদেশাদি দিয়ে পূর্ব ‘পদ’-এ পুনরায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে(‘...পুত্র কর অবধান/অনুচিত কর্ম্ম নাহি কর, সাবধান’, ‘এত বলি ইন্দ্রে পাঠাইল যথাস্থান’)[১৭] ।

‘রাবণের রম্ভাবতী হরণ’[১৮] অংশে নলকূবরের ঈপ্সিত রমণী রম্ভাবতীকে হরণ ও সম্ভোগ করায় নলকূবর রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—‘আজি হৈতে শাপ মোর হউক প্রচার/বলে ধরি রাবণ যেই করিবে শৃঙ্গার/সেইক্ষণে মরিবেক যাবে দশ মাথা/নলকুবরের শাপ না হবে অন্যথা।।[১৯]’—এই অভিশাপের ফানুসের আড়ালে সমাজের এক বাস্তবোচিত ঘটনা ধরা পড়ে। রম্ভাবতী যিনি একজন গণিকা, তিনি পূর্ব-নির্ধারিত নায়ক নলকূবরের কাছে নির্ধারিত সময়ে(রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর)চলেছেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে পৌঁছাতে পারছেন না; কারণ সেই রাতে নলকুবরের খুল্লতাত রাবণ একরকম জোরপূর্বক আটকে রেখে তাঁকে সম্ভোগ করেন। সাত দিন পরে ছাড়া পেয়ে রম্ভাবতী নলকুবরের কাছে যান এবং নির্ধারিত সময়ে না আসার কারণ ব্যক্ত করেছেন এবং এও জানিয়েছেন- তিনি বহু জায়গায় ঘুরেছেন কিন্তু এমন অপমান, এমন ঘটনার সম্মুখীণ হননি; রাবণ বলপূর্বক তাঁকে সাত রাত্রি সম্ভোগ করেছেন(‘ধর্ম্মলোপ করিলেক বলে চেপে ধরি’, ‘সপ্ত রাত্রি পাপিষ্ঠ আমারে নাহি ছাড়ে’)[২০]। রম্ভাবতী বহুভোগ্যা হলেও, রাবণ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্ভোগ করায় তা অপরাধ। নলকুবরের কাছে রম্ভার নালিশের ভিত্তিতে রাবণকৃত অপরাধের বিচারে বলা হচ্ছে-- এরপর রাবণ এরকম কর্ম করলে, তৎক্ষণাৎ তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে, মাথা কেটে ফেলা হবে(‘বলে ধরি রাবণ যেই করিবে শৃঙ্গার/সেইক্ষণে মরিবেক যাবে দশ মাথা’)[২১]। অর্থাৎ অপ্সরা রম্ভাবতী, যিনি বহুভোগ্যা, তাঁকে ‘সপ্ত রাত্রি’ নির্যাতনের জন্য নির্যাতনকারীকে কোন শাস্তি দেওয়া হল না; শুধু অপরাধীকে সাবধান করে দেওয়া হল ভবিষ্যতে এরকম অপরাধ করলে তাকে

মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। কেন এমন একপেশে রায় দেওয়া হল, তা এই বৃত্তান্তের কুশী-লবদের দিকে নজর করলেই বোঝা যায়— অপরাধী 'লঙ্কেশ্বর', নির্যাতিতা একজন গণিকা আর বিচারক অপরাধীর ভাতুষ্পুত্র।

'মহাভারত'-এ জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণের কাহিনি পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ধরা পড়ে জয়দ্রথকে শাস্তি পেতে হয়েছে; চুল ধরে মাটিতে ফেলে তাঁকে প্রহার করা হয়; মস্তকে পদাঘাত করা হয়। মূর্ছিত হলেও তাঁকে ছাড়া হয় না, মাথার মাঝে মাঝে মুড়িয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে অর্ধমৃত করে ছেড়ে দেওয়া হয়; দুঃশলার কথা ভেবে জয়দ্রথকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয় না।[২২] অর্থাৎ পারিবারিক সম্বন্ধের কারণে অপরাধীকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিয়ে ব্যাপারটিকে মিটিয়ে নেওয়া হয়।

'পুলোমারাক্ষসকর্ত্তৃক ভৃগুভার্য্যা হরণ'[২৩] অংশে ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করায় রাক্ষস পুলোমাকে শাস্তি পেতে হয়। আখ্যানসূত্রে জানা যায়, হরণকালে গর্ভবতী পুলোমা দেবীর গর্ভচ্যুত শিশুপুত্রের সূর্যতুল্য রূপ দেখে রাক্ষস ভস্মীভূত হয়—'ততঃ স গর্ভো নিবসন্ কুক্ষৌ ভৃগুকুলোদ্বহ!/রোষান্মাতুশ্চ্যুতঃ কুক্ষেশ্চ্যবনস্তেন সোঽভবৎ/তং দৃষ্ট্বা মাতুরুদরাচ্চ্যু তমাদিত্যবর্চ্চসম্/তদ্রক্ষো ভস্মসাদ্ভূতং পপাত পরিমুচ্যতাম'।।[২৪]--এই অতিরঞ্জনের পিছনেও এক রূঢ় সত্য অনুমিত হয়। -একসময়ে 'রাক্ষস' পুলোমা ভার্য্যারূপে পুলোমাকে মনোনীত করলেও, শেষ পর্যন্ত তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়নি। সুন্দরী পুলোমার পিতা বিশেষ প্রাপ্তি লাভের প্রত্যাশায় ভৃগুর হাতে কন্যা সমর্পণ করেন।[২৫] কন্যার পিতার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। কারণ ভৃগু সমাজে এক অভিজাত বংশের প্রতিনিধি, বিশেষ ক্ষমতাশালী।[২৬] তাই পিতার কাছে 'রাক্ষস' পুলোমা অপেক্ষা ভৃগুই কন্যার যোগ্য পাত্র। ভৃগুর বিবাহিতা স্ত্রী গর্ভবতী পুলোমাকে পূর্ব পাণিপ্রার্থী পুলোমা হরণ করতে চেষ্টা করলে ভৃগু-পত্নীর গর্ভচ্যুতি হয়, আর ধরা পড়ে সামাজিক শাস্তি হিসেবে 'রাক্ষস' জাতিভুক্ত পুলোমাকে ভস্মীভূত করা হয়।

'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ'-এর 'প্রকৃতিখন্ড'-এ ধর্মরাজ যমের মুখে শোনা যায়- গুরুপত্নী অগম্যা।[২৭] আবার 'সুরথ-বংশ বর্ণন, তারাহরণ বৃত্তান্ত, বুধের উৎপত্তি' অংশে দেখি ব্রহ্মার পৌত্র চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে হরণ করে 'শত বর্ষ শৃঙ্গার' করে এবং চন্দ্রের ঔরসে তারার গর্ভে বুধের জন্ম হয়। যেহেতু তারার অনিচ্ছায় এই 'শৃঙ্গার' সংঘটিত হয়, তাই চলতি কথায় এটাকে 'ধর্ষণ' বলা যায়। চন্দ্রের 'সকাম বচন' শুনে তারাদেবী 'রোষভরে' অনেক কটু কথা বলেছেন; এও বলেন- পরস্ত্রীকে যে কামনা করে, সেই 'নীচাশয়' 'সর্ব্ব কর্ম্মে অশুচি' হয়; চন্দ্র এমন হীন কার্যে রত হলে সে রাজযক্ষ্মা প্রাপ্ত হবে।–কিন্তু তারাদেবী রেহাই পেলেন না। শতবর্ষ ব্যাপী চন্দ্রের দ্বারা তাঁকে ধর্ষিত হতে হল—'নন্দন বনেতে কভু পুষ্পিত কাননে/পুষ্কর তীর্থেতে আর ভদ্রকের বনে/কভু শয্যামাঝে কভু মলয় দ্রোণিতে/পর্ব্বতে পর্ব্বতে আর নদীতে নদীতে/এইরূপে শতবর্ষ করিল শৃঙ্গার'[২৮]—অর্থাৎ একদিন নয়, শত-বর্ষ-ব্যাপী তাঁকে আটকে রেখে দিনের পর

দিন দফায় দফায় ধর্ষণ করা হচ্ছে।–এ প্রসঙ্গে ‘দেবতা’ (তৎকালীন সমাজপতি, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি?)দের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যণীয়।-

চন্দ্র নিজের কর্মফল থেকে বাঁচতে দৈত্যগুরু শুক্রের শরণাপন্ন হয়েছেন। শুক্রাচার্য্য চন্দ্রকে উপদেশ-বাক্য প্রদান করলেও, শাস্তি না দিয়ে নিজের পুণ্যের ভাগ দিয়ে তাঁর পাপ স্খালন করেছেন—‘আমার বরেতে তব পাপ নাহি রহে/জীবনে যতেক ধর্ম্ম করেছি অর্জ্জন/তোমা তরে সেই ধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন/আমার পুণ্যের ভাগ পাইবেক তুমি’।[২৯]–তারাকেও তিনি ‘সাধ্বি’ বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং পতিগৃহে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। -শুক্রাচার্য্য পরম বৈষ্ণব ছিলেন(অন্তত ‘ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ’-এর আখ্যানসূত্রে তাই জানা যায়); তাই চন্দ্র ও তারার প্রতি এটা কি তাঁর বৈষ্ণবোচিত আচরণ? এও স্মরণীয় শুক্রাচার্য্য তারা-পতি বৃহস্পতির প্রতিপক্ষ। দেবতাদের কার্যকলাপও লক্ষ্যণীয়।–বৃহস্পতির পত্নী-হরণের কথা শুনে ইন্দ্র তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন- ‘গুরুদেব, না করিহ ভয়/দুরাত্মা চন্দ্রেরে আমি বধিব নিশ্চয়’[৩০]। ইন্দ্র ব্রহ্মার কাছে তারা-হরণের বৃত্তান্ত নিবেদন করলে, ব্রহ্মা বৃহস্পতিকৃত অপরাধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন--‘গর্ভকালে বলাৎকার করে বৃহস্পতি/যেই জন ভ্রাতৃজায়া করয়ে হরণ/কুম্ভীপাক নরকে সে করিবে গমন/খন্ডাবে কর্ম্মের ফল নাহিক শকতি/নিজ কর্ম্মফল তাই পায় বৃহস্পতি’।[৩১] বৃহস্পতি কেন পত্নীহরণের দুঃখ ভোগ করছেন তা নয় বোঝা গেল। কিন্তু কোন্ অপরাধে তারাদেবীকে শত বৎসর ধর্ষিত হতে হল? অবাঞ্ছিত সন্তান গর্ভে ধারণ করতে হল? উল্লেখ্য চন্দ্র ব্রহ্মার পৌত্র।[৩২] ব্রহ্মার নির্দেশে বৃহস্পতি শিবের কাছে গেলে শিব জানিয়েছেন- চন্দ্র ক্ষমতাশালী শুক্রাচার্য্যের আশ্রয়ে আছেন, আর শুক্রাচার্য্যকে রক্ষা করছেন ‘পরব্রহ্ম’ শ্রীহরি। অতএব শ্রীহরিকে যদি খুশি করতে পারেন তবেই বৃহস্পতির কার্যোদ্ধার হবে।–অর্থাৎ বৃহস্পতিকে উচ্চ-মহলে পৌঁছানোর ‘রুট’ বাতলে দিচ্ছেন দেবাদিদেব শিব। লক্ষ্যণীয় প্রত্যক্ষভাবে শিবের বা ইন্দ্রের ক্ষমতা নেই চন্দ্র বা শুক্রাচার্য্যের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন করে তবেই দেবাদিদেব শিব-আদি ইন্দ্র- সকল দেবতা কৃতকার্য্য হয়েছেন বৃহস্পতি-পত্নী তারা-উদ্ধারে। অবশেষে ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় শুক্রাচার্য্য তারা ও চন্দ্রকে অর্পণ করলেন ব্রহ্মার নিকট। চন্দ্রের ঔরসে গর্ভবতী ‘অবনতমুখী’ তারার প্রতি ব্রহ্মার উক্তি- ‘মাতঃ, কর শোক পরিহার’[৩৩], ‘পতির প্রেয়সী হবে দিনু এই বর/প্রায়শ্চিত্ত করি শুদ্ধ হইবে সত্বর’[৩৪]-অর্থাৎ তারাদেবীকে প্রায়শ্চিত্ত করে ‘শুদ্ধ’ হতে হবে। কিন্তু চন্দ্র, যে আসলেই অপরাধী তার প্রতি কোন প্রায়শ্চিত্তের কথা বললেন না। নিজের পৌত্র বলে, নাকি চন্দ্র পুরুষ বলে তার শুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নেই! অবশেষে একরকম সামাজিক মিটমাট করে (‘প্রসব করিল তারা সুন্দর কুমার...পুত্রেরে লইয়া চন্দ্র করিল প্রস্থান’)[৩৫] তারাকে বৃহস্পতির কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং বৃহস্পতিও ‘ভার্য্যা’কে পেয়ে আনন্দিত—‘বৃহস্পতিকরে ভার্য্যা করে দান/ভার্য্যারে লইয়া গুরু আনন্দিত মনে/চন্দ্রের কলঙ্ক রটে এ বিশ্ব ভুবনে’[৩৬]-এখানে ‘দান’ শব্দটি তাৎপর্যবাহী।

'দান' শব্দটা কি শুধুমাত্র পূর্ব লাইনের 'প্রস্থান'-এর সঙ্গে অন্ত্যমিলের জন্য? নাকি এই সমাজে নারীকে পণ্য ভাবা হত? তাই কি কোন অপরাধ না করেও তারাদেবীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে! অথচ অপরাধী চন্দ্র, যে শতবর্ষ-ব্যাপী তারাদেবীকে আটকে রেখে ধর্ষণ করলেন, তার পাপ-মুক্তির জন্য দৈত্যগুরু এগিয়ে এলেন।–আর রইল ভুবনে চন্দ্রের কলঙ্ক রটার ঘটনা; তা 'দেবতা'রা যতই গোপন করার চেষ্টা করুন না কেন, এ অপরাধের কথা যে গোপন থাকবে না তা তৎকালীন 'দেবতা' তথা সমাজপতিরা বুঝেছিলেন। তাঁদের সমাজ-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থার প্রতি যাতে 'মর্ত্যবাসী' তথা প্রজারা আস্থা না হারায়, তাই ঘোষণা করতে হল- বিশ্বভুবনে চন্দ্রের এ কলঙ্ক রটবে।–এ যেন লোক-দেখানো শাস্তি; নাহলে তারাদেবীকে উদ্ধার করতে শতবর্ষ পার হয়ে গেল দেবতাদের! বর্তমানে কেউ ধর্ষিতা হলে অনেক ক্ষেত্রে সমাজের মাতব্বররা অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে তাকে একরকম প্রশ্রয় দেয়, কখনও নির্যাতিতাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু অর্থমূল্য দিয়ে একরকম মিটমাট করে; তারাহরণ ও ধর্ষণের ক্ষেত্রে 'দেবতা'দের কার্যকলাপ যেন সেই ভাবেই পরিচালিত হতে দেখি। তারাদেবীকে ব্রহ্মা যে বরদান করেছেন ও সান্ত্বনা দিয়েছেন তার মধ্যে সমাজ-ব্যবস্থার ঘুন-ধরা অংশ চোখে পড়ে-'পতির প্রেয়সী হবে দিনু এই বর/প্রায়শ্চিত্ত করি শুদ্ধ হইবে সত্বর'[৩৭]। এই সান্ত্বনা-বাণীর পরও তারাদেবী রোদনপূর্বক বলেছেন- 'দুরাত্মা শশাঙ্ক মোরে করিল হরণ/তাহার ঔরসে গর্ভ হইল আমার'[৩৮]-এটা কি ব্রহ্মার কাছে তারাদেবীর আকুতি-পূর্ণ নালিশ ছিল না? কিন্তু কার কাছে তিনি নালিশ জানাচ্ছেন? তিনি কি যথার্থই পাপ-পুণ্য, নৈতিক-অনৈতিকতার একজন নিরপেক্ষ বিচারকর্তা? তারা-উদ্ধারে তাঁর যে মধ্যস্থতা তার মধ্যে কি তিনি চন্দ্রের পিতামহ- এই পরিচয়ই বড় হয়ে ওঠে না? তারার গর্ভে উৎপন্ন চন্দ্রের ঔরসজাত পুত্র নিয়ে চন্দ্রের প্রস্থানের পর বৃহস্পতিকে তারা দান করার মধ্যে ব্রহ্মার পলিটিক্স স্পষ্ট।

হরণের জন্য ইন্দ্রের প্রাপ্ত শাস্তি লঘু করা হয়, লঙ্কেশ্বর রাবণকে সতর্ক করা হয়, জয়দ্রথকে প্রহার ও মাথা মুড়িয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করলেও মৃত্যুদন্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, চন্দ্রকে পুণ্যের ভাগ দেওয়া হয়, পুলোমাকে ভস্মীভূত করা হয়। ইন্দ্র, রাবণ, জয়দ্রথ, চন্দ্র, পুলোমার নারীহরণের বিচার ও শাস্তি দেখে মনে হয় হরণের প্রকৃতি অনুসারে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শাস্তি ভিন্ন ছিল। কিন্তু শুধুই কি হরণের প্রকৃতি, সমাজ, বিচার-ব্যবস্থা, বিচারক ভেদে শাস্তির এই ভিন্নতা? নাকি অন্য বিষয়ও ছিল? এই অন্য পলিটিক্সটি সহজেই ধরা পড়ে, যখন দেখি ব্রহ্মার পৌত্র হওয়ায় অপরাধী 'চন্দ্রদেব' অপরের পুণ্যের ভাগী হন, আর হরণকৃত অপরাধের জন্য অনার্য 'রাক্ষস' জাতিভুক্ত পুলোমাকে ভস্মীভূত হতে হয়।

নিবন্ধে উল্লিখিত 'তারাহরণ বৃত্তান্ত'টি 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ'-এর অংশ। এই পুরাণের অন্যত্র গুরুপত্নী গমনের পাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এতে 'শতব্রহ্মহত্যা'-সম পাপ হয়; অপরাধীর শতযুগ নরকবাস অবধারিত।[৩৯] শতযুগ নরকবাস দূরস্থান, বরং প্রকারান্তরে

চন্দ্রের শাস্তি মকুব করতে দেবতারা তৎপর। অর্থাৎ সামাজিক অনুশাসন থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর হত না। বিচার-প্রক্রিয়া পক্ষপাতশূন্য ছিল না। জাতি, বর্ণ, ক্ষমতা বিচার-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করত।

এবার আসা যাক হৃত নারীটির শাস্তিবিধানে। হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও, এটা প্রমাণিত যে, সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই হৃত নারীরও শাস্তিবিধান করে। স্বয়ম্বর সভা থেকে ভীষ্ম কর্তৃক হৃত কাশীরাজের তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ অম্বা শাল্বরাজকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছেন জেনে, ভীষ্ম তাঁকে শাল্বরাজের কাছে পাঠান। কিন্তু ভীষ্ম কর্তৃক হৃত হওয়ায় শাল্বরাজ অম্বাকে গ্রহণ করেননি। দীর্ঘ শাস্তি-ভোগের(‘কাননেতে তোর তনু হউক প্রস্তর’[৪০])পর অহল্যা গৌতমের কাছে গৃহীত হয়েছেন(‘তাহাতে হইল তার শাপ বিমোচন/আহ্লাদিত শুনিয়া গৌতম তপোধন/অহল্যাকে দেখিয়া সানন্দ মহামুনি/পুনর্ব্বার করিলেন পুষ্পের ছাউনি’)[৪১]। ‘তারাহরণ বৃত্তান্ত’-এ দেখা গেছে চন্দ্রের হৃত নিরপরাধ তারাদেবীকে ব্রহ্মার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে(‘প্রায়শ্চিত্ত করি শুদ্ধ হইবে সত্বর’[৪২])। আর রাবণ হরণ করায়, সীতাদেবীর একাধিকবার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীণ হওয়া এবং বনবাস-যাপনের কাহিনি তো সকলেরই জানা। যুগ বদলেছে। বাল্মীকির আশ্রম আর নেই। পরিবর্তে উদ্ধার হওয়া মেয়েদের ফিরতে হয় ‘হোম’-এ। না, বাড়ি ফেরা হয় না—সমাজের এ এক অলিখিত শাস্তি-বিধান।

তথ্যসূত্র:

১. ‘Kidnapping and Abduction under Indian Penal Code’, ‘Legal Service India’ E-Journal, https://www.legalserviceindia.com, Accessed on 16.02.2024

২. রাজশেখর বসু, ‘কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত’ (সারানুবাদ), অষ্টাদশ মুদ্রণ, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড. কলকাতা, ১৩৫৬

৩. তদেব, পৃ.২২৪-২২৬

৪. দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বারাঙ্গনা, সুবর্ণা, কলকাতা, ১৯৯৮,পৃ.২১

৫. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ‘বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’ (২য় ভাগ), ২য় সং, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ.২১৩১

৬. মনিকা দত্ত রায়, অপর্ণা দে (সম্পাঃ), ‘আইনে নারীর অধিকার’, ত্রিপুরা মহিলা কমিশন, আগরতলা, ২০১৬, পৃ.৩৮

৭. তদেব পৃ.৩৯

৮. অতুল সুর, ‘ভারতে বিবাহের ইতিহাস’, শঙ্খ প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃ.১৯

৯. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ‘বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’ (২য় ভাগ), ২য় সং, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ.১৫৮৯

১০. রাজশেখর বসু, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত' (সারানুবাদ)/আদিপর্ব, অষ্টাদশ মুদ্রণ, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড. কলকাতা, ১৩৫৬, পৃ.৪০। 'ভারতকৌমদী'তে রয়েছে 'স্বয়মিতি।রাজন্যাঃ ক্ষত্রিয়াঃ।জ্যায়সীং ভার্য্যান্তবাপেক্ষযা ক্ষত্রিয়পক্ষে শ্রেষ্ঠাম্', উৎস: হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, 'মহাভারতম্' (আদিপর্ব্ব ৩), ২য় সং,পৃ.১১৩৫

১১. ঐ

১২. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, 'মহাভারতম্' (আদিপর্ব্ব২), ২য় সং, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৩৮, পৃ.১০০৮

১৩. মনিকা দত্ত রায়, অপর্ণা দে (সম্পাঃ), 'আইনে নারীর অধিকার', ত্রিপুরা মহিলা কমিশন, আগরতলা, ২০১৬, পৃ.৪১

১৪. তদেব, পৃ.৪১-৪২

১৫. শ্রী বেনীমাধব শীল (সম্পাঃ), 'কাশীদাসী মহাভারত'/ 'উদ্যোগপর্ব্ব', অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৯৪,পৃ.৬১৬

১৬. ঐ

১৭. শ্রী বেনীমাধব শীল (সম্পাঃ), 'কাশীদাসী মহাভারত'/ 'উদ্যোগপর্ব্ব', অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৯৪, পৃ.৬১৭

১৮. শ্রী বেনীমাধব শীল (সম্পাঃ), 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'/উত্তরকান্ড, অক্ষয় লাইব্রেরী. কলিকাতা, ১৩৯৪

১৯. তদেব, পৃ.৫৭৩

২০. তদেব, পৃ.৫৭২-৫৭৩

২১. তদেব, পৃ.৫৭৩

২২. রাজশেখর বসু, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত' (সারানুবাদ)/বনপর্ব, অষ্টাদশ মুদ্রণ, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড. কলকাতা, ১৩৫৬, পৃ.২২৭

২৩. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, 'মহাভারতম্' ('আদিপর্ব্ব'১), ২য় সং, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৩৮

২৪. তদেব, পৃ.২৬৭-২৬৮

২৫. 'পিত্রা তু ভৃগবে দত্তা পুলোমেয়ং যশস্বিনী/দদাতি ন পিতা তুভ্যং বরলোভান্মহাযশাঃ' ('মহাভারতম্'/আদিপর্ব্ব১, ২য় সং, পৃ.২৬৬)

২৬. '...দেবৈঃ সেন্দ্রৈঃ সর্ষিমরুদগণৈঃ/পূজিতঃ প্রবরো বংশো ভার্গবো ভৃগুনন্দন!/ইমং বংশমহং পূর্বং ভার্গবং তে মহামুনে/নিগদামি যথাযুক্তং পুরাণাশ্রয়সংযুতম্'।।('মহাভারতম্'/আদিপর্ব্ব১, ২য় সং, পৃ.২৫৯)

২৭. শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার (অনুদিত), শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পুনর্মুদ্রণ, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৩৬০, পৃ.১৬১

২৮. তদেব, পৃ.১৮৭
২৯. তদেব, পৃ.১৮৮
৩০. ঐ
৩১. শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার (অনুদিত), শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পুনর্মুদ্রণ, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৩৬০, পৃ.১৮৯
৩২. তদেব, পৃ.১৮৬ (ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র)
৩৩. তদেব, পৃ.১৯১
৩৪. ঐ
৩৫. ঐ
৩৬. ঐ
৩৭. ঐ
৩৮. ঐ
৩৯. শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার (অনুদিত), শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পুনর্মুদ্রণ, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৩৬০, পৃ.১৬১
৪০. শ্রী বেনীমাধব শীল (সম্পাঃ), ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’/আদি, অক্ষয় লাইব্রেরী. কলিকাতা, ১৩৯৪, পৃ.১১১
৪১. তদেব, পৃ.১১২
৪২. শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার (অনুদিত), শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পুনর্মুদ্রণ, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৩৬০, পৃ.১৯১

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে পরিযায়ী শ্রমিকের আখ্যান

রূপম প্রামাণিক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজ

সারসংক্ষেপ: সাম্প্রতিক অতীতের লকডাউন পরিস্থিতিতে সবথেকে বেশি আলোচিত বিষয়টি হল পরিযায়ী শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা। এই সমস্যায় রাস্ট্র তার দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। রাস্ট্র তাদের সম্মান তো দূরের কথা বরং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকেও ধর্তব্যের মধ্যে রাখেনি। তাই বাধ্য হয়ে অতিথি শ্রমিকরা প্রথমবার স্রোতের বিপরীতমুখী হয়ে চলল শহর থেকে গ্রামের দিকে পদব্রজে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের মনে পড়বে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে শ্রমজীবি মানুষ তথা পরিযায়ী শ্রমিকের ভিন্ন রূপ। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'লেবার সেটদার' গল্পে যার সূত্রপাত। এরপর 'জলকন্যা' (২০০১), 'নতুন কাচের ঘর' (২০০৩), 'শশীকান্তর ১০০ দিনরাত্তির' (২০০৯), 'তেলমাসি' (২০১০), 'টাওয়ার ডগায় মেঘ' (২০১০), 'মানচিত্রে ঘর উঠোন' (২০১৩), 'রাতের চন্দ্রাণী' (২০১৩) এবং 'ফোল্ডিং মশারি' (২০২১) -- এই দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর ধরে লেখা গল্পগুলিতে পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটে গেলেও পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যার পরিবর্তন হয়নি। বরং, লকডাউন বুঝিয়ে দিয়েছে সরকার তাদের জন্য ভাবেই না। কোনো গল্পে আছে বাবুবাড়িতে কাজ করার চিত্র, আবার কোথাও বা ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বাঁচার তাগিদে নাম (পড়ুন ধর্ম) পাল্টে থাকার প্রসঙ্গ। কোনো গল্পে পরিবার-পরিজনদের উদ্বেগ, আবার কোনোটায় লকডাউনে কাজ হারিয়ে বাড়ি ফেরারা গাড়ি চেয়ে পুলিশের লাঠি পেটা খাওয়ার বাস্তব চিত্র। আর অধিকাংশ গল্পে বাস্তবসম্মতভাবে উঠে আসে লেবার সেটদাররা। তারাই ভয় এবং ভরসার স্থল। তাদের জন্য কাজ জোটে, টাকা উপার্জনও হয়। আবার তাদের একাংশের ঠকবাজির কারণে টাকা না পাওয়ার চিত্রও বিরল নয়। এই সমস্যা সমাধানে আশু পদক্ষেপ গ্রহনের সম্ভাব্য পথটুকু বাতলে দেওয়ার চেষ্টা করা গেছে এই প্রবন্ধে। সাহিত্যের দিক থেকে যে সমস্যাগুলি পাওয়া গেছে, বাস্তবের সঙ্গে তার অমিল কিছুই নেই। তাই বাস্তবিক সমস্যার সমাধানে রাস্ট্র এবং নাগরিক উভয়পক্ষকেই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে হবে।
সূচক শব্দ: পরিযায়ী, আভিবাসী, অতিথি, লেবার, শ্রমিক, লকডাউন, সুন্দরবন, অন্ত্যজ, লাট, শহরতলি, বিত্তবান, মালিক, বিশ্বমানব।

।ক।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ২৪/০৩/২০২০। এদিন সন্ধ্যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথমবার ২৫.০৩.২০২০ তারিখ থেকে ২১ দিনের জন্য

'লকডাউন' ঘোষণা করেন মাত্র কয়েক ঘন্টার নোটিশে। এই পর্যন্ত মোটামুটি ঠিকই ছিল। কিন্তু ২১ দিন পর দ্বিতীয় 'লকডাউন' শুরু হতেই সারা দেশে শুরু হয় পরিযায়ী শ্রমিকদের পদযাত্রা। দিল্লির আনন্দবিহার বাস টার্মিনাস, গুজরাটের সুরাট, মুম্বইয়ের বান্দ্রায় শুরু হয় বিক্ষোভ নিজ রাজ্যে ফেরার গাড়ি না পেয়ে। তখনও কেন্দ্রীয় সরকার ট্রেন চালানোর কথা ঘোষনা করেনি। ফলত, এই প্রথম মিছিল চলল শহর থেকে গ্রামের অভিমুখে বিপরীতমুখী স্রোতে। আর একই সঙ্গে শুরু হল মৃত্যুমিছিল। মাত্র ১২ বছরের জামলো মকদম থেকে রণবীর সিং আর মালগাড়ির নিচে চাপা পড়া ১৬ জনের সেই মিছিল প্রায় সংখ্যায় হাজার হয়েছে। এতদিন যারা এদের পরিশ্রম-ত্যাগ নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না, সেই 'ভদ্দরনোকে'র প্রাণ কেঁদে উঠেছে। যতনা নিজেরা সাহায্য করেছে তার থেকে বেশি সরকারকে দোষারপ করতেই তারা ব্যস্ত। শুরু হয়েছে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি। সেই সূত্রে তাদের জীবন-জীবিকার বিশ্লেষন এবং পরিযায়ী শ্রমিকের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

> *জনগণনা অনুযায়ী, ভারতের ৪০ কোটিরও বেশি মানুষ নিজের স্থায়ী ঠিকানা বা জন্মভিটেতে থাকেন না। কেউ বিদেশে, কেউ অন্য রাজ্যে, কেউ নিজের রাজ্যে থাকলেও গ্রাম ছেড়ে বড় শহরে। এদের একটা বড় অংশ আবার কয়েক মাসের জন্য অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান। আবার ফিরে আসেন। এঁরাই পরিযায়ী শ্রমিক। এঁদের সংখ্যা কত, তাঁর কোনও সরকারি গণনা নেই। কেউ ভাবেননি।* [১]

সরকার জানে পরিসংখ্যান রাখলে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলবে, জবাব চাইবে।তার থেকে পরিসংখ্যান না রাখাই ভাল। যাকে মার্ক্স বলেছেন 'প্রলেতারিয়েত', পলিটিকাল ইকোনমির চোখে রাতারাতি লকডাউনে –এরা মানুষ রইলেন না, ঘোড়া হয়ে গেলেন। এখানেই মানুষ আর শ্রমিকের পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে। অপরিকল্পিতভাবে 'লকডাউন' করে সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে এদের মানুষ মনে করার মত মানসিকতা সরকারের নেই। স্বচ্ছল 'ইন্ডিয়া' আর অনগ্রসর 'ভারতে'র দ্বন্দ্ব আজ প্রকাশ্যে এসে গেছে সরকারি কর্মকান্ডের ফলে। কারোর কাছে এরা 'পরিযায়ী' শ্রমিক, কারো কাছে 'অতিথি' শ্রমিক, কেউ বা বলে 'অভিবাসী' শ্রমিক। নামের হেরফের কষ্টের বোঝা লাঘব করতে পারে না। আর মহিলা শ্রমিকদের তো ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় না।

> *পুরসভার চোখে যারা অবৈধ দখলদার, ঠিকাদারের চোখে লেবার, শহরবাসীর কাছে দৃশ্যদূষণকারী, রাজনৈতিক দলের কাছে ফালতু অ-ভোটার, পুলিশের চোখে সম্ভাব্য অ-নাগরিক, গৃহকর্ত্রীর চোখে ফাঁকিবাজ, মহামারীর সামনে দাঁড়িয়ে চোখ খুলে সবাই দেখল, তারা মানুষ।* [২]

যেখানে তার নিজের যায়গা , সেখানে কাজ নেই। আবার যেখানে কাজ আছে, সেটা নিজের যায়গা নয়। সুতরাং, 'স্বভূমি' এবং 'কর্মভূমি'র মধ্যে যাতায়াত তাদের নিয়তি। লকডাউনে ইউরোপ, মধ্য-প্রাচ্যের বহু দেশ থেকে 'বন্দে ভারত' অভিযানের মাধ্যমে বহু

মানুষকে দেশে ফেরানো হয়। বিভিন্ন রাজ্যে আটকে থাকা ছাত্রদের বাস পাঠিয়ে স্বরাজ্যে ফেরনো হয়। উত্তরাখন্ডের তীর্থযাত্রীদের গুজরাটে ফেরানো হয়। শুধু বাদ থাকে পরিযায়ী শ্রমিকরা। খাবার তো পাচ্ছ, আবার ফিরতে চাওয়া কেন? শেষপর্যন্ত স্বচ্ছল 'ইন্ডিয়া' বাড়িতে বসে টিভিতে হেঁটে, সাইকেলে চেপে অনগ্রসর 'ভারত'কে বাড়ি ফিরতে দেখে।

।খ।

সুন্দরবন নিয়ে বর্তমান সময়ে যাঁরা লিখে চলেছেন ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রাঢ় বঙ্গের সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রতিযোগী হয়ে উঠতেই যেন ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সুন্দরবনমুখীনতা। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন 'দক্ষিণবঙ্গের তারাশঙ্কর'। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে আমরা পেয়েছি গাঙের বিভিন্ন চিত্র, চর ও চরের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ জঙ্গল, হেতালের গেঁওয়া-গরাণ, ভটভটি-লঞ্চ-ডিঙি-ট্রলারে জীবন সংগ্রাম, আড়ত ও আড়তদার। আর আছে অবৈধ সম্পর্কের টানাপোড়েন।এ সব নিয়েই লেখকের বাস্তবের জগত। এই রিয়ালিটির জগৎটি লেখকের নিজস্ব সম্পদ।

এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, ঝড়েশ্বর যেমন চেনেন তাঁর বিধৃত অঞ্চলের মাটিকে, ঠিক তেমনই জানেন সেই মাটির মানুষদের লড়াইয়ের ইতিহাসকে। [৩]

বিধৃত অঞ্চলের মাটি ও মানুষের লড়াই উঠে এসেছে তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে। সুন্দরবন নিয়ে লেখকের মাদকতা থাকলেও মফস্‌সল লেখকের বহু গল্প-উপন্যাসে ধরা দিয়েছে। একদিকে 'রামপদর অশন-ব্যসন', 'স্বজনভূমি', 'চরপূর্ণিমা', 'সমুদ্র দুয়ার'-এর মত সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাস যেমন তিনি লিখেছেন, তেমনি গাছের কলম তৈরি করা নিয়ে 'জোড়কলম', জবা ফুলের চাষ নিয়ে 'ফুলের মানুষ' বা নারী-পুরুষের হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক নিয়ে তৈরি 'বিনোদনের বিপণন'-এর মত উপন্যাসগুলি মফস্‌সলের চিহ্ন বহন করে। তাই লাট অঞ্চলের কথা মূলত থাকলেও ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে আছে বিচিত্র বিষয়।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় নাটকীয়তা নেই। শিল্পীর নৈব্যক্তিকতা, ধৈর্য, সততা প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর লেখায়। পাঠকের মনোরঞ্জনের দ্বায় নিয়ে এ লেখা তৈরি হয়নি। নিরাভরণ, সরল বর্ণনাতেই তাঁর লেখার সার্থকতা। তাঁর লেখনিতে ছিন্নমূল মানুষের মিছিল, দলিল–দস্তাবেজের প্রামাণ্য তথ্য বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত করে তোলে। গ্রাম্য জীবন, লোকাচার, দেবদেবী বিশ্বাস সবই উঠে আসে তাঁর লেখায়।

ঝড়েশ্বর অবশ্য গ্রামের বর্ণনায় ততটা নয়, গ্রামের বিভিন্ন পেশার মানুষকে ধরতে চেষ্টা করেছেন। [৪]

একদিকে আছে শহরতলির চাকরি করা মানুষ, অন্যদিকে নদী ও জঙ্গলের মুখাপেক্ষী মানুষ; যাদের প্রধান জীবিকা মাছ ধরা, কাঠ কাটা, মধু সংগ্রহ। আর আছে ফুল চাষ এবং কলম বাঁধার জীবিকা। বই বিক্রির জন্য নয়, বরং প্রয়োজন অনুসারেই উপন্যাসে যৌনতার আগমণ ঘটান ঝড়েশ্বর। তাঁর প্রত্যেকটা উপন্যাসেই আছে অবৈধ সম্পর্কের

ছড়াছড়ি। কিন্তু সম্পর্কগুলি আসে শুধু যৌনতার টানে নয়, জীবনধারার প্রয়োজনে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট ভৌগোলিক স্থানকে সাহিত্যের পটভূমিতে স্থান দেওয়া এবং ঐতিহাসিক সত্যকে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করা। যখন তেভাগার মত বিষয় লেখকের লেখার বিষয় হয়, তখন তিনি তথ্যকে কীভাবে ব্যবহার করবেন সাহিত্যে এবং সত্যের সঙ্গে কল্পনার বুননে কীভাবে সাহিত্যটি তৈরি হবে; তাকেই প্রাধান্য দেন লেখক। আর তাই বাস্তব সত্য কখন যে সাহিত্যের সত্যে পরিণত হয়, তা স্থির করে ওঠার আগেই পাঠক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য পড়ে ফেলে। বিগত পাঁচ দশকে ঝড়েশ্বর যে সাহিত্য সম্ভার তৈরি করেছেন, তার মধ্যে বিগত তিন দশকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নানানভাবে তিনি ধরতে পেরেছেন তাঁর লেখনিতে; বিশেষত গল্পে। এমনই কয়েকটি গল্প আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সাহিত্যে পরিযায়ী শ্রমিকের অবস্থানকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

।গ।

ইদানিং আমরা বেশ কিছু করোনা ডায়রি পড়েছি। ভালও লেগেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ‘ছেলেটা’ কবিতার নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডির মত শ্রমিক বা মজুরদের অসহনীয় যন্ত্রনার আখ্যান সেভাবে বর্তমান দিনের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের ‘ছড়ার ছবি’তে কারখানার শ্রমিক মাধো’র বৌ-বাচ্চা নিয়ে পথে নামার চিত্র। ‘রক্তকরবী’র বিশু দেশে যেতে চাইলেও সর্দার ফিরতে দেয় না। লকডাউনের মধ্যে পড়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের সেই অবস্থা। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি গল্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিচিত্র স্বর ধরা পড়েছে। সেগুলির আলোচনায় বিগত তিন দশকে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যাবে এবং বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান খুঁজে নেওয়া যাবে।

‘জলকন্যা’ গল্পে মালতী প্রায় এক বছর কাজ করে বাবুদের বাড়ি থেকে দিন দশেকের ছুটিতে বাড়ি ফেরে। একফালি ঘরে দিদিমণিদের পুরানো সায়া-ব্লাউজ-ম্যাক্সিতে আর সমপরিমান খাদ্যে বেশ কেটে যাচ্ছিল তার। বাদাবন, সুন্দরবনের দেশে ফিরে কাঁকড়া-মিন ধরাতেও সে সমানভাবে প্রত্যয়ী। ছুটির ১০দিন পেরিয়ে গেলেও শহরে বাবুবাড়িতে ফেরার নাম করেনা মালতী। শহরে বাড়ির বাবু অনিমেষ ও তার স্ত্রী মালতীকে নিতে আসে। মালতীও ফিরতে চায়। কিন্তু তার শরীরি ভাষা যেন সমুদ্র ছেড়ে যেতে চায় না। তাই অনিমেষ তার স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে যায়। মালতী বাড়ির কাজের মেয়ে থেকে স্বাধীন, মুক্ত প্রকৃতিকন্যা হয়ে ওঠে। বাড়ির অস্বচ্ছলতার বিপক্ষে বাবুবাড়ির স্বচ্ছলতায় ভাল খাবার পায় মালতী। তাতে তার গায়ে তেল গড়িয়েছে, যা বাড়ির বৌদিদের হিংসার কারণ। এমনকি সন্দেহের বসে তারা বলে,--

‘... জামাই ... ! হুম ওর যা চিকন ঠমক গোটা শহর ... কলকাতা ঘুরলে তো রোজ দুটো চারটে জামাই ?’ (পৃঃ ১৮৩। ‘জলকন্যা’, **নতুন মেম**।)

অথচ তার পাঠানো টাকায় বাড়িতে খানিকটা স্বচ্ছলতা ফেরে। যে মানুষগুলোর ভরণপোষন হচ্ছে তার টাকায়, তারাও সন্দেহ করে মালতীকে। বাড়ির কাজেরলোক হয়ে বিশ্বাসহীনতার এই যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয় মালতীদের।

চন্দনপীঁড়ির কিশোরী গৌরী কাজ করে বারুইপুর-সোনারপুর সংলগ্ন বাবুবাড়িতে। তাকে ভালোবাসে বাড়ির মাসি-মেসো, দাদা-বৌদি সকলেই। খাওয়া-পরারও কোনো অভাব নেই। সমুদ্রের দেশের গৌরী গরম পড়লেই কলকাতার ভারি বাতাসে হাঁফিয়ে ওঠে। তখনই মনে পড়ে তার দেশের সমুদ্রের কথা। আর বারবার সমুদ্রের কথা বলায় বিরক্ত হয় মাসি। তাকে শান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মেসো নিয়ে যায় মজে যাওয়া গঙ্গা দেখাতে। মেসো বলে, এই গঙ্গা দিয়ে চৈতন্যদেব পুরি গিয়েছিলেন। কিন্তু মজে যাওয়া গাঙ সমুদ্রের খিদে মেটাতে পারে না। দাদাবাবু ফোনে কথা বলছে দেখে গৌরীর ইচ্ছা হয় মা লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু লক্ষ্মীর ফোন নেই। অন্যদিকে লক্ষ্মী মিন ধরে উপার্জিত সামান্য কটা টাকা দিয়ে টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করে গৌরীর কাজের বাড়িতে। সমুদ্রে অনেক মিন পাওয়া যাচ্ছে শুনে গৌরী বাড়ি ফিরতে চায়। কিন্তু লক্ষ্মী সন্দিহান মেয়ের ফেরা নিয়ে। একদিকে দীর্ঘদিন বাড়ি না থাকায় মেয়েকে কাছে পাওয়ার মায়ের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে প্রকৃতির কাছে মুক্ত কন্যা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা – গল্পটির চালিকাশক্তি। আকাশে মেঘ দেখে গৌরী যখন বলে ---
'মাসি... ওই মেঘগুলো না আমাদের দেশের গাঙের উপর দিয়ে আসছে গো' (পৃঃ ২২৮।'নতুন কাচের ঘর', **নতুন মেম**।), তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না; মাটির প্রতি মানুষের টান কাউকেই পরিযায়ী করে না।

ডায়মন্ড হারবার সংলগ্ন ইটভাটায় কাজ করতে আসা বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যার পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনের টুকরো চিত্র 'তেলমাসি' গল্পের প্রাণ। কল্পনা জাঁতুয়া ইটভাটার শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে কেরোসিন তেল বিক্রি করতে যায়। সেই সূত্রে পাঠকদের চোখে ধরা পড়ে ইটভাটার শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্র।

'আলগা ইটগুলো পরপর বসিয়ে পাঁচফুট উচ্চতায় ১০ইঞ্চি মোটা দেওয়াল, তার ওপর বাঁশ বাখারি কাঠামোয় হোগলা তেরপলিন চাপিয়ে লম্বা দৌড় আঠারো বিশখানা কামরা। এগুলো তো ইটভাটার কুলি রেজাদের শেড এদিকটায়।'(পৃঃ ১৫২। 'তেলমাসি', **রমণী ও পুরুষ**।)

তাদের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। তাই কেরোসিন কিনে লণ্ঠনেই ভরসা। গ্যাসের বদলে ছোট ঘুপচি ঘরে কাঠের, কয়লার জ্বাল দিয়ে রান্না।

'আর একপ্রস্থ কাঁথাকানির ওপর ছ'মাসের বাচ্ছাটা শুয়ে। যেন ময়ূরভঞ্জের পাহাড় ঘসা একটুকরো কালো পাথর।' (পৃঃ ১৫৪। 'তেলমাসি', **রমণী ও পুরুষ** ।)

চারিদিকে মদের গন্ধ, তার মধ্যেই বেড়ে উঠছে শৈশব-কৈশোর। এখানেও আছে লেবার সাপ্লায়ার ঘাসিরাম। সংসার, সন্তান ছেড়ে সে এখানে আছে। গ্রাম থেকে ৬০-৭০ জন লেবার যোগান দেয় সে। সংসার ছেড়ে থাকার কারণে প্রকৃতিকে উপেক্ষা

করতে পারে না ঘাসিরাম। তেলমাসি কল্পনার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। লেবার সেটদার ঘাসিরাম আর স্থানীয়, পুরুষহীন তেলমাসিরা একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

'লেবার সেটদার' গল্পে চন্দনপীঁড়ি গ্রাম ছেড়ে অন্ধ্রপ্রদেশে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভূগর্ভ থেকে তেল তোলার কাজ করতে চায় নির্মল গুড়িয়া, ভূপতিরা। প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে লেবার সেটদার শ্রীকণ্ঠ মাইতির ভূমিকা। এই শ্রীকণ্ঠ মাইতিরা গ্রামের বেকার যুবকদের ভিন রাজ্যে কাজের জন্য পাঠায়, বিনিময়ে কিছু কমিশন পায়। নির্মলকে ছাড়তে আসে তার স্ত্রী কমলা। সবার লক্ষ্য ৩-৪ মাসে ৩ হাজার টাকা উপার্জন এবং সেই টাকায় গ্রামে একটু জমি যদি কেনা যায়। শ্রমিক পরিবারের ভয় যদি ঠকে যায় তারা, দ্বারিকনগরের ছোকরার মত যদি না ফেরে। পরিবার-পরিজনকে কাছে না পাওয়ার বেদনা, তাদের আবদার, সন্তান-সন্ততির চাহিদা --- এ সবই আবর্তিত হয় গল্পে। যে চন্দনপীঁড়িতে একদিন ফসলের ভাগ নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল, সেখানে চাষবাদের বদলে মানুষকে কাজের জন্য বাইরে যেতে হয়। যাত্রার পূর্বে পরিবার-পরিজনের পাশে থাকার আকুতি, তাদের সহমর্মিতা চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ে। আজও প্রতিনিয়ত দক্ষিনবঙ্গের প্রান্তিক এই স্থানগুলি থেকে একটু বেশি রোজগারের খোঁজে ভিনরাজ্যে চলেছে মানুষ। মধ্যসূত্র সে লেবার সেটদাররাই। বাড়ির মহিলাদের উদ্বেগ দূর করতে শ্রীকণ্ঠ বলে ---

'এটা কি বলছ বউমা? আমি পাঁচটা লোক দিচ্ছি কোম্পানিকে – কোম্পানির লোক হাবড়ায় থাকে গেলেই খবর পাব।'(পৃঃ ১২১। 'লেবার সেটদার', **ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প**।)

অমল দন্ডপাট নামক লেবার সেটদারের প্রসঙ্গ টেনে শ্রীকণ্ঠ আরও জানায় যে, সে অমলের মত ঠকবাজ নয়। কারো পয়সা সে মারে না। তাছাড়া ভিনরাজ্যে কাজে গেলে পঞ্চায়েতকে জানিয়ে, বিডিও অফিসে লিস্টে নাম তুলে যাওয়ার পক্রিয়ায় আছে ভরসার ছোঁয়া। বাইরে কাজে গিয়ে ভাষা সমস্যাও তাদের কতটা বিড়ম্বনায় ফেলে, তা মফিজের কণ্ঠে ধরা পড়ে।

কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার মর্মস্পর্শী কাহিনির গল্পরূপ 'শশীকান্তর ১০০ দিনরাত্তির'। নন্দীগ্রামে শিল্প না হওয়ায় বাংলার গ্রামীন অর্থনীতি যে শহরমুখী হবে-- এ কথাই যেন ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিতে চান লেখক। একদিকে পঞ্চায়েতের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প, অন্যদিকে লেবারের কাজ নিয়ে নয়াদ্বীপে যাওয়াকে কেন্দ্র করে গল্পের বুনন তৈরি হয়। কিন্তু গল্প শেষ হয় ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া এক মুসলমানের পরিচয় লুকানোর বাসনায়। নব্য সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ, লেবার সেটদার নিমাই হাজরার কাছে বিক্রি হওয়ার থেকে ১০০ দিনের কাজ করা অনেক ভাল বলে মনে করে শশীকান্ত। কিন্তু অল্প শিক্ষিত শশীকান্ত বোঝে না স্থানীয় পঞ্চায়েত মেম্বারকে ধরে জব

কার্ড করালেও কাজ পেতে দু-সপ্তাহ লাগবে। কাজ পাওয়ার দীর্ঘসূত্রতায় গরিব মানুষের ধৈর্য ভাঙে। তাদের কথপোকথনে বোঝা যায়---

'ঠিকাদার কইছিলি যে, অন্ধ্রপ্রদেশ না ব্যাঙ্গালোর কোথায় যে ... দেশগুলোর নাম শুনতে শুনতে শশী সকলের মুখ দেখে। হঠাৎ বলে, নাসের ... নাসিরুদ্দিনদা তুই?
--জোয়ারভাটার দেশের মানুষ। যৌখানে কাজকামের জোয়ার সৌখানে ভাসব।'(পৃঃ ৩৮৯।'শশীকান্তর ১০০ দিনরাত্তির', **সেরা ৫০টি গল্প**।)

মোবাইল ফোনের আগমনে বহু জীবিকা তৈরি হলেও জীবিকার যে সংকট তৈরি হতে পারে, তারই গল্প 'টাওয়ার ডগায় মেঘ'। মোবাইল ফোনের আগমনের ফলে এস.টি.ডি. বুথগুলি বন্ধ হয়ে যায়, তাই এই ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ। কাজের অভাবে পরিযায়ী হয়েছে প্রমথ, নাসিরুদ্দিনরা। অনটনের সংসারে মাথা ভাল প্রমথ ৮ম শ্রেনী পর্যন্ত পড়ে পড়া ছাড়তে বাধ্য হয়। তাই সে রোজগারের আশায় পরিযায়ী হয়। শিল্পায়ণের প্রাসঙ্গিকতা, সোয়াইন ফ্লু-র কারনে মাস্ক ব্যবহারের প্রসঙ্গ গল্পটিতে উঠে এসেছে। একই সঙ্গে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে বিয়ে করে সংসার পাতলে যদি টাকা না পাঠায়, সেই ভয়ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে কাজ করে--- যা অত্যন্ত বাস্তবিক এবং মনস্তত্ত্বসম্মত।

'মানচিত্রে ঘর উঠোন' গল্পে বিদেশ-বিভুঁইয়ে চাকরির দুটি রূপ আমাদের কাছে ধরা দেয়। দশরথ সরকারি চাকরি সূত্রে বিভিন্ন রাজ্যে যায়। অন্যদিকে বাদাবনের আরেক সন্তান সৌরভ গুজরাটে ঠিকে শ্রমিক। কখোনো আবার পুণা, বোম্বাইয়ে যেতে হয় তাকে। কোম্পানি বিল্ডিং তৈরির কাজ ধরায় এখন আর তার ঘরে ফেরা হবে না। তার সঙ্গে নামখানা, সাগর, বসিরহাট, মালদার ছেলেরাও কাজ করে। নামখানার সেখ পাড়ার নাড়ু সেখ তাদের লেবার ঠিকাদার। সৌরভদের টাকার ভরসায় থাকে তার স্ত্রী, সন্তান ও মা।

'রাতের চন্দ্রাণী' গল্পে চন্দ্রাণী ছোট ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে একা থাকে সুন্দরবনের দ্বীপে। জঙ্গলের কাঠ চুরি করে সামান্য উপার্জন করে সে। তার স্বামী বোম্বাইতে কাজ করে। শিল্পায়ণের কারণে সেখানে কাজের সুযোগ বেশি। নামখানার হরিপদ দিন্দা এই দ্বীপের ৪০-৪২ জনকে নিয়ে গেছে, তার মধ্যে চন্দ্রাণীর স্বামী একজন। একদিকে বেকার যুবকদের একটা হাল হয়েছে বটে। কিন্তু চন্দ্রাণীর ভয়---
'... ঘরের মানুষ কত দূরে ... ! আমি কটা বাচ্চা নিয়ে ... !'(পৃঃ ৩০৪। 'রাতের চন্দ্রাণী', **রমণী ও পুরুষ**।)

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে লেখা 'ফোল্ডিং মশারি' গল্পে করোনার আবহে পরিযায়ী শ্রমিকদের মর্মন্তুদ কাহিনি বর্তমান। রবীন্দ্র বিজলি বিয়ের আগে আবুধাবিতে কাজ করতে গিয়ে কিছু টাকা উপার্জন করে। সেই টাকায় ঘর-দালান তোলে। বিয়ে করে তৃষাকে, এক কন্যারও বাবা হয় সে। আবার তাকে পরিযায়ী হতে হবে। নইলে

ঘরের প্লাস্টার বা সাধের কাঠের টেবিল হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তৃষা আর তাকে ছাড়তে রাজি নয়। গল্পে মোবাইলে পুরানো ছবি দেখে রবীন্দ্রর স্মৃতিতে ভেসে ওঠে –

'আর একটু বাড়িটার নীচতলায় কন্ট্রাকটরের টানা হলঘরটা। পরপর সস্তা কাঠের সরু তক্তাপোশে ন'দশ জনের বিছানাগুলো ফুটে ওঠে।'(পৃঃ ২৯। 'ফোল্ডিং মশারি', **সাপ্তাহিক বর্তমান, ৩৩ বর্ষ, সংখ্যা ২৫**।)

শিবনগর, মৌসুনি, পাথর প্রতিমা, সাগরের ছেলেরা সেখানে কাজ করে। একটু পড়াশোনা জানলে হিসেব রাখারও কাজ পায়। বর্তমান করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলেই রবীন্দ্র ভিসা করিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু মোবাইলে ভিডিওতে সে দেখে মুম্বাই রেলস্টেশনে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিড়। আর সেই ভিড়ে পুলিশের লাঠিচালনা।

'হাজার হাজার মানুষের চিৎকারের পর চিৎকার ... বান্দ্রা স্টেশনের বাইরে কাঁধে পিঠে কিটস ব্যাগ নিয়ে কিশোর, যুবক, মধ্যবয়সী পুরুষদের ভিড়। তাদের আর কাজ নেই। রোজ মজুরি নেই। খাদ্য নেই আবার সেকেন্ড লকডাউন ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীজির। কোলে শিশু নিয়ে কত মহিলা, কিশোর, কিশোরী দাঁড়িয়ে। নিজ নিজ রাজ্য ... দেশ গাঁয়ের ভিটেতে ফেরার প্রার্থনায় ট্রেনের দাবী ...।' (পৃঃ ৩০। 'ফোল্ডিং মশারি', **সাপ্তাহিক বর্তমান, ৩৩ বর্ষ, সংখ্যা ২৫**।)

।ঘ।

> *বিত্তবানদের থেকে পরিযায়ী শ্রমিক যত দূরে, ততই কাছে। আমাদের গাঁথনির ইটে, ছাদের ঢালাইতে, শাড়ির জরি, হাতের কাঁকন, শিশুর খেলনাতে তাঁদের শ্রম। তাঁরাই দুমকা থেকে বর্ধমান, উত্তর প্রদেশ থেকে হরিয়ানা গিয়ে ধান কাটেন। তাঁরাই ডাইমন থেকে কলকাতা, গোসাবা থেকে দিল্লি গিয়ে ভাত রাঁধেন। নাজ্য পারিশ্রমিকের চাইতে কম টাকায় কাজ (এমব্রয়ডারির কাজে প্রতি পিস মজুরি কমছে), ঘুপচি ঘরে বসবাস (প্রায়ই দাহ্য বস্তুর সঙ্গে, তালাবন্দী হয়ে)। কেন আইনি অধিকার, প্রকল্পের সুবিধের কোনওটাই ওদের স্পর্শ করতে পারেনি, কেউ জানতে চায়নি।* [৫]

ভারতে ১ শতাংশ মানুষের হাতে আছে দেশের মোট সম্পত্তির ৭৩ শতাংশ। অথচ প্রায় ২৭ কোটি মানুষ ভারতে খালি পেটে শুতে যায়। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুধা সূচকে ভারত ৫৫তম স্থানে ছিল। বর্তমানে আমরা ১০২তম স্থানে অবস্থান করছি। আমাদের আগে আছে চীন, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, এমনকি পাকিস্তানও। সরকার চাইলেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া বিত্তবানদের থেকে বেশি করে ট্যাক্স বসিয়ে সেই টাকা গরিব কল্যাণে ব্যায় করতে পারে। কিন্তু সরকারের একটা বড় অংশ তো সেই কলা গাছের কলা খেয়ে বসে আছে। আমাদের প্রবৃদ্ধি (জি.ডি.পি.) হার অনুযায়ী আমরা উন্নয়নশীল দেশ। অথচ উৎপাদিত সম্পদের সুষম বন্টনের সমস্যার কারনে গরিবি আর দূর হয় না। যেটাকে কৌশিক বসু বলবেন, 'ব্যবসার লাভের অংশ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে' (আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৮-০৪-২০২০)। ব্যাঙ্কের টাকা লুঠ করে সরকারি ক-খ-

গ-ঘ বাবুদের সহায়তায় গবিদেশে পালায় নীরব মোদি, মেহুল চোক্সিরা। অথচ আমাদের চারিদিকে ঘটে আমলাশোল, খয়রাশোল, কালাহান্ডি। এই বাস্তব পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার তাগিদে, একটু স্বচ্ছলতার জন্য মানুষ পরিযায়ী হয়।

গল্পগুলির পাঠে আমরা দেখেছি পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গী বৈষম্য। কখনো এজেন্ট দ্বারা তারা প্রতারিত, কখনওবা ভাষা-ধর্মের কারণে অত্যাচারিত। লকডাউনে তাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়েছে। তাদের দু-দিকে মার। একদিকে কাজ বন্ধ, সঞ্চয় শেষ, খাদ্য শেষ। অন্যদিকে শারীরিকভাবে অপুষ্ট হওয়ার কারণে অতিমারিতে মরবে তারাই। শ্রমিক বাড়ি গিয়ে যদি না ফেরে, এই ভেবে মালিক ছাড়তে চায় না। অথচ শ্রমিকের সঞ্চয় শেষ। সরকারও চায় না শ্রমিক বাড়ি ফিরুক। কারণ, কারখানা বন্ধ হলে ট্যাক্স কম ঢুকবে সরকারের কোষাগারে। সীমিত সঞ্চয় নিয়ে, কর্মহীন অবস্থায় সরকারি সাহায্য ছাড়া কতদিন তারা থাকবেন! ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে গাদাগাদি করে থাকতে তারা বাধ্য। অথচ সংক্রমণ বাড়লে দ্বায় বর্তায় তাদের উপরেই। কোথাও আইনি পথে, আবার কোথাও বেআইনি পথে ভিনরাজ্যে তারা কাজ নিয়েছে। তাই পুলিশের ভয় তাদের নিত্যসঙ্গী। কখনোবা বাড়ির লোকের সন্দেহ, আবার কখনও বাড়ি ফেরার তাড়নায় তারা দগ্ধ। কখনোবা নিজের চাহিদা মেটাতে অস্থায়ী সম্পর্ক, আবার কখনও প্রিয়জনের জন্য বাড়ি ফেরার তাগিদ তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। আর বাড়িতে থাকা পরিবার-পরিজনের উদ্বেগ গল্পগুলিতে সবচেয়ে বাস্তবিকভাবে ফুটে উঠেছে। আমরা, তুলনামূলকভাবে বিত্তবানরা, তথাকথিত শিক্ষিতরা গল্পের সেই কাহিনি পড়ে চোখের জল ফেলেছি; অথচ তাদের হয়ে লড়াই করিনি। সমস্যাটা অতিমারি নয়, সমস্যাটা মানবিক। এই সমস্যার মোকাবিলায় আমাদের বিশ্বনাগরিক হতে হবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। অভিবাসী শ্রমিকদের চিহ্নিত করে সরকারকে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আর আমাদের হতে হবে সরকারের বিবেক তথা পথপ্রদর্শক।

তথ্যসূত্র:

১। প্রেমাংশু চৌধুরী। ভোটার হিসেবে দাম শূন্য। সম্পাদকঃ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৪-০৫-২০২০। পৃঃ ৪
২। স্বাতী ভট্টাচার্য। আজ চোখে পড়ছে যাঁদের। সম্পাদকঃ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা। ১১-০৪-২০২০। পৃঃ ৪
৩। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। দিগন্তে নতুন পথিকের দল। সম্পাদকঃ অশোক দাশগুপ্ত। আজকাল। ২৮-০১-১৯৯৬
৪। মীনাক্ষী দত্ত। গ্রাম শহর ছোঁয়া দিনস্রোত। সম্পাদকঃ অশোক দাশগুপ্ত। আজকাল। ২৯-০৬-১৯৯৩

৫। স্বাতী ভট্টাচার্য। আজ চোখে পড়ছে যাঁদের। সম্পাদকঃ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা। ১১-০৪-২০২০। পৃঃ ৪

আকর গ্রন্থঃ

১। ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প। ১ম সংস্করণ। প্রতিক্ষণ পাবলকেশন প্রা.লি.। কলকাতা-১৩। ১৯৯৩।

২। ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। নতুন মেম। ১ম সংস্করণ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা-৭৩, ২০০৫

৩। ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। সেরা ৫০টি গল্প। ১ম সংস্করণ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা-৭৩, ২০০১১

৪। ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। রমণী ও পুরুষ। ১ম সংস্করণ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা-৭৩, ২০১৪

আকর পত্রিকা:

১। ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ফোল্ডিং মশারি। সম্পাদকঃ জয়ন্ত দে। সাপ্তাহিক বর্তমান। বর্ষ ৩৩, সংখ্যা-২৫। ০৯-০১-২০২১

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে প্রান্তিক চরিত্র

সমীরণ বেরা
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : রামকুমার মুখোপাধ্যায় মূলত তাঁর নির্মিত আখ্যানে চরিত্রকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। রামকুমারের গল্প উপন্যাসে তাঁর চোখে দেখা চরিত্রেরা অনেকেই সরাসরি প্রবেশ করেছে। কথনভঙ্গির বিশিষ্টতায় রামকুমারের চরিত্ররা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। গ্রামের নিরক্ষর মানুষগুলোর জীবন সংগ্রাম অতি যত্নে তিনি তুলে ধরেন। তাদের জীবন জীবিকার সাথে চরিত্রগুলি সম্পৃক্ত হয়ে যায়। কেষ্ট মেটে, টেলু চক্রবর্তী, ফ্লুট-বাজিয়ে মধুসূদন, ফেতিরাণী বিভিন্ন গল্পের এই সব চরিত্রগুলি তাঁর চোখে দেখা বাস্তবের চরিত্র।

সূচকশব্দ : মাঠ রান্না, হাভাতে, গোষ্ঠ, পিকনিক, চৌকিদার, বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি।

আখ্যানকার যখন তাঁর আখ্যান নির্মাণ করেন তখন তার ভিত্তি মূলত দুটি - একটি হল চরিত্র আর অন্যটি বিষয়। কোথাও ঘটনার প্রাধান্য আবার কোথাও চরিত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তবে রামকুমার মুখোপাধ্যায় মূলত তাঁর নির্মিত আখ্যানে চরিত্রকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে তাঁর চোখে দেখা চরিত্রেরা অনেকেই সরাসরি প্রবেশ করেছে কাহিনির মধ্যে। কথনভঙ্গির বিশিষ্টতায় চরিত্ররা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। গ্রামের নিরক্ষর মানুষগুলোর জীবন সংগ্রাম তিনি অতি যত্নে তুলে ধরেন। এই প্রান্তিক মানুষগুলো জীবন জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তাঁর চোখে দেখা বাস্তবের চরিত্র যেমন- কেষ্ট মেটে, টেলু চক্রবর্তী, ফ্লুট- বাজিয়ে মধুসূদন, ফেতিরাণী প্রভৃতি চরিত্রগুলি কখনও সরাসরি আবার কখনও উক্ত চরিত্রগুলির আদলে গল্প-কাহিনিতে উঠে এসেছে। কল্পনার আশ্রয়ে নির্মিত চরিত্ররাও তাঁর লেখনীর গুনে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে কতকগুলি প্রান্তিক শিশু কিশোরের জীবন জীবিকার ছবি আছে। এরা প্রত্যেকেই অভাব-অনটনের সঙ্গী। যে বয়সে পুতুল খেলার কথা তারা সে বয়সেই জীবিকার সাথে যুক্ত হয়। এদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। এ প্রসঙ্গে 'পিকনিক' গল্পের গঙ্গি, 'গোষ্ঠ' গল্পের লক্ষ্মণ, 'চারণে প্রান্তরে' উপন্যাসের বিশুর কথা উঠে আসে। এদের প্রত্যেকেরই জীবিকা হল 'বাগালি' বা রাখালিয়া। গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের গোরু, ছাগল, ভেড়া চরিয়ে সামান্য আয় করে এরা। 'পিকনিক' গল্পে গঙ্গি যেন নিরন্ন গ্রাম বাংলার সমস্ত অভুক্ত শিশু সমাজের প্রতিনিধি। পেট ভরে দুটো খাবারের আশায় সে হাজির হয় কলকাতা থেকে আসা বাবুদের 'মাঠ রান্না' করার জায়গায়। তার মতো অন্য কয়েকজনও এসে হাজির

হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ একটু বেশি তরকারি পাওয়ার আশায় বাবুদের আমোদের জন্য এলাকা পরিস্কার করে দেয়। গল্পকার এই গল্পে গঙ্গির বিপরীতে একটা শহুরে মেয়ের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। একদিকে অভাব অনটন অন্যদিকে শহরের আভিজাত্য প্রাচুর্য – এই দুই বৈপরীত্যে গঙ্গি এবং তার বয়সি শহুরে মেয়েটির মাধ্যমে গ্রামবাংলার নিরন্ন রূপটি প্রতিভাত হয়েছে। রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গল্পে এই বৈপরীত্যকে তুলে ধরেছেন নিরাসক্তভাবে-

> *"ঠিক তার সোজাসুজি বসেছে তার মতো একটা মেয়ে। গঙ্গি পা ঘষে ঘষে আর একটু সামনাসামনি যায়। চোখ চেয়ে গঙ্গি হাঁ হয়ে যায়। একি জামা রে বাবা – পা থেকে টুঁটি পর্যন্ত লাল টুকটুকে! গাঁয়ের বাবুদের মেয়েরাও এমন জামা পরেনি। গঙ্গিরও একটা জামা আছে। পরবপালে পরে। বাবুগিন্নি দিয়েছে। নাম বলেছিল –'বাউজ'। লাইকুন্ডল থেকে খানিকটা নামে। লাল জামাটা দেখে লোভ হয় গঙ্গির। ও বাবা, পায়ে আবার লাল টুকটুকে জুতো! অমন ঝিলিকমিলিক জুতো দেখে হাঁ হয়ে যায় গঙ্গি। দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে নিজের পায়ে হাত বুলোয়।... চোখ এসে আটকে যায় তার মতো মেয়েটার পাতায়। মেয়েটা গবগব করে খাচ্ছে। ফুলো ফুলো গালদুটো কুবকুবে হয়ে ওঠে। গঙ্গি ডান হাতটা কাঁধ থেকে গালের উপর নিয়ে যায়। হাত ঘষে। নাঃ ডোবা ডোবা।"*[১]

আসলে এই শহুরে মেয়েটি যেন গঙ্গিরই আর এক সত্তা। গল্পকার এক চরম নির্লিপ্ততায় গঙ্গি চরিত্রটিকে অঙ্কন করেছেন। গঙ্গি শহুরে মেয়েটির খাওয়া দেখে লোভ সামলাতে পারে না। সে এগিয়ে যায় শহুরে মেয়েটির দিকে। শহুরে মেয়েটিকে একেবারে সামনাসামনি পেয়ে ভেংচে দেয় গঙ্গি। সুদির মায়ের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলে ওঠে 'মুখপুড়ি, মাগা ভাত মাগের লাথ'। কেউ পাশ থেকে 'ধর, ধর' বলে উঠলে গঙ্গি বুকের কাছে এঁটো পাতাটা জাপটে ধরে ছুটতে থাকে। একদিকে ক্ষুধার তাড়না অন্যদিকে আত্মমর্যাদাবোধ – এই দুই বৈপরীত্যের সমন্বয়েই গঙ্গি চরিত্রটির সার্থকতা।

'হাভাতে' গল্পের ডিংলে যেন গঙ্গিরই পরবর্তী রূপ। টেলু চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পুত্র ডিংলের জন্ম হয়েছে খরা চৈত্রের রৌদ্রক্লান্ত দুপুরে। যদিও টেলু চক্রবর্তী এই খবরে মোটেই খুশি হন নি। তখনও তার দু মাড়োর চাল পুয়ো দেড়েক বাকি। ডিংলে ছোটবেলা থেকেই খুব দুরন্ত। গল্পকার ডিংলের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন –

> *"ডিংলেটা হল বামুন ঘরের এঁড়ে। তেলি, বাগদি, তাঁতিদের ছেলের পালের সঙ্গে ঘোরে।...... ডোবা নালা ছেঁচে কই টিকলি মাগুর ধরে। ... গরমকালে সারা দুপুর লোকের আমতলা, খেজুরতলায় ঘোরে। ... হাটবারের দিন তো দল বেঁধে এর বেগুন টানা, তার মুলো*

> *সটকানো। ... আর আখশাল বসলে সারা মাস জুড়ে সুর করে চেঁচাতে থাকে- আখ দেয়নি হাতে, খায় মাগের পাতে।”* [২]

টেলু ঠাকুর দুবেলা পেট ভরে খাবার দিতে অপারগ। তাই দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবার আশায় ডিংলেকে নিয়ে টেলু ঠাকুর কলকাতায় রওনা দেয়। রাস্তায় যেতে যেতে বারবার ডিংলে ক্ষুধার তাড়নায় মুড়ি খেতে চায়। হাভাতে ডিংলে কলকাতায় হাজার হাজার হাভাতের সঙ্গে মিশে যায়। গল্পকার গঙ্গি চরিত্রে যে দ্বান্দ্বিকতার সৃষ্টি করেছিলেন ডিংলে চরিত্রে এসে তা পূর্ণতা পায়।

'হাউসে' গল্পে খাঁদা সাঁওতাল পাখি শিকার করে দিনযাপন করে। ছোট্ট হুড়োল খাঁদা সাঁওতালের পিছু নেয়। খাঁদা সাঁওতাল ভালোবেসে হুড়োলকে একটা গুড়ুর পাখি দেয়। হুড়োল এই গুড়ুর পাখি নিয়েই পাকমারা হয়ে ওঠে। পাখির স্বর নকল করে। গাছের সঙ্গে এমন ভাবে লেপটে থাকে যাতে মনে হয় গাছের ছাল। পাখির স্বর আর গাছের শরীর – এই নিয়ে তার সংসার। হুড়োলের শারীরিক গঠনের কথা উঠে আসে খাঁদার দৃষ্টিতে -

> *“ছেলেটার শরীরে এক রত্তি খাদ নেই। বাবলাগাছের মতো ডাঁটো শরীর, শালের মতো তামাটে রঙ। উচ্ছে গাছের আঁকশির মতো পাকানো চুলের নীচে উড়ু উড়ু মনটাকে দেখতে পেয়েছিল। বুঝেছিল এ একদিন হাউসে হবে। এর পায়ে দড়ি টিকবে না। ছিঁড়ে যাবে।”* [৩]

কেঁতো চিতির ঠোকরে প্রাণ বাঁচাতে হুড়োলের বাঁ পায়ের পাঁচটি আঙুলকেই বাদ দিতে হয়। এই শারীরিক অক্ষমতা সত্বেও হুড়োলকে গৃহী মানুষ করে তুলতে পারে নি। সে হয়ে উঠেছে হাউসে। শিকারী হলেও হুড়োল নির্দয় নয়। তার গুড়ুর পাখি নিখোঁজ হয়ে গেলে সে কেমন হয়ে যায়, শূন্য খাঁচার দিকে তাকিয়ে তার মন হুহু করে ওঠে গভীর শূণ্যতায়-

> *“...চারপাশ খোঁজে। খাঁচাটাকে আর একবার দেখার জন্যে মুখের সামনে তোলে। শূণ্য খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে হাউসের বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে। তিনটে বছর ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হাঁসের ডিমের মতো পাকটা একটু একটু করে বড়ো হয়। তিন তিনটে বছরের সঙ্গী। দুটো প্রাণ কত বনপথ পেরিয়েছে একসঙ্গে। সকাল দুপুর বিকেল রাত ফিরেছে গাঁয়ে গাঁয়ে।”* [৪]

গাঁয়ের লোক ভেবেছিল যে এবার হয়তো হুড়োল গৃহী হবে। পাখির শোক ভুলতে হুড়োল বীজ টানা, ধান রোয়ার কাজ করে। কিন্তু এই সব কাজে তার মন বসে না হুড়োল এবার সাপের পেঁড়ি আর ডুগডুগি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। হাউসে পাকমারা থেকে এবার সে সাপুড়েতে পরিণত হয়-

> *"হুড়োলের দেখা মেলেনি। কদিন পর দেখে মুনিনগড়ের ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে হাউসে চলেছে। কাঁধে বাঁক – সামনে পেছনে গোটা আষ্টেক সাপের পোঁড়ি।"*[৫]

'বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি' গল্পে বঙ্কিমচন্দ্র তন্তুবায় ওরফে বাঁকুচাঁদ তার পৈতৃক তাঁতের ব্যবসা ধরে রাখতে পারে নি। বাজারে সুতোর দাম বেড়ে যাওয়া ও মানুষের রুচির বদলের কারণেই এই ব্যবসা বাকুচাঁদ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ছেলেরা লুঙ্গি-পাজামা ছেড়ে প্যান্ট পরছে, লোকে তাঁতের কাপড় ছেড়ে মিলের সস্তা কাপড় কিনছে। বাঁকু বিকল্প জীবিকা হিসেবে ঘরের চাল ছাওয়া, পুকুর জোঁতা রাখা, বিয়ে-পৈতে-শ্রাদ্ধে উনুন তৈরি, লোকের গরুর পাল ধরানো এই সব কাজ বেছে নিয়েছে। বাঁকুর দুই পায়ে আকল থাকায় শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে পারে না। তাই সংসারে টান লেগেই থাকে। একপ্রকার বাধ্য হয়ে দুবেলা ভাত খেতে পাবার আশায় যোগেন তাঁতির মত বউ নোদি আর মেয়েকে কলকাতায় ঝি খাটতে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে যায় কোনো মানি অর্ডার আসে না। পরে জানতে পারে বউ নোদি গাড়ী অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে আর মেয়ে বাবুর ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। বাঁকুর আপাত নিস্তরঙ্গ জীবন কাটে ক্লাবে জল ঝাঁট দিয়ে, কখনো বাস রাস্তা থেকে মালপত্র বয়ে দিয়ে। গ্রামে চুরি বাড়লে মুখুজ্জেদের বাড়িতে রাত পাহারার কাজ নেয় বাঁকু। মুখুজ্জেদের কাজের মেয়ে রানির গোগ্রাসে ভাত খাওয়া দেখে তারও ভাত খেতে ইচ্ছে করে। মুখুজ্জে গিন্নি বাঁকুচাঁদকে এক থালা ভাত পর্যন্ত দেয় না। নাম মাত্র পয়সা দেয়। বাঁকুর রাত কাটে শুকনো পাঁউরুটি চিবিয়ে। ভাতের পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে সে রাতের অন্ধকারে রানিকে নিয়ে পালায় –

> *"আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে কর্তা গিন্নি উঠে দেখে বাঁকু নাই, রানি নাই, টিনের থালা দুটো নাই, তারে ঝুলোনো কাপড় তিনটে নাই, ডালার পাঁচসের চাল নাই, এমনকী নারকেলকাটার লুতিটি পর্যন্ত নাই।*
>
> *বাঁকু বুঝেসুঝেই নিয়ে গেছে- বউ আনতে কড়ি, ঘর বাঁধতে দড়ি।"*[৬]

'জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ঘুঘু কিংবা মানুষ' গল্পে সুচাঁদ তিন দিন অভুক্ত থেকে বউ এর সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মহত্যা করতে যায়। সাঁওতাল ডিহির ইলেকট্রিক পোস্টে ঝুলে আত্মহত্যা করতে গিয়েও সে ফিরে আসে –

> *"মরতুম বটে। সাঁওতালডির পোস্টটা ধরে তর তর করে উঠছি। আর একটুন হলেই হাত পাব। তা তারের উপরে একটা ঠ্যাঙা ছিল। এক জোড়া ঘুঘু পিরীত করতে করতে বসল গিয়ে ঠ্যাঙাতে । ঠিকা গেল তারে। শালা খাইচে শক – চিৎপটাং। বলি খিদার জিনিস ভগবান দেছেন, মরতে যাব কোন দুঃখে? তার উপর তুই উপোস করে বসে আছিস বটে।"*[৭]

মৃত্যু বাসনা ভুলে ঘুঘুর মাংস রান্না করে খায় সুচাঁদ আর তার পরিবার। ঘুঘুর মাংসে পেট ভরে খেয়ে গান গাইতে গাইতে তারা কিতন কেয়ারির মেলা দেখতে যায়। অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির নির্মমতার মধ্যেও এই মানুষগুলো নিজেদের মতো করেই বাঁচার চেষ্টা চালিয়ে যায়। রামকুমার মুখোপাধ্যায় এখানে জীবন মৃত্যুর খেলায় জীবনের জয়গান গেয়েছেন।

'বনমালীর পৃথিবীতে ফেরা' গল্পে দুদিন কাজ না জোটায় জীবনে প্রথমবার তালগাছে ওঠার দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও গাছে ওঠা তার একমাত্র পেশা নয়। গল্পকারের বর্ণনায়-

> *"চাষের কাজ পেলে চাষের কাজ করে, শীতে খেজুর গাছে রস দেয়, অনেকের সঙ্গে মিলে মহল্লা করে, মোচ্ছবে খিচুড়ি বানায়, লোকের গোরু আবাদ করায়, গলায় তুলসীর মালা পরে হরিনামের দলে খোল বাজায় আর কাজ না জুটলে চুরিচামারি করে।"* [৮]

বনমালী তার অবস্থা ফেরাতে নানা কিছুর চেষ্টা করেছিল। লটারির টিকিট কিনে লাখপতি, কোটিপতি হবার স্বপ্ন দেখেছে। 'সবার জমি এক হবে' শুনে এক হালের চাষ জমি পাবে এমন আশাও করেছে। কিন্তু সরকারিভাবে ভাগচাষিদের জমির রেকর্ড হলেও জনমজুরদের কোনো রেকর্ড হয় নি ফলে বনমালীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় না কখনোই। তালগাছে উঠে বনমালীর মধ্যে চলে দুই বিপ্রতীপ স্রোত- এক দিকে বাঁচার তাগিদ অন্যদিকে জীবনের প্রতি অসীম বিতৃষ্ণা। গভীর রাতে যখন সে ঘরে ফিরে দেখে কিষ্ট চৌকিদার তার বউকে রাধা করে দিব্যি শুয়ে আছে তখন তার জীবন সম্পর্কে সব মোহ ভঙ্গ হয়। বনমালী উপলব্ধি করে বাঁচতে গেলে মরতেই হয়। তালগাছের মাথায় উঠে বনমালীর কাছে পৃথিবীটা একেবারে অচেনা বলে মনে হয় – নিচের পৃথিবীটা তার কাছে মায়াময় পুতুলের সংসার বলে মনে হয়। কিন্তু যখন সে দেখে তার বউ ছেলে কোলে করে তার খোঁজে বেরিয়েছে তখন এক অন্য উপলব্ধি হয় বনমালীর। গল্পের একেবারে শেষাংশে গল্পকার জানান-

> *"বনমালী নেমে আসে। দু হাতে চারটে বেল্লো শক্ত করে ধরে। টানতে টানতে নিয়ে যায়। পাঁচজন বনমালী কিংবা পাঁচটা তালপাতা কাঁকুরে পথে বুক ঘষতে ঘষতে এগোয়।"*[৯] রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে প্রান্তিক চরিত্রগুলির মধ্যে মিশে আছে মাটির গন্ধ। বাঁকুড়া – পুরুলিয়ার প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রাম ও তাদের জীবন চেতনা রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্মিত আখ্যান- চরিত্রে অনন্য রূপে পরিস্ফুট হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১) মুখোপাধ্যায়, রামকুমার., ‘পিকনিক’, গল্পসমগ্র, মাঘ ১৪১৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৬-৭

২) মুখোপাধ্যায়, রামকুমার., ‘হাভাতে’, গল্পসমগ্র, মাঘ ১৪১৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১১

৩) মুখোপাধ্যায়, রামকুমার., ‘হাউসে’, গল্পসমগ্র, মাঘ ১৪১৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পৃ. ২২৭

৪) তদেব, পৃ. ২৩৪

৫) তদেব, পৃ. ২৩৪

৬) মুখোপাধ্যায়, রামকুমার., ‘বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি’, গল্পসমগ্র, মাঘ ১৪১৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৪৮

৭) মুখোপাধ্যায়, রামকুমার., শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা -০৯, কলকাতা, ২০০৫, ‘জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ঘুঘু কিংবা মানুষ’ গল্প, পৃ. ৫৮-৫৯

৮) মুখোপাধ্যায়, রামকুমার., ‘বনমালীর পৃথিবীতে ফেরা’, গল্পসমগ্র, মাঘ ১৪১৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১১০

৯) তদেব, পৃ. ১১৩

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের 'অগ্নিপর্ণী শালপিয়াল' : প্রসঙ্গ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

পায়েল সিংহ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর

সংক্ষিপ্তসার: লেখক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের 'অগ্নিপর্ণী শালপিয়াল' হড় সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস। যেখানে জীবন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অধিকারের লড়াইতে নামে। সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। হড় সহানুভূতি, দয়া, আস্থা, আনুগত্য দলগত কাজের মধ্য দিয়ে জীবন কাটায়। তারাই আবার যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়। 'অগ্নিপর্ণী শালপিয়াল' উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের অধিকারের লড়াই হয়েছে। যেখানে হড় হেরে গিয়েও ইতিহাসের পাতায় জিতে গেছে। প্রতিবাদ, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা আত্মচেতনাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তাদের জীবন বয়ে গেছে উগ্রতার জ্বালায়। স্বাধীনতার লড়াইয়ে তারা জীবনকে ভাবনার ঘেরাটোপে এবং আত্মবিশ্লেষণের স্বচ্ছতায় নিজেদেরকে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা করে গেছে।
সূচক শব্দ: [index word]: ভাগনাডিহি, হড় সম্প্রদায়, ছটিহার অনুষ্ঠান, সাঁওতাল, ইংরেজ, প্রতিবাদ, লড়াই, ভাগলপুর, জঙ্গল, বিদ্রোহ, অত্যাচার, রাজনীতি, ভারতবর্ষ, কাপি-বল্লম, অশিক্ষা।

মূল আলোচনাঃ [main discussion]:
আমাদের সমাজে 'প্রান্তিক' মানুষ অবহেলিত সম্প্রদায়ের। তারা অস্পৃশ্য, অচ্ছুত বলে সমাজে সবসময় অবহেলা কুড়িয়েছে উঁচু সম্প্রদায়ের মানুষদের থেকে। নির্যাতন, অবহেলা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, নিরক্ষরতা তাদের নিত্য সঙ্গী। ভারতে, দক্ষিণ এশিয়ায় এই সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে বেশি দেখা যায়। আমাদের রাজ্যে কামার, কুমার, নাপিত, বাঁশ ও বেত প্রস্তুতকারক, কাঁসা-পিতল প্রস্তুতকারী, জুতা মেরামত করেন যারা ইত্যাদি পেশা নিয়ে বংশপরম্পরায় জীবন নির্বাহ করেন, তারাই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ। এছাড়াও আমাদের দেশে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি উপজাতির মানুষ প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে। পাহাড়, জঙ্গল নিয়ে মূলত একখন্ড ভূমি অথবা অন্ন, বস্ত্রের জন্য এদের লড়াই। এদের লড়াই সম্মানের তাগিদে। তথাকথিত উঁচু সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের দিয়ে বেগাড় খাটায়। সবচেয়ে অপরিষ্কার, অসম্মানজনক কাজ তাদের দেওয়া হয়। গালিগালাজ করতেও তাদেরকে কেউ ছাড়ে না। তারা ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়েছে অনেক দিন ধরেই। তবুও ব্যাঙ্গ, বিদ্রুপের শিকার হয়েছে। বংশ পরম্পরায় তাদের উন্নতি নেই। তাদের লড়াই তাই সমাজের বিরুদ্ধে। আসলে,-

"প্রান্তিকতা এমন একটি অভিজ্ঞতা যা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে। প্রান্তিক ব্যক্তিরা তাদের জীবন এবং তাদের কাছে উপলব্ধ সম্পদের উপর তুলনামূলকভাবে কম নিয়ন্ত্রণ রাখে। এর ফলে তারা সমাজে অবদান রাখতে প্রতিবন্ধী হয়ে ওঠে। ..."[১]

লেখক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের তিনটি উপন্যাস প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষকে নিয়ে লেখা। 'অগ্নিপর্ণী শালপিয়াল', 'অতন্দ্র অরণ্য' এবং 'ঈশ্বরের আবাস'। তিনটি উপন্যাসের মধ্যে 'অগ্নিপর্ণী শালপিয়াল' 'হড়্' সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস। এই সম্প্রদায়ের মানুষকে সাঁওতাল বলে লেখক কখনো চিহ্নিত করতে চাইলেও হড়েরা নিজেদেরকে সাঁওতাল মানতে নারাজ। তারা হড়্। এই বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাপনের নানান দিক, বিদ্রোহের আদব কায়দা মিলিয়ে অনেকখানি অংশ লেখক তুলে ধরেছেন। ভাগলপুর অঞ্চলের ভাগনাডিহির অরন্যকে কেন্দ্র করে তাদের বাস।

উপন্যাসটিতে দু ধরনের মানুষ দেখা যায়। একদল যারা শোষিত শ্রেণী। তারা হড়্ সম্প্রদায়। অপরদল যারা শোষণ করছে তারা মহাজন, ইংরেজ সম্প্রদায়। সমাজে ঐ একদল যারা শোষিত তারা নিজেদের জায়গায় বসতবাড়ি করলেও মহাজনরা তাদের কাছে খাজনা দাবি করে। সপ্তাহে দুটি দিন মাংস খাওয়ার লোভ দেখিয়ে মেথরের কাজ করায়। মহিলাদের নগ্ন করে নৃত্য করতে বাধ্য করায়।

হড়্ অসহায়। তারা বনজঙ্গলে থাকে। পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের ধর্মকে তারা ভালোবেসে বসবাস করে। তাদের গোত্র, পদবী অন্যান্যদের থেকে আলাদা। পিলচু, হাঁসদা, মুর্মূ, কিস্কু, হেমব্রম, মারাণ্ডী, সোরেন, টুডু প্রভৃতি। এই সকল সম্প্রদায় হড়্ সম্প্রদায়। তারা কাঁড়বাঁশ বা বর্শা চালাতে দক্ষ হয়। ময়াল সাপের মাংস খেয়ে তারা বেঁচে থাকে। তারা জানে তারা পৃথিবীর সর্বপ্রান্ত প্রদক্ষিণ করেছে। তাদের পূর্বপুরুষ এই জঙ্গলে তাদের বাসস্থান গড়ে গেছে। তাদের বৈচিত্র্য আছে। তারা একসাথে এক জোট হয়ে কাজ করে, খাবার যোগাড় করে। ছটিহার অনুষ্ঠান তাদের গর্বের উৎসব। সন্তানকে বুকে আগলে রেখে তারা তাকে কঠোর পরিশ্রম করার কৌশল শেখায়। সন্তান পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার সব ধরনের কৌশল শেখে। পুরুষেরা ছোটো থেকেই ঘরের মধ্যে নয়, বাইরে থেকে নিজেদের দাবি সম্পর্কে সচেতন হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখে।

ইংরেজরা স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করে। ক্লীভল্যান্ডের চমৎকার লাইব্রেরী আছে। তারা পড়াশোনা করে। মদ,মাংস খায়। নির্বিবাদী হড়্কে নিয়ে ফুর্তি করে, তাদের বেগাড় খাটায়। আসলে হড়্ কলাকৌশল জানে। তারা চিটিংবাজি জানে না। তারা অত্যন্ত সাধাসিধে। ব্যাঙ পুড়িয়ে অথবা বন জঙ্গল থেকে আনা পশুদের পুড়িয়ে তারা খায়। ওদিকে পুটিয়া সাহেব ভাতের মাড়ের সাথে সেদ্ধ করা মুরগীর মাংস খায়। নুন এবং লঙ্কা সহযোগে তা আরও সুস্বাদু করে তোলে। হড়্ সম্প্রদায়ের মানুষ ভালো

গান জানে। তারা বাঁশি বাজায়, নৃত্য পরিবেশন করে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে হড় সম্প্রদায়ের মানুষের বৈচিত্র্য গোটা সমাজকে যেন নতুন নতুন শিক্ষা দেয়। হিংসা কিম্বা দলাদলি নয়, পরিবেশের সাথে শান্তিপূর্ণ বসবাসই সমাজের সকল স্তরের মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

এই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিবাদ করেছে পেটের তাগিদে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ছিল তাদের অধিকারের জায়গা। হড় নিজেকে সাঁওতাল মানতেও রাজি নয়। তারা জানে তারা আলাদা গোষ্ঠী। প্রকৃতির শ্যামল অঞ্চলে তারা থাকে। ভাগনাডিহিতেই তারা বসবাস করতে জানে। তারা জানে এই প্রকৃতিই তাদের কর্মস্থান। প্রকৃতি তাদের মা। তারা দেবতার প্রসাদী পউর খায়। বর্ষা চালাতে তারা দক্ষ। নারী পুরুষ নির্বিশেষে তারা কাজ করে খায়। রাজমহল ও ভাগলপুর জেলার কালেক্টর মিস্টার ক্লিভল্যান্ড প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী পার্বত্য এলাকায় হড়দের উঠিয়ে দেবার চেষ্টা চালিয়েছেন।

ভাগলপুর শহর একটা সময় হড়ের ছিলো। দিকু এবং মোঘল সম্প্রদায় একটা সময় হড়ের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছে। আবার চিলিমিলি সাহেব খাজনা আদায় করে হড়ের কাছ থেকে। শান্তিপ্রিয় হড়দের জেলখানায় খাটিয়ে নেয়। হড় প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। তারা ঠিক করে দরকার হলে তীর- ধনুক এবং কাপিবল্লম নিয়েই তারা যুদ্ধ করবে। আসলে হড় পড়াশোনা শেখে নি। আধুনিক অস্ত্র-শাস্ত্রে তারা দক্ষ নয়। ইংরেজরা তাই সবটা তাদের থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছে। হড় মহিলাদের উলঙ্গ করে নিজেরা মজা করেছে। তাই তারা ঠিক করে তারা প্রতিবাদ করবে। তারা অধিকারের লড়াইতে নামবে। তারা যুদ্ধ করবে। হড় একা হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে দিকু মহাজন, মোঘল দারগা, নীলকুঠির সাহেব প্রত্যেকে যুদ্ধে দামামা বাজালে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে হড় সমাজ। তারা নিজেরাই লোকজনদের হারাতে থাকে।

যুদ্ধ চলে বন্দুক, তীর, আগুনের পুটুলি, কামান নিয়ে যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে জেতে সাহেবরা। সিধু হড়দের নিয়ে চলে যায়। এলিজাবেথকে হড়েরা মেরে ফেলে। সুফল মাঝি বলে,-" তোদের কুড়িগুলোকে নিয়ে আরও অনেক তামাশা হবে সাহেব, দেখবি নাকি তোরা "?[২] এ যেন এক প্রতিবাদের ভাষা। হড় নারীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ। একটা সময় এসে কোম্পানী আধিপত্য হারায়। সিধুর ফাঁসির খবর আসে। হড়দের এই প্রতিবাদ ইতিহাসে লেখা হয়েছে। এই প্রতিবাদ যেন ইংরেজদের শিক্ষা দিয়েছে। তাদের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এই ভারতবর্ষ তাদের নয়। এই ভারতবর্ষের মাটি তাদের নয়।

উপন্যাসটি সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে লেখা। যে সময়টিতে বিশ্বশান্তি একটি অস্থির অসহায় সময়ের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। টালমাটাল পরিস্থিতি ভারতবর্ষের মানুষের। রক্তাক্ত সমাজ বিশ্বাস ভাঙার যন্ত্রণায় ও নিরাপত্তাহীনতায় ধুঁকছে। চারিদিকে যেন পরিকল্পনা করে একটি গোষ্ঠীর মানুষকে বিতাড়িত করার প্রচেষ্ঠা চলছে। সেই

উদ্দেশ্যেই চারিদিকে একটি কৃত্তিম অর্থনৈতিক সঙ্কট তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে ইংরেজরা। তাতে মদত দিচ্ছে সুবিধাবাদী শ্রেণী। চারিদিকে অশিক্ষা ছড়িয়ে দেবার কৌশল। বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক মন্দার প্রসার তারই ফলশ্রুতি। এই রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাতেই সমাজের সাধারন মানুষ ভালো- মন্দের পার্থক্য ভুলেছে। সুকুমার বৃত্তি থেকে সরে গিয়ে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে।

উপন্যাসে হড় কিন্তু নিজের রাজ্যেই বসবাস করত। তাদের উপর রাজস্ব বৃদ্ধি একটা সময় লাগাম ছাড়া হয়েছিলো। শোষণ এবং মহাজনী অত্যাচারে তারা বাধ্য থাকত। সুদের হার অত্যন্ত চড়া। অথচ এই সাঁওতালরা নিরক্ষর। তাদের বুদ্ধি, সাহস কোনোটাই সেভাবে না থাকায় ইংরেজদের পক্ষে তাদের উপর রাজনৈতিক কৌশল চাপানোটা অনেক সুবিধার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। হড়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ফন্দি এঁটেছিল দীকু মহাজন, মোগল দারোগা, মিঞা কাজি, মালের এবং মাল পাহাড়ী, নীলকুঠির সাহেব, পোন্ডরাপাজ প্রত্যেকেই। তারা জানে অশিক্ষিত হড় লড়াই করতে গেলে তীর ধনুক বা বাঁশ এ ধরনের অস্ত্র আনবে। সহজেই তাদের হারিয়ে ফেলা যাবে। অপরদিকে তারা অশিক্ষিত হওয়ায় বিদেশী ভাষা জানে না। জানে কেবলমাত্র বাহা। তাই তাদের দিয়ে আমোদ-প্রমোদ, উৎসব করাটা অনেক বেশি সহজ সাধ্য।

রাজনৈতিক পরিকল্পনায় সাঁওতালদের প্রতি পদক্ষেপে ফাঁসাতে চেষ্টা করে ইংরেজরা। তারা মাঝে মাঝে মাংস খাওয়ার প্রলোভন দেখায়। বিলিতি চুরি, শাড়ি, পেতলের গয়না, বাসনপত্র ইত্যাদি পুরষ্কারের লোভ দেখায়। সব লোভ দেখিয়ে মেয়েদের নগ্ন করে ইংরেজরা আমোদ-প্রমোদ করে। বোকা বানায় সাঁওতালীদের। হড় চুরি ডাকাতি করে না। তারা কখনো বিশ্বাস ভাঙতে শেখেনি। তারা সহজ-সরল। অথচ সাহেবরা তাদের লড়াইয়ের নাম দেয় 'ডাকাতি'। আসলে পাহাড়তলীর সুতাররাই পাহাড়ীর প্রধান শত্রু। তারা রাজনৈতিক কৌশলেই হড়কে হারাতে চায়। ইংরেজরা বিতাড়িত করতে চায় হড়কে। তাই সূক্ষ্ম চাল চালে। উপন্যাসটির সাথে তারাশঙ্করের 'কালিন্দ্রী' উপন্যাসের মিল পাই। কালিন্দ্রীতে দেখি, "রাত্রি শেষে অস্পষ্ট আলোকময় অন্ধকারের মধ্যে কালো কালো মানুষের সারি, কাঁধে ভার, মাথায় বোঝা,......... নিঃশেষে ভূমিহীন হইয়া চলিয়া গেল"।[৩] সবকিছু থেকে প্রতিবাদ জানায় হড়। তারা ইংরেজদের রেল পরিকল্পনাকেও ধ্বংস করতে চায়। " কত না বাধা বিপত্তি ও বিপর্যয় অতিক্রম করে রেললাইন টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। পরাধীন জাতটাকে পরক্ষে হুমকি দিয়ে রাখার অন্যতম নির্দোষ আয়ুধ ও এই রেলপথ"।[৪]

উপসংহারঃ [conclusion]: অগ্নিপর্ণী শালপিয়াল উপন্যাসটিতে উনিশ শতকের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উদ্‌ভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা উঠে এসেছে। এখানে রাজনৈতিক সংগ্রাম সহ তীব্র সংঘর্ষ, লড়াই দেখানো হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি দিক যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহ, তেমনি ইংরেজদের বিতাড়িত করে নতুন সমাজ গড়ার প্রচেষ্ঠা উপন্যাসটিতে রয়েছে। সর্বোপরি এটিকে একটি সার্থক উপন্যাস বলা যেতে পারে।

তবে লেখক চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বের আড়ালে মানব জীবনকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। মানব হৃদয়কে ধর্ম, উৎসব, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, জীবন যাপনের নিরিখে মূর্ত করে তুলেছেন।

তথ্যপঞ্জিঃ [index]:

১। সাকসেনা দেবেশ, আইন অনুষদ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের প্রান্তিক গোষ্ঠীর সমস্যা, সেপ্টেম্বর ৮, ২০১৪, লিংকঃ https://www.lawctopus.com/academike/problems-marginalized-groups-india/

২। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত, অগ্নিপর্ণী শালপিয়াল, উপন্যাস, নাথ পাবলিশিং, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশ- কার্তিক, ১৩৭০। পৃষ্ঠা নং- ১৯২।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, কালিন্দ্রী, উপন্যাস, রচনাবলী ২য়, পৃষ্ঠা- ৩৩১।

৪। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত, অগ্নিপর্ণী শালপিয়াল, উপন্যাস, নাথ পাবলিশিং, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশ- কার্তিক ১৩৭০। পৃষ্ঠা নং- ১৯৫।

স্বাধিকার বোধে রবীন্দ্রগল্পের তিন নারী

শিপ্রা দত্ত (ঘোষ)
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা

সারাংশ: স্বাধিকার বোধ এই শব্দটি আমাদের বিশেষ ভাবে মনে করিয়ে দেয় নিজ অধিকারের কথা তথা অধিকার আদায়ে তীব্র লড়াইয়ের কথা। নারীর স্বাধিকার বোধের উপলব্ধি একদিনে হয় নি। গতিশীল ইতিহাসের সূত্র ধরে আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসেছি। ফলে জীবন সম্পর্কে মানুষের ধ্যান ধারণা পাল্টেছে। বহুমুখী চিন্তাচেতনা, মানুষে মানুষে যোগসূত্র, সময়ের দ্রুত পরিবর্তন, নিজেকে সম্মানের সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা, সবশেষে চিন্তা চেতনার আমূল পরিবর্তনে নারী বুঝতে পেরেছে শুধুমাত্র স্বামীর মন জোগানো, সন্তান উৎপাদন এবং রান্নাঘরেই নিজের জীবন সীমাবদ্ধ নয়। এর বাইরে রয়েছে বৃহত্তর জগৎ। সেখানে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনা, স্বাধীন চিন্তা ভাবনা ইত্যাদি বলেও অনেক কিছু আছে।

উনিশ শতকের আধুনিক চিন্তার অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নানান উন্নয়নমুখী কর্মকান্ড বিশেষ করে নতুন চেতনায় নারীকে জাগ্রত করে তুলেছে। এঁদের পথ ধরে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এগিয়ে গেছেন। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে নারী অনেকটাই নিজেদের অধিকারবোধে সচেতন হয়েছে। তারা সমাজকে এই বার্তা দিতে সমর্থ হয়েছে যে, অশ্রুবিসর্জন নয়, আপোষ নয়, প্রতিবাদ করেই বাঁচার মতো বাঁচা যায়। 'নিরুপমা' নীরব প্রতিবাদ করলেও, 'মৃণাল', 'সোহিনী', 'হৈমন্তী', 'কল্যাণী' এবং আরও অনেকে সরব প্রতিবাদ করে নিজের অধিকার তথা মর্যাদা আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। তাই স্বাধিকার বোধে রবীন্দ্র গল্পে নারীরা তাঁর মৃত্যুর আশি পঁচাশি বছর পরেও খুবই প্রাসঙ্গিক। আশা করি এই প্রাসঙ্গিকতা কোনদিনই ম্লান হবে না।

সূচক শব্দ: স্বাধিকারবোধ, চিন্তা চেতনা, নারী আন্দোলন, সচেতনতা, বৃহত্তর জগৎ, সরব প্রতিবাদ, মর্যাদা।

মূল আলোচনা:

'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন "নদী সামনের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারণ। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয় মর্জি নিয়ে।"[১] ভূমিকায় এই প্রসঙ্গটি

উত্থাপনের কারণ রয়েছে। 'স্বাধিকারবোধ' এই শব্দটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় নিজ অধিকারের কথা। নারীর স্বাধিকারবোধ এর উপলব্ধি একদিনে হয়নি। গতিশীল সামাজিক ইতিহাসের সূত্র ধরে আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসেছি। জীবন সম্পর্কে মানুষের ধ্যান ধারণা পাল্টেছে। বহুমুখী চিন্তাচেতনা, মানুষে মানুষে যোগাযোগ, সময়ের দ্রুত পরিবর্তনে চিন্তা চেতনার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। সমাজ ও সময়ের পরিবর্তনশীলতার স্রোতেই আধুনিকতার জন্ম। উনিশ শতকের নবচিন্তা ও নবচেতনার অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর কর্মকান্ড মানবমুখী চেতনার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছে।

উনিশ শতকের নতুন চেতনায় জাগ্রত মানুষ ব্যক্তি হিসেবে তার স্বাতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। এই সময়ে নারীর স্বতন্ত্র মূল্য ও সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নও বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই গড়ে উঠে 'নারীশিক্ষার আন্দোলন', 'বিধবা বিবাহ-প্রবর্তনের আন্দোলন'। 'বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহরদের আন্দোলন'। এই আন্দোলনগুলি আমাদের সমাজের অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। রবীন্দ্র গল্পে নারীর স্বাধিকার বোধের প্রসঙ্গে পৌঁছানোর আগে এ কথাগুলি আমাদের জানা প্রয়োজন। সামাজিক পরিবর্তন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনে। কারণ সাহিত্য মানুষের কথা। মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজ ও সাহিত্য একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। সামাজিক ক্ষেত্রের আধুনিক চিন্তাভাবনা সাহিত্যেও সঞ্চারিত হয়।

উনিশ শতকে বাংলায় আধুনিক উপন্যাস লেখা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ের সার্থক ঔপন্যাসিক। এ প্রসঙ্গটি ও এখানে আলোচনা করার কারণ উনিশ শতকেই নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' এ দেখা যায় 'সুন্দরী' নামে নারী তার বাবা মায়ের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করেনি। সুন্দরী বলেছে "আমি তাহাকে চিনিনা, এবং তিনিও আমার মনকে জানেন না অতএব বিবাহ করিলে পশ্চাতে আমাদের সুখ কি দুঃখ হইবে তাহা নিশ্চয় নাই।"[২] অবশ্যই স্বাধিকার বোধের উন্মেষ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম সৃষ্ট নারী চরিত্র গুলির উল্লেখ করতেই হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের 'আয়েষা' চরিত্রে আধুনিক জীবনবোধ তথা স্বাধিকার বোধের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। এই উপন্যাসের 'তিলোত্তমা', 'বিমলা'ও স্বতন্ত্র চিন্তায় উজ্জ্বল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে যে স্বতন্ত্র নারী চরিত্র গুলি অঙ্কন করেছেন তারই আরোও বিকশিত রূপ এই চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা যায়। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের 'শৈবলিনী' কৃষ্ণকান্তের উইল' এর 'ভ্রমর' 'বিষবৃক্ষের' 'সূর্যমুখী' ইত্যাদি চরিত্র সেই সময়ের নিরিখে চিন্তাভাবনায় অগ্রসর অধিকার সচেতন নারী।

আধুনিক সমাজে ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কের যে দ্বন্দ সার্বিকভাবে দেখা দিয়েছিল ব্যক্তি হিসেবে নারীর সামাজিক স্বীকৃতির দাবীও তারই একটি অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্রের পর এলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোটগল্প আমাদের বাংলা কথাসাহিত্যের

দিগন্তকে আরোও প্রসারিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আমাদের বাংলা কথাসাহিত্যকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ কবি, গীতিকার, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প রচয়িতা। লিখেছেন দেশ সমাজ শিক্ষা ধর্ম বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ নিবন্ধ। তাঁর চিঠিপত্র গুলিও আমাদের সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্র গল্পের তিন নারী যাদের স্বাধিকারবোধ প্রবল এদের নিয়ে কিছু কথা বলতে হবে। তিনি যখন গল্প লিখছেন- নেমে এসেছেন সাধারণ জীবনের সমতলে। পদ্মাতীরে কুঠিবাড়ির গবাক্ষপথে নদীর বুকে বজরার ছাদ বা জানালা থেকে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের গভীর প্রবাহকে অনুভব করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা'। দুটি গল্পেই রবীন্দ্রনাথের জীবন ভাবনার সঙ্কেত মেলে। ঘাট অচল, পথ- কিন্তু দুইই বহমান জীবনস্রোতের সাক্ষী। 'সাধনা' 'হিতবাদী, 'ভারতী' ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের প্রকাশের বাহন ছিল। বাং ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসের শেষের দিকে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত গল্পের রচনারীতি নতুনতর, বিষয়বস্তুতেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'সবলা' কবিতায় (বাং ১৩৩৫ ভাদ্র) দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন-

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় কবিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?
নত করি মাথা-
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পুরণে'র লাগি
দৈবাগত দিনে?
শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ?"[৩]

এর আগেই লিখেছেন 'স্ত্রীর পত্র' গল্প। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। গল্পটি লেখা হয়েছিল বাং ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে, 'স্ত্রীর পত্রে'র 'মৃণাল' নারীর নিজস্বতা, তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল নারী সত্তার মর্যাদা চেয়েছে। স্বামীকে চিঠি লিখছে মৃণাল। সে পত্রে আছে এক নারীর অস্মিতা।- “আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছর পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি। আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে।"[৪]

এই আত্মপ্রকাশের তাগিদ একে তো স্বাধিকারবোধই বলতে হবে। সংসারের নির্মম উদাসীনতার মধ্যে বিন্দুকে আশ্রয় দিয়ে ভালোবেসে সেই ভালোবাসার দীপ্তিতে মেজ-বৌ সংসারের কুটিল জীর্ণ পরিসরের বাইরে বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের স্বরূপ

উপলব্ধি করেছে। ২রা আষাঢ় ১৩৪৩ বাং শান্তিনিকেতনে বসে লিখেছিলেন 'বাঁশিওয়ালা' কবিতা। যা 'শ্যামলী' কাব্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সে কবিতায় 'অন্ধকার কোণ থেকে' বেরিয়ে আসে ঘোমটা খসা নারী। বিদ্রোহিনী নারী জেগে উঠে। সময় পাল্টে যায় - পুরোনো ধারণা পরিবর্তিত হয়। নারী শুধু গৃহকোণে আবদ্ধ থাকতে চায় না। সসাগরা বসুন্ধরা তাকে ডাকে। বৃহৎ সংসার প্রাঙ্গণে অজস্র কর্মজালে নিজেকে জড়িয়ে রেখে মুক্ত আকাশে ডানা মেলে বিহঙ্গের মতো উড়তে চায়। 'সবুজপত্র' সাহিত্যপত্রিকা যৌবনের জয় ঘোষণা করেছে। আর রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে আমাদের 'মৃনাল' সমাজকে স্বাধিকার বোধে উদ্দীপ্ত নারীর মুখোমুখি দাঁড় করায়। বিয়ের পর স্বামীর ঘরে এসে মৃণাল অনুভব করেছে নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিয়ে নির্বিচারে সব মেনে নেওয়াতে মৃণাল মা হয়েছিল। কিন্তু তার মেয়েটি জন্মের পরেই মারা যায়। তাই সন্তানকে নিয়ে নিজের একটা জগৎ গড়ে তোলা হয়নি। বড়ো জায়ের বোন বিন্দু যখন এ সংসারে এসে আশ্রয় নিল মৃণাল তাকে ভালোবেসে কাছে টেনে নিল। মৃণালের বড়ো জা সর্বদাই কুণ্ঠিত, ভীত। বিন্দুকে কেন্দ্র করে মৃণাল জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে নিতে চাইল। কিন্তু পরিবারের লোক বিরূপ, এমন কি মৃণালের স্বামীও বিন্দুর প্রতি এই মমত্ব বা ভালোবাসাকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি।

মৃণাল অনুভব করে যে ঘরকে সে নিজের বলে ভেবেছে, তা শুধুই তার নয়। মৃণালের এই বোধ, তার অস্মিতা, নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার দৃঢ় মানসিকতা আজও আমাদের ভাবায়। শতবর্ষ অতিক্রম করে আরোও এক দশক পেরিয়ে গেছে এ গল্পের রচনাকাল। তারপরেও এ গল্প আমাদের ভাবায়। সমষ্টি নয়, ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা, ব্যক্তি স্বাধীনতা একজন নারীর অনুভব, দৃঢ় মানসিকতা-ই এ গল্পের প্রাণ। ঘটনা নয়, বিশেষ এক বোধ, যার নাম স্বাধিকার তাই-ই এ চরিত্রটির প্রাণশক্তি। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের অন্তিমে মৃণালের স্বাধিকার বোধের জাগরণ। মৃণাল তার স্বামীকে চিঠির মাধ্যমে জানায়,-

"তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাইনে। আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়। কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবনা। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয় যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক না কেন সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানব জন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্ সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি মেয়ে নয়। অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।"[৫]

বিন্দুর মৃত্যুতে মৃণাল উপলব্ধি করেছে প্রতিদিনে জীবনযাপন বড় তুচ্ছ। আমরা প্রতিদিন বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি-র নাগপাশে বন্ধ থাকি। এর বাইরে বেরোতে গেলে প্রয়োজন আত্ম উন্মেষ। মৃণালের মধ্যে সেই আত্ম উন্মেষের উদ্বোধন,- “তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিল। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে ডেকে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই।" চিঠির সমাপ্তিতে মৃণাল স্বামীকে লিখেছে" তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল।"[৬]

বিশ শতকের নবজাগ্রত চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ নারীর স্বাধিকার বোধকে গল্পের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই চিন্তায় হয়ত আবেগ বেশি তবে আরোও সংহত বোধের প্রকাশ রয়েছে' অপরিচিতা' ও 'ল্যাবরেটরি' গল্পে। 'স্ত্রীর পত্রের' মৃণালের পর স্বাধিকার বোধে উজ্জ্বল আর এক নারী চরিত্র 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী। 'অপরিচিতা' গল্পটি লেখা হয়েছে বাংলা ১৩২১ সালে। এই গল্পে আছে পণপ্রথার নিষ্ঠুর রূপ। কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ বাবু বিশ শতকের শিক্ষিত ভদ্রলোক। তিনি সেইসময় মেয়ে কল্যাণীকে মনের মত করে বড় করে তুলেছেন। বিয়ের দিনে কল্যাণীর হবু স্বামীর মামা বিয়ের অনুষ্ঠান শুরুর আগেই কনের সমস্ত গয়না যাচাই করে নিতে চান। কল্যাণীর পিতৃদেব শম্ভুনাথ বাবু হবু বরের মতামত জানতে চাইলেন। সেখানেও তিনি নিরাশ হলেন। হবু বর মামার মতামতের ব্যাপারে কোন কথা বলতে নারাজ। শম্ভুনাথ বাবু মনস্থির করে নিলেন। পাত্র পক্ষকে খাইয়ে দাইয়ে জানিয়ে দিলেন এ বিয়ে হবেনা। গল্পের এই পর্ব পর্যন্ত আমরা কল্যাণীকে প্রত্যক্ষভাবে পাই না।

বিয়ে হল না, দিন যায়। গল্প কথকের কথনে কাহিনী এগিয়ে চলেছে। ট্রেনে চড়ে মাকে নিয়ে তীর্থে যাওয়ার পথে দেখা হয়ে গেল সেই নারীর সঙ্গে যে রয়ে গেছে অপরিচিতা। ট্রেনে বসার জায়গা পাচ্ছেনা, এমন সময়ে অপরিচিত মেয়েটি জানাল,- " আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না এখানে জায়গা আছে।"[৭] মেয়েটির বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, সহজ ব্যবহারে গল্প কথক মুগ্ধ। গল্পের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায় ইংরেজ কর্মচারীদের অন্যায় সুবিধার বিরুদ্ধে মেয়েটি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। সে তাদের অন্যায় দাবী মেনে নেয়নি। সুশিক্ষিতা মেয়েটি ইংরেজী ভাষায় ষ্টেশন মাষ্টারকে জানায় এ গাড়ি আগে থেকে রিজার্ভ করা নয়। সুতরাং অন্যায় আদেশ মেনে সে বসার স্থান ছেড়ে দেবে না। গন্তব্যে পৌঁছায় ট্রেন। ষ্টেশনে নিজেদের জিনিসপত্র নামানোর তোড়জোড়, এরই মাঝে জানা গেল মেয়েটির নাম কল্যাণী। তার বাবার নাম শম্ভুনাথ সেন, তিনি ডাক্তার। সবাই নেমে গেলেন। গল্প এখানে ফুরায়নি। মামার নিষেধ অমান্য করে কানপুরে এসেছে গল্প কথক। কল্যাণীর মায়ের সঙ্গে কথা বলেছে, কল্যাণীর সঙ্গেও কথা হয়েছে।

কিন্তু কল্যাণী বিয়ে করতে রাজী নয়। কল্যাণী অনুভব করেছে বিয়েতেই নারীজীবনের সার্থকতা নয়। যে বিবাহ অনুষ্ঠান দুটি মানুষের একত্রে চলার অঙ্গীকার, সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় দেনা পাওনা। তা কিছুতেই হতে পারে না। কারণ নারী একজন মানবী। তার ভালো লাগা, মন্দ-লাগা, তার জীবন বোধ, সব কিছুকে অস্বীকার করে বিষয় বুদ্ধি, দেনা-পাওনা যখন বড় হয়ে দেখা দেয়, তখন বিবাহ ব্যাপারটিই নিরর্থক হয়ে যায়।

এ গল্প যখন লেখা হয়, তখন দেশ পরাধীন। দেশ মাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে সে অঙ্গীকার বন্ধ হয়। সংসারের ছোট সীমা থেকে সে পাড়ি দেয় দেশের বৃহত্তর আঙ্গিনায়। কল্যাণীও স্বাধিকার বোধে উদ্দীপ্ত। সে পিতার সম্মান রক্ষা করেছে। তাই কারোর প্রতি কোন কটুবাক্য নিক্ষেপ করেনি।। কাউকে অপমান করেনি। শুধু নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল থেকেছে। বিয়ের রাত্রের এই একটি ঘটনায় তার নারীসত্তা বিপন্ন। সেই বিপন্ন মুহূর্তে তার স্বাধিকার বোধ জীবনের পথে চলতে প্রেরণা যুগিয়েছে। 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমার বিড়ম্বিত জীবন, জীবনের অবসান আমাদের বিষন্ন করেছে। 'হৈমন্তী' গল্পের 'হৈমন্তী' সত্য পথে অবিচল নারী। কিন্তু তার মধ্যে সেই অধিকার বোধ জাগ্রত হয়নি। 'শাস্তি' গল্পের 'চন্দরা'র নারীসত্তার এক অবিস্মরণীয় স্বরুপের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যে অর্থাৎ উপন্যাস ছোটগল্পে নারীচরিত্রগুলি বারবার সময়ও সমাজের পরিবর্তনের সত্যকে মেনে নিয়ে তিলে তিলে বিবর্তিত হয়েছে।

স্বাধিকারবোধে উজ্জ্বল আর এক নারী সোহিনী। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের প্রধান চরিত্র সোহিনী। সোহিনী চরিত্র চিত্রনে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য তীক্ষ্ণতার পরিচয় দিয়েছেন। নন্দকিশোর ছিলেন সে সময়ের একজন প্রযুক্তিবিদ। ব্যবসার প্রয়োজনে কিছুদিন ছিলেন পাঞ্জাবে। সেখানেই সোহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সোহিনী হয়ে যায় নন্দকিশোরের জীবন সঙ্গিনী। আমাদের প্রচলিত সামাজিক নীতি নিয়মকে সোহিনী গ্রাহ্যই করেনা। এমনকি নন্দকিশোরের সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধাতেও আছে চমক। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ সোহিনীকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, "মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেক্টারের তেজ।"[৮]

প্রৌঢ় বয়সে নন্দকিশোর মারা গেলেন। নন্দকিশোরের জীবনের প্রধান কর্ম তার স্থাপিত পরীক্ষাগার। এই ল্যাবরেটরিকে রক্ষার জন্য সোহিনীর সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা। সোহিনী বুদ্ধিদীপ্ত নারী। তার রূপের মাধুর্যও আছে। সোহিনী ভেঙে পড়েনি। বুজে নিয়েছে আইনের মারপ্যাচ। সোহিনীর মেয়ে নীলিমা যাকে নীলা নামে ডাকা হয়। সোহিনী তার স্বামীর সাধনাকে সম্মান দেয়। তাই ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্য যোগ্য মানুষ খুঁজে নিতে চান। সোহিনীর মনে হয় এতেই নন্দকিশোরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হবে। আমাদের প্রচলিত ধারণার নিরিখে সোহিনীকে বিচার করা যায়। সোহিনী চরিত্র আমাদের অবাক্ করে বিস্মিত করে। স্বাধিকার বোধের অনন্য দৃষ্টান্ত সোহিনী। সে জীবনের কোন পর্যায়ে ভেঙে পড়েনি। যুক্তি আর বুদ্ধির দীপ্তিতে সে উজ্জ্বল। আমাদের সামাজিক রীতিনীতিকে সে গ্রাহ্যই করেনি। নিজের যা ঠিক বলে মনে হয়েছে সেই

কাজটিই করেছে। প্রসঙ্গক্রমে সোহিনী ও অধ্যাপকের কথোপকথন মূল গল্প থেকে উদ্ধৃত করছি,-

সোহিনী অধ্যাপককে বলেছেন, "জানেন বোধ হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবেরটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ঐ ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দেব বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবর্তী ভট্টাচার্যের কথা।

অধ্যাপক বললেন,- 'যোগ্য ছেলেই বটে। তার যে লাইনের বিদ্যে সেটাকে শেষ পর্যন্ত চালান করতে মালমসলা কম লাগবে না।"

সোহিনী বললে, " আমার রাশকরা টাকায় ছাড়া পড়ে যাচ্ছে। আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুর দেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শুনে হয়তো রাগ করবেন, আমি ও সব কিছুই বিশ্বাস করিনে।"
চৌধুরী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন," তুমি তবে কি মান ?"

"মানুষের মতো মানুষ যদি পাই, তবে তার পাওনা শোধ করে দিতে চাই যতদূর আমার সাধ্য আছে। এই আমার ধর্ম কর্ম।”[৯]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন সায়াহ্নে এ গল্প লিখেছেন। গল্পটির রচনাকাল ১৩৪৭ ব্যং আশ্বিন। জীবনের শেষপর্বে একেবারে সংস্কারমুক্ত এক নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সোহিনী স্বাধীকারে দৃপ্ত। কোথাও সে নতি স্বীকার করেনা। নিজের ভুল ত্রুটি বিষয়েও সচেতন। অধ্যাপক সোহিনীকে ভালো করে চিনেছেন। তিনি সোহিনীকে ছদ্মবেশী সোনার ঢেলা বলেন। সোহিনী ধর্ম কর্ম মানে না। মানুষ, পশু, পাখির প্রতি মমত্ব আছে। কিন্তু ভাবালুতা নেই ওর স্বভাবে। নিজেকে সতী নারীও ভাবে না। তার চরিত্রে কোন কপটতা নেই। আমাদের কপটতা ভান, এগুলিকে আঘাত করে তির্যক ভাবে। সোহিনী অধ্যাপককে জানায়,- “আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতা সাবিত্রী।"[১০]

সোহিনীর এই যে কথন এটাই তার চারিত্রিক শক্তি। সোহিনীর এই স্পষ্টবাদিতা তাকে পাঠকের কাছে আরোও প্রিয় করে। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের বিষয়বস্তু যেমন চমকপদ তেমনি তার চরিত্রগুলি। গল্পটির চরিত্র চিত্রশালায় সোহিনী হীরক দ্যুতিতে উজ্জ্বল। 'ল্যাবরেটরি' গল্পটির মূল চালিকাশক্তিই 'সোহিনী'। তাই স্বাধিকার বোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'সোহিনী' চরিত্রটি। সে বিশ্বাস করে সততায়, স্বামীর আদর্শকে সম্মান করে। আবার প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে এক লহমায় সে নস্যাৎ করে দেয়। রবীন্দ্র উপন্যাসে, গল্পে স্বাধিকার বোধে উজ্জ্বল নারীদের দেখা পাওয়া যায়। এরই মাঝে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের 'মৃনাল', 'অপরিচিতা' গল্পের 'কল্যাণী' আর 'ল্যাবরেটরি' গল্পের 'সোহিনী' স্বাধিকার বোধে উজ্জ্বল তিনটি নারী চরিত্র।

তথ্যসূত্র

১। 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা-১৮।

২। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (নতুন সংস্করণ) চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত। পৃষ্ঠা-১৩৫।
৩। সঞ্চয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবলা কবিতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ১৪০২ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা-৬৩১।
৪। গল্পগুচ্ছ অখন্ড, স্ত্রীর পত্র গল্প (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ) পৃষ্ঠা-৫৬৭।
৫। তদেব গল্পগুচ্ছ অখন্ড, স্ত্রীর পত্র গল্প (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ) পৃষ্ঠা- ৫৭৫-৫৭৬।
৬। তদেব গল্পগুচ্ছ অখন্ড, স্ত্রীর পত্র গল্প (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ) পৃষ্ঠা-৫৭৬।
৭। গল্পগুচ্ছ অখন্ড, অপরিচিতা গল্প (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ) পৃষ্ঠা-৬০৬।
৮। গল্পগুচ্ছ অখন্ড, ল্যাবরেটরি গল্প (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ) পৃষ্ঠা-৬৯৬।
৯। গল্পগুচ্ছ অখন্ড, ল্যাবরেটরি গল্প (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ) পৃষ্ঠা-৬৯৮।
১০। গল্পগুচ্ছ অখন্ড, ল্যাবরেটরি গল্প (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ) পৃষ্ঠা-৭০২।

বাংলা লিটল ম্যাগাজিন ও সত্য গুহ

সফিয়ার রহমান
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি

সারাংশ (Abstract): বর্তমান সাহিত্যে, বিশেষ করে অধুনা বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের অবদান অনস্বীকার্য। মননশীল ভাবনা, চিন্তা-চেতনার বিকাশ, সাহিত্য-সংস্কৃতির যথাযথ মূল্যায়ন ও সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে লিটল ম্যাগাজিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে চলেছে। নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাহিত্যাঙ্গণে তুলে ধরার অন্যতম ধারক ও বাহক লিটল ম্যাগাজিন। তাছাড়া লিটল ম্যাগাজিনে উঠে আসে আঞ্চলিক মানুষের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক জীবন। বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের অন্যতম পীঠস্থান উত্তর ২৪ পরগনা। এই জেলার বহু লেখক লিটল ম্যাগাজিনকে মাধ্যম করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সত্য গুহ উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের লেখক সত্য গুহ'র অবদান আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়।
মূল শব্দ (Keyword) : বাংলা সাহিত্য, লিটল ম্যাগাজিন, সত্য গুহ'র কবিতা ও গদ্য।

মূল আলোচনা (Discussion):

বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিন: লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্য ও সাহিত্যিক সৃষ্টির অন্যতম কারিগর। শুধু সাহিত্য নয়, লোকসমাজ, লোকসংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে লিটল ম্যাগাজিন। সাহিত্যের নিত্যনতুন ধারার জন্ম দিয়ে পাঠকের কাছে নতুন পাঠ্যস্বাদ তুলে দেওয়ার সূক্ষ্ম কাজটাও করে যায় সে। পাঠক বেছে নেয় তার পছন্দের সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা। লিটল ম্যাগাজিন কারও কাছে দায়বদ্ধ নয় বলেই পরীক্ষামুলকভাবে নতুন নতুন কাজ করতে পারে। সাহিত্যের মুক্তাঙ্গন তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। সেই মুক্তাঙ্গনে পাঠকও হয়ে উঠতে পারে মুক্তমনের অধিকারী। লিটল ম্যাগাজিন অত্যন্ত গতিশীল। চলমান সমাজের সঙ্গে সেও চলমান। যেন 'চরৈ:বেতি'র বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এগিয়ে চলে সামনে। পিছনে তাকাবার সময় নেই। বর্তমান সময়কালে অত্যন্ত আলোচিত দুটি সাহিত্য ধারা অণুকবিতা ও অণুগল্প সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়েছে লিটল ম্যাগাজিনে। সে চর্চা এখনও নিরন্তর চলছে। সমাজ বিবর্তনের পথেও লিটল ম্যাগাজিন বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করছে। তার মননশীল চিন্তাধারা সমাজের অগ্রগতি তরান্বিত করছে। সুষ্ঠু সমাজ গঠনে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রকৃত অর্থে গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখির ধারক ও বাহক লিটল ম্যাগাজিন। চিন্তা-চেতনায় সে যেমন অগ্রগণ্য, তেমনি বিষয়বৈচিত্র্যেও ব্যাপকতা লক্ষ্যনীয়। সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি,

রাজনীতি, সমাজ প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে লিটল ম্যাগাজিন। তবে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্য বিষয়ক। সাহিত্য বিষয়ক ম্যাগাজিন বাংলার অহংকার। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বিকাশে এর ভূমিকা অপরিসীম। সেই সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিনকে মাধ্যম করে যাঁরা অনন্যসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি করছেন তাঁরা লিটল ম্যাগাজিনের সম্পদ। বাংলা সাহিত্য তাঁদের নিয়ে শ্লাঘাবোধ করে। এমনই এক বিরল সাহিত্যিক সত্য গুহ, যিনি তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাই লিখে গিয়েছেন লিটল ম্যাগাজিনে। জেলার সীমানা ছাড়িয়ে তিনি গোটা বঙ্গদেশের এক কৃতী সাহিত্যিক।

সত্য গুহর কাব্য ও প্রবন্ধ: উত্তর ২৪ পরগনার অত্যন্ত জনপ্রিয়, নিয়মনিষ্ঠ ও চেতনাসম্পন্ন কবির কথা বললেই সর্বাগ্রে উঠে আসে সত্য গুহ'র কথা। সত্য গুহ গদ্য ও পদ্য দুটি ধারাতেই সমান পারদর্শী। তবে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ কবি হিসেবে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় একটার পর একটা লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছেন, লিটল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন ও তাদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি ধারাবাহিকভাবে লিখে গেছেন লিটল ম্যাগাজিনে। তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে লিটল ম্যাগাজিনের পাতায়। তিনি বেশ কিছু গবেষণা ধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলিও প্রকাশ করেছেন লিটল ম্যাগাজিনে। যেমন - 'যুগসন্ধি: সাম্প্রতিক বাংলা লেখালেখির পটভূমি'[১] নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটি লিখেছেন উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত 'শ্যামচ্ছায়া বাণীমালা' পত্রিকায়। অত্যন্ত সময়োপযোগী প্রবন্ধ। বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি উঠে গেছে বলে তিনি মনে করেন। এতে সামাজিক ক্ষতি হচ্ছে। কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলন, নানাবিধ সংস্কার আন্দোলন, প্রগতিশীল ধ্যানধারণা নিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন সবটাই করেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। শুভবুদ্ধি তাড়িত এই মধ্যবিত্তরাই হাজার বাধা অতিক্রম করে স্বৈরাচারী সরকারকে অনায়াসে উপড়ে ফেলতে পারে। আবার গদিতে বসাতে পারে মানবতার কোনো পুজারিকে। এই সময়ে সংঘটিত নানা অসামাজিক কার্যকলাপ, বিশেষ করে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-প্রমোটারিকে দৃঢ়ভাবে নিন্দা করেছেন। এই সময়ের লেখালেখি নিয়েও তাঁর ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। কিছু লেখক-লেখিকা নীতি, আদর্শ ভুলে অর্থলোলুপ হয়ে উঠছে। তাদের কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। তবে আশার আলোও দেখিয়েছেন লেখক। কিছু যুবক লিটল ম্যাগাজিনকে মাধ্যম করে বা নিজেরাই একটা লিটল ম্যাগাজিন জন্ম দিয়ে সামাজিক উত্তরণের পথ দেখাচ্ছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে। প্রবন্ধটি অত্যন্ত সমসাময়িক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

সত্য গুহ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নবপর্যায়ে প্রকাশিত প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম উপদেষ্টা। নিজ বাসভূমি অশোকনগরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অভ্যুদয় পাঠাগার, রক্তরবি সব পেয়েছির আসর, ঐকতান নাট্য সংস্থা। প্রকাশ করেছিলেন লিটল ম্যাগাজিন ঋতুপত্র। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চেনা অচেনার ভীড়ে আমার

মুখ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরই অশোকনগর উপনগরীতে তিনি কবি হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিছু অনুগামীও জুটে যায়। মুলত কিশোর ও যুবকরাই তাঁর অনুগামী। সত্য গুহ লেখালেখির বিষয়ে তাদের অলিখিত নেতা হয়ে ওঠেন। তার পর থেকে তাঁর নেতৃত্বে অশোকনগর চৌরঙ্গীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি চক্র। তাঁর সেই আড্ডাচক্রে জড়ো হত উৎসাহি যুবকেরা। তিনি ছিলেন অশোকনগর বয়েজ সেকেন্ডারী স্কুলের শিক্ষক। সেই স্কুলের ছেলেরাই মুলত ভিড় করে থাকত সত্য গুহকে। লেখালেখি ও সংস্কৃতি চর্চায় সেইসব যুবকদের অনুপ্রেরণা যোগাতেন তিনি। যুবা বয়সে তিনি সপ্তাহ, নতুন পরিবেশ, চতুষ্কোণ, কালান্তর, বিচিন্তা, কবিতা সীমান্ত, কবিতা সাপ্তাহিকীর মত ছোট পত্রিকায় যেমন লিখেছেন ; তেমনি পরিচয়, কৃত্তিবাসের মত স্বনামধন্য পত্রিকাতেও লিখে গিয়েছেন নিরন্তর। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখার পিরিধিও বেড়েছে। লিখেছেন অহর্নিশ, প্রগতি, শ্রীময়ী, মৃত্তিকা, নীলাক্ষর, সৃজন, কারুকথা, যামিনী কথা, যমুনামতি, বালার্ক, প্লাবন, অববাহিকা, বাতিঘর, ইচ্ছেনদী, বঙ্গসৃতি, দাবদাহ, নবপল্লব, রঞ্জালোক, সবুজ শৈশব, রথের রশি, নয়াদুনিয়া, অশোক কল্যাণ, নহবত, অনুভবের মত বহু লিটল ম্যাগাজিনে। সত্য গুহ তাঁর জীবদ্দশায় মোট ১১টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সেগুলি হল ---- 'চেনা অচেনার ভীড়ে আমার মুখ', 'এ যেন বারবেলা', 'অবিরাম ভীড়ে ও জীবনে', 'সত্য গুহর ঘরবাড়ি ও প্রেম', 'ঈশ্বরী পাটিনী', 'আমি আছি, থাকতে যে হয়', 'পরণ কথা আপন কথা', 'চলতে চলতে প্রকীর্ণ কবিতা', 'ভাল নেই অন্ধকারে', আপন কথা পরণ কথা' ও 'টুকরো স্মৃতি'।

সত্য গুহর 'পরণ কথা আপন কথা' ও 'আপন কথা পরণ কথা' দুটি কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ। দেশভাগ প্রতিটি বাঙালির জীবনে যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায়, বেদনার ইতিকথা। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। হাজার হাজার মানুষ ভিটেমাটি হারিয়েছিল। বিপন্ন মানুষ কীভাবে সেই বিপর্যয় পর্যুদস্ত করেছিল, কীভাবে কঠোর সংগ্রাম করে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছিল তা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বহু গল্প, উপন্যাস, নাটক, আত্মজীবনী লেখা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র দেশভাগ ও উদবাস্তু হয়ে ওঠার যন্ত্রণাকে বিষয়বস্তু করে একটি দীর্ঘ কবিতা দিয়ে গ্রন্থ সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে বিরল। সেই বিরল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সত্য গুহ। সেই কাহিনি নিয়েই ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয় 'পরণ কথা আপন কথা'। গ্রন্থের প্রকাশক সম্পাদক অপূর্ব সাহার 'থির বিজুরি'।

জীবন প্রবহমান নদীর মত। সে কখনও থেমে থাকে না। সত্য গুহর জীবনও চলতে থাকে নির্দিষ্ট গতিতে। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কবি উদবাস্তু জীবনের ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবনে থিতু হয়েছেন কিন্তু সংগ্রাম শেষ হয়নি। থিতু হওয়া ও উদবাস্তু জীবনের অন্য আর এক রূপ নিয়ে তিনি লিখলেন সেরকমই এক দীর্ঘ কবিতা, যা মলাটবন্দি হল 'আপন কথা পরণ কথা' শিরোনামে। ২০১৯ সালে গ্রন্থাকারে

প্রকাশিত হল 'বঙ্গসৃতি' থেকে। প্রকাশক দিলীপ বিশ্বাস। অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বাইসারি গ্রামের কিশোর নিজভূমি ছেড়ে কীভাবে এপারে এসে গা ভাসালেন, কীভাবে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখলেন তা দেখিয়েছেন কবি। দুটি আলাদা কাব্যগ্রন্থ হলেও একই জীবনের পরম্পরা কাহিনি। বলা যেতে পারে একই গ্রন্থের দুটি খন্ড। সম্প্রতি এবছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে 'থির বিজুরি' পত্রিকার সম্পাদক অপূর্ব সাহা 'পরণ কথা আপন কথা' ও 'আপন কথা পরণ কথা' গ্রন্থ দু'টি একত্রে এক মলাটে 'পরণ কথা আপন কথা' শিরোনামে প্রকাশ করেছেন। প্রকাশক থির বিজুরি। গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন রচিষ্ণু সান্যাল। উল্লেখ্য, এক মলাটে প্রকাশিত গ্রন্থটি ২০২৪ সালে যেমন প্রকাশ করেছে একটি লিটল ম্যাগাজিন, তেমনি পূর্বে অতি পরিচিত কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রকাশ করেছিল দুটি লিটল ম্যাগাজিন --- বঙ্গসৃতি ও থির বিজুরি। সত্য গুহর গ্রন্থ প্রকাশ করে লিটল ম্যাগাজিন তার গুরু দায়িত্ব পালন করেছে।

একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল: সত্য গুহর যুগান্তকারী সৃষ্টি 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল'। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল বইটি দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৯৮৭ সালে। এটি শুধু একটা গ্রন্থ নয়, বাংলা গদ্যপদ্যের যথার্থ দলিল। নিরলস পরিশ্রম করে তিনি পত্রপত্রিকায় পাহাড় সংগ্রহ করেছেন। আর সেই পাহাড় প্রতিম অক্ষরের উপর বসে তিনি নির্মান করেছেন এই কালজয়ী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি খ্যাতিমান লেখকদের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি লিটল ম্যাগাজিনে লেখা স্বল্প পরিচিত কবি সাহিত্যিকের কথাও বলেছেন। কেন লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের এত গুরুত্ব দিয়েছেন? গ্রন্থের 'নান্দিমুখ' অংশে তিনি স্পস্ট সেকথা উল্লেখ করে বলেছেন, "ক্ষুদে মুখপত্র অর্থাৎ লিটল ম্যাগাজিনগুলো একদিকে যেমন তরুন লেখক-কবিদের ফতোয়া এবং পরীক্ষানীরিক্ষার ক্ষেত্র --- তরুন চিন্তার সমস্ত রকম ঝক্কি যেমন তারা বহন করে, তেমনি তুলে ধরে একটা সময়ের তাজা ও প্রগতিশীল সাহিত্য। প্রগতির চিহ্ন এখানেই।"[২]

বিরাট কলেবরে প্রকাশিত এই গ্রন্থে বাংলার সমসাময়িক সময়ের প্রায় সমস্ত কবি-সাহিত্যিকের কথা রয়েছে। এমন এক গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা কখনও মাথায় আসলেও তা হয়ে ওঠা কঠিন ছিল। তবে একটি ঘটনা তাঁর ইচ্ছাকে উস্কে দিয়েছিল। সেই ঘটনাই 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল' সৃষ্টির ইতিহাস। লেখক সত্য গুহ নিজে বলেছেন, "একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল লেখার জন্মকথা বলতে গেলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয় আচার্য হোড় রায়ের কথা। বাবার সঙ্গে তাঁর এবং অধ্যাপক সমরেন্দ্র দত্ত চৌধুরী মশাইয়ের সখ্যতা থাকার কারণে আমার পরিচিতি ঘটে।... সে বছর সম্ভবত ১৯৬৫, বাণীপুর লোকমেলায় সাহিত্যালোচনা সভায় সাম্প্রতিক লেখালেখি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য আচার্য হোড় রায় আমন্ত্রণ জানালে, আমার মাথায় যে কথাগুলো কিলবিল করছিল তা লিখে ফেললাম। ১৬ পাতার সে প্রবন্ধ নিয়ে জনতা হলের বাণীপুরের কালচার অনুযায়ী বিশুদ্ধ ভাবগম্ভীর সাহিত্য বাসরে

পৌঁছে দেখলাম ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ। আমার হাতপা সেঁধিয়ে যাবার উপক্রম। তবে কমিউনিস্ট তো, প্রথমেই যখন আমাকে প্রবন্ধ পাঠ করতে ডাকা হল, আমি অকুতোভয় ক্রুদ্ধ হাংরি কবি গদ্যকারদের গদ্যপদ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধটি পাঠ করে জানালাম --- শক্তি, সুনীল, সন্দীপন, দেবেশ, দীপেনরাই এক্ষণে প্রকৃত লেখক। অবক্ষয়িত, মূল্যবোধহীন, ব্যাভিচারি উৎকট এই সময়ে এখনকার গদ্যপদ্য লেখকরাই প্রকৃত প্রস্তাবে ঊনবিংশ শতকের রেনেসাঁসের বিপরীতে অন্ধকারের দিক থেকে নবজাগরণ আনছেন সত্য উদঘাটন করে।..."[৩]

উপস্থিত বরেণ্য অতিথিরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। সেই উৎসাহে তিনি একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিলের সলতে পাকানো শুরু করেন। শুরুতে টুকরো টুকরো লেখা প্রকাশিত হয়েছে লিটল ম্যাগাজিনে। তারপর পাঠকের প্রশ্রয়ে তিনি অসম্ভব পরিশ্রম করে এই গ্রন্থ লেখেন।

জেলার তথা বাংলার একজন প্রথম সারির সাহিত্যিক লিটল ম্যাগাজিনকে মাধ্যম করে একটার পর একটা সাহিত্য উপহার দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যকে তিনি যেমন সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি উন্নীত করেছেন লিটল ম্যাগাজিনকে। ২০২০ সালের ৮ নভেম্বর করোনায় আক্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে মারা যান সত্য গুহ। তাঁর মৃত্যু বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের অপূরনীয় ক্ষতি।

তথ্যসূত্র:

১. বিশ্বাস দিলীপ, ২০২০ হৈমন্তী সংখ্যা, শ্যামচ্ছায়া বাণীমালা, অশোকনগর, পৃষ্ঠা ৭-৮
২. গুহ সত্য, ১৯৮৭, একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল, কলকাতা, অধুনা পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা: ৩৪
৩. উত্তর ২৪ পরগনার সাহিত্যে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন গবেষণা পত্রে একটি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পাওয়া তথ্য।

শিশু-কিশোর সাহিত্য : নারায়ণ দেবনাথের 'বাঁটুল দি গ্রেট'

মৌসুমী পাল
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ : শিশু ও কিশোর পাঠকদের কথা ভেবেই শিশু ও কিশোর সাহিত্যের সূচনা হয়েছে। নির্মল আনন্দরস সৃজনকারী সাহিত্যই হল শিশু-কিশোর সাহিত্য বা ছোটদের সাহিত্য। শিশু ও কিশোরদের জন্য সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে নূতন নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকরা শিশু ও কিশোরদের জন্য সাহিত্য রচনা করেছেন। শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ শিশু-কিশোরদের জন্য আকর্ষণীয় কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বাঁটুল দি গ্রেট'।

শিশু ও কিশোরদের মনের অবদমিত ইচ্ছেপূরণের জন্যই নারায়ণ দেবনাথ বাঁটুল চরিত্রটি অঙ্কন করেন। একদিন হঠাৎ করেই লেখকের কল্পনায় ভেসে উঠে বাঁটুল। তিনি মনে মনে বাঁটুলের অবয়বও ভেবে নেন। তাঁর অঙ্কিত বাঁটুল অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী। ট্যাংক, মিশাইল, বিমান চালাতে সে দক্ষতার শীর্ষে। শত্রুর উপর অভিনব ক্রিয়াকান্ডের ডালি নিয়ে সে উপস্থিত হয় পাঠকের সামনে।

নারায়ণ দেবনাথ বাঁটুলকে শিশু ও কিশোরদের কাছে বীর হিসেবে উপস্থাপিত করেন। বাঁটুল তার পেশীবহুল হাতে ট্যাঙ্ক তুলে মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে শত্রু দমনে নিক্ষেপ করে। বাঁটুলের কার্যকলাপে শিশু ও কিশোরদের মনের ইচ্ছাপূরণ হয়।

'বাঁটুল দি গ্রেট' কমিক্সের বাঁটুল এক অসাধারণ ক্ষমতাশালী নায়ক। পেশীবহুল, বিশাল দেহ, বীর নায়ক বাঁটুল। সে অসীম ক্ষমতাধারী এবং অসাধ্য সাধনে পটু। বাঁটুলের শক্তিশালী কার্যকলাপ অবাক করে শিশু-কিশোরদের। সে তার কর্মের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের ইচ্ছেপূরণ করে। শিশু ও কিশোরেরা তাদের স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন হতে দেখে।

শিশু ও কিশোরদের শক্তি সীমিত। ভূতের মোকাবেলা করার মতো শক্তি ও সাহস কোনটাই তাদের নেই। ভূতের নামে তারা ভয়ে মুর্ছা যায়। অথচ তারা যে কাজটি করতে পারে না সেই কাজটি অপরকে করে ফেলতে দেখে একদিকে যেমন তারা বিস্মিত হয়, তেমনি অন্যদিকে তাদের নিজেদের ইচ্ছেপূরণ হতে দেখে আনন্দিত হয়। বাঁটুল তার কর্মের মাধ্যমে শিশু ও কিশোরদের মনের সুপ্ত ইচ্ছেপূরণ করে। এই অসম্ভব ক্ষমতাধারী বাঁটুলকে নিয়েই নারায়ণ দেবনাথ রচনা করেছেন 'বাঁটুল দা গ্রেট'।

সূচক শব্দ: কমিক্স, শিশু-কিশোর সাহিত্য, ইচ্ছেপূরণ, ক্ষমতাশালী, নায়ক, কৌতুককর সংলাপ।

মূল প্রবন্ধ

শিশু ও কিশোরদের জন্য সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে নূতন নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকরা শিশু ও কিশোরদের জন্য সাহিত্য রচনা করেছেন। শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ শিশু-কিশোরদের জন্য আকর্ষণীয় কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল 'হাঁদাভোদা', 'বাঁটুল দি গ্রেট', 'নন্টে ফন্টে', 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড ইন্দ্রজিৎ রায়', 'পটলচাঁদ দি ম্যাজিশিয়ান', 'কৌশিক রায়', 'বাহাদুর বেড়াল', 'ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু', 'পেটুক মাস্টার বটুকলাল', 'সুটকি-মুটকি'।

নারায়ণ দেবনাথের প্রথম ব্যঙ্গচিত্র হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবি ছবি'। বারাণসী সর্বোদব প্রকাশনা সংস্থা থেকে বাংলা ও হিন্দিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম জনপ্রিয় ব্যঙ্গচিত্র 'হাঁদাভোঁদা' শুকতারা প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হবার পর আলোড়ন সৃষ্টি করল। তাঁর সৃষ্ট 'নন্টে ফন্টে', 'হাঁদাভোঁদা' এত বছর পরেও এখনো মানুষের মনোরঞ্জন করে চলেছে। কমিক্সের রচয়িতা হিসেবে নারায়ণ দেবনাথ হলেন প্রথম ও একমাত্র ডি. লিট উপাধি প্রাপ্ত।

শিশু-কিশোরদের উপযোগী বিষয় নির্ধারণ করা এবং সেটাকে তাদের ভালো লাগার মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করা রীতিমতো আয়াসসাধ্য কাজ। কিন্তু নারায়ণ দেবনাথের ছবিতে গল্প বলার নিজস্ব এমন এক সহজ ভঙ্গী রয়েছে, যেটা তাঁর প্রতিভাবলেই তিনি এই কাজটি অনায়াসে করে চলেছেন। নারায়ণ দেবনাথের কমিক্স বইয়ের সম্পাদক শান্তনু ঘোষ বলেছেন - "সিরিয়াস অলংকরণ ছাড়াও নারায়ণবাবুর দক্ষতার আরেকটি নজির হলো কমিক ছবি যার হিউমার এলিমেন্ট আর সকল শিল্পীর থেকে তাঁকে পৃথক স্থান দিয়েছে। নারায়ণ দেবনাথ বলতেই সাধারণের মনে ভেসে ওঠে তার তিনটি জনপ্রিয় কমিক সিরিজ - 'হাঁদাভোঁদা', 'বাঁটুল' ও 'নন্টে ফন্টে'।"[১]

শিল্পী নারায়ণ দেবনাথের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হলো নির্ভেজাল সারল্য। তাঁর সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হলো মজাদার কথোপকথন আর আকর্ষণীয় চরিত্রের মিশেলে তৈরি মন কেড়ে নেওয়া কৌতুক। তাঁর সৃষ্ট বাঁটুল চরিত্র সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন - "এটা একটা কাল্পনিক চরিত্র। এর অদ্ভুত কার্যকলাপের সন্ধান দিতেই শুকতারার পাতায় এর আবির্ভাব।"[২] ১৯৬৫ সালে বাঁটুলের আবির্ভাব লগ্নে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যুদ্ধে বীর নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হলো বাঁটুলকে। পেশীবহুল হাতে ট্যাঙ্ক তুলে মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে শত্রু দমনে নিক্ষেপ করে। বাঁটুলের কার্যকলাপে শিশু কিশোরদের মনের ইচ্ছাপূরণ হয়।

'বাঁটুল দি গ্রেট' নারায়ণ দেবনাথের প্রথম রঙ্গিন কমিক্স। তিনি জানিয়েছেন, কলকাতার কলেজ স্ট্রীট থেকে ফেরার পথে হঠাৎ একদিন বাঁটুল তার চিত্রণে ভেসে ওঠে। নামকরণের মত বাঁটুলের দেহসৌরভ ভেসে ওঠে তার মনের গহনে কল্পনার তুলিতে। তাঁর অঙ্কিত বাঁটুল অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী। ট্যাংক, মিশাইল, বিমান চালাতে সে দক্ষতার শীর্ষে। শত্রুর উপর অভিনব ক্রিয়াকান্ডের ডালি নিয়ে সে উপস্থিত হয় পাঠকের সামনে।

নারায়ণ দেবনাথের 'বাঁটুল দি গ্রেট' নতুন যুগের শিশু ও কিশোর হৃদয়ে অপরিমেয় মজাদার আনন্দের সঞ্চার করেছে। নির্ভেজাল আড্ডার মাঝে প্রচলিত বাংলা শব্দগুলি চরিত্রের মুখে বসিয়ে আবেগের উচ্ছ্বাসে চরিত্রটিকে তিনি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। 'বাঁটুল দি গ্রেট' আজকাল টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠে। 'হাঁদা ভোঁদা'র জন্মের এক বছর পর বীরোচিত কান্ডের বাঁটুলের আবির্ভাব। পেশীবহুল, বিশাল দেহ, বীর নায়ক বাঁটুল জন্ম নিল নারায়ণ দেবনাথের মনে। সে অসীম ক্ষমতাধারী এবং অসাধ্য সাধন সাধনে পটু।

বাঁটুল অসাধারণ শক্তির অধিকারী। সে হাত দিয়ে মানুষকে উড়িয়ে দিতে পারে। লাঠির আঘাতে সে পাহাড় কমিয়ে দেয়। ভূতকে ভয় পায় না। বড় বড় মানুষকে সহজে কাবু করে তোলে। বাঁটুলের গল্পগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে নারায়ণ দেবনাথের কৌতুককর সংলাপ সৃষ্টির মাধ্যমে।

'বাটুল দি গ্রেট' কমিক্সের বাঁটুল এক অসাধারণ ক্ষমতাশালী নায়ক। গাছ কাটার গল্পে গাছ কাটতে গিয়ে অন্য সবাই ভূতের পেটে গেলেও বাঁটুল ভূতের দলকে দেখেও নির্বিকার থাকে। সব জেনেই সে গাছ কাটতে উদ্যোগী হয় এবং তার কোন হাতিয়ারের প্রয়োজন হয় না। সে তার হাত দিয়ে আঘাত করেই গাছ কেটে ফেলে এবং গাছে লুকিয়ে থাকা ভূতগুলিকে পালাতে বাধ্য করে।

আদিবাসীদের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে ভয়ানক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে বাঁটুল আর তার দুই সঙ্গী। উপায় না দেখে তারা একটা বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং তিনজনেই ঘুমিয়ে পড়ে। সে বাড়িটা ছিল ভূতের বাড়ি। ভূতেরা বাড়ি ফিরে এসে তাদের দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়। ভূতেরা রক্তচোষার জন্য বাঁটুলের উপর হামলে পড়ে। বাঁটুল নিজের গায়ে মশা কামড়ানোর যন্ত্রণা অনুভব করে। ঘুমের ঘোরে সে কেবলমাত্র হাত দিয়ে ঠেলে ভূত তিনটিকে নিজের অজান্তেই ঘায়েল করে। বাঁটুল তার সঙ্গীদের ভূতের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য দু'হাতে দু'জনকে ঘাড় মটকানোর জন্য তৈরি হলে তারা নিজেদের বাঁচাবার জন্য আর্ত চিৎকার শুরু করে।

এক জায়গায় ভোজ খেয়ে বাঁটুল তার দুই সঙ্গী নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু ভোজের বাড়িতে বেশি খেয়ে ফেলায় তারা আর হাঁটতে পারছিল না। এমন সময় পাশের একটা বাড়ি থেকে কেউ একটা পাথর ছুঁড়লে সেটা এসে বাঁটুলের গালে লাগে। কিন্তু বাঁটুল এতটাই শক্তিশালী যে পাথরের ঘা খেয়েও সে নির্বিকার থাকে। তিনজনে

কে পাথর ছুঁড়েছে তা দেখার জন্য বাড়ির ভিতরে যেতেই একটা ভূত তাদের আক্রমণ করে। বাঁটুল ভূতের গলাটা চেপে ধরতেই তাদের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। কিন্তু বাঁটুল একটি শর্তেই তাকে ছাড়তে পারে। আর সেই শর্তটা হল যে তাদের তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে।

একটি গল্পে আমরা দেখি বাঁটুলের নাম করে দু'জন লটারির টিকিট বিক্রি করে টাকা তুলছে। টাকা সংগ্রহ করে দুজনে একটা ঘরে বসে যখন টাকার হিসেব মেলাচ্ছে তখন বাঁটুলকে আসতে দেখে ওরা ভয় পেয়ে যায় এবং একটি বড় পাথরের চাঁই বাঁটুলের মাথার উপর ফেলে তাকে আটকানোর চেষ্টা করে। ওরা একজন আরেকজনকে বলে - "দে পাথরটা বাঁটলোর উপর গড়িয়ে। তারপর ও বেড়াতে যাবে হাসপাতালে আর আমরা যাব সমুদ্রের ধারে।"[৩] কিন্তু সেই বড় পাথরটা বাঁটুলের পায়ে লেগে উল্টে তাদের দু'জনের মাথায় পড়ে। বাঁটুল তখন টাকার পুঁটুলিটা নিয়ে নেয় এবং বলে – "যাক, আমার নাম করে যখন চাঁদা তুলেছিস তখন আমি সমুদ্রের ধারে বেরিয়ে আসি আর তোরা হাসপাতালে গিয়ে রেস্ট নে।"[৪] এই কথা শুনে ওদের একজন বলে উঠে – "যা ব্বাবা! এযে উল্টো বুঝলি রাম হয়ে গেল!"[৫]

'বাঁটুল দি গ্রেট' এর বিভিন্ন কমিক্সগুলো পড়লে আমরা দেখতে পাই যে বাঁটুল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান। তার এই শক্তি ও বুদ্ধিই তাকে বিভিন্ন সমস্যায় নির্বিকার করে রেখেছে, তাকে ক্ষমতাশালী করে তুলেছে। অর্থ কিংবা প্রতিপত্তিতে বাঁটুল ক্ষমতাশালী নয়, তার শক্তি, তার উপস্থিত বুদ্ধির জন্য আমরা তাকে ক্ষমতাশালী নায়ক বলতে পারি।

বাঁটুল তার কর্মের মাধ্যমে, আচরণের মাধ্যমে আমাদের বিস্মিত করে। সামনে ভীষণ সমস্যা বা বিপদ থাকলেও সে নির্বিকার থাকে। তার এই নির্বিকারভাব আমাদের বিস্মিত করে। সে তার কর্মের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের ইচ্ছেপূরণ করে। শিশু ও কিশোরেরা তাদের স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন হতে দেখে।

বাঁটুল ভূতকে ভয় করে না। সে অবলীলায় ভূতের মোকাবেলা করতে পারে। দু-তিনটি ভূতকে হাতের মারে জব্দ করা তার কাছে কোন ব্যাপার নয়। বাঁটুলের এই জীবনীশক্তি আমাদের বিস্মিত করে। একটি কাহিনীতে দেখা যায় বাঁটুল প্রচণ্ড গরমে অনেকটা হেঁটে এসে একটা গাছের নিচে বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। সেই গাছে বাস করে এক ব্রহ্মদৈত্য। তার পা বাঁটুলের মাথায় লাগতেই বাঁটুলের সুখের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে। বাঁটুল তার পায়ে ধরে টেনে হিঁচড়ে গাছ থেকে নামায়। ব্রহ্মদৈত্য প্রথমে গাছের ডাল ভেঙ্গে আঘাত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাঁটুলের পেটে লেগে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এবার একটা পাথর দিয়ে আঘাত করে। সেটি বাঁটুলের কোন ক্ষতি করতে পারে না। বরং পাথরটি ভেঙ্গে গুঁড়া হয়ে যায়। এবারে বাঁটুল ব্রহ্মদৈত্যকে ঘুরিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

বাঁটুলের শক্তিশালী কার্যকলাপ অবাক করে শিশু-কিশোরদের। তারা বিস্মিত হয় একটা মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি লক্ষ্য করে। একটা মানুষ কিভাবে নিজেকে লৌহমানবে পরিণত করতে পারে তা তারা ভেবে কুল পায় না। একটা রক্তমাংসের মানুষের মধ্যে কি এতটা শক্তি থাকতে পারে? কিন্তু বাঁটুলের কার্যকলাপ দেখে শিশু ও কিশোরেরা বিস্মিত হলেও তারা ভাবে যে সেটা একমাত্র বাঁটুলের পক্ষেই সম্ভব।

আরেকটা কাহিনীতে দেখা যায় ভুতেদের গুরু ব্রহ্মদৈত্যের মেয়ের বিয়ে। এই বিয়েতে ভূতেরা আধুনিক মানব সমাজের অনুকরণ করে পোলাও, বিরিয়ানি, চিলি চিকেন ইত্যাদি খাবার করতে চায় নিমন্ত্রিত ভূতদের জন্য। শুধু তাদের পুরনো ঐতিহ্য অনুযায়ী বেশ একটা হৃষ্টপুষ্ট মানুষ জোগাড় করতে হবে তাজা রক্ত খাবার জন্য। সেই অনুযায়ী তারা পথে বেরিয়ে বাঁটুলকে পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং যে ঘরে খাবার মজুত রয়েছে সেই ঘরেই আটকে রাখে। ভূতেরা দরজা বন্ধ করে চলে গেলে বাঁটুল মহা আনন্দে সমস্ত খাবার খেয়ে ফেলে। ব্রহ্মদৈত্য গুরু খাবার চেখে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলে ভূতেরা ঘরে গিয়ে দেখে সমস্ত খাবার বাঁটুল সাবাড় করে নিয়েছে। এবার ভূতেরা রেগে বাঁটুলের হাড়-মাংস চিবিয়ে খাবার জন্য তৈরি হয়ে তার কাঁধে দাঁত বসাতেই ভূতেদের দাঁতগুলো সব ভেঙ্গে যায়। বাঁটুল যে অসীম শক্তিশালী তা প্রমাণিত হয়।

শিশু ও কিশোরদের শক্তি সীমিত। ভূতের মোকাবেলা করার মতো শক্তি ও সাহস কোনটাই তাদের নেই। ভূতের নামে তারা ভয়ে মূর্ছা যায়। অথচ তারা যে কাজটি করতে পারে না সেই কাজটি অপরকে করে ফেলতে দেখে একদিকে যেমন তারা বিস্মিত হয়, তেমনি অন্যদিকে তাদের নিজেদের ইচ্ছেপূরণ হতে দেখে আনন্দিত হয়। বাঁটুল তার কর্মের মাধ্যমে শিশু ও কিশোরদের মনের সুপ্ত ইচ্ছেপূরণ করে।

আধুনিক সমাজের সঙ্গে তাল রেখে নারায়ণ দেবনাথ বাঁটুলের হাতে মোবাইল তুলে দিয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই স্থানীয় যুবকরা বাঁটুলকে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। আর সময়মতো যোগাযোগের জন্যই দুষ্ট লোকেরা বাঁটুলের হাতে ধরা পড়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

শুধু শিশু আর কিশোরেরাই নয়, আপামর বাঙালি নারায়ণ দেবনাথকে মনে রেখেছে তাঁর অমর কমিক্সগুলোর জন্যই। তাঁর 'বাঁটুল দি গ্রেট' কমিক্সে আমরা দেখি স্যান্ডো গেঞ্জি আর কালো হাফপ্যান্ট পড়ে হাজির হয় বাঙালির অতি প্রিয় চরিত্র অসীম শক্তিধর বাঁটুল। বাঁটুল একটি বাঙালি চরিত্র এবং বাঙালি সমাজে অসম্ভব জনপ্রিয় চরিত্র। তবে সে সাধারণ একজন ভেতো বাঙালির পর্যায়ে কখনোই পড়বে না। কালো হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে বুক ফুলিয়ে চলা বাঁটুলকে দেখলেই পাঠকের মনের মধ্যে জেগে উঠে অসমসাহসী ব্যায়ামবীরদের কথা।

বাঁটুলের ছবি দেখে, তার সাহসিকতা দেখে আমাদের বাস্তব জগতের লৌহমানবদের কথাই মনে এসে যায়। বাঁটুল লড়াই করে, ভূতকে ভয় পায় না,

মস্তানদেরও ছেড়ে কথা বলে না। তাদেরও উত্তম-মধ্যম দেয়। এমনকি বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পিছপা হয় না। ফুঁ দিয়ে সে গোলা উড়িয়ে দেয়, হাতের শক্তিতে বিরাট প্রাসাদ নাড়িয়ে দেয়।

বাঁটুল একই সঙ্গে বাস্তব আর অবাস্তবকে ছুঁয়ে থাকে। চলন্ত ট্রেনের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় বাঁটুল। ফলে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা ট্রেন বাঁটুলের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় তার ইঞ্জিনটা ভেঙ্গে যায়। আর ওই প্রচন্ড ধাক্কায় ট্রেনটা বেশ কিছুটা পিছু হটে গিয়ে এলিয়ে পড়ে। সাবলীলভাবে ভূতকে পেটাতে তার জুড়ি নেই। রাজসেনাকে হেস্তনেস্ত করতে সে দ্বিধা করে না। তার শট মারা বল অনায়াসে পৌঁছে যায় স্ট্যাটোস্ফিয়ারে। ছিপ দিয়ে সে ধরে ডুবোজাহাজ, আর এক লাথিতে ভেঙ্গে ফেলে উঁচু মিনার। এ হেন বাঁটুল তো শিশু ও কিশোরদের মনকে আকৃষ্ট করবেই। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল ভেঙ্গে বাঁটুল আজ আধুনিক এক রূপকথার চরিত্রে পর্যবসিত হয়েছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে নারায়ণ দেবনাথ সৃষ্টি করেছেন বাঁটুলকে।

'বাঁটুল দি গ্রেট' এর মত জনপ্রিয় কমিক্সের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ। এই কমিক্স তাঁকে অসম্ভব জনপ্রিয় করেছে। তবুও তিনি থেমে যাননি। এগিয়ে চলাই যে তাঁর জীবনের মন্ত্র। নতুন থেকে নতুনতর অথবা আনন্দের খোঁজ করাই তাঁর জীবনের ব্রত। 'বাঁটুল দি গ্রেট' এর ষাট বছর পূর্তির সময় রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

তাঁর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় চরিত্র হলো 'বাঁটুল দি গ্রেট' এর বাঁটুল। বাঁটুলের গল্পগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে নারায়ণ দেবনাথের কৌতুককর সংলাপ সৃষ্টির মাধ্যমে। তাঁর পরিচয় কৌতুককর গল্পকার হিসেবে। যার নিদর্শন কাহিনীগুলির সংলাপের মধ্যেই রয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যখনই দেশের যুদ্ধ চলছে তখনও এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাঁটুলকে আমরা সক্রিয় হতে দেখি। পাকিস্তানের যুদ্ধ ট্যাংক যখন আসছে সেটাকে বাঁটুল ধ্বংস করছে। ওরা যখন কামানের গোলা ছুঁড়ছে, তখন সেটাকে ধরে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে বাঁটুল। ওদের প্লেন যখন বোমা ফেলতে এদিকে আসছে বাঁটুল সেই প্লেন চেপে ধরে আটকে দিচ্ছে। অসম্ভব শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী নারায়ণ দেবনাথের বাঁটুল।

কেবল অসম্ভব শারীরিক শক্তিরই অধিকারী নয় বাঁটুল। তার অভিজ্ঞতাও আছে। পথে যেতে যেতে তার মনে হলো গরম জলের দ্বারা স্নান দরকার। একটু এগিয়ে দেখতে পেল পথের পাশে কয়েকটি পাইপের উপর রয়েছে একটি জলের ট্যাঙ্ক। এবার সে কিছু কাঠ সংগ্রহ করে পাইপের নিচে আগুন ধরিয়ে দিলো। আর মাঠের ভেতর দেখল অনেক নুড়িপাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মুখ ভর্তি করে সেই নুড়িপাথরগুলি তুলে দিয়ে ট্যাংকের তলার দিকে ছিটিয়ে দিলো। তারপর ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেলে বাঁটুল তার নিচে দাঁড়িয়ে চমৎকার ওই গরম জলে স্নান করে নিল।

নগর, গ্রাম, পাহাড়, সমুদ্র, গলি, রাজপথ – সবকিছুর ছবি এসেছে নারায়ণ দেবনাথের সৃষ্টিতে। আর এভাবেই 'বাঁটুল দি গ্রেট' বাঙালি জীবনে ওতোপ্রোতভাবে

জড়িয়ে গেছে। পুলিশ, আইনের কর্তা, দারোগা, হাবিলদার, শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ভূত কোন চরিত্রই বাদ যায়নি তার কমিক্স থেকে। পাম্পের কর্মী, সেলসম্যান প্রভৃতি অসংখ্য চরিত্র ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর 'বাঁটুল দি গ্রেট' এ। আর সব চরিত্রই এসেছে বাঁটুল চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। বাঁটুলের চেহারা, আচরণ, তার কার্যকলাপ কেবলমাত্র শিশু ও কিশোর পাঠকদের মনেই নয়, আপামর বাঙালি পাঠক মনে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হয়ে আছে নারায়ণ দেবনাথের অসাধারণ সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি একাধারে কমিক শিল্পী, গ্রন্থ আলংকারিক শিল্পী ও বিরল প্রতিভার অধিকারী একজন শিশু এবং কিশোর সাহিত্যিক।

তথ্যসূত্র :

১) গরাই, প্রদীপ ও ঘোষ, শান্তনু, (সম্পাদনা), 'নারায়ণ দেবনাথ - কমিক্স সমগ্র-৩', দ্রষ্টব্য: 'গ্রন্থচিত্রণ ও নারায়ণ দেবনাথ', পৃঃ viii।
২) লাহিড়ী, চন্ডী ও ঘোষ, শান্তনু, (সম্পাদনা),'নারায়ণ দেবনাথ - কমিক্স সমগ্র-২', পৃঃ ৩৪।
৩) গরাই, প্রদীপ ও ঘোষ, শান্তনু, (সম্পাদনা), 'নারায়ণ দেবনাথ - কমিক্স সমগ্র-৩', পৃঃ ৫৬।
৪) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।
৫) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

গ্রন্থপঞ্জী :

১) দেবাশিষ দেব ও শান্তনু ঘোষ (সম্পাদনা), 'নারায়ণ দেবনাথ – কমিক্স সমগ্র-১', নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১১।
২) চন্ডী লাহিড়ী ও শান্তনু ঘোষ (সম্পাদনা), 'নারায়ণ দেবনাথ – কমিক্স-সমগ্র-২', নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০১১।
৩) প্রদীপ গরাই ও শান্তনু ঘোষ (সম্পাদনা), 'নারায়ণ দেবনাথ - কমিক্স সমগ্র-৩', নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস, কলকাতা- ৯, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১৩।

বঙ্গ-ভঙ্গ প্রসঙ্গে নমঃশূদ্র আন্দোলন

তন্ময় জোদ্দার
আংশিক সময়ের অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সোনারপুর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : গুপ্তযুগে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের ফলে সমাজে বর্ণশংকর পদ্ধতি প্রচলিত হয়। ব্রাহ্মণ কন্যা ও শূদ্র পুরুষের বিবাহের ফলে (প্রতিলোম) উদ্ভূত সন্তান চন্ডাল হিসাবে পরিচিত লাভ করে। পূর্ববঙ্গের ছয়টি জেলা – বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোহর, ময়মনসিংহ, খুলনা, ঢাকা ছিল মুখ্য নমঃশূদ্র অধ্যূষিত অঞ্চল। **১৯০৫** সালের **১৯**শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষনা করা হলে **১৯০৫** সালের **৭** আগস্ট স্বদেশী আন্দোলনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষনা করা হয়। অম্বিকাচরণ মজুমদার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে এই আন্দোলনে সামিল করতে সচেষ্ট হলে প্রথমে তারা অংশগ্রহণে সম্মত হলেও পরবর্তীকালে তাদের নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে আন্দোলনে সামিল না হয়ে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করে তাদের নিকট থেকে কিছু কিছু সরকারি সুযোগ সুবিধা আদায়ে সক্ষম হয়।
সূচকশব্দ : অনুলোম, প্রতিলোম, ব্রাহ্মণ্যবাদী, চন্ডাল, নমঃশূদ্র, মতুয়া, স্বদেশী, আলিঙ্গন, সংরক্ষণ, নলখাগড়া।

মূল আলোচনা :

গুপ্তযুগে শাসকশ্রেণীর মধ্যে স্মৃতির অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত হওয়ায় সমাজে বর্ণশংকর পদ্ধতি প্রচলিত হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে ব্রাহ্মণকন্যা ও শূদ্র পুরুষের বিবাহের (প্রতিলোম) ফলে উদ্ভূত সন্তান 'চন্ডাল' নামে পরিচিতি হত।[১] মনু যাজ্ঞবল্ক, বৃহস্পতি, পরাশর, চব্যন, দেবল প্রমুখ স্মৃতি শাস্ত্রকারগন একবাক্যে চন্ডালদের অস্পৃশ্য ও অশুচি বলে ঘোষণা করেছেন।[২] ফা-হিয়েনের বর্ণানুসারে মধ্যদেশে চন্ডালদের নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের সীমানার বাইরে বাস করতে হত এবং নগরে প্রবেশ করলে দূর থেকে কাঠে কাঠে শব্দ করে অন্যের স্পর্শ এড়িয়ে যেতে পারত। চন্ডালগণ একমাত্র শিকার ও মৎস্য ব্যবসা করত। হিউয়েন সাঙ এর বর্ণনানুসারে জল্লাদ, কসাই, ঝাড়ুদার প্রভৃতিদের বসবাসের জন্য নগরীর বাইরে একটি নির্দিষ্ট এলাকা ছিল।[৩]

সেন আমলে, বিশেষত বল্লাল সেন এর শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আধিপত্যের কাছে নতিস্বীকার না করে চন্ডাল আশ্রয় নেয় বর্তমানকালের যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি নদীনালা, খালবিল, নলখাগড়া জঙ্গলপূর্ণ দুর্গম অঞ্চলে।[৪] **১৮৭২** সালে চন্ডালগণ বাখরগঞ্জ জেলায় জাতপাতের বিরুদ্ধে প্রথম

আন্দোলন করে এবং এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল উচ্চশ্রেণীর সাথে সর্বপ্রকার অসহযোগিতা করা। এর পরবর্তীকালে চন্ডালগণ সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে ছিল যে, সরকারী সেরেস্তার যাবতীয় কাগজপত্রে তাদের জাতির নাম নমঃশূদ্র লিখতে হবে।[৫] ১৮৮১ সালে শ্রীহট্টের ব্রিটিশ সহ-কমিশনার এক সরকারী নির্দেশ নামায় আদেশ দেন যে চন্ডাল এর পরিবর্তে নমঃশূদ্র লিখতে হবে এবং যে না লিখবে তাকে চাকুরি থেকে বহিস্কার করা হবে। ১৯১১ সালের সেন্সাস প্রতিবেদন এ 'চন্ডাল' এর পরিবর্তে নমঃশূদ্র লেখা হয়।[৬]

সংখ্যায় নমঃশূদ্ররা ছিল পূর্ববঙ্গের সর্বাপেক্ষা বড় জনগোষ্ঠী এবং সমগ্র বঙ্গদেশে তাদের স্থান ছিল দ্বিতীয়। পূর্ববঙ্গের ছয়টি জেলা বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোহর, ময়মনসিংহ, খুলনা, ঢাকা ছিল মুখ্য নমঃশূদ্র বসতি এবং সবথেকে বেশী মানুষ বাস করত পশ্চিম বাখরগঞ্জ এবং দক্ষিণ ফরিদপুরের জলাভূমি ও অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে।[৭] ১৮১২ সালের ১৩ই মার্চ এবং ১৮৪৬ সালের ১৩ই মার্চ তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার এবং বর্তমানে বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সফলাডাঙ্গা গ্রামে এক নমঃশূদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যথাক্রমে হরিচাঁদ ঠাকুর (হরিদাস) এবং তার সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুর বৈষ্ণবধর্মের অনাচার ও সর্বপ্রকার আর্থ-সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধাচরণ করে পরিশোধিত করে উদার মানবতার বাণী উর্ধ্বে তুলে প্রবর্তন করেন 'মতুয়া ধর্ম'। এটি মূলত দলিত নিপীড়িত নমঃশূদ্র জনসমাজের চেতনা জাত প্রতিবাদী ধর্ম, নমঃশূদ্রগণ দলে দলে মতুয়া বর্ণে আকৃষ্ট হয়।[৮]

১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের পর স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট প্রশাসনিক অজুহাতে বাংলা ভাগের প্রস্তাব দেন। ১৮৭৪ সালে আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রধান কমিশনার নিয়ন্ত্রিত একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়।[৯] ১৮৯২ সালে দক্ষিণ লুসাই পার্বত্য অঞ্চলকে বাংলা থেকে নিয়ে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব আশে এবং ১৮৯৬-৯৭ সালে বিষয়টি বিশদ আলোচিত হয়। বঙ্গভঙ্গের বিষয়টি ১৯০১ সালে নতুন করে আলোচিত হয় মধ্যপ্রদেশের তদানিন্তন কমিশনার স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের একটি প্রস্তাব থেকে।[১০] অ্যান্ড্রু ফ্রেজার লেফটেন্যান্ট গভর্নর রূপে নিযুক্ত হওয়ার পর কার্জন তাঁকে প্রাদেশিক সীমান্ত পুনঃবিন্যাসের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা পেশের নির্দেশ দেন। ফ্রেজার ১৯০৩ সালের ২৮ মার্চ কার্জনের নিকট যে নোট পেশ করেন তাতে চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব থাকে। ১৯০৩ সালের ১লা জুন কার্জন এই পরিকল্পনার উপর একটি বিস্তারিত নোট তৈরি করেন এবং ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর দলিলটি 'রিজলে পেপার' নামে সাধারন্যে প্রকাশিত হয়।[১১] ১৯০৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি এই প্রস্তাব ইংল্যান্ডে পাঠানো হলে ১৯০৫ সালের ৯ জুন ভারত সচিব ব্রডরিক তাঁর নির্দেশনামায় বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিন ধার্য হয় এবং ঐ দিনই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হয়।[১২]

১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের কথা জনসমক্ষে এলে বিভিন্ন স্তরের বাঙালি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত ঘোষনাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য প্রতিবাদ সভা সংঘটিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পৃথ্বীশচন্দ্র রায় প্রমুখ নেতারা বেঙ্গলি হিতবাদী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার চালায়। ১৯০৩-০৫ সাল পর্যন্ত স্মারকলিপি আবেদন নিবেদন, বক্তৃতা, জনসভা সংবাদপত্রে লেখালিখি পায়।[১৩] বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ উপেক্ষা করে কার্জন ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট স্বদেশ' আন্দোলনের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষিত হয়। বঙ্গভঙ্গের দিন সমগ্র বাংলায় অরন্ধন, রাখিবন্ধন ও শোকদিবস পালিত হয়। নরমপন্থী ঐতিহ্যের প্রভাব যুক্ত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিনটি পৃথক ধারার গঠনমূলক স্বদেশী, রাজনৈতিক চরমপন্থী বা নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ কৌশল এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ এর সূচনা হয়।[১৪]

আগুনঝাড়ার ভেগাই হালদার এই আন্দোলনকে সমর্থন করে আন্দোলনকে তীব্র করতে অশ্বিনী দত্তের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রতিবাদ পত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। তিনি এই সময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন বসু, আব্দুল রসুল, ফজলুল হক প্রমুখ নেতার সান্নিধ্যে এসে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে স্বদেশী আন্দোলনে সামিল করতে সচেষ্ট হয়।[১৫] স্বদেশী আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ভেগাই হালদারের মাধ্যমে বিরাট সমাবেশ আয়োজিত হলে তাঁর আহ্বানে বরিশাল, খুলনা ও যশোহর থেকে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা যোগ দেয়।[১৬]

স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ফরিদপুরের উকিল অম্বিকাচরণ মজুমদার উপলব্ধি করেন দেশের মাটির সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মানুষকে যদি এই আন্দোলনে সামিল করা যায় বিশেষ করে ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের জেলা সমূহের বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে যুক্ত করা যায় তবে এর গতি আরো দুর্বার হবে। তিনি নমঃশূদ্র যোদ্ধাদের সৈনিক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ওড়াকান্দির সন্নিকটস্থ ঘৃতকান্দি গ্রামে সেখানকার কায়স্থ ও ব্রাক্ষণদের সাহায্যে স্বদেশী আন্দোলনের স্বপক্ষে সভা অনুষ্ঠিত করে নিজ বাগ্মিতা গুনে পার্শ্ববর্তী এলাকার নমঃশূদ্রদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।[১৭]

অম্বিকাচরণ মজুমদার এই সভাতে আহ্বান জানান যে সকলে যেন একত্রিত হয়ে দেশমাতার মর্যাদা রক্ষার্থে আন্দোলন অংশ নেয়। তাঁর বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নমঃশূদ্রগণ স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হলেও তিনি জানতেন নমঃশূদ্র নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুরের সম্মতি ব্যতিত এই কাজ অসম্ভব। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে অম্বিকাচরণ নমঃশূদ্রদের সম্বোধন করে অনুরোধ করেন তাঁরা যেন একত্রে সমগ্র বিষয়টি গুরুচাঁদকে জানিয়ে তাঁর সম্মতি নেয়।[১৮] সভাশেষে নমঃশূদ্রগণ দলে দলে

পতাকা হাতে নিয়ে স্বদেশী গান গাইতে ওড়াকান্দিতে গুরুচাঁদের নিকট উপস্থিত হয়। অম্বিকাচরণের পরামর্শ মতো নমঃশূদ্রগণ গুরুচাঁদকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের ইচ্ছা জানালে গুরুচাঁদ তাদেরকে চপলমতি বালকের ন্যায় স্বদেশী সাজায় এই সিদ্ধান্ত নিবুর্দ্ধিতার নামান্তর মাত্র আখ্যা দেন। তিনি বলেন যারা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত করতে চায় তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা প্রয়োজন। গুরুচাঁদের মতে স্বদেশী আন্দোলন ভালো, কিন্তু শিক্ষিত, উচ্চশ্রেণীর মানুষ যারা স্বদেশ, স্বদেশী বলে চিৎকার করছে তারা দেশ বা জাতির স্বার্থ বা ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় নিম্নশ্রেণীর মানুষকে আন্দোলন সামিল কেন করতে চায় তা ভাবা উচিত। তিনি তাঁর পুত্র শশীভূষনকে নির্দেশ দেন নমঃশূদ্রদের স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে অবগত করতে।[১৯]

শশীভূষণ নমঃশূদ্রদের নিকট যে ব্যাখ্যা দেন তার সারমর্ম ছিল স্বদেশী মানে শুধু মাটির মুক্তি নয়, মাটির মানুষ ও তার সার্বিক মুক্তির আন্দোলনই হল প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলন। তাঁর মতে উচ্চশ্রেণীর মানুষ যারা স্বদেশী ডাক দিয়ে নিম্নশ্রেণীর মানুষের নিকট উপস্থিত হয়েছে তাদের আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ কতটা উপস্থিত হয়েছে তাদের আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ কতটা তা সর্বাগ্রে বিবেচ্য, যাদের খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ, শিক্ষা নেই এবং যারা কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং বঞ্চিত তাদের নিকট উচ্চশ্রেণীর মানুষ শরনাপন্ন হলে ও বিপদ কাটার পরে তারা সব ভুলে যাবে।[২০] সমবেত নমঃশূদ্রগণ ক্ষমা চেয়ে স্বদেশী মনবাসনা ত্যাগ করে গুরুচাঁদের নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন হরিচাঁদের আশিসে নমঃশূদ্র সমাজে যে চেতনার সঞ্চার হয়েছে এবং যে একত্রতা গড়ে উঠেছে কোনো প্রলোভনেই তা নষ্ট করা উচিত নয়। তিনি আরো বলেন যারা দেশ জানে ও দেশের খবর রাখে তারা একত্রিত হয়ে স্বদেশী সাজুক। নমঃশূদ্রগণ দরিদ্র, অন্নহীন, ঋণগ্রস্ত এবং দেশ ভাগ হলে বা জোড়া লাগলে তাদের কোনো লাভ নেই। তিনি আরো বলেন ব্রিটিশ সরকার সর্বদা সাম্যের সাধক ও তাদের সাহায্যেই একমাত্র নমঃশূদ্রদের সার্বিক উন্নতি সম্ভব, ভদ্রলোকদের দ্বারা নয়।[২১]

স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর যে পত্র পেয়েছেন তার কথা ও স্বীকার করেন এবং একটি উত্তরপত্র ও প্রেরণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন নমঃশূদ্র অত্যন্ত দরিদ্র হওয়ায় তারা বিলাস ব্যসনে অভ্যস্থ নয় এবং এরা বাধ্য হয় সস্তার বিলাতি কাপড় ক্রয় করতে। শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় যারা বিলাস ব্যসনে ব্যস্ত, স্বদেশী সাজতে হলে তারা যেন সাজে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অধিকার ও নেই। এই সমস্যার সমাধান একমাত্র সম্ভব যদি উচ্চসম্প্রদায় নমঃশূদ্রদের যথাযথ সম্মান দেয় ভাই মনে করে বুকে টেনে নেয়।[২২] সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী গুরুচাঁদের পত্র পাওয়ার পর পুনঃরায় পত্র দ্বারা ওড়াকান্দি আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে গুরুচাঁদ হরিচাঁদের আদর্শ স্মরণ করিয়ে তাঁকে আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে বলে অনুরোধ করেন এই আন্দোলন সফল করায় আগে সমস্ত ভারতবাসীর সমস্যা ও ভেদাভেদ দূর করতে।[২৩]

নমঃশূদ্রগণ স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করার পরিবর্তে তাদের চাকরিতে সংরক্ষনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে নানা সুযোগ আদায়ের জন্য আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে দূরে রাখে। নমঃশূদ্রগণ নানা সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য ১৯০৬ সালের ২রা অক্টোবর ব্রজেন্দ্রনাথ মন্ডলের সভাপতিত্বে এক সমাবেশের আয়োজন করে। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার পর পূর্ব বাংলার লেফটেন্যান্ট গর্ভনর স্যার ল্যাস্টটহের ১৯০৭ খ্রি ফেব্রুয়ারি মাসে "Proportional Representation of Communities of Public Employment Act" ঘোষনা করে এবং এর দ্বারা মুসলিম ও দলিত হিন্দুরা সংরক্ষণ পায়। সংরক্ষন প্রথার মাধ্যমে ১৯০৭ সালে শশীভূষণ সাব-রেজিস্টার এর চাকুরি পায় এবং ১৯০৮ সালে কুমুদ বিহারী মল্লিক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। এইভাবে নমঃশূদ্রগণ স্বদেশী আন্দোলনে অংশ না নিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করে তাদের নিকট থেকে বিবিধ সরকারী সুযোগ সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়।[২৪]

সূত্রনির্দেশ:

১. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১২৩।

২. ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, ভারতের আর্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৫, পৃ. ১৫৩।

৩. রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা ২০০১, পৃ. ৪০-৪১।

৪. কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল (সম্পাদনা) মতুয়াধর্ম প্রসঙ্গে, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা ২০১০, পৃ. ৬৬।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৮. মহানন্দ হালদার, শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত, মতুয়া মহাসংঘ, ঠাকুরনগর, ২০০৯, পৃ. ৪৯

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

১১. Sumit Sarkar, The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908, People's Publishing House, Calcutta 1973, P-9

১২. সিদ্ধার্থ গুহরায় এবং সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারতের ইতিহাস ১৭০৭-১৯৬৪, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০১২, পৃ ৬১৪-৬১৫

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৭০
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৬
১৫. নরেশ দাস, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ, কলকাতা-১৯৬১, পৃ. ৫২-৫৪
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১১
১৭. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার অনুন্নত সমাজ, নিখিত ভারত কলকাতা- ২০১১, পৃ. ৫৯-৬০।
১৮. কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮-১৭০
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৭৩
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮
২২. মহানন্দ হালদার প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩১৯

সাঁওতাল বিদ্রোহ : পাঠ ও বিশ্লেষণ

রামকৃষ্ণ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা নাট্যচর্চার এক বিশেষ মুহূর্তে নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। গণনাট্য সংঘের সেই গতিবেগ তখন কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে এসেছে। তবু গণনাট্যের আদর্শকে সামনে রেখে সমকালীন নাট্যকারা তাদের নিজস্ব নাট্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই গণনাট্যের আদর্শগত জঠরেই গড়ে উঠেছিল গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন,যার অন্যতম পুরোধা ছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বল্পায়ূ জীবনে অজিতেশ আজীবন গণ ভাবনাকেই তার নাট্য আন্দোলনে স্থান দিয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন কিভাবে গণ-আন্দোলনকে অগণিত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় নাটকের মাধ্যমে। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক গুলির মধ্যে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' অন্যতম পূর্ণাঙ্গ নাটক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সকল আদিবাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো সাঁওতাল বিদ্রোহ। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত সাঁওতাল বিদ্রোহ ঐতিহাসিক দিক থেকে শুধু নয়, সমকালীন রাজনৈতিক দিক থেকেও ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিহারের ভাগলপুর থেকে রাজমহল পাহাড় তৎকালে পরিচিতি পেয়েছিল 'দমন-ই –কোহ' নামে। ব্রিটিশ শাসক শুধু নয়, সমকালীন সামন্ততান্ত্রিক তকমায় অভিধেয় জমিদার, মহাজন, নায়েব-গোমস্তা, পুলিশ, পাইক -বরকন্দাজ প্রভৃতির কাছ থেকে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল সাঁওতাল আদিবাসীদের। সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে তাদের মরণপণ সংগ্রাম চিরস্মরনীয়। তাদের দৃঢ়পণ ছিল বিদেশি শত্রু বা 'দিকু'-দের শাসন মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা। সেই সাঁওতাল বিদ্রোহের স্বরূপ আলোচনাই আলোচ্য নাটকের মূল অবলম্বন । ইতিহাস সময়ের সঙ্গে ফুরিয়ে যায় না, ইতিহাস তার গুরুত্বের আবেদনে বারবার ফিরে ফিরে আসে আমাদের মাঝে । নাট্যকার যখন এই নাটক লিখছেন তখন সাঁওতাল বিদ্রোহের পর ১০০ বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। নাট্যকার দেখালেন সময়ের বদল ঘটে, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আসে কিন্তু শাসক-শাসিতের মনোমালিন্য কিছুতে ঘোচেনা। অন্তঃশীলা নদীর মত সেই জটিল মনস্তত্ত্বের ব্যবধানগত বৈষম্য মূলক আচার-ব্যবহার নিয়ম-নীতি থেকেই যায়। তাই এ নাটক ঐতিহাসিক দিক থেকে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি বর্তমান সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

সূচক শব্দ: অজিতেশ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ইতিহাস, ইংরেজ, জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, মহাজন, সিধু-কানু, সম্মিলিত প্রতিবাদ, প্রাসঙ্গিকতা।

মূল আলোচনা :

বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল অজিত বন্দোপাধ্যায়। ১৯৩৩ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর মানভূম জেলার রোপা গ্রামে জন্ম। ছাত্র জীবন থেকেই নাটক রচনা ও অভিনয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। স্বল্প আয়ুষ্কালে বিচিত্র কর্মজগতে অজিতেশের অনায়াস বিচরণ লক্ষিত হয়। নাটকের প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, নাট্যকার, অনুবাদক, সুরকার, গীতিকার, ইত্যাদি নানান জগতে তার যাতায়াত ছিল। প্রায় ৪০টি নাটকের তিনি কখনো নির্দেশক, কখনো অভিনেতা আবার কখনো নির্দেশক এবং অভিনেতার ভূমিকায় লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর জন্মের ১০ বছর পর যে ফ্যাসীবিরোধী প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে আমাদের দেশে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল, তার প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। তবু কমিউনিস্ট পার্টির ভাবাদর্শে গঠিত আই.পি.টি.এ. সংঘের সমস্ত আদর্শকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। সেই মতবিরোধের জন্য গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করে, ১৯৬০ সালের ২৯শে জুন 'নান্দীকার' নামে একটি গ্রুপ থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন। নিজের কর্মদক্ষতা এবং একাগ্রতার গুনে অনতিকালের মধ্যে নান্দীকারের হাত ধরে অজিতেশ মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিলেন। নাট্যকার হিসেবে মৌলিক, অনুবাদ এবং একাঙ্ক মূলক নাটকেই তিনি লিখেছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণের মতোই তাঁকে অতীতের দলভুক্ত করে আমাদের উদাসীন থাকাটাও অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নাটকটি তিনি নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনেই লিখেছিলেন। এটি সাল্পায়তনের ঐতিহাসিক নাটক। ইতিহাস সচেতন পাঠক-পাঠিকারা অবশ্যই সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত আছেন। তবু আলোচ্য নাটকের মর্মোদ্ধারে ও নাট্যকারের অভীপ্সা সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে ভূতপূর্ব সেই ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। পঞ্চাশের দশকের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার ছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই আন্দোলনের সঙ্গে তার থিয়েটারও যুক্ত হয়েছিল নতুন মাত্রায়। সমকালে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে বিভিন্ন বস্তি ও শিল্পাঞ্চলে তিনি কাজ করে গেছেন একনিষ্ঠ ভাবে। এরই পাশাপাশি থিয়েটার ভাবনা ওতপ্রোতঃভাবে মিশে গিয়েছিল তার সমগ্র সত্ত্বাজুড়ে। এই সময়েই দমদম অঞ্চলের পাঁচটি নাট্য শাখা মিলে নির্মিত হয় একটি কেন্দ্রীয় কমিটি। উল্লেখ্য এখানেই সর্বপ্রথম অভিনীত হয় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নাটক।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস: বিদেশীদের আয়ত্তে থাকা ভারত জননীর স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল আদিবাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আমরা কম বেশি সকলেই সচেতন। উল্লেখ্য, ভারতের আদিবাসী অধুস্যিত অঞ্চলের এহেন জনমানবরা শুধুমাত্র পরাধীনতার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হননি, সমাজের বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশাদারী মানুষেরা এইসব অসহায় মানুষদের রক্ত শোষণে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই বাধ্য হয়েই তাদেরকে বেছে নিতে হয়েছিল প্রতিরোধের দুর্গম পথকে। নিপীড়িত, নির্যাতিত,

অসহায় আদিবাসীরা বুঝেছিল শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া বিকল্প পথ আর কিছুই নেই। এবং তারা বোধহয় এও জানত প্রতিপক্ষের আগ্নেয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালানও সম্ভব নয়। একদিকে আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত ট্রেনিংপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনী অন্যদিকে বাঁশ, পাথর, কুঠার বর্ষা তীর ধনুকের মতো লৌকিক অস্ত্রসাজে সজ্জিত নারী -পুরুষের একটা দঙ্গল। তবুও আত্মসমর্পণ নয়, সেই অসম লড়াইয়ে প্রাণের বিনিময়ে তারা মাতৃমুক্তি ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল।

লোকবিশ্বাসের ভিত্তিভূমি সুদীর্ঘ ছিল আদিবাসীদের। তারা বিশ্বাস করত, তাদের ওপরকার এই নির্যাতনের প্রতিবাদে মুখরিত হতে এবং নেতৃত্ব দিতে তাদের এই সমাজে জন্ম নেবে এক অলৌকিক ক্ষমতাধারী মহামানব। যার মাধ্যমেই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারবে ও ‘দিকু ‘দের যথার্থ মোকাবিলা করতে পারবে। সেই মহামানবই হল সিধু। যার নেতৃত্বে অগণিত সাঁওতালগণ লড়াই করেছিল অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসক, জমিদার, মহাজন, নায়েব -গোমস্তাদের বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, মুক্ত বিদ্রোহের বীরসা মুন্ডা, কোল বিদ্রোহের বুদ্ধ ভগত ও দয়া ভগত, চুয়াড় বিদ্রোহের জগন্নাথ সিং, খাসি বিদ্রোহে তিরুৎ সিং এর কথা ।

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) নানান দিক থেকে ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাঁওতালদের বাসভূমি ছিল বিহারের ভাগলপুর থেকে রাজমহল পাহাড় ।এই অঞ্চলে বসবাসকারী সাঁওতালদের দৃঢ়পণ বিদেশী শত্রু বা দিকু’দের শাসন মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা।

সাঁওতালরা এইসব ‘দিকু’ ও সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণ, মিথ্যাবাদী চোর মাতাল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতো বলে মনে হয় না। ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী, ১৮৫৪ সালে সাঁওতাল সর্দাররা, মাঝি ও পরগণিতরা মিলিত হয় বিদ্রোহের সম্ভাব্য আলোচনা-কল্পে। পরে পরেই তারা কর্মসূচি অনুযায়ী জমিদার বা মহাজনদের বাড়িতে চুরি ডাকাতির মত বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটায়। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ৩০ শে জুন আদিবাসী নেতারা ৪০০ গ্রামের প্রায় ছয় হাজার সাঁওতালদের নিয়ে ভাগনিদিহিতে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় বহিরাগত তথা ‘দিকু’দের হাত থেকে মুক্তিকল্পে সচেতন ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে। উদ্দেশ্য, সত্যের শাসন ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা।

আগেই উল্লেখ করেছি আদিবাসীরা বিশ্বাস করতেন তাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পিছনে স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদ রয়েছে। তিনি প্রয়োজন মত দুষ্টের দমন কালে যথার্থ প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন । সাঁওতালদের কাছে সেই কাঙ্খিত প্রতিনিধি হলেন সিধু ও তার ভাই কানু। এবং এই ভ্রাতৃদ্বয় দাবি করেছিলেন ভগবান তাদের দেখা দিয়ে বলেছেন, অস্ত্র হাতে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হবে। এক ঘোষণায় সিধু জানান – “ঠাকুর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এই দেশ সাহেবদের নয়।”[১]

ক্রমান্বয়ে সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমূহে। সংগঠিত মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদী সাঁওতালী কণ্ঠস্বরে মুখরিত হয় সমগ্র অঞ্চল। সাঁওতালবাহিনী পরিকল্পনা মাফিক জমিদার মহজনদের বাড়ি-ঘরে ও তাদের আশ্রয়স্থল, পুলিশ ও তাদের আবাস স্থলে আক্রমণ চালায়। রেলপথ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ডাক গাড়ি ধ্বংস করা প্রভৃতি বিদ্রোহমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। বিদ্রোহের ব্যাপ্তিতে সেদিন ভীত হয়েছিলেন ব্রিটিশ প্রশাসন। নির্মমভাবে দমন করেছিল তারা সেই বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের ১৫ হাজারের বেশি সাঁওতাল নিহত হয়েছিল সেই অসম যুদ্ধে। বিশ্বাসঘাতকের দুরভীসন্ধিতে ধরা পড়ে সিধু। ১৮৫৫ সালের আগস্ট মাসে তাকে হত্যা করে ব্রিটিশ প্রশাসন। আর ১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধরা পড়েন বিদ্রোহের অন্যতম নেতৃত্ব কানু। অস্তমিত হয়ে আসে বিস্তৃত জঙ্গলমহলে সেই অসহায় আদিবাসীদের সম্প্রদায়ের স্বপ্ন –সাধনা, অস্তিস্ব রক্ষার লড়াই।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’ নাটক । নাটকে লেখার পিছনে অবশ্যই নাট্যকারের থিয়েটার ভাবনা লুক্কায়িত ছিল । স্পষ্ট ভাবে বললে এ কথাই বলতে হয়, ছাত্র আন্দোলনের তরুণ তুর্কি ও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী অজিতেশ থিয়েটারের জন্যই রচনা করেছিলেন ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’। ঐতিহাসিক নাটকের লক্ষ্য প্রতিবাদের পথ অবলম্বন করে প্রত্যাশা পূরণের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়া। আলোচ্য নাটকের মূল বক্তব্য তাই। অতএব, এ নাটক শুধুমাত্র নাট্যকারের সশ্রদ্ধ ঐতিহাসিক ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেনি, রূপায়িত করেছে একজন তরুণ নাট্যকর্মীর মানস অভিব্যক্তিকে।

নাটকের ঐতিহাসিকতা: একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করেই লিখিত নাটক ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’। শ্রেণীবিচারে মাপকাঠিতে এটি অবশ্যই ঐতিহাসিক নাটক। তবে ঐতিহাসিকতা বিচারে যাওয়ার আগে এই ধরনের নাট্যকাহিনীর বিশেষত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলা নাটকের গোত্র বিচারে ঐতিহাসিক নাটক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিরস্মরণীয় ঐতিহাসের আধারে পরিবেশিত হয় এই ধরনের নাটক। তত্ত্ববিচার গ্রন্থে নাট্য সমালোচক দুর্গা সংকর মুখোপাধ্যায় এই ধরনের নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন- ''যে নাটকের মূল কাহিনী, প্রধান প্রধান ঘটনা ও চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত এবং নাট্যকারের সৃজনশীল পরিকল্পনার সহযোগে যা মানবিক গুণে মন্ডিত হয়ে শিল্পমূল্যে রসোত্তীর্ণ - তাই হলো ঐতিহাসিক নাটক।''[২]

এই ধরনের নাটক যেসব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সমূহ আত্মস্থ করে সার্থকতার সীমা স্পর্শ করে তা হল:

১. ঐতিহাসিক নাটকের মূল ঘটনা ও প্রধান চরিত্রগুলি সংগৃহীত হয় সিদ্ধ ইতিহাস থেকে।

২. সমকালীন সমাজনীতি, রাজনীতি, প্রথা, আদর্শ - এক কথায় তৎকালীন tone and

temperment যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে নাট্যকারকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়।
৩. ঐতিহাসিক রস যথাযথভাবে রক্ষা করার প্রতি সচেতন থাকেন নাট্যকার।
৪. মনে রাখতে হবে ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে যখন নাট্যকার নাটক লিখছেন তখন নাট্যকারের স্বতন্ত্র কল্পনার অনুরণন সেখানে আসতেই পারে, তবে সে কল্পনা ইতিহাস থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারবে না। নাটকীয় উত্থান-পতন এবং ক্লাইম্যাক্স এর প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করবে।

ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে অবলম্বন করেই লিখিত আলোচ্য সিপাহী বিদ্রোহ নাটকটি এবং নামকরণের মধ্যেও নাট্যকার সেই মহিমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তবে কাহিনীতে ভাঙ্গা-গড়া বা নাট্যকারের মৌলিক চিন্তাভাবনার ছাপ সুস্পষ্ট। আসলে, তিনি চেয়েছিলেন ১০০ বছর পূর্বেকার একটি বিশেষ ঐতিহাসিক আন্দোলনের বিনির্মাণ করতে । নাটকের মূল চরিত্রগুলিও সিদ্ধ ইতিহাস থেকে নেওয়া। পাশাপাশি কাহিনীর প্রয়োজনে যে দুই একটি কল্পিত অনৈতিহাসিক চরিত্র স্থান পেয়েছে তারাও নাট্যকারের দক্ষ মুন্সিয়ানার ছোঁয়ায় ইতিহাসোচিত মহিমায় মহিমান্বিত হয়েছে।

মূলত দুই ধরনের চরিত্র স্থান পেয়েছে আলোচ নাট্য কাহিনীতে। এক. শাসক বা অত্যাচারী সম্প্রদায় এবং দুই শাসিত বা অত্যাচারিদের দ্বারা অত্যাচারিত সাঁওতাল নর নারীগণ। অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন যথাক্রমে ব্রাউন ও রিচার্ডসন এবং এদেশীয় দিকু'দের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মী (মহেশ দারোগা এবং ঈশরী মহাজন। কাহিনীর কেন্দ্রে মূলত একটি সাঁওতাল পরিবারের কথা স্থান পেয়েছে। সেই পরিবারের নব দম্পতিরা হল মংরা এবং তার স্ত্রী সুখিয়া। তুফানি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক। তবে সে আপন জাতি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছে আজীবন। ছকু সাঁওতাল যুবক । পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও বৈভবের প্রতি কিঞ্চিৎ আকর্ষণ রয়েছে তার।

সমকালীন সমাজনীতি, রাজনীতি, প্রথা, আদর্শ প্রভৃতি বিষয় সমূহ আলোচনা নাটকে দুর্লভ নয়। পাশাপাশি সাঁওতালদের সংগ্রামকে কঠোর হাতে দমনের জন্য ব্রিটিশ শাসকদের একাগ্রতা তথা তৎপরতা যথাযথভাবেই উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার আলোচ্য নাট্য কাহিনীর মর্মমূলে। আবার বাস্তব অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিপুন দক্ষতার সঙ্গে আঁকতে সক্ষম হয়েছেন সাঁওতাল সংস্কৃতির সম্যক চালচিত্র। দেবতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, অনুষ্ঠান, সন্ধ্যার আসরে নারী-পুরুষ সবাই মিলে নৃত্য গীত ও মদ্যপানে তৃপ্ত হওয়া, লোকজ বাজনার (মাদল, কাঁসি,) তালে তালে আনন্দে মেতে ওঠা, অনুষ্ঠান উপলক্ষে দলবদ্ধ ভাবে শিকারে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী বিশ্বাসযোগ্য রূপে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। তাই সমুচিত tone and temperment এখানে যথার্থই রক্ষিত হয়েছে।

সর্বোপরি, ইতিহাসের প্রতি গভীর অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়কর বিমুগ্ধতা ছিল নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই ঐতিহাসিক রস সৃষ্টিতেও তিনি দারুণভাবে সফল । অতএব, সবদিক বিচার করে আমরা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'কে যথার্থই ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

নাট্য কাহিনীর গভীরে (প্রথম দৃশ্য): সাঁওতাল পল্লীর এক সান্ধ্যকালীন সংগীতমূখর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাট্য কাহিনী সূত্রপাত। (নাট্যকারের নির্দেশনা- "সাঁওতাল গ্রাম। মংরা সুখিয়ার কুটির। সময় সন্ধ্যা । বাইরে থেকে গান ও মাদলের শব্দ শোনা যাচ্ছে । সুকিয়া তালে তালে দুলছে, মংরার প্রবেশ") যেখানে বেশ কিছু সাঁওতাল নর নারী একত্রিত হয়ে মহুয়ার মদ্যপান ও মাদলের তালে নৃত্য গীতে মাতোয়ারা। তাদের মধ্যে এসে পড়ে মংরা । মংরা সাঁওতাল যুবক । কাহিনীর শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। তার আগমনে আত্মতৃপ্তি বোধ করে স্ত্রী শুখিয়া। উল্লেখ্য এই শুখিয়া সিধু কানুদেরই ঘরের মেয়ে । মংরার সঙ্গে তার সদ্য বিবাহ হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাদের এই দৈনন্দিন জীবনে চাওয়া-পাওয়া, তৃপ্তি, অতৃপ্তি, কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের বাসনা, স্বাধীনতার স্বপ্ন সার্থকতার ইতিবৃত্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে নাট্যকার আপামর সাঁওতাল নর নারীদের চিন্তা ভাবনাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন আলোচ্য কাহিনীতে। সাঁওতাল জাতির মুক্তকল্পে মংরার অবিরাম ছুটে চালায় ভীত হয় নববধূ সুখিয়া। তাই মংরার মুখপানে তাকিয়ে বলে "হে মাঝি, সমাজ সমাজ কইরা তুই কি বাউরা হইয়া যাবি নাকি?[৩]

সুখিয়ার এমন প্রশ্নের সদুত্তর এক কথায় দিতে পারেনা মংরা। তাই নিরলসভাবে ব্যক্ত করে সাঁওতাল সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত । দর্শক-পাঠক অবহিত হতে পারেন সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী জীবন-যাপন ও সমাজ সম্পর্কে। শাল পলাশের বনে তাদের ১০ পুরুষ আগেকার লোকেরা শ্বাপদ–শঙ্কুল হিংস্র জীবজন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে কিম্বা প্রাণদানের মাধ্যমে নির্মাণ করেছেন বসতবাড়ি। মৌহার রসে আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকে পালন করেছে মাঘী পরব। বন্য মহিষের চামড়ার দ্বারা নির্মাণ করা ঢোলক বাজিয়ে নৃত্য গীতের মাধ্যমে রাতও জেগেছেন। আর সেই স্বপ্নের সাঁওতালভূমি ক্রমান্বয়ে হয়ে পড়েছে জমিদার, মহাজন, নীলকর, সাহেব সুবদের মুনাফা লাভের ভিত্তি ভূমি। রেললাইনের কাজ দেওয়ার নামে আড়কাঠিরা ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের । অতএব, দিকুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই মংরাদের কাছে। বিদ্রোহের আগুনে সব অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটানোই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। মংরার বক্তব্যে ফুটে ওঠে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটা সুস্থ স্বাভাবিক সমাজের অধিবাসী রূপে প্রতিস্থাপন করবার রঙিন স্বপ্ন। -'দুখের যা ভোগ তা হামরার জনমেই ফুরায়। হামরার ছেইলাটোকে হামরা সুখ দিবই।'[৪]

তুফানী এ নাটকের বিশেষ একটি নারী চরিত্র । এদেশীয় নারীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বহু শাসক তাদেরকে রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার করেই তৃপ্ত ছিল। তুফানীর মা তেমনি একজন সাঁওতাল রমণী । মায়ের মৃত্যুর পর তুফানী তারই বিধর্মী জন্মদাতা (অবশ্য তুফানী এ সত্য অনেক পরে জানতে পেরেছে) পাগলা সাহেবের কাছেই পালিত হয়েছে। তুফানীর অসহায় জীবন সম্পর্কে মংরা জানায় - "বাপ- মা লাই। পাগলা সাহেবই উয়াকে মানুষ করেছে। বলে কুন নীলকর সাহেব নাকি উহার বাপ। হামরার মায়ের বুকের দুধ টাইনে উ বাইচেছে।"[৫] পাগলা সাহেবের আসল নাম ব্রাউন। যিনি ৫০ বছর ধরে সাঁওতালদের মধ্যে বসবাস করছেন। ধর্মান্তরিতকরণের প্রতিনিধি তিনি। সুখিয়া ও মংরার কথোপকথনে উঠে আসে ব্রাউন সাহেবের কথা। গড যীশুর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সাঁওতালপল্লীর মানুষের কাছে তিনি সমাদৃত 'পাগলা সাহেব' নামে। তবে এ কথা সত্যি, দীক্ষা দেওয়ার কাজে ব্রতী হয়েও এদেশীয় মানুষদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন। সাঁওতালদের জীবন-যাপন- সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর কথাতে – "এখন হামি তুমাদের সাথে হাঁড়িয়া,মহুয়া খাই, মাদল বাজাতে পারি। নাচতে পারি। এখনও কি হামি সায়েব আছি?"[৬]

আলোচ্য নাট্য কাহিনিতেন ছকু একটি বিশেষ প্রতীকি চরিত্র। খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে সে বিলিতি আদব-কায়দা ও স্বাচ্ছন্দ লাভের প্রত্যাশায় উন্মুখ। সুখিয়াকে সে বউ দিদি বলে ডাকে। কথাবার্তা, চালচলনে সাহেবি পালিশ। সাহেবদের জীবন-যাপন, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে সে খানিক অবহিত। মাঝে মাঝে এতদসকল মুখরোচক সংবাদ পরিবেশন করে থাকে সাঁওতাল সমাজে।

কিত্তা'কাকা বয়স্ক অভিজ্ঞ সাঁওতাল। সিধু ও তার ভাই কানুর আগমন সংবাদের তিনি কৌতূহলী। মুঙ্গেরে মংরার সঙ্গে সিধু'র কি কি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে তা জানতে চেয়েছেন মংরার কাছে। সাঁওতালদের ওপর বিদেশী ও এদেশীয় দিকু'দের অত্যাচারের স্বরূপ প্রতিমূর্ত হয়ে ওঠে তাদের আলোচনাতে। কোন পথে আন্দোলন চলবে - এ সম্পর্কে আলোচনা কালে সিধু ও কানু এসে উপস্থিত হয় তাদের মধ্যে । আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। সিধু জানায়, তাদের চলা-ফেরা ও কাজ- কর্মের প্রতি প্রশাসন তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। তার কথাতে – "দিঘির মহেশ দারোগা আসিছে আইজ রাইতে উ একবার ঢুঁড়ে যাবেকই। হামরা ইখানে আসিছি কিনা।..."[৭]

সিধু'র আশঙ্কা ঠিক ছিল। অনতিকালের মধ্যেই এসে হাজির হয়েছে মহেশ দারোগা, সঙ্গে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত অফিসার রিচার্ডসন ও পদলেহী ঈশরী মহাজন। কোম্পানিকে প্রদেয় খাজনা পরিশোধ, বিনা অনুমতিতে জঙ্গলের গাছ না কাটা ও শিকার না করার হুকুম জারি করে ঈশরী মহাজন সাঁওতালদের উদ্দেশ্যে। টানটান উত্তেজনায় বাক বিনিময় হয় তাদের মধ্যে।

দ্বিতীয় দৃশ্য: সাঁওতালদের উদ্দেশ্যে প্রাজ্ঞ কিত্তা কাকার ভাষণের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরু তার সুদীর্ঘ ভাষণের মাধ্যমে দর্শক পাঠক বহু বিষয়ে অবহিত হওয়ার সুযোগ পান। দিকু'দের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যাওয়া, জমিদারদের খাজনা মুকুবের ছলনাতে দারিদ্র্যতার কষাঘাতে জর্জরিত হওয়া, আড়কাঠিদের কবলে পড়ে সাঁওতাল যুবকদের নিরুদ্দিষ্ট হওয়া, বভা'র দর্শন ও নির্দেশ মতো বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হওয়া, মাঘ পরবের সংস্কৃতিকে মান্যতা দেওয়া-সাঁওতালদের আসু কর্তব্য - প্রভৃতি বিষয়গুলি স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয় কিত্তা'র কণ্ঠে।

ইতিমধ্যে ঘরে ঘরে লড়াইয়ে ময়দানের নামার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সাঁওতাল নর -নারীরা। সুখিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মংরা বেরিয়ে পড়ে যুদ্ধের ময়দানে। আন্দোলনের নায়ক সিধু'র কাছে সে জানতে পারে ব্রিটিশ সৈনিকদের নৃশংস আক্রমণের কথা। তুফানীযও সহযোদ্ধা হতে এগিয়ে আসে। ওদিকে পাগলা বাবা খুঁজতে থাকেন তুফানীকে। বহু অনুসন্ধানের পর তুফানীকে খুঁজে পেয়ে তাকে ঘরে ফেরার আহ্বান জানান পাগলা (ব্রাউন) বাবা। কিন্তু তুফানী ঘরে ফিরতে চায় না। আপন জন্মভূমির মুক্তিকল্পে সেও ভূমিকা নিতে চায় । বহুক্ষণ কথোপকথন চলে সুখিয়া, তুফানি ও ব্রাউনের মধ্যে।

অনতিকালের মধ্যে ঈশরী মহাজন এসে হাজির হয় তাদের মধ্যে। সঙ্গে পুলিশ কর্তা মহেশ দারোগা। উদ্দেশ্য সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়কদ্বয় সিধু ও কানুকে স্তব্ধ করা। তাদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু হয় সুখিয়া ও তুফানীর । মহেশ দারোগার ঝাঁঝালো কুট ইঙ্গিত সহ্য করতে পারেনা তুফানী। সমস্ত দেহ -মন বিষে ওঠে তার। মনে হয় শত্রু পক্ষের অন্তত দু একজনকে খতম করতে পারলেই মাতৃভূমির ঋণ অন্তত কিছুটা শোধ হবে । মুহূর্তের মধ্যে হাতে তুলে নেয় খরিশ সাপের বিষ মেশানো তীর। চকিতে সেই তীর নিক্ষেপ করে বন্দুকধারী মহেশ দারোগাকে লক্ষ্য করে। মৃত্যু হয় মহেশের। পালিয়ে যায় ঈশরী মহাজন। উত্তেজনার গন্ধ পেয়ে নীলকর অধিকর্তা রিচার্ডসন এসে পড়েন ঘটনাস্থলে। তুফানীকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হন তিনি । কিন্তু পারেন না। ব্রাউনের অনুরোধই নিরস্ত হন তিনি। এদিনেই তুফানী জানতে পারলো তার জন্মের ইতিহাস। ব্রাউনই তার আসল পিতা।

তৃতীয় দৃশ্য: আলোচ্য নাটকের তৃতীয় দৃশ্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাইমেক্সে ভরপুর। সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক তথা শীর্ষ নেতা সিধু ধরা পড়ে ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে। বৃটিশরা তাকে হত্যা করেছে নির্মমভাবে। কানুর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ফুটে ওঠে সিধু'র মৃত্যু হওয়ার সেই নির্মম ভয়ংকরতা - " বিশটো বন্দুকের গুলি, সোজা যাইয়ে বিধলেক উয়ার বুকে.....।"[৮] বিদ্রোহের নায়কের আকস্মিক মৃত্যুতে বিষন্নতা নেমে আসে সাঁওতাল সমাজের বুকে। কিত্তা, মংরা, সুখিয়া, কানু প্রভৃতিরা ভেঙে পড়ে, তবে হাল ছাড়ে না। আরো কঠিন সংকল্পে বুক বেঁধে এগিয়ে যায় যুদ্ধের ময়দানে। প্রতিবাদ, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় টগবগ করে ফুটতে থাকে কানুর রক্ত।

অন্যদিকে তুফানী ব্যক্ত করে তার বাবার মৃত্যুর সংবাদ। আত্মহত্যা করেছেন পাগলা সাহেব। আরো অসহায় বোধ করে তুফানী। একদিকে জন্মদাতার মৃত্যু, অন্যদিকে বিদ্রোহের আহ্বান- দ্বিধান্বিত তুফনী অনুভব করে, এক অসহায় সাঁওতাল রমণীর গর্ভজাত সে, তাই ছুটে চলে উলগুলানের ময়দানে। অন্যদিকে মংরা ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ বহন করে আনে সাঁওতাল পল্লীর বুকে। ব্যক্ত করে দু পক্ষের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত- " ই সাহেব, জমিদার, নীলকর সাহুকর ইয়ারা মানুষ লয়। লক দিয়ে, দাঁত দিয়ে, চাইর হাত-পায়ে হামরার সান্তাল বিটিছেইল্যা গুলোকে ছিড়ে লিছে উয়ারা।"[৯]

প্রতিহিংসা পরায়ণ কানু রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে আসে সাঁওতাল পল্লীতে। বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচ বেইমান মহাজন ঈশরীকে হত্যা করে চরম পরিতৃপ্ত বোধ করে কানু। সদর্পে প্রকাশ করে তৃপ্তিকর সেই মৃত্যুদণ্ডের নৃশংসতাকে- "পা ঠিনে মাথা বরাবর কাইটে চার টুকরা কইরে ফাবড়াই দিলম পলাশ ডালে।"[১০] ক্ষতবিক্ষত কানুকে সুস্থ করবার দায়িত্ব দিয়ে কিত্তা চলে যায় লড়াইয়ের ময়দানে। তুফানীও তার সঙ্গী হয়। পরে পরেই নীলকর সাহেব রিচার্ডসন এসে হাজির হয়। কানুকে হাতের নাগালে পেয়ে উল্লেখিত হয়ে ওঠেন তিনি। কানু বিষণ্ণ চিত্তে সুখিয়াকে পালিয়ে যেতে বলে। নারীমাংস লোভী সাহেব সুবোদের জঘন্য প্রবৃত্তি সম্পর্কে সে অবহিত। কিন্তু সুখিয়া অবিচল। অসুস্থ ক্ষতবিক্ষত কানু কাকাকে ফেলে রেখে সে যাবে কেমন করে ? উদ্ধত রিচার্ডসন বন্দুক ত্যাগ করে কানুকে উদ্দেশ্য করে। বাধা দিতে এগিয়ে যায় সুখিয়া রিচার্ডসনের লাথিতে ছিটকে পড়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। লক্ষ্যভ্রষ্ট বন্দুকের গুলি ছুটে এসে বিধে যায় সুখীয়ার দেহে । মৃত্যুপথিক কানুর শেষ উচ্চারণ - "সুখিয়া- লড়াই ছাড়িস না-।"[১১] উদভ্রান্ত মংরা ফিরে এসে প্রত্যক্ষ করে সেই ঘটনার নৃশংসতা। তার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে সমাপ্তি ঘটে নাট্যকাহিনীর – "বউটো মইরা গেল !.... । উরা হামরার সিধুঠাকুরকে মারিছে। কানু ঠাকুরকে উরা ধরে নি গেইছে । হামি আছি। হামি লইড়ব।"[১২]

চিরন্তন গুরুত্ব: বাঙালির স্বভাবজ যে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমরা যে দু'একজন সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাসকে ভুলে যায়নি, তার বড় প্রমাণ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাঁওতাল বিদ্রোহ নাট্যসৃষ্টি ও পুনরায় তারপর আলোকপাতের সদিচ্ছা । আলোচ্য নাটকটি যে সেদিন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন সিদ্ধ করে বুদবুদের মত মিলিয়ে যায়নি, তা বলাই বাহুল্য । মাত্র তিনটি বিন্যস্ত এ নাটক । সব রকমের বাহুল্যতা বর্জন করে ইতিহাসের তথ্যকে অবিকৃত রেখে অত্যন্ত সংহত ভাবে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার এ কাহিনীকে । এখন প্রশ্ন হল, এমন ধরনের নাট্যকাহিনীর চিরন্তন গুরুত্ব কোথায় ? কিম্বা এ নাট্যকাহিনীতে এমন কিছু এমন কিছু নাট্যগুণ আছে কি, যার আবেদন আজও দর্শক-পাঠকগণ আকৃষ্ট হতে পারেন? এইসব নানান প্রশ্নের সদুত্তরের স্বপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তথ্য:

১. গৌরবান্বিত ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়কে নাট্যাঙ্গিকে বিনির্মাণ করেছেন, নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তার আপন অনুভূতি সম্ভূত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।
২. স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় দেড় দশক পরে নাট্যকার লেখেন ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’ । স্বপ্নের স্বাধীনতা প্রাপ্তির (১৯৪৭) অনতিকালের মধ্যেই আপামর মানুষের জীবনে স্বপ্নের দিন ও স্বাচ্ছন্দ যে অধরাই থেকে গিয়েছিল তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি । বলাবাহুল্য সমাজ সচেতন নাট্যকার সর্বসাধারণের এই অপ্রাপ্তি বা অতৃপ্তি জনিত হতশ্বাসকে প্রতিকায়িত করতে চেয়েছেন সাঁওতালদের জীবন যন্ত্রণার চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে।
৩. স্বাধীনতা, স্বাধিকার বা স্বপ্নকে সার্থক করবার যে দীর্ঘ অঙ্গীকার আলোচনা নাটকের নির্যাতিতদের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়েছে, তা একালের দর্শক -পাঠকদেরও দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা কল্পে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।
৪. শাল-পিয়াল-মহুয়া-পলাশের রঙে রাঙা বনভূমিকে আপন অধিকারে বক্ষ লগ্ন করে রাখতে গিয়ে সেদিন সাঁওতালরা আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত্রুদের মারণাস্ত্রের সামনে- এ দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই আমাদের মেকি স্বদেশভক্তিকে স্বচকিত করে। আমাদের অনুভবের গভীরে গুঞ্জন তোলে, জননীর মত জন্মভূমির জন্যও আমরা বলিপ্রদত্ত।
৫. সাঁওতালদের লোকজ জীবন ও সংস্কৃতির যেসব সম্যক ধারণার আয়োজন লক্ষিত হয় এ কাহিনীতে তা অকৃত্রিম ও নির্ভেজাল । নাট্যকার তার বাস্তব অভিজ্ঞতা নিরিখে এখানে সংযুক্ত করেছেন সাঁওতালদের লোকজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। লোক-দেবতা বভা সম্পর্কে তাদের দৃঢ়বিশ্বাস কত গভীরে প্রোথিত তার প্রমাণ মিলে প্রবীণ কিত্তার ভাষণে- "বিজলীর আলোয় ঝকঝকাই গেল পাহাড়ের পাথর। বুইঝলাম বভা বলছে লড় ।”[১৩] পাশাপাশি তাদের লোকখাদ্য, লোকবাদ্য, লোকসংগীত, লোকবিশ্বাস, ভাবনা, প্রভৃতি বিষয়গুলিকে নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন সুদক্ষ চিত্রশিল্পী দৃষ্টিতে । মংরার একটি সংলাপ – “ মহুয়া রস খাইয়া হামরার সান্তালেরা পূর্ণিমার রাইতে মাঘি পরবে ভর বর্ষায় লাইচেছি। হেই বনের পলাশ চুলে গাইথে হামরার বউ-বিটিরা সাইজেছে । হেই বনের মোষের চামড়া বাইধে আমরা ঢোলক বানাইছি।”[১৪]
৬. সর্বোপরি সাঁওতালদের লোকভাষার যথাযথ উপস্থাপন ও বিন্যাস গোটা নাট্যকাহিনীর সংলাপ নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। পাশাপাশি এদেশীয় জমিদার, মহাজন, কিংবা ব্রিটিশ বানিয়াদের মুখের সংলাপ ও নির্মিত হয়েছে চরিত্রানুগ। তাই দর্শক পাঠকের বোধের জগতে সমগ্র সাঁওতালদের সংগ্রামী উত্তাপ ও প্রতিপক্ষের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ খোদাই করে নিতে কোন অসুবিধাই হয় না। দু’ একটি দৃষ্টান্ত-
ঈশরী : জরুর, এই বনই জমি কি তুদের বাপের ?

কানু : জরুর, জরুর, হামরার বাপের । মাঘসিমের পরবের দিনে হামরা ওই বনে কাঠ কাইটব । শিকার কইরব । জিমি হামাদের । কুম্পানি হামাদের কাছে জমি কিনেছে ?

রিচার্ড : What does he say?

তথ্যসূত্র :

১। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় – নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ -২০১১, পৃষ্ঠা -২৩ ।

২। দুর্গাশংকর মুকোপাধ্যায়- নাট্যতত্ত্ব বিচার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা বইমালা - ২০০৩,পৃষ্ঠা -৫৬ ।

৩। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় – নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ -২০১১, পৃষ্ঠা -১৩ ।

৪। তদেব , পৃষ্ঠা -১৪

৫। তদেব, পৃষ্ঠা -১৫

৬। তদেব, পৃষ্ঠা -১৯

৭। তদেব , পৃষ্ঠা -২১

৮। তদেব , পৃষ্ঠা -৩৬

৯। তদেব,পৃষ্ঠা -৪০

১০। তদেব , পৃষ্ঠা -৪১

১১। তদেব , পৃষ্ঠা -৪২

১২। তদেব, পৃষ্ঠা -৪২

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা -২৭

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা -১৪

১৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- দেবেশ কুমার আচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা -৯, ১৪১৭

১৬। বাংলা লোকনাট্য- সম্পাদনাঃ বিশ্বনাথ রায় ও ছন্দা রায়, এবং মুসায়েরা , কলকাতা – ৭৩, ২০১৬

সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘একটি মোরগের কাহিনী’ : বহুমাত্রিক অন্বেষণ

তাপস মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : আধুনিক বাংলা কবিগোষ্ঠী বলয়ের অন্যতম প্রধান কবি হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)। বয়সে তরুণ এই কবি তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবদ্দশায় সাহিত্য অঙ্গনে নিজের স্থানটি পাকা করে নিয়েছিলেন আপন প্রতিভার গুণেই। আমরা জানি কবি সাহিত্যিকরা কেউই বহির্জগতের প্রাণী নন। তাঁরাও আমাদের মতোই সমাজবদ্ধ জীব। তাই সমাজের প্রতি তাঁদেরও দায়বোধ যথেষ্ট। এই দায়বদ্ধতা থেকেই শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষদের হয়ে কবি সাহিত্যিকরা কলম ধরেন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যও এই ধারার ব্যতিক্রমী কবি নন। তিনিও সামাজিক ও মানবিক দায়বোধ থেকেই শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষের হয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও নিজের দিকে তাকাবার ফুরসত পাননি তিনি। সংগ্রামী মানুষের জন্য তাঁর আর্তি সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ— ‘ছাড়পত্র’ (১৯৪৭)। এই কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা হল- ‘একটি মোরগের কাহিনী’। এই কবিতাটিতে কবি একটি মোরগের কাহিনি শোনাতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে সমাজের অসহায়, নিপীড়িত, অত্যাচারিত,ক্ষুধাতুর মানুষের কাহিনিকে উপস্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে কবিতাটিতে প্রকট হয়ে উঠেছে শ্রেণি সংগ্রাম ও তার পাশবিক রূপ।

সূচক শব্দ : মোরগ, প্রাসাদ, ক্ষুধা, আহার, আশ্রয়, শাসক, শোষক,আঁস্তাকুড়, দুর্বল, ঘৃণা,বিদ্রোহ, মানুষ, শ্রেণি সংগ্রাম।

মূল আলোচনা :

আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) একটি চিরস্মরণীয় নাম। রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক কবিতা যখন আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তখনই সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা কাব্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন। অতি অল্প বয়সে যৌবনের প্রথম সোপানে পৌঁছেই এই কবির অকাল মৃত্যু ঘটেছিল। বয়সে কিশোর হলেও কবির প্রতিভা কিন্তু কৈশোরের অপরিণত স্বভাবকে স্বীকার করে নেননি। চিন্তার স্বচ্ছতা ও রূপায়ণ ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে বহু কবির ভিড়ের মধ্যেও বয়সে কিশোর এই কবি আপনার স্বাতন্ত্র্যকে পরিস্ফুট করতে পেরেছিলেন।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবি ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল- সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে প্রখর সচেতনতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর কবির নাতিদীর্ঘ জীবনে আর-এক বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর কবি সত্তাকে ও তাঁর মানবিক অস্তিত্বকে নানা প্রশ্ন ও নানা চিন্তায় জর্জরিত করেছিল। যার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর কবিতার মধ্যে ফুটে উঠতে দেখা যায়। সুকান্তের কবি ভাবনায় বিদ্রোহ, ঘৃণা এবং আশাবাদের সমন্বয় দেখা গেলেও "তাঁর কবি ভাবনার মূল বিষয় হচ্ছে 'বিদ্রোহ'। এই বিদ্রোহ প্রথমে জীবনের সর্বদিকের গ্লানি এবং অন্যায়কে আক্রমণ করেছে, অর্থাৎ প্রথম বিদ্রোহ পরিবেশের বিরুদ্ধে, পরে সেই বিদ্রোহ পরাধীনতা-উপনিবেশিকতা এবং দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং এই বিদ্রোহই রূপায়িত হয়েছে শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে। যেখানে বিপ্লব স্পন্দিত বুকে কবি নিজেই লেলিনে পরিণত হয়েছেন...

' মাঝে মাঝে যেন জ্বালা করে এক বিরাট ক্ষত
হৃদয় গত।
ব্যর্থতা বুকে, অক্ষম দেহ, বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে
দিনরাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুক মারে।'

এই চেতনা থেকেই কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।"[১]

বিদ্রোহ, ঘৃণা ও আশাবাদ সুকান্ত ভট্টাচার্যের অধিকাংশ কবিতায় দেখা যায়। 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতাটির মহত্ত্ব এইখানে যে, বিদ্রোহ ও ঘৃণা এই কবিতায় শ্লোগানধর্মীতাকে অঙ্গীকার করে ফুটে ওঠেনি। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন— "কবিতার ক্ষেত্রে আমি এক ধরনের নতুন Experiment করছি সুভাষদা।"[২] তীব্র তীক্ষ্ণ ঘৃণা ও বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কবির ভাবনা কবিতাটিতে ব্যঞ্জনা রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। মোরগের রূপকে নিরন্ন দুর্বল শ্রেণির ক্ষুধার অন্ন ও বাসস্থান অন্বেষণের করুণ পরিণামকে কবি চিত্রিত করে শাসক ও শোষক শ্রেণির প্রতি বিদ্রূপ ও ঘৃণাকে ব্যঞ্জিত করতে পেরেছেন। আর সেই ঘৃণার সূত্রেই বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা সহৃদয় পাঠক চিত্তে অতি অবশ্য অনুভূত হয়। স্পষ্টভাবে কোন রাজনৈতিক শব্দ উচ্চারণ না করলেও কবির এই কবিতাটি নিঃসন্দেহে রাজনীতি ও কাব্যধর্মের সুন্দরতম সমন্বয় ঘটাতে পেরেছে। এইখানেই কবিতাটির মহত্ত্ব ও নূতনত্ব।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতাটি 'ছাড়পত্র'(১৯৪৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। "১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল - যুগসন্ধির এই পাঁচটা বছর ছাড়পত্রের রচনাকাল। একদিকে মৃত্যুকীর্ণ যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর মহামারী, অন্যদিকে জীবন প্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ সংগ্রাম—জয় পরাজয় আর উত্থান-পতনে, সুখ-দুঃখ আর আশা নিরাশায় ঘেরা এই পাঁচটা বছর ছাড়পত্রে উৎকীর্ণ হয়ে আছে। কোটি কোটি মানুষের বলিষ্ঠ আশা কবির কণ্ঠে নির্ভীক ঘোষণায় ফুটে উঠেছে। "[৩]

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কবিতাটির নাম দিয়েছেন -‘ একটি মোরগের কাহিনী’। একটি ইতর প্রাণী মোরগের আশ্রয় ও আহার অন্বেষণের প্রচেষ্টা ও তার পরিণাম কবিতাটির বিষয়বস্তু। আদি-মধ্য-অন্ত্যের সুবলয়িত রূপ কবিতাটির গঠন ভঙ্গিমায় অনুভূত হয়। কাজেই একে কাহিনি বলে মেনে নিতে কোন দ্বিধা থাকে না। কবিতাটির শুরু অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে —

“একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেলো
বিরাট প্রসাদের ছোট্ট এক কোণে
ভাঙা প্যাকিং বক্সের গাদায়—
আরো দু-তিনটি মুরগির সঙ্গে। ”[৪]

কবিতাটির প্রথম স্তবকে ‘বিরাট’ ও ‘ছোট্ট’ এই দুটি বিপরীত শব্দের ইঙ্গিত পূর্ণ সহাবস্থান লক্ষ করবার মতো। বিরাট প্রসাদবাসী ছোট্ট এক কোণে ভাঙা প্যাকিং বাক্স বা বর্জিত স্তুপের মাঝখানে প্রাণবন্ত সুন্দর মোরগকে ঠাঁই দিয়েছে। ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায় সুন্দর মোরগের এই আশ্রয় প্রাপ্তি নতুন কোন আশ্বাস বা আনন্দের নয়। এর মধ্যে দিয়ে প্রাণের প্রতি প্রসাদবাসীর অবহেলা প্রথমেই ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে।

কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে বিরাট প্রাসাদের মধ্যে যে করুণাহীন পাষাণ সদৃশ্যতা বিরাজমান তা আরও স্পষ্টতা পেয়েছে কবির এই উচ্চারণে —

“ আশ্রয় যদিও মিললো,
উপযুক্ত আহার মিলল না। ”[৫]

মহৎ কবির মতোই সুকান্ত ভট্টাচার্য এখানে যতটুকু বলেছেন তার চেয়ে পাঠককে অনেক বেশি ভাবিয়ে নিতে পেরেছেন। মোরগের এই আহার হীনতার পাশাপাশি বিরাট প্রাসাদের কথা মনে পড়লেই ঐ প্রাসাদবাসীর চরিত্রকে সহজেই বুঝে নিতে পারি। উপলব্ধি করতে পারি প্রাণীর ক্ষুধার যোজ্ঞাগ্নিকে লাঞ্ছিত করে ওই বিশাল প্রাসাদ উদ্ধত ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবকে ক্ষণজীবী মোরগ নত মস্তকে মেনে নেয়নি।সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে আর প্রতিকারে প্রতিবাদ জানিয়ে গলা ফাটিয়েছে। মোরগের এই প্রতিবাদ আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় এ শুধু কোন মোরগের কাহিনি নয়। এ আসলে ভূরিভোজী আর ক্ষুধাতুর, দুর্বল আর সবল, শোষক আর শোষিতের কাহিনি। ভূরিভোজী শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে নিরন্ন দুর্বল শোষিত মানুষের এই প্রতিবাদের ব্যঞ্জনা কবিতাটিতে কখনোই আরোপিত বোধ হয় না—এইখানেই কবির কৃতিত্ব। ইতর প্রাণী মোরগের উচ্চকণ্ঠ সুতীক্ষ্ণ চিৎকারের স্বভাব ধর্মের সঙ্গে কবির এই প্রতিবাদের বর্ণনা সহজ স্বাভাবিকতায় সমন্বিত হয়েছে। বিরাট প্রাসাদে মোরগের ক্ষুধার খাদ্য মেলেনি। কারণ কেউই ভাবেনি তার কথা। তার খাদ্যের প্রয়োজন চিন্তিত করেনি কাউকে। অথচ আঁস্তাকুড়ে দেখা যায় —

“ ফেলে-দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।”[৬]

প্রসাদবাসীর নির্মমতা এখানে সুস্পষ্ট হয়েছে। প্রাণীর ক্ষুধার আগুনের প্রতি ভূরিভোজীদের অসম্মান সূচক মনোভঙ্গি প্রবলতর হয়ে আমাদেরকে উত্তেজিত করে। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় কবি নিজে একটিও উত্তেজক শব্দ ব্যবহার করেননি। কবিতাটি সত্যিই নাটকীয়। নাটকীয়তার অন্যতম প্রধান লক্ষণই হল অপ্রত্যাশিত চমক আর উৎকণ্ঠার সঞ্চার। আসলে "নাটকে থাকে ঘটনার আকস্মিক গতি পরিবর্তন এবং অপার বিস্ময় ও কৌতূহল যা অবিরত ক্রিয়া পারম্পর্যে সংঘটিত হয়।"[৭] আমরা দেখেছি মোরগটি প্রাসাদে আশ্রয় পেয়েছে অথচ ক্ষুধা নিবৃতির খাদ্য পায়নি। তার সুতীব্র প্রতিবাদ যে মুহূর্তে ব্যর্থ হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই অপ্রত্যাশিত ভাবে জানা গেছে আঁস্তাকুড়ে রাশি রাশি খাবারের কথা। এই খাদ্যের লোভেই আঁস্তাকুড়ে এসে জুটেছে প্রচুর খাবারের অংশীদার। কবির ভাষায় তারা —

" ময়লা ছেঁড়া ন্যাকরা পরা দু-তিনটে মানুষ; "[৮]

এর ঠিক পরের পংক্তিতে কবি 'কাজেই' শব্দটিকে অত্যন্ত ইঙ্গিত পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। 'কাজেই' শব্দটির মধ্যেই অনিবার্য যুক্তির ব্যঞ্জনা আছে। ক্ষুধাতুর মানুষের আবির্ভাবে মোরগের আহার প্রাপ্তির সুযোগ রুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই মুহূর্তে 'কাজেই' শব্দটির ব্যবহার করে কবি যেন ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন এ পৃথিবীতে দুর্বল-সবলের সম্পর্ক এক আপেক্ষিক সত্য। সমগ্র বিশ্বজুড়ে যেন সবলের কাছে দুর্বলের পরাভবের ঘটনা প্রাকৃতিক সত্য হিসাবে অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছে। কবিও দুর্বল-সবলের এই আপেক্ষিক সম্পর্ককে স্পষ্টতর করেছেন 'দুর্বলতর' শব্দটির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে।

কবিতাটির পরবর্তী স্তবকটিও নাটকীয়তায় ভরপুর। ক্ষুধার প্রয়োজনে মোরগটি বারবার প্রাসাদে ঢোকার চেষ্টা করছে কিন্তু ভূরিভোজী শাসক শ্রেণির প্রতীক প্রসাদবাসীর দল ক্ষুদ্র মোরগের আহার অন্বেষণের এই প্রচেষ্টাকে বারবার ব্যর্থ করে দিয়েছে প্রবল প্রতিরোধে। তবু মোরগটি পরাস্থ হয়নি। বাস্তবে যে খাদ্য মেলেনি তারই স্বপ্ন দেখেছে সে। সাময়িক ব্যর্থ হলেও মোরগের স্বাভাবিক গ্রীবা ভঙ্গিমাকে কবি শব্দ বিন্যাসের কৌশলে গভীরতর ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন। আমরা অনুভব করি সাময়িক ব্যর্থতায় ভেঙে পড়া নয় বরং লক্ষ্যে অবিচল থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ায় সকলের উচিত কর্তব্য।

কবিতাটির পঞ্চম স্তবকে মোরগের কাহিনির শেষ পরিণাম রচিত হয়েছে নাট্যোৎকণ্ঠা বজায় রেখে —

" তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো,
একেবারে সোজা চ'লে এলো
ধবধবে শাদা দামি কাপড়ের ঢাকা খাবার-টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়
খাবার হিশেবে। "[৯]

কবির এই আকস্মিক উচ্চারণ আমাদের স্তব্ধ করে। কুশলী শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্যের গুণে কবি জানাতে চেয়েছেন খাদ্য সন্ধানী দুর্বল প্রাণীর ভয়ংকর পরিণামকে। সেই সঙ্গে কবি এও বুঝিয়ে দিয়েছেন সমগ্র পৃথিবী জুড়ে দুর্বল এবং সবলের সম্পর্ক আসলে খাদ্য খাদকের সম্পর্ক। বিরাট প্রাসাদের বাসিন্দা সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি নিজেদের প্রয়োজনে দুর্বল মানুষকে কাজে লাগায় অথচ তাদের ক্ষুধার অগ্নিকে তারা স্বীকৃতি দিতে পারে না। নিরন্ন দুর্বল শ্রেণি খাদ্যের স্বপ্ন দেখে ঠিকই কিন্তু সেই স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবায়িত হয় না। বরং তারা নিজেরাই সমাজের সুবিধাভোগী শাসককুলের খাদ্যে পরিণত হয়। এইখানেই মোরগের কাহিনি শেষ হয়ে যায়। তবে সেই কাহিনির অনুরণন চলতে থাকে আমাদের মনে। আমরা জানি শাসক শ্রেণির খাদ্যবস্তু রূপে দুর্বল মানুষের দল, শোষিত মানুষের দল সমাজে স্থান পায়। তবে এই পরাভাব মেনে নেওয়া উচিত নয়। মানুষে মানুষে এই খাদ্য খাদক সম্পর্ক অবশ্যই লুপ্ত হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য দরকার সঙ্গবদ্ধ প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ।

‘একটি মোরগের কাহিনী’ কবিতাটিতে মোরগের জীবনবৃত্তান্তের আশ্রয়ে শোষক শ্রেণির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রোহের মনোভাব ব্যঞ্জিত হয়েছে। কবিতাটি এই কারণে রসসার্থক যে, কবির বক্তব্য কখনোই নিরস বিবৃতি বা রাজনৈতিক শ্লোগানে পরিণত হয়নি। রাজনৈতিক শ্লোগানধর্মিতার অনুপস্থিতির সত্বেও কবিতাটি ব্যঞ্জনা সূত্রে আমাদের মনে এক অমোঘ সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা দান করে। কবিতাটির নাটকীয় ভঙ্গি, সুসংযত ও নাতিদীর্ঘ আয়তন, সুনির্বাচিত শব্দ প্রয়োগ এবং অত্যন্ত সহজ সরল কৌতুকের ভঙ্গিমা কবিতাটির রসধর্মকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

অনেকে ‘একটি মোরগের কাহিনী’ কবিতাটিকে রূপক কবিতা হিসেবে মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। রূপক কবিতায় এক রূপের উপর অন্যরূপ আরোপ করা হয়। কবিতার আপাত অর্থ থাকে একটি কিন্তু সেই অর্থের সমান্তরালে আরও একটি অর্থ প্রবাহিত হয়। রূপক কবিতায় তাই কবিতার বিষয়বস্তুতে দুটি ভিন্ন অর্থ সহজেই চিহ্নিত করা যায়। ‘একটি মোরগের কাহিনী’ কবিতাটিতেও রূপক কবিতার এই সমান্তরাল অর্থবিন্যাস কিছুটা লক্ষ করা যায়। যেমন —

বিরাট প্রসাদ = সমাজের অনিবার্য শাসক শ্রেণি, মোরগ = সমাজের শাসিত ও শোষিত দুর্বল শ্রেণি, মোরগের আহার অন্বেষণ = শোষিতের অস্তিত্বের লড়াই, মোরগের ডাক = শাসিত বা শোষিত জনগণের প্রতিবাদ......ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে অর্থের এই সমান্তরালতা থাকা সত্ত্বেও ‘ একটি মোরগের কাহিনী ’ কবিতাটিকে যথার্থ রূপক কবিতা বলা যায় না। কারণ বিরাট প্রাসাদের বাসিন্দারা যদি হন শাসক শ্রেণির প্রতীক ও মোরগ যদি হয় দুর্বলতর শোষিত জনসাধারণের প্রতিনিধি, তবে এই প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে — ছেঁড়া ন্যাকরা পরা মানুষের দল তবে কারা? ভাঙা প্যাকিং বাক্স, অন্য দু-চারটি মুরগি, আঁস্তাকুড়, ধবধবে শাদা দামি কাপড়ের সমান্তরাল অর্থই বা কী? সুতরাং এখানে নিঃসংশয়ে বলা যায়

রূপক কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি তা রচনা করা কবির অভিপ্রেত ছিল না। বস্তুত মোরগের কাহিনি রূপকের সংকীর্ণতা ভেঙে বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সবল দুর্বলের চিরন্তন খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। তাই কবিতাটিকে খাঁটি রূপক কবিতা না বলে রূপকের উপকরণ যুক্ত ব্যঞ্জনাগর্ভ কবিতা হিসাবে গ্রহণ করায় শ্রেয়।

কবিতাটির রসসার্থকতার পিছনে কবির বক্তব্যের শক্তি যেমন ক্রিয়াশীল থেকেছে ঠিক তেমনি কবিতাটির ভাষাভঙ্গিও একে অপরূপতা দান করেছে। কবিরা মানুষের জীবনের ভাষাকেই আশ্রয় করেন। আলোচ্য কবিতাটির ভাষাভঙ্গিও একান্তভাবে জীবনেরই কাছাকাছি। তবু এই ভাষার মধ্যে দিয়ে নির্মম কঠিন বাস্তব রূপায়িত হয়েছে। বস্তুত গদ্যধর্মী ভাষার প্রয়োগ কবিতাটির আধুনিক লক্ষণকেই স্পষ্ট করেছে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর অন্যান্য কবিতার মতো এই কবিতাতেও একান্তভাবে কাব্যিক ভাষাকে এড়িয়ে চলেছেন। তাঁর ভাষাভঙ্গি ও ছন্দভঙ্গি গদ্যাত্মক। কথা কওয়ার স্বাভাবিকতাকে তিনি কবিতার ভাষায় সক্ষম ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এই আপাত সহজ ভাষাভঙ্গিতে কবির শিল্পী সচেতন মনের প্রকাশ স্পষ্ট অনুভূত হয়। যেমন প্রথম স্তবকে 'বিরাট প্রাসাদ' আর 'ছোট্ট এক কোন' দুইয়ের বৈপরীত্যের মাধ্যমে বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ স্পষ্টতা দিতে পেরেছেন। এই অসামঞ্জস্যতা আমাদের প্রথমেই সচেতন করে দেয় যে কবিতাটির বিষয়বস্তু মূলত সমাজের সামঞ্জস্য হীনতাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা কবি কবিতাটির আদি থেকে অন্ত্য পর্যন্ত একটা টানটান উত্তেজনার সঞ্চার করতে পেরেছেন। ফলে কবিতাটি আমাদের কাছে রসসার্থক হয়ে ধরা দিয়েছে। কবিতা পাঠের পরেও এর অনুরণন কানের মধ্যে গুণগুণ করতে থাকে। শ্লোগানধর্মী না হয়েও একটি কবিতাকে কত বেশি রাজনৈতিক বক্তব্য সমন্বিত করে তুলে ধরা যায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ' একটি মোরগের কাহিনী ' কবিতাটি যেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, কৃষ্ণ, ' সুকান্ত স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন', আগস্ট ১৯৬০, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৩৫
২. তদেব, পৃ. ২১
৩. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, ' ছাড়পত্র ', তৃতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা অংশ
৪. বসু, বুদ্ধদেব (সম্পাদিত), ' আধুনিক বাংলা কবিতা ', পঞ্চম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪০৫, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২৩০
৫. তদেব, পৃ.২৩০
৬. তদেব, পৃ. ২৩০

৭. মণ্ডল, তাপস, ‘ মৈমনসিংহ গীতিকার ‘মহুয়া’ পালার নাটকীয়তা ’(প্রবন্ধ), ‘ ময়মনসিংহ গীতিকা ও অন্যান্য লোকসংগীত ’, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা - সোসাইটি অব বেঙ্গল স্টাডিজ , ফেব্রুয়ারি ২০২৩ , পাড়ি , কলকাতা , পৃ. ১১

৮. বসু, বুদ্ধদেব (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ.২৩০

৯. তদেব, পৃ. ২৩১

গ্রন্থপঞ্জি :

1. চক্রবর্তী, কৃষ্ণ, ‘ সুকান্ত স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন ’, আগস্ট ১৯৬০, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
2. চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম (সম্পাদিত), ‘ আধুনিক বাংলা কবিতা সঞ্চয়ন ’, সপ্তম মুদ্রণ : জুলাই ২০১৩, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান
3. চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার, ‘ কবিতায় গাঁথা ভেলা ’, জুন ২০১৫, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা
4. বসু, বুদ্ধদেব (সম্পাদিত), ‘ আধুনিক বাংলা কবিতা ’, পঞ্চম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪০৫, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা
5. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, ‘ ছাড়পত্র ’, তৃতীয় সংস্করণ , পুনর্মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ , সারস্বত লাইব্রেরী , কলকাতা
6. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, ‘ সুকান্ত সমগ্র ’, পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৪০৬, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা
7. মিশ্র, অশোককুমার, ‘ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস ’(আধুনিক পর্ব : ১৮০০-২০১২), পঞ্চম সংস্করণ, জুলাই ২০১৯, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা
8. সোসাইটি অফ বেঙ্গল স্টাডিজ (গ্রন্থনা ও সম্পাদনা), ‘ ময়মনসিংহ গীতিকা ও অন্যান্য লোকসংগীত ’, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পাড়ি, কলকাতা

বেদান্ত ও ব্রহ্মতত্ত্ব

সুদীপ্তা ভকত
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান

বৈদিক ঋষিদের চিরন্তন-সত্য-শাশ্বতবাণী 'উপনিষদ্' আধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতার অমূল্য সম্পদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা মূলক গ্রন্থই বেদের অন্তিম অংশ হিসাবে উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়।বৈদিক ঋষিরা পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এই অর্জিত জ্ঞান লিপিবদ্ধকারে নিহিত উপনিষদে। *"তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তদ্ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্"*[১](শ্বেতা.উপ,৫/৬)- বেদের সার এবং রহস্যতত্ত্ব যে উপনিষদ্ সমূহ তাহাতে পরমাত্মা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত হয়েছেন।উপনিষদের গভীর তত্ত্বমূলক আলোচনার মধ্যে সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নেই, ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই বিশ্বরূপে পরিব্যাপ্ত।উপনিষদের মূল বক্তব্য হল বিশ্বই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মা। সৃষ্টির ভিতর একই ব্রহ্ম বহু হয়েছে। এই উপনিষদ্ আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, নিরবাচ্ছিন্ন আনন্দ ও অবিমিশ্র সুখ লাভ রূপ 'মোক্ষ' লাভের সন্ধান দেয়, আবার আধ্যাত্ম চেতনার মধ্য দিয়ে মানব-প্রকৃতি তথা পৃথিবী মধ্যস্ত সমস্ত জীবকূল কে একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে।

উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয় আবার 'পরম রহস্য' গ্রন্থও বলা হয়। "বেদান্তে পরমং গুহ্যং"[১] (শ্বেতা.উপ,৬/২২) অর্থাৎ 'পরম রহস্য' এই ব্রহ্মবিদ্যা বেদান্ত।কঠোপনিষদে বলা হয়েছে- *"য ইমং পরমং গুহ্যং"*[১](কঠ.উপ,১/৩/১৭) 'পরম গুহ্য' অর্থাৎ অতি গূঢ় ও রহস্যপূর্ণ গ্রন্থ এই বেদান্ত। আবার ছান্দোগ্যোপনিষদের এই মন্ত্রে বলা হতেছে *"তে বা এতে গুহ্যা* আদেশা*"*[১](ছান্দোগ্য.উপ,৩/৬/২) গুহ্যা আদেশা অর্থাৎ পরম রহস্যপূর্ণ এই বেদান্ত।বৈদিক ঋষিরা উপনিষদের যে স্বরূপ বলেছেন তাতে স্পষ্ট যে, উপনিষদ্ বা বেদান্ত হল পরম রহস্যপূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা।উপনিষদ্ এর অর্থ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ডয়সন বলেছেন-"*Upanishad by* rahasyam"[২]. অর্থাৎ 'রহস্যগত জ্ঞান' বলে ব্যাখ্যা করে বলেছেন এই জ্ঞান রহস্যপূর্ণ হওয়ায় গুরুর নিকটে একান্তে বসে এই বিদ্যা লাভ সম্ভব বলে এই গ্রন্থের নাম উপনিষদ্।। ম্যাক্সমূলার বলেছেন – 'গুরুর নিকট বসে দার্শনিক বিদ্যা আয়ত্ত করা হত বলে তার নাম উপনিষদ্[৩]। বিবেকানন্দের মতে বেদান্ত বিচিত্রমুখী এক দর্শন, বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার অভিমুখে যাত্রা। উপনিষদ্ শব্দটির ব্যুৎপত্তি,–উপ+নি-সদ্+ক্বিপ্। ব্যুৎপত্তিগতভাবে উপনিষদ্ কথাটির অর্থ হল –'উপ' অর্থে গুরুর নিকটে 'নি' অর্থে নিশ্চিত রূপে 'সদ্' অর্থে (সদ্ ধাতুর তিনটি অর্থ-নাশ,গতি ও প্রাপ্তি) অবিদ্যার নাশকারক আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তি এবং দুঃখের অন্তের জন্য জ্ঞান। সুতরাং উপনিষদ হল জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ।

"উপনিষদ্ং ভো ব্রুহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব উপনিষদমব্রূমেতি"[১] ।। (কেনো. উপ, ৩/৩/৭) এই মন্ত্রে শিষ্য আচার্যকে বলছে – 'আমাকে উপনিষদ্ বলুন', উত্তরে আচার্য বললেন 'তোমাকে উপনিষদ্ই বলিয়াছি, ইহাই ব্রাহ্মী বাক্, ব্রহ্ম বিদ্যা বিষয়ক উপনিষৎ"। উপনিষদ্ই যে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত আর কিছুই নইয় তা দৃঢ করবার জন্যই 'উপনিষৎ বলিয়াছি' – এই কথার দ্বিরুক্তি করা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপায় স্বরূপ বেদ-বেদান্ত। এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভে ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফল বিষয়ক সকল ভেদবুদ্ধি নিবারিত হয়। সুতরাং ব্রহ্ম বিষয়ের বিদ্যাই উপনিষদ, বা যে বিদ্যাতে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় সেই বিদ্যাই উপনিষদ্.ব্রহ্মের স্বরূপ কি? এই প্রসঙ্গে কেনোপনিষদের প্রথম খণ্ডের সমস্ততাতেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হয়েছে- *"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো/ন বিদ্মো ন বিজনী*মো*"*[১] ।। (কেনো.উপ,১/৩/৪) অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' কে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, বাক্য দ্বারা তাঁকে প্রকাশিত করা যায় না,মন দ্বারা তাঁকে চিন্তা করা যায় না। আমরা তাকে জানি না, উপলব্ধি করি তিনি ইন্দ্রিয়-মনের অগোচর। এই ব্রহ্মোপলব্ধি প্রসঙ্গে তৈত্তরীয় উপনিষদের ঋষি ভৃগু *বলেছেন-"অন্নং প্রাণং শ্রোত্রং মনো বাচমিতি"*[১] (তৈত্ত.উপ,১/১) অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্য এরাই ব্রহ্মোপলব্ধি দ্বার। আমাদের সর্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য উপনিষদের অধ্যয়ন প্রয়োজন।উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্তি হয় ও মুক্তি লাভ হয়।ব্রহ্মবিদ্যায় বিশেষতঃ পরমাত্মার জ্ঞানেই ব্রহ্মবিদ্যার পরিসমাপ্তি এবং এই ব্রহ্মবিদ্যার ফল নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষ লাভ।এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপায় স্বরূপ কেনোপনিষদে বলা হয়েছে – "তস্যৈ দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্বাঙ্গানি, সত্যমায়তনম্*"*[১]।। (কেনো.উপ,৩/৮) এখানে তপস্যা, ইন্দ্রিয়-সংযম ও কর্ম এই সকল উপনিষদের পদ-স্বরপ।'তস্যৈ' অর্থাৎ সেই উপনিষদের এখানে 'উপনিষৎ' বলতে উপনিষদযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যাই প্রধানতঃ বোঝানো হয়েছে। সুতরাং চিত্তের একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান এই সকল উপনিষদযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা পদস্বরূপ। এখানে 'ব্রহ্মবিদ্যাকে' মানুষ রূপে কল্পনা করে বলা হয়েছে – মানুষ যেমন পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে, পা না থাকলে দাঁড়াতে পারে না, সেরূপ উপনিষৎ(ব্রহ্মবিদ্যা) এই সমস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, এইগুলির অভাবে (তপঃ,দমঃ,কর্মঃ) ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হতে পারে না। উপনিষদের মূল বক্তব্য হল ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নয় *'জীবব্রহ্মক্যৈই*মূল ব্রহ্মতত্ত্ব। ।এই ব্রহ্ম প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বলেছেন – "ব্রহ্ম জীবজগৎ বিশিষ্ট"(১-১৩-৬),"তিনিই অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ, তিনিই আবার জীবজগৎ হয়েছেন*"*[৪]।(৩-১৩-৬)

উপনিষদের গভীর তত্ত্বমূলক আলোচনার মধ্যে সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় হল ব্রহ্মতত্ত্ব।"সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্*"*[১]। (ছান্দগ্যো.উপ,শান্তিপাঠ) অর্থাৎ সমস্ত উপনিষদে প্রতিপাদিত বিষয় ব্রহ্ম। বৈদিক ঋষিগণ আদিকাল থেকে সৃষ্টি রহস্য জানতে

চেয়েছিলেন, তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, সৎ বা অসৎ এদের কোনটিই বিশ্ব সৃষ্টির মূল নয়, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন আর কিছুই নেই। উপনিষদের মর্মবাণী হল *'তত্ত্বমসি* (ছান্দোগ্য. উপ,৬/৭) 'তুমি' ও 'ব্রহ্ম' একই, জীব ও ব্রহ্মের কোন ভেদ নেই। সৃষ্টির ভিতর একই ব্রহ্ম বহু হয়েছেন – উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্বে যা প্রতিপাদ্য বিষয়। উপনিষদের ঋষিরা খণ্ডের ভিতর অখণ্ডকে দেখেছেন, বহুর ভিতরে এক কে অনুভব করেছেন এবং ভূমার মধ্যে অমৃতের স্বাদ পেয়েছেন, - বিশ্ব এক অখণ্ড সত্তা রূপে বিরাজমান।বিশ্ব হল সৃষ্টি আর ব্রহ্ম হলেন স্রষ্টা। তিনি অন্তরে ও বাহিরে সকলের পরিচালক। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতিমর্্য, সর্বদর্শী স্বয়ম্ভূ –

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"।।(ঈশোপনিষদ্‌,শান্তিপাঠ)

ব্রহ্ম জগতীত জগদ্‌ব্যাপী; জন্ম বা সৃষ্টি ব্রহ্মের একত্বের বা পূর্ণত্বের কোন পরিবর্তন করে না। সুতরাং বিশ্বের মূলতত্ত্ব হল ব্রহ্ম। তাঁর উপাদান বিভিন্ন রূপে প্রকাশ হয়েছে। এই ব্রহ্মবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণ কাব্যগ্রন্থের একটি সুন্দর বর্ণনা এখানে উল্লেখ্য–

"যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ, গন্ধ, গীত করিছে রচনা"[৫]।।

(যে ভাবে রমণী রূপে আপন মাধুরী।কবিতা, পৃ ৩০)

এই ব্রহ্মতত্ত্বের মূল কথা হল ব্রহ্ম বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তি বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে তার সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে মিশে বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছে্ন। আবার অন্যভাবে ধর্তত্ত্বের দিক দিয়ে বলা যেতে পারে- ঈশ্বর ব্রহ্ম বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে আছেন অর্থাৎ সর্বেশ্বরবাদ। বিশ্বের এই প্রচ্ছন্ন নিয়ামক শক্তি ব্রহ্মাত্ব এবং তা যে বিদ্যমান এই অনুভূতি নিয়ে কবি শেলির একটি কাব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ্য – "*Spreading itself where'er that power may move/Which has with drawn his never wearied love being to its own*[১]"" আবার *"সর্বং তৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"* (ঐত.উপ,৩/৩) অর্থাৎ জড় ও জৈব প্রকৃতি জুড়ে এক অভিন্ন প্রজ্ঞা বিরাজ করছে উপনিষদের ভাষায় বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত এবং সেই প্রজ্ঞাই ব্রহ্মা। কঠোপনিষদের ঋষি বলছেন –*"একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধাঃ যঃ* করোতি"[৭](কঠ. উপ,২/২/১২) একই ব্রহ্ম বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ।ব্রহ্ম সর্বময় বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন। আবার ঋষি বলেছেন – *"যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যহন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত*

আত্মান্তর্যাম্যমৃত, ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্”[১]।। (বৃহদ.উপ,৩/৭/১৫) অর্থাৎ ব্রহ্ম বিভিন্ন জীবের অন্তরে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রিত করে সকল ভূত তাঁরই স্বরূপ। অন্তরে থেকে জীব-সকল কে নিয়ন্ত্রিত করেন বলেই তিনি অন্তর্যামী। দেহ পরিবর্তন হয় কিন্তু তার নিয়ামক শক্তি নিত্য এবং 'অমৃত'। মাণ্ডূক্যোপনিষদে বলা হয়েছে – *“সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ”*।(মাণ্ডুক্য.উপ,২) এখানে ঋষি বলেছেন এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম।ছান্দোগ্যোপনিষদের ঋষি বলেছেন – *“সর্বং খল্বিদং তজ্জলানিতি”*[১]। (ছান্দোগ্য.উপ৩/১৪/১)– “এই সমস্তই ব্রহ্ম, কারণ তাঁহা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই বিলীন হয় এবং তাঁহাতেই জীবিত।

উপরিউক্ত আলোচনার মূল বক্তব্য হল এই সমস্তই ব্রহ্ম।তিনি বাক্যে আছেন ক্ষেমরূপে, হাতে আছেন কর্মরূপে, চরণে গতিরূপে পায়ুতে বিমুক্তি রূপে; তেমনি তিনি বাইরে আছেন, বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বল রূপে, নক্ষত্রে জ্যোতিরূপে, আকাশরূপে তিনি সর্বত্র। এই প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ঋষি বলেছেন- *“তদেবাগ্নিস্তাদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।/ তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ* প্রজাপতিঃ”[১] ।। (শ্বেতা.উপ,৪/২) তিনি (ব্রহ্মই) অগ্নি, তিনিই সূর্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই জলরাশি তিনিই জ্যোতিময়, তিনিই অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ, তিনিই বিরাট আত্মা নামক প্রজাপতি। তৈত্তরীয়োপনিষদের ঋষি ভৃগু বলেছেন- *“অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, প্রাণং বহ্মেতি ব্যজানাৎ, মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, বিজ্ঞানং বহ্মেতি ব্যজানাৎ”*[১]।(তৈত্ত.উপ,২-৩-৪-৫) অর্থাৎ অন্নই ব্রহ্ম, কারণ অন্ন হতেই ভূতগণ জন্মায়, জন্মের পর অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে এবং অন্তিমকালে অন্নে প্রতিগমন করে তাতে বিলীন হয়।প্রাণই ব্রহ্ম, কারণ প্রাণ হতেই এই ভূতগণ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয়ে প্রাণ দ্বারাই জীবিত থাকে এবং বিনাশ কালে প্রাণেই প্রতিগমন করে বিলীন হয়। মনঃ অর্থাৎ মনই ব্রহ্ম, কারণ মন হতে ভূতগণ জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর মনের দ্বারাই জীবিত থাকে এবং মৃত্যুকালে মনে প্রতিগমন করে তাতে বিলীন হয়। ঐতরেয়োনিষদের ঋষি বলেছেন *“স এতমেব পুরষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যাদিদ* মদর্শমিতী”[১]। [ঐত.উপ,৩/১৩] সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের প্রকাশ। “আমি আকাশাদি ভূতসমূহকে অর্থাৎ সর্বজগতকে ব্রহ্মরূপে দেখিয়াছি”। বৃহদারযকোপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপে দুই রূপের উল্লেখ করা হয়েছে – “মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ”[১]।(বৃহদ.উপ,২/৩/১) এই উপনিষদে ব্রহ্মের দুটি রূপের কথা বলা হয়েছে তা হল মূর্ত ও অমূর্ত, মর্ত্য ও অমর্ত্য, স্তিতিশীল ও গতিশীল, 'সৎ' অর্থাৎ সত্তাশীল এবং 'ত্যৎ' অর্থাৎ অব্যক্ত। এর অর্থ বায়ু ও আকাশই অমূর্ত্ রূপ এবং তিনি অমৃত, তিনি গতিশীল, তিনিই অব্যক্ত সত্তা ও সৎ।বৈদিক ঋষিগণের ব্রহ্মানুভূতি হল–“ব্রৈহ্মবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্”- এই জগতে শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই।(মুণ্ডক.উপ,২/২/১২)।আবার *বৃহদারযকোপনিষদে বলা হয়েছে “তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মাব্রহ্মসর্বানুভূরিত্যনুশাসনম্”* – এই ব্রহ্মের পূর্বাপর

নাই অন্তর –বাহির নাই, এই আত্মাই ব্রহ্ম, সর্ব বিষয়ের অনুভব কর্তা (বৃহদ,উপ,২.৫.১৯)।

উপনিষদ্ ও ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় যে তত্ত্বটি স্থাপিত হল তাতে এই বিশ্বের মৌলিক শক্তিকে ‘ব্রহ্ম’ বলা হয়েছে। ব্রহ্মময় বিশ্ব, বিশ্বের সমস্তই ব্রহ্মময় তাই বিশ্ব ব্রহ্মময়। *‘তত্ত্বমসি’*বা *‘অহং ব্রহ্মাস্মিই’* হচ্ছে উপনিষদের মূলবক্তব্য। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপনিষদে যেমন অখণ্ড জীবনদর্শন সুচারুভাবে বর্ণিত রয়েছে তেমনি ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের মাধ্যম এই উপনিষৎ সেকথাও দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে। উপনিষদের মূল শিক্ষা হল প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছে। এই ঈশ্বর ‘ব্রহ্ম’ বা ‘আত্মা’, জীবের দিব্য সত্তা যা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণশক্তি, মন, বুদ্ধি ও অহং জ্ঞান থেকে আলাদা। *“যস্তু সর্ব্বানি ভূতানি আত্মন্যেনানুপশ্যাতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে”* (ঈষ.উপ,৬)। যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন এবং সকল ভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখেন তিনি কাওকেও ঘৃণা করেন না।সুতরাং জগৎ মণ্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান ও জগৎ-সংসারের কর্মে ঈশ্বরের কর্ম এই জ্ঞানে যিনি বদ্ধপরিকর হবেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সক্ষম হবেন। ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় উপনিষদের অনেক স্থলেই আত্মা’ ও ‘ব্রহ্ম’ এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কঠোপনিষদে ব্রহ্ম *“সর্বভূতান্তরাত্মা”*[১] (কঠ, উপ,২/২/৯)রূপে বর্ণিত।আবার মাণ্ডুক্যোপনিষদে *“অয়মাত্মা* ব্রহ্ম*”*[১] (মাণ্ডুক্য.উপ,২)- যিনি আত্মা তিনিই সর্বাধার বৃহৎ বস্তু। ছান্দোগ্য উপনিষদে “তৎতত্ত্বমসি” সেই বস্তু তুমি। আবার *“সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম”*এই সমুদয় ব্রহ্ম, জ্ঞানে, ভোগে এবং কর্মে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের মূল ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার একমাত্র স্থান এই সংসার তথা কর্মক্ষেত্র যা ব্রহ্ম মন্দির। এই বিশ্বসংসার ব্রহ্মের প্রেমময় প্রকাশ।এই অনন্ত প্রেমতত্ত্বে তাঁর আনন্দলীলা মহিমান্বিত।এককথায় তিনি সবেতে, সব তাতে তিনি, তিনি ছাড়া কিছু নেই। তিনি নিত্য-শশ্বত-সনাতন। তিনিই আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব। তোমাতে-আমাতে নেই কোন ভেদাভেদ,তুমি-আমি সমস্ত বিশ্ব-সংসার ব্রহ্মময়, বিশ্বময় ব্রহ্ম, ব্রহ্মময় বিশ্ব,বিশ্বের মৌলিক শক্তি ব্রহ্ম। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের এই সূক্তটি উল্লেখ্য – *“একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বান*মাহুঃ*”*[৫৭] ।(ঋগ্বেদ-১/১৬৪/৪৬)সকল মানুষ, সকল জীব, সকল বস্তুকে জড়িয়ে প্রচ্ছন্নভাবে সব কিছু ব্যপ্ত করে আছেন ব্রহ্ম। ‘ব্রহ্মময়-জগৎ’ সুতরাং, জগতের জাগতিক বস্তু ও ক্রিয়া ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত এই জ্ঞানে আমরা স্নেহ-ভালোবাসা-ত্যাগ-সেবার মাধ্যমে সংসারে থেকেও ব্রহ্মকে লাভ করতে পারব, উপনিষদ্ যেন এই শিক্ষাই দেয়। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে অর্থাৎ সংসার ধর্ম পালন করেও ব্রহ্মজ্ঞান তথা ব্রহ্ম-লাভ সম্ভব, আর এই ব্রহ্ম জ্ঞান ও ব্রহ্ম লাভের উপায় হল উপনিষদ্ ।উপনিষদের “পরম রহস্য” বৈদিক ঋষিদের মত বোধগম্য না হলেও আমাদের সাধারণ জ্ঞানে এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত সারবস্তুর সরলার্থ বলতে পারি, উপনিষদ্ আমাদের এই নির্দেশ করে যে, জগৎ তথা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়, জীব-জগৎ ব্রহ্মের সৃষ্টি

এবং প্রত্যেক জীবেই তিনি বিরাজমান, সুতরাং প্রত্যেক জীবের প্রতি যত্নবান হলে, ভালোবাসলে তবেই সৃষ্টিকর্তা তথা ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করা যায়।শ্রী রামকৃষ্ণও একই কথা বলেছেন- "শিব জ্ঞানে জীব সেবা"। আবার স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন – "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" ।উপনিষদে যেন ব্রহ্মবিদ্যার মধ্য দিয়ে বিশ্বের সকল জীবও জগৎকে একটি অখণ্ড সত্তায় উপলব্ধি করিয়ে একত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করায় তেমনি মনব-সভ্যতায় প্রকৃতির গুরুত্বও ও প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হবার বার্তাও নির্দেশ করে। পৃথিবীর জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, মেঘ, বৃষ্টি, বৃক্ষ,পর্বত প্রভৃতি সমস্ত কিছুর কথা উল্লেখ রয়েছে উপনিষদে।বৃহদারযকোপনিষদে বলা হয়েছে – *"মধুবাতা ঋতায়য়ে।মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।মাধ্বীর্ন সান্ত্বাষাধীর্ভূঃ স্বাহাঃ।মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধূমান্ অস্তু সূর্যঃ।মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ"*[১] ।।(বৃহদ.উপ,৬.৩.৬) অর্থাৎ বাতাসে মধু বয়, নদীর জলে সেই মধু ক্ষরে।ঔষধিরা আমাদের নিকট মধুময় হোক। আমাদের পিতা দ্যৌ মধুময় হোক।বনস্পতি,সূর্য এবং গাভীগুলি সকলেই আমাদের নিকট মধুময় হোক।এই মন্ত্রে সমগ্র পৃথিবী তথা বিশ্বের সাথে একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আধ্যাত্ম চেতনার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে এমন আপন করে দেখার, এমন পরিবেশ সচেতনার উদাহরণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। উপনিষদের বাণী মানুষকে জীবনের সম্পূর্ণ সদর্থক, মিলনাত্মক, ঐক্যবোধক ও পূর্ণতার প্রতি পথ নিদর্শক করে। উপনিষদের সাধনা হল অখণ্ড, আনন্দের ও অমৃতের। উপনিষদের লক্ষ্য হল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান।উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে বেদান্ত তথা উপনিষদের এই চার মহামন্ত্রই(*"প্রজ্ঞানং-ব্রহ্ম","অহং-ব্রহ্মাসি","তত্ত্বমসি","অয়মাত্মা"*)পারে আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা,দুঃখ,কষ্ট, মোহ,লোভ,শোক,হিংসা তথা মৃত্যুকে অতিক্রম করে মুক্তজ্ঞানের অধিকারী করে অমৃত-আনন্দ সাগরের অতলে ডুব দিয়ে অন্তঃপুরের ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে। শ্রী শ্রী পরমহংসদেব রামকৃষ্ণের এই মধুর গানটি যেন তারই বার্তা দেয়– ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।/তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি, রে প্রেম রত্নধন ...।

তথ্য-সূত্র`

১. অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশ্চন্দ্র ঘোষ, উপনিষদ অখণ্ড সংস্করণ -হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭।

২. Rev.A.S.Geden, M.A,Edinburgh, and By Paul Deussen, Authorised English Translation: The Philosophy Of The Upanishads, The Religion and Philosophy of India..By:T&T.Clark,38 George Street, 1996, Page 12-13.

৩. Maxmueller, Sacred Books of the East,vol.I, P ixxxi.

৪. তব কথামৃতম্, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের আলোচনা, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ,(পৃ ৫১-৫২)

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশনা বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট।কলিকাতা ১৯৬১।(পৃ ৩৩, ২২ নং কবিতা)।

৬. Percy Bysshe Shelley, ADONAIS: An Elegy on the Death of John Keats Published for the Shelley Society Byreeves and Turner 196 Strand 1386(XLII)

৭. রমেশচন্দ্র দত্তের ভূমিকা অবলম্বনে শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধায়, ঋগ্বেদ-সংহিতা – হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭।(পৃ ২৯৯)।

ইতিহাস ও কল্পনার মেলবন্ধন : আফসার আমেদের ‘হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা’

আলমগীর সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর

বিষয় সংক্ষেপ : বিংশ শতকের আটের দশকে আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে আবির্ভাব। তাঁর কথাসাহিত্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্থান পেলেও মূলত মুসলিম সমাজের অন্দরমহলের কথা ব্যক্ত করতে লেখক যেন বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী রচনা ‘কিস্‌সাধর্মী’ উপন্যাসগুলি তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে স্থান করে দিয়েছে। আলোচ্য ‘হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা’ (২০০৭) টিতে ইতিহাস ও কল্পনার অটুট মেলবন্ধন ঘটেছে। সমাজগত দিক থেকে দেখলে কিস্‌সা বলতে বোঝায় উপন্যাস, আখ্যায়িকা , কথা ও গল্প। এই কিস্‌সায় সাহিল চরিত্রের বহুগামিতা, জাসমিন ও ফাহমিদার লালসার কথা ফুটে উঠেছে। রূপকথার নানান ঘটনায় উপন্যাসটি আবৃত। রূপকথার নায়িকা রিজি। তার বাবার বংশানুক্রমে ঐতিহ্যের আভিজাত্য ও বৈভবের বর্ণনা আছে। তার সঙ্গে আভিজাত্য টিকিয়ে রাখার একটি দর্শনও আছে। এই আভিজাত্য লেখক সাহিলের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। সাহিল ও রিজির মধ্য দিয়ে লেখক স্বপ্ন ও বাস্তবতার আলোকে প্রবাহমান জীবনধারাকে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা ইতিহাসগত দিক থেকে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি উপন্যাসের রসবোধকে বহুগুণ ত্বরান্বিত করেছে।
সূচক শব্দ :কিস্‌সা, বহুগামিতা, আভিজাত্য, সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, ফকিরপাড়া, রূপকথা, কিংবদন্তি।

মূল প্রবন্ধ :

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় আফসার আমেদ একজন অন্যতম স্থপতি। তিনি ১৯৫৯ সালে হাওড়া জেলার বাইনানের কড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্য রচনা শুরু ‘সংযম’ (১৯৭৩) কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে গল্প-উপন্যাস রচনাতে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর অমর সৃষ্টি ‘কিস্‌সা সাহিত্য’ রচনা। একথা বলার কারণ তিনি কিস্‌সাধর্মী মোট ছয়টি উপন্যাস রচনা করে পাঠক মহলে যথেষ্ট সাড়া জুগিয়েছেন। কিস্‌সাগুলি বাংলা আখ্যানে এক নতুন আঙ্গিক বহন করে আনে। বর্তমানেও সেই কিস্‌সাগুলির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায়না। কিস্‌সাগুলিতে মুসলিম সমাজের কথা উঠে আসলেও এর বাইরেও এগুলির একটি সার্বজনীন গুরুত্ব রয়েছে। যেকোন সমাজে এরকম ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং মুসলিম সমাজ

কেন্দ্রিক বলা পুরোটাই সঠিক বলে আমার মনে হয় না। কারণ এমন ঘটনা সচরাচর অন্য ধর্মেও ঘটতে দেখা যায়। একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে এসেও তাঁর কিস্‌সাগুলি গতি হারায়নি। তাঁর সাহিত্যগুলি পাঠক মনে রসদ জুগিয়েই চলেছে। তিনি নির্মাণ করেছেন সময়োপযোগী সাহিত্য। তাঁর কিস্‌সাগুলিতে জীবন্ত হয়ে রয়েছে ইসলামিক মিথ, নারীর যন্ত্রণা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা, শ্রেণি সংগ্রাম, রূপকথা, কিংবদন্তি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ।

কিস্‌সা বিশেষ্য অর্থে 'কেচ্ছা' বা 'কুৎসামূলক গল্প'। আরবিতে 'কিস্বহ' শব্দটির অর্থ 'কাহিনি'। কিন্তু আরবি শব্দ 'কিস্‌সা' উর্দুতে উচ্চারণের কারণে শব্দটি হয়ে দাঁড়ায় 'কিস্‌সা'।[১] আবার আমরা যদি সেই 'কেচ্ছা' শব্দটির বিশেষ্য অর্থ করি তাহলে অর্থ দাঁড়ায় (ক) কাহিনী, গল্প (খ) কুৎসা, কলঙ্ককাহিনী।[২] কথাকার আফসার আমেদ উক্ত 'কিস্‌সা' শব্দটিকে বিকৃত থেকে মুক্ত করে তার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করে তিনি বললেন, আমি কলঙ্ককাহিনী লিখেছি মাত্র।'[৩] আফসার আমেদ রচিত কিস্‌সাগুলি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। কিস্‌সা বলতে বোঝায়, ভালোকথায় এটি গল্প, কথা, উপন্যাস কিংবা আখ্যায়িকা। বিস্ময়ের ভাষায় বলতে গেলে এটি এক প্রকার অদ্ভুত গল্প বা বিচিত্র কথাকে বোঝায়। আর রাগের কথায় এর অর্থ দাঁড়ায় 'বচসা বা বাদানুবাদ'। কেলেঙ্কারির কথায় এটির অর্থ কুৎসা, কেচ্ছা, নিন্দার কথা বা অপবাদ কথা। একটা মানুষের জীবনে প্রয়োজনে হোক কিংবা অপ্রয়োজনেই হোক এই সকল উপাদানই একসঙ্গে থাকতেই পারে। যদি প্রয়োজনে থাকে তাহলে সুচতুরভাবে সে এটির ব্যবহার করবে। আর অপ্রয়োজনে রাখলে ক্রমশ এর অধীনতা মানতে মানতে সেই ব্যক্তি মানসিক রোগগ্রস্ত পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। আফসার আমেদ রচিত কিস্‌সাগুলির মধ্যে 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'য় সফীউল্লা, 'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা'য় সাহিল উভয়েই এই দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেন যাতায়াত করে।

আফসার আমেদ রচিত 'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা'(২০০৭) একটু ভিন্ন ধর্মী উপন্যাস। মুসলিম সমাজের পর্যালোচনার পাশাপাশি তিনি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করেছেন। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বিভিন্ন বিদ্রোহ আমাদের চোখে পড়ে। যেমন- সাঁওতাল বিদ্রোহ, হুল বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ইত্যাদি। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন। তেমনি তিনি অমর-সৃষ্টি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অতিসুন্দর ভাবে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা তুলে ধরেছেন। কথাকার আফসার আমেদও ঐতিহাসিক পটভূমিকে নিয়ে উক্ত উপন্যাসটি রচনা করেছেন। তাঁর এই কিস্‌সাতে ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার একটি অবাধ সংযোগ দেখতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের যে একটি ইতিহাস আছে তা উপন্যাসটি গভীরভাবে অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। সন্ন্যাসী বা ফকির বিদ্রোহ বলতে বোঝায়,"আঠারো শতকের শেষের দিকে (১৭৬০-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলাতে ফকির ও সন্ন্যাসী বা মুসলিম ও হিন্দু

তাপসদের তৎকালীন ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনকে বোঝানো হয়ে থাকে।”[৪] বাংলা এবং বিহার সহ সমগ্র উত্তর ভারতে কয়েকশো বছর যাবত কিছু ভবঘুরে মানুষ বসবাস করতেন। যাদের মধ্যে কিছু হিন্দু-মুসলমানও ছিল। তবে এই সকল মানুষরা ধর্মের কঠোর অনুশাসন থেকে বিচ্যুত থাকতেই ভালবাসতেন। এদের কাছে নানান রকমের বাদ্যযন্ত্র থাকতো যা অনেক গ্রাম গঞ্জে ঘুরে ঘুরে বাজাতেন, লোকগীতি গাইতেন; তাদের গানের মধ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা সুখ-দুঃখের কথা নিহিত থাকত। অনেক সময় তারা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একযোগে যেতেন। এদের রাজ্য, রাজনীতি ক্ষমতা পাবার লোভ কিংবা সাংসারিক বন্ধনের প্রতি কোন মায়া ছিল না। গান শুনে গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষ খুশি হয়ে যা দান করতেন তা সন্তুষ্টি মনে গ্রহণ করতেন। এভাবে দান গ্রহণেই তাদের জীবন অতিবাহিত হত। তবে এদের মধ্য থেকেই কিছু মানুষ যুদ্ধের সময় কখন কখন ভাড়া করা সৈনিকের কাজ করতেন। তারা তাদের পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু চাষের জমি পেতেন, আবার অনেক সময় খাদ্য শস্য বা কিছু অর্থ পেয়ে থাকতেন। অনেক সময় তারা তাদের পুটলির ভেতরে কিছু সামগ্রী নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। যেমন রেশম, মসলা বা কোন মূর্তি ইত্যাদি। এই মূর্তিগুলি তারা গ্রাম-গঞ্জে বিক্রি করে থাকতেন। এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে তাদের জীবন চলছিল। সমস্যার সূত্রপাত ঘটে তখন, যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রাজস্ব আদায় শুরু করে। কোম্পানি সাধারণ মানুষের কাছে রাজস্ব আদায় করতে পারলেও এই সন্ন্যাসী বা ফকিরদের কাছ থেকে রাজস্ব নিতে পেরে উঠত না। কারণ এদের স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, আর তাদের খোঁজ খবর রাখাও ছিল আয়ত্ত্বের বাইরে।

ব্রিটিশদের হাত ধরে এই ফকির-সন্ন্যাসীরাও ছাড়া পায়নি। তারা নানা ভাবে এই ফকির-সন্ন্যাসীদের উত্ত্যক্ত করতে শুরু করে। প্রথম ধাপে এই ফকিরদের দেখতে পেলেই কোম্পানির লোক জোরপূর্বক কর আদায় করত। আর তাতেও দিতে রাজি না হলে মারধোরও পর্যন্ত করত। তাছাড়া টাকার অভাবে বাদ্যযন্ত্র বা খাদ্য সামগ্রী পর্যন্ত হস্তান্তর করত। এরপর ব্রিটিশরা সন্ন্যাসী-ফকিরদের জমির উপর নজর দেয়, যা তারা যুদ্ধে গিয়ে পারিশ্রমিক স্বরূপ পেয়েছিল। তারা তাদের জমি কিনে নিতে থাকে, অনেক জমিতে ইংরেজদের পাহারাদার রাখা হত। যাতে ফকির-সন্ন্যাসীরা রাজস্ব না দিয়ে পালাতে না পারে।মন্দির কিংবা মসজিদের বাইরে এদের থেকে তীর্থ কর আদায় করতে থাকে ব্রিটিশ শাসক। এরপর ব্রিটিশ সরকার আইন জারি করে এসব ফকির-সন্ন্যাসীদের দান গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা। এই ভাবে নানা ঘটনায় এই ভবঘুরে ফকিরদের জীবন অতিষ্ট করে তোলে কোম্পানি। ১৭৬৩ সালে কোচবিহারের দিনহাটায় সন্ন্যাসীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে, অপরদিকে ঢাকায় সমস্ত ফকিরেরা একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ শুরু করে। ধীরে ধীরে এই বিদ্রোহ গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। আমরা জানি, ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোঘলদের কাছ থেকে বাংলা, বিহারের রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন। তখন তারা সাধারণ মানুষের মতো ফকির-সন্ন্যাসীদের

উপর করের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এই সময় ফকির-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সঙ্গ দিতে বাংলার বহু সাধারণ কৃষক এগিয়ে আসে। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রোমণ আরও জোরালো হয়ে ওঠে। তার একবছর বাদে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জানা যায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছিলেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় ইংরেজরা কোনরকম সাহায্য করেনি, বাংলার মানুষকে। ফলে ব্রিটিশদের উপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। দলে দলে সাধারণ মানুষ ফকিরদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৭৭৩ সালে রংপুরে আচমকা হামলা করে বিদ্রোহীরা।তাতে ক্যাপ্টেন টমাস মারা যান। তখন বাংলার গভর্নর ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর বিশাল বাহিনীর কাছে ফকিররা হেরে যান। কিন্তু বিদ্রোহ এখানেই স্তমিত হয়ে যায় নি, এরপর এর নেতৃত্ব দেন মজনু শাহ। তিনি বহু বছর ধরে বিদ্রোহ চালিয়ে যান। মজনু শাহের পর মুসা শাহ যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু তিনিও ১৭৯২ সালে মারা যান। আঠারো শতকের দিকে এই বিদ্রোহ শেষ হয়ে যায়। তবে বহু বছর ধরে চলা এই বিদ্রোহ ইংরেজদের রাতের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছিল - তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভবানীপাঠক ও দেবী চৌধুরানী। সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষিজীবী মাদারি ফকিররাও কোম্পানির অপশাসনের শিকার হয়েছিলেন। এই প্রকার সন্ন্যাসী-ফকিররা কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলেও তারা সন্ন্যাসী ও ফকিরের পোশাকই ব্যবহার করত। আফসার আমেদ রচিত'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা'য় সাহিল নামক চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক ইতিহাসের এক বৃহৎ আন্দোলনের কথা তুলে ধরেছেন। এখানে লেখকের কল্পনা ও বাস্তবতা মিলেমিশে একাকার হয়েছে। কল্পনা হঠাৎ বাস্তবতার আলোকে উঁকি মারে। রূপকথার নায়িকা রিজির ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে আভিজাত্যবোধ নিহিত আছে। মোট ৪৫ টি পর্বে উপন্যাসটি বিন্যস্ত হয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত সাহিল মাঝে-মাঝেই বাস্তবতা হারিয়ে ফেলে। বছর বিয়াল্লিশের সাহিল স্ত্রী, পুত্র কন্যা নিয়েই তার সংসার। প্রচুর আর্থিক সম্পদের অধিকারীও হয়েছে সে। সাহিলের মধ্যে বহুগামিতার একটি মানসিকতা ছিল। তা না হলে স্ত্রী-সংসার থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীর প্রতি আকর্ষিত হওয়া সম্ভব হত না। উপন্যাসে সে স্ত্রী ছাড়া তিনটি নারীর প্রতি আকর্ষণ দেখিয়েছে। যথা- সাহিলের দূর সম্পর্কে ভাগ্নি, নিজ শালী জাসমিন এবং নায়িকা রিজির প্রতি।

উপন্যাসে দেখা যায়, বাগনান স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরেই সাহিলের বাড়ি। তার পাড়ার নাম ফকিরপাড়া। এই ফকিরপাড়ায় সরকারি কিছু খাস জমি ছিল। কিন্তু বছর কুড়ি আগে কিছু গরিব মানুষদের মধ্যে পাট্টা বিলি করে বসতি স্থাপন করা হয়েছে। মাঝে মাঝে সাহিলের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে চলে যাওয়া এক অবাস্তব অলৌকিকতা। আসলে রিজির মধ্যে সে একটা প্রেমের কিস্‌সার খোঁজ করেছিল। ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সে রিজির হৃদয় জয় করতে চেয়েছে। রিজি তাদের ফকির

পাড়ারই এক বাসিন্দা। রিজি তার আসুরা নানিকে নিয়ে একা থাকে। ফকিরপাড়া থেকে বাগনানের দূরত্ব মাত্র নয় কিলোমিটার। সাহিল ইচ্ছা করলেই এই পাড়া ছেড়ে বাগনানে এসে স্থায়ী বসবাস করতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। এই না করাও একটি ইতিহাস আছে। এই ফকিরপাড়ার সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্র আছে। সাহিল এখানে ইতিহাসকে মান্যতা দিয়ে চলে। আজ থেকে প্রায় দুশো আড়াইশো বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বাংলার ফকিররা যখন যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন একজন ফকির সৈনিক এ পাড়ায় এসে আত্মগোপন করেছিল। আর পরবর্তীতে সেই ফকিরের সময় থেকে এই পাড়ার নাম হয় ফকিরপাড়া। সাহিলের বিশ্বাস সেই ফকিরের আশীর্বাদেই আজ তার এত ধন-দৌলত। তাই সে এ পাড়া ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না।

ফকিরপাড়া ছেড়ে চলে যাওয়াকে যেমন সাহিল অন্যায় বলে মনে করে, তেমনি প্রবেশ করারও একটি ইতিহাস আছে। এই পাড়াতে একমাত্র আদি বংশধর ছাড়া অন্য কোন মানুষের প্রবেশের অধিকার নেই। তবে হ্যাঁ, মেয়ে জামাইরা চাইলে এসে বসবাস করতে পারে, এতে কারোর আপত্তি ছিল না। যাদের সঙ্গে পাড়ার আর মানুষের রক্তের কোনরূপ সম্পর্ক নেই, তারা এখানে স্থান পায় না। কিন্তু পাড়ার অন্য অনেক মানুষ নানা স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, সাহিল তা পেরে ওঠেনি, বলা ভালো যেতে চায়নি। ফকিরপাড়ার উপরে ফকিরের রব আছে এমনটা সেই পাড়ার প্রত্যেক মানুষের প্রত্যয়। বংশ পরম্পরায় এ পাড়ার মানুষরা সেই রবের সুবিধা ভোগ করেই চলেছে। পাড়ার মানুষের ধারণা এই রবের আশীর্বাদের ফলে এখানে কোন অঘটনও ঘটে না। যেমন- এ পাড়ার কেউ আগুনে পুড়ে মরে না, কেউ জলে ডুবে যায় না, সন্তান প্রসব করতে গিয়েও নারীরা মরে না। এতদ্ সত্বেও ফকিরের কিছু বাধা নিষেধকে এ পাড়ার মানুষরা মান্যতা দিয়ে চলে আসছে দীর্ঘকাল যাবৎ। সেগুলি হল- "এক, পাড়ার কেউ অবৈধ যৌনাচার করবে না। দুই, সুদ খাবে না। তিন, একাধিক বিয়ে করবে না। এক স্ত্রীত্বে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"[৫] কিন্তু সাহিল এত জেনেও একসময় অঘটন ঘটিয়েই বসে।

কিস্‌সার সমস্ত ঘটনা রিজিকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। যুবতী রিজি স্বপ্নে-আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে ভাবে কোন রাজকুমার তাকে ঘোড়ায় চড়ে সন্ধান করেই চলেছে। রিজি সেই রাজকুমারকে ধরা না দিয়ে লুকিয়েই থেকেছে। রিজি তার দারিদ্রতাকে রাজকুমারের কাছে প্রকাশ করতে চায়। তার রূপ আছে, কিন্তু তার রূপ প্রকাশের কোন সুযোগ থাকে না। কেননা পেশায় সে ভিখিরি। রিজির মায়ের বিয়ে ফকিরপাড়া থেকে কিছুটা দূরত্বে গদিগ্রামে হয়েছিল। অকালে বাবা-মা মারা যাওয়ায় রিজি তার বিধবা নানির কাছে ফিরে এসেছিল। কথাকার তার বাবা প্রসঙ্গে বলেছেন, "রিজির বাবা ঠাকুরদা পরদাদা যে-সে ফকির ছিল না, নামজাদা ফকির ছিল। তারা ঘোড়া নিয়ে জরির পোশাক পড়ে গান গেয়ে খানদানি ফকিরের বেশে ভিক্ষে করত।"[৬] সেই

পেশাদার ফকির-বংশ আজ লোপ পেয়েছে। ভিটে-মাটি সব চলে গেছে। রিজি সেই বংশেরই একমাত্র সুন্দরী যুবতী। সে তার বংশের শখের পেশাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। ইচ্ছে করলেই সে সুন্দর একটা বিবাহ করতে পারে। কিন্তু তা করেনি কারণ তার ধারণা বিয়ের পর স্বামী যদি সেই ভিক্ষাবৃত্তিকে গ্রহণ না করে। তাই সে তার রূপ অন্ধকারের আড়ালে রেখে দূর গ্রামে ভিক্ষে করতে চলে যায়। ভোরেই বেরিয়ে পড়ে, রাত্রে ফেরে। তার রূপকে মানুষের আড়ালে রাখে নোংরা পোশাক পরিধান দ্বারা। এই ভিক্ষা করাকে রিজি তার ফকিরি ঐতিহ্য বলে মনে করে।

ফকিরপাড়ার প্রভাবশালী ব্যক্তি সাহিল রিজির রূপে পাগল হয়ে যায়। রিজির খোঁজে সে একপ্রকার বাস্তবতা হারিয়ে ফেলে। তবুও তাকে খুঁজে পায়না। রিজি ভিক্ষা বৃত্তি করা, আলুথালু পোশাক পরাতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সাহিলের চুম্বন স্পর্শ রিজি পেয়েছিল। উপন্যাসে তা বর্ণিত আছে। রিজি ভিক্ষাবৃত্তির জীবন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে চায়। সেখানে সে ছেদ চায় নি। তার বহু পূর্বপুরুষ ফকির ছিল, ভিক্ষাবৃত্তি করেই জীবন অতিবাহিত করেছে। রিজিও তাই চায়। বংশের দৈন্য ও দীনতার দর্শনকে রিজি একভাবে মেনে চলে। শুধু ভিখিরি বলে রিজিরা সামান্য মানুষ নয়। তার পূর্বপুরুষদের গলায় থাকত বহু মূল্যবান রত্নের মালা, যা তারা সংগ্রহ করেছিল দেশ-বিদেশ থেকে। সেই রত্নগুলির মধ্যে ইতিহাস ও সভ্যতার একপ্রকার স্পর্শ ছিল।

রিজির পূর্বপুরুষরা ঘোড়া নিয়ে ভিক্ষে করতে যেত। রিজি শৈশবেও তার বাবাকে ঘোড়া নিয়ে ভিক্ষে করতে যেতে দেখেছিল। কিন্তু বংশের শেষ ঘোড়া তার বাবারই ছিল। তার সামনে সেই ঘোড়া দানা-পানি না খেতে পেয়ে অকালে মরে যেতে দেখেছিল। তাদের বংশের শেষ ঘোড়াটিকে রিজি মরতে দেখেছিল। ইতিহাস সাক্ষী আছে, ফকির বিদ্রোহের সময় এই ভিক্ষে করা পেশাদার ফকিররা ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল। যাদের কিছুই ছিলনা নেই এই সকল নিঃস্ব, সম্বলহীন মানুষরা বিদ্রোহ করেছিল, এর সঙ্গে কৃষক এবং ভিক্ষুক ফকিররাও যোগ দিয়েছিলেন। ফকির বংশের ফকিরা মারা গেছেন কিন্তু রিজিই একমাত্র অবশিষ্ট রয়ে গেছে। ইতিহাসের এই ভিক্ষাবৃত্তির দর্শনকে রিজি চালু রাখতে চায়। নিজের রূপকে আড়ালে রেখে তার স্বেচ্ছা ভিক্ষাবৃত্তি, তার এক ধরনের কৃচ্ছ্রতাকে জীবনের সার্থকতা মনে করে সে। রিজি চাক্ষুস দেখেছে তার বাবা হাসান ফকির মৃত্যুর আগে গলায় থাকা মূল্যবান রত্নের হার' যা তিনি প্রিয় মানুষদের বিলিয়ে দিত। কথাকার আফসার আমেদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন- "ভিখিরি বলে মূল্যবান রত্ন উপহার দিতে পারবে না?ফকির তো আসলে কৃচ্ছ্রসাধন, পার্থিব বিষয়ে দৈন্য। আসল তো মানবসত্তা।"[৭] রিজির বাবা মারা যাওয়ার আগে রিজিকে এক টুকরো হিরের সন্ধান দিয়েছিল। সেই হিরেটি রিজি আজও আগলে রেখেছে। এই হিরের কথা আসুরা নানিকেও রিজি জানায়নি। তার ধারণা রত্নের প্রতি নানির লোভ জন্মাতে পারে। রিজির রত্নের প্রতি লোভ নেই কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি চরম লোভ আছে। আর এই ঐতিহ্য চিহ্ন এই হীরকখণ্ডটি।

রিজি ভিক্ষে করতে যাওয়ার সময় রাখাল বালক মধুর কাছে হিরেটি গচ্ছিত রেখে যায়। সন্ধ্যায় ফেরার পথে আবার নিয়ে আসে। সাহিল ভিখিরি রিজির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। পথমধ্যে সে নানান কিংবদন্তি জানতে পারে। সাজুমাঝি, কুমোর জ্যাঠা কিংবা মধু হালদারের মাঝে রিজি গল্পে একজন হয়ে ওঠে। কারণ তারা রিজিকে রোজই দেখে। রিজি ভিখারিনির সঙ্গে সাহিলের দেখা হলে ইতিহাসের পুনর্মিলন ঘটবে। শুধু সেই একই পাড়ার বাসিন্দা ভিখারিনি ভিখিরিই থেকে গেছে, আর সাহিল হয়েছে অর্থবান।রিজির সঙ্গে সাহিলের দেখা করার বাসনা ও কল্পনা কম আকর্ষণীয় নয়। এখানেই যেন কোন কল্পকাহিনি নিহিত আছে। তা না হলে সাহিলের মতো অর্থবান ব্যক্তি ভিখিরির পিছু পিছু ঘুরবে না। সাহিল সাংসারিক ব্যথায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সে আশ্রয় খুঁজছে বাস্তব যাত্রার মধ্যেই কল্পকাহিনিকে। ফকির পাড়ার সৈনিকরা হেরে গিয়েও সামাজিক কিছু নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে গেছে-এখানেই ইতিহাসের গুরুত্ব।

সাহিল ফকিরপাড়ারই একজন বাসিন্দা। সেই সূত্রে সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না, তা জেনেও ভিখারিনির উদ্দেশ্য তার প্রেমের অভিসার। এর কোন অর্থ হতে পারে না। অপরদিকে রিজিও সুন্দরী মাদারী ফকির বংশের কন্যা। সাহিলের স্ত্রী ভেবেছে তার স্বামী যদি অন্য কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে তার আপন বোন জাসমিনকে বিয়ে করতেই পারে। এখানে ফাহমিদার লোভের প্রাধান্য দেখা যায়। তা নাহলে আপন বোনের সঙ্গে নিজ স্বামীর বিবাহের কথা কি কোন নারী ভাবতে পারে। ফকির পাড়াকে কেন্দ্র করে কিংবদন্তির জন্ম হতে থাকে। যেমন- সাহিল রূপকথার স্বপ্নে দেখেছিল এক ইংরেজ সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে ফকির পাড়ায় এসে আস্তানা নিয়েছিল। আসলে লেখক প্রকৃত অর্থে সাহিলের স্বপ্নের ঘোরে দেখা রিজির বাবারই কথা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তা ছাড়া সাহিল সেই ফকিরকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখেছে। সেসময় যখন ফকির বিদ্রোহ কিছুটা শিথিল হয়ে গেছে, তখন এক ফকির যোদ্ধা নেতা ঘোড়া ছুটিয়ে আশরফ পাড়ায় এসে আমৃত্যু থেকেছিলেন। আর তার নামানুসারেই এ পাড়ার নাম হয়েছিল।

রিজির কাছে হিরে থাকার কথা সাহিল কুমোর জ্যাঠার কাছে জানতে পারে। এও জানতে পারে এই হিরের লোভ যদি সাহিলের প্রধান হয়ে ওঠে, রিজি যদি অপ্রধান হয়ে যায়- তাই সে সম্পর্কে আসতে রাজি হয়নি। সাহিল হিরের কথা বিশ্বাস করতেই পারছিল না। সাহিল কুমোরের কাছে কসম খেয়ে বসে—

> ‘‘তাহলে আমি ফকিরপাড়া ছেড়ে দেব, দ্বিতীয় বিয়ে করব।’
>
> ‘তাহলে তো ভোগে যাবেন আপনি।’
>
> ‘আমার প্রেম থাকবে না, আমার শাস্তি সেখানেই। ভিখারিনির প্রেম আমি ত্যাগ করব।’
>
> ‘ভোগের মধ্যে এ কেমন ত্যাগ!’

'আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। সে রূপসী বলে আমাকে টেনেছে, তার চেয়ে বেশি ভিখারিনি বলে।"[৮]ভিখারিনির ছদ্মবেশধারী সাহিলের ভবিষ্যৎবাণী করে। এই বলে যে সাহিল ভিখারিনির কাছে একদিন হিরে ভিক্ষা চাইবেন এবং প্রেম প্রত্যাক্ষাত হবেন। রিজি জানে সাহিলের দম্ভ, প্রেম দুটিই আছে কিন্তু প্রেমের মধ্যে নিবেদিত হওয়ার বিনয় ও দীনতা নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে শশীর মধ্যেও এমনটা ছিল। কিন্তু রিজির ভিক্ষাবৃত্তিতে রিজি স্বপ্নের ঘোরে দেখার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন—

"ঘুম। সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে যায়। আর স্বপ্ন দেখতে থাকে আশ্চর্য ঘোড়ার শব্দ। তার গায়ে বাহারি রঙের মখমলের ঝালর। তার লাগাম ধরে হাঁটতে হাঁটতে কোন ফকির চলেছে রাস্তা ধরে। ফকিরের গলায় বহু মনি-মুক্তো-হিরে-জহরত খচিত হার। ফকির যেতে যেতে ভিক্ষের গান গেয়ে চলেছে। রাস্তার দুপাশের মানুষ সালাম জানাচ্ছে। তার ঝোলার ভিক্ষে ভরে দিচ্ছে।"[৯] এই স্বপ্নের ভেতর রিজির ইতিহাসের পদসঞ্চার ঘটে।

উপন্যাস শেষে দেখা যায় সাহিল বাগনানে 'শবনম' নামক ফ্ল্যাট উদ্বোধন করবে। এমন সময় সেখানে তার শালী জাসমিনকে নিয়ে ঘর সাজাচ্ছিল, ঠিক সে সময়ে তাদের খুনসুটিও চলছিল। রিজি ভিখারিনির ছদ্মবেশে সাহিলের দরজায় হাজির হয়। ভিক্ষে চেয়ে বসে। সাহিল ভিখারিনি রিজিকে চিনতে পারেনি। উপরন্তু কু-কথা বলে বসে। বলে বসে- "শুধু ভিক্ষে নাও,কোনদিন তুমি ভিক্ষে দিয়েছ?"[১০] রিজি সঙ্গে সঙ্গে তার আঁচলের থেকে কাগজে মোড়া হিরের খণ্ডটি সাহিলের হাতে দিয়ে দেয়। জাসমিন তা খুললে সাহিলের মাথায় বজ্রঘাত হয়। তাকে এখন দ্বিতীয় বিয়ে করতে হবে, ফকিরপাড়া ছাড়তে হবে। কারণ পূর্বের জ্যোতিষ গণনা ফলে গেছে। রিজি এখন নিশ্চিন্ত হতে পারে। হিরের মোহটা তার আর থাকল না। এখন সে সাজু মাঝি পুরুষ হিরের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কারণ সাজু মাঝির কাছ থেকে একটা ঘোড়াও চেয়েছিল সে। রিজির ধারণা তারা দুজনে বিনয়, দীনতার বার্তা নিয়ে তারা দুজনে দূর গ্রামে ভিক্ষে করতে যাবে। রাখাল বালককে যে রিজির ভালো লাগেনি এমনটা নয়। রিজির মনকে নাড়িয়ে দিয়েছিল যে গল্পটি তা হল— রাখাল বালকের রাজকন্যা ও রাজত্ব পাওয়ার গল্পটি। আসলে এটি তো একটি লোককথা, রূপকথার গল্প। আফসার আমেদ নানান ঘটনার সমবায় ইতিহাসের বাস্তবতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন গল্পের মাধ্যমে। অপরদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব রূপ ভিখারিনি রিজির অবস্থানের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। রিজির বুদ্ধিমত্তার কাছে পুরুষ যে বেওকুফ বনে যায় তার প্রমাণ উপন্যাসটি। একদিকে ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার লড়াই অপরদিকে নারীর স্বাধীনচেতা মনোভাব দুদিক থেকেই রিজি জয়ী হয়েছে। সুতরাং উপন্যাসটি ইতিহাস ও কল্পনার মিলিত সমন্বয়ে পাঠক মহলে নজির সৃষ্টি করেছে।

তথ্যসূত্র :

১। বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র, মে ২০০১, ‘সংসদ বাংলা অভিধান’,কলকাতা,সাহিত্য সংসদ,পৃষ্ঠা-১৯১।

২। তদেব, পৃষ্ঠা-২০৬।

৩। ৬ জানুয়ারি ২০১৮, আমার নিজস্ব সাক্ষাৎকার।

৪। https:/bn.m.wikipedia.org.wiki

৫। আমেদ, আফসার,জানুয়ারি ২০১৬,, মাঘ ১৪২২, ‘কিস্‌সা সমগ্র-২’, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, দে’জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-১১৭।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১২১।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা-১২৭।

৮। তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৬।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা-১৭৯।

১০। তদেব, পৃষ্ঠা-২০৩।

ট্রিলজির প্রাথমিক ইতিহাস ও বিশ্ব সাহিত্যে ট্রিলজি ফর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

মৌমিতা দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সাহিত্যের নতুনত্বের পথে নতুন নতুন ফর্ম বা ধারা তৈরি হয়েছে। যা সাহিত্যকে প্রতি ক্ষেত্রে একধাপ করে এগিয়ে দিয়েছে সামনের দিকে। বিশ্ব সাহিত্যে নজর দিলে এমন বহু নতুন ধারার সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। যা পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে অন্যরূপে অন্যরকম বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরি করেছে সাহিত্যের নতুন রূপ। এমনি একটি ধারা হল ট্রিলজি (Trilogy)। সেই ধারার উৎপত্তি, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলায় সে অর্থে তেমন আলোচনা উঠে আসেনি। ট্রিলজি এই ফর্মের উৎপত্তি প্রথমে দেখা যায় গ্রিক নাটকে। সেই গ্রিক নাটকে এই ফর্মের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। পরবর্তীতে বিশ্ব সাহিত্যে এই ফর্মের ব্যবহার দেখা যায়। তারও পরবর্তী সময়ে বাংলা কাব্যে ও উপন্যাসে এই ফর্মের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। আমরা মূলত এই ফর্মের উৎপত্তি, গ্রিক নাটকে ও পাশ্চাত্যের উপন্যাসে এর ব্যবহার, বৈশিষ্ট্য দেখার চেষ্টা করবো। সাহিত্যের এই ধারাতে সময়ের যে বিশেষ ভূমিকা আছে তা দেখানোর চেষ্টা করবো। বাংলা সাহিত্যের ট্রিলজি নিয়ে আলোচনা না থাকলেও এই সূচনা পর্ব যে বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারা তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে তা আমরা বুঝতে পারবো।
সূচক শব্দ : ট্রিলজি, সাহিত্য, ফর্ম বা ধারা, নাটক, ডায়োনোসিয়া, ট্রাজেডি, তিন পর্ব, গ্রিক, পাশ্চাত্য।

মূল আলোচনা :
সাহিত্যের অন্যতম একটি ফর্ম বা ধারা হল ট্রিলজি। বিশ্বসাহিত্যে নজর দিলেও যেমন এই ধারা দেখা যাবে, তেমনি বাংলা সাহিত্যেও এই ধারা দেখা যাবে। ত্রয়ী বা ত্রিলেখ বা ত্রিধা নামে বাংলা সাহিত্যে এই ধারা প্রচলিত। এই ধারায় তিনটি পর্ব বিশিষ্ট একটি সম্পূর্ণ কাহিনি থাকে। যেখানে কাহিনির ও চরিত্রের একটা ধারাবাহিকতা দেখা যায়। গ্রিক নাটকে এই ফর্মের ব্যবহার দেখা গেলেও পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ভাষা এবং বাংলা উপন্যাসেই বেশি এই ফর্মের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা কাব্যে ও চলচ্চিত্রে এই ফর্মের ব্যবহার খুব স্বল্প খুঁজে পাওয়া যায়। ট্রিলজি ফর্মের উৎপত্তি কোথায় কিভাবে হয়, বিশ্ব সাহিত্যে এর প্রভাব কতদূর তা আমরা দেখার চেষ্টা করবো।

ট্রিলজির উৎপত্তি ও অর্থ বিশ্লেষণ

সাহিত্যের একটি বিশেষ ফর্ম বা জাঁর হল ট্রিলজি বা ত্রয়ী। গ্রিক নাটকে এই ফর্মের ব্যবহার প্রথম দেখা যায়। যা 'Trilogia' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি সাহিত্যের ধারায় এই ফর্মের ব্যবহার দেখা গেছে। বাংলা সাহিত্যের ধারায় বিশেষভাবে উপন্যাসে এই ফর্মের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। এছাড়া কাব্য ও চলচ্চিত্রে এই ধারা লক্ষনীয়। গ্রিক শব্দ 'Trilogia' থেকে ইংরেজি 'Trilogy' শব্দটি এসেছে। ইংরেজি 'Trilogy' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'ত্রয়ী' শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলায় যদিও অনেকে ত্রিলেখ, ত্রিক, ত্রিধা বলে থাকেন, তবে 'ট্রিলজি' শব্দটি বাংলাতেও অনেক বেশি প্রচলিত। গ্রিস দেশে প্রাচীন সময় থেকে এই ফর্মের প্রচলন ছিল। 'Dianysia' নামক এক প্রাচীন গ্রিক উৎসবে এই ফর্মের প্রচলন হয়। 'The Oresteia' গ্রিক সাহিত্যের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ট্রিলজি। যা অনুষ্ঠিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫৮ তে।

ট্রিলজির তিনটি পর্ব কখনো আলাদা আলাদা সময়, ঘটনার প্রেক্ষিতে সাধারণত লেখা হয় না। একটা সময় থেকে শুরু করে সময়ের একটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রচিত হয়। ট্রিলজিতে তিনটি পর্ব থাকে, এবং এই তিন পর্বের নাট্যকার বা লেখক বা কবি একজনই হয়ে থাকেন। ধারাবাহিকতা ট্রিলজির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য, তাই সময়, ঘটনার ও চরিত্রের ধারাবাহিকতা সাধারণত ট্রিলজিতে থাকে। 'Trilogy' শব্দের 'Tri' শব্দের অর্থ 'Three' অর্থাৎ তিন। গ্রিক শব্দ 'logia' অর্থে বচন বা শব্দ যা লিখিত অথবা মৌখিক। ট্রিলজিতে তিনটি পর্ব থাকার কারণ এই শব্দের মধ্যেই নিহিত আছে। 'Trilogia' শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় –

> A trilogy is a series of three connected literary works may be fiction or any other branch of creative arts.[১]

'ডায়োনোসিয়া' উৎসবে তিনটি ট্রাজেডি ও একটি স্যাটায়ার মিলিয়ে একটি 'Tetralogy' মঞ্চে অনুষ্ঠিত হত। তিনটি ট্রাজেডিকে 'Trilogia' বলা হত। তাই গ্রিক ট্রিলজি সম্পর্কে যে বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাতে বলা হচ্ছে –

> The set of three tragedies from a tetralogy is called a trilogy.[২]

গ্রিস দেশের এথেন্সে অন্যতম একটি উৎসব 'ডায়োনোসিয়া'। সেখানেই প্রথম তিনটি পর্বে নাটকের সংরূপে এই ফর্মের প্রথম ব্যবহার হয়। ট্রিলজির অর্থ অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে গ্রিক সাহিত্যে এই ফর্মের ব্যবহার একমাত্র ট্রাজেডির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি গ্রিক ট্রিলজি অবশ্যই ট্রাজেডি।

> Series of three related tragedies performed at Athens at the festival of Dionysus.[৩]

এথেন্সের Dionysia উৎসবে প্রথম ট্রিলজি ফর্মের ব্যবহার হয়। সেই সময়ের প্রথম ট্রিলজি লেখক ছিলেন Aeschylus, যাঁর 'Oresteia' হল সেই সময়ের ট্রিলজির অন্যতম এক উদাহরণ। এছাড়া সফোক্লিসের 'ইডিপাস', 'ইডিপাস অ্যাট কলোনাস', ও 'আন্তিগোনে' অন্যতম আরও একটি গ্রিক ট্রিলজি। অন্যান্য ভাষার উদাহরণ হিসেবে Robertson Davies's এর 'Deptford Trilogy' ও Roddy Doyle's 'Barrytown Trilogy' এর নাম উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের ধারায় ট্রিলজি ধারা বেশ কয়েকটি সংরূপে দেখা হয়, যেমন - চলচ্চিত্র, উপন্যাস, নাটকে, কাব্যে ও গানে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চরিত্র, ঘটনা, কাহিনিতে ধারাবাহিকতা থাকে। ট্রিলজিতে তিনটি সম্পূর্ণ বই বা চলচ্চিত্র বা যেকোনো আর্ট ফর্ম তৈরি হওয়া সম্ভব। যার ঘটনা, কাহিনি, চরিত্রে ধারাবাহিকতা থাকে আর তা অবশ্যই কোনো একজন লেখকের রচিত হয়। এই ধারার আরো একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট সময়ের একটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রচিত হয়ে থাকে। এটি সাহিত্যের এক ধরণের বিশেষ শৈল্পিক ধারা। ট্রিলজিতে তিনটি পর্ব থাকে, যা একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। বাংলা সাহিত্যে সাধারণত উপন্যাস, কাব্য ও চলচ্চিত্রে এই ফর্মের ব্যবহার হয়। অন্যান্য সংরূপে তেমনভাবে এই ফর্মের ব্যবহার দেখা যায় না।

বিদেশি সাহিত্যের ধারায় ট্রিলজি ফর্মের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে Robertson Davies এর 'Deptford Trilogy' নাম করা যেতে পারে। আবার S. Burroughs এর 'Nova Trilogy' উল্লেখযোগ্য একটি ট্রিলজি। John Galsworthy এর 'The Forsyte Saga', Chinua Achebe এর 'African Trilogy' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও Roddu Doyle's এর 'Barrytown Trilogy', Amitav Ghosh এর 'Ibis Trilogy', Carmac Mc Carthy এর 'The Border Trilogy', Naguib Mahfouz এর 'Cairo Trilogy প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ট্রিলজি শব্দটি স্বল্প হলেও গানের বিষয়ে যুক্ত। যেমন David Bowie এর 'Berlin Trilogy' যা গানের সুর ও কথার বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। এই গান বার্লিন ও জার্মানিতে রেকর্ড করা হয়। এই গানের গায়ক Adele এটিকে ট্রিলজি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

গ্রিক উৎসব Dionysia(ডায়োনোসিয়া) :

ট্রিলজির আলোচনা করতে হলে মূল উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে জানতেই হয়। Dionysia গ্রিস দেশের একটি প্রাচীন উৎসব। প্রাচীন এথেন্সে দেবতা Dionysus এর সম্মানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হত। 'All dramatic performances at this period took place at festivals of the god Dionysus.' যার কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম একটি ছিল ট্রাজেডি নাট্য প্রদর্শনী। গ্রিক নাট্যাভিনয় ডায়োনিসাসের উৎসবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। যদিও খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৭ অব্দ থেকে কমেডিও প্রদর্শিত হতে থাকে। বসন্তকালীন উৎসবে ট্রাজেডির অভিনয় হত, এবং শীতকালীন উৎসবে কমেডির অভিনয় অনুষ্ঠিত হত। প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী নাট্যকারকে নাটকে প্রয়োগের

জন্য সঙ্গীত রচনা ও নৃত্যের পরিকল্পনা করতেও হত। উৎসবটি পাঁচ-ছয়দিন চলতো। প্রথমদিন বর্নাঢ্য এক শোভাযাত্রা হত। পরের তিনদিন সকালের দিকে ত্রয়ী ট্রাজেডি ও একটি স্যাটির (Satyr) নাটকের অভিনয় হত। বিকেলের দিকে কমেডির অভিনয় হত। শেষ দুদিন ডিথ্যাইর‍্যাম্বের প্রতিযোগীতা চলত।

> Every year three tragedians competed for a prize, each producing four plays on one day; and five comic poets competed for another prize, each producing one play.[৪]

পানাথেনিয়ার পর এটি ছিল গ্রিকদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। Dionysia দুটি উৎসব নিয়ে গঠিত – Rural Dionysia, City Dionysia। এখনো বিভিন্ন জায়গায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই উৎসবটিকে Great Dionysia বলা হয়। যা থিয়েটারের (বিশেষত ট্রাজেডি) দিকে মানুষকে পরিচালিত করে।

গ্রিক পৌরাণিক মতে Dionysus (ডায়োনিসাস) দ্রাক্ষা ফসল, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও ওয়াইনের দেবতা। গ্রিক পুরাণে তাঁকে সভ্যতার উন্নয়নকারী, আইন প্রণেতা ও শান্তির দেবতা বলা হয়ে থাকে। কখনো কখনো তাঁকে কৃষি, উর্বরতা ও থিয়েটারের দেবতা বলা হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে তাঁর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রিক পুরাণে তিনি একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। গ্রিক থিয়েটারের উন্নয়নের পিছনে তাঁর উৎসবগুলি মূল চালিকা শক্তি ছিল। ডায়োনিসাসের প্রাচীন মূর্তিগুলি একটি পুরুষ। পরবর্তী সময়ের ছবিগুলিতে তাঁকে নগ্ন বা অর্ধ-নগ্ন তাত্ত্বিক যুবক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

উৎসবটি বর্তমানে মানবতার উদযাপন ও সংস্কৃতির একটি প্রদর্শনী হিসেবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্থা, ক্লাব প্রতি বছর এপ্রিল মাস নাগাদ বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নাটক তৈরি করে।

> The Great Dionysia also incorporated religious ceremonies and performances of dithyrambs(a form of non-dramatic choral song). The plays, however, were not religious rituals; they had no RITUAL function and their content had no necessary connection with Dionysus. The plays were mass entertainment, ...[৫]

এই উৎসবে প্রথম ট্রিলজি ফর্মের প্রচলন হয়। চারটি পর্বে নাটককে বিভাজিত করে দেখানো হয়, যার প্রথম তিনটি পর্ব ট্রাজেডি, যাকে ট্রিলজি বা গ্রিক শব্দে 'Trilogia' বলা হয়। বিখ্যাত গ্রিক নাট্যকার ইস্কাইলাসের নাটকে প্রথম এই ফর্মের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রিক ট্রিলজির পর্যালোচনা :

গ্রিক ট্রিলজিগুলির মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত ট্রিলজি *Oresteia (ওরেস্টিয়া)*। প্রাচীন গ্রিক নাট্যকার ইস্কাইলাসের করুণ রসাত্মক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম এটি। ৪৫৮ সনে

প্রথম এই নাটকটি পরিবেশিত হয়। গ্রিক ট্রিলজিগুলির মধ্যে যেগুলির অস্তিত্ব এখনো আছে তার মধ্যে অন্যতম এটি। *Oresteia (ওরেস্টিয়া)* তিনটি সংযুক্ত নাটক। গ্রিক নাটকে ট্রিলজি ফর্মের ব্যবহার এই নাটকেই প্রথম দেখা যায়। তিনটি নাটক – *আগামেমনন(Agamemnon), দ্য লিবিশন বিয়ার্স(The Libation Bearers), দ্য ইউম্যানাইডস(The Eumenides)*।

সমাজের এক প্রতিবিম্ব হল নাটক। সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি নাটকের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। গ্রিক সাহিত্যগুলি বেশিরভাগই কালজয়ী, বিশেষ করে নাট্যসাহিত্য। গ্রিক নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইস্কাইলাস। তিনি প্রায় নব্বইটিরও বেশি নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু নানা যুদ্ধবিগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে তাঁর অনেক সৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে তাঁর সাতটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। যার মধ্যে তিনটি নাটক একটি ত্রয়ী নাটকের জন্ম দিয়েছিল। নাট্যকার ইস্কাইলাসের সময়ে দীর্ঘ কাহিনিকে তিনটি ভাগ করে, তিনটি নাটক পৃথক করে রচনা করার রীতি ছিল। তিন অংশ বা পর্ব বিশিষ্ট নাটকই Trilogia নামে পরিচিত ছিল। ইস্কাইলাসের অনেক নাটকই এই ট্রিলজি ফর্মের অন্তর্গত ছিল, এমনটা অনেকে মনে করেন। তিনি তাঁর নাটককে স্বদেশীয় পটভূমিতে সার্থক করার জন্য সংলাপকে সেই সময়ের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন। গ্রিক ট্রাজেডিগুলিতে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতিসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। নাটক মূলত ক্রিয়াশীলতার সৃজনভূমি। দীর্ঘ বর্ণনার ভার কখনোই তাঁর নাটককে আক্রান্ত করেনি। এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে নাট্যকার চলে গেছেন অনায়াসে। গ্রিসে মূলত উৎসবের সময় মঞ্চে অভিনয় করা হয়। ইস্কাইলাসের কিছু সময় আগে থেকেই এই প্রথা চালু ছিল।

প্রাচীন যুগের সময় থেকেই গ্রিক সাহিত্যে ভাগ্য বা নিয়তি বা দেবদেবী নিয়ন্ত্রিত হলেও সেখানে ব্যক্তিমানুষের প্রেম, সংগ্রাম ও সংকটের যে রূপ পাওয়া যায়, তা সর্বকালের। দেবদেবীদের মাধ্যমে মানব চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। গ্রিক নাট্যকার ইস্কাইলাস-এর '*দ্য ওরেস্টিয়ান ট্রিলজি*'র প্রথম নাটক '*আগামেমনন*'-এ আগামেমননের যে ট্র্যাজিক পরিণতি তার প্রতিশোধ পুত্র ওরেস্টিস পরবর্তীকালে নিলেও হিংসা কখনো নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। মানবজাতি তার বংশপরম্পরায় কর্মফলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেবদেবীর ভূমিকা সেখানে প্রতীকী অর্থে প্রকাশিত হয়েছে।

'আগামেমনন' নাটকটি ট্রয় পতনের সংবাদ দিয়ে শুরু। গ্রিক সেনাপতি, আর্গোসরাজ আগামেমনন দশ বছরের যুদ্ধ শেষে তার রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন। যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের সঙ্গে ট্রয়ের রাজকন্যা কাসান্দ্রাকে নিয়ে আসেন। আগামেমননের স্ত্রী ক্লাইটেমনেস্ট্রা, কোরাস ও অন্যান্যদের স্তুতি লাভের পর অন্তপুরে প্রবেশ করেন এবং তারপর নিজের স্ত্রীর হাতে নিহত হন। আপাত এই সরল কাহিনির ভেতর লুকিয়ে আছে গ্রিক মিথ ও মানুষের রক্তক্লেদ। আগামেমনন পৈতৃকসূত্রে রাজা ছিলেন, অপরদিকে ঘাতকের লক্ষ ছিলেন।

ট্রিলজির দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় আগামেমননের নির্বাসিত পুত্র অরেস্টিস বোন ইলেক্ট্রার সহযোগিতায় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়। অরেস্টিস নিবার্সিত অবস্থায় মারা গেছেন – এমন সংবাদ ছড়িয়ে দেন। রাজপ্রাসাদে পথিকের ছদ্মবেশে উপস্থিত হন এবং আজিসথুকে হত্যা করেন। মাকে হত্যা করতে গেলে মা তাকে চিনে ফেলেন। অভিশাপ বা স্নেহের জালে থামাতে পারেননি অরেস্টিসকে।

শেষ পর্ব 'ইউমিনিডিস'- মায়ের অভিশাপ তাড়া করতে থাকে তাঁকে। মায়ের অভিশাপ থেকে নিস্তার পায়না সে। একটা সংকট-সমস্যা বহু সংকট-সমস্যার সৃষ্টি করে। গ্রিক ট্রিলজিতে দেব-দেবী বা মানুষের কাজের মধ্যে দিয়ে নানা সংকট তৈরি হয় সেই সংকট বংশপরম্পরাতে প্রবাহিত হয়। তাই মাতৃঘাতক অরেস্টিসও শাস্তি পায়।

সফোক্লিসের 'ইডিপাস', 'ইডিপাস অ্যাট কলোনাস' ও 'আন্তিগোনে' অন্যতম একটি বিখ্যাত ট্রিলজি। সফোক্লিসের বিয়োগান্তক এই তিন পর্বের নাটক এক নিয়তির বার্তা দেয় আমাদের। ইডিপাস নাটকে দেখা যায়, থিবস নগরের রাজা ইডিপাস দেবতাদের অভিশাপে নিজের অনিচ্ছায় পিতার হত্যা করেন ও মায়ের শয্যাসঙ্গী হন। তাঁর পিতা লাসও জানতেন দেবতাদের এই অমোঘ বাণীর কথা। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছেলে ইডিপাসকে তিনি হত্যা করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। এক মেষপালককে ইডিপাসকে হত্যা করার দায়িত্ব দেন। কিন্তু সেই মেষপালক শিশু ইডিপাসকে সিথায়ন পর্বতে নিয়ে গিয়েও হত্যা করেন না, তুলে দেন অন্য এক দেশের মেষপালকের হাতে। শাপগ্রস্ত শিশু ইডিপাসকে সেই মেষপালক কোরিন্থ নগরের নিঃসন্তান রাজা পলিবাসের হাতে তুলে দেন। রাজা পলিবাসের সন্তান হিসেবে বড় হয়ে ইডিপাস সেই দৈববাণী শুনতে পান। সেই দৈববাণী এড়াতে কোরিন্থ নগর ত্যাগ করে থিবসে পৌঁছে যান যুবক ইডিপাস। পরিস্থিতি ও নিয়তির কারণে ইডিপাসের হাতে খুন হন রাজা লাস। নিয়তির কাছে পরাভূত হয় ইডিপাস।

পরবর্তী 'ইডিপাস অ্যাট কলোনাস' পর্বে দেখা যায় ইডিপাসের দুই ছেলে এটিওক্লেস ও পলিনেসের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ হারায়। ক্ষমতার লোভের বশে তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে পরিণত করে। শেষপর্ব 'আন্তিগোনে'তে নিয়তি জানান দেয়। ইডিপাসের দুই সন্তানের মৃত্যুর পর ক্রেয়ন নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং প্লনেসের শবদেহ কেউ কবর দেবে না, শকুন ও কুকুরে ছিঁড়ে খাবে এমন আদেশ দেন। কিন্তু আন্তিগোনে সেই আদেশ অমান্য করে সমাহিত করে ভাইকে। এর ফলস্বরূপ জীবন্ত সমাহিত করা হয় ইডিপাস কন্যা আন্তিগোনেকে। এর মূল্য অবশ্য দিতে হয় ক্রেয়নকেও। আন্তিগোনের প্রেমিক ক্রেয়নের ছেলে হ্যামন প্রেমিকার মৃত্যু শোক সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। - ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, লোভ, জেদ, অতিরিক্ত চাহিদা মানুষকে কীভাবে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যায়, তারই এক চিত্র ফুটে উঠেছে এই ত্রয়ী নাটকে।

গ্রিক ট্রিলজির সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

- গ্রিক নাটকে ট্রিলজি ফর্মের ব্যবহার দেখা গিয়েছে। গ্রিক সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপে এই ফর্ম বিশেষ দেখা যায় না। ডায়োনিসাস উৎসবে নাটকে এই ফর্মের ব্যবহার প্রথম হয়।

  Most of the Greek plays which survive were performed at Athens in the 5th century BC. All dramatic performances at this period took place at festivals of the god Dionysus... The four plays by a tragedian usually comprised three tragedies followed by a satyr play. ... The set of three tragedies from a tetralogy is called a trilogy.[৬]
- গ্রিক ট্রিলজিগুলি বেশিরভাগই ট্রাজেডি অর্থাৎ বিয়োগান্তক নাটক। বিষয় সাধারণত গুরুগম্ভীর।

  The style of tragedy can be supple can be supple, lively and, up to a point, colloquial, but always retains a certain dignity; it avoid jokes and indecencies associated with comedy and enriched by poetic words and expressions unknown in ordinary usage.[৭]
- কাহিনি আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত হয়ে থাকে। প্লট বৃত্তাকার ও সুগঠিত হয়ে থাকে।
- ত্রি-ঐক্য অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র তে ঐক্য দেখা যাবে।
- নাটকের প্রতিটা ঘটনার পরিণতি প্রায় একইরকম। এছাড়া গ্রিক ট্রিলজিতে মৃত্যু বা হত্যা অন্যতম একটি সমাধান হয়ে দেখা দিয়েছে।

  The fact that a Greek tragedy can end unhappily, however, and can contemplate death and acute suffering without escapism or false consolation, is a remarkable feature of the genre...[৮]
- গ্রিক সাহিত্যের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য কাহিনিতে মিথ, দৈব্যবাণী, অভিশাপ ও রাজরাজাদের কাহিনি বর্ণনা স্থান পেয়েছে। ট্রিলজির কাহিনিতেও তা দেখা যাবে।

  The great majority of tragedies dramatized events from the Greek myths. These traditional tales were believed to be historically true in essence, but were also felt to provide paradigms of human fortunes, against which men could measure their own experience.[৯]

- গ্রিক ট্রিলজির ভাষা কাব্যিক অলংকার যুক্ত।
  We are surprised by the fact that though we see no one on the stage we hear, somewhere in the deep of darkness, the solitary voice of a man humming nervously to himself...[১০]
- দেবদেবীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের ভুল ত্রুটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। সমাজের বাস্তব চিত্রকে স্পষ্ট রূপে তুলে ধরা হয়েছে। যার ফলে গ্রিক ট্রিলজিগুলিতে সময়ের গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থার চিত্র স্পষ্ট রূপে ফুটে ওঠে।

গ্রিক ট্রিলজিতে প্রতিফলিত সময়ের ভূমিকা :

সাহিত্যের সমস্ত ফর্মে বা ধারাতে সময়ের একটা বিশেষ গুরুত্ব থাকে। লেখক, কবি বা নাট্যকার সময়কে নিয়েই রচনা করে থাকেন। কখনো সেই সময় রচনার মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে, কখনো সময় রচনার ধারাবাহিকতার সহায়ক হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে।

গ্রিক ট্রিলজি নাটকগুলিতে দেখা যায় গ্রিক পুরাণের দেব-দেবী বা রাজ-রাজাদের কাহিনিতে চরিত্র হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাই সময়ের একটা মুখ্য ভূমিকা অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। নাটক সমাজের দর্পণ, গ্রিক নাটকগুলি সমাজের সেই সময়ের নানা বিষয়কে খুব স্পষ্ট রূপে ফুটিয়ে তুলেছে। ইস্কাইলাসের 'ওরেস্টিয়া' ট্রিলজিতেও সমাজের নানা দিক ফুটে ওঠে। সেই সময়ের সমাজ, রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক একটা ধারণা তৈরি হয়। রাজ-রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও যুদ্ধ জয়ের পর কিভাবে এক রাজ্য অন্য রাজ্যের হস্তগত হত; সেই সময় চিত্রিত হয়েছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে গ্রিক ট্রাজেডিগুলিতে সেই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতি প্রতিফলিত হয়েছে। আবার 'ইডিপাস' ট্রিলজিতে এক বিশেষ সময়ের রাজাদের জীবনযাপন ও অভিশাপ ও নিয়তির পরিণাম পরিস্ফুট হয়েছে। সেই সময়ের সমাজ প্রেক্ষিতে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সময়।

এছাড়া রাজরাজাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ও তাদের একাধিক পত্নী থাকা সেই সময়ের প্রেক্ষিতকে তুলে ধরে। মিথ, দৈববাণী, অভিশাপ সেই সময়ের সংস্কৃতি ও মানুষের বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে তোলে। রাজ-রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করে। সময়প্রেক্ষিতে কাহিনিতে ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যা বিশেষভাবে সময়কে সূচিত করে।

আমরা গ্রিক ট্রিলজিতে দেখতে পাবো মৃত্যু দৃশ্য। সবকিছুর সমাধান বা শেষকে মৃত্যু দিয়ে টানা হয়েছে। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হত। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই সময়কে আমরা খুঁজে পাই গ্রিক ট্রিলজিতে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে অন্যান্য ভাষার নির্বাচিত ট্রিলজির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা :

ইংরেজি, রুশ, আরবি, আফ্রিকান ইত্যাদি পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধারায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ট্রিলজি আছে, সেগুলির বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের জন্য কাহিনির প্রেক্ষাপটে সময় আলাদা কোনো গুরুত্ব পেয়েছে কিনা তা সংক্ষেপে দেখার চেষ্টা করবো আমরা। এই প্রসঙ্গে John Galsworthy এর 'The Forsyte Saga', Robertson Davies এর 'Deptford Trilogy', S. Burroughs এর 'Nova Trilogy', Roddu Doyle's এর 'Barrytown Trilogy', Amitav Ghosh এর Ibis Trilogy, Carmac Mc Carthy এর 'The Border Trilogy', Chinua Achebe এর 'African Trilogy', Naguib Mahfouz এর 'Cairo Trilogy' প্রভৃতি আলোচনায় আনার চেষ্টা করা হবে।

- John Galsworthy(1867-1933) ছিলেন একজন ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রচনা 'The Forsyte Saga'। এটি একটি আধুনিক কমেডি। একটি উচ্চ-মধ্যবিত্ত ইংরেজ পরিবারের তিনটি প্রজন্মের গল্প। ১৮৮৬ থেকে ১৯২০ সময় এই ট্রিলজিতে ফুটে উঠেছে। তিনটি পর্ব - 'Man of Property'(1906), 'In Chancery'(1920), 'To Let'(1921)। 'The Forsyte Saga' একটি পরিবারের তিন প্রজন্মের কাহিনি। ফোরসাইরা সর্বদা সম্পদ বৃদ্ধির জন্য উদ্বিগ্ন। সম্পত্তির জন্য তাদের আকাঙ্খা নৈতিকভাবে কতটা ভুল তা উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। 'Man of Property' তে সোমেস ফোরসাইট চরিত্রের মাধ্যমে ফোরসাইটদের আক্রমণ করা হয়। তিনি একজন আইনজীবি এবং তার স্ত্রী হলেন আইরিন, যাকে তার স্বামী কেবল সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করতেন। অন্যদিকে আইরিন এক তরুণের প্রেমে পড়ে। 'In Chancery','To Let' এর কাহিনিতে সোমেস ও আইরিনের বিবাহবিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় বিবাহ এবং তাদের সন্তানদের দেখা যায়। কাহিনি শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক সম্পর্কের সন্ধান দেয়।

  কাহিনিতে আইরিন চরিত্রটি গ্যালসওয়ার্দি তাঁর নিজের স্ত্রী অ্যাডা গ্যালসওয়ার্দির উপর ভিত্তি করে তৈরি করেন। যিনি আসলে গ্যালসওয়ার্দির এক দাদার স্ত্রী ছিলেন। যার সঙ্গে তিনি গোপনে বহু বছর সম্পর্ক রেখেছিলেন এবং পরে বিয়ে করেন। গ্যালসওয়ার্দির উপন্যাসে সমাজের এক সরলীকৃত রূপ এবং ব্যক্তি জীবনের প্রতিফলন দেখতে পাই।

- Naguib Mahfouz তাঁর সত্তর বছরের দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি এনে দিয়েছিল 'Cairo Trilogy' নামের তিন পর্বের উপন্যাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ১৯৫২ সালে ক্ষমতাচ্যুত্য রাজা ফারুখের সময় পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দোলাচলতার একটা সময়পর্ব উঠে আসছে। 'Cairo Trilogy' মোট তিন খণ্ডের উপন্যাস। এই তিন খণ্ডের

নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি তিনটি রোডের নাম ব্যবহার করেছেন। এই খণ্ডগুলোর নাম যথাক্রমে Palace Walk(1956), Palace of Desire(1957), Sugar Street(1957)। উপন্যাসের তিন খন্ডের কাহিনি মোটামোটি একটি পরিবারের ভাঙা-গড়ার কাহিনি।

কাহিনি মূলত একটি পরিবারের কাহিনি। শুধু পরিবারের কাহিনির মধ্যেই যে এই সুবিশাল উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে তা কিন্তু নয়। কায়রো শহরে পিতৃতান্ত্রিকতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এখানে পুরুষ সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। নারী এখানে শুধুই ভোগের সামগ্রি। তবে মাঝে মাঝে এখানে নারীর ভূমিকাও চোখে পড়ে যেন তারা একেবারেই নগণ্য নন। আমিনা তেমনি একটি চরিত্র। অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিকতা থাকায় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আল সাইয়িদ আহমেদের একনায়কসুলভ আচরণ দেখা যাবে। পরিবারের সকলে তার ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকে। কিন্তু তার চরিত্রে বহুমাত্রিকতা দেখতে পাওয়া যাবে। একই সঙ্গে তিনি স্নেহশীল পিতা, কর্তব্যপরায়ণ স্বামী অন্যদিকে একজন নারীলোলুপ মাতাল আবার কখনো তিনিই প্রেমিক। অন্যদিকে আমিনার জীবন সাধারণভাবে কাটে। প্রতিদিনের নামাজের পর রুটি তৈরি করা দিয়ে তার জীবন শুরু হয়। তিনি সর্বদা সন্তানদের আগলে রাখেন। একবার স্বামীর অনুমতি না নিয়ে মাজার জিয়ারত করতে যায় সে, এবং এর জন্য তাকে সংসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই মা আবার স্বামী, সন্তানকে আগলে রাখার জন্য ফিরে আসেন।

- Chinua Achebe এর 'African Trilogy' - Things Fall Apart'(1958), 'No Longer at Ease' (1960), 'Arrows of God' (1964) এই তিন পর্ব নিয়ে রচিত। 'Things Fall Apart' উপন্যাসে মূলত ঔপনিবেশিক সময়ে ইগবো সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কিরূপ ছিল তা দেখিয়েছেন। খ্রিস্টীয়দের আগ্রাসনে নাইজেরিয়ার অবস্থা, আফ্রিকার অধিবাসীদের সাথে পশ্চিমাদের দ্বন্দ্ব এবং তাদের সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে। নাইজেরিয়ার ইওমোফিয়ার ইগবো গ্রামের প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ব্রিটিশদের আগ্রাসনের চিত্র ধরা পড়েছে। ওকোনকোর জীবনের উত্থান পতনের সাথে ব্রিটিশের আগ্রাসনে ইগবো জনজাতির অবস্থা দেখানো হয়েছে। 'No Longer at Ease' (1960) ওকোনকোর নির্বাসিত জীবনের কষ্ট, যন্ত্রনা তাকে জীবন সম্পর্কে এক অন্য উপলব্ধি এনে দেয়। স্বজাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার ফলস্বরূপ সে জীবনে যে ধাক্কা পায় তাতে সে নিজের বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়ে। উপনিবেশবাদের হাত থেকে স্বজাতিকে রক্ষা করা তার জীবনের সংকল্প হয়ে

দাঁড়ায় এই পর্বে। 'Arrows of God' (1964) ওকোনকো ফিরে আসে ইওমোফিয়ায়। সেখানে সে নিজেকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বহুদিন সে সেখানে না থাকায় অনেক কিছু বদলে যায় সেখানে। ঔপনিবেশিক শাসনে সব কিছু ভেঙে পড়তে থাকে, জীবন যাপনে আমূল পরিবর্তন আসে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ভয়ে তার স্বজাতিরা তাকে বিশেষ সাহায্য করে না। এই বাস্তবতার সাথে আপোষ করতে পারে না ওকোনকো, আত্মহননের পথে শামিল হয় সে।

- 'Fifth Business'(1970), 'The Manticore'(1972), 'World of Wonders'(1975) নিয়ে 'Deptford Trilogy' তৈরি হয়। ট্রিলজির কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই, একটি অল্প বয়স্ক ছেলে অন্যের দিকে তুষার বল ছুঁড়তে যায়, কিন্তু তা এক গর্ভবতী মহিলাকে আঘাত করে যার ফলে তার অকাল প্রসব হয়। 'Deptford Trilogy' এর বর্ণনামূলক ভঙ্গিমা ও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে বিখ্যাত।

  'Fifth Business' উপন্যাসটিতে Dunstable Ramsay কাহিনির বর্ণনা করেন। যিনি কানাডার দক্ষিণ পশ্চিমের ডেপ্টফোর্ড নামের এক শহরে বড় হয়ে ওঠেন। বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি একটি কলেজে শিক্ষকতার চাকরেই করতেন। উপন্যাসটি একটি চিঠির মতন, যা রামসে তার অবসর গ্রহণের পর কলবোর্ন কলেজের প্রধান শিক্ষককে লিখে পাঠান। ছেলেবেলার তুষার বল দিয়ে আঘাতের ফলে এক গর্ভবতী মহিলার কথা মনে করে দুঃখ পান। এবং কিভাবে এই ঘটনা তার জীবনকে প্রভাবিত করেছিল উপন্যাসের কাহিনি সেই সম্পর্কে জানায়।

  The Manticore' হল ডেভিডের ছেলের গল্প, যে সুইজারল্যান্ডে মনোবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যায়। থেরাপির সময় সে তার ও বাবার সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করে। উপন্যাসটি তার থেরাপি ও জীবন বিশ্লেষণের একটি বয়ান। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র রামসেকে আমরা অসুস্থ অবস্থায় উপন্যাসে পাই।

  'World of Wonders' এই উপন্যাসে আমরা পাই- রামসের বন্ধু Paul Dempster কে। তিনি যাদু করতে শেখেন এবং একজন বিখ্যাত যাদুকর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। Dunstable Ramsay কে আমরা উপন্যাসে ফিরে পাই।

- Roddu Doyle's এর 'Barrytown Trilogy' 'The Commitments' (1987), 'The Snapper' (1990), 'The Van' (1991) এই তিন পর্বে রচিত। 'The Commitments' এখনও পর্যন্ত লেখা বিভিন্ন মজার উপন্যাসের অন্যতম। একদল সঙ্গীত শিল্পীদের আত্মা আনার এক মজার

কাহিনি। 'The Snapper' হল কুড়ি বছর বয়সী Sharon Rabbitte এর গর্ভবতী হওয়ার কাহিনি। 'The Van' হল ১৯৯০ সালে আয়ারল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট ফুটে ওঠে।

- Amitav Ghosh এর Ibis Trilogy' 'Sea of Poppies'(2008), 'River of Smoke'(2011), 'Flood of Fire'(2015) এই তিন পর্ব নিয়ে রচিত। উত্তর ঔপনিবেশিক সাহিত্যের একটি অন্যতম নিদর্শন। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ১৮৩০ এর দশকে প্রথম আফিম যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কাহিনি লেখা হয়। বিশেষ করে ভারত ও চিনের মধ্যে আফিমের ব্যবসা এবং মরিশাসে পাচার হয়ে যাওয়া মানুষের কথাকে তুলে ধরে।

অন্যান্য ভাষার ট্রিলজির আপাত বৈশিষ্ট্য ও প্রতিফলিত সময়ের ভূমিকা :

বিশ্ব সাহিত্যের সম্পূর্ণ অংশে নজর দেওয়া সম্ভব না হলেও যে কয়েকটি উদাহরণ হিসেবে দেখানো হল, তাতে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংরূপের বদল ঘটেছে। আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম সংরূপ উপন্যাসের জন্ম হয়ে যাওয়াতে উপন্যাসে এই ফর্মের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। যার ফলে বেশিরভাগ লেখক বা ঔপন্যাসিক উপন্যাসে ট্রিলজি ফর্মের ব্যবহার করছেন।

- কয়েকটি ট্রিলজিতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সময় প্রেক্ষাপটের সময় হিসেবে উঠে এসেছে। যে সময় অবশ্যই একটা দীর্ঘ সময়।
- গ্রিক ট্রিলজি যেহেতু নাটকের ফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল তাই সংরূপগত ভিন্নতা বিশ্বসাহিত্যে বেশি দেখা গেল। এরফলে গঠনগত পরিবর্তন নজরে আসে।
- বহু ট্রিলজি শেষ হল দুঃখজনক কোনো এক ঘটনার মাধ্যমে, সমস্ত ট্রিলজিতে মিলনাত্মক শেষ পাওয়া গেল না। অর্থাৎ, গ্রিক ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে।
- তবে চরিত্রগুলি দেবদেবী বা রাজ-রাজার চরিত্র না হয়ে বাস্তবিক হয়ে উঠতে দেখা যাবে। যার ফলে সময়ের পূর্ণ প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া গেল। সমাজ ও মানুষের সমস্যার নানা দিক উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে ধরা পড়তে থাকল।
- কয়েকটি ট্রিলজিকে টেট্রালজি হতে দেখা যাবে পরবর্তী সময়ে। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক পরবর্তী সময়ে আরো পর্ব লিখছেন। যেমন – 'The Barrytown Trilogy' চতুর্থ পর্ব 'The Guts' (2013) লেখা হয়।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসে ট্রিলজি ফর্মের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। এছাড়া কাব্যে, নাটকে এই ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে। এই ফর্মে তিন পর্বের কাহিনি বিন্যস্ত থাকে। যার প্রতিটি স্বতন্ত্র আবার প্রতিটি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। একথার অর্থ প্রতিটি পর্ব এক একটি স্বতন্ত্র উপন্যাস বা কাহিনি হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে কাহিনির উৎস সন্ধানে গেলে দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো ঔপ্যনাসিক তিন পর্ব লেখার উদ্দেশ্য নিয়েই

লিখেছেন। আবার কেউ বা প্রথম অংশ লেখার পর বাকি অংশ লেখার কথা ভেবেছেন। এক্ষেত্রে, বোঝা যাচ্ছে ট্রিলজি সর্বদা পূর্ব প্রস্তুতিতে লেখা হয় না। একটা পর্ব লেখার পর অন্য অংশ না লিখলে লেখা সম্পূর্ণ হচ্ছে না, এমন চাহিদা থেকেও কখনো কখনো লেখা হয়। বাংলা উপন্যাস সংরূপে এই ফর্মের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ট্রিলজিগুলি হল - ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর উপন্যাস – ‘অন্তঃশীলা’(১৯৩৫), ‘আবর্ত’ (১৯৩৭), ‘মোহনা’ (১৯৩১)। সরোজ কুমার রায়চৌধুরী এর ত্রয়ী উপন্যাস – ‘ময়ূরাক্ষী’ (১৯৩৬), ‘গৃহকোপতী’ (১৯৩৭), ‘সোমলতা’ (১৯৩৮)। গোপাল হালদার এর ত্রয়ী উপন্যাস – ‘একদা’ (১৯৩৯), ‘অন্যদিন’ (১৯৫০), ‘আর একদিন’ (১৯৫১)। ‘পঞ্চাশের পথ’ (১৯৪৪), ‘ঊনপঞ্চাশী’ (১৯৪৫), ‘তেরশ পঞ্চাশ’ (১৯৪৬)। গজেন্দ্রকুমার মিত্র এর ত্রয়ী উপন্যাস – ‘কলকাতার কাছেই’ (১৯৫৭), ‘উপকণ্ঠে’ (১৯৬০), ‘পৌষ ফাগুনের পালা (১৯৬৪)। আশাপূর্ণা দেবী এর ত্রয়ী উপন্যাস – ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ (১৯৬৪), ‘সুবর্ণলতা’ (১৯৬৭), ‘বকুলকথা’ (১৯৭৪)। (সত্যবতী ট্রিলজি – পৌষ, ১৪২০)। গৌরকিশোর ঘোষ এর ত্রয়ী উপন্যাস – ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ (১৯৭৮), ‘প্রেম নেই’ (১৯৮১), ‘প্রতিবেশী’ (১৯৯৫) ইত্যাদি।

বিশ্বসাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যে এই ফর্মের ব্যবহার বিপুল। সাহিত্যের নতুনত্বের ধারায় ট্রিলজি একটি নতুন ধারা তৈরি করেছে। গ্রিক নাটকে এই ফর্মের ব্যবহার ও পরবর্তীতে অন্যান্য সাহিত্যে এর ব্যবহারে তফাৎ তৈরি হলেও সাহিত্যে নতুন ধারা তৈরি করে সাহিত্যের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তথ্যসূত্র:

১) দাস, বেলা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, *বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্ব,* কলকাতা, সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা: ৫

২) Stanton, Sarah and Banham, Martin, 1996, New York, *Cambridge Paperback guide to THEATRE,* Cambridge University Press, page – ১৪৭

৩) https://www.britannica.com/topic/Great-Dionysia, ০৫/১২/২০২৩, ১৭:৫০

৪) Stanton, Sarah and Banham, Martin, 1996, New York, *Cambridge Paperback guide to THEATRE,* Cambridge University Press, page – ১৪৭

৫) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৪৭

৬) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৪৭

৭) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৪৮

৮) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৪৮

৯) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৪৮

১০) Aeschylus’, 1989, *The Oresteia,* Translated by George Theodoridis, Chicago and London, The University of Chicago Press, page – 36

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি : তিনশো বছরের সন্ধিক্ষণে

ভীষ্মদেব মুখোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বারাসাত সরকারী মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : শোভাবাজারের 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' স্কুলের ত্রিশতবর্ষ আসন্ন। স্কুলকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। উনিশ শতকে ইংরেজি শিখতে গেলে বাঙালি ছাত্রদের ভর্তি হতে হত মিশনারিদের পরিচালিত স্কুলে বা হিন্দু কলেজে। গৌরমোহন আাঢ্য খ্রিস্টধর্মের প্রভাব মুক্ত ইংরেজি পাঠশালা 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' প্রতিষ্ঠা করেন। 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র প্রথম হেডমাস্টারের নাম প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌরমোহন সেমিনারির পার্টনার করেছিলেন টর্ণফুল সাহেব এবং হামান জিওফ্রি নামে একজন ব্যারিস্টারকে। 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র তিনটে বিভাগ একসঙ্গে চলত। একটি শিশু বিভাগ। দ্বিতীয়টি ইংরেজি পাঠশালা। তৃতীয়টি বাংলা পাঠশালা। স্কুলের পড়াশোনার মান ঠিক রাখার জন্য গৌরমোহন ইস্কুলের নিম্নতম শ্রেণিতে ইংরেজি ভাষা শেখানোর জন্য ফিরিঙ্গি শিক্ষক নিয়োগ করতেন। ইস্কুল ছাড়াও 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' সেকালে নানা সভা-সমিতির কেন্দ্রস্থল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই স্কুলের কিছুদিনের ছাত্র। 'ছেলেবেলা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন এই স্কুলের শাসনপ্রণালীর কথা। এছাড়াও ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়েছেন চন্দ্রনাথ বসু, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রসরাজ অমৃতলাল শিশুকালে এই 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'তেই পড়েছেন। সেকালে শুধু ইস্কুল নয়, অন্যতম সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবেও 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত। সে যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অক্ষয় দান এই ইস্কুল – 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি', একালেও অম্লান।
সূচক শব্দ: গৌরমোহন আাঢ্য, চন্দ্রনাথ বসু, উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষাকেন্দ্র, ইংরেজি পাঠশালা, ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র, 'পতিতোদ্ধার সভা'।

মূল আলোচনা :

ইস্কুলের নাম 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'। আর মাত্র বছর পাঁচেক, তারপরেই ৩৬৩ রবীন্দ্রসরণী, আহিরিটোলা, শোভাবাজার ঠিকানার এই স্কুলটি পা দেবে গৌরবোজ্জ্বল তিনশো বছরে। একটি বিদ্যালয়ের পক্ষে এতটা পথ পাড়ি দেওয়া সহজ কথা নয়। এই স্কুলের আরও একটি গৌরবের দিক আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই স্কুলের স্বনামধন্য অ্যালুমিনি। ইস্কুল এইজন্য গর্বিত। কিন্তু কিছুদিনের ছাত্র, বালক রবীন্দ্রনাথের মনে এই স্কুলের দিনগুলির ছবি কীরকম? ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রায় বছর সাতেকের শিশু রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হয়েছিলেন এই স্কুলে। স্কুলের বয়স তখন ঊনচল্লিশ।

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি আঁকতে বসে, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: 'কান্নার জোরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অকালে ভর্তি হইলাম। সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাঁহার দুই প্রসারিত হাতের ওপর অনেকগুলি স্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত।'[১] কেবল জীবনস্মৃতিতেই নয়, 'ছেলেবেলা' বইতেও রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: 'পালকির বাইরে এক-একদিন ছিল আমার মাস্টারি, রেলিঙগুলো আমার ছাত্র। ভয়ে থাকত চুপ। এক-একটা ছিল ভারি দুষ্ট, পড়াশুনোয় কিচ্ছুই মন নেই; ভয় দেখাই যে বড়ো হলে কুলিগিরি করতে হবে।'[২] বক্তা রবীন্দ্রনাথ এখানে শিক্ষক। বয়স তাঁর সবেমাত্র সাত কিংবা আট। বছর সাত-আটের বালক যখন শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন সে স্কুলের শিক্ষককেই নকল করে। শিক্ষকের অনুকরণেই সে তার ছাত্রদের কুলিগিরি করতে হবে বলে ভয় দেখায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'শিক্ষকের প্রদত্ত বিদ্যাটুকু শিখিতে শিশুরা অনেক বিলম্ব করে, কিন্তু শিক্ষকের ভাবখানা শিখিয়া লইতে তাহাদিগকে কোন দুঃখ পাইতে হয় না।'[৩]

এবারে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র দিক থেকে বিষয়টি দেখা যাক। স্কুলের একজন ছাত্রের মনে যখন শিক্ষার চাইতে শাসন প্রণালীর এমন একটা ভয়ংকর ছবি মনে দাগ কেটে বসে যায়, তখন সেই স্কুলের পরিবেশের সুস্থতা সম্পর্কে সত্যিই সংশয় জাগে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'তে তখন কি স্কুলের পরিবেশ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপযোগী ছিল না? এমন প্রশ্ন মনের ভেতরে জাগা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' আজ এসবের অনেক ওপরে। অনেকটা পথ আজ সে পেরিয়ে এসেছে। তার নিজস্ব একটা ইতিহাস গড়ে উঠেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র তখনও বিদ্যাসাগর হননি। সবেমাত্র বছর নয়েকের শিশু তখন। আর সুবিখ্যাত মিশনারি, আলেকজান্ডার ডাফ সাহেবের কলকাতা এসে পৌছুতে তখনও প্রায় চোদ্দ মাস দেরি। এমন একটা সময় আত্মপ্রকাশ করেছিল ইংরেজি পাঠশালা 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'। জন্মতারিখ ১ মার্চ, ১৮২৯। বছর সাতাশের এক যুবক, গৌরমোহন আঢ্য সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাঠশালা অথচ মাধ্যম ইংরেজি – এমনটা নিশ্চয়ই ছিল, সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্টই অভিনব। সেকালে ইংরেজি শিখতে গেলে বাঙালি ছাত্রদের ভর্তি হতে হত মিশনারিদের পরিচালিত স্কুলে বা হিন্দু কলেজে। সে সব জায়গায় পড়াশোনার পাশাপাশি সবসময় একটা ভয় কাজ করত। পাছে বাচ্ছারা খ্রিস্টান হয়ে যায় – এই আতঙ্ক সর্বদাই অভিভাবকদের মনের ভেতরে ধিকধিক করে জ্বলত আর জ্বালাত। বুদ্ধিমান গৌরমোহন খ্রিস্টধর্মের প্রভাব মুক্ত একটা পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছিলেন। সেইকারণে 'এক হিসেবে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি হিন্দু কলেজের (১৮১৭) বিপরীত দিকে চলিয়াছিল।...ওরিয়েন্টাল সেমিনারি সামাজিক সংরক্ষণ নীতির প্রশ্রয় দিয়া প্রাচ্য আদর্শকে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না বলিয়া দৃঢ় সংকল্প হইয়া বসিয়াছিল।'[৪] দেখা

যায়, সেকালের শিক্ষিত বাঙালি বনেদী পরিবারের অনেক শিশুই স্বচ্ছন্দে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হয়েছিল। ফলে প্রতিষ্ঠার বছর দুয়েকের মধ্যেই পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা প্রায় দুশো পার হয়ে গেল। গৌরমোহন এইসময় টর্ণফুল সাহেব এবং হামান জিওফ্রি নামে একজন ব্যারিস্টারকে সেমিনারির পার্টনার করে নিলেন। এই ব্যারিস্টার সাহেবের নাম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, হার্ডমান জেফ্রয়। আবার করুণাময় মজুমদার লিখিত বইতে এই সাহেব হারমান জেফ্রয় নামে পরিচিত। নাম যাই হোক, এই সাহেব ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতেই থাকতেন। ইংরেজি ছাড়াও গ্রীক, ল্যাতিন, হিব্রু ও জার্মান ভাষা জানতেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র অক্ষয় কুমার দত্ত এই সাহেবের কাছ থেকেই এইসব ভাষা শিখেছিলেন। প্রতিষ্ঠার বছর দুয়েকের মধ্যেই, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় সেকালের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি সম্পর্কে লেখা হল:

'অতএব নিবেদন করি মহাশয়।
বালককে শিখাইতে বাঞ্ছা যার হয়।।
উচিত তাহার ঐ স্থানেতে পাঠান।
রাখিয়া আপন ধর্ম্ম হইবে বিধান।।'

বোঝাই যাচ্ছে, নিজের ধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে, বালককে ইংরেজি শেখাতে চাইলে 'ঐ স্থানেতে পাঠান'-একটা স্কুলের পক্ষে অনেক বড়ো বিজ্ঞাপন। ক্রমশঃ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের একটা নতুন নামই সেদিন জনমানসে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল: 'গৌরমোহন আড্ডির স্কুল'।

প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন ছিলেন মাটির মানুষ। সহজ-সরল। মাথায় বুদ্ধি আছে। ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। অথচ হেডমাস্টার হলেন না। 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র প্রথম হেডমাস্টারের নাম প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌরমোহন প্রথম শ্রেণির ছাত্রদের ইংরেজি পড়াতে পারতেন না। নিজের এই না পারার কথা সেই ছাত্রদের কাছে অকপটে বলেও দিতেন। 'কলিকাতার ইতিহাস' বইতে গৌরমোহন সম্পর্কে লেখা হয়েছিল: '[গৌরমোহন] অতি মৃদু স্বভাব ছিলেন; আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নানাপ্রকার স্বভাব ও মেজাজের লোকের সহিত তাঁহাকে কারবার করিতে হইলেও তিনি অতি সুকৌশলে আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তিনি কখনও কাহারও বিরাগভাজন হন নাই।'[৫] স্কুলের বয়স যখন সবেমাত্র পাঁচ, সেই ১৮৩৪ সালে বছর সাতেকের কৈলাসচন্দ্র বসু ভর্তি হচ্ছেন সেমিনারিতে। ঐ একই বছরে চোদ্দ বছরের শম্ভুনাথ পণ্ডিত ঐ একই ক্লাসে ভর্তি হলেন। কর্মজীবনে শম্ভুনাথ কলকাতা হাইকোর্টে, প্রথম ভারতীয় বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন ১৮৬৩ সালে। অন্যদিকে কৈলাসচন্দ্র 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' থেকে মেডেল পেয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র শিক্ষক হয়েছিলেন,তারপরে হয়েছিলেন হেড মাস্টার । ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত কৈলাসচন্দ্র 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন

বেথুন সোসাইটির সম্পাদক। শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা জন উড্রো সাহেবের অনুরোধে সোসাইটির একটি সভায় 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র ইতিহাস বিবৃত করেছিলেন। এ সবের পাশাপাশি ১৮৪৯ সালে ইনি প্রকাশ করেছিলেন বিখ্যাত 'লিটারারি ক্রনিকল' পত্রিকা।

১৮৩৬ সালে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'তে একটি নতুন মাত্রা যোগ হল। ডবলিউ. এস. পারকিন্স নামে এক সাহেব এখানে একটি প্রাতঃকালীন শিশুবিদ্যালয় খুললেন। তিন বছর থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এখানে বিনা বেতনে বাংলা ও ইংরেজি শেখানো হতে থাকল। গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে, '[এখানে] চিত্রের মাধ্যমে আমোদ আহ্লাদের ভিতর দিয়া ছেলেদের সবকিছু শেখানো হইত। বাংলাদেশে, শুধু বাংলাদেশ কেন সমগ্র ভারতেই মনে হয় এইটি প্রথম নার্সারি স্কুল বা শিশু বিদ্যালয়।'[৬]

১৮৩৮ সালে পুজোর ছুটির পর এখানে একটি বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হল। এই পাঠশালায় বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত এবং ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় বাংলায় শেখানো হতে থাকলো। তা হলে দেখা গেল, ১৮৩৮ সালের শেষের দিকে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র তিনটে বিভাগ একসঙ্গে চলছে। একটি শিশু বিভাগ। দ্বিতীয়টি ইংরেজি পাঠশালা। তৃতীয়টি বাংলা পাঠশালা। যোগেশচন্দ্র জানিয়েছেন: 'শিশুবিভাগ বাদে, অন্য বিভাগদ্বয়ের শিক্ষা বৈতনিক ছিল। তৎসত্ত্বেও প্রায় পাঁচশত ছাত্র এই দুইটি বিভাগে অধ্যয়ন করিত।'[৭]

এইসময়কার ওরিয়েন্টাল সেমিনার ইস্কুলের ছাত্রদের বিষয়ে একটু খোঁজ খবর নেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই আসা যেতে পারে কৃষ্ণদাস পাল-এর বিষয়ে। কৃষ্ণদাস পাল প্রথমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে এসে ভর্তি হচ্ছেন শিশু বিভাগে। ১৮৪৫ সালে। স্কুলের পড়াশোনার মান ঠিক রাখার জন্য গৌরমোহন ইস্কুলের নিম্নতম শ্রেণিতে ইংরেজি ভাষা শেখানোর জন্য ফিরিঙ্গি শিক্ষক নিয়োগ করতেন। কৈলাসচন্দ্র বসুর পুত্র রসরাজ অমৃতলাল শিশুকালে এই 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'তেই পড়েছেন। স্মৃতিচারণে তিনি জানিয়েছেন: 'আমার মনে আছে [শিশু বিভাগে] একজন শিক্ষকের নাম ছিল স্মিথ, আর একজনের নাম ছিল ব্যালিস।'[৯] মাঝের শ্রেণিগুলিতে ভালো ভালো বাঙালি শিক্ষক নিয়োগ করা হত। আর ওপরের দিকে শ্রেণিগুলোতে পড়াবার জন্য খাঁটি ইংরেজ শিক্ষক নিয়োগ করতেন গৌরমোহন।

সাল তারিখের বিচারে দিনটা ছিল ৩ মার্চ, ১৮৪৬। দিন-দুয়েক আগেই ওরিয়েন্টাল সেমিনারি তার আঠারোতম জন্মদিন পালন করেছে সাড়ম্বরে। সে সময় কৃষ্ণদাস পড়ছেন শিশু বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণিতে। গৌরমোহন গিয়েছিলেন শ্রীরামপুরে। মিশনারিদের কাছে। ভালো ইংরেজ শিক্ষকের সন্ধানে। হয়ত নতুন কোন শিক্ষক ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে আসবেন, স্থিরও হয়ে গিয়েছিল। ফেরার সময় তিনি

কলকাতায় ফিরছিলেন ভরা গঙ্গার ওপর দিয়ে। নৌকায়। মাঝ পথে হঠাৎ করে নৌকাডুবি হয়ে গেল। গঙ্গার বুকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেন গৌরমোহন।

১৮৪৮ সালে কৃষ্ণদাস পাল ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হলেন। এই বিভাগের বেতন দেবার সচ্ছলতা না থাকার কারণে সেমিনারি কতৃপক্ষ কৃষ্ণদাসের বেতন মকুব করে দিলেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির নতুন মালিক গৌরমোহনের ভাই হরেকৃষ্ণ মেট্রোপলিটন একাডেমী নামে অন্য স্কুলের সমস্ত সত্ত্ব কিনে নিলেন। ফলে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি অনেকটা বড়ো হয়ে গেলো। মেট্রোপলিটন একাডেমীর বিখ্যাত শিক্ষক ডেভিড লেসটার রিচার্ডসন এই সময় থেকে সেমিনারিতে পড়াতে লাগলেন। রিচার্ডসন ছাড়াও উইলিয়ম প্যাত্রিক, রবার্ট ম্যাকঞ্জ, ক্যাপ্টেন পামার প্রমুখ নামী ইংরেজ শিক্ষকরাও সেমিনারিতে যোগ দিলেন। 'এ সময়কার পাঠ্য পুস্তকের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়, বর্তমান কালের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে যে রূপ বিবিধ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, এখানেও সেইরূপ কিংবা ততোধিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত।'[১০]

এই সময়ের ওরিয়েন্টাল সেমিনারিকে চোখের ওপরে দেখেছিলেন এখানকার আর একজন ছাত্র চন্দ্রনাথ বসু। ১৮৫৪ সালে বছর দশেকের চন্দ্রনাথ বাবার হাত ধরে যখন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হতে এলেন, তখন সেমিনারির তিনটি শাখা স্কুল শুরু হয়েছে। কলকাতার কাছাকাছি চিতপুরে মূল বিদ্যালয়ের একটি শাখা। দ্বিতীয় শাখা স্কুল ভবানীপুরে এবং তৃতীয় শাখা স্কুলটি চলত বেলঘরিয়ায়। চন্দ্রনাথ বসু ১৮৬০ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেন । ১৮৫৯ সালে তিনি কলকাতা চিতপুর শাখা স্কুল থেকে এসে, মূল স্কুলে পড়ছেন। স্মৃতিকথায় চন্দ্রনাথ বলছেন: 'যখন জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় শ্রেনীতে অর্থাৎ Preparatory ক্লাসে পড়ি তখন রিচার্ডসন সাহেব আমাদিগকে দুই একদিন পড়াইয়াছিলেন। এন্ট্রান্স পাঠের মধ্যে Roger's Pleasures of Memory নামক কাব্য ছিল। একদিন সাহেব Rogers, Goldsmith, Campbell, Akenside, Thomson প্রভৃতি descriptive কাব্য প্রণেতাদের দোষগুণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তেমন কথা আর শুনি নাই। ... দুইদিনেই বুঝিয়াছিলাম যে, ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার মত অধ্যাপক বঙ্গে আর আসেন নাই।'[১১] এই অনুষঙ্গে আরও একটি তথ্য সংযোজন করি, '১৮৫৪ সালের শিক্ষা বিষয়ক ডেসপ্যাচে এই বিদ্যালয়টির [ওরিয়েন্টাল সেমিনারি] শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছিল।'[১২] এইসময় ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত একটি ডিবেটিং ক্লাব ছিল। সেখানে প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করা হত। তর্ক-বিতর্ক হত। ১৮৬০ সালে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে, এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পর 'শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষ ডব্লিউ. এস. অ্যাটকিনসন ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারির হরেকৃষ্ণ আঢ্যের (প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্যের ভ্রাতা) সহযোগিতায় তিনি [চন্দ্রনাথ] আট টাকার সরকারী বৃত্তি পান।'[১৩]

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে চন্দ্রনাথ বসুর সহপাঠী ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অন্যতম পরিচয় হল তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি। এই উমেশচন্দ্র ১৮৬৪ সালে রুস্তমজি জিজিভাই বৃত্তি নিয়ে বিলেত যান। ১৮৬৫ সালে লন্ডনে ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করেন উমেশচন্দ্র। পুরনো স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে যায় নি তাঁর।

ইস্কুলের ইতিহাস বলে, হরেকৃষ্ণ আঢ্য পরিচালিত ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ১৮৬০-৬১ সালের পরবর্তী সময়ে ছাত্র সংখ্যা অনেকখানি কমে যায়। বোঝাই যায়, এই সময়কার 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' একক ব্যক্তির পরিচালনায় সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হতে পারে নি। তখন আঢ্য পরিবারের হরেকৃষ্ণ ১৮৬৯ সালে এক কার্য নির্বাহক সমিতির ওপর সেমিনারি পরিচালনার দায়িত্ব দেন। এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। আর এই সমিতির ম্যানেজিং কমিটিতে ছিলেন মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপচাঁদ মিত্র এবং আমাদের W.C.Bonnerjee বা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময়কার 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' সম্পর্কে বলা হচ্ছে 'বেচারাম বাবু [বেচারাম চট্টোপাধ্যায়] এই সেমিনারীর সঙ্গে এতটাই সংশ্লিষ্ট ছিলেন যে উক্ত স্কুলকে বেচারাম বাবুর স্কুল বলিয়া সাধারণ লোকে জানিতেন।'[১৪] বালক রবীন্দ্রনাথ যে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'তে ভর্তি হয়েছিলেন, সে সময়ে সেমিনারির স্বাস্থ্য খুব একটা সুস্থ ছিল না। স্কুলের পড়াশোনার পরিবেশও অনেকটা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষা দানের চাইতে শাসন প্রণালী অনেক বড়ো হয়ে উঠেছিলো। দেখা গেল, বেচারাম বাবু তাঁর উইলে উক্ত সেমিনারিকে তাঁর ব্যক্তগত সম্পত্তি বলে উল্লেখ করলেন। এবং শ্রীনাথ চন্দ্রের পুত্র গোপীনাথ চন্দ্রকে স্কুলের সেক্রেটারি নিযুক্ত করলেন। এরপরে, ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেচারাম বাবু পরলোক গমন করেন। বেচারাম বাবুর পুত্র ছিলেন ব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি স্কুল চালাতে পারতেন না । তিনি তার বাবার উইলের provate নিয়ে স্কুল দখল করতে উদ্ধত হন। স্কুলের সেই সময়ের সেক্রেটারি অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ উমেশচন্দ্রকে সব কিছু জানালেন। উমেশচন্দ্র হাইকোটে ব্রজগোপালের বিরুদ্ধে injunction বা নিষেধাজ্ঞা প্রচার করলেন। হাইকোর্টে উমেশচন্দ্র বেচারামবাবুর লেখা পুরনো একটি চিঠি প্রমাণ হিসেবে দেখালেন। ঐ চিঠি বেচারাম বাবু লিখেছিলেন উমেশচন্দ্রকেই। সেই চিঠিতে স্পষ্ট কথায় বলা ছিল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি সাধারণ স্কুল, কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। মামলায় ব্রজগোপাল বাবুর কুড়ি হাজার টাকা জরিমানা হল। ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ওই জরিমানা নেবার পরিবর্তে ১৮৬০ সালের একুশ আইন অনুসারে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'কে পাবলিক স্কুল হিসেবে নিবন্ধীকরণ করে নিলেন। প্রাক্তন ছাত্র উমেশচন্দ্র ১৯০২ সাল পর্যন্ত ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে উমেশচন্দ্র

'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র উন্নতিকল্পে ছিলেন সর্বদাই যত্নবান। স্কুলের বাৎসরিক প্রাইজের অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ সময়ে তিনি গোপনে অর্থ সাহায্য করেছেন। কখনো বা হাইকোর্টের ভালো ভালো বিচারপতিদের অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে নিয়ে এসেছেন। ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'কে একটি সাধারণ স্কুল হিসেবে আইনত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠায় 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' আজও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

ইস্কুল ছাড়াও 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' সেকালে নানা সভা-সমিতির কেন্দ্র স্থল হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছিল। ১৮৫১ সালের ২৫ মে তারিখে এই ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে 'পতিতোদ্ধার সভা' স্থাপিত হয়। সে সময় খ্রিস্ট ও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবল জোয়ার থেকে হিন্দু সন্তানদের রক্ষা করার জন্য এই সভা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। "বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতগণ এবং সমাজ নেতৃবৃন্দ ও ইহাতে যোগদান করেন। যাহারা খ্রীষ্টান বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে হিন্দু ধর্মে ফিরাইয়া আনার জন্য 'শুদ্ধি'র প্রস্তাব এই সভায় সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। ... কিন্তু এ আন্দোলনের সুচনা এই সভাতেই প্রথম দেখা গেল।"[১৫] এইভাবে শুধু ইস্কুল নয়, শহর কলকাতার অন্যতম সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবেই হয়ে গেল 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র পরিচয়। প্রতিষ্ঠা। সে যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অক্ষয় দান এই ইস্কুল – 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি', একালেও অম্লান। অমলিন।

উল্লেখপঞ্জি:

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, প্রকাশ ১৯১২, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৫-৬।

২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ছেলেবেলা, প্রকাশ ১৯৪০, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৯৯।

৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, প্রকাশ ১৯১২, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৩।

৪। গুপ্ত বিপিনবিহারী, পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় বিদ্যাভারতী সংস্করণ ১ চৈত্র, ১৩৭৩, বিদ্যাভারতী, ৮ সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২০০।

৫। দেব বাহাদুর বিনয়কৃষ্ণ রাজা,কলিকাতার ইতিহাস, বঙ্গানুবাদ শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র, ২৫ শে বৈশাখ, ১৩১৪, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১৩০।

৬। বাগল শ্রী যোগেশচন্দ্র, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৬, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪।

৭। বাগল শ্রী যোগেশচন্দ্র, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৬, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪।

৮। রায় বাহাদুর সেন জলধর, বঙ্গ গৌরব, প্রথম খণ্ড, ১৯২২, ম্যাক মিলান এন্ড কোম্পানি লিমিটেড, ২৯৪ নং বহু বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৬।

৯। গুপ্ত বিপিনবিহারী,পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় বিদ্যাভারতী সংস্করণ ১ চৈত্র, ১৩৭৩, বিদ্যাভারতী, ৮ সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২০০।
১০। বাগল শ্রী যোগেশচন্দ্র, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৬, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৬৪।
১১। মজুমদার করুণাময়, চন্দ্রনাথ বসু: জীবন ও সাহিত্য, ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, জি এ ই পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪১।
১২। বাগল শ্রী যোগেশচন্দ্র, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৬, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৬৪।
১৩। মজুমদার করুণাময়, চন্দ্রনাথ বসু: জীবন ও সাহিত্য, ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, জি এ ই পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪২।
১৪। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী কৃষ্ণলাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী, নভেম্বর, ১৯৩৪, কলিকাতা, ২৪ নং কাশী দত্ত ষ্ট্রীটস্থ, পৃষ্ঠা ৮৬।
১৫। বাগল শ্রী যোগেশচন্দ্র, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৬, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬।

কোচবিহার জেলার নদ-নদীর মিথকথা ও পূজা-পার্বণ

প্রসেনজিৎ রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকে জলের সঙ্গে মানুষের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। আর এই জলকে কেন্দ্র করেই মানুষের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা। পৃথিবীর প্রতিটি জাতি, জনজাতির মধ্যে তাই জলকেন্দ্রিক নানান লোক বিশ্বাস, সংস্কার, ব্রতকথা, ও জল-উপাসনা দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এই তিন পর্যায়েই জল বিষয়টি উপজীব্য। নদ-নদীর দেবতাকে পূজা করার রীতিটি হল জড়বাদী উপাসনার একটি বিশেষ অংশ। যা আদিমতম সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আজও প্রবাহমান। কোচবিহার জেলার মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজবংশীরা হলেন সংখ্যাগোরিষ্ঠ। নৃগোষ্টিগত ভাবে এরা ইন্দো-মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠী ভুক্ত। নদ-নদী, গাছ-পালা প্রভৃতিকে পূজা করা রীতি তাই কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে রয়েছে নানান লৌকিক দেবতার পূজাও। কোচবিহার জেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন নদ-নদীর দেবতাকে পূজা করার লৌকিক রীতি প্রচলিত রয়েছে এই অঞ্চলে। যেমন – তিস্তার নদীর দেবতা তিস্তা বুড়ি, তোর্সা নদীর দেবতা তোর্সা পীর, জলসূয়া নদীর দেবতা জলসূয়া পীর, গদাধর নদীর দেবতা মাশান ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত নদ-নদীকে কেন্দ্র করে রয়েছে নানান মিথকথা ও লোকশ্রুতি। নদীর সঙ্গে নদীর বিবাহ, নদীতে নদীতে সখা পাতানো, ভাই বোন সম্পর্ক ইত্যাদি - এ যেন এই অঞ্চলের মানুষের পারিবারিক চিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছে।
সূচকশব্দ : লৌকিক দেবতা, রাজবংশী সমাজ, নদ-নদী, জলসংস্কৃতি, তিস্তা, ধরলা, পূজা-পার্বণ।

ভূমিকা : ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাংশের একটি অন্যতম নদীমাতৃক জেলা হল কোচবিহার। যেখানে সবচেয়ে বেশি নদ-নদী এবং তাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে। এই নদীর মতোই এখানকার জনবিন্যাস – রাজবংশী, সাঁওতালী, বোডো, রাভা প্রভৃতি জনজাতির বসবাস। আর যেখানে যত বেশি জনবিন্যাস, সেখানে ততোবেশি ভাষাগত ভিন্নতা। তবু যেন একই সুতোয় গাথা মালা। এই নদীর প্রসঙ্গেও উঠে আসে সেই কথাই। তাই দেখা গেছে, একটি নদী উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। যেমন – দৈদুয়া > ডুডুয়া, তি-সা-থা > তিস্তা। বিভিন্ন জনজাতি ও

তাদের ভাষাগত ভিন্নতার জন্য এই নামবৈচিত্র্য। তবে এই নামকরণের পেছনে কাজ করেছে নদীর গঠন প্রকৃতি, ভূমিরূপ, নদীর নাব্যতা, নদীর গতিপথের রূপ। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার নদ-নদীগুলির ক্ষেত্রে এই তথ্য যথাযথ ভাবে প্রযোজ্য। নীহাররঞ্জন রায় বাংলার এই সব নদ-নদী সম্পর্কে বলেছেন –

> "অনেক পুরাতন পথ মরিয়া গিয়াছে, প্রশস্ত খরতোয়া নদী সংকীর্ণা ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়িয়াছে; অনেক নদী নূতন খাতে নূতনতর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন নামও হারাইয়া গিয়াছে, নদীও হারাইয়া গিয়াছে নূতন নদীর নূতন নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এইসব নদ-নদীর ইতিহাস বাঙলার ইতিহাস। ইহাদেরই তীরে তীরে মানুষ-সৃষ্ট সভ্যতার জয়যাত্রা; মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য, ধর্মকর্ম সবকিছুর বিকাশ।"[১]

সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকে নদ-নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গভীর-গভীরতর। বিশ্বসৃষ্টির ক্ষেত্রেও জলের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। তাই নদ-নদীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। এই অঞ্চলের বিভিন্ন জনজাতিদের মধ্যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা হলেন সংখ্যাগোরিষ্ঠ। নৃগোষ্ঠীগত ভাবে এরা হলেন ইন্দো-মোঙ্গলীয় জনজাতির অন্তর্গত। আদিকাল থেকেই এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিলেন প্রকৃতি উপাসক। কৃষিকেন্দ্রিক নানান ব্রত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এরা জলকেন্দ্রিক নানান লোকবিশ্বাস-সংস্কার ও পূজা-পার্বণ করে থাকেন। জলকে কেন্দ্র করে গোটা উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে রয়েছে নানান মিথ কথা ও লোককাহিনী। যা এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে একটি বিশেষ মর্জাদা প্রদান করেছে। পূর্বে এই কোচবিহার জেলার বিস্তৃত অঞ্চল ছিল নদ-নদী ও গভীর অরণ্যে ঘেরা। সেই সঙ্গে ছিল প্রাকৃতিক দূর্যোগের ভয় ও বন্য জীব-জন্তুর উপদ্রব। যা এই অঞ্চলের মানুষদের জীবন যাত্রাকে বিচলিত করে তুলেছিল। মানুষ প্রকৃতির কাছে ছিল অসহায়। আর এই ভয় ও অসহায় অবস্থা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে শুরু হয়েছিল প্রকৃতি দেবতার কল্পনা। সেই কল্পনার রসে জাড়িত হয়ে সৃষ্টি হল নানান লোককাহিনী। ধীরে ধীরে নানান লৌকিক দেবতার রূপ কল্পনা ও পূজা-পার্বণ। কোচবিহার জেলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে একসময় বেশ কয়েকটি বড় বন্যা দেখা দিয়েছিল। যার মধ্যে রয়েছে ১৮৯৭, ১৯৯২, ১৯৯৪৮, ১৯৯৬৮ সালের তিস্তার বন্যা, ১৯৫৪ সালের তোর্সা নদীর বন্যা। যা এই অঞ্চলের মানুষদের জীবন যাত্রাকে স্তিমিত করে দিয়েছিল। এই বন্যাগুলি যেমন মানুষের স্মৃতিপটে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি এই ভয়াল বন্যাগুলিকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে নানান লোককাহিনী ও লোকসাহিত্যও।

কোচবিহার জেলার বিস্তৃত অঞ্চলে নদ-নদীর দেবতাকে পূজা করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। যেমন – এই অঞ্চলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত উল্লেখযোগ্য নদী 'তিস্তা'। এই তিস্তা নদীকে কেন্দ্র করে শুধু কোচবিহার জেলা নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির মানুষেরা তিস্তাবুড়ি ঠাকুরের পুজা করে থাকেন। একসময় এই তিস্তা নদী ছিল বিধ্বংসী। এই নদীর বন্যায় কত যে ঘর-বাড়ি, লোকজন হাঁড়িয়ে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নদীর এই ভয়ঙ্করী রূপকে শান্ত করতে রাজবংশী ও অন্যান্য আদিবাসী সমাজ নদীর দেবতাকে তিস্তাবুড়ি দেবতা রূপে পূজা করতে শুরু করেন।
কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বেশ কয়েকটি নদ-নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, ধরলা, জলসূয়া, সুটুঙ্গা, বংতি, ভোগজান, গদাধর, রায়ডাক প্রভৃতি। নিম্নে কয়েকটি নদ-নদীর দেবতার মিথকথা ও পূজা-পার্বণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

তিস্তা বুড়ি : উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহার জেলার একটি বিশেষ পরিচিত লৌকিক দেবতা হল তিস্তা বুড়ি। এটি কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত তিস্তা নদীর দেবতা। 'তিস্তা' নামের সঙ্গে যুক্ত 'বুড়ি' শব্দটি আদতে নদীমাতৃকার রূপ কল্পনা, এখানে তিস্তার বৃদ্ধাকালের রূপকল্পনা করা হয়েছে। তিস্তা বুড়ি ঠাকুরের মাটির মূর্তি বানিয়ে পূজা করেন কোচবিহার জেলার তিস্তা নদী তীরবর্তী রাজবংশী সমাজের মানুষেরা। দেবতার অবয়ব বা দৈহিক বর্ণনায় বলা হয়েছে –

> "অশীতিপর বৃদ্ধা, পরিধানে সাদা শাড়ি, মাথায় সমস্ত চুল শান পাটে মতো সাদা, হাতে একটি লাঠি, সেই লাঠিতে ভর দেওয়ার জন্য একটু নুইয়া পড়া ভঙ্গী, দন্তহীন মুখে একটু স্মিতহাসি – এই হইল রাজবংশীদের ধারণায় তিস্তাবুড়ির মূর্তির রূপ।"[২]

তবে লোক কল্পনায় দেবতার নাম তিস্তা বুড়ি হলেও তিস্তা যে পূর্ণ যৌবনা ও ভয়ঙ্করী, তা বোঝা যায় আর একটি শ্লোকে –

"সগায় কছে তিস্তা বুড়ি
বুড়ি না হয় জুয়ান চেঙেরী।"[৩]

এই নদী ও নদীর দেবতাকে নিয়ে এই অঞ্চলে নানান মিথকথা প্রচলিত রয়েছে, যেমন – দার্জিলিং জেলার লেপচা সমাজে প্রচলিত আছে তিস্তা (নদী) ও রঙ্গিতের (দার্জিলিং জেলায় প্রবাহিত একটি নদ) প্রেমের কাহিনী। রঙ্গিতের রূপের কথা শুনে তিস্তা তার প্রেমে পড়ে যায় এবং তাদের মিলনে সহায়তা করেছিল একটি পাখি ও একটি সাপ। সবশেষে তাদের বিবাহ হয়। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে লেপচা সমাজে বেশকিছু বিয়ের গান প্রচলিত রয়েছে।

আবার বিভিন্ন লোককথায় ও তিস্তাবুড়ি পূজার মেছেনি গানে তিস্তা বুড়ির চার বোনের কথা বলা হয়েছে। যথা – ডাকলক্ষ্মী, গুছিলক্ষ্মী, অঘণলক্ষ্মী, ও পৌষলক্ষ্মী। একটি গানে বলা হয়েছে –

"তিস্তা বুড়ি না মান গে হৈসে
বড়য় তো হাউসালী।
হাউস করিয়া নেও গে
তিস্তা বুড়ির পন্চ বহিনী।।"[৪]

এছাড়াও রয়েছে নদীর সঙ্গে নদীর নানান সামাজিক-পারিবারিক সম্পর্ক। যা ইন্দো-মোঙ্গলয়েড সমাজ-সংস্কৃতিতে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন – তিস্তা নদীর আর একটি লোককথায় জানা যায় যে, ধরলা বুড়া (নদ) সাথে তিস্তা বুড়ির (নদী) বিবাহ হয়েছিল। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে, যথা – করলা নদী (ছেলে) ও দুলালী দীঘি (মেয়ে)। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে যে লোককথাটি শোনা যায়, তাতে তিস্তা বুড়ির দুইটি বোনের কথা জানা যায়, যথা – গিলাণ্ডী বুড়ি (নদী), ও সাঞ্জাই বুড়ি (নদী)।[৫] তিস্তা নদীর এই লোককাহিনীগুলি এতদ্ অঞ্চলে বেশ পরিচিত কাহিনী হয়ে উঠেছে, তেমনি এই কাহিনীগুলির যেন মানবী রূপায়নও ঘটেছে। এ যেন এই অঞ্চলের মানুষের জীবন কাহিনী। যার মধ্যে নিহিত রয়েছে এই অঞ্চলের রাজবংশী সমাজের মানুষের আবেগ, বিশ্বাস ও সংস্কার।

পূর্বে তিস্তা নদী ছিল ভীষণ খরস্রোতা এবং বিধ্বংসী। নদীর এই আগ্রাসী রূপ থেকে রক্ষা পেতে এই অঞ্চলের রাজবংশী সমাজের মানুষেরা নদীকে দেবতারূপে পূজা করা শুরু করেন। মূলত রাজবংশী সমাজের মহিলারা এই দেবতার পূজা করেন। এই পূজার প্রথম ভাগে রয়েছে মেচেনি ব্রত বা মেচেনি খেলা। যেখানে প্রায় পঁচিশ – তিরিশ জন মহিলার একটি দল গঠিত হয় এবং এদের মধ্যে একজন হলেন মাড়েয়া (প্রধান)। এই মাড়েয়ার হাতে থাকে সুন্দর ভাবে সাঁজানো একটি ছাতা ও অন্য হাতে ফুল, সিদূর, ধূপ ইত্যাদি। এই দলটি বৈশাখ মাসের শুরুতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেচেনি খেলার গান ও নাচ করেন এবং চাল, সবজী বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করেন। মেচেনি খেলার একটি গান এখানে উল্লেখ করা হল –

"আসিয়া মেচেনি মাও মোর
দুয়ারে দিলেক পাও।
আগ বাড়ি সিদ্ করে বিধ বাপো মাও।
শুনগে দিদি ওগে বাঈ।।"[৬]

এই ব্রত পার্বণ শেষ হওয়ার পর দেবতার নির্দিষ্ট থানে (মন্দির) পূজা দেওয়া হয়। সবশেষে দেবতার নামে কলা গাছের গেড়া (ভেলা) বানিয়ে গেড়া ভাসানো পর্ব দিয়ে দেবতার পূজা সম্পন্ন হয়।

তিস্তা বুড়ি ঠাকুরের মাটির মূর্তি রয়েছে মেখলীগঞ্জ মহকুমার নদী তীরবর্তী পার মেখলীগঞ্জ অঞ্চলে, পৈচতি, জামালদহ প্রভৃতি এলাকায়। কোথাও আবার দেবতার মাটির থাপনা দেখা যায়। বেশির ভাগ দেবতার থান একচালা টিনের ছাউনি।

কোচবিহার জেলায় অনেক অঞ্চলে আবার গ্রাম ঠাকুরের সঙ্গে তিস্তা বুড়ির পূজা প্রচলিত রয়েছে।

তিস্তা বুড়ি পূজায় পূজারি হিসেবে থাকেন স্থানীয় কোনো রাজবংশী সমাজের দেউসী বা ওঝা। কোথাও আবার অধিকারী দিয়েও দেবতাকে পূজা করা হয়। পূজার উপকরণ হিসেবে প্রয়োজন – কলা গাছের পাতা, আতপ চাল, রসুন, পেঁয়াজ, ওরের ফুল, ঘি, দই, চিড়া, আঠিয়া কলা, ইত্যাদি। দেবতার মানোত হিসেবে দেওয়া হয় – পায়রা, ডিম ইত্যাদি। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমায় আবার এই দেবতাকে বুড়ি ঠাকুর হিসেবেও পূজা করা হয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে W.W Hunter এর কথা। তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন –

> "The Chief deity of the Villageres is Buri thakurai, the goddes of the tista."[৭]

কোচবিহার জেলার এতদ্ অঞ্চলের রাজবংশী সমাজের মানুষদের বিশ্বাস এই দেবতার পূজা করলে – নদীর ভয়াল রূপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে এই দেবতা হল উর্বরতা তন্ত্রের দেবতা, ফলতঃ এই দেবতার পূজা করলে কৃষিজ ফসল ভালো হবে। কারণ নদী প্রবাহের সাথে ভেসে আসা পলিমাটি নদী তীরবর্তী জমির উর্বরতাকে অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

চিত্র : তিস্তা বুড়ি

গদাধর মাশান : কোচবিহার জেলার একটি লৌকিক দেবতা হল গদাধর মাশান। এটি আদতে নদীর দেবতা। গদাধর নামে একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার মধ্য দিয়ে। এই নদীর পাড়ে পাড়ে রয়েছে মাশান দেবতার থান বা থাপনা। দেবতার নামটির দল বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় 'গদা' ও 'ধর' শব্দদুটি। 'গদা' হল এক ধরণের হাতিয়ার, যা মাশান দেবতার মূর্তিতে দেখা যায়। অর্থাৎ গদা

ধরে থাকেন যিনি, তিনিই গদাধর। বিশিষ্ট্য গবেষক ড. দীলিপ কুমার দে এক জায়গায় ২৪ প্রকার মাশানের কথা বলেছেন, যার মধ্যে এই গদাধর মাশানের কথা বলা রয়েছে।

তুফানগঞ্জ মহকুমার নদী তীরবর্তী রাজবংশী সমাজের মানুষেরা নদী ভাঙন ও বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে এই দেবতার পূজা করেন। সেই অঞ্চলের বেশিরভাগ মন্দিরে রয়েছে দেবতার মাটির মূর্তি। সেখানে বাম হাত দিয়ে গদা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গদাধর মাশান। দেবতার বাহন হিসেবে রয়েছে শোল মাছ। দেবতার পূজার উপকরণ হিসেবে দেওয়া হয় – দই, চিড়া, মনুয়া কলা, কলার পাতা, খই, চাল ভাজা (ভুগুড়া), চ্যাং মাছ, পায়রা ইত্যাদি।

চিত্র : মাশান

ধরলা বুড়া : কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি উল্লেখযোগ্য নদী ধরলা। এই ধরলা নদীর দেবতা হিসেবে এই অঞ্চলে ধরলা বুড়া ঠাকুরের পূজার প্রচলন দেখা যায়। এটি রাজবংশী সমাজের লৌকিক দেবতা। মিথকথা অনুসারে জানা যায় এই ধরলা বুড়ার সাথে তিস্তা বুড়ির বিবাহ হয়েছিল এবং 'Folk-tele' অনুসারে এদের দুটি সন্তান রয়েছে, একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট্য ভাষা ও লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. দীপক কুমার রায় জানান –

> "লোককথা অনুযায়ী তাঁর একজন পুত্র এবং একজন কন্যা। পুতের নাম করলা (নদী), কন্যা দুলালী (দীঘি)। প্রতি বৎসর বন্যায় তারা পরস্পর মিলিত হয়।"[৮]

কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্থানে আবার এই দেবতাকে বুড়া ঠাকুর, বুড়া সৈন্ন্যাসী, শিব সৈন্ন্যাসী হিসেবেও পূজা করা হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় ধরলা নদী তীরবর্তী এলাকায় নদীর ধারে, রাস্তার পাশে কোথাও বুড়া ঠাকুরের থাপনা, আবার কোথাও শিব ঠাকুরের থাপনা। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌরাণিক শিবের অনেকগুলি লৌকিক রূপ রয়েছে। তার মধ্যে শিব সৈন্ন্যাসী অন্যতম।

মেখলীগঞ্জ মহকুমার চ্যাংরাবান্ধার অন্তর্গত বারোঘরিয়া গ্রামে এই ধরলা বুড়া ঠাকুরের পূজা হয়। সেখানে গ্রাম দেবতার সাথে এই দেবতাকেও পূজা করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। সেখানে দেবতার মূর্তি নেই, মাটির ঢিবি বা শিলাখণ্ডে পূজা করা হয়।

চিত্র : ধরলা বুড়া (শিলাখণ্ডে পূজিত)

জদ্দকা ঠাকুর : কোচবিহার জেলার নদীসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি নদী জলঢাকা। এই নদীর দেবতা হলেন জদ্দকা ঠাকুর। এটি এই অঞ্চলের লৌকিক ব্রাহ্মণ দেবতা। ক্ষেত্রসমীক্ষায় এই নদী ও নদীর দেবতাকে নিয়ে নানান মিথকথা শোনা যায়, যা আজও নদী তীরবর্তী এলাকায় বেশ প্রচলিত। এই নদীর অনেকগুলি বন্যার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে এই লোককথাগুলির মধ্য দিয়ে। লোককথা অনুসারে – এই জদ্দকা ব্রাহ্মণ হলেন তিস্তা বুড়ির ভাশুর। জদ্দকার কোনো এক ভাইয়ের সাথে তিস্তা বুড়ির বিয়ে হয়েছি।[৯] আবার একটি লোককথায় - এই জদ্দকা ঠাকুরের বোন হলেন সুংলি বুড়ি (মেখলীগঞ্জের জামালদহের পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী)। এই সুংলি নদীর তেমন প্রবাহ নেই, জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় থাকে। এই অবস্থা দেখে জদ্দকা ঠাকুর তার বোনের বাড়ি গিয়ে জঙ্গল পরিস্কার করে দিয়ে আসতে চায়। এবং সুংলি বুড়ি তাতে রাজি হয়নি। কারণ সে জানে তার দাদা জদ্দকা যেদিকে যাবে সব কিছু ভেঙ্গে দিয়ে যাবে। তাতে অনেক মানুষের ক্ষতি হবে।[১০]

এই জদ্দকা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পূজার প্রচলন রয়েছে কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ ও মাথাভাঙ্গা মহকুমার বিস্তৃত অঞ্চলে। সেখানে মাটির থাপনায় পূজা করেন স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। মেখলীগঞ্জ মহকুমার ধূলিয়া অঞ্চলে দেখা যায়

স্থানীয় রাজবংশী সমাজের মানুষেরা বাড়িতে কোনো শুভ অনুষ্ঠান বা পূজা পার্বণ দেখা দিলে বাড়ির অন্যান্য দেবতার সাথে এই দেবতার উদ্দেশ্যেও নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন।

জলসূয়া পীর : মেখলীগঞ্জ মহকুমার রানীরহাট এলাকার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত জলসূয়া নদীর দেবতা হল জলসূয়া পীর। এটি এই অঞ্চলের লৌকিক দেবতা রূপে পূজিত হয়ে থাকে। 'জলসূয়া' অর্থাৎ জলের সন্তান। 'সূয়া' মানে সন্তান। এই জলসূয়া পীরের থান (মন্দির) রয়েছে রানীরহাট অঞ্চলের শৌলমারী সেতুর পাশেই। সেখানে দেবতার মাটির মূর্তি রয়েছে। দেবতার বাহন হিসেবে রয়েছে শোল মাছ। সেই সাথে সেখানে পূজিত হয় মোটা সৈন্ন্যাসী ও সুর দেবতা। এই পীর দেবতার পূজা করেন স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষেরাই। এছাড়াও নদী তীরবর্তী প্রতিটি গ্রহস্থ বাড়িতেই এই দেবতাকে পূজা করার রীতি রয়েছে। লোককথা অনুসারে এই দেবতার সঙ্গে জদ্দকার যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে জলসূয়া হেঁড়ে যায় এবং তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তি জদ্দকা নিয়ে চলে যায়। এই লোককাহিনীর মধ্য দিয়ে উঠে আসে জলঢাকা নদীর ভয়াবহ বন্যার প্রসঙ্গ।[১১]

চিত্র : জলসূয়া পীর

এছাড়াও আরও অনেক নদ-নদীর দেবতা রয়েছে কোচবিহার জেলার বিস্তৃত অঞ্চলে, যাদের পূজা করেন এতদ্ অঞ্চলের রাজবংশী, রাভা, বোরো, মেচ জনজাতির মানুষেরা। এই সমস্ত নদ-নদীকেন্দ্রিক পূজা পার্বণের সাথে তাঁদের জীবনযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্দ বন্ধ অনুভব করা যায়। নদীর সাথে মানুষের এই গভীর সম্পর্ক যেন আদিম সমাজের একটি পারিবারিক কাঠামোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সমস্ত পূজা-পার্বণের মধ্যে তাদের লোকবিশ্বাস ও সংস্কার, তাদের রীতি-নীতি এক অনন্য মাত্রা প্রদান করেছে। সেই সাথে রয়েছে জলকে বরণ করা, নদীর জলে স্নান করে চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথিতে বাসন্তী দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা করা এবং সর্বপরি রয়েছে নদীকেন্দ্রিক

নানান উৎসব ও মেলা। যা কোচবিহার জেলার লোক-সংস্কৃতিকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, ড. নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৪২০, পৃ. ৭২

২. রায়, ড. গিরিজাশংকর, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ, এন. এল পাবলিশার্স, আসাম, ১৯৯৯, পৃ. ৯৭

৩. তদেব

৪. রায়, ড. দীপক কুমার, তিস্তা বুড়ি, সোপান পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০৮৪, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, পৃ. ২৭

৫. তদেব

৬. ক্ষেত্রসমীক্ষা : বুধবালা রায়, বয়স - ৭৯, ভোটবাড়ি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার, তাং - ১১/০২/২০২৪

৭. Hunter, W.W, A Statistical Account of Begal, D. K Publishing House, Delhi 110035, Frist Reprint 1974 p. 265

৮. রায়, ড. দীপক কুমার, তিস্তা বুড়ি, সোপান পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০৮৪, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, পৃ. ২৭

৯. ক্ষেত্রসমীক্ষা : ক্ষেতি বর্মন, বয়স - ৬৭, বগের ডাঙ্গা, জামালদহ, কোচবিহার, তাং – ২১/০৮/২০২৩

১০. ক্ষেত্রসমীক্ষা : জিতেন বর্মন, বয়স - ৮১, পাড়ের বাসা, ১৯২ ভোগজান, চ্যাংরাবান্ধা, কোচবিহার, তাং - ২১/০৮/২০২৩

১১. ক্ষেত্রসমীক্ষা : রবীন্দ্র বর্মন, বয়স - ৭১, ১৯৩ রতনপুর, জামালদহ, কোচবিহার, তাং - ১৯/০৯/২০২৩

ক্ষেত্রসমীক্ষায় তথ্যদাঁতার তালিকা :

১. রাজেন রায়, বয়স ৬০, দোমুখার পাড়, আলোকঝারি, রানীহাট, কোচবিহার

২. সুশীলা রায়, বয়স ৭০, জিগার গোর, ১৫৯ আলোকঝারি, রানীহাট, কোচবিহার

৩. মনেশ্বর রায়, বয়স ৯০, কাউয়ার টারি, ১৭৫ ধুলিয়া খালিসা, কোচবিহার

৪. লংকেশ্বর রায়, বয়স ৬০, কাউয়ার টারি, ১৭৫ ধুলিয়া খালিসা, কোচবিহার

৫. বিশ্বনাথ রায় (মালী), বয়স ৬২, প্রধানের বাড়ি, ১৮৫ জলসূয়া, কোচবিহার

৬. প্রসন্ন অধিকারী, বয়স ১২৩, ধুলিয়া, কালির হাট, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

৭. নিরবালা বর্মন, বয়স ৬২, পাড়েয়ার হাট, উছলপুকুরি, কোচবিহার

৮. রমনী বর্মন, বয়স ৭৩, ১৭৫ ধুলিয়া খালিসা, কামাখ্যার থান, উছলপুকুরি, কোচবিহার

৯. যতীন বর্মন, বয়স ৬৫, পাঁচকাটা, ১৬৫ উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার
১০. উকিল বর্মন, বয়স ৬০, পাঁচকাটা, ১৬৫ উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার
১১. নাল্টু বর্মন, বয়স ৬৬, দামের বাসা, ১৬৫ উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার
১২. মজেন বর্মন, বয়স ৬৬, দামের বাসা, ১৬৫ উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার
১৩. কামিনী রায় ডাকুয়া, বয়স ৭০, ডাঙ্গাপাড়া, ২০৮ উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার
১৪. মুকুন্দ বর্মন, বয়স ৭৮, ডাঙ্গাপাড়া, ২০৮ উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার
১৫. মফরুণ বেওয়া, বয়স ১০১, ডাকুয়াপাড়া, ১৬৪ গোপালপুর, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার
১৬. ভোলা বর্মন, বয়স ৬২, ১৫৬ দেউতিখাতা, উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার
১৭. সাগর মণ্ডল, বয়স ৬০, চিতাইয়ের ডাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার
১৮. জিতেন বর্মন, বয়স ৮১, পাড়ের বাসা, ১৯২ ভোগজান, চ্যাংরাবান্ধা, কোচবিহার
১৯. রবীন্দ্র বর্মন, বয়স ৭১, ১৯৩ রতনপুর, জামালদহ, কোচবিহার
২০. ক্ষেতি বর্মন, বয়স ৬৭, বগের ডাঙ্গা, জামালদহ, কোচবিহার

জীবনানন্দ দাশের জীবনীমূলক উপন্যাসে কবির অন্তর-জীবনের অতলান্তিক অন্বেষণ

রোমিও সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ: কবিতার মত জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিগত জীবনও রহস্যপূর্ণ এবং বিভিন্ন কারণে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।তাঁর জীবনীমূলক উপন্যাসগুলো যে কেবল কবির ব্যক্তিগত জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাতের যাপিত জীবনচিত্রকে তুলে ধরে তা তো নয়, বরং কবির সাহিত্যিক দর্শন, মেজাজ, মনোভঙ্গি ও কবিসত্তার মনোবীজকেও তুলে ধরে। বরিশাল থেকে কলকাতায় এসে উদ্বাস্তু জীবনের মত তিনি জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় হা-পিত্যেশ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি যতটুকু লেখালেখি করেছেন তাতে তাঁর প্রাপ্য সম্মান তো নয়ই, বরং প্রায় সর্বত্রই তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে অবজ্ঞা ও অপমান করার চেষ্টা করা হয়েছিল।একদিকে নিদারুণ অর্থ কষ্টের মধ্যে সংসার জীবন অতিবাহিত করছেন, অন্যদিকে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে লক্ষ্য করে সমালোচকেরা কবিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তাঁর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে তিনি তাঁর লেখার উপর ভরসা রেখেছিলেন এবং লেখালেখির মধ্যে দিয়েই বাঁচতে চেয়েছিলেন। আমাদের আফসোস যে কবির জীবৎকালে তাকে যথাযোগ্য সম্মান আমরা দিতে পারিনি, সেই লজ্জা আমরা রাখবো কোথায়।

সূচক শব্দ : নক্ষত্র, অস্তিত্ব, বিষন্নতা, বিপন্ন, মৃত্যু, অবচেতন, রাত্রি, ধূসর, অন্ধকার, ঘাস।

'কবিরে পাবেনা তাহার জীবনচরিতে।'[১]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যতই একথা বলুন না কেন, আজ বোধহয় কেউ আর একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, কবি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে কোথাও না কোথাও নিজের Signature বা স্বাক্ষর রেখে যান।আবার একথাও ঠিক যে কোন কবি বা সাহিত্যিকের মন, মেজাজ এবং তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হলে কেবল তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সম্ভার গুলো সম্পর্কে জানাই যথেষ্ট নয়, কবির ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, তাঁর যাপিত জীবনের নানান ঘাত প্রতিঘাত সম্পর্কেও জানা গুরত্বপূর্ণ বলে মনে করি।বিশেষত জীবনানন্দ দাশের মতো এমন একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ, রহস্যময়, লাজুক, মিতকথনে বিশ্বাসী মানুষটির সাহিত্যকে বুঝতে হলে তাঁর জীবনীমূলক গ্রন্থগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করি।

আমরা জীবনানন্দ দাশের জীবনীমূলক উপন্যাসগুলিকে মন্থন করে কবির অন্তর-জীবনের তত্ত্বতালাশ করার চেষ্টা করব। কবির জীবন অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যে আমরা পাঁচটি উপন্যাসের খোঁজ পেয়েছি। এইগুলি হল- 'নীল হওয়ার সমুদ্রে', 'সোনালী ডানার চিল', 'বিকেলের নক্ষত্রের কাছে', 'একজন কমলালেবু' এবং 'কাঞ্চন ফুলের কবি'। আমরা এই সকল উপন্যাস গুলিকে মন্থন করে ব্যক্তি জীবনানন্দকে ছোঁয়ার চেষ্টা করব।

আমাদের কাছে ১৮৯৯ সালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।কেবল এই জন্য নয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একটা বিরাট পট পরিবর্তন দেখা দেবে, বরং এই জন্য যে এই বছরে দুজন বিখ্যাত মানুষের জন্ম হয়েছিল, যারা পরবর্তীকালে বাংলা কবিতায় দুটো সম্পূর্ণ ভিন্নধারার স্রোত তৈরি করতে পেরেছিলেন। একজনের কবিতায় সাম্যবাদ ও বিদ্রোহের সুর ও বৈশিষ্ট্য প্রবল ভাবে দেখা যাবে এবং আরেকজনের কবিতায় কাল ও সময় চেতনার হাত ধরে বাংলা নিসর্গ প্রকৃতির অপূর্ব রূপ নতুন ধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে।এই দুজনের মধ্যে একজনের নাম কাজী নজরুল ইসলাম এবং আরেকজনের নাম জীবনানন্দ দাশ।

জীবনানন্দ দাশের কবি হওয়ার পিছনে তাঁর মা কুসুম কুমারী দাশের অবদান সব থেকে বেশি ছিল। কবির মা একদা লিখেছিলেন- আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে? কবি যেন মায়ের কথা রেখে আদর্শ ছেলে হয়ে উঠেছিলেন। কথা কম বলে আপন মনে শুধু লিখে গিয়েছিলেন।

তাঁর শৈশবের একটি ঘটনার কথা জানতে পারা যায়,যা আমাদের বিষয়-আশয় সম্পৃক্ত পৃথিবীতে সামান্য হলেও ছোট্ট কবির কাছে তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।এই ছোট্ট ঘটনাটির মধ্যে দিয়ে আমরা জীবনানন্দ দাশের কবি সত্তার একটি পূর্বাভাস পেয়ে যাই। ঘটনাটি হল একবার বাংলাদেশের বরিশালে মিলু যখন খুব ছোট ছিল তখন তাঁর বাবা সত্যানন্দ দাশ বর্ষায় বাগানের বাড়ন্ত ঘাস গুলোকে কেটে ফেলার জন্য ফকিরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।তিনি বলেছিলন-

> 'ঘাস কাট ফকির, বর্ষায় ঘাস বড় বড় হয়েছে, সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে, তুমি জায়গাটা পরিষ্কার করে দাও।'[২]

সেই সময় ছোট্ট মিলুর সংবেদনশীল মনে সেদিন ঘাসের জন্য বড় করুণ ব্যথা অনুভব হয়েছিল। তাঁর হৃদয় ও মন ঘাসের সঙ্গে যেন এক অভিন্ন আত্মায় পরিণত হয়েছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে যে বড় হয়ে সেই মিলু একদিন ঘাসকে নিয়ে বিখ্যাত একটি কবিতা লিখেছিলেন-

> কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
> পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
> কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস - তেমনি সুঘ্রাণ -

হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।

... ...

ঘাসের পাখনায় আমার পালক,

ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মায় কোন এক নিবিড় ঘাস মাতার..."[৩]

ছোটবেলা থেকেই রূপ- রস- গন্ধ পূর্ণ মাটি পৃথিবীর প্রতি কবি গভীর একাত্মতা বোধ করতেন। রূপসী বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি কবির হাতে এক অপূর্ব চিত্র হয়ে ধরা দেয়, যা কিনা তাঁর আগে কেউ এমন সুন্দর ভাবে বলেন নি।

১৩২৬ -এর বৈশাখে মায়ের অনুরোধে 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় কবির প্রথম কবিতা 'বর্ষ আবাহন' প্রকাশিত হয়। এরপর বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় কবির অনেক কবিতা প্রকাশিত হলেও 'কল্লোল' পত্রিকায় 'নীলিমা' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হলে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবিতাটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রশংসায় কবি যেন কবিতা লেখার ব্যাপারে নিজের মনের থেকে কিছুটা সাহস সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। এর ফলে নিজের টাকায় বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত কবিতাগুলিকে একত্রিত করে ১৯২৭ সালে 'ঝরাপালক' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এই বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন কবির কাকাতো বোন শোভনা দাশকে, উৎসর্গ পত্রে তাকে কল্যাণীয়াষু বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও 'লিটারারি নোটস' থেকে জানা যায় যে তিনি শোভনা দাশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। আর সেই গভীর অনুরাগ থেকেই হয়তো তিনি 'ঝরা পালক' বইটি তাকে উৎসর্গ করেছিলেন। শুধু তাই নয় বইটির একটি কপি শোভনা দাশ ওরফে বেবী বা By বা Y -কে পড়ার জন্য তিনি নিজে থেকে পাঠিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালের ডায়রির একটি চিঠিতে কবির প্রেমিকা শোভনা দাশ সম্পর্কে তিনি লিখছেন-

> 'She was the Only Women and her Love the Only Love for My Soul.'[৪]

জীবনানন্দ দাশ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' বইটির একটি কপি প্রিয় নারীর মতো প্রিয় মানুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও পাঠিয়ে তাঁর মতামতের অপেক্ষায় ছিলেন এবং মনে মনে কবিগুরুর স্নেহ ও আশীর্বাদ কামনা করেছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের প্রায় এক দশকেরও কিছু সময় আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছেন। সুতরাং বাংলা কাব্য সাহিত্য তাঁর মতামতের একটা গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা ছিল। জীবনানন্দ দাশ যা চেয়েছিলেন, হল ঠিক তার উল্টো। কবিগুরু লিখলেন-

'কল্যাণীয়েষু',

> **তোমার কবিত্ব শক্তি আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারি না। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহাসিত করে। বড় জাতের রচনার মধ্যে**

একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উল্টো।[৫]

ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একজন নবীন উদীয়মান কোন কবির পক্ষে কবিগুরুর এইরকম সমালোচনা শুনলে হয়তো সেই কবি ভেতর থেকে দুমড়ে মুচড়ে হতাশ হয়ে কবিতা লেখা ছেড়েই দিতেন, কিন্তু জীবনানন্দ দাশের মন খারাপ হয়ে গেলেও তিনি তাঁর নিজের লেখালেখির উপর ভরসা রেখেছিলেন।

'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩২৮ -এর মাঘ সংখ্যায় কবির 'ক্যাম্পে' কবিতাটি প্রকাশিত হলে কবিকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। এই ব্যাপারে সজনীকান্ত দাস কেবলমাত্র যে জীবনানন্দ দাশকে'ই অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করে বসে থাকলেন তা নয়, বরং 'পরিচয়' পত্রিকাকেও ছাড়লেন না। তিনি লিখলেন-

"'পরিচয়' একটি উচ্চ শ্রেণীর কালচার বিলাসীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে সস্নেহ অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইহাতে লিখিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথও হীরেন্দ্রনাথ ব্যক্তিরা যে কাগজের সম্পর্কে সম্পর্কিত তাহাতে কি প্রকারে জঘন্য লেখা বাহির হইতে পারে ও হয় তার একাধিক 'পরিচয়' দিয়েছেন। 'ক্যাম্পে' তাহার চূড়ান্ত নমুনা।"[৬]

কেবলমাত্র সজনীকান্ত দাশ'ই নয়, এইরকম আরো অনেকে কবিকে হেনস্তা করেছিল। কবি যখন ব্রজমোহন কলেজে পড়াতেন তখন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক এবং সহকর্মী নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাকে 'ঘাইহরিণী' বলে ডাকতেন।এই কলেজের হেরম্ব চক্রবর্তী কবিকে উদ্দেশ্য করে 'নীল জলের শিঙি মাছ' নামক কবিতাটি লেখেন।তিনি জীবনানন্দ দাশকে ব্যঙ্গ ও অপদস্ত করার জন্য কবির সামনেই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত বিদ্রুপাত্মক লেখাগুলি জোরে জোরে পাঠ করে শোনাতেন। এইরকম ভাবে হেরম্ভ বাবু কবিকে তাচ্ছিল্য করে যেন বেশ মজা উপভোগ করতেন।

কবির মা কুসুমকুমারী দেবী ভেবেছিলেন, তাঁর ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দিলে বোধহয় সংসারে সে মন দেবে। তাই জীবনানন্দ দাশ যখন দিল্লির রামযশ কলেজে পড়াতেন, তখন তাঁর মা একটি চিঠিতে কবিকে লিখেছিলেন-

'চিরজীবিতেষু',

'দিন ১৫ ছুটি লইয়া আইস।পাত্রী দেখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি। একেবারে বধূমাতা লইয়া কর্মস্থলে ফিরিবা। ইহাই অত্রস্থ গুরুজনের ইচ্ছা।'[৭]

আশীর্বাদিকা মা

অবশেষে ১৯৩০ সালের ৯-ই মে লাবণ্য দেবীর সঙ্গে কবির বিয়ে ঠিক হয়। এই সময় কবির মনে মধ্যে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটে চলেছিল। একদিকে রয়েছে শোভনার জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা, আরেকদিকে সদ্য বিবাহিত স্ত্রী লাবণ্যের প্রতি অনুরাগ, এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন। বিয়ের পর বাসর রাতে লাবণ্যের কাছ থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের -'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, / বন্ধু হে আমার, রয়েছো দাঁড়ায়ে', গানটি শুনতে চেয়েছিলেন। লাবণ্যকে কবি সারা জীবন পাশে পেতে চেয়েছিলেন । রামযশ কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে বিয়ে করলেও বিয়ের পর কলেজে যেতে অনেক দিন দেরি হওয়ায় জন্য তাঁর কলেজের চাকরিটি চলে যায়। এর ফলে তাকে বিবাহিত জীবনে নিদারুণ অর্থ কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছিল।বিয়ের এক বছর পরে কন্যা মঞ্জুর জন্ম হয়। কলহ পূর্ণ দাম্পত্য জীবনে একমাত্র মেয়ের ভালোবাসা কবিকে পূর্ণতা দান করেছিল। একটি জায়গায় মেয়ের প্রতি কবির গভীর ভালোবাসার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় –

> "এ পৃথিবীতে বাস্তবিক যদি কোন ভালোবাসা থেকে থাকে, তা একটি মেয়ের বাপকে ভালোবাসা। আনন্দ যখন প্রভার সঙ্গে কথা চালাচলিতে ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে একা মনমরা বসে থাকে, ওই এক রত্তি মেয়ে তখন তার পাশে এসে দাঁড়ায়। গলা জড়িয়ে ধরে। কী যেন বলবে, ভেবে পায় না, কেবল 'ও বাবা', 'ও বাবা', 'বাবা' ডাকতে থাকে, এখন কলকাতায় যেতে গেলে বড্ড বেশি মন খারাপ হয়। ফিরে আসার সময়ও- তেমন কিছু আনতে পারে না মেয়েটার জন্য।"[৮]

সমাজ ও পরিবারের মধ্যে অপমান, অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে কবির জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। ছাত্রজীবনে সেকেন্ড ক্লাস নিয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করার ফলে কবির চাকরি পেতে বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তবুও কর্মজীবনে কবি নির্দিষ্ট কোন কলেজের অধ্যাপক পদে স্থিত হতে পারেন নি। বিভিন্ন কলেজে পড়িয়েছেন। এদের মধ্যে পড়বে- ব্রজমোহন কলেজ, সিটি কলেজ, রামযশ কলেজ, হাওড়া গার্লস কলেজ প্রকৃতি। আসলে কবির শিল্পী সত্তা হয়তো বারে বারেই চাকরির মত ধরা বাধা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতো, তাই একটি জায়গায় তিনি বলেছেন-

> " চাকরি আমার ভালো লাগে না। অন্যের গোলামী করে
> আনন্দ নেই। সাহিত্যকেই আমার জীবিকা করতে চাই
> লাবণ্য। তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে।"[৯]

জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে কবি জীবনানন্দ দাশকে নিকৃষ্টতম কাজও করতে হয়েছে। কখনো তিনি ইন্সুরেন্সের দালালি করেছেন, কখনো বা ব্যবসা অথবা টিউশনের কথা ভেবেছিলেন। সত্যবাবুকে লেখা একটি চিঠিতে কবির নোটস লেখার কথা পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন –

"কাল রাত্তিরে কিছু টাকা নিয়ে আমার এখানে আপনার আসার কথা ছিল। কিন্তু আপনি আসেন নি, আপনার নির্দেশ মতো গত দেড় মাস ধরে আমি দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করে Note লিখেছি। এজন্য অন্য সমস্ত কাজ ছেড়ে দিয়ে আমাকে এক মনে বসে (প্রায় ৯২ থেকে ৯৩ ঘন্টা) লিখতে হয়েছে। মাস মাস কটা টাকা পাওয়া যায় বলে।"[১০]

জীবনানন্দ দাশ এমন একটি কাজ খুঁজছিলেন যেখানে বসে তিনি আপন মনে তাঁর সৃষ্টি কর্মের জন্য সময় বের করতে পারেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর । কবির মনের এই আক্ষেপ ঝরে পড়েছে তারই লেখা একটি কবিতায়-

"পৃথিবীতে নেই কোন বিশুদ্ধ চাকরি।
এ কেমন পরিবেশে রয়ে গেছি সবে-
বাক্ প্রতি জন্ম নিয়েছিল যেই কালে,
অথবা সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিল স্বাভাবিক পথ দিয়ে।"[১১]

কোন চাকরি নয়, দালালি নয়, সমালোচনাও নয়, কবি আপন সৃষ্টিকর্মের দ্বারা নীরবে নির্জনতার মধ্য দিয়ে হাজার বছর ধরে হাটতে চেয়েছিলেন।

জীবনানন্দ দাশের এত সমালোচক থাকা সত্ত্বেও যে কয়েকজন নামমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নাম অন্যতম। সমালোচকদের তীব্র আক্রমণ যখন প্রবলভাবে জীবনানন্দ দাশের উপর ধেয়ে আসছিল, তখন বুদ্ধদেব বসু কবির হয়ে প্রথম কলম ধরেছিলেন। আর জীবনানন্দ দাশও বুদ্ধদেব বসুকে সম্মান জানিয়ে 'ধূসর পান্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থটি তাকে উৎসর্গ করেছিলেন। এছাড়াও সঞ্জয় ভট্টাচার্যও কবির আমৃত্যু সুহৃদ ছিলেন। বিপদে-আপদে নানা সময় তিনি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শরণাপন্ন হয়েছেন। একটি চিঠিতে তিনি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন-

'প্রিয়বরেষু',

**আশা করি ভালো আছেন। বেশি ঠেকে
পড়েছি, সেজন্য বিরক্ত করতে হলো
আপনাকে। এক্ষুনি চার পাঁচশ টাকার
দরকার, দয়া করে ব্যবস্থা করুন।**[১২]

সঞ্জয় ভট্টাচার্যও সব সময় যথাসাধ্য কবির পাশে থেকে তাকে সাহায্য করেছিলেন। জীবনানন্দ দাশ ল্যান্সডাউন রোডের ১৮৩ নম্বর বাড়িতে থাকতেন। প্রচন্ড অর্থ কষ্টের মধ্যে পড়ে তিনি সেই বাড়ির একটা অংশ সুরুচি মজুমদার নামে এক মহিলাকে Sublet দিতে বাধ্য হন। ভদ্রমহিলা গান,বাজনা করতেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই ভদ্রমহিলার দিন-রাত গান-বাজনা ও চিৎকার চেঁচামেচিতে জীবনানন্দ দাশের শান্তির নীড় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে, জীবনানন্দ দাশের মতো একজন শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষ কতটা অশান্ত

উৎপীড়নের মধ্যে থাকলে গুন্ডা ভাড়া করে মহিলাকে তুলে দেবার কথা ভাবতে পেরেছিলেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে অধিকাংশ লোক বিভিন্নভাবে ভুল ব্যাখ্যা করেছিল, এই জন্য কবির মনে গভীর আক্ষেপ ও দুঃখ ছিল। এমনকি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো কবিতা-বোদ্ধা মানুষও তাঁর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি পড়ে কবিকে হতাশ একজন 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'র কবি বলে উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়াও আরো অকবি বা তৃতীয় শ্রেণির কবিদের ব্যাখ্যায় কবির আপন স্বতঃস্ফূর্ত কবিতার প্রাণ যেন নষ্ট হতে বসেছিলো। সেই কারণে কবি হয়তো কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন-

"আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন এ- কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ চেতনার, অন্যমতে নিশ্চেতনার ; কারো মীমাংসায় এ- কাব্য একান্তই প্রতীকি; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানা- রকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য – কোন- কোন কবিতা বা কাব্যের কোন-কোন অধ্যায় সম্পর্কে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।"[১৩]

জীবনানন্দের সমসাময়িক সাহিত্যিক বোদ্ধারা তাঁর কবিতার যথার্থ মূল্যায়ন করেননি। ফলে আপামর সাধারণ পাঠকের কাছে জীবনানন্দ দাশের কবিতার কতগুলো ভুল বার্তা পৌঁছেছিল। জীবনানন্দ দাশের সমালোচকদেরকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত -একদল সমালোচক কবিকে মাতাল বা পাগল প্রমাণ করতে চাইলেন, দ্বিতীয়ত আরেক দল তাঁর কবিতাকে দুর্বোধ্যতা ও অশ্লীলতা রূপে প্রমাণ করতে চাইলেন। আর তৃতীয় আরেকটি দলও ছিল যারা কবিকে প্রগতিবিরোধী হতাশাগ্রস্ত কবি হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাইছিলেন। কবির বিরুদ্ধে এত সমালোচনার ঝড় উঠলেও তিনি সরাসরি কাউকেও কোন দোষারোপ করলেন না। কিন্তু একটি কবিতায় সমালোচকদের উদ্দেশ্যে যেন তাঁর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিলো –

"বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা--
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়া পিণ্ড দিলো না উত্তর;
বুঝলাম সে তো কবি নয়-- সে যে আরূঢ় ভণিতা;
পান্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের পর
বসে আছে সিংহাসনে- কবি নয়—"[১৪]

শুধু কবিতার মধ্যে দিয়েই নয়, প্রবন্ধের মধ্যে দিয়েও সমালোচকদের প্রতি তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সমালোচনা করা যে খুবই সহজ এটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু কবিতা লেখা অথবা কবি হওয়া কী সহজ ? বোধহয় নয়। তাঁর সমালোচকদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয় 'কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।'[১৫] জীবনানন্দ দাশ সমালোচকদের প্রতি অথবা

তৃতীয় শ্রেণির কবিদের উদ্দেশ্যে একটি জায়গায় যে সব কথা বলেছিলেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন-

> **সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি -- কেননা তাদের হৃদয় কল্পনার এবং কল্পনার ভেতরে চিন্তা অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে...**[১৬]

কবি হতে গেলে শুধু সমালোচনা করলেই চলে না, হৃদয়ের কল্পনা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চিন্তনের প্রয়োজন হয়। এই চিন্তন আবার কেবল বিমূর্ত চিন্তন অথবা কোন দুশ্চিন্তা নয়। বাস্তব মানব জীবনের চরাচরের সঙ্গে চিন্তন প্রক্রিয়া মিশে গিয়ে সত্য, শিব ও সুন্দরের মিলন ঘটলে তবেই কবিতার সৃষ্টি হয়।

কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতাকে কবি মনে প্রাণে ভালোবেসে ছিলেন। তাই তিনি কলকাতা থেকে কখনো দূরে গিয়ে চাকরি করতে চান নি। বিভিন্ন কারনে কবিকে বারে বারে বাড়ি বদল করতে হয়েছিল। ভাড়া বাড়িতে অথবা উপ ভাড়াটিয়ার উৎপাতে কবির জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি চেয়েছিলেন কলকাতার মধ্যে নিজের একটা বাড়ি অথবা এক টুকরো জমি যেখানে তিনি নিজে শান্তিতে আপন মনে তাঁর লেখালেখির কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন। কবির বোন সুচরিতা দাশ এক জায়গায় লিখছেন-

> "কলকাতার ধারে কাছেই থাকার জন্য তাঁর ইচ্ছা ছিল। এবার পূজোয় ছুটিতে কেবলই বলেছেন, আমার মধ্যে লিখবার এমন একটা প্রবল প্রবাহ এসেছে যে ভাবছি কলেজের কাজ ছেড়ে দেব, শুধু লিখব, কলকাতার কাছাকাছি কোথাও একটা জমির খোঁজ কর না।"[১৭]

১৯৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ২৮ এবং ২৯ শে জানুয়ারি একটি কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। কবি জীবনানন্দ দাশ সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং 'বনলতা সেন' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। কবিতা পাঠ শেষ করে তিনি চুপচাপ বাড়ি চলে গিয়েছিলেন কিন্তু শ্রোতারা তাঁর কবিতা পাঠের কিরকম প্রতিক্রিয়া দেবেন সেই বিষয়ে তিনি বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান নি। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন যে, জীবনানন্দ দাশের আবৃত্তিতে 'বনলতা সেন' কবিতাটির যেন মৃত্যু ঘটে গেল।কবিতাটির আবৃত্তি বিষয়ে কেবলমাত্র কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত জীবনানন্দ দাশের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

১৯৫৪ সালের ১৪ই অক্টোবর হেমন্ত'র এক বিকেলে কবি হাঁটতে যাওয়ার সময় ধর্মতলা থেকে বালিগঞ্জগামী BLG304 ট্রামের সামনে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। ট্রামের চালক অনেকবার সতর্কবাণী হিসেবে হর্ন বাজালেও তিনি শুনতে পান নি। তাঁর শরীর ট্রামের সামনের ক্যাচারে আটকে গিয়েছিল এবং ট্রামটি তাঁর বডিকে টানতে টানতে কিছুটা দূরে গিয়ে তারপর থেমেছিল। পুলিশি ঝামেলা এড়াতে কবির বিপদের সময় কেউ কাছে না এলেও চুনিলাল দে কবিকে পাঁজকোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে শম্ভুনাথ

পন্ডিত হাসপাতালের জেনারেল বেডে ভর্তি করিয়েছিলেন।কবির বুকের পাঁজর এবং পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। শয্যাশায়ী কবির সঙ্গে হাসপাতালে ভূমেন্দ্র গুহ, বোন সুচরিতা দাশ এবং নার্স শান্তি মুখার্জি রাত জেগে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কবিকে সুস্থ করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।সঞ্জয় ভট্টাচার্য সজনীকান্ত দাসকে খবর পাঠালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবিকে দেখতে আসেন। যে সজনীকান্ত দাস কবিকে সবসময় সমালোচনা করতেন, তিনিও কবির এই বিপদের দিনে প্রচন্ড দুঃখ পেলেন। তিনি ড: বিধান চন্দ্র রায়কে নিয়ে কবিকে দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে কবির অবস্থা আরো আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল।

মৃত্যু পথযাত্রী অবস্থায় জীবনানন্দের জন্য সকলের মন যখন বেদনায় ভারাক্রান্ত তখন অত্যন্ত দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে কবি পত্নী লাবণ্য দাশ তাকে দেখতে এলেন না। অবশেষে ২২ শে অক্টোবর ১১.৩৫ মিনিটে কবি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন এবং আমাদের জন্য রেখে গেলেন তাঁর সৃষ্ট কাব্যের অমৃত ভান্ডার। কবির কথাতেই বলা যায়- এই পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর। কবির মৃত্যুর পর লাবণ্য দাশ ভূমেন্দ্র গুহকে বলেছিলেন-

> “তোমাদের দাদা নিশ্চয়ই বড় মাপের সাহিত্যিক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি অনেক কিছু রেখে গেলেন হয়তো । আমার জন্য কি রেখে গেলেন বল তো?”[১৮]

জীবনানন্দ দাশের জীবদ্দশায় স্ত্রী লাবণ্য দাশের মতো আরো অনেকেই কবির মন ও মেজাজ বুঝতে পারেননি। বৈষয়িক নশ্বর পৃথিবীতে স্ত্রীর অপমান ও লাঞ্ছনা এবং সমালোচকদের তীব্র আক্রমণ উপেক্ষা করেও বাংলার অপরূপ নিসর্গ প্রকৃতিকে ভালোবেসে যদি মানুষ হিসেবে সম্ভব নাও হয়, অন্তত কাক,শালিখ অথবা শঙ্খচিলের বেশে তিনি বাংলাতেই পুনর্জন্ম নিতে চেয়েছিলেন।

ট্রামের মতো একটি ধীর গতি সম্পন্ন যানবাহনের নিচে সাধারণত কোন মানুষ'ই চাপা পড়ে না, তবে কবির মৃত্যু কি ইচ্ছা মৃত্যু ছিল ? নাকি আত্মহত্যা? অথবা নিছকই একটি দুর্ঘটনা ? আজ আর সে কথা জানবার বিশেষ কোন উপায় নেই। বিভিন্ন সমালোচকেরা এই বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলে থাকেন। তবে একথা কী ঠিক নয়, যে আমরাই কবিকে অপমানে, অবজ্ঞায়, লাঞ্ছনায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছি? হয়তো তাই। জীবনানন্দ দাশের জীবন তাঁর কবিতার মতোই রহস্যময়। আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে কী নিদারুণ চূড়ান্ত রকমের হেনস্থা, বঞ্চনা ও অর্থ কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করেও কেমন করে তিনি ‘বনলতা সেন’, ‘মহা পৃথিবী’, ‘রূপসী বাংলা’র মতো বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। অথবা এও হতে পারে নীলকণ্ঠের মত বিষ জর্জর যন্ত্রনা নিজে গ্রহণ করে আমাদের জন্য রেখে গেছেন কাব্যের অমৃত ভান্ডার।আসলে নামটাই তো জীবনানন্দ। তিনি নিজে নিরানন্দ থেকেও আমাদের জন্য জীবনের আনন্দ তুলে রেখে গিয়েছিলেন। কবি যেমন

বলে গিয়েছিলেন মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব থেকে যায়; ঠিক তেমনি ভাবেই বলা যায় জীবনের মৃত্যু হলেও থেকে যায় জীবনানন্দ।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৬৮, শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলকাতা - ৯ ,পৃষ্ঠা- ৯৮।
২. কল্যাণকুমার বসু, 'বিকেলের নক্ষত্রের কাছে', নাথ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২৫শে নভেম্বর ১৯৯৮, ২৬ বি পন্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা ৭০০০২৯,পৃষ্ঠা -২৩।
৩. ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পা), 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র', ভারবি, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০৪, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ১৮৯।
৪. গৌতম মিত্র, 'পান্ডুলিপি থেকে ডায়েরি জীবনানন্দের খোঁজে', ঋত প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পি ৪৫/৫ উষা পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৮৪, পৃষ্ঠা- ১৩৭।
৫. শাহাদুজ্জামান, একজন কমলালেবু, প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪, সি এ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা- ৩৪।
৬. অমিতাভ দাশগুপ্ত (সম্পা), 'জীবনানন্দ ১০০ পরিচয়', ৭-৯ সংখ্যা, ৬৮ বছর ,মাঘ-চৈত্র ১৪০৫, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭, পৃষ্ঠা- ১৪২।
৭. প্রদীপ দাশশর্মা, 'নীল হওয়ার সমুদ্রে', প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ, বইমেলা জানুয়ারি ২০০৯, ১৮/ এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ৭০০০০২ পৃষ্ঠা- ৮৪ ।
৮. সুরঞ্জন প্রামাণিক, 'সোনালি ডানার চিল', উবুদশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৫, ২৯/৩ শ্রী গোপালমল্লিক লেন, কলকাতা- ৭০০০১২,পৃষ্ঠা-১৮৭।
৯. কল্যাণকুমার বসু, 'বিকেলের নক্ষত্রের কাছে', নাথ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২৫শে নভেম্বর ১৯৯৮, ২৬ বি পন্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা ৭০০০২৯,পৃষ্ঠা -১০৪।
১০. মাসউদ আহমাদ, 'কাঞ্চন ফুলের কবি', ধারাবাহিক পর্ব- ২৫ , 'দেশ' সাহিত্য পত্রিকা, ১৭ ই জানুয়ারি ২০২৩, ৯০ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃষ্ঠা- ৫৯।
১১. ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পা), 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র', ভারবি, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০৪, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ২৮৯।
১২. শাহাদুজ্জামান, 'একজন কমলালেবু', প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪, সি এ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা- ২০৮।

১৩. জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, প্রথম মুদ্রণ, মে ১৯৫৪, ৪৭ গনেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩, পৃষ্ঠা-৫।
১৪. ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পা), 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র', ভারবি, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০৪, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ২৬৬।
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক-সাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থন- বিভাগ, পুনর্মুদ্রণ- পৌষ ১৩৪৫, ২১০ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা -৭।
১৬. জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতার কথা', সিগনেট প্রেস, দশম সংস্করণ, মাঘ ১৪১৩, ২৫/৪ কবি মহঃম্মদ ইকবাল রোড, কলকাতা- ২৩, পৃষ্ঠা- ৭।
১৭. জগদীন্দ্র মন্ডল, সমর চক্রবর্তী(সম্পা), 'জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখ', পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১-২, ২৩/১ চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলকাতা- ২৫, পৃষ্ঠা- ১৮৫।
১৮. সুব্রত রুদ্র (সম্পা), 'জীবনানন্দ: জীবন আর সৃষ্টি', নাথ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৯, ২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা- ৭০০০২৯, পৃষ্ঠা- ১৪৪।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সিন্দুক' : লাটদার-জমিদারের আক্রান্ত আখ্যান

মুঈদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, কাকদ্বীপ

সারসংক্ষেপ : তেভাগার প্রেক্ষাপটে একটি অসাধারণ ব্যতিক্রমী গল্প ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সিন্দুক'। যার প্রেক্ষাপট কাকদ্বীপের চন্দনপিঁড়ি এলাকা। ব্যতিক্রমী বলছি এই কারণে, সাহিত্যিকরা সাধারণত তেভাগা আন্দোলনকারীদের দুর্দশা, শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত হওয়া নিয়ে গল্প লিখেছেন। আমরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাদের সেই মর্মন্তুদ কাহিনী শোনার জন্য। কিন্তু একবারও কি উঁকি মেরে দেখেছি তাঁদের দিকে, যাঁরা আন্দোলনের পরে পরেই জমিদারি লাটদারি হারিয়েছেন! ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় দেখেছিলেন। দেখেছিলেন বলেই 'সিন্দুকে'র মতো গল্প লিখতে পেরেছিলেন। গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার' (১৯৫০), নারায়ণ সান্যালের 'লাল মাটি' (১৯৫১), সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান' (১৯৫৬-৫৮), মহাশ্বেতা দেবীর 'বন্দোবস্তি' (১৯৮৭), সেলিনা হোসেনের 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' (১৯৮৯) প্রভৃতি উপন্যাসে আমরা দেখি, তেভাগা আন্দোলনের নানান টানাপোড়েন। কখনো তাদের দুর্দশা, কখনো হিংসা, সন্দেহ, কখনোবা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, অবিশ্বাস, কখনোবা কৃষক নেতৃবর্গের দলাদলি। এমনকি এই ধারারই একটি উপন্যাস ঝড়েশ্বরও লিখেছিলেন, যার নাম 'স্বজন ভূমি'। 'সিন্দুক' গল্পটি কিন্তু এসবের ব্যতিক্রম। এখানে আন্দোলনকারীদের নিয়ে কোনো কথা নেই বরং যাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সেই তাদেরই একজনের কাহিনি। সত্তর বাহাত্তরের ছুনু মাইতি। একদা জাঁহাবাজ। পাকা গোঁফ দাড়িতে ছেয়ে থাকলেও চকচকে তার চিবুক। নদীর মাঝখানে নৌকা দেখলে বলে দিতে পারে কার নৌকা। এক রশি দূর থেকে হাঁটার ছন্দ দেখে অনায়াসে শনাক্ত করতে পারে কে আসছে। টাটকা মাছ ও দুধ তার আহার। যার প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণ মাইতি বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর আদলে বই ছাপিয়েছিলেন নিজস্ব ছাপাখানায়, নিজ খরচে। পুলিশ দারোগা দেখলে যাকে সম্মান করতেন। লাটদার-জমিদারের আখ্যান। যে লাটদার অনেককিছু হারিয়েছে। বিলাস বৈভব এখন আর তেমন কিছু নেই। এরকম এক হৃতসর্বস্ব লাটদারের আখ্যান 'সিন্দুক'।

সূচক শব্দ: তেভাগা, জমিদার, লাটদার, আন্দোলন, শোষিত, দুর্দশা, আখ্যান ইত্যাদি।

মূল আলোচনা :

শুধু ভারতবর্ষ কেনো, পৃথিবীর ইতিহাসে চল্লিশের দশক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, মন্বন্তর, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কৃষক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাদি ঘটনাবলি ঘটেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি আন্দোলন হলো তেভাগা আন্দোলন। যার ব্যাপ্তি এপার-ওপার দু-বাংলাতেই বয়ে ছিলো। এপার বাংলায় দিনাজপুর থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে প্রায় সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। কাকদ্বীপ তথা দক্ষিণ বাংলায় কৃষক সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৪৬ সালের নভেম্বরে। পাঁচ বছর ধরে চলেছিল এই সংগ্রাম। কাকদ্বীপের লালগড় হয়ে উঠেছিল সংগ্রামের প্রধান রণক্ষেত্র। ক্রমে চন্দনপিঁড়ি, বুধাখালী সংগ্রামের এক একটি ঝটিকা কেন্দ্রে পরিণত হয়। চন্দনপিঁড়ির চাষি মা অহল্যা সহ সরোজিনী, উত্তমী, বাতাসী এবং চাষিবীর অশ্বিনী দাস, গণেশ ভুঁইয়া, নীলকণ্ঠ, সুধীর, সুরেন, নগেন দলুই, মণি ধাড়া প্রমুখের নির্ভীক আত্মদানে অমর হয়ে আছে কাকদ্বীপের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস। অমর হয়ে আছে বুধাখালী, চন্দনপিঁড়ি। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের আলোচ্য 'সিন্দুক' গল্পের প্রেক্ষাপট এই চন্দনপিঁড়ি গ্রাম।

তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস জানতে হলে সে সময়ের ভূমি ব্যবস্থা বিষয়ে জানা প্রয়োজন। বাংলার গ্রামীণ সমাজে ব্রিটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত ভূমির মালিক ছিলেন চাষিরা। মোগল আমল পর্যন্ত তারা এক তৃতীয়াংশ বা কখনো কখনো তার চেয়েও কম ফসল খাজনা হিসাবে জমিদার বা স্থানীয় শাসনকর্তার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে প্রদান করতেন। ব্রিটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রচলনের ফলে চাষিদের জমির মালিকানা চলে যায় জমিদারদের হাতে। জমিদাররা জমির পরিমাণ ও উর্বরতা অনুযায়ী ব্রিটিশদের খাজনা দিত। জমিদারদের সাথে ফসল উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ সময় জমিদার ও কৃষকদের মাঝখানে জোতদার নামে মধ্যস্বত্বভোগী এক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এরা পত্তনি প্রথার মাধ্যমে জমিদারদের কাছ থেকে জমি পত্তন বা ইজারা নিত। এই জোতদার শ্রেণি কৃষকের জমি চাষ তদারকি ও খাজনা আদায়ের কাজ করতো। ফসল উত্পাদনের সম্পূর্ণ খরচ কৃষকেরা বহন করলেও যেহেতু তারা জমির মালিক নন সে অপরাধে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তুলে দিতে হতো জোতদারদের হাতে। এ ব্যবস্থাকে বলা হতো 'আধিয়ারী'। জোতদারি ও জমিদারি প্রথা ক্ষুদ্র কৃষকদের শোষণের সুযোগ করে দেয়। খাজনা আদায়ের জন্য জোতদাররা এদেরকে দাসের মতো ব্যবহার করে। উৎপন্ন ফসলের পরিবর্তে একসময় কৃষককে বাধ্য করা হয় অর্থ দিয়ে খাজনা পরিশোধ করতে। ফলে কৃষকেরা গ্রামীণ মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হন। সর্বস্বান্ত হয়ে এক সময়ের সমৃদ্ধ বাংলার কৃষক পরিণত হন আধিয়ার আর ক্ষেত মজুরে। জমিদার-জোতদারদের এই শোষণ কৃষকের মনে বিক্ষোভের জন্ম দেয়। এই বিক্ষোভকে সংগঠিত করে ১৯৩৬ সালে গঠিত হয় 'সর্ব ভারতীয় কৃষক সমিতি'। ১৯৪০ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার উদ্যোগে বাংলার ভূমি

ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাব দেয় 'ফ্লাউড কমিশন'। এই কমিশনের সুপারিশ ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে চাষিদের সরাসরি সরকারের প্রজা করা এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দুইভাগের মালিকানা প্রদান করা। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের আন্দোলনের জন্য কৃষক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এছাড়া জনসাধারণের কাছ থেকে হাটের 'তোলা' ও 'লেখাই' সহ নানা কর আদায় করা হতো। এসব বন্ধের জন্য আন্দোলন জোরদার হয়।

তেভাগা আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি ছিলো— ১) উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দু'ভাগ (২/৩ ভাগ) তাদের দিতে হবে।
২) জমিতে ভাগ চাষীদের দখলিসত্ব দিতে হবে।
৩) ভাগচাষির খামারে ধান তুলতে হবে।
৪) ভাগ চাষের ধান বুঝে নিয়ে জমির মালিকরা রসিদ দেবে।

এই দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছলে পুলিশ নির্মমভাবে অনেকেরই হত্যা করে। প্রশাসন দমন-পীড়ন চালালেও এই আন্দোলন বাংলার কৃষক সমাজে দারুন প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে আমরা দেখেছি, জোতদার লাটদারের শোষণ ও জমিদারি প্রথার বিলুপ্তিও ঘটেছে।

গল্পটি ব্যতিক্রমী বলেছি এই কারণে, সাহিত্যিকরা সাধারণত তেভাগা আন্দোলনকারীদের দুর্দশা, শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত হওয়া নিয়ে গল্প লিখেছেন। আমরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাদের সেই মর্মন্তুদ কাহিনী শোনার জন্য। কিন্তু একবারও কি উঁকি মেরে দেখেছি তাঁদের দিকে, যাঁরা আন্দোলনের পরে পরেই জমিদারি লাটদারি হারিয়েছেন! ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় দেখেছিলেন। দেখেছিলেন বলেই 'সিন্দুকে'র মতো গল্প লিখতে পেরেছিলেন। গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার' (১৯৫০), নারায়ণ সান্যালের 'লাল মাটি' (১৯৫১), সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান' (১৯৫৬-৫৮), মহাশ্বেতা দেবীর 'বন্দোবস্তি' (১৯৮৭), সেলিনা হোসেনের 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' (১৯৮৯) প্রভৃতি উপন্যাসে আমরা দেখি, তেভাগা আন্দোলনের নানান টানাপোড়েন। কখনো তাদের দুর্দশা, কখনো হিংসা, সন্দেহ, কখনোবা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, অবিশ্বাস, কখনোবা কৃষক নেতৃবর্গের দলাদলি। এমনকি এই ধারারই একটি উপন্যাস ঝড়েশ্বরও লিখেছিলেন, যার নাম 'স্বজন ভূমি'। 'সিন্দুক' গল্পটি কিন্তু এসবের ব্যতিক্রম। এখানে আন্দোলনকারীদের নিয়ে কোনো কথা নেই বরং যাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সেই তাদেরই একজনের কাহিনি। লাটদার-জমিদারের আখ্যান। যে লাটদার অনেককিছু হারিয়েছে। বিলাস বৈভব এখন আর তেমন কিছু নেই। এরকম এক হৃতসর্বস্ব লাটদারের আখ্যান 'সিন্দুক'।

সত্তর বাহাত্তরের ছুনু মাইতি। একদা জাঁহাবাজ। পাকা গোঁফ দাড়িতে ছেয়ে থাকলেও চকচকে তার চিবুক। নদীর মাঝখানে নৌকা দেখলে বলে দিতে পারে কার নৌকা। এক রশি দূর থেকে হাঁটার ছন্দ দেখে অনায়াসে শনাক্ত করতে পারে কে

আসছে। টাটকা মাছ ও দুধ তার আহার। যার প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণ মাইতি বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর আদলে বই ছাপিয়েছিলেন নিজস্ব ছাপাখানায়, নিজ খরচে। লাটদারেরই ওয়ারিশ এই ছুনু বাবু এখন নিজ চাষের জমির ধান আর নথিভুক্ত বর্গাদারের ফসলাংশ বেচেবুচে চন্দনপিঁড়ির মাননীয় ব্যক্তি। প্রতিদিনের অভ্যাস, রাতে বাস্তুপুকুর ফিশারি টহল দিয়ে এসে শোয়। সকালে কাজকর্ম সারে। একদিন সকালে ব্রাশ নিয়ে পুকুর ঘাটে, এমন সময় কানে লাগে 'দাদা—বড়দা—'। সাইকেল চেপে কাকদ্বীপ থেকে গেছে সুবোধ। তার লেডিস হোস্টেলের কাজ এখন অনেক বাকি। পয়সা নেই। কি করবে ভেবে না পেয়ে ছুনু মাইতির বাড়ি। প্রিয়াকে চা বসাতে বলে ছুনু বাবু জানতে চায় তার মনস্কামনার কথা। সুবোধ কীভাবে উপস্থাপন করবে ভেবে পাচ্ছেনা। মুড়ি নারকেল কুচো খেতে খেতে চায়ে চুমুক মেরে শেষমেশ সুবোধ বলে ফেলে, 'যা পরিকল্পনা করছিলুম, সব বুঝি হেজে যায়ঠে।—হোস্টেল ঘরটার ছাদ ফেলাইবো। কিন্তু পকিট যে একদম ফাঁকা। আপনার দোরকে ধার মাঙতে আসছি। হাজার দশেক টাকা হইলে কাজটা শেষ করি ফেলাই—'[১]

এই সুযোগে লেখক ছুনু মাইতির অতীত ও বর্তমান অবস্থা জানিয়ে দিতে ভোলেন না। পাঠকও জেনে যায় একদা লাটদারের 'দিনকাল'। একটা সময় কত পুলিশ দারোগা তার বাড়িতে বসে ডাব জল মাছ ভাজা খেয়ে তবেই গ্রামে ঢুকেছে। বিভিন্ন পরামর্শ নিয়েছে রাইফেল কাঁধে পুলিশ, কোমরে পিস্তল রাখা দারোগা। দেড় দু হাজার মন ধান বেচা। বোট বোঝাই হয়ে ধানকলে চালান যাওয়া। এরপর লেখকের কৌশলী সংযোজন—'সৌসব তো অখন পুরাণ ভাগবতের কাহিনী! দশ হাজার কি, দু দশ টাকা বার করতেই কত যে খুঁজতে হয়!'[২] তাই আজকাল আর সম্মান নেই। এখন গুরুত্ব পায় চাষীদের ছেলেপুলে, পঞ্চায়েত সদস্যরা। ছুনু বাবু থমকে যায় দশ হাজারের কথা শুনে! সুবোধ জানাও ধীরে অথচ সতর্ক ভাবে চা খায় উত্তরের অপেক্ষায়। এবার ছুনু বাবু তার নিজের আওকাতের কথা জানিয়ে দেয়—' অখন তো নগদ ক্যাশ আর লাড়াচাড়ার সোর্স নাই গো! যা দু পাঁচ বস্তা ধান বেচি সৌ পয়সায় তেল মশলা খরিদ করি। ফিশারির মাছ বেচে কাপড়চোপড় কিনি, মেয়ে জামাইদের লৌকিকতা সারি'।[৩] সুবোধও ছাড়া লোক নয়। কীভাবে আদায় করতে হয় সে জানে। মাছ ট্রলার, ব্যাংক লোন, টু সিলিন্ডার সিক্স সিলিন্ডার মেশিন, থানা পুলিশ রেজিস্ট্রি অফিস, লরি লরি মাল বিক্রি, নার্সিংহোম, পলিক্লিনিকের সঙ্গে আবাসিক হোটেলে নারী পুরুষের অবাধ সহবাসের নতুন ক্রমবর্ধমান শহর কাকদ্বীপের বাসিন্দা সুবোধ কাজ উদ্ধারের জন্য কতটা নরম আর হীন হতে হয় জানে। সুবোধ ফট করে ছুনু বাবুর হাতটা ধরে বলে, 'খেঁজুরি থানার দেশবাড়িতে আমার বাপ ঠাকুরদা নানাভাবে আপনাদের কাছ থিকে উপকৃত। আমি সৌ আশায় আপনার কাছে প্রার্থী গো বড়দা'।[৪] একদা ভূস্বামী বংশের সুখ্যাতিতে মনটা ভিজে যায় ছুনুবাবুর। বড়লোক গরীবিয়ানা পছন্দ করেন না। তাই এখন জীর্ণ হলেও দীন হতে বাধে ছুনুবাবুর। গাছ তিনখানা দেওয়ার কথা বললেও

সুবোধ তাতে সন্তুষ্ট হয় না। নাছোড়বান্দা। জানায় হাজার তিনেক টাকা না হলে বাজারে মুখ দেখাতে পারবে না। পাওনাদাররা বলে, 'খেঁজুরির লোক তো? ও শালাদের ফুটানি সর্বস্ব!' নিজের জন্মস্থানের নিন্দে শুনে ছুনু ক্ষেপে ওঠে। শেষমেশ, জাঁদরেল আলমারির পাল্লা খুলে চকচকে পাঁচখানা ১০০ টাকার নোট সুবোধের হাতে দেয়।

ঝড়েশ্বরের গল্পের একটা প্যাটার্ন হলো, কোনো যানবাহনে বসে কাহিনি নির্মাণ করা। এই গল্পেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সাইকেল নিয়ে সুবোধ ও ছুনু মাইতি বের হয়। এদিকে গল্পও এগিয়ে চলে। গোটা গ্রামে কোথায় কি, কার আধিপত্য কেমন ছিলো সুবোধকে জানাতে ভোলে না। কোথায় শহীদদের বেদী, কোথায় স্মৃতিস্তম্ভ সবই দেখায়। এমনকি অহল্যার নামে স্মৃতিস্তম্ভ তিনিই প্রথম গড়েন, সেটিও জানায়। সুবোধ মনে মনে ভাবে, এই বাবুরাই তো লাটদার চাকদার, তারাই তো সেনের কাছারিতে পুলিশ এনে গুলি করেছে, যে গুলিতে অহল্যা বাতাসিরা মরেছিলো। আবার তারাই শহীদ বেদী বানাচ্ছে! সুবোধ ভাবতেই থাকে—'বোধহয় বুঝছিলো দিন বদল হইতেছে। সেই সময়ে নিজেকেও বদলাইতে অমন কাজ করছিলি বুদ্ধিমান লোকটা। মাঠ ভর্তি গাছ চিনে, ধানের জটা দেখি কয়ে দিতে পারে ফলন কেমন হইবে—সেই মাটিতে আবার কারা ক্ষমতায় আসতিছে আন্দাজ পাইছিলো। শিকারি মানুষ তো—বাঘ হরিণের আবাজ বুঝে...!'[৫]

গল্পকার সাইকেলের সঙ্গে সঙ্গে গল্পকেও এগিয়ে নিয়ে যান। আশ্রমের উদ্দেশ্যে বার হলে রাস্তায় অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। অনেকেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ লাটদার বংশের সন্তান ছুনু বাবুকে সমীহ দেখায়। আবার কাউকে দেখে মনে মনে তিনি রেগেও যান। রতিকান্ত, দোকানি বা সুদর্শনরা ছুনু বাবুকে সমীহ করে, অন্যদিকে মুবারকের নাম শুনে ছুনুবাবুর গায়ের রক্তে তাপ জেগে ওঠে। বলে, এরাই 'সেই কালে কৃষক লিডারদের সঙ্গে দল গড়ে সেনেদের কাছারির পরেশকে খতম করেছিলো'। সুবোধ মুচকি হাসে। ভূমির উপর দাঁড়িয়ে ভূস্বামী। এক সময়ের প্রজাবর্গ চাষীবাসি তাদের সন্তানরা সম্মান দিয়ে কথা বলছে। সম্পত্তি হারালেও কিছু মানুষ যে এখনো বশীভূত, ভালো লাগে ছুনু বাবুর। এখন সেই অর্থ সামর্থ্য বা বিক্রম দেখানোর মতো তাগদ নেই। সেই দলবলও নেই। লেখক এদের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন—এরা এখন 'বিষ হারিয়ে অক্ষম বিষধর... কিংবা বিক্রম হারিয়ে বুড়ো বাঘ!' অথচ এই টিবির জঙ্গলে উঠে ছুনুবাবু কতো যে হরিণ ফায়ার করেছিলো, তখন ফরেস্টাররা সব ইয়ার দোস্ত। তেল মসলা টোটা ছুনুর। ফরেস্টার রেঞ্জারদের শুধু হরিণ। এইসব ভাবতে ভাবতে 'টাকরা জিহ্বা' নিসপিস করে ওঠে, আক্ষেপের সুর ধরা পড়ে—'কতদিন যে হরিণ খাবা হয়নি!' সুবোধ সমব্যথী হয়ে জানায়, 'বন্দুকটা লিয়া বারাইলে পারেন'। কিন্তু এখন যে বাঘ বোরা হরিণ কুমির সব মারা বারণ! 'শালারা...পশুকুলের সঙ্গে প্রকৃতির ভারসাম্য করতিছে। ও দিকে যে দশ মনের পারমিট লিয়া দু'শ মণ কাঠে বোট বোঝাই দিয়া পালাইতেছে—তার বেলায় ক্ষতি হইতেছি নি'![৬] অনুযোগ ক্রমে

আপসোসের রূপ পায়। সারা দিনরাত বন্দুকটা কাঠের সিন্দুক আলমারিতে ভার হয়ে শুয়ে থাকে, কোনো কাজেই লাগে না আজকাল। আপসোস করতে করতে আবারো বলে ফেলে 'হরিণের মাংস বড় শুদ্ধ খাদ্য' সুবোধ। সুবোধও প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে ভাবতে থাকে, এই শেষ বয়সে 'মানুষটা যদি হরিণের এক থাবা মাংস খাইতে পাইতো...!'

দেবেশ রায় ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র ভূমিকায় লিখেছেন—'ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় সেই বিরল গল্পকার যাঁর প্রতিটি লাইন বা বাক্য গল্পে ঠাসা ও সে-গল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ'।[৭] সেজন্য 'সিন্দুক' গল্পটিকে আমরা নভেলেটও বলতে পারি। কারণ, আমরা খেয়াল করলে দেখবো, ছুনু মাইতির কাহিনির পাশাপাশি লেখক আরো একটি ছোট্ট উপকাহিনিও শুনিয়েছেন। জীবন সাউ-অনিমা-ডিংরা বাবু। চন্দনপিঁড়ি দ্বীপের ছোটখাটো চকদার রূপচাঁদ ডিংরা। নিজ সংসার দিল্লিতে। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে সাজানো সংসার। অনিমাকে নাতনি পাতিয়ে ছেলের বাড়ি কাজের মেয়ে করে পাঠিয়েছিল ডিংরাবাবু। সেই বারো তেরো বছর বয়সে পাঠিয়েছিলো। এখন উনিশ কুড়ি বছরের যুবতী অনিমা। মাসে মাসে অর্ধেক বেতন বাপের নামে পাঠায়। বাকি অর্ধেক জমে অনিমার পাস বইয়ে। বছর বছর টেরিভয়েলের শাড়ি, বৌদিদের বাতিল নিখুঁত সিন্থেটিক শাড়ি, চুড়িদার পাঞ্জাবিতে অনিমাকে বেশ সুন্দরী লাগে—'বিয়ার যুগ্যি'। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবলে জীবন সাউ যেনো হোঁচট খায়। কারণ মাস ফুরালেই পিয়ন এসে টাকা দিতো। বলতো, 'তোমার পেনশান লিবেনি, জীবন?' দিল্লির টাকা, অনিমার খাটুনির পয়সা। গুরুপদ, রতিকান্তরা পেনশান পায় ঠিক কথা, কারণ তার মায়েরা তে-ভাগা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মরেছিল। তাই সরকার পেনশান দেয়। কিন্তু অনিমার হকের পয়সা, রোজগারের পয়সা; ভিক্ষা নয়। এখন তার পাত্রস্থ করতে উদগ্রীব মা। এমনকি তার রূপার হার বালা বেচে দিতেও প্রস্তুত। যতই কালো হোক না কেনো পরিস্কার কাপড় কুর্তা পরলে অনিমাকে কেউ অবহেলা করতে পারবেনা। এই অনিমা সুবোধ ও ছুনু মাইতির পথ আটকে দাঁড়ায়। ফুরফুরে মেজাজে ছুনুবাবুকে দাদু সম্বোধন করে। আদিখ্যেতার সুরে বলে, 'বাপ বর খুঁজে না পাইলে কি? দাদু তোমার গলায় মালা দুবো। লিবে নি?' গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে লেখা বলে গল্পকার আদি রসাত্মক ইয়ার্কিও তুলে ধরেন। ছুনুবাবু বলে, 'দুশ শালি! ঢঙি। আর ক বছর থাকলি তো দিল্লি বম্বের রেণ্ডি বনে যেতিস।'[৮]

ভাষার ক্ষেত্রেও গল্পকারকে খুব সচেতন মনে হয়েছে। কথায় কথায় 'গো' শব্দটির প্রয়োগে গ্রামীণ মানুষের আন্তরিকতা ধরা পড়ে। যেমন, 'ভোর হইছে নাকি গো', 'সৌ আশায় আপনার কাছে প্রার্থী গো বড়দা', 'কে গো', 'না গো' ইত্যাদি। আবার উপভাষার ব্যবহারও ঠিকঠাক দেখা যায়। এরা 'সেই'কে 'সৌ', 'কেনো'কে 'কেনি', 'পয়সা'কে 'পইস্যা', (সেই>সৌ, কেনো>কেনি, পয়সা>পইস্যা) বলে। আবার এদের উচ্চারণেও প্রায় শ্রুতিধ্বনি শোনা যায়। যেমন, 'আওয়াজ'কে 'আবাজ'

(আওয়াজ>আবাজ), 'হাওয়া'কে 'হাবা' (হাওয়া>হাবা) 'বাবু'কে 'বাউ'(বাবু>বাউ)। দন্ত্য 'ন'কে 'ল' তো হামেশাই উচ্চারণ করে। যেমন, 'নামা'কে 'লাবা' (আমি লাববো) বলে। কখনো বা অল্পপ্রাণকে মহাপ্রাণ, মহাপ্রাণকে অল্পপ্রাণ, অঘোষকে সঘোষ, সঘোষকে অঘোষ উচ্চারণও চোখে পড়ে।

বৃহদাকার মজবুত কাঠ বা লোহার বাক্সকে আমরা সিন্দুক বলি। আলোচ্য গল্পের নাম 'সিন্দুক'। কিন্তু গল্পের সিন্দুকটি লোহার নয়, কাঠের। গ্রামের মানুষ তখন এট্যার্চি দেখেনি। সিন্দুকই তাদের নিরাপদ আশ্রয়। টাকা, গহনা, দলিল, দস্তাবেজ গুরুত্বপূর্ণ সব জিনিস সিন্দুকের মধ্যেই রাখা হতো। এই গল্পেও আমরা দেখি, ছুনু মাইতি সিন্দুক থেকে বন্দুক বের করে রাতে ফিশারি টহল দেয়। আবার দিনের বেলা সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। কারণ, পশু শিকার করা এখন নিষেধ। সেজন্য 'সারাদিন কাঠের সিন্দুক আলমারিতে বন্দুকটা ভার হয়ে শুয়ে থাকে'। অর্থের সঙ্গে সিন্দুকেরও একটা সম্পর্ক আছে। অর্থ থাকলে সিন্দুকেরও নাড়াচাড়া হয়। এখন ছুনু মাইতি লাটদারি হারিয়েছে, ফলে সেই অর্থ আর নেই। তাই সিন্দুকের ব্যবহারও কমেছে। কেবল বন্দুকটারই আশ্রয় হিসেবে থেকে গেছে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে 'সিন্দুক' নামকরণটিও মন্দ হয়নি।

তথ্যসূত্র:

১. ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৯, শ্রাবণ ১৪২৬, পৃ ১১২

২. প্রাগুক্ত, পৃ ১২২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১২৪

৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩০

৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৪

৭. দেবেশ রায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৯, শ্রাবণ ১৪২৬, পৃ ১৫

৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১২৯

যোগদর্শনালোকে সমাধি লাভের উপায়

আল জুলিয়াস হক
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, সংস্কৃত বিভাগ,
নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়, হলদিবাড়ি, কোচবিহার

সারসংক্ষেপ : ভারতীয় দর্শন আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দুই প্রকার। এই আস্তিক দর্শনের মধ্যে অন্যতম হল মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত 'যোগসূত্র'। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে- চিত্তবৃত্তির নিরোধই হল যোগ। এই যোগ বা সমাধি দুই প্রকার- (ক) সম্প্রজ্ঞাত ও (খ) অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হল চিত্তবৃত্তি নিরোধের সেই অবস্থা যেখানে ধ্যেয় বস্তুর সম্যক ভাবে সাক্ষাৎকার হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরবর্তী ধাপ হল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে, যখন বিবেক-খ্যাতি রূপ সাত্ত্বিক বৃত্তির নিরোধ হয় এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বৃত্তির-ই নিরোধ হয়, চিত্তে কেবলমাত্র সংস্কার মাত্রই অবশিষ্ট থাকে, তখন তাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়।

সমাধি লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন। কারণ সাধনা ছাড়া কখনোই সিদ্ধি লাভ হয় না। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনে সমাধি লাভের জন্য প্রধানত চারটি উপায়ের কথা বলেছেন-

১. অভ্যাস এবং বৈরাগ্য।
২. ঈশ্বর-প্রণিধান।
৩. ক্রিয়াযোগ।
৪. অষ্টাঙ্গ যোগ।

চিত্তবৃত্তির নিরোধের জন্য অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই দুটোরই সমান গুরুত্ব রয়েছে। দুটির মধ্যে একটির সাধনের দ্বারা সমাধি সম্ভব নয়। কারণ বৈরাগ্যের দ্বারা বাহ্যিক বস্তুর মোহ নষ্ট হয় এবং নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা মন নিয়ন্ত্রিত হয়।

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে সমাধি লাভের দ্বিতীয় উপায় হল ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বর হল ক্লেশ, কর্ম, বিপাকাদি সংস্কার হইতে মুক্ত এবং অন্য সমস্ত পুরুষের তুলনায় একটি বিশেষ ধরনের অর্থাৎ উচ্চতর শ্রেণীর। যদিও প্রতিটি মানুষ কার্যত বিষয় হইতে মুক্ত তথাপি অজ্ঞতার কারণে তাঁর মধ্যে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি গুণের অধ্যারোপ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে এমন কোন গুণেরই অধ্যারোপ হয় না। সাধক যদি ঈশ্বরের ধ্যান করে তবে সে দ্রুতই সমাধি এবং সমাধির ফল লাভ করবে।

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে ক্রিয়াযোগের দ্বারা সমাধি লাভ করা যায়। তিনি তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলেছেন।

সাংসারিক তথা মন্দাধিকারী ব্যাক্তিদের সাধনার উপায় রূপে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলা হয়েছে। অষ্টাঙ্গ যোগের আটটি অঙ্গ হল- যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,

প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। আলোচ্য প্রবন্ধে চিত্তবৃত্তির নিরোধ তথা সমাধি লাভের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মূল শব্দ- যোগদর্শন, পতঞ্জলি, সমাধি, ঈশ্বর, চিত্তবৃত্তি, অষ্টাঙ্গ যোগ।

ভূমিকা- 'দৃশ্' ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় যোগে "দৃশ্যতে জ্ঞায়তেঽনেনেতি দর্শনম্" এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা দর্শন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। তাই বলতে পারি- যার দ্বারা যথার্থ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাই দর্শন। ভারতীয় দর্শন আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দুই প্রকার। যারা বেদকে প্রামাণ্য রূপে স্বীকার করেন তারা আস্তিক। আর যারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না তারা নাস্তিক। এই আস্তিক দর্শনের মধ্যে অন্যতম হল যোগ দর্শন।

যোগ শব্দটি 'যুজ্' থেকে উদ্ভূত। 'যুজ্' ধাতুর তিনটি আর্থ- সমাধি, সংযোগ, সংযম। বেদব্যাস যোগভাষ্যে স্পষ্টতই বলেছেন- "যোগঃ সমাধিঃ"। মহর্ষি পতঞ্জলিও যোগ দর্শনে যোগ শব্দটিকে 'সমাধি' অর্থেই গ্রহণ করেছেন। কারণ মহর্ষি পতঞ্জলি সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত যোগের জন্য সমাধি শব্দের ব্যবহার করেছেন।

যদিও ভারতীয় সাহিত্যে যোগ শব্দের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। তবুও যোগদর্শনের উপর উপলব্ধ একমাত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ হল মহর্ষি পতঞ্জলির লেখা 'যোগসূত্র'। এটি চারটি পাদ-এ বিভক্ত- সমাধি, সাধন, বিভূতি, কৈবল্য। **"যোগদর্শনালোকে সমাধি লাভের উপায়"** হল আমার প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

সমাধির লক্ষণ- মহর্ষি পতঞ্জলি "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"[১] -এই সূত্রে সমাধি তথা যোগের লক্ষণ করেছেন। সূত্রের সাধারণ অর্থ হল- চিত্তবৃত্তির নিরোধই হল যোগ। বাচস্পতি মিশ্রের মতে- "চিত্তশব্দেনান্তঃকরণং বুদ্ধিমুপলক্ষয়তি"[২]। সাধারণত, চিত্ত হল প্রকৃতির বিকার। আর এই চিত্ত ত্রিগুণাত্মক হয়। চিত্ত যখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন চিত্ত বস্তুর আকার ধারণ করে, এরই নাম চিত্তবৃত্তি। আর্থাৎ চিত্ত যে বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত সেই বিষেয়েরই আকার ধারণ করে। চিত্তের এই বিষয়গত বিকারই হল চিত্তবৃত্তি।

চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার- প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, এবং স্মৃতি। চিত্তবৃত্তিকে আত্মা নিজের বৃত্তি বলেই মনে করে এবং যারফলে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হওয়া উচিৎ। আর এই চিত্তবৃত্তির নিরোধই হল মুক্তি।

মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বললেও আচার্য বাচস্পতি মিশ্রের মতে যোগ হল- "ক্লেশকর্মবিপাকশায়পরিপন্থাচিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"[৩]। তাঁর মতে, ক্ষিপ্তাদি

---

[১] যোগসূত্র-১/২

[২] পাতঞ্জলযোগদর্শনম্(ব্যাস ভাষ্য, তত্ত্ববৈশারদী, যোগ বার্ত্তিক সহিত)। শ্রীনারায়ণ মিশ্র। পৃষ্ঠা-৩

[৩] পাতঞ্জলযোগদর্শনম্(ব্যাস ভাষ্য, তত্ত্ববৈশারদী, যোগ বার্ত্তিক সহিত)। শ্রীনারায়ণ মিশ্র। পৃষ্ঠা-১০

চিত্তভূমিতে যে সকল বৃত্তির নিরোধ হয় সে সকল ক্লেশাদির পরিপন্থী হওয়ায় তাদের যোগ বলা যায় না।

আচার্য বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে- কেবলমাত্র "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এই সূত্রানুসারে যোগের লক্ষণ স্পষ্ট হয় না। তাই তাঁর মতে- "দ্রষ্টুস্বরূপাবস্থিতি হেতুশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগঃ"[৪]। এই যোগ হল চিত্তের সার্বভৌম ধর্ম। তাই ব্যাসদেব ভাষ্যে বলেছেন- "স চ সার্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্মঃ"[৫]। আর এই চিত্তের সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থানের নাম হল চিত্তভূমি। এই চিত্তভূমি পাঁচ প্রকার- ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। যেহেতু যোগের গৌণ অর্থ হল একাগ্রতা। এবং সেই একাগ্রতা কেবলমাত্র ক্ষিপ্ত প্রভৃতি চিত্তভূমিতেই সম্ভব। তাই যোগকে চিত্তের সার্বভৌম ধর্ম বলা হয়েছে। একাগ্র ভূমিতে ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু মনের সমস্ত বিকার একমাত্র নিরুদ্ধ ভূমিতেই নষ্ট হয়। তখন মন শান্ত হয়ে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান করে- "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্"[৬]।

যোগ বা সমাধি দুই প্রকার- (ক)সম্প্রজ্ঞাত ও (খ)অসম্প্রজ্ঞাত।

(ক) সম্প্রজ্ঞাত সমাধি- সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হল চিত্তবৃত্তি নিরোধের সেই অবস্থা যেখানে ধ্যেয় বস্তুর সম্যক ভাবে সাক্ষাৎকার হয়। চিত্তের একাগ্রাবস্থায় অর্থাৎ চিত্ত যখন ধ্যেয় বস্তুতে স্থির থাকে, সেই অবস্থায় যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় এই সমাধিকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। এই সমাধিতে প্রথমে স্থূল বস্তু পরে সূক্ষ্ম বস্তুর জ্ঞান হয়। তাই বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেছেন-

যোগারম্ভে মূর্তহরিমমূর্তমথ চিন্তয়েৎ।
স্থূলে বিনির্জিতং চিত্তং ততঃ সূক্ষ্মে জ্ঞানৈর্নয়েৎ।[৭]

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে- একজন তীরন্দাজ যেমন ভাবে প্রথমে স্থূল লক্ষ্যে অনুশীলন করে পরে সূক্ষ্ম বস্তুকেও লক্ষ্য করতে সক্ষম হয় তেমনি সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রথমে স্থূল বস্তু পরে সূক্ষ্ম বস্তুকে ধ্যেয় করে সাধনা করা হয়। ধ্যেয় বিষয়ানুসারে এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চারটি অবস্থা রয়েছে- বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত এবং অস্মিতানুগত। দেবদেবীর মূর্তি অথবা ঘটাদির মতো কোন স্থূলবস্তুতে চিত্ত যখন ধ্যান নিবিষ্ট হয় তখন তাকে বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। তাই ব্যাসদেব ভাষ্যে বলেছেন- "বিতর্কঃ চিত্তস্যালম্বনে স্থূল আভোগঃ"[৮]। তন্মাত্রের মতো কোন সূক্ষ্ম বস্তুতে চিত্ত যখন ধ্যান নিবিষ্ট হয় তখন তাকে বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। ইন্দ্রিয়ের

---

[৪] পাতঞ্জলযোগদর্শনম্(ব্যাস ভাষ্য, তত্ত্ববৈশারদী, যোগ বার্ত্তিক সহিত)। শ্রীনারায়ণ মিশ্র পৃষ্ঠা-১৩

[৫] ব্যাস ভাষ্য-১/১

[৬] যোগসূত্র-১/৩

[৭] পাতঞ্জলযোগদর্শনম্(ব্যাস ভাষ্য, তত্ত্ববৈশারদী, যোগ বার্ত্তিক সহিত)। শ্রীনারায়ণ মিশ্র। পৃষ্ঠা-৫৭

[৮] ব্যাস ভাষ্য-১/১৭

মতো কোন সূক্ষ্ম বস্তুতে চিত্ত যখন ধ্যান নিবিষ্ট হয় তখন তাকে আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। অস্মিতা বা অহম্-এ চিত্ত যখন ধ্যান নিবিষ্ট হয় তখন তাকে অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

(খ) অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি- সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরবর্তী ধাপ হল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে, যখন বিবেক-খ্যাতি রূপ সাত্ত্বিক বৃত্তির নিরোধ হয় এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বৃত্তির-ই নিরোধ হয়, চিত্তে কেবলমাত্র সংস্কর মাত্রই অবশিষ্ট থাকে, তখন তাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়। যোগ দর্শনে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে নির্বীজ সমাধি বলা হয়েছে। তাই ভাষ্যকার ব্যাসদেব বলেছেন- "এষঃ নির্বীজঃ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ"[৯]। এই নির্বীজ সমাধিতে যখন কোন বৃত্তি-ই অবশিষ্ট থাকে না, অর্থাৎ সমস্ত বৃত্তির নিরোধ হলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। তাই ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে- "সর্ববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধাঃ চিত্তস্য সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ"[১০]।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দুই প্রকার- ১.উপায় প্রত্যয় ২.ভব প্রত্যয়। "স খল্বয়ং দ্বিবিধঃ উপায়প্রত্যয়ো ভবপ্রত্যয়শ্চ"[১১]। উপায় প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে শাস্ত্র কথিত উপায়ের বিধিবৎ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুমুক্ষুদের মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি পাঁচ প্রকার উপায়ের কথা বলেছেন- শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা। বিদেহ এবং প্রকৃতিলয় উপাসকদের যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় তাকে ভব প্রত্যয় সমাধি বলে।

সমাধি লাভের উপায়-

সমাধি লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন। কারণ সাধনা ছাড়া কখনোই সিদ্ধি লাভ হয় না। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনে সমাধি লাভের জন্য প্রধানত চারটি উপায়ের কথা বলেছেন-

১.অভ্যাস এবং বৈরাগ্য।
২.ঈশ্বর-প্রণিধান।
৩.ক্রিয়াযোগ।
৪.অষ্টাঙ্গ যোগ।

১.অভ্যাস এবং বৈরাগ্য- মহর্ষি পতঞ্জলির মতে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্ভব। আর পূর্বেই বলা হয়েছে চিত্তবৃত্তির নিরোধই হল 'সমাধি'। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের কথা বলতে গিয়ে বেদব্যাস বলেন- "চিত্তনদী নাম উভয়তোবাহিনী"[১২]। অর্থাৎ চিত্ত হল একটি নদীর মতো, যার দ্বিমুখী স্রোত রয়েছে। প্রথমটি যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন করে এবং দ্বিতীয়টি অযথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন করে। মহর্ষি

---

[৯] ব্যাস ভাষ্য-১/১৮

[১০] ব্যাস ভাষ্য-১/১৮

[১১] ব্যাস ভাষ্য-১/১৯

[১২] ব্যাস ভাষ্য-১/১২

বেদব্যাসের মতে, প্রথম ধারাটি প্রবাহিত হয় মুমুক্ষুর কল্যাণের জন্য অর্থাৎ মুমুক্ষুকে মোক্ষের দিকে নিয়ে চলে এবং দ্বিতীয়টি ব্যাক্তিকে সংসারভিমুখি করে তোলে। তাই ব্যাসদেব বলেছেন- "বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ"[১৩]।

চিত্তবৃত্তির নিরোধের জন্য অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই দুটোরই সমান গুরুত্ব রয়েছে। দুটির মধ্যে একটির সাধনের দ্বারা সমাধি সম্ভব নয়। কারণ বৈরাগ্যের দ্বারা বাহ্যিক বস্তুর মোহ নষ্ট হয় এবং নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা মন নিয়ন্ত্রিত হয়। অতএব, চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য অভ্যাস এবং বৈরাগ্য উভয়েরই প্রয়োজন। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন- "অভ্যাসবৈরাগাভ্যাং তন্নিরোধঃ"[১৪]। মনের চঞ্চলতা প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন-

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে"[১৫]॥

২.ঈশ্বর-প্রণিধান- মহর্ষি পতঞ্জলির মতে সমাধি লাভের দ্বিতীয় উপায় হল ঈশ্বর-প্রণিধান। তাই তিনি বলেছেন- "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা"[১৬]। ভাষ্যকার বেদব্যাসের মতে- "তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি"[১৭]। অর্থাৎ সাধক যদি ঈশ্বরের ধ্যান করে তবে সে দ্রুতই সমাধি এবং সমাধির ফল লাভ করবে।

প্রসঙ্গত প্রশ্ন জাগে ঈশ্বরের স্বরূপ কী? এর উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলেছেন- "ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"[১৮]। অর্থাৎ ঈশ্বর হল ক্লেশ, কর্ম, বিপাকাদি সংস্কার হইতে মুক্ত এবং অন্য সমস্ত পুরুষের তুলনায় একটি বিশেষ ধরনের অর্থাৎ উচ্চতর শ্রেণীর। যদিও প্রতিটি মানুষ কার্যত বিষয় হইতে মুক্ত তথাপি অজ্ঞতার কারণে তাঁর মধ্যে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি গুণের অধ্যারোপ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে এমন কোন গুণেরই অধ্যারোপ হয় না। বর্তমানে যে সকল যোগীরা মুক্ত পূর্বে তারা বদ্ধ ছিল এবং সংসারী মানুষেরা সারাজীবনই বদ্ধই থাকে। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব কালেই মুক্ত, সর্বজ্ঞ এবং সর্বাধিক ঐশ্বর্য সম্পন্ন। জাগতীক সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়। ঈশ্বর এক, তিনিই আদিগুরু। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলেছেন- "পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"[১৯]।

---

[১৩] ব্যাস ভাষ্য-১/১২

[১৪] যোগসূত্র-১/১২

[১৫] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৬/৩৫

[১৬] যোগসূত্র-১/২৩

[১৭] ব্যাস ভাষ্য-১/২৩

[১৮] যোগসূত্র-১/২৪

[১৯] যোগসূত্র-১/২৬

ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যোগসূত্রকার বলেছেন- “তজ্জপস্তদর্থভাবনম্”[২০]। অর্থাৎ ওম্-কারের জপ এবং তার অভিধেয়ার্থের কথা চিন্তা করা উচিৎ। এইভাবে ঈশ্বর প্রনিধানের দ্বারা চিত্ত একাগ্র হয় এবং তারপর ঈশ্বর উপলব্ধি হয়। ঈশ্বর সাধককে অনুগ্রহ করে সমাধির ফল প্রদান করেন।

৩. ক্রিয়াযোগ- মহর্ষি পতঞ্জলির মতে ক্রিয়াযোগের দ্বারা সমাধি লাভ করা যায়। তিনি তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলেছেন- “তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ”[২১]। শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্ত্রণে রাখাই হল তপস্যা। বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থের নিয়মিত অধ্যয়ন হল স্বাধ্যায় এবং নিয়মিত ভগবানের পবিত্র নাম জপ করাই হল ঈশ্বর প্রণিধান। তপস্যার সহজ অর্থ হল ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করা, অর্থাৎ তপস্যা হল কষ্ট সহ্য করার সাথে সাথে যে সমস্ত কাজের দ্বারা সুখের প্রাপ্তি হয় সেই সমস্ত কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে তপস্যা তিন প্রকারের হয়- শারীরিক তপস্যা, বাচিক তপস্যা, মানসিক তপস্যা।

মনকে সংসার থেকে বিচ্যুত করে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ভগবানের নাম জপ করাই হল স্বাধ্যায়। বাচস্পতি মিশ্রের মতে- পুরুষসূক্ত, রুদ্রমণ্ডলাদি বৈদিক গ্রন্থ এবং ব্রহ্মপরায়ণের মতো পৌরাণিক গ্রন্থের অধ্যয়ন হল স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে চঞ্চল মনে একাগ্রতা আসে।

ক্রিয়াযোগের তৃতীয় উপায় হল ঈশ্বর প্রনিধান। মহর্ষি বেদব্যাসের মতে, ঈশ্বরের কাছে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে কর্মের ফল লাভের বাসনা ত্যাগ করাই হল ঈশ্বর প্রণিধান। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, ইহ-লৌকিক বা পার-লৌকিক সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাই হল ঈশ্বর প্রণিধান।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে সমাধির উপায়রূপে আলোচিত ঈশ্বর প্রণিধান এবং ক্রিয়াযোগ আলোচিত ঈশ্বর প্রণিধান একই নাকি ভিন্ন। আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, সমাধির উপায়রূপে আলোচিত ঈশ্বর প্রণিধান এবং ক্রিয়াযোগ আলোচিত ঈশ্বর প্রণিধান ভিন্ন। সমাধির উপায়রূপে আলোচিত ঈশ্বর প্রণিধান ভাবনারূপ এবং ক্রিয়াযোগ আলোচিত ঈশ্বর প্রণিধান কর্মার্পণরূপ- “নন্বীশ্বরপ্রণিধানমত্র-কর্মতচ্ছেষত্বয়োরভাবাদিত্যর্থঃ”[২২]। তাই এই দুটি ভিন্ন।

৪.অষ্টাঙ্গ যোগ- সাংসারিক তথা মন্দাধিকারী ব্যাক্তিদের সাধনার উপায় রূপে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলা হয়েছে। যারা অষ্টাঙ্গ যোগের অনুসরণ করবেন তাদের অভ্যাস-

---

[২০] যোগসূত্র-১/২৮

[২১] যোগসূত্র-২/১

[২২] পাতঞ্জলযোগদর্শনম্(ব্যাস ভাষ্য, তত্ত্ববৈশারদী, যোগ বার্ত্তিক সহিত)। শ্রীনারায়ণ মিশ্র। পৃষ্ঠা-১৩৯

বৈরাগ্য বা ক্রিয়া যোগের অনুসরণ করতে হবে না। কারণ অন্যান্য সাধকদের জন্য বর্ণিত অভ্যাস-বৈরাগ্য, ভক্তি ইত্যাদির মতো উপায়ও অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অষ্টাঙ্গ যোগের আটটি অঙ্গ হল- যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। যোগের এই আটটি অঙ্গই সাধকের অনুসরণ করা উচিৎ। বিশেষ অবস্থা ব্যতীত কোন একটি অঙ্গের অনুসরণ না করে সাধক তার লক্ষ্য পৌঁছাতে পারবে না।

"যময়ন্তি নিবর্তয়ন্তি ইতি যমাঃ" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে যম-শব্দের অর্থ হল নিবৃত্তিমূলক সাধনা। যমের মূল উদ্দেশ্য হল সাধককে হিংসাদি নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা। 'যম' আচরণে শুদ্ধি আনে এবং দু:খজনক কর্মের অবসান ঘটায়। যম পাঁচ প্রকারের হয়- "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ"[২৩]। অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। কারও প্রতি হিংসা না করাই হল অহিংসা। মিথ্যা কথা না বলাই হল সত্য। জোর করে করোও জিনিস না নেওয়াই হল অস্তেয়। ষড় রিপুর উপর বিজয় লাভ করাই হল ব্রহ্মচর্য। অন্যের থেকে কিছু না নেওয়াই হল অপরিগ্রহ। মহর্ষি পতঞ্জলি এই পাঁচ প্রকার যমকে 'মহাব্রত' বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর মতে, অহিংসাদি ব্রতগুলিকে নিরন্তর অভ্যাসের মাধ্যমে মহাব্রত অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব।

"নিয়ময়ন্তি প্রেরয়ন্তি ইতি নিয়মাঃ" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে নিয়ম হল প্রবৃত্তিমূলক। এই 'নিয়ম' পাঁচ প্রকার- "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ"[২৪]। অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান। নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রত পালন হল নিয়ম। প্রত্যহিক স্নান ও শুদ্ধ আহার গ্রহণ করা শৌচ। প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকা হল সন্তোষ। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করাই হল তপস্যা। নিরন্তর শাস্ত্রাদির পাঠ এবং ওম্-কারের জপ করাই হল স্বাধ্যায়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই ঈশ্বর প্রণিধান।

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে- "স্থিরসুখমাসনম্"[২৫]। অর্থাৎ যেখানে একজন সাধক আরামে এবং স্থিরভাবে বসতে পারে সেটাই হল আসন। শরীরের স্বাভাবিক প্রচেষ্টাকে শিথিল করে এবং মনকে স্থির করে বসাই হল আসন। তাই যোগসূত্রে বলেছেন- "প্রয়ত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্"[২৬]। বাচস্পতি মিশ্র আসনের সময় শরীরের স্বাভাবিক কার্যকলাপ বন্ধ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন।

[২৩] যোগসূত্র-২/৩০

[২৪] যোগসূত্র-২/৩২

[২৫] যোগসূত্র-২/৪৬

[২৬] যোগসূত্র-২/৪৭

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে- "তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ"[২৭]। অর্থাৎ আসন সিদ্ধির পর শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করাকে 'প্রাণায়াম' বলা হয়। নাসারন্ধ্র দিয়ে বাহ্যিক বায়ু প্রবেশ করাকে শ্বাস বলা হয় এবং নাকের ছিদ্র দিয়ে অভ্যন্তরীণ বায়ু নির্গত করাকে প্রশ্বাস বলে। প্রাণায়াম অনুশীলনকারী এই শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রাণায়াম সাধারণত তিন প্রকার- রেচক, পূরক এবং কুম্ভক। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি চার প্রকার প্রাণায়ামের কথা বলেছেন- ১.বাহ্য প্রাণায়াম(রেচক), ২.অভ্যন্তর প্রাণায়াম(পূরক), ৩.স্তম্ভ প্রাণায়াম(কুম্ভক) ৪.বাহ্য এবং অভ্যন্তর বিষয়াপেক্ষী(কুম্ভকের একটি প্রকার)।

প্রশ্বাসের পর যখন শ্বাস না নেওয়া হয় তখন তাকে বাহ্যিক প্রাণায়াম বা রেচক বলা হয়। শ্বাসকে ভেতরের দিকে টেনে আটকে রাখাকে অভ্যন্তর প্রাণায়াম বা পূরক বলা হয়। শরীরকে স্থির রেখে শ্বাসের দ্বারা সমগ্র শরীরকে বায়ু পূর্ণ করাই হল স্তম্ভ প্রাণায়াম বা কুম্ভক প্রাণায়াম। বাহ্য এবং অভ্যন্তর বিষয়াপেক্ষী প্রাণায়াম হল কুম্ভকের একটি প্রকারভেদ। কারণ এতেও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে বন্ধ করা হয় এবং যারফলে শরীরস্থ বায়ু সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

যখন ইন্দ্রিয়গুলি তাদের নিজ নিজ বিষয় হইতে সম্বন্ধ রহিত হয় এবং চিত্তের স্বরূপের অনুকরণ করে তখন তাকে 'প্রত্যাহার' বলা হয়। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন- "স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ"[২৮]। এতে স্বাভাবিকভাবে বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে অন্তর্মুখী করা হয়। এই প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে চিত্ত স্থির করা হয়।

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে- "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা"[২৯]। অর্থাৎ চিত্তকে কোনো বিশেষ দেশে বা নির্দিষ্ট কোন একটি বিষয়ে আবদ্ধ করাই ধারণা। ভাষ্যকার ব্যাসদেবের মতে, দেশ দুই প্রকার- বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ। ভাষ্যকার ব্যাসদেবের মতে- নাভিচক্র, হৃদয়, নাসিকাগ্র, জিহ্বাগ্র প্রভৃতি হল অভ্যন্তর দেশ; এবং সূর্য চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি হল বাহ্য দেশ।

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে- "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"[৩০]। অর্থাৎ ধারণার একটি নির্দিষ্ট দেশে চিত্তকে স্থির রাখাই হল ধ্যান। ধ্যানের সময় চিত্ত নির্দিষ্ট বিষয়ে এতটাই নিমগ্ন হয়ে যায় যে সেই সময় চিত্তে অন্যান্য কোন বিষয়েরই চিন্তা হয় না।

ধ্যানের সর্বোচ্চ অবস্থার নাম হল সমাধি। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে- "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ"[৩১]। সমাধিবিশিষ্ট-চিত্ত ধ্যেয় বিষয়ে এতটাই

---

[২৭] যোগসূত্র-২/৪৯

[২৮] যোগসূত্র-২/৫৪

[২৯] যোগসূত্র-৩/১

[৩০] যোগসূত্র-৩/২

নিমগ্ন থাকে যে তার আত্মজ্ঞানের অনুভূতি থাকে না। তিনি ধ্যেয় বিষয়েই অভিভূত হয়ে পড়েন।

উল্লিখিত অষ্টাঙ্গিক যোগ দুটি ভাগে বিভক্ত- বাহ্যিক সাধনা এবং অভ্যন্তরীণ সাধনা। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি প্রথম পাঁচটিকে বলা হয় বাহ্যিক সাধনা এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই শেষ তিনটিকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ সাধনা।

উপসংহার- যোগ বা সমাধি হল চিত্তের চঞ্চলাতাকে নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ পদ্ধতি। মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধি লাভের চারটি উপায়ের কথা বলছেন। যেগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে সাধক তাঁর চিত্ত বৃত্তির নিরোধ করতে পারেন। যিনি যোগ সাধনা করেন তাকে যোগী বলা হয়। আর এই যোগী হল সর্বোৎকৃষ্ট। তাইতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন-

তপস্বিভ্যোধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন।।[৩২]

গ্রন্থপঞ্জী-

১. পাতঞ্জলযোগদর্শনম্। সম্পা। স্বামী ভর্গানন্দ। কোলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২৩।
২. পাতঞ্জলযোগদর্শনম্। সম্পা।সুরেশ চন্দ্র শ্রীবাস্তব। বারাণসীঃ চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ১৯৮৮।
৩. ভারতীয় দর্শন। সম্পা। ড. জগদীশ চন্দ্র মিশ্র। বারাণসীঃ চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০০৫।
৪. পাতঞ্জলযোগদর্শনম্ (ব্যাস ভাষ্য, তত্ত্ববৈশারদী, যোগ বার্ত্তিক সহিত)। সম্পা। শ্রীনারায়ণ মিশ্র। বারাণসীঃ ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ১৯৮১।
৫. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)। সম্পা। স্বামী রামসুখদাস। গোরখপুরঃ গীতাপ্রেস, ২০১৭(৩৪-তম সংস্করণ)।

---

[৩১] যোগসূত্র-৩/৩

[৩২] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা- ৬/৪৬

নাট্যকার হর ভট্টাচার্যর 'অদ্ভূত আঁধার' : ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বয়ান

রবিউল শেখ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বিশ শতকের নয়ের দশকের বাংলা প্রতিবাদী নাটকের ধারায় নাটককার হর ভট্টাচার্য অন্যতম। সামাজিক অধিকারের অবমাননা ও ক্ষমতার স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে তিনি সাহসী সংলাপ সাজিয়েছেন। যেখানেই সাধারণ মানুষের মূল্যবোধ ক্ষুণ্ন হয়েছে, মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, শাসকদলের আগ্রাসী শক্তি প্রভাব বিস্তার করেছে মানুষের উপর, ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর শোষণ ও শাসন নেমে এসেছে সাধারণ জনগণের উপর সেখানেই তাঁর প্রতিবাদী বিবেক প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা, নিয়ন্ত্রণ, করাপশন, জনগণের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ, সংঘ বিজেপির মৌলবাদ, সাধারণ ব্যক্তির স্বাধীন অধিকারকে সংকুচিত করে দেওয়া সিস্টেম— ইত্যাদির বিরুদ্ধে নাটককারের প্রতিবাদী অন্তরাত্মা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। 'অদ্ভূত আঁধার' নাটকে নাট্যকার একদিকে যেমন ক্ষমতালোভী, দাপুটে নেতার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে পার্টির সর্বস্তরীয় নিয়ন্ত্রণ এবং Criminalization-এর কথাও তুলে ধরেছেন। আবার ক্ষমতায়নের পাশিপাশি সৎ কমিউনিস্ট নেতার কথাও তুলে ধরেছেন।

মূল শব্দ: পার্টির সর্বস্তরীয় নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতায়নের রাজনীতি, সৎ কমরেডের বিকল্প মডেল, প্রতিবাদী অন্তরাত্মা, করাপসন।

মূল আলোচনা:

১

বাংলা প্রতিবাদী নাটকের যে ধারা চলে আসছিল তা আটের দশকের শেষ দিক এবং নয়ের দশকের শুরুতে এসে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে। এ সময় স্বল্পসংখ্যক নাট্যকারের কিছু নাটকে প্রতিবাদের কথা থাকলেও তেমন ধারাবাহিকতা দেখা যায়না। হর ভট্টাচার্য প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদী নাটক লেখা শুরু করছেন। তাঁর নাটকগুলি বিশেষভাবে অভিনয়-সাফল্যও লাভ করে। প্রথম প্রযোজনার দিক থেকে তাঁর রচিত নাটকগুলির সময়কাল হল – 'একজন সিদ্ধার্থ মিত্র আপনি বুঝতে পারছেন',(১৯৮৪), 'ঘোড়া চোর' (১৯৮৬), 'আত্মজ হত্যা' (১৯৮৮), 'নষ্ট অসীম' (১৯৯০), 'অন্ধকার থেকে' (১৯৯৩), 'নটি ও ঘোড়া চোর' (১৯৯৪), অদ্ভুত আঁধার' (১৯৯৬), 'জঙ্গল জঙ্গল' (১৯৯৭), 'নয়ন' (১৯৯৮), 'মহানাবিক' (১৯৯৯), 'বেচারা পেঁচারা' (২০০৩), 'আগুনের

বর্ণমালা' (২০০৭), 'ডলার এবং অন্যান্য' (১৯৯২), 'অস্তিত্বের আকার' (২০০৭), 'অয়দিপউস' (২০১১), 'মেদেয়ারা' (২০১৪), 'চৈতন্য' (২০২২), 'ক্রেয়ন ও অন্তিগনে' (২০২২), 'ব্যারিকেড থেকে ব্যারিকেড' (২০২২), 'তাজমহল' (২০২৩)। তাঁর অপ্রযোজিত নাটক 'কৃষ্ণ কথা' (২০০৭ -এ স্যাস নাট্যপত্র থেকে প্রকাশিত হয়), 'প্রকৃত পাঠ' (২০০৯, স্যাস নাট্যপত্র থেকে প্রকাশিত)।

২

হর ভট্টাচার্যর প্রায় সব নাটকেই আছে প্রতিবাদী স্বর। কোনো প্রকার অন্যায়, ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যক্তির অধিকারে শাসক দলের হস্তক্ষেপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি আপোস করেননি। তাঁর প্রতিবাদী সত্তার পরিচয় তাঁর নাটকে ফুটে উঠেছে। তাঁর 'অদ্ভুত আঁধার' নাটকে দলের ক্ষমতাকে তিনি তুলে ধরেছেন। দল চাইলেই বিরোধী মত পোষণকারী সদস্যকে যেকোনো মুহূর্তে ছেঁটে ফেলতে পারেন। মনুর মতো আদর্শবাদী রাজনৈতিক নেতাকে দল ছেঁটে দেন। নীতিজ্ঞানহীন, ক্ষমতালোভী, দাপুটে নেতা মদন মিত্র **(বিভাস চক্রবর্তীর প্রযোজনায় অন্য থিয়েটার থেকে 'অদ্ভূত আঁধার' অভিনীত হবার সময় মনুর বন্ধু চরিত্রের নাম মদন মিত্রর জায়গায় ছিল গগন)**[১] মিনিস্টার। 'পার্টি বলতে লোকে বুঝে মদন মিত্রকে রঞ্জিতদাকে'। নাটকটি নাটককার লিখছেন **১৯৯০** এর প্রেক্ষিতে। তখন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর সিং। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। **প্রথম দিকে যে প্রয়োজন ও নীতিবোধ নিয়ে দল রাজ্যে ক্ষমতায় আসেন ধীরে ধীরে তা ভুলে যেতে থাকেন**। এ সম্পর্কে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য-

> তিন দশকেরও বেশি (১৯৭৭-২০১১) শাসনের প্রথম পনেরো বছরে অন্তত বিরোধী রাজনীতি বলতে তেমন কিছু ছিল না; ঠিক যেমন আগের পাঁচ বছরের কংগ্রেসী শাসনে বিরোধীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।[২]

দলের মধ্যে নানা মতানৈক্য তৈরি হয়। দলের সদস্যের মতানৈক্যের অন্যতম উদাহরণ 'অদ্ভুত আঁধার' নাটকটি। মিছিল করার জন্যে দল মনু ও বিজয় পালকে চাকরি থেকে বহিস্কার করেন। কোনো সদস্য দলের সমালোচনা করলে, দলের কার্যাবলীর প্রতি সহমত পোষণ না করলে দল তাকে বহিস্কার করতে পিছপা হতেন না। সুকন্যার মূল্যায়ন– **"পৃথিবীটা এখন তোমরা যে জায়গায় নিয়ে গেছ তাতে মানুষের সামনে দুটো রাস্তা হয় হত্যা অথবা আত্মহত্যা"**। কমিউনিস্ট পার্টি করলেও দর্শনগত দিক দিয়ে মনু ও মদন মিত্র দুজনের অবস্থান আলাদা। একই ইস্যুতে আন্দোলন করতে গিয়ে বিজয় পালের ও মনুর চাকরি যায়। দল মনুকে চাকরি ফিরিয়ে দিতে চাইলে মনু তা গ্রহণ করেননি। তাঁর যুক্তি:

> একই ইস্যুতে আন্দোলন করতে নেমেছিলাম। দুজনের চাকরি গেল। পার্টি আমার চাকরির ব্যবস্থা করল। প্রতীপ আমাদের দলের লোক

> নয় বলে ওরটা হল না, এক্ষেত্রে চাকরিটা গ্রহণ করা মানে পিছনের দরজা দিয়েই ঢোকা।[৩]

দলের ক্ষমতার অপব্যবহারকে নাটককার সমালোচনা করেছেন। দলের কাছে জনগণ শুধু একজন ভোটার মাত্র। শক্তির কাছে, পুঁজির কাছে শ্রমিক, সাধারণ মানুষ শুধু সংখ্যামাত্র - এ সত্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'রক্তকরবী' নাটকে অনেক আগেই তুলে ধরেছিলেন। নাট্যকার হর ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতায় আসার পর জনগণকে ভুলে যান – **"এটাই আমাদের দেশের সবচেয়ে ডেফিসিয়েন্সি তাঁরা সাধারণ মানুষকে বুঝতে চাননা । নিজেরা যেটা বুঝেছেন সেইটা মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন"**। জনগণের ভোটে ক্ষমতায় এসে ক্ষমতায় টিকে থাকা ও আরো ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার নেশায় মেতে ওঠেন। মদন মিত্রর কাছে পাওয়ার গেইন করাই একমাত্র লক্ষ্য:

> চাকরি করব কেন, আই উইল অ্যা লট টু ডু, অনেক কিছু করতে হবে আমায়। স্টেডিয়ামের কাজটা শুরু হয়েছে কলেজের সাংসানটা বার করেছি, শুধুমাত্র সেটাকে আমাদের লোকালিটিতে নিয়ে আসতে হবে।.. আর ক্রমাগত আরো ক্ষমতা আরো power attain করতে চাই।[৪]

সুকন্যার মতে, মদন মিত্রের মতো পলিটিশিয়ানরা **'টিকিধারী সংকীর্ণ কমিউনিস্ট'**। এই শব্দ প্রয়োগের বিশেষ গুরুত্ব আছে। ধর্ম ও স্বৈরাচার এবং রাজনীতি যেন এক হয়ে উঠেছিল। পার্টি করতে আসার অর্থই হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজের আখের গোছানো এবং শক্তি সঞ্চয় করা । এই শব্দবন্ধ সে সময়ের মদন মিত্রের মতো নেতাদের স্বরূপ উদঘাটনের কাউন্টার থিসিস।

৩

'অদ্ভুত আঁধার' নাটকে নাট্যকার হর ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন দলীয় স্বার্থ বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ অনেক সময় ব্যক্তিস্বরকে চিরতরে শেষ করে দেয়। ব্যক্তির স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারলাভের সপক্ষে নাট্যকার সোচ্চার হয়েছেন। সে সময় পার্টিতে **'ক্রিমিনালাইজেশন শুরু হয়'**। পার্টির এই রাজনৈতিক সত্যকে নাটককার তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন: 'অদ্ভুত আঁধার' নাটকটি বিভাস চক্রবর্তীর প্রযোজনায় অভিনীত হবার পর নাটকটি সম্পর্কে **প্রতিদিন** সংবাদপত্রে একটা রিভিউ বের হয়েছিল, সেখানে বলা হয়েছিল:

> 'অদ্ভুত আঁধার' প্রমাণ করে দিল সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে অন্তত একটি ভালো নাটক লেখা হয়েছে। বামপন্থী নাট্যকাররা আর ভাল নাটক লিখতে পারছেন না এই দুর্নামটি ঘোচাল 'অদ্ভুত আঁধার'।[৫]

মদন মিত্র ও মনু দুজন বন্ধু হলেও, মদন মিত্র বন্ধুকে ভালোবাসলেও মনুর আদর্শের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিলনা। মনুর আদর্শবোধ মদন মিত্রের কাছে অতিরিক্ত

বাড়াবাড়ি, **'সত্যের মেনিয়া'**। আবার তাঁর বিদ্রোহি ভাবনাকে মদন মিত্র ভাবেন নকশাল। মনু সমস্ত দিক দিয়ে একলা, তাঁর স্ত্রীও শেষ পর্যন্ত তাঁর আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেননা। তাঁদের দীর্ঘদিনের দাম্পত্য জীবন সন্তানহীন। সুকন্যা চান একটা নিজেদের সন্তান, সেজন্য তিনি মনুকে চিকিৎসার জন্য তাড়া দেন, অলৌকিক বাবার কাছে যেতে বলেন। মনুর কাছে এসব সংস্কার। সুকন্যা শেষপর্যন্ত মদন মিত্রের কাছে তাঁর দুঃখের কথা বলেন । মদন মিত্রকে জীবন দিতে বলেন:

> ভালোবাসায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই মদন। যথেষ্ট পরিমাণে ভালবাসা আমি পেয়েছি, দিয়েওছি। ভালোবাসায় আমাদের কোনো অপূর্ণতা নেই আমি চাই জীবনের স্রোত ঢেও আছড়ে পড়ুক, বড় প্রাণহীন আমাদের বেঁচে থাকা। আমাদের প্রাণ এনে দিতে পার।[৬]

মনু তাঁর স্ত্রী সুকন্যা ও মদনের প্রীতি সম্ভাষণ সবটা শুনেন। এই অবস্থায় মনু সিঁড়ি বেয়ে আসতে আসতে সিঁড়ি থেকে পড়ে যান তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। ১৯৯৮ সালে নাটকটি অভিনীত হবার পর *The statesman* পত্রিকায় একটা রিপোর্ট বের হয়, সেখানে নাটকটি সম্পর্কে বলা হয়:

> In fact 'Adbhut Andhar, written by Hara Bhattacharya and produce by Bibhas Chakraborty, tells us the story on an individual who protested against his grand father is corruptioin in his boyhood, fight corruption in his party(in many matters and party method and practice) and finally is shaken to the core by his wife desperation(through only for a child he cannot give her for his organic deficiencies) and act of indiscretion with his long time friend and comrade.[৭]

মনু ও সুকন্যার দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকার একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল:

> এ নাটকটি কতটা রাজনৈতিক সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। মনু ও গগনের ব্যক্তিজীবন এবং মনু সুকন্যার দাম্পত্য জীবনে ঢুকে পড়া নাটকটিকে রাজনৈতিক নাটক হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছে। [৮]

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই ঘটনার মধ্যে অভিনবত্ব আছে। দুই বন্ধুর ব্যক্তিজীবনচর্যা একই রাজনৈতিক দলের দুই কমরেডের অবস্থানকে স্পষ্ট করে। এই ঘটনার পর দেখা যায় মনু তাঁর ঠাকুরদা, মার সাথে কথা বলতে থাকেন, সেই সাথে স্ত্রী সুকন্যার কথারও জবাব দেন। একই দৃশ্যে তিনটি প্রজন্ম কথোপকথনের মধ্যে এগোচ্ছে। মনুর ঠাকুরদা, মনুর মা, এঁরা সক্রিয়ভাবে সংলাপে অংশ নিয়েছেন। মনু কলেজে না গিয়ে বাড়ি ফিরে আসে, কলেজস্ট্রিটে ছাত্রদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে, তাই মনুরা স্কুল বয়কট

করেছে এ কথা শুনে মনুর ঠাকুরদা বলেন: 'পুলিশ তো আর তোর বাবা, ঠাকুরদার উপর গুলি চালায়নি'। মনুর স্মৃতিচারণায় হলেও, তাঁর ঠাকুরদা চরিত্রটি বাস্তবের চরিত্র হয়ে উঠেছে। মনুর মা-ও সংলাপের মধ্যে নিজেকে তুলে ধরেছেন: 'তোর বাবাও তো এক হাজিরাবাবুর চাকরি করেছে মিলে। পেরেছে? তোর ঠাকুরদার মত রোজগার করতে?' এ যেন বাংলা নাটকের ধারায় এক অভিনব পরিকল্পনা। এক নতুন ছাঁচ।

৪

১৯৭৭-তে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথমদিকে বিপুল পরিমাণে জনসমর্থন লাভ করেছিল— বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে। তবে দুই দশক ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জয়লাভ পার্টির শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। সরকার সাধারণ মানুষ ও তাদের অধিকার, মানুষের দাবি-দাওয়া, এসবকে গুরুত্ব না দিয়ে করাপশনকে প্রশ্রয় দেয়। পার্টির মধ্যে বিভিন্ন স্তরের নেতার মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ দেখা যায়। পার্টি সর্বস্তরে তাঁর ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান। কি শিক্ষা, কি হাসপাতাল, গ্রাম, শহর সর্বস্তরে পার্টি নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। মন্দির, মসজিদ মঠ ক্লাব ছোটো বড়ো মাস্তানবাহিনী পার্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাখবার চেষ্টা করেন। নাটককার হর ভট্টাচার্য তাঁর 'অদ্ভুত আধাঁর' নাটকে পার্টির নিয়ন্ত্রণকেও তুলে ধরেছেন। পার্টি শিক্ষাব্যবস্থাকেও হাতে রাখতে চান। চাকরি দেওয়া ও চাকরি নেওয়া দুটোই পার্টির পাওয়ার হিসেবে গণ্য হয়। মিনিস্টার মদন মিত্র সুকন্যার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে চাইলে মনু তা গ্রহণ করতে দেননি সুকন্যাকে:

> মদন: বিদ্যাভবনে ওর জন্যে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। তুই আটকাসনি?
>
> মনু: সেটা তো আর একজন বেটার কান্ডিডেটকে দিপ্রাইভ করে ওকে দেওয়া হয়েছিল।[৯]

পার্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার জন্যে অনেক সময় মাস্তানবাহিনীকে সুপারি দিয়ে পালন করেন। নাটকে মনুর কথা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে, মদনের ক্ষমতায় আসার পিছনে মস্তানবাহিনীর অবদানের কথা:

> মনু: মনে আছে লাস্ট আস্যেম্বলি ইলেকশন। আমি, বলেছিলাম মানুষ আমাদের পাশে তুই এমনিই জিতবি। সামনাসামনি আমাকে সমর্থন করলি আর চার পাঁচটা বুথ এক-একটা মস্তানের দায়িত্বে ছেড়ে দিলি।[১০]

মাস্তান দিয়ে বুথ দখল করে ক্ষমতায় টিকে থাকা, জনগণকে একটা ভয়ের মধ্যে রাখা, এসবের বিরুদ্ধে নাটককার তাঁর নাটকে বিরোধিতা জানিয়েছেন। এই নাটকটি অভিনীত হবার পর ১৯৯৮ সালে 'প্রতিদিন' পত্রিকায় একটা রিপোর্ট ছাপা হয়:

> একসময় ছাত্র ও যুব রাজনীতির দল থেকেই যে দল বিপ্লবের বার্তা ছড়াত, এখন তাদের অধিকাংশ নেতাই নানান ক্ষমতার আরাম

> কেদারায়। বিপ্লব সিঁকোয় উঠেছে এবং ক্ষমতা, আরও ক্ষমতা ও শাসনের অধিকার রক্ষায় বেশি উৎসাহী।[১১]

৫

নাটককার হর ভট্টাচার্য যেমন পার্টির অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন তেমনই পার্টির কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী সৎ কমরেডের কথাও তাঁর অদ্ভূত আঁধার নাটকে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'অদ্ভুত আঁধার' নাটকে মিনিস্টার মদন মিত্রের বিপরীত প্রান্তে তিনি দাঁড় করিয়েছেন মনুকে। যে মনু সৎ, আদর্শ কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী। তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শকে ত্যাগ করেননি। যদিও পার্টির কাছে মনুর আচরণ দুর্বোধ্য ঠেকে। মদন মিত্রের কাছে এমনকি স্ত্রী সুকন্যারর কাছেও। মনু আদর্শ কমিউনিস্ট কমরেডের এক বিকল্প মডেল। স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ছেড়ে মনু চাকরিতে ঢুকলে মিনিস্টার মদন মনুকে বলেন 'স্টুডেন্টফ্রন্টেই তার ফিউচার ভালো ছিল'। মনু বলেন, তিনি ফিউচার বানানোর জন্য রাজনীতি করছেন নাকি? এখানেই মদন মিত্রের মত মুখোশধারী কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী সৎ কমরেডের পার্থক্য। মনু পাওয়ার গেইন করার জন্য, পাঁচজনকে চাকরী দেবার জন্য, শক্তি সঞ্চয় করার জন্য, ফিউচার বানানোর জন্য রাজনীতিতে ঢুকেননি। তাঁর আদর্শ সম্পর্কে নাট্যকার মনুর বয়ানে লেনিনের যে ঘটনা তুলে ধরেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ:

> প্রাভদয় একবার একটা রিপোর্টে সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে একটু জল মেশানো হয়েছিল। লেনিন সেই রিপোর্টটারকে বলেছিলেন এই রিপোর্ট সত্য নয় এটা ক'জন জানে। রিপোর্টটার বলেছিল খুব বেশি নয়, কনসার্ন ডিপার্টমেন্টের কয়েকশোজন। লেনিন বলেছিলেন, আমি একশোটা যুদ্ধে হেরে যেতে রাজি আছি কিন্তু একশোটা মানুষের বিশ্বাস হারাতে রাজি নয়। পার্টি দাঁড়িয়ে আছে মানুষের বিশ্বাসের উপর, পার্টির ওপর, লিডারশিপের ওপর, বিশ্বাসের ওপর। একজন কমরেডের ওপর আর একজন কমরেডের বিশ্বাস আছে বলেই না পার্টি এত সুশৃংখল সুসংহত।[১২]

নাটককার আদর্শ কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী একজন কমরেডের বিকল্প মডেল নাটকের মধ্যে নির্মাণ করেছেন। মনু কমরেড বিজয়ের সুসাইডের কথা শোনা মাত্রই তার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া থেকে তার খবরা-খবর নেওয়া সবটাই করেছেন। অন্যদিকে মিনিস্টার মদন মিত্র বালসয় ব্যাটবলের শো দেখতে যাবার জন্য টিকিট সংগ্রহ ও শো দেখতে যাবার কথা ভাবেন।

মনু তাঁর বাল্যস্মৃতির কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর বাবা ছিলেন সৎ, তাঁর ঠাকুরদা ব্রিটিশ আমলে জুটমিলের ব্যবসা করতেন। পায়ের মোজাতে করে টাকা আনতেন এবং গঙ্গাজল ছিটিয়ে বাক্সে টাকা তুলে রাখতেন। মনু তাঁর মাকে বলতেন, লোকে তো বলে

চুরির টাকা। মনুর মা বলতেন তার বাবাও তো হাজিরাবাবুর চাকরি করতেন, পারেননি তাঁর ঠাকুরদার মত টাকা রোজগার করতে। তাঁর মা মনুকে বলেন –

> কমিউনিস্ট হওয়া সব সময় খারাপ নয়। ওই করেও তো অনেকে দু পয়সা করছে। তোর ওপর আমার শেষ ওই ভরসাটুকু ছিল।[১৩]

মনু সৎ কমিউনিস্ট কমরেড, মুখোশধারী কমরেড তিনি ছিলেননা। বাল্য স্মৃতিচারণায় মনু তুলে ধরেছেন— একদিন পরীক্ষা দিতে গিয়ে পরীক্ষা না দিয়ে ঘুরে এলে তাঁর মা ঠাকুরদা কারণ জানতে চাইলে বলেন: **"কলেজ স্ট্রিটে ছাত্রদের মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে আমরা পরীক্ষা বয়কট করেছি"**। তাঁর ঠাকুরদা বলেন পুলিশ তো আর তোর বাপ ঠাকুরদার উপর গুলি চালায়নি। মনু বলেন, সে ছাত্র, ছাত্রের উপর গুলি চালনা মানে তার উপর গুলি চালনা করা হয়েছে। মনু তাঁর ঠাকুরদাকে মুখের উপর চোর বলেছিলেন। তাঁর ঠাকুরদা শূন্য থেকে শুরু করে চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। মনুর মতে **"ভোটে জিতলেও চোর চোরই থাকে"**। মনু একজন সৎ কমিউনিস্ট। তিনি মদনমিত্রের মত গুণ্ডা দিয়ে বুথ দখল করে ক্ষমতায় আসার জন্য রাজনীতি করেন না। তিনি সুকন্যার উত্তরে বলেন: **'রাজনীতি কেন করি? ক্রমাগত মানুষ হয়ে উঠতে চাই বোধহয়। আর কোনো আম্বিশন নাই'**। মনু রাজনীতি করেন ক্রমশ মানুষ হয়ে উঠবার জন্য।

৬

নাট্যকার হর ভট্টাচার্য মনে করেন প্রত্যেক শিল্পীর একটা নিজস্ব মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষ ও তাদের অধিকার এবং তাদের প্রত্যাশা-স্বপ্ন ইত্যাদি কোনো শাসক দল বা প্রতিষ্ঠান বা শক্তিশালী ব্যক্তির দ্বারা লঙ্ঘিত হলে শিল্পীর অন্তরাত্মা প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। কংগ্রেস সরকারের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা বাংলা ও বাংলার মানুষের বিপুল সমর্থনে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসেন। ধীরে ধীরে বামফ্রন্ট সরকারও জনগণকে ভুলে যান। জনগণ, কৃষক, শ্রমিক, সরকারের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্তরে করাপশন প্রাধান্য পায়। পার্টির নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াই, গুন্ডাবাহিনীর মদদ— এসবের যথার্থ পরিচয় 'অদ্ভুত আঁধার' নাটকে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে নির্মল ধরের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> 'অদ্ভুত আঁধার' নাটকটি রাজনৈতিক বক্তব্যে পরিস্কার।... সুবিধাভোগী নেতাদের দলে ভিড়তে না পারা মনুরা তো এই মুহূর্তে সত্যই কোনো বিপ্লবের জন্ম দিতে পারছে না। সততা, নীতি, বিবেকের ম্যানিয়ায় আক্রান্ত না হয়ে এখন শাসক দল বিধানসভায় আসন দখল রাখতে ব্যস্ত। চতুর্দিকের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সমঝোতাই এখন জায়গা নিয়েছে বিপ্লবী ভাবনার।[১৪]

তাঁর প্রতিবাদী নাটকগুলি বাংলা প্রতিবাদী নাটকের ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। তাঁর প্রতিবাদী নাটকগুলি ধারাবাহিকভাবে রচিত হতে থাকলে সেই

সময় আরো কিছু নাট্যকার প্রদিবাদী নাটক রচনা শুরু করেন। নয়ের দশকে এসে থেমে যাওয়া প্রতিবাদী নাটক আবার গতি পায় এবং ২০০৯, ২০১০ পর্যন্ত প্রতিবাদী নাটক প্রবল রূপলাভ করে । ২০১১-তে এসে প্রতিবাদের ধারা আবার থেমে যায়। যে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদী নাটক নাট্যকার ব্রাত্য বসু নয়ের দশকের পর থেকে লেখা শুরু করেন তাও ক্রমশ থেমে যায় একুশ শতকের দুয়ের দশকের শুরুর দিকে। নাট্যকার হর ভট্টাচার্যর হাত দিয়ে প্রতিবাদী নাটক রচনা থামেনি। তবে ২০১১ পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবধানে রচিত হতে থাকে তাঁর নাটক— ২০১১-এ ‘অয়দিপস’; এরপর ২০১৭-এ ‘মেদেয়ারা’, ২০২২-এ ‘চৈতন্য’, ‘ক্রেয়ন অন্তিগনে’, ২০23-এ ‘ব্যারিকেড থেকে ব্যারিকেড’। তাঁর একার পক্ষে যেন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় একটি ধারাকে টিকিয়ে রাখা। কিছুটা উৎসাহহীনতা-ই কী তাহলে নাটক রচনায় দূরুত্বের সৃষ্টি করে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ, রাজনীতির ক্ষেত্রেও বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। সমসাময়িক রাজনীতি, কেন্দ্রের গেরুয়াকরন- এসবের বিরুদ্ধে তাঁর ‘ব্যারিকেড থেকে ব্যারিকেড’(২০২৩) নাটকের সাহসী সংলাপ 'তিলকধারী সন্যাসী' নিঃসন্দেহে সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। বর্তমান সময়েও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক করাপশন, গুণ্ডাবাহিনীর বুথ দখল, পার্টির সর্ব নিয়ন্ত্রণ, সরকারের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন, জনগণের অধিকার প্রত্যাখান বেড়েছে বই কমেনি। হয়তো ভবিষ্যতে প্রতিবাদী নাটকের ধারা সংকুচিত জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে।

তথ্যসূত্র:

১। ধর, নির্মল, *সৎ রাজনীতিকে ঘিরে অদ্ভুত আঁধার,* প্রতিদিন সংবাদপত্র, শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১১
২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, বিক্ষুব্ধ বাঙলা (১৯৪৭-২০১০), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ৬
৩। ভট্টাচার্য, হর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭৯
৪। তদেব, পৃ. ৮০
৫। ধর, নির্মল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১
৬। ভট্টাচার্য, হর, ‘অদ্ভুত আঁধার’ নাটক, তিনটি পূর্নাঙ্গ নাটকের সংকলন, কলাভৃৎ পাবলিশার্স, জুন ২০১২, পৃ. ৯৪
৭। Letters to the Editor, The lost of Credibility, *The statesman,* Monday, January, 1998
৮। পালিত, দিব্যেন্দু, বিষয়ে সাহসিক, প্রযোজনা গুণেও আকর্ষক, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
৯। ভট্টাচার্য, হর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮১

১০। তদেব, পৃ. ১১৭
১১। ধর, নির্মল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১১
১২। ভট্টাচার্য, হর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৮
১৩। তদেব, পৃ. ৯৮
১৪। ধর, নির্মল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১

নিমজ্জন - এক অভিশপ্ত শহরের আখ্যান

কৌষেয়ী ব্যানার্জি
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি

বাংলাদেশের সাহিত্যিক সেলিম আল দীনের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। বোঝা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি যুদ্ধ যখন সংগঠিত হয়েছিল তখন তিনি নিতান্ত বালক।কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক তথা রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে তিনি বেড়ে ওঠেন। ১৯৭১ এর মুক্তি যুদ্ধের সময় তিনি রীতিমত গেরিলা যুদ্ধের সৈনিকের কর্তব্য পালন করেন। স্বভাবতই বাংলা ভাষা ও জাতি সত্তার প্রতি একটা গভীর চেতনা তার মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল।

তার আখ্যান রচনাগুলির বিষয় ও আঙ্গিক বিচার করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সেলিম আল দীন কেবল মাত্র দেশজ শিকড়ের সন্ধানেই আখ্যান রচনা করেন নি, চিন্তনের অভিমুখকে নিতান্ত পশ্চিমি পরিচয় থেকে উদ্ধার করে প্রাচ্যের সম্ভাবনা ও ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এখানেই তার বিশেষ কৃতিত্ব। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই উত্তর ঔপনিবেশিক মন ঔপনিবেশিক চিত্তের সঙ্গে নানান ভাবে সংঘর্ষশীল হয়ে উঠেছিল। সৃজনে দেশজ প্রতিমানের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা অনেক ক্ষেত্রেই উত্তর- ঔপনিবেশিক পর্বের শিল্প সাহত্যে একটি প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বাঙ্গালী মনন ও কল্পনা খুঁজতে চেয়েছে একটা স্বতন্ত্র আইডেন্টিটি।তবে আমাদের দেড়শ বছরের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক পর্ব বহুমাত্রিক সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে কখনই পশ্চিম কে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না নিজ ইতিহাসের তাগিদেই। উত্তর ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস স্বাদেশিক চেতনার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়।

এই প্রবন্ধে আমরা 'নিমজ্জন' রচনাটির উপন্যাসগুণ ও সম্ভাবনা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করবো। ২০04 সালের রচনা নিমজ্জন। এ এক গণহত্যার আখ্যান। পারিপার্শ্বিক যুদ্ধ, দাঙ্গা,রক্ত স্রোত, মানুষের হিংস্রতা চিত্রিত হয়েছে নিপুণ কুশলতায়। যে শহরের কাহিনি এখানে বর্ণিত হয়েছে তার কোন নাম নেই, যে দুই বন্ধুকে নিয়ে গল্প তাদের পেশাগত পরিচয় ছাড়া আর কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যাও নেই। বোঝা যায়, লেখক কোন বিশেষ স্থান বা বিশেষ চরিত্রকে তুলে ধরার জন্য লেখনী ধরেন নি। স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে এক মৃত্যুপুরীর চিত্র অঙ্কন করাই ছিল বোধহয় তার উদ্দেশ্য। বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতা সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন তিনি এই আখ্যানে।

আপাত ভাবে কাহিনি খুবি সরল ও দ্বন্দ্ববিহীন। দুই বন্ধু,বহুদিন পরে তাদের এক অদ্ভুত স্থানে দেখা হয়। দুই বন্ধুর একজন হলেন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তিনি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পদচ্যুত অধ্যাপক আর একজন হলেন বিশ্বভ্রামণিক। তাদের প্রাথমিক

আলাপ হয় কোন যুদ্ধক্ষেত্রে বিস্ফোরণের মধ্যে। তারপর একত্রিশ বছর কেটে গেছে, তাদের কোন দিন দেখা হয় নি। এতদিন পর বারোপাতার একটি চিঠি লিখে অধ্যাপক তার বন্ধুকে ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু ততদিনে তার শহর মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছে। রাস্তায় কালো মুখশধারি লোকেরা অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মেঝেতে ভেসে যাচ্ছে রক্ত স্রোত। ডাইনিং টেবিলে,মেঝেতে, বেঞ্চিতে সর্বত্র অসঙ্খ্য অগণ্য মৃতদেহ, আর তাদের মাঝেই দেখা হচ্ছে এই দুই বন্ধুর।আপাত ভাবে কাহিনির মধ্যে কোন জটিলতা নেই, কিন্তু আমরা যদি ঔপনিবেশিক চেতনা নিয়ে এই আখ্যানে নিটোল কাহিনি অনুসন্ধান করতে যাই, হতাশ হতে হবে আমাদের। কারণ কাহিনি বলাই যে উপন্যাস নয়, সমসাময়িক সময়ের বিশৃঙ্খলতা, অসহায়তা ও হতাশাকে একেবারে বাস্তব চেতনা নিয়ে অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন লেখক। বানিয়ে তোলা কোন মানুষের জীবন নয়। যে জীবনটা আমরা রোজ খবরের কাগজে খুঁজে পাই অথচ নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে চোখ বন্ধ করে ভাল থাকার অভিনয় করে চলি, তার বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়েছেন কথাকার।

এই আখ্যানের গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। উপাখ্যান সূচিত হয়েছে মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে। ‘এই মৃত্যুপুরাণ অনন্তর নিহিত হোক সম্মুখবাস্তবতায়’[১]-বোঝা যায় যে কল্পকাহিনি নয়, একেবারে বাস্তব জীবনের কথাই বর্ণিত হবে এই আখ্যানে। আগন্তুক হলে বিশ্বভ্রামণিক। তার রয়েছে সাধারণ রেডক্রস কর্মী হিসেবে যুদ্ধক্রান্ত উত্তপ্ত এক বিশ্বের এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপজুড়ে ধর্ষণ–হত্যা- এইডস বা ম্যাডক্যাউ ডিজিজ দেখার অভিজ্ঞতা। যে শহরে তিনি এসেছেন তা আর কয়েকদিনের মধ্যেই ডুবে যাবে। পৃথীবির সকল হত্যা-ধর্ষণ, আর অমানবিকতার কথামালা যেন এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিটলারের হত্যাকীর্তি পেরিয়ে ফ্রাঙ্কো, মিলেসোভিচ এমনকি একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে বুশের হত্যাকীর্তি, খেলার নামের উন্মাদনা, বহুজাতিক কোম্পানির ফ্যাশন শো- ক্যাটয়াক ও কম্পিউটারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, সমস্তটাই নিপুণ ভাবে ধরা দিয়েছে এই আখ্যানের ধমনিতে।

কাহিনির সূচনা হয়েছে এক বন্দরে ঘটে যাওয়া গণহত্যার কাহিনি দিয়ে এবং এই আশ্চর্য নিমজ্জনের সাক্ষিদের এক একজন কে এই কাহিনিটি আরো সাতজনকে বলতে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপাখ্যানের দ্বিতীয় পর্বে আশীর্বাদ উচ্চারিত হয়েছে। এতে আয়ু দীর্ঘতর হয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে। কাহিনিতে দেখা দেয় এক ভিখারি। কাঠের পা-অলা ভিখারিকে দেখে মুহূর্তের মধ্যেই তাকে সুদানিজ,চেচনিয়ান,উগান্ডাবা মোজাম্বিকের সীমান্তে পা হারানো কোন ব্যেক্তি বলে মনে হতে পারে পাঠকের। লেখক তাকে কোন স্থানের পরিচয়ে আবদ্ধ করে না,আর এর মাধ্যমেই পাঠক খুব সহজেই কাহিনির বিস্তার ও বিন্যাসের পরিচয় পান। দুঃখের বিষয় হল মানুষ আজ জানে যে ভিখারির এই দশা শুধুমাত্র মানুষেরই জন্য কারণ মানুষই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী।

চিঠিতে বন্ধুকে শহরের প্রবেশ পথ সম্পর্কে সচেতন করেছেন অধ্যাপক বন্ধু। ‘ তুমি এ শহরের বিশাল প্রবেশপথ দিয়া আসিও না। তুমি জল পথেও আসিও না।’[২]স্টেশনে গাড়ি থামতেই নিঝুম অন্ধকারের মধ্যে শররে প্রবেশ। এ জগত যেন জ্ঞান-বিজ্ঞান- শিল্প এ সব কিছু থেকে অনেক দূর। আলোকের সন্ধানে তাকে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত পরিচিত একটি গান ‘ আলো আমার আলো অগ আলয় ভুবন ভরা’[৩] গানটি গাইতে শুনি। বিশ্লেষনী পাঠক হয়তো আগন্তুক কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাবতে পারের কিন্তু পরবর্তী সময়ের ঘটনা প্রবাহ আমাদের ভুল ভাঙ্গিয়ে দেয়। যখন স্টেশনে নামে তখনই নিমজ্জনে এক একটি পর্বে তার সামনে ঘটতে থাকে অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত সব ঘটনা। যেমন – ‘ঝুলন্ত কুলি, ওয়েটিং রুম পারগেটরি ও অদ্ভুত দর্শন ব্যেক্তি, নয় কিলমিটার দূরে শহরের আভা, ঘোড়ার গাড়িতে গেস্টহাউজ যাত্রা,’[৩] গরোস্থানের ভিতরদিয়ে ঘূর্নীপথ, গেস্টহাউজে আগমন, ‘ধাধালো চাবি,শোবার ঘরটি থর থর   করে কেঁপে ওঠে গেস্টহাউজ,বৃদ্ধের জলে ঝাঁপ দেওয়া’[৪] ও ঘূর্নিযজ্ঞে স্টিমার ডুবল। এই সকল পর্বের নিরালম্ব বর্ণনার সঙ্গে প্রায় ঢুকে পড়েছে আগন্তুকের অতীত ও বর্তমান সময়ের অভিজ্ঞাতার সমন্বয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়- ‘অতীতের একদিন বেলাডুবি গায়ের নানান বাড়িতে পুকুর ঘাটে ঘোলা জলে তার পকেট থেকে একটি আধুলি পরে গিয়েছিল।আধুলিটা সে আর খুজে পায় নাই কোনদিন।’[৫] এবং বর্তমান কি ভয়ঙ্কর। বিল্ডিংটা তিনতলা। নদীর দিক থেকে সেটা এখন একতলা। এই বর্ণনাটাও অত্যন্ত জটিল। সামনে থেকে যা তিনতলা তা নদীর দিক থেকে একতলা- এটাও কি সম্ভব বাস্তবে। আসলে লেখক আমাদের বর্তমান সময়ের রীরংসাময় ইতিহাসের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এক তন্দ্রাময় পৃথীবিতে নিয়ে চলেছেন। পাঠক যেন নিজের অজান্তেই সম্পূর্ণ এক অন্য জগতে প্রবেশ করছে।

আমন্ত্রণকারী রুগ্ন বন্ধুর শহরের রাস্তা থেকে রেস্তোরা যাত্রায় আগন্তুক এবার রেস্তোরা ভ্রমে ঢুকে পরেছিল এক সেক্স ডল শপে। এরপর ফুটপাত ধরে হাটতে সে পথে দেখে শববাহী মিনিট্রাক। আর শবের উপর তিনটি কি চারটি মৃত কাক। ইতিহাস,পুরাণ, এমনকি মার্ক্সিয় পুস্তকে এ দৃশ্যের কোন ব্যাখ্যা নেই। দৃশ্য ও ব্যাখ্যা বিষয়ে ভাবতে ভাবতে আগন্তুক আধা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পরে। এরপর আগন্তুক ভুল বাড়িতে বন্ধুর সন্ধান করে চলে, বামের পথ দিয়ে ডানের পথে চলে সে, এখানে যেন আমরা খুব সুপ্তভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শের সন্ধান পাই। মানুষ যে বার বার নিজ প্রয়োজনে রাজনৈতিক পরিচয় ও পথের দিশা বদলাতে থাকে তাই যেন লেখক নির্দেশ করেছেন এখানে।এ শহররের সমস্ত হত্যা- কবর-জানাজা-শোক একটি প্রাচীন ভাঙ্গাচোরা বাড়ির সামনে এসে শেষ হয়। আগন্তুক বন্ধুর বাড়ি খুঁজে পায়। কিন্তু যখন সে বাড়িতে ঢুকল তখন তার রুগ্ন মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুটি ঘুমন্ত। আর তার এই ঘুমের ফাকে আগন্তুকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেয় অবসরপ্রাপ্ত সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি ঘুমন্ত বন্ধুটির সহকর্মী।বন্ধুটিকে আগন্তুক ভাবে- ‘ যুদ্ধক্ষেত্রে সেই শেষবার দেখা। দুজন দুই

অঞ্চল থেকে পালিয়ে এসে সীমান্তের ভিতর একটা ঝোপে লুকিয়ে ছিল। দুজনের কাছেই ছিল দুটো গ্রেনেড। সামনে থেকে অকস্মাত একজন সৈন্য চিৎকার করে-'হ্যান্ডস আপ'। এই বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ হাত তোলার ভঙ্গীতে গ্রেনাড ছুঁড়ে দেয়। সৈন্যটির মুহূর্তে গ্রেনেডের বিস্ফোরণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।'[৬] তারপর দুই বন্ধু দুইদিকে চলে গিয়েছিল।প্রাণ ফিরে পেয়ে প্রাণে বেঁচে থাকবার কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশের অবকাশ ছিলনা। সেই কোন দূর সেপ্টেম্বর। দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর সেই বন্ধু মৃত্যু পথযাত্ররার আগেই বিদায় সম্ভাষণ নিতে এসেছে। কিন্তু সে ঘুমন্ত। নিদ্রিত বন্ধুর সামনে তাকে অনেক্ষণ বসে থাকতে হয়। তখন তার ভাবনায় ভর করে- পেরুর লীমা বাউল ও ডিয়েগো রিভেয়ার মেক্সিকো সিটি আজটেক ফিন ড্যান্স, রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ চিত্র এবং পারিমা হ্রদের তীরভূমিতে সোনার ভালুকারাশি ও তুতা –এই সব ভাবনার মধ্যে আগন্তুক দুপুরের খাবারের জন্যে যুবকের ডাক শুনে অর্ধনিদ্রা থেকে জেগে শহরের রৌদ্রকে রক্তভ্রম করে। যুবকটি শান্ত চোখে তাকানোর মধ্যে আগন্তুকের ভ্রম ভাঙ্গে। কিন্তু গতরাতে দূরের নদীতে স্টীমার থেকে ভেসে আসা চিৎকার এবং স্টীমার হত্যায় শিকার তেষট্টিজন নারী পুরুষের মৃত দেহ গেস্টহাউজ কম্পাউন্ডারে কবর দেবার স্মৃতি,আর কবর থেকে বেচে ওঠা সেই পেঠ ছেড়া মেয়েটির কথা থেকে যুবকের দেখান দৈনিক প্রকাশিত সংবাদের বিস্তর ব্যবধান আগন্তুককে নতুন করে তার শহর প্রবেশের দুর্বিসহ অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

কাহিনি আখ্যান এভাবেই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। বোঝা যায় গতানুগতিক উপন্যাসের কাহিনি, প্লট বা দ্বন্দ্ব এখানে নেই, কিন্তু এই যে কাহিনি পারম্পর্যের অনিয়ম, যা আমাদের প্রাত্যহিক উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে অনেকটাই ভিন্ন, এটাই এই আখ্যানের অভিনবত্ব ও স্বাতন্ত্র্য।

খাওয়া শেষে আগন্তুক ও যুবকটি দোতলায় উঠে যেতেই নীচ তলা থেকে হাঁকডাক দিতে সরাসরি উপরে উঠে আসেন সাহিত্যের অধ্যাপক- ' দেখুন কাকে নিয়ে এসেছি!'[৭] তার সঙ্গে এসেছে আট কি নয় বছরের সাদা ফ্রকে একটি ছোটো মেয়ে। সে প্রজাপতির মত এবং সে সাহিত্যের অধ্যাপকের কন্যা। তার পিছনে প্রৌঢ়প্রায় কবি। তার ডান হাতটি কাটা। যুবকটি আগন্তুককে জানিয়ে দেয়– 'পার্লামেন্ট ভবনে হত্যাকান্ডের পর তার একটি শোক গাঁথা প্রকাশিত হলে প্রকাশক ও তার হাত কেটে ফেলা হয়।'[৮] কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। এই অত্যাচারের জীবনকেই তো আমরা নীরবে মেনে নিয়েছি।

দীর্ঘ একত্রিশ বছর পর দুই বন্ধু এমন সাক্ষাৎ ও মিলনের পর একটা ভয় ছিল। নিমজ্জন-এর আখ্যান বুঝি তাদের দুই বন্ধুর কথোপকথন বা স্মৃতি রোমন্থনের মাঝে স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয় নি, নিমজ্জন- এর আখ্যানের সঙ্গে এরপর সমান্তরাল ভাবে যুক্ত হয়ে যায় সাহিত্যের অধ্যাপক এবং তার প্রজাপতি স্বরূপ কন্যা ও স্ত্রী, লেখক- সঙ্ঘ আর শহরটির বিচিত্র ধরনের কর্মকান্ড।

পরবর্তী পর্বে তাদের আলোচনায় উঠে আসে পেরুভিয়ান সিপান ঈশ্বর রিচ্যুয়ালের ছদ্মবেশে গণহত্যার ইতিহাস। আগন্তুকের সেই নির্মম সাব্রানিতসার গণহত্যা আর ধর্ষণবর্ণনার ঠিক পর পরই বর্ণিত হয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকের স্ত্রী এবং জনৈক যুবকের মৃত্যু কথা। এখানেও নিরালম্ব বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে আগন্তুকের বন্ধু যখন রিমান্ডে ছিল তখন তার স্ত্রীর সঙ্গে গনতন্ত্রীদের যোগাযোগ ঘটে। তারা ফিল্ড মার্শালের অতিলৌকিক রাষ্ট্র তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি লিফলেট প্রকাশ করে।

কিন্তু এই নিশ্চিত ধ্বংসের কোন পরিত্রাণের পথ অধ্যাপকের তত্ত্বে খুঁজে পাওয়া যায়না, চলে দুই বন্ধুর দীর্ঘ দীর্ঘ তাত্ত্বিক আলোচনা। কিন্তু আখ্যানের সমাপ্তি অংশে এক অতিলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়। নদীর তরঙ্গের মাঝে এক মানব শিশুকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসতে দেখা যায়, বোঝা যায় যে এই শহরটি হয়তো আবার নদীর বুকে জেগে উঠবে, হত্যাকারীরা ধ্বংস হবে সচেতন মানব সভ্যতার হাতে।

পরিশেষে বলা যায় নিমজ্জন এক অসম্ভভব সম্ভাবনাময় উপাখ্যান যা পাঠকের চিত্তে নানা রকম চিন্তার উদ্রেক করে। মানুষ নিজে কীভাবে নিজেকেই হত্যা করার পথে এগিয়ে চলেছে, তাই যেন নির্দেশিত হয়েছে এই আখ্যানে। একবিংশ শতকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ভয়ঙ্কর রূপ উন্মোচিত হয়েছে। শোষণ, আক্রমণ, বর্ণবাদ, ধর্মান্ধোতার ডেকে এনেছে গণহত্যা ও অমানবিকতা। তবে আখ্যানের শেষে দেখা গেছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরের মাঝখান থেকে উঠে আসছে এক নিস্পাপ শিশু হয়তোবা নতুন সূচনার ইঙ্গিত বহন করে।

এই উপাখ্যানের আর একটি নতুন বিষয় হল এই উপাখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা শহরের কোন নাম উল্লেখ করা হয়নি। তার বদলে সজ্ঘটন স্থান নামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে- ‘শহর’, বা ‘শহরটি’,এবং চরিত্রদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ‘আগন্তুক’, ‘রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক’, ‘সাহিত্যের অধ্যাপক’, ‘কবি’, ‘বালিকা’ ইত্যাদি। এই যে নির্বিশেষ পরিচয়, এথেকেই বোঝা যায় তিনি কোন নির্দিষ্ট চরিত্র বা স্থানের আখ্যান রচনা করতে চান নি।

এ রচনায় উপাখ্যানকার সেলিম আল দীন বিশ্বসংস্কৃতির নবতর ব্যাখ্যায় মগ্ন হয়েছেন। মানব সভ্যতার ক্রমমুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছেন লেখক নিজস্ব স্বতন্ত্র শৈলীতে।

সূত্রনির্দেশ:

১। সেলিম আল দীন, নিমজ্জন, থিয়েটার, ৩৭তম বর্ষ,মে, ২০০৮, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা), পৃ ৯

২। সেলিম আল দীন, নিমজ্জন, থিয়েটার, ৩৭তম বর্ষ,মে, ২০০৮, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা), পৃ. ১১

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
৮। অরুণ সেন,সেলিম আল দীনঃ নিমজ্জমান এক শহরের আখ্যান, কালি ও কলম, কলকাতা ,প্রথম বর্ষ, জুন,২০০৫,পৃ. ৯৫

বীরভূম জেলায় সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রভাব

নির্মল হাঁসদা
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদিবাসীদের দ্বারা সংগঠিত হওয়া বিদ্রোহ গুলির মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশদের শাসন শোষণ এবং জমিদার ও দিকু মহাজনদের অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাঁওতালরা যে বিদ্রোহের ঘোষণা করেছিল তার প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছিল বীরভূম জেলায়। এই বিদ্রোহের ভয়াবহ ক্রিয়াকলাপের প্রধান কেন্দ্র ছিল বীরভূম। এই সময় বীরভূম জেলার অবস্থা ছিল শোচনীয়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ৩০ শে জুন সিধু কানুর নেতৃত্বে এক বিশাল ঐতিহাসিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা হুল বা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এখান থেকেই দলে দলে বিদ্রোহীরা বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হয় তারই একটি দল এগিয়ে এসেছিল বীরভূমের দিকে। আর কেনই বা তারা বীরভূমের দিকে এল এবং বীরভূম জেলাকে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত করল? বিদ্রোহী সাঁওতালরা বীরভূমের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে ইংরেজ শাসনকে কীভাবে শেষ করে দিয়েছিল? এই বিদ্রোহকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্রিটিশ সরকারকে কেনই বা এত বেগ পেতে হয়েছিল? সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাসে কীভাবে বীরভূম জেলা স্মরণীয় হয়ে ওঠে এবং কীভাবে এই বিদ্রোহ বীরভূম জেলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে তোলে, তার একটি গবেষণামূলক আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।
সূচক শব্দ : সাঁওতাল, দামিন- ই -কোহ, দিকু, হুল, আদিবাসী, দাদন।

মূল আলোচনা :
উনিশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসে যে সমস্ত আদিবাসী বিদ্রোহগুলি সংগঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল অন্যতম। এই বিদ্রোহ একদিকে যেমন ছিল কৃষক বিদ্রোহ তেমনি ছিল জাতিসত্তার আন্দোলনও। ভারতে ইংরেজরা আগমনের অনেক আগে থেকেই আদিবাসীরা সমগ্র ছোটনাগপুর এলাকা জুড়ে জীবনযাপন করতো। পরবর্তীকালে বাংলার সীমান্ত বীরভূম ও ভাগলপুরে বিভিন্ন এলাকায় তারা ছড়িয়ে পড়তে থাকে জীবিকার সন্ধানে। গ্রাম পত্তন ও জমি-জমাকে কেন্দ্র করে শুরুর দিকে পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে থাকলে সাঁওতালরা শেষ পর্যন্ত 'দামিন-ই কোহ' এলাকাতেই তাদের বসবাসের স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে ঠিক করে। এই এলাকায় ঝোপ জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে অনাবাদি পতিত জমিকে চাষের জন্য যোগ্য করে তোলে। এখানে গ্রাম প্রধানের মাধ্যমে ছয় ভাগের একভাগ রাজস্ব দিয়ে মুঘল আমল পর্যন্ত সাঁওতালরা স্বাধীনভাবে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপন করত।[১] কিন্তু ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে

পলাশীর যুদ্ধের যুদ্ধবাজ গণহত্যাকারী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার বাহিনীকে পরাজিত করার পর ভারতীয় উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে পাকাপাকিভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসে এবং প্রায় ২০০ বছর ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণ চালায়। উপনিবেশ দখল করার পর চতুর ও ফন্দিবাজ ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তাদের সুবিধাবাদী স্বার্থ অনুযায়ী জমিদারদের সঙ্গে সন্ধি করেছে। কারণ গুটিকতক ব্যবসায়ী মিলে এত বড় ভূখণ্ড নিজেদের পক্ষে আয়ত্তে আনা পুরোপুরিভাবে সম্ভবপর হবে না এ কথা তারা ভালভাবে জানতো। তাই তারা জমিদারদের মাধ্যমেই তাদের শাসন শোষণের যাঁতাকল চালিয়ে যেতে লাগলো। এরকম পরিস্থিতিতে জমিদারদের স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হলো এবং তাদের উপর করের বোঝা যখনই বাড়তে লাগলো তখনই তারা সেটা চাপিয়ে দেয় প্রজাদের ঘাড়ে। গরিব অসহায় প্রজারা তখন যাবে কোথায়? বাধ্য হয়ে তারা ছুটে গেল সুদখোর মহজনদের কাছে। নিরক্ষর প্রজারা হিসেব নিকেশ জানতো না। ফলত দিকু তথা মুনাফালোভী মহাজনদের কাছ থেকে দাদন বা অগ্রিম হিসেবে এবং উচ্চ সুদের বিনিময়ে টাকা ও শস্য ইত্যাদি ধার নিত।[২] এর ফল হলো মারাত্মক। বাড়ির ঘটি বাটি, গয়নাগাটি, গোরু, ছাগল সবকিছু বিক্রি করেও ওই পরিমাণ ঋণ শোধ করা সম্ভবপর হতো না শেষ পর্যন্ত পুরো পরিবারটাই বিক্রি হয়ে যেত সুদখোর মহাজন দের কাছে। তাই বলা যেতে পারে দাস ব্যবস্থার যুগের মত মানুষ কেনাবেচাটাও অস্বাভাবিক ছিল না। জমিদার মহাজনদের পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ীরাও তাদেরকে নানাভাবে ঠকাতো। ব্যবসায়ীরা যখন সাঁওতালদের কাছ থেকে কোন জিনিস কিনত তখন বড় ধরনের বাটখারা ব্যবহার করত, যাকে বলা হতো কেনারাম (স্বাভাবিক মাপের থেকে বেশি হত)। আর সাঁওতালদের কাছে যখন কোন জিনিস বিক্রি করতো তখন ব্যবসায়ীরা ছোট বাটখারা ব্যবহার করত যাকে বলা হতো বেচারাম (স্বাভাবিক মাপের তুলনায় কম থাকতো)। তাছাড়া সাঁওতালরা বিশ-এর বেশি হিসেব করতে জানতো না। তাই হিসেবেও জমিদারেরা তাদেরকে নানা ভাবে ঠকাতো। ইংরেজ জমিদার ও মহাজনদের পাশাপাশি তাদের অধস্তন কর্মচারী অর্থাৎ নায়েব, গোমস্তা, থানার দারোগা থেকে শুরু করে রেল কর্মচারীরাও আদিবাসীদের ওপরে অত্যাচার করত। অনেক ক্ষেত্রে রেল কর্মচারীরাও সাঁওতালদের বাড়ি থেকে হাঁস, মুরগি, ছাগল বিনা পয়সায় নিয়ে নিত। এমনকি সাঁওতাল নারীদের প্রতিও তাদের কুনজর ছিল। শুধু তাই নয়, ধনী ব্যক্তিরাও সাঁওতালদের জমিতে গরু ছাগল মহিষ ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে তাদের কষ্ট করে ফলানো ফসল নষ্ট করাতো। এভাবে দেখা যায় যে সমগ্র ‘দামিন’ এলাকায় সাঁওতালদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন ছিল চরমভাবে বিপর্যস্ত।[৩] এরকম একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের স্বাধীনচেতা সাঁওতালরা অত্যাচারী জমিদার ও অসাধু ব্যবসায়ীদের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য সিধু ও কানুর নেতৃত্বে জড়ো হলেন ভগনাডিহির ময়দানে। প্রায় ২৫-৩০ হাজার সাঁওতাল জনজাতির সমাবেশ থেকে সিদ্ধান্ত হল জমিদার ও মহাজনদের এই

অত্যাচারের বিবরণ ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড ডালহৌসিকে জানানো হবে। ব্রিটিশ শাসন, শোষণ এবং জমিদার ও মহাজনদের অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ণের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য সাঁওতালরা যে বিদ্রোহের ঘোষণা করেছিল, তার প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছিল বাংলার এই বীরভূম জেলায়।[৪] দীর্ঘদিনের শাসন-শোষণ, অন্যায়, অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও অপমানের ফলে সাঁওতালরা যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল, তার প্রতিফলন ঘটেছিল বীরভূম জেলায়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের ভয়াবহ ক্রিয়াকলাপের প্রধান কেন্দ্র ছিল বীরভূম।[৫] এই সংগ্রামে সাঁওতালরা নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় বীরভূম জেলার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। বীরভূমে বিদ্রোহীরা গ্রামের পর গ্রাম দখল করে তাদের প্রধান ঘাঁটি গড়ে তোলে এবং বিদ্রোহের রণকৌশল তারা এখান থেকেই পরিচালনা করতে থাকে। আক্রমণের ঝাঁজ এখান থেকেই দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা নলহাটি, রামপুরহাট, নাগোর, সিউড়ী, লাঙ্গুলিয়া, গুর্জোরি প্রভৃতি জায়গা থেকে ইংরেজদের অপশাসনকে প্রায় নির্মূল করে দিয়েছিল। এই সময় জমিদার, মহাজন, নীলকর সাহেব ও কর্মচারীরা প্রাণের ভয়ে সবকিছু ছেড়ে বীরভূম থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়।[৬] সাঁওতাল বিদ্রোহের তীব্রতা দেখে ব্রিটিশ সরকার রীতিমত ভয় পায়। এবং এই বিদ্রোহকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্রিটিশ সরকার তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

এখন প্রশ্ন হল, বিদ্রোহী সাঁওতালরা কেন বীরভূম আক্রমণ করেছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে ১৮৫৫ সালে ৩০শে জুন ভগনাডিহির মাঠে এক বিশাল সমাবেশের মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা হুল বা বিদ্রোহের ঘোষণা করেছিল এবং এখান থেকে দলে দলে বিদ্রোহীরা বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তারই একটি দল এগিয়ে এসেছিল বীরভূমের দিকে। জেলার বাইরে থেকে বিদ্রোহের আগুন এসে পড়ল এই বীরভূমে। আর এই আগুনের ছোঁয়ায় এখানকার আদিবাসীরাও নিজেদেরকে প্রজ্জ্বলিত করল। সেই আগুনের দাবানল মুহূর্তের মধ্যে সারা বীরভূম এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। কারণ এই বীরভূম ছিল সাঁওতালদের একটি প্রধান অঞ্চল, এই অঞ্চলে মহাজনদের হাতে সাঁওতালদের নিপীড়িত হতে হত। তাই আক্রমণকারীদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল এখানকার জমিদার, মহাজনরা। এছাড়াও 'দামিন-ই-কোহ' তে আগত মহাজনদের মধ্যে বীরভূমের মহাজনদের সুদের হার ছিল সবথেকে বেশি, প্রায় ৫০ শতাংশ। এবং এই অঞ্চলেই সাঁওতালদের প্রধান শত্রু মহাজন, ব্যবসায়ী ও ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অবস্থান ছিল।[৭] ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৬৫ -তে যখন ইংরেজরা জঙ্গল এলাকায় শাসন নিজেদের কর্তৃত্বে আনতে চাইল তখন বীরভূমকে তারা প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে। বীরভূম থেকেই তারা এই অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করত। এছাড়াও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রেলের ঠিকাদার ও কর্মচারীদের অত্যচার। বীরভূমের রামপুরহাটে তখন রেলপথ স্থাপনের কাজ চলছিল। সেখানে সাঁওতালরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করলেও সঠিক মজুরি পেত না। রেলপথ

নির্মাণে নিযুক্ত সাহেবরাও সাঁওতালদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে জোরপূর্বক বিনামূল্যে মুরগি ছাগল নিয়ে আসত। তাতে সাঁওতালরা প্রতিবাদ করলে তাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়ত বই কমত না। এমনকি দুজন সাঁওতাল স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার ও একজনকে হত্যার নিদর্শনও পাওয়া যায়।[৮] এইভাবে সাঁওতাল রমণীদের উপর অত্যাচারের কথা শুনে বীরভূমে সাঁওতালদের মনে বিক্ষোভের দানা পুঞ্জীভূত হতে থাকে, তারপর যখন ভগনাডিহির বিদ্রোহের ধারা এসে যোগ দেয় তখন এই ক্ষোভ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। কারণ তাদের কাছে প্রাণের চেয়ে সম্মানই ছিল সবথেকে বড় কথা। ৩০শে জুন ভগনাডিহির মাঠে ঐতিহাসিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে হুল বা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিদ্রোহী সাঁওতালরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে করতে বীরভূমের অভিমুখে যাত্রা করে।[৯] তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল বীরভূমের সিউড়ী আক্রমণ এবং পরবর্তী লক্ষ্য ছিল কলকাতা আক্রমণ। সাঁওতালরা সিউড়ীর নিকট ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে সমবেত হয়। সেখান থেকে সাঁওতাল বীর সিরু মাঝির নেতৃত্বে এক বিশাল বিদ্রোহী দল বীরভূমের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে প্রবল বেগে বীরভূমের রাজধানী সিউড়ী আক্রমণ করে নিজেদের করায়ত্ত করে। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা বীরভূম জেলার প্রায় অর্ধেক অঞ্চলে ইংরেজ শাসনকে শেষ করতে সক্ষম হয়। এই জেলার নলহাটি, রামপুরহাট, নাগোর, সিউড়ী, লাঙ্গুলিয়া, গুর্জোরি ও অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহীদের আধিপত্য অনেকদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[১০] এই বিদ্রোহী সাঁওতালদের সামনে উচ্চবর্গের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। দেওঘর থেকে সিউড়ীর ডাক লুট হয়ে যাওয়ায় ডাকব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। সাঁওতালরা একের পর এক গ্রামকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। তারা প্রায় ৩০ টি গ্রামকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।[১১]

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রবাহ বাংলার বীরভূমে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। বীরভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ছিল ১২-১৫ হাজার। রামা মাঝি ও সুন্দর মাঝির নেতৃত্বে তিন হাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল বীরভূম জেলার কয়েকটি থানা ও গ্রাম অধিকার করেছিলন।[১২] বীরভূমের সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নেতা সুলিয়া ঠাকুরের নেতৃত্বে দুঃসাহসিক রাজনগর অভিযান ঘটেছিল। এবং সফলভাবে তারা রাজনগর আক্রমণ করে রাজনগরকে নিজেদের দখলে নিয়ে আসে।[১৩] বিদ্রোহীরা চন্দ্রপুর গ্রামের অত্যাচারী মহাজন রামধন মণ্ডল ও তার পুত্রকে ধর্মরাজ ঠাকুরের খুটোতে বলি দেয়। এই বিদ্রোহের অভিঘাতে যেমন জমিদার ও মহাজনদের প্রাণ যায় তেমনি কিছু নিরীহ মানুষের জীবনও অকালে চলে যায় যা বিদ্রোহীরা কখনো চায়নি। এই অঞ্চলে তখন ইংরেজ সাহেবদের নীল, রেশম ইত্যাদির অনেকগুলি ফ্যাক্টরী বা কুটী ছিল, এই কুটীই হল অত্যাচারী ইংরেজদের ধ্বজা। এখান থেকেই নিরীহ কৃষকদের তারা জোরপূর্বক নীলচাষ করতে বাধ্য করত। বিদ্রোদের লেলিহান শিখা যখন সমগ্র এলাকাতে ছড়িয়ে পরতে থাকে তখন সাহেবরা নৌকার সাহায্যে পালিয়ে কোনরকমে

তাদের জীবন রক্ষা করে। জমিদাররা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে জলের মধ্যে আশ্রয় নিলেও শেষ রক্ষা হয় না, বিদ্রোহীরা তাদের সারা শরীরে তীরবিদ্ধ করে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য করে।[১৪] এছাড়াও নারানপুরের কুখ্যাত জমিদারকে বিদ্রোহী সাঁওতালরা খণ্ড খণ্ড করে কেটে হত্যা করে বরাকর নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, জমিদার ও মহাজনদের প্রতি সাঁওতালদের ক্ষোভ এতটাই ছিল যে, তারা নির্মমভাবে হত্যা করতেও পিছপা হয়নি। এইভাবে বিদ্রোহীরা তাদের এতদিনের বঞ্চনা, লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিয়ে নিজেদের স্বাধীন চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল।[১৫]

বীরভূম জেলার রাজনগর থেকে লাঙ্গলহাট্টা, নানুর থেকে বোলপুর, লাভপুর থানা থেকে নলহাটি, রামপুরহাট সর্বত্র সংগ্রামের আগুন প্রবাহিত হয়েছিল।[১৬] ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ২০ শে জুলাই -এর মধ্যেই বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তালডাঙ্গা থেকে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উভয় পাশে ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে সাঁইথিয়া পর্যন্ত বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল।[১৭] সাঁওতাল বিদ্রোহীরা বীরভূম জেলার বাঁশকুলি গ্রাম লুট করে বহু মহাজনকে হত্যা করে, যার মধ্যে পিতাম্বর মণ্ডল নামে এক কুখ্যাত মহাজনও ছিল। বিদ্রোহীরা সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছিল। কেউ তাদের বাধা দিতে পারেনি।[১৮] ২০শে জুলাই বিদ্রোহীরা মিথিজানপুর ও নারানপুর এই দুটি গ্রাম লুট করে। ২১শে জুলাই বাঙালী মহাজন ও ধনী ব্যক্তিদের রক্ষার্থে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য অভিযানে নামে। কাতমা নামক স্থানে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে পুলিশ বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। ২৩শে জুলাই বিদ্রোহীরা বীরভূমের বিখ্যাত ব্যবসা বানিজ্যের বাজার গণপুর ধ্বংস করে।[১৯] বিদ্রোহীরা তারপর সিউড়ীর ১৫ মাইল পশ্চিমে নাগোর লুট করে। লেফটেন্যান্ড তৌলমেইন একটি সেনাবাহিনী নিয়ে খয়রাশোলের কাছে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে কিন্তু বিদ্রোহীদের গেরিলা যুদ্ধের কাছে সেনাবাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং স্বয়ং সেনাপতি তৌলমেইন ও বহু সৈন্য নিহত হয়। এইভাবে দেখা যায় যে বিদ্রোহী সাঁওতালরা চরম দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে শক্তিশালী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছিল এবং একইরকম ভাবে বিদ্রোহীরা পুরো জুলাই মাস জুড়ে বীরভূমে অত্যাচারীর খড়্গ নিশান ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছিল।[২০] এই বিদ্রোহে সাঁওতাল ছাড়াও সমাজের নিম্নস্তরের মানুষরা যেমন কামার, কুমোর, তেলি, তাঁতি প্রভৃতিরা দলে দলে যোগদান করেছিল। বীরভূমের কালেক্টরের রিপোর্ট থেকে জানা যায় মহম্মদ বাজারের গরীব বাঙালীরা বিদ্রোহীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রিক দিয়ে সাহায্য করেছিল।[২১] অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, এই বিদ্রোহ কেবলমাত্র সাঁওতালদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছিল পুরো নিপীড়িত, খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের সংগ্রাম।

এইভাবে দেখা যায় বীরভূম জেলার অধিকাংশ স্থানে বিদ্রোহীদের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই অঞ্চলে বিদ্রোহীদের আধিপত্য দীর্ঘ কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে।

শহরের মানুষদের মধ্যে সাঁওতাল আক্রমণের উদ্বেগ ও ভীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সিউড়ীর বীরভূম জিলা- স্কুল কয়েক মাসের জন্য বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।[২২] কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার সামরিক আইন জারি করে সমগ্র বীরভূম জেলায়। এরপর থেকে দেখা যায় যে ইংরেজ সেনাবাহিনী বীরভূমসহ 'দামিন-ই-কোহ'তে সাঁওতালদের উপর চরম অত্যাচার, ধ্বংসলীলা ও হত্যাকাণ্ড চালায়। হাতিদের উন্মত্ত করে সাঁওতালদের বাড়িঘর ভাঙা হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহের অধিকাংশ সময়কাল জুড়ে বীরভূম জেলার কালেক্টর ছিলেন আর.আই.রিচার্ডসন। সাঁওতাল বিদ্রোহে দমনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। তার নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনীর আক্রমণে বিদ্রোহীরা দিশেহারা হয়ে বীরভূম ত্যাগ করতে থাকে। লাঙ্গুলিয়া থানায় ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের লড়াইয়ে বহু সাঁওতাল নিহত হয়েছিল। এরপর ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে লাওবেড়িয়াতে যে যুদ্ধ হয়েছিল সেখানে বহু সাঁওতাল বিদ্রোহী সহ বহু ইংরেজ সৈন্য মারা গিয়েছিল। ১৮৫৫ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর বীরভূমের মহম্মদবাজারে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে ধরা পড়েছিল স্ত্রী, দুই কণ্যাসহ ধুলিয়া মাঝি। এক মাস পর ১৫ই অক্টোবর ১৮৫৫ সালে ধুনিয়া মাঝিসহ তাঁর পরিবারকে বীরভূমের সেশন কোর্ট শাস্তি দেয়। এই ভাবে দেখা যায় যে একটি বিদ্রোহী পরিবার বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করায় কিভাবে শেষ হতে হয়। ৯ই নভেম্বর ১৮৫৫ সালে বীরভূম জেলার দায়রা আদালতে ২০ জন বিদ্রোহীকে দণ্ডিত করা হয় এবং দেখা যায় যে এরা সকলেই বীরভূম জেলার নলহাটি থানার বাসিন্দা ছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় যে, বীরভূমের সিউড়ী জেলখানা বিদ্রোহীদের বন্দিতে ভরে গিয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহে যেসব বিদ্রোহী ধরা পড়েছিল তাদের পরিণতির দুঃখে দলে দলে সাঁওতাল মহিলারা কোর্ট কাছারিতে আসতে থাকে। এছাড়াও বীরভূমের সিউড়ীর জেলে শিশুসন্তান সহ বহু সাঁওতাল মহিলাকে আটক করা হয়েছিল।[২৩] এর থেকে বোঝা যায় যে সাঁওতাল মহিলারাও এই বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। তবে একথাও ঠিক যে বিদ্রোহ করার অভিযোগে হাজার হাজার নিরপরাধ সাঁওতালকে হত্যা করা হয়েছিল। বিদ্রোহ দমনের নামে ইংরেজ সরকার সিউড়ীর ময়দানে শত শত বিদ্রোহীকে ফাঁসি দিয়েছিল। ইংরেজ শাসকের এই অত্যাচারী ভূমিকা বিদ্রোহীদের থেকে শতগুণে বীভৎস ছিল। তাই আধুনিক অস্ত্রবিহীন সাঁওতালেরা এই বিদ্রোহে পরাজিত হতে বাধ্য হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাসে এইভাবে বাংলার বীরভূম জেলা স্মরণীয় হয়ে থাকল এবং এর সাথে সাথে এই বিদ্রোহ বীরভূম জেলার ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করে তুলল। সাঁওতাল বিদ্রোহে বীরভূম জেলার পরিণতি চরম দুর্দশাগ্রস্ত হলেও অত্যাচারী জমিদার, মহাজন ও ইংরেজরা বুঝে গিয়েছিল যে গরীব সাঁওতালদের আর দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এবং ইংরেজকেও ভূমি আইন নিয়ে নতুন করে ভাবতে হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে ৩০শে জুন সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা স্মরণ করে বীরভূম জেলার সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে মহম্মদবাজার থানা ও রামপুরহাট থানার পশ্চিমাংশে সাঁওতাল

বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উৎযাপন করা হয়। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮০ সালের ৩০শে জুন সাঁওতাল বিদ্রোহের একশত পঁচিশ বছর পালন করে এই বীরভূম জেলায়। বীরভূমের গণপুরে সিধু কানহু বংশধরদের সম্মানিত করা হয়। সিউড়ীতে সিধু কানহু আদিবাসী চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও এখানে সাঁওতাল বিদ্রোহে ব্যবহৃত অস্ত্রসস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রীও সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিবছর ৩০শে জুন এই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে পদযাত্রা, বীর সাঁওতালদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। যাঁদের জন্য আদিবাসীরা স্বাধীনতার সঙ্গে বাঁচতে শিখেছে।

তথ্যসুত্র :

১। হেমব্রম, গণেশ, '*সাঁওতাল বিদ্রোহের গুরুত্ব', সাঁওতাল ও মিশনারি* (সুরঞ্জন মিদ্দে), সম্পাদনা, নান্দনিক, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২২, পৃ-১৪০
২। হাঁসদা, নাজু, '*সাঁওতাল হুল (১৮৫৫-৫৬): ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ইতিহাস,' ইতিকথা,* বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি, কলকাতা, একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-৯৩
৩। হেমব্রম, গণেশ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪২-১৪৩।
৪। মিদ্দে, সুরঞ্জন '*সাঁওতাল বিদ্রোহ ও রবীন্দ্রনাথ', আদিবাসী জগৎ ও স্বদেশ চর্চা,* স্বপন কুমার দাস (সম্পাদনা), আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, বালী, হাওড়া, প্রকাশ ২০১৮, পৃ-২৪।
৫। মণ্ডল, কুদ্দুছ আলি, '*সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫-৫৬) প্রেক্ষিতে বীরভূমের ইতিহাস', "প্রসঙ্গ বীরভূম",* নূর মহম্মদ সেখ ও সামিমা নাসরিন (সম্পাদনা), চয়ন পাবলিশার্স, বীরভূম, প্রথম সংস্করণ ২০২২, পৃ -৯৮।
৬। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ *"সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস"* ,বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ-৭৭-৭৮।
৭। মণ্ডল, কুদ্দজ আলি, পূর্বোক্ত, পৃ-৯৯।
৮। পাল, শিবানন্দ, *"সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল মহাবিদ্রোহ",* কল্যাণী, নদীয়া, ২০২১, পৃ-২০।
৯। মিত্র, গৌরিহর, *"বীরভূমের ইতিহাস"* পার্থ শঙ্খ মজুমদার (সম্পাদনা), আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ-২৮৫।
১০। রায়, সুপ্রকাশ *"সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬)",* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-৪১।
১১। মিত্র, গৌরিহর, পূর্বোক্ত, পৃ-২৮৫
১২। মিদ্দে, সুরঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃ-২৪
১৩। পাল, শিবানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ-৬০
১৪। মিত্র, গৌরিহর, পূর্বোক্ত, পৃ-২৮৫

১৫। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ-১২৮
১৬। মিদ্দে, সুরঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃ-২৫
১৭। রায়, সুপ্রকাশ, পূর্বোক্ত, পৃ-৪১
১৮। বাস্কে, ধীরেন্দ্রানাথ, পূর্বোক্ত, পৃ-৯৩
১৯। রায়, সুপ্রকাশ, পূর্বোক্ত, পৃ-৪২
২০। পাল, শিবানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ-৪১
২১। কবিরাজ, নরহরি, *"সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রকৃতি", পশ্চিমবঙ্গ,* সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা, তরুণ ভট্টাচার্য ও দিবজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৪০২, পৃ-৭৫
২২। সিংহ, সুকুমার, *"সিউড়ি শহরের ইতিহাস",* আশাদীপ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃ-১১১
২৩। পাল, শিবানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩২০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬।
২. পাল, শিবানন্দ, *সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল মহাবিদ্রোহ,* কল্যাণী, নদীয়া, ২০২১।
৩. রায়, সুপ্রকাশ, সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৪।
৪. মন্ডল, অমল কুমার, *ভারতীয় আদিবাসী,* দেশ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭।
৫. মিদ্দে, সুরঞ্জন (সম্পাদনা) সাঁওতাল ও মিশনারি, নান্দনিক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৮।
৬. হাঁসদা, কানাইলাল, *দামিনতে সেন: আর অনা তায়ম,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, নর্থ ঘোষপাড়া, বালি, হাওড়া, ২০১৯।
৭. দাস, স্বপন কুমার (সম্পাদনা), *আদিবাসী জগৎ ও স্বদেশ চর্চা,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, নর্থ ঘোষ পাড়া, বালি, হাওড়া, ২০১৮।
৮. হেমব্রম, পরিমল, *ঝাড়খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ নিবন্ধ,* সাহিত্যম্, কলকাতা, ২০১৮।
৯. বসু, তপন, *সাঁওতাল বিদ্রোহ,* উবুদশ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪।
১০. সেখ নূর মোহাম্মদ, নাসরিন সামিমা (সম্পাদনা), *প্রসঙ্গ বীরভূম,* চয়ন পাবলিশার্স, কাষ্টগরা, রামপুরহাট, বীরভূম, ২০২২।
১১. মিত্র, গৌরিহর, *বীরভূমের ইতিহাস,* পার্থ শঙ্খ মজুমদার (সম্পাদনা), আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৭।

১২. সিংহ, সুকুমার, *সিউড়ি শহরের ইতিহাস,* আশাদীপ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৯।

১৩. *পশ্চিমবঙ্গ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা,* সম্পাদক: তরুণ ভট্টাচার্য ও দেবজ্যোতি মজুমদার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৪০২।

১৪. Tudu, Buddheswar, *History of the Indian Independence Struggle of the Santhal*, Firm Klm Private Limited, Kolkata, 2019.

পত্রিকা:

১। *ইতিকথা,* বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি, কলকাতা, একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা জানুয়ারি ২০২৩।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কি আদৌ যুক্তিযুক্ত ? একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

দীপা রবিদাস
গবেষক, দর্শন বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ (Abstract) : মানব সভ্যতার ইতিহাস এক অর্থে মানবধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস। ধর্মের সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে মানুষের চিন্তা যেমন পরিশীলিত হয়েছে তেমনি তা সমৃদ্ধ হয়েছে নীতিবোধে। যদিও ধর্মের বিবর্তন কোনো সরলরেখা পথ ধরে অগ্রসর হয়নি। ধর্ম যে সর্বত্র সত্য, শিব ও সুন্দরের পথ উন্নীত করেছে তাও নয়। তথাপি মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে ধর্মের একটি সদর্থক অবদান যে রয়েছে , সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মাক্সমুলারের মত জার্মান পন্ডিত সকলে সে বিষয়ে এক মত। আর এই ধর্ম চেতনা যে কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে অবলম্বন করে উন্মেষিত হয়েছে তাহল - ঈশ্বর। মানব চিন্তার ইতিহাস এরই প্রমাণ দেয় যে, যুগে যুগে ঐশ্বরিক সত্তায় বিশ্বাসকে প্রমাণ সিদ্ধ করে তোলার চেষ্টা বিভিন্ন ধার্মিক ও দার্শনিকরা করেছেন। কিন্তু তাঁরা যে সকলেই এক মত পোষণ করেন তা নয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দাবী করেছেন। বিশেষ করে যে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় সাধারণ ধার্মিকের দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা, কর্মফল দাতা, এক ব্যক্তিসত্তা হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছেন, সেটি ন্যায়- বৈশেষিক দর্শন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে ভিত্তিভূমি জোগাতে এই সম্প্রদায়গুলি যেসমস্ত প্রমাণের অবতারণা করেছেন , সেই সমস্ত প্রমাণ গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সেগুলির যুক্তিযুক্ততা বিচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক সমস্যার সমাধান কল্পের অবতারণা করা আলোচ্য গবেষণা পত্রের মুখ্য উপজীব্য।

সূচক শব্দ (key words) : ঈশ্বর, জগৎকর্তা, অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা, বেদের উপদেষ্টা, নৈতিকতা বাধ্যবাধকতা।

মূল আলোচনা (Discussion):

মানুষ মাত্রই ধর্মীয় জীব। জন্মসূত্রেই মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার বীজ নিহিত রয়েছে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মধ্যে এই ধর্মীয় চেতনা নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। তবে প্রত্যেক ধার্মিক মানুষ এক অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করেন, তাহল - ঈশ্বর। ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান, করুণাময়, অলৌকিক, অতিরিন্দ্রিয় এবং অতিপ্রাকৃতিক সত্তা। অনেকে ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিয়ন্তা হিসেবেও দেখেছেন। আবার, জনসাধারণ্যে ঈশ্বর হলেন, আরাধ্য বিষয় এবং উপাস্য দেবতা। যার করুণা লাভ করা ধার্মিক মানুষের চরমতম অভিপ্রায়। মনে করা হয়, ঈশ্বর ব্যতীত ধর্ম যেন প্রাণহীন

মানুষের ন্যায়। তাই ধার্মিক কূলে ও ঈশ্বরবাদী দার্শনিক মহলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে নানা যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে ন্যায়-বৈশেষিক, যোগ এবং বেদান্ত - এই সম্প্রদায়গুলি নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। অপরদিকে, পাশ্চাত্য ধর্ম দর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি, তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি, উদ্দেশ্যমূলক যুক্তি এবং নৈতিক যুক্তি দেওয়া হয়েছে। আবার যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, তাঁরাও নানাবিধ যুক্তি দেখিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবে মনে এই সংশয় উত্থাপিত হয় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে প্রদত্ত যুক্তিগুলি কতটা যুক্তিসঙ্গত?

ন্যায়-বৈশেষিকদর্শনে ঈশ্বরসাধক যেসকল যুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, সেই যুক্তিগুলি কেবল ঈশ্বরবাদের ইতিহাসে নয়; সাধারণ্যে, অস্তিক ধার্মিককূলে বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। এই যুক্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জোরালো যুক্তি হল - জগৎ কর্তা বা জগতের নিমিত্ত কারণ রূপে ঈশ্বর প্রমাণ[1]। যেটি কারণতা মূলত যুক্তি হিসাবেও পরিচিত। এই যুক্তিটির দাবী হল কার্য মাত্রেরই কোন না কোন কারণ থাকবে; যার মধ্যে নিমিত্ত কারণও অন্তর্ভুক্ত। এখানে নিমিত্ত কারণ একজন চেতন কর্তা। সচরাচর চেতন কর্তা ব্যতিরেকে কোন কার্যই সুসম্পন্ন হয় না। জগৎ কার্যের নিমিত্ত কারণ হিসাবে যেহেতু কোন সসীম, অসর্বজ্ঞ, অল্পজ্ঞ জীবকে দায়ী করা যায় না। এজন্য এক অসীম, সর্বশক্তিসম্পন্ন, সর্বজ্ঞানসম্পন্ন ঐশী সত্তার অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়। এমনকি যাঁরা যান্ত্রিক কার্য-কারণ নিয়মের সাহায্যে সবকিছুর ব্যাখ্যা দেন, সেই বিজ্ঞানীরাও যান্ত্রিক নিয়মের সমান্তরাল ঈশ্বরের ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এই যুক্তিটি ধার্মিকদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত জোড়ালো বলে মনে হলেও যাঁরা কার্যের উৎপত্তিতে কোন নিমিত্ত কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বরং মনে করেন, নিমিত্ত কারণের হস্তক্ষেপ ছাড়াই জগতের কার্যগুলি উৎপন্ন হয় তাঁদের দৃষ্টিতে এই যুক্তিটি মূল্যহীন। কেননা, ঘট-পটের ন্যায় যাবতীয় বস্তুর নিমিত্ত কারণ স্বীকৃত হলেও এমন অনেক ঘটনা আছে যেমন বিদ্যুতের চমক, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনা নিমিত্ত কারণের উপস্থিতি ছাড়াই ঘটে থাকে বলে মনে হয়। সুতরাং জগতও ঐরূপ কোন নিমিত্ত কারণ ব্যতিরেকে সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিটি কার্যের মধ্যে কিছু পরিকল্পনার ছাপ বর্তমান। এই পরিকল্পনার ছাপ লক্ষ্য করে সেই কার্যের কর্তাকে অনুমান করা হয়। কিন্তু যেসমস্ত কার্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ঘটে তার পশ্চাতে কর্তার অনুমান করা হয় না। যেমন, ঝড়ে গাছপালা উপড়ে গেলে আমরা তার প্রতি কোন সত্তার অনুমান করি না; কিন্তু মানুষের দ্বারা একটি গাছ ছেদন হচ্ছে - এটা লক্ষ্য করলে আমরা কার্যের প্রতি কর্তাকে অনুমান করি। কাজেই, যে ঘটনা গুলি অপরিকল্পিতভাবে ঘটছে, সেক্ষেত্রে সচরাচর কর্তার অস্তিত্ব অনুমান না করলেও পরিকল্পিত ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে কর্তার অস্তিত্ব অনুমান করতে হয়। কিন্তু অনেকেই রয়েছেন যাঁরা পরিকল্পিত ঘটনাগুলিকেও অন্যভাবে ব্যাখ্যা

দেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম। তিনি মনে করেন, কারণ ও কার্যের মধ্যে সততসংযোগ আছে, কোন অনিবার্য সম্বন্ধ নেই। হিউমের এই নীতি মানলে কার্য অনিবার্যভাবে কর্তাকে নির্দেশ করে না। তিনি আরো বলেন, আপাত দৃষ্টিতে যেসকল ঘটনাকে পরিকল্পিত তথা কর্তৃজন্য বলে মনে হয়, সেগুলি আসলে পরিকল্পিত নয়। শৈশব থেকে বারং বারং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখে তাদের পরিকল্পিত বলে মনে করি মাত্র। কোন কর্তার হস্তক্ষেপ ছাড়াও এই ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রীক পরমানুবাদী ও ডারউইনের বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যাকে মডেল হিসাবে মেনেছেন। অভিব্যক্তির নিয়মে জীবকূল তাদের সুনির্দিষ্ট দেহশৈলী লাভ করেছে এমন কথা ভাবলে ঐ সকল ঘটনার কোন কর্তা বা রূপকারের কল্পনা করতে হয় না।

আবার এমন অনেক দার্শনিক রয়েছেন যাঁরা কার্যের উৎপত্তিতে নিমিত্ত কারণ স্বীকার করেও জগৎ কর্তা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁদের দাবী সসীম কার্য থেকে বড়জোর সসীম নিমিত্ত কারণের অনুমান হতে পারে। কিন্তু কোন অসীম কর্তার অনুমান নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে হিউম প্রদত্ত একটি উপমার সাহায্য নিয়ে বলা যায়, 'যদি একজোড়া স্কেলের কেবল একটি দিক দেখা যায় এবং দেখা যায় দশ আউন্স ওজনের কোনো বস্তু বিপরীত দিকে ঝুঁকে আছে, তাহলে এমন মনে করার যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, 'অ-দেখা' বস্তুটির ওজন দশ আউন্সের অধিক। অবশ্য এর থেকে কিন্তু এটা অনুমান করা যায় না যে, 'অ-দেখা বস্তুটি হাজার আউন্স বা অনন্ত আউন্স। তেমনি সসীম কার্যের উৎপত্তির জন্য কোন সসীম কারণকে স্বীকার করতে হয়; কোন অসীম কারণকে নয়।

তবে, এই সমস্ত যুক্তি দিয়ে জগৎ কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে কোনোভাবেই খর্ব করা যায় না। সত্যি বলতে, বিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত জগৎ সৃষ্টির সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা পেষ করতে পারেনি। মহাবিস্ফোরনের তত্ত্ব (Bigbang Theory) ও কৃষ্ণগহ্বর তত্ত্ব(Black Whole Theory) ইত্যাদি অনেক তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা এপর্যন্ত দিয়েছেন। কিন্তু কোনটিই প্রামাণিক বলে গন্য হয়নি। তাই জগৎ উৎপত্তিতে প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি অতিলৌকিক ব্যাখ্যা গড়ে ওঠারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর একটা ব্যাখ্যাকে তখনই পরিত্যাগ করা যায় যখন অন্য একটি ব্যাখ্যা মান্যতা পায়। কিন্তু প্রকৃতিবাদী বা বিজ্ঞানবাদী এখনো পর্যন্ত জগৎ উৎপত্তির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেনি। সুতরাং, প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা বা ঈশ্বরবাদী ব্যাখ্যার সম্ভাবনা উনমুক্তই থেকে যায়। বিশেষ করে কার্যের উৎপত্তিতে যে গতির প্রয়োজন হয় তা ঈশ্বরবাদীদের পাশাপাশি বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন হল, যেকোন কার্য যদি গতি সাপেক্ষ হয় তাহলে সেই গতির উৎস কি হবে? পদার্থবিদের কাছেও গতিশক্তি কিন্তু কার্য উৎপত্তির মূল। কিন্তু গতি শক্তির মূল কি? সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। এখন গতির উৎস হিসাবে অন্য একটি গতিকে মানলে, সেই

গতির জন্য আবার একটি গতিশীল বস্তুকে মানতে হবে, ফলে পরিণামে অনাবস্থা দোষ অপরিহার্য হয়ে পড়বে। কাজেই, গতির আদি কারণ বা মূল কারণ হিসাবে একটা উৎসকে স্বীকার করতেই হয়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও Unmoved Mover বা অসঞ্চালিত সঞ্চালক[ii] হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনেছেন। যদিও অ্যারিস্টটলীয় সেই ঈশ্বর নৈয়ায়িকদের মতো ব্যক্তিপুরুষ নন। কিন্তু গতি থেকে গতিদাতার যে অনুমান - সেটা যেমন অ্যারিস্টটলের ক্ষেত্রে কার্যকর তেমনি নৈয়ায়িকদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে কার্যকর।

আবার, অদৃষ্টের অধিষ্ঠতারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব[iii] দাবী করা হয়েছে ন্যায় দর্শনে। কেননা ভারতীয় দার্শনিকদের অধিকাংশই কর্মবাদী ও জন্মান্তরবাদী। কর্ম ফল প্রসব করে - একথা তাঁরা যেমন স্বীকার করেন, তেমনি কর্ম যেমন ফলভোগও তেমন - এমন কথাও তাঁরা মানেন। এই কর্মানুযায়ী ফললাভের জন্য জীবকে জন্মান্তর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। এখন প্রশ্ন হল, কর্মানুযায়ী ফলপ্রাপ্তি কিভাবে সম্ভব? আকর্ষিকভাবে কি কর্মানুযায়ী ফলপ্রাপ্তি হতে পারে। ধর্ম অনুসারে সুখ আর অধর্ম অনুসারে অসুখ বা দুঃখ অর্থাৎ যার যতটুকু ধর্ম তার ততটুকু সুখ এবং যার যতটুকু অধর্ম তার ততটুকু অসুখ বা দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু এইভাবে এইজীবন ও পরজীবনে কর্মফলকে নিয়ন্ত্রণ করা কার পক্ষে সম্ভব? এখন এই ফলপ্রাপ্তি যদি আকস্মিকভাবে ঘটত তাহলে কোন জীবই কর্মফল লাভের জন্য কর্ম করত না। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি সকল জীব নিজ নিজ কর্মে নিয়োজিত। এখানে মীমাংসকগণ বলতে পারেন, অপূর্ব অনুযায়ী মানুষ ফলভোগ করে। কিন্তু অপূর্ব হল এক জড় শক্তি বিশেষ। তাই এই জড়শক্তি একজনের কর্মানুযায়ী তার ফল প্রাপ্তিকে সুনিশ্চিত করে - একথা ঠিক বোধগম্য হতে পারে না। যেহেতু জড় স্বনিয়ন্ত্রিতভাবে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করতে পারে না। কাজেই কর্ম অনুযায়ী ফলবিধান করার জন্য অদৃষ্টের নিয়ন্তা হিসাবে একজন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা দরকার। কারণ, অদৃষ্ট অনুযায়ী ফলপ্রাপ্তি বা কর্মানুযায়ী ফলভোগ - এই নিয়ম না মানলে মানুষ যা ইচ্ছা তাই করবে, কর্মের ওপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। কেননা শুধুমাত্র আইনী বা রাষ্ট্রীয় বিধি-নিয়ম প্রয়োগ করে একজন ব্যক্তির কর্ম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু ‘কর্ম অনুযায়ী ফললাভের প্রকল্প’ সে এই জীবনে হোক্ কিংবা পরজীবনে - তা মেনে নিলে মানুষের কর্মের ক্ষেত্রে রাশ টানা সম্ভবপর হয়। আর এই রাশ টানার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কল্পনা অনিবার্য হয়ে পড়ে। অথবা সমগ্র জগতে নৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকে।

ঈশ্বর অস্তিত্ব প্রমাণে আরো একটি যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে সেটি হল - বেদের উপদেষ্টারূপে ঈশ্বরপ্রমাণ[iv]। তবে এই নিরলস প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ভারতীয় দর্শনেই পরিলক্ষিত। যেহেতু অন্যান্য ঈশ্বরবাদীরা যেমন বেদকে প্রামাণিক হিসাবে মানেন না তেমনি বেদের কর্তারূপে ঈশ্বরসিদ্ধির দায়ও তাঁদের নেই। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যে বেদকে সকল জ্ঞানের আকর হিসাবে স্বীকার করা হয়। বিশেষত আস্তিক দর্শন

সম্প্রদায়িকগণ তো বেদকে এমন মর্যাদায় দিয়ে থাকেন। কারণ আজকের দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ নতুন নতুন বিষয়ে অবগত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু প্রাচীন কালে সেই জ্ঞান লাভ কি সম্ভব ছিল? বিবর্তনের নিয়ম মানলে মানুষ নিম্নতর থেকে উচ্চতর প্রাণী হয়ে উঠেছে - একথা মানতে হয়। এখন তাই যদি হয়, তাহলে প্রায় মনুষ্যইতর প্রাণীর আকার সম্পন্ন মানুষের পক্ষে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া এবং বেদের মতো একটি গ্রন্থ রচনা করা সম্ভবপর নয়। অতএব বেদের কর্তা হিসাবে কারোর অস্তিত্ব মানতে হয়। এখানে মীমাংসক বেদের নিত্যতাবাদ সমর্থন করে বলেন যে, বেদ আসলে কারোর দ্বারা রচিত নয়। বেদকে ঋষিরা মানষচক্ষু দ্বারা উদ্ধার করেছেন মাত্র। অতএব বেদ নিত্য। কিন্তু যেকোন গ্রন্থ কোন না কোন রচয়িতাকে নির্দেশ করে। তবে বেদকে যাঁরা প্রামাণিক বলে মানেন না তাঁদের নিকট এই যুক্তি মূল্যহীন। তাই বলা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে এটি খুব একটা জোড়ালো যুক্তি নয়।

আবার, শক্তির আশ্রয়রূপেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব[v] স্বীকার করা হয়। এখানে শক্তি বলতে পদ শক্তিকে বুঝতে হবে। যে শক্তির দ্বারা একটি পদ, একটি অর্থকে সূচিত করে। সেটি কার ইচ্ছাতে হয়? এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন। এই শক্তির আশ্রয় রূপেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব দাবী করা হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই যুক্তিটি আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকলেরই স্বীকার করা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, পদের শক্তি কি কারোর ইচ্ছা দ্বারা সত্যিই নির্ধারিত হয়? ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে নানা রকম ধ্বনি ব্যবহার হয়ে থাকে, পাখিরা যখন করকাকলিতে চারিদিক ভরিয়ে তোলে তখন তারাও কি সংকেত গুলিকে ভাব বিনিময়ের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে না! এখানে হয়তো কেউ বলবেন পশু বা পাখিদের ঐধরনের চেষ্টা সহজাত। সহজাত প্রবৃত্তির বশে তারা তা করে। তাছাড়া সেক্ষেত্রেও ভাববিনিময়ের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু বর্ণনাত্মক শব্দের সাহায্যে মানুষের ভাব বিনিময়ের মধ্যে যে এক প্রকার সৃজনশীলতা রয়েছে, সেই সৃজনশীল ভাব বিনিময়ের উৎস হল - বিভিন্ন পদ শ্রবনের দ্বারা শ্রোতার মনে উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন পদার্থের স্মৃতি। যাকে ঠিক সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এখানেও কেউ আপত্তি তুলে বলতে পারেন, নির্দিষ্ট পদ থেকে নির্দিষ্ট অর্থ সূচিত হোক এটা লোক ব্যবহারই ঠিক করে দিয়েছে। তাছাড়া নব্যনৈয়ায়িকরা কিছু ক্ষেত্রে মানব ইচ্ছাকে শক্তি হিসাবে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। তাই এই শক্তির আশ্রয় হিসাবে ঈশ্বরের স্বীকৃতি কেন? এই উত্তরে ঈশ্বরবাদীরা বলেন, মানব ইচ্ছা ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে পদশক্তির উৎস হতে পারে, কিন্তু পরম্পরাক্রমে প্রচলিত শব্দ সমূহের যে শক্তির জ্ঞান ব্যক্তির হয়, তার চরম উৎস কি? যে মানবের কাছ থেকে ঐ পরম্পরা মানব সমাজ লাভ করেছেন, তিনি ঐ পদের শক্তির জ্ঞান লাভ করলেন কিভাবে? কাজেই এখানেও ঈশ্বরবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণের পক্ষে যে যুক্তি রয়েছে তা অস্বীকার করা চলে না। বিশেষ করে নব্য নৈয়ায়িকরা আধুনিক সংকেত অর্থাৎ মানব ইচ্ছাকে শক্তি বলে উল্লেখ করেছেন[vi]। এখন মানব ইচ্ছাকে যদি শক্তি বলে স্বীকার

করা হয় তাহলে কি শক্তির আশ্রয় রূপে ঈশ্বরের স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? এই প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায়।

উপসংহার:

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদীদের বিবাদ লক্ষ্য করলে বলা যায়, এই সমস্ত যুক্তি ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্বকে প্রতিপাদন করে না বরং কম বা বেশি মাত্রায় ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে সূচিত করে মাত্র। তবে, আলোচ্য যুক্তিগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি লৌকিক বিশ্বাসকে এক সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে সাহায্য করে।কিন্তু যাঁরা অকাট্য যুক্তির অনুসন্ধান করেন তাঁদের মনে ঐসকল যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক ধারণাকে দৃঢ় করতে সক্ষম নয়। স্পষ্টতই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক যে সমস্যা তা অমীমাংসিত ভাবেই শেষ হয়।

তা সত্ত্বেও এইরূপ নানাবিধ যুক্তির সাহায্য ঈশ্বরে উপনীত হওয়ায় এই যে প্রচেষ্টা তা মানবাত্মার এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবণতা, যার জন্য মানুষ একপ্রকার বাধ্যবাধকতা অনুভব করে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বাধ্যবাধকতাটা কোথায়? বক্তব্য এই যে, বাধ্যবাধকতা আসলে নৈতিক বাধ্যবাধকতা - এটা আমার মনে হয়েছে। কারণ, জগতের কর্তারূপে কোন এক অলৌকিক সত্তাকে স্বীকার না করলে আমরা যে সমস্ত আচরণ বা ব্যবহার করি সেগুলির কোনরূপ ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায় না। তাই সবকিছুকে বিশৃঙ্খল কার্যকারণহীন ভাবার তুলনায় মানুষ বুদ্ধির শৃঙ্খলার মধ্যে সমস্ত কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাছাড়া কোন ঐশী সত্তায় মানুষের বিশ্বাস না থাকলে মানুষ যে আত্মত্যাগ, আত্মশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি এগুলি করে থাকে সেগুলি সম্ভব হয় না বরং মানুষের যে দৈহিক দাবীগুলি রয়েছে যেমন- ক্ষুদা, তৃষ্ণা, যৌনতা প্রভৃতির মধ্যেই মানুষ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই বলা যায়, প্রমাণ হিসাবে যুক্তিগুলি সর্বোপরি না হলেও যুক্তিগুলি কিন্তু মূল্যহীন নয়।

প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাসের বিষয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতার সাহায্য লাভ করা যায় না। যেহেতু এক, অসীম, অনন্ত গুণসম্পন্ন ঈশ্বর বুদ্ধি তথা বিচার বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতার অতিবর্তী। তাই তাঁর প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করা সসীম মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আমরা কেবল ঈশ্বরের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করতে পারি মাত্র। এখন, কেউ প্রশ্ন করে বলতে পারেন, কিসের ভিত্তিতে এইরকম অলৌকিক ঈশ্বরে আস্থা জ্ঞাপন করব? এর উত্তর আমি হিউমকে স্মরণ করে দিতে চাই। তিনি মুদ্রণ ব্যতিরেকে কোন ধারণার অস্তিত্ব সেইভাবে স্বীকার করেননি। এজন্য তাঁর দর্শনে[vii] তথাকথিত অধিবিদ্যা; যেখানে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচিত হয় বলে আমরা মনে করি, সেই অপ অধিবিদ্যা (False Metaphysics)-কে বর্জন করেছেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও তিনি আরো একটা কথা বলেন যে, "...subservient to the interests of society"[viii]। এক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, দর্শন করতে গিয়ে সমাজ ও মানুষের সম্পর্ককে বিচ্যুত করলে চলবে না। কোন কিছু যদি সমাজ কল্যানের

উপযোগী বা পরিপোষক হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেননা, দার্শনিক হওয়ার আগেও আমাদের যে কথা মনে রাখতে হবে তাহল আমরা মানুষ। যা তাঁর বিখ্যাত উক্তি "Be a Philosopher; but admits all your philosophy, be still a man"[ix]এতে অতি স্পষ্ট। আর আমরা জানি যে, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আমাদের সমাজের পক্ষে কতটা কল্যানকর এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাস না হলে তা সমাজ ব্যবস্থাকে কিভাবে বিঘ্নিত করবে। সুতরাং সমাজের নানাবিধ অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতা দূর করার জন্য এবং মানুষের আচরণের নৈতিকতা বজায় রাখার স্বার্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এক গ্রহণযোগ্য প্রকল্প।

তবে, ব্যতিক্রমী নিরীশ্বরবাদী দর্শন ও ধর্ম সম্প্রদায়গুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কেউ বলতে পারেন যে, নৈতিকতা রক্ষায় ঈশ্বর বিশ্বাস অপরিহার্য নয়। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দর্শনগুলি নিরীশ্বরবাদী হয়েও নীতি দর্শনের পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচিত হয়। কর্মবাদী মীমাংসা বা জ্ঞানবাদী সাংখ্যের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের স্বীকৃতি অপরিহার্য নয়। আবার, নৈতিকতাকে বৌদ্ধিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা বিচারবাদী কান্ট ও উপযোগবাদী মিল-বেন্থামের রচনাতেও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ঈশ্বর বিশ্বাস নিরপেক্ষ ভাবেও যে নৈতিকতার উন্মেষ ঘটতে পারে - সেকথা হয়তো স্পষ্ট করেছে নাস্তিক দর্শনগুলি। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেখি বুদ্ধ ও মহাবীরকে প্রায় ঈশ্বরের স্থানই দেওয়া হয়েছে। সাংখ্য যে প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানের দাবী করেন, তা এক পরম কারণের আশীষ ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয় শ্বেশ্বর সাংখ্য তা দেখিয়েছেন। মীমাংসকগণ যে বিধির কথা বলেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে তার অনুগমন তখনই প্রেরণা পায় যখন তাতে ঈশ্বর বা অতিলৌকিকের অনুমোদন মানুষ দেখতে পায়। কান্টের বুদ্ধি সর্বস্ব নৈতিকতার পাঠ ঈশ্বরের প্রাক্ স্বীকৃতি ছাড়া যে ফলপ্রসূ হতে পারে না, কান্ট স্বীকৃত তিনটি পূর্বস্বীকৃতি তা বুঝিয়ে দেয়। আত্মার অমরতা ও ইচ্ছার পাশাপাশি, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যে নৈতিক জীবনের পূর্বাঙ্গ তা কান্টও বলেছেন। অতিলৌকিকে বিশ্বাস পরিহার করে বিচারশীল নৈতিক দর্শন গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখেন হিতবাদী বা উপযোগবাদীরা। কিন্তু হিত বা উপযোগের ধারণাটি দেশ-কাল-সমাজ সাপেক্ষ। তার ওপর চিরকালের নৈতিকতাকে দাঁড় করানো যায় না বলে মত প্রকাশ করেছেন বিবেকানন্দ। 'সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণসাধন' -এই যে নীতি উপযোগবাদীরা পেষ করেন, তাতে কল্যাণের ধারণাকে পূর্বস্বীকৃতি হিসাবে মেনে নিতে হয়। ঐ কল্যাণের ধারণা এক পরমের ধারনার সঙ্গে সম্বন্ধ না হয়ে উপলব্ধ হয় না। খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য হতে যে কল্যাণের ধারণা ইউরোপ লাভ করেছিল, তার ওপর দাঁড়িয়ে কল্যাণের ধারণা পরিমাণগত ও ব্যাপ্তিগত আধিক্যের কথা বলেছেন মিল-বেন্থামেরা। এমতাবস্থায় ঈশ্বর নিরপেক্ষ নৈতিকতার ধারণা কতখানি গ্রহণযোগ্য সে প্রশ্ন থেকেই যায়। তাই এর পরিবর্তে ঈশ্বরের বিশ্বাসের আকারে নৈতিকতার কুসুমটি অবলীলায় প্রস্ফুটিত হতে দেওয়ায় যুক্তিসঙ্গত।

তথ্যসূত্রি নির্দেশ:

---

[i]শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), পুনর্মুদ্রণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, ভাষপরিচ্ছেদঃ,কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, পৃষ্ঠা - ১৩।

ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন (অনূদিত), শ্রীমদাচার্যোদয়নপ্রণীঃ ন্যায়কুসুমঞ্জলীঃ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, পৃষ্ঠা - ৩৭৯।

[ii]F. Copleston, April 1993, *A History of Philosophy,*vol.1 , New York, IMAGE BOOKS DOUBLEDAY, P. 316

[iii]তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ন্যায়দর্শন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, পৃষ্ঠা - ৫২।

[iv]তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, প্রথম প্রকাশ ১৩১৮, ন্যায়দর্শন (২য় খণ্ড), কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, পৃষ্ঠা - ৩৪৭।

[v]শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), পুনর্মুদ্রণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, ভাষাপরিচ্ছেদ, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, পৃষ্ঠা - ৪১৫-৪১৬।

[vi]শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), পুনর্মুদ্রণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, ভাষাপরিচ্ছেদ: , কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, পৃষ্ঠা - ৪১৬-৪১৭।

[vii]Hume D, '*An Enquiry Concerning Human Understanding'*, p.131

[viii]Hume D, '*An Enquiry Concerning Human Understanding'*, p. 5

[ix] Hume D, '*An Enquiry Concerning Human Understanding'*, p.4

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

(১) কর, শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়াচার্য, তর্কভাষা (দ্বিতীয় খন্ড), মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০৮.

(২) গোস্বামী, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র, তর্কসংগ্রহঃ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

(৩) তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, ন্যায়পরিচয়- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৬.

(৪) তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, ন্যায়দর্শন, দ্বিতীয়খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

(৫) তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, ন্যায়দর্শন, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮১।

(৬) তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, ন্যায়দর্শন, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৮।

(৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ, ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮৬,

(৮) ভট্টাচার্য্য, ড. চন্দন, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৪.
(৯) ভট্টাচার্য্য, শ্রী মোহন, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯৫।
(১০) ভট্টাচার্য্য, শ্রীমৎ পঞ্চানন, ভাষাপরিচ্ছেদঃ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা, ১৯৭০।
(১১) মিশ্র, শ্যামাপদ, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি (প্রথমদ্বিতীয়স্তবক), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।
(১২) মোহান্ত, দীলিপ কুমার, ধর্মদর্শনের কতিপয় সমস্যা, কলকাতা নবভারতী প্রকাশনী, ২০১০।
(১৩) Copleston, Frederick, *A History of Philosphy*, IMAGE BOOKS BOUBLEDAY, New York, 1993।
(১৪) Hume, David, *An Enquiry Concerning Human Understanding* (introduction by J N. Mohanty), Progressive Publishers, Calcutta, 1992.

কল্পবিজ্ঞানের আলোকে উপন্যাস ও চলচ্চিত্র : পাতালঘর

চিরঞ্জিত ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বহরমপুর গার্লস্ কলেজ

সারসংক্ষেপ : বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের কল্পবিজ্ঞান একটি অত্যাধুনিক ধারা। অদ্রিশ বর্ধন, অনীশ দেব, সৌরভ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান চর্চা করলেও কথাকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তার ভিত্তিতে পরিমার্জিত ভাবনা-চিন্তা করেছেন। আর তারই প্রতিফল হিসাবে তিনি বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকায় কিশোরদের জন্য একাধিক ছোটগল্প ও কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। আমাদের বিজ্ঞানচিন্তা যেখানে থিতু হয়ে যায়, কল্পনার মিশ্রণে মনন জগতে তারই একটি অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করি প্রতিনয়ত আমরা। আজকে যেটি আমাদের কাছে অবাস্তব কল্পনা, সেটি আগামী দিনে সত্যতায় প্রতিপন্ন হয়ে উঠতে সাহায্য করে কল্পবিজ্ঞান। লক্ষণীয়, আখ্যানকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি ‘পাতালঘর’ উপন্যাসে সেটির বাস্তবায়ন করেছেন বলা যায়। ডাক্তারি বিদ্যার এক দুরগম্য রিসার্চ তথা মানুষকে দেড়শ’ বছর ঘুম পাড়িয়ে প্রয়োজন সাপেক্ষে তাকে জাগানোর প্রক্রিয়া এই উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের বিপরীতমুখী ধারায় বিজ্ঞানী অঘোর সেনের ল্যাবরেটরির ‘সঞ্জীবনী অমৃতবিন্দু’ এরই উৎকর্ষ আবিষ্কার উপন্যাসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যার ফলস্বরূপ, এই ঘুমন্ত ঔষধ প্রয়োগ করে চরম অত্যাচারী সনাতন বিশ্বাসের হাত থেকে নন্দপুর রক্ষিত হয়েছে। সদ্য মেলেটারি থেকে অবসরপ্রাপ্ত সুবুদ্ধি নন্দপুরের পাইকপাড়ায় একটি পুরানো বাড়িতে পাতালঘর আবিষ্কার করেছে। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল গবেষণাগারের প্রতিস্থাপন বেশ চমকপ্রদ ঘটনা। এছাড়া সপ্তর্ষি মণ্ডলের বাসিন্দা হিক সাহেবের পুত্র ভিক সাহেব এই পাতালঘরের ল্যাবরেটরি থেকে ‘রেসপিরেটর’ ও ‘রিভাইভার’ বিজ্ঞাননির্ভর যন্ত্রসহ সনাতন বিশ্বাসকে তাঁদের গ্রহে নিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত চেষ্টার কূটকৌশল উপন্যাসে দেখানো হয়েছে।
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কল্পবিজ্ঞানধর্মী এই ‘পাতালঘর’উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রপরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ‘পাতালঘর’ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ছবিতে সনাতন বিশ্বাসের চরিত্রে বিপ্লব চক্রবর্তীর অভিনয় দক্ষতা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন মানুষকে অপয়া ভেবে সমাজ তাকে কতভাবে বঞ্চিত করে তার মর্মযন্ত্রণা যেমন সিনেমাতে পরিস্ফুট; তেমনি ওই বঞ্চনাকে কাজে লাগিয়ে সনাতন বিশ্বাস প্রাত্যহিক জীবনে অর্থ উপার্জন করে— যা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। অর্থাৎ, ‘অভিশাপই আর্শীবাদ’রূপে ধরা দিয়ে সনাতন বিশ্বাসের জীবন পরিক্রমা সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছে

কাহিনিতে। সুতরাং, 'পাতালঘর' উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রে কাহিনির উপস্থাপনগত অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে— যা শিল্পের মিশ্র প্রতিক্রিয়াজাত সংরূপ।

সূচক শব্দাবলী : কল্পবিজ্ঞান, উপন্যাস, চলচ্চিত্র, পাতালঘর, গবেষণাগার।

অ-বিজ্ঞানের ছাত্র, মফসল শহরে বেড়ে ওঠা, প্রাকৃতিক সান্নিধ্যে লালিত্যময় জীবন ও যন্ত্র সভ্যতা থেকে দুরগম্য অমর কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিতে অনায়াসে মজার ছলে প্রবেশ করেছেন। তবে কল্পবিজ্ঞান তাঁর 'কিশোর উপন্যাসে' সব থেকে একাধিপত্য রাজত্ব বিস্তার করেছে। শীর্ষেন্দুবাবু লেখক জীবনের শুরুতে বড়োদের সাহিত্য রচনার মাধ্যমে সাহিত্যে প্রবেশ করেন। কিন্তু বিশ শতকের সাতের দশক থেকে তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য লিখতে নেমেছেন কেবলমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধবশত। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন:

> আগে আমি শুধু বড়দের জন্যই লিখতাম। গেরামভরী সব লেখা। তারপর আনন্দমেলার সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এসে আমাকে ধরলেন, ছোটদের জন্য একটা গল্প লিখে দে তো। শুনে ঘাবড়ে গেলাম। ছোটদের জন্য লেখা! পারব কি? তার কিছুদিন আগে আনন্দবাজারের পাতায় যে একপাতার আনন্দমেলা বেরোয় তার তখনকার সম্পাদক, আমার বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমাকে দিয়ে একটা একরত্তি গল্প লিখিয়ে নিয়েছিল, সেটা একটা চোরের গল্প, নীরেনদার ফরমাশে এবার যে গল্পটা লিখে ফেললাম সেটার নাম "বিধু দারোগা", আর তার কিছুদিন পরেই ধারাবাহিকভাবে "মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি" উপন্যাস, তারপর পুজো সংখ্যায় "গোঁসাইবাগানের ভূত"। ওই সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে, প্রথমে একটু অনিয়মিত এবং পরে নিয়মিতভাবে প্রতি পূজা সংখ্যাতে একটি করে উপন্যাস লিখে আসতে হয়েছে।[১]

সাতের দশক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ উর্ধ্বে। বলাবাহুল্য, আনন্দ পাবলিশার্স্ থেকে শীর্ষেন্দুবাবুর যে 'কিশোর উপন্যাস সমগ্র' (৫ খণ্ডে) প্রকাশিত হয়েছে—তাতে উপন্যাসের সংখ্যা আটত্রিশটি। এগুলির মধ্যে কল্পবিজ্ঞানের আশ্রয়ে গড়ে ওঠা উপন্যাস নয়টি। স্মর্তব্য যে, কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস নির্মাণে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কেবলমাত্র মসী চালিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়; পাশাপাশি কয়েকটা ছোটগল্পও লিখেছেন। সেগুলি সাধারণত 'আনন্দমেলা' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। এই ধারার উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল: 'সময়', 'তিন হাজার দুই', 'আশ্চর্যপ্রদীপ', 'সবুজবেড়াল', 'ইশারা', 'বনদেব', 'অজয়', 'উলটপুরাণ', 'বড়সাহেব', 'গগন চাকি ও পবনদূত', 'তেল' ও 'অম্বুজবাবুর ফ্যাসাদ' প্রভৃতি। তবে কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের তুলনায় লেখকের সাফল্য উপন্যাসেই

বেশি লক্ষ করা যায়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে কল্পবিজ্ঞানধর্মী উপন্যাস রচনা করেন নি অবশ্য। কিন্তু এই আঙ্গিকের উপন্যাস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে চলেছেন তিনি আজও। তাই শুধু কল্পবিজ্ঞানের লেখকই তিনি নন, একজন খ্যাতনামা গবেষকও। কালানুক্রমিকভাবে তাঁর কল্পবিজ্ঞানধর্মী উপন্যাস বিশ্লেষণে দেখা যাবে, একটি পর্ব থেকে অন্য পর্বে লেখকের চিন্তন স্তর কীভাবে পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। ১৯৮৪ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চার দশক ধরে সৃষ্ট কল্পবিজ্ঞানধর্মী উপন্যাসে বিজ্ঞানচর্চা, কল্পনার সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয়, মানবিক আবেগ ও প্রযুক্তির সংমিশ্রণে সভ্যতার উত্তরণ এবং বিজ্ঞানের যন্ত্র সভ্যতাকে বাস্তবমুখী করে উপস্থাপন করা ইত্যাদি বিষয়কে স্থান দিয়েছেন তিনি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কল্পবিজ্ঞান ধারার এক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘পাতালঘর’। এটি এপ্রিল ১৯৯৬ সালে গ্রন্থাগারে আত্মপ্রকাশ করে। এই উপন্যাসে মূলত দুটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে—‘কল্পবিজ্ঞান’ ও ‘কুসংস্কার’। উপন্যাসে সূত্রপাতে দেখা গেছে, কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র সুবুদ্ধি সদ্য মিলিটারি চাকরি থেকে রিটায়ার করেছে। সে অবিবাহিত। তার দিদি ছাড়া আপনজন কেউ না থাকার জন্য একটি ছোট ব্যাবসা করে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছে। এবং দিদির অনুরোধবশত ভাগ্নে কার্তিকের পড়াশুনার দায়িত্বও সে গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য সুবুদ্ধি হুগলি জেলার নন্দপুরের পাইকপাড়ায় নরহরিবাবুর নিকট বাড়ি কিনেছে। কিন্তু এটি অতি-পুরানো বাড়ি হওয়ায় মেরামত করার কাজে এই গাঁয়েরই এক অন্যতম মিস্ত্রী হরেন ও তার শাগরেদ পাঁচুকে কাজে লাগানো হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ঘরের মেঝে হঠাৎ ধসে যাওয়ায় শাগরেদ পাঁচু চূড়ান্তভাবে জখম হয় এবং বাড়ি মেরামত অচিরেই বন্ধ হয়ে পড়ে। তার ফলস্বরূপ, বাড়ি ওইরূপ ঝুরঝুরেই থেকে যায়। কিন্তু এই পোড়ো বাড়িতে মামা-ভাগ্নে বসবাস শুরু করলেও নানা রকম অলৌকিক ঘটনা ঘটতে থাকে। বস্তুত, মাঝ-রাতে সুবুদ্ধি ও কার্তিকের আকস্মিক ঘুম ভেঙে যায় কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির অস্পষ্ট কণ্ঠের ডাক শুনতে পেয়ে। কিন্তু এই ডাকের হদিস জানতে গিয়ে সুবুদ্ধি এক বিশালায়তন দৈত্যের দ্বারা প্রচণ্ড আহত হয়ে ঘরেরই মেঝের তলায় মাটি চাপা পড়ে। মৃত্যুর হাত থেকে অবশেষে নিজেকে বাঁচাতে সে এক অদ্ভুত পাতাল ঘরের সন্ধান পায়। এবং সেখানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে সুসজ্জিত এক গবেষণাগারও লক্ষ করে সুবুদ্ধি।

সুবুদ্ধির পাশের বাড়ির প্রতিবেশী গোবিন্দ বিশ্বাস নন্দপুরের বিখ্যাত অপয়া হিসাবে পরিচিত। কথিত আছে যে, কোন ব্যক্তি বেলা বারোটার আগে পর্যন্ত তার মুখ দর্শন করলে বিপদ বা দুর্ঘটনা অনিবার্য। তাই তিনি বলেছেন:

> আমি হচ্ছি বিখ্যাত অপয়া গোবিন্দ বিশ্বাস। সকালের দিকে আমার মুখখানা দেখেছ কি সর্বনাশ! ধরো বাজারে বেরোবার মুখে আমার সঙ্গে

> দেখা হয়ে গেল। ব্যস, আর দেখতে হবে না। সেদিন হয় তোমার পকেটমার হবে, নয়তো পচা মাছ বা কানা বেগুন গছিয়ে দেবে ব্যাপারীরা, নয়তো ষাঁড়ে গুঁতিয়ে দেবে।[২]

বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে এটি কুসংস্কার হলেও লোক বিশ্বাসের প্রথানুযায়ী তাঁর সঙ্গে সাত-সকালে দেখা হওয়ার ভয়ে সকলে চোখ বুজে অন্ধের মতো যাতায়াত করে। বর্তমানে গোবিন্দবাবু এটিকে পেশা হিসাবে নির্বাচন করায় বেশ আর্থিকভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছেন। এমনকি এই অপয়া মুখ যাতে পড়শিদের না দেখতে হয়, সেজন্যে বাড়িতে বিনামূল্যে খাই-খরচের বাজারও নিত্যই চলে আসে—যা তাঁর অতিরিক্ত মুনাফালাভ।

পাতাল ঘরের এই গবেষণা কক্ষের গবেষক ছিলেন প্রয়াত বিজ্ঞানী অঘোর সেন। তিনি বিজ্ঞানের কাজ-কর্ম নিয়ে যেমন সদা ব্যস্ত থাকতেন, তেমনি সপ্তর্ষি গ্রহের বাসিন্দা হিক সাহেবের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিকল্প নিয়ে নানা ধরনের পর্যালোচনা করতেন। বলাবাহুল্য, হিক সাহেবের পরামর্শে অঘোরবাবু একটি ‘শ্বাস-নিয়ামক’ যন্ত্র ও কিছু রাসায়নিক পদার্থ সহযোগে এক বোতল ‘সঞ্জীবনী অমৃতবিন্দু’ আবিষ্কার করেন। স্মর্তব্য যে, এটি কোন ব্যক্তির উপর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করলে সে কয়েক শত বছর ঘুমন্ত অবস্থায় বেঁচে থাকবে। তাই অঘোরবাবু তাঁর সমকালীন সময় অর্থাৎ ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে সনাতন বিশ্বাস নামে এক দুষ্ট প্রকৃতির লোকের অত্যাচার থেকে নন্দপুরকে রক্ষা করতে তার ওপর অনেক কৌশল অবলম্বন করে এই পাতালঘরে বিজ্ঞানের প্রয়োগ-বিদ্যা ব্যবহার করেন। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই বলা হোক না কেন, সুবুদ্ধি বিজ্ঞানী অঘোর সেনের রচিত খসড়া থেকে বর্তমানে সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারার পর সনাতনবাবুকে পৃথিবীলোকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিপুল উৎসাহ ও উৎদ্রেগ প্রকাশ করতে থাকে। সনাতন বিশ্বাসকে কীভাবে নিদ্রাভঙ্গ করতে হবে তারও প্রকৌশল খসড়ার মধ্যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন অঘোরবাবু। তিনি তার পুনরুজ্জীবনের পদ্ধতি লিখেছেন এরকম:

> ভবিষ্যতের মনুষ্য, যদি সনাতনের সন্ধান পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তড়িঘড়ি করিবেন না। ... সনাতনের শিয়রে একটি শিশিতে একটি তরল পদার্থ রাখা আছে। সনাতনকে হাঁ করাইয়া এই শিশি হইতে সামান্য তরল পদার্থ তাহার মুখে ঢালিবেন। অনুমান করি সনাতন চক্ষু মেলিবে।[৩]

উল্লেখ্য, প্রায় দেড়শো বছরেরও বেশি ঘুমন্ত সনাতনকে জাগিয়ে দেখা যায় তার বয়স আটাশ বছরেই থেমে আছে। কিন্তু হিসাবানুযায়ী তার বয়স একশো আটাত্তর বছর—যা বেশ বিস্ময়কর ঘটনা।

সম্প্রতি ভূতনাথ নন্দী নামক একজন বিজ্ঞানী সদ্য প্রকাশিত একটি বিদেশি 'সায়েন্স জার্নালে' অঘোরবাবুর এমন আশ্চর্য কৃতিত্বের কথা জানতে পেরে নন্দপুরে উপস্থিত হয়ে নানারকমভাবে গবেষণাগারের অনুসন্ধান করতে থাকেন। এদিকে সপ্তর্ষি মণ্ডলের বাসিন্দা হিক সাহেবের ছেলে ভিক বিজ্ঞানী অঘোর সেনের ল্যাবরেটরি থেকে 'রেসপিরেটর' ও 'রিভাইভার' দুটি যন্ত্র সমেত সনাতন বিশ্বাসকে তাদের গ্রহে নিয়ে যেতে এসেছেন। বলাবাহুল্য, সমকালীন সময়ে অঘোর সেনের সঙ্গে হিক সাহেবের চুক্তি ছিল যে, যেদিন সনাতনের ঘুম ভাঙবে বা ভাঙানো হবে সেদিন তাকে তাঁদের গ্রহে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রসঙ্গত, হিক চেয়েছিলেন এই উন্নত 'বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি' যেন পৃথিবীবাসীর কাছে চিরকালই অজ্ঞাত থাকে। তাই হিক সাহেবের পুত্র ভিক অঘোর সেনের গবেষণা কক্ষের খোঁজে সমগ্র নন্দপুরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন। এমনকি তাঁর দ্বারা ভূতনাথ নন্দী, হরুয়া ও সুবুদ্ধি প্রমুখরা কম-বেশি আহত হয়েছেন। স্মরণীয়, ভিক যে-কোন উপায়ে উদ্দেশ্য সাধনে অতি তৎপর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

বিজ্ঞানী ভূতনাথ নন্দী অঘোরবাবুর ল্যাবরেটরি দেখে আশ্চর্য হয়েছেন মূলত উনিশ শতকের চারের দশকে বিজ্ঞানের এমন উৎকর্ষতার কথা স্মরণ করে। সর্বাপ্রেক্ষা উল্লেখ্য, 'অমৃতবিন্দু'র মধ্যে কী এমন কেমিক্যাল আছে যার গুণে সনাতন বিশ্বাস টানা দেড়শো বছর ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল—এর রহস্য উন্মোচনে তিনি ভিককে তাঁদের গ্রহে প্রত্যাবর্তন করতে সমগ্র গ্রামবাসীর সহায়তার পাণি পার্থী হন। তবে শেষ পর্যন্ত সনাতন বিশ্বাসের কর্ম-কৌশলের দ্বারা ভিক তাঁর উদ্দেশ্য সাধন না করে কেবলমাত্র প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করেন। এই একুশ শতকের বিজ্ঞান বা মেডিক্যাল সায়েন্সের কাছে এই ধরনের রিসার্চ অনেক দুরগম্য ও বিস্ময়কর হলেও উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে পাঠকের একবারের জন্যও এটি কাকতালীয় বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের ভাবনাকে কত বিচিত্র পন্থায় সাহিত্যে কাজে লাগানো হয় তা 'পাতালঘর' উপন্যাসের মধ্যে পরিস্ফুটিত। আর এই উপন্যাসে 'অপয়া' নামক কুসংস্কারটি নিছক মজা ও হাসির খোরাক ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পৃথিবীর স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পের দুনিয়ায় চলচ্চিত্র স্মরণীয় গণমাধ্যম। অন্যান্য শিল্পগুলি থেকে তিল তিল করে উপদান নিয়ে তিলোত্তমারূপে চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ঘটে উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে। প্রথমদিকে এটির দুটি রূপ: নির্বাকচিত্র ও সবাকচিত্র। তথা কথিত সাহিত্যের উপাদান নিয়েই চলচ্চিত্র জন্মলাভ করেছে শৈল্পিক জগতে। বস্তুত তখন থেকেই সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তা সত্ত্বেও, সাহিত্য আর চলচ্চিত্র দুটি ভিন্ন শিল্প মাধ্যম। প্রথমটি অতি প্রাচীন, অপরটি একেবারে নবীন। সাহিত্যের বর্ণনা, সঙ্গীতের সুর, চিত্রকলার কম্পোজিশন, নাটকের অভিনয়, স্থাপত্যের গঠন ও ফটোগ্রাফির বাস্তবতা ইত্যাদির সংমিশ্রণে চলচ্চিত্রের খোলনলচে

বর্ণিতরূপ ধারণ করেছে। তাই চলচ্চিত্রকে বলা হয় যৌথ শিল্প। সাধারণত সাহিত্য কেবলমাত্র এক শ্রেণি শিল্পপ্রেমীদের রসাস্বাদনের মধ্য দিয়ে কালোজয়ী হয়ে ওঠে। কিন্তু সিনেমা সর্বস্তরের দর্শকদের চিত্তরসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। অবশ্য দুটিরই আলাদা শিল্পমূল্য আছে। আবার কোন সাহিত্য যখন চলচ্চিত্রে রূপ পায়, তখন সাহিত্যের সম্পূর্ণ তথ্য চিত্রপরিচালক গ্রহণ করেন না। তিনি সমকালে ঐ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তার মূল্যায়নেই ছবির উপাদানের হেরফের ঘটান। এইসব বিষয়কে কেন্দ্রে রেখেই চলচ্চিত্রকার সিনেমা নির্মাণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও, সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। তাই প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক রিচার্ডসন বলেছেন :

> The connections that exit between literature and film are worth concentrating upon first and most simply because literature and film are near neighbors in many respects and secondly because these two forms of artistic expression appear to be in creakingly dominant in the formation of aesthetic responses.[৪]

এইভাবে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিকে নিয়ে চিত্রপরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী ২০০৩ সালে ‘পাতালঘর’ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। সেখানে উপন্যাস থেকে ছবিতে কাহিনির উপস্থাপনগত অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। উপন্যাসে দেখা গেছে, সুবুদ্ধি রায় ভাগ্নের পড়াশুনা ও অবসরকালীন কর্ম জীবনের আনন্দ উপভোগের জন্য বাড়ি ক্রয় করেছে। কিন্তু সিনেমায় সুবুদ্ধির ভাগ্নে কার্তিক উত্তরাধিকার সূত্রে নিশ্চিন্দিপুরে বাড়ি পেয়েছে। উল্লিখিত যে, উপন্যাসে এই বাড়ি হল হুগলী জেলার পাইকপাড়ায়। এছাড়া অপয়া চরিত্রের অভিনয়টি দুর্বল হলেও ওঁর কণ্ঠে গীত গানটি বেশ চমকপ্রদ। বিজ্ঞানী অঘোর সেনের চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় কাহিনির গতিকে আধুনিক করে তুলেছে। তাঁর আবিষ্কৃত ঘুম পাড়ানি যন্ত্রটি কয়েকটি আদিম শব্দ শুনিয়ে মানুষজনকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে—যা অঘোরবাবুর অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। কিন্তু উপন্যাসে দেখা গেছে এটি কেমিক্যাল পদার্থমিশ্রিত এমন এক অমৃতবিন্দু যা কোন মানুষের উপর প্রয়োগ করলে সে টানা দেড়শ’ বছর ঘুমাতে পারবে। এছাড়া সনাতন বিশ্বাস চরিত্রে অভিনেতা বিপ্লব চক্রবর্তীর অভিনয়ে পরিচালক কিছুটা খামখেয়ালিপনা ও উদাসীনতা প্রবেশ করিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, তিনি দীর্ঘ সময় ঘুম থেকে ওঠার পর পৃথিবীর আশ্চর্য জগৎ সম্পর্কে এক নিদারুণ কৌতূহল সর্বদা বোধ করেছেন। তাঁর পরিহিত পোশাক দেখলেই আমাদের কেবল তাঁকে অন্য গ্রহের প্রাণী বলে মনে হয়েছে। আসলে এটি হল দেড়শ’ বছর আগের পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিকায়িতরূপ। উপন্যাসে ভিক সাহেবের পরিবর্তে চলচ্চিত্রকার বেগমের চরিত্র

উপস্থাপিত করেছেন সিনেমায়। অলৌকিকতার পরিবর্তে বাস্তবতা এখানে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তবুও তাঁর অভিনয়দক্ষতা বেশি অতি নাটকীয় মনে হয়েছে ছবিতে। উল্লেখ্য, চলচ্চিত্রে থিয়েটারের উপস্থাপনা কাহিনিকে দৃষ্টিগ্রাহী করে তুলেছে সুবুদ্ধি—যা চমকপ্রদ। চলচ্চিত্রের সমাপ্তিতে লক্ষ করা যায়, বিজ্ঞানী ভূতনাথ কার্য-কারণহীনভাবে অদৃশ্যলোকে যাত্রা করেছে। এই ঘটনা ছবিটিকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে। বিজ্ঞানের আলোকছায়ায় নির্মিত ছবিতে এই অলৌকিক দৃশ্যের সংযোজন অবান্তর বলে আমার মনে হয়েছে। কিন্তু অপরদিকে উপন্যাসে ভূতনাথের উপস্থিতি বেশি বাঙ্ময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। ফলে কল্পবিজ্ঞানের জৌলুস উপন্যাসে যত তীক্ষ্ণভাবে ধরা পড়েছে চলচ্চিত্রে তা অনেক কম প্রণিধানযোগ্য। স্মর্তব্য যে, সমকালের বর্ণময় সমাজ ভাবনা 'পাতালঘর' চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ বড় বেশি আদরের প্রতিফলন। এইভাবে বিজ্ঞান ও লোক জীবনের প্রচলিত প্রথাকে কল্পনার মিশ্রণে চলচ্চিত্রের আঙিনায় অতি চমৎকারভাবে পরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী 'পাতালঘর' ছবিতে উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং বলতে পারি, এখানেই ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি জগতে মুন্সিয়ানা উজ্জ্বল দীপ্তিতে দীপ্তিমান ও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে 'পাতালঘর' সিনেমাতে।

প্রসঙ্গত, চলচ্চিত্র অত্যন্ত বাস্তবতার শরীর উপস্থাপন করে। কেননা, এই যন্ত্রনির্ভর শিল্পে ক্যামেরা হল কেন্দ্রীয়শক্তি। ক্যামেরায় যা ধরা পড়ে তার কোন বিকৃতি ঘটে না। কিন্তু, সাহিত্যের রচয়িতাগণ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে মূল বাস্তবতাকে কল্পনার রঙে উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রতিভাত করেন। এখানে পুরোপুরি বাস্তব সত্য প্রকাশ পায় না। যা'হোক, আমাদের এই আলোচনাপত্র সাহিত্য ও সিনেমার মধ্যেই আজ সীমাবদ্ধ। তাই এই দুই শিল্পরূপ নিয়ে সমালোচকগণ মন্তব্য করেছেন:

> সাহিত্যের কাছে থেকে চলচ্চিত্র কতখানি নেবে, কীভাবে নেবে, একেবারেই নেওয়া উচিত কি না এ জাতীয় বিতর্কে না জড়িয়ে আমরা যদি একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে প্রয়োজনে সাহিত্যের কাছ থেকে হাত বাড়ানোর অধিকার চলচ্চিত্র অর্জন করেছে উত্তরাধিকার সূত্রেই নয় শুধু, ঐতিহাসিক দাবির জোরেও।[৫]

এইসব বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে, 'পাতালঘর' চলচ্চিত্রের পরিচালক অভিজিৎবাবু কাহিনির কাল্পনিক প্লটগুলিকে নিষ্কাশন করে মূল নির্যাসকে সত্যতার অঙ্গনে হাজির করেছেন। সেইসূত্রে অনেক চিত্রসমালোচক এই ছবিকে অত্যন্ত দুর্বল গোত্রের বললেও আমার তা একবারও মনে হয়নি। বরং বলা যেতে পারে 'পাতালঘর' ছবির নির্দিষ্ট গতিপথের ধারাবাহিকতা এবং কাহিনির একমুখীনতা আমাদের মুগ্ধ করে।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, প্রথম সং, পঞ্চম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৩, “কিছু কথা”, ‘কিশোর উপন্যাস সমগ্র ১’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৩
২. ঐ, প্রথম সং, তৃতীয় মুদ্রণ,ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ‘কিশোর উপন্যাস সমগ্র ৩’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১৮৫
৩. তদেব, পৃ. ২০৬
৪. মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিশীথকুমার, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৫৯, ‘বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র’, কলকাতা, নাভানা, পৃ. ৯
৫. পত্রী, পূর্ণেন্দু, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬, ‘সিনেমা সংক্রান্ত’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ১০

পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের নিরিখে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' : একটি পুনঃপাঠ

অদিতি ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, খড়্গপুর- ২

সারসংক্ষেপ: সাহিত্য সমালোচনার রীতিতে তত্ত্বপ্রস্থান হিসেবে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বা Ecocriticism-এর উদ্ভব উত্তর-আধুনিক যুগে। এই সাহিত্যতত্ত্বের মূল নিহিত আছে পরিবেশের সঙ্গে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগসূত্রের মধ্যে। এর ভরকেন্দ্র অবশ্যই প্রকৃতি, তার চারপাশে থাকে প্রকৃতিলগ্ন মানুষ এবং তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত। আদতে সভ্যতার আগ্রাসন যখন থেকে উন্নতির নামে প্রকৃতি-পরিবেশের নির্বিচার ধ্বংসসাধনে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, ঘনিয়ে তুলেছে সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয়, তখন থেকেই ক্রমশ প্রকৃতি এবং মানুষের চিরন্তন সম্পর্ককে নতুন করে ফিরে দেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। সেই তাগিদ থেকেই মনন ও চিন্তনের বৌদ্ধিক জগতে পরিবেশবাদী সাহিত্যবীক্ষণের অনুপ্রবেশ। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এর চর্চা বিশ শতকের নয়ের দশক থেকে হলেও তার আগের নানাবিধ রচনায় এর সূত্র পাওয়া যায়। এমনকি তথাকথিত এই তাত্ত্বিক বিশ্বের বাইরে থেকেও ত্রিকালদর্শী সাহিত্যস্রষ্টার তৃতীয় নয়নে ধরা পড়ে মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থান থেকে আধিপত্যবাদের এই বদলাতে থাকা সমীকরণ। ভবিষ্যতে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর অনুসন্ধিৎসু মন সেই সৃষ্টির অন্তর-অন্দর থেকে খুঁজে পায় তত্ত্বের নির্যাস। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের নিরিখে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এর পুনঃপাঠ করলে এভাবেই ধরা পড়ে প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক এবং উন্নতির জাঁতাকলে তার অবনমনের বেদনালাঞ্ছিত ইতিবৃত্ত।

সূচক শব্দ: পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব, Ecocriticism, প্রকৃতি, আরণ্যক, অরণ্যনীতি, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র।

মূল আলোচনা:

সাহিত্য সমালোচনার রীতিতে তত্ত্বপ্রস্থান হিসেবে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বা Ecocriticism-এর উদ্ভব উত্তর-আধুনিক যুগে। এই সাহিত্যতত্ত্বের মূল নিহিত আছে পরিবেশের সঙ্গে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগসূত্রের মধ্যে। এর ভরকেন্দ্র অবশ্যই প্রকৃতি, তার চারপাশে থাকে প্রকৃতিলগ্ন মানুষ এবং তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত। আদতে সভ্যতার আগ্রাসন যখন থেকে উন্নতির নামে প্রকৃতি-পরিবেশের নির্বিচার ধ্বংসসাধনে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, ঘনিয়ে তুলেছে সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয়, তখন থেকেই ক্রমশ প্রকৃতি এবং মানুষের চিরন্তন সম্পর্ককে নতুন করে ফিরে দেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। সেই

তাগিদ থেকেই মনন ও চিন্তনের বৌদ্ধিক জগতে পরিবেশবাদী সাহিত্যবীক্ষণের অনুপ্রবেশ। Greg Garrard রচিত Ecocriticism এবং Cheryll Glotfelty ও Harold Fromm সম্পাদিত The Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology থেকে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাস সম্পর্কে নানা তথ্যের সন্ধান মেলে। কেবল তথ্যই নয়, এই তত্ত্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটিও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রাঞ্জল ভাষায়। এই গ্রন্থে স্পষ্টই জানানো হয়েছে 'Ecocriticism takes as its subject the interconnections between nature and culture-Specially the culture artifacts of language and literature. As a critical stance, it has one foot in literature and one other in land; as a theoretical discourse, it negotiates between the human and the nonhuman."[১] প্রকৃতি এবং মানুষের সম্পর্ক দেশ-কাল-সময়-লিঙ্গ-রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি সর্বোপরি ক্ষমতার তারতম্যে কীভাবে বদলে যেতে থাকে, তার রেখচিত্র অঙ্কনে এই সাহিত্যতত্ত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীন সভ্যতায় মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্ক মানুষের আধিপত্যবাদের দ্বারা চালিত ছিল না, বরং পারস্পরিক সহাবস্থানের নীতিতেই চালিত এই সম্পর্ক ছিল সহজ। পরিবেশবাদী তাত্ত্বিকদের মতে 'In contrast, for animistic cultures, those that see the natural world as inspirited, not just people, but also animals, plants, and even 'inert' entities such as stones and rivers are perceived as being articulate and it times intelligible subjects, able to communicate and interact with humans for good or ill.'[২] এই সহজ সম্পর্কে বিনষ্টির সূত্রপাত হয় শিল্প-বিপ্লব আসার পরে। মানব সভ্যতার উন্নতির স্বার্থে চিড় ধরে সহাবস্থানে। উন্নতির নামে নির্বিচার অত্যাচারে মেতে উঠে প্রকৃতি এবং প্রাণীকুলকে বিপন্নতার দিকে এগিয়ে দেয় মানুষ। প্রকৃতি এবং মানুষের এই দ্বৈত সম্পর্কের ধারায় এসে পড়ে শোষণ আর শাসনের নতুন সমীকরণ। কিন্তু প্রগতির রথের চাকায় সবকিছুকে গুঁড়িয়ে দিয়ে শেষরক্ষা হয় না। টান পড়তে শুরু করে সার্বিক জীবনধারণের সেই রসদগুলিতে, অর্থের বা উন্নতির বিনিময়ে যাদের ক্রয় করার ক্ষমতা মানুষের নেই। আত্মধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মানবজাতি তখন ফিরে দেখতে চায় তার সঙ্গে প্রকৃতির আদি সম্পর্কের মূলসূত্রটিকে। তারই ফলস্বরূপ Ecocriticism এর আগমন।

The Ecocriticism Reader থেকে জানা যাচ্ছে "Ecocriticism is the study of the relationship between literature and physical environment."[৩] ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Rachel Carson এর 'Silent Spring' থেকেই সচেতনভাবে এই পরিবেশবাদী সাহিত্যচর্চার ধারা শুরু হয় বলে সমালোচকরা মনে করেন। Western Literary Association এর একটি সমাবেশে ১৯৮৯

খ্রিস্টাব্দে Ecocriticism তত্ত্বটি সাহিত্য-সমালোচনার রীতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় The Association for the Study of Literature and Environment (ASLE), ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় Interdisciplinary Studies in Literature and Environment (ISLE)। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এর চর্চা বিশ শতকের নয়ের দশক থেকে হলেও তার আগের নানাবিধ রচনায় এর সূত্র পাওয়া যায়। এমনকি তথাকথিত এই তাত্ত্বিক বিশ্বের বাইরে থেকেও ত্রিকালদর্শী সাহিত্যস্রষ্টার তৃতীয় নয়নে ধরা পড়ে মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থান থেকে আধিপত্যবাদের এই বদলাতে থাকা সমীকরণ। ভবিষ্যতে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর অনুসন্ধিৎসু মন সেই সৃষ্টির অন্তর-অন্দর থেকে খুঁজে পায় তত্ত্বের নির্যাস। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের নিরিখে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এর পুনঃপাঠ করলে এভাবেই ধরা পড়ে প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক এবং উন্নতির জাঁতাকলে তার অবনমনের বেদনালাঞ্ছিত ইতিবৃত্ত।

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ সনের চৈত্রমাসে। প্রথমে প্রবাসী পত্রিকাতে ধারাবাহিক এবং তারপরে বই হিসেবে আরণ্যকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর উৎস হিসেবে আছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পটভূমি। পাথুরিয়াঘাটার খেলাত ঘোষের মালিকানার জঙ্গলমহালের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে ভাগলপুর-সার্কেলে কর্মরত বিভূতিভূষণের মননভূমিতে সেই অভিজ্ঞতা 'আরণ্যক'এর বীজ বপন করেছে। চলনের দিক থেকে চেনা উপন্যাস কাঠামোয় না পড়লেও স্রষ্টার মতে এটি ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরি নয়, উপন্যাস। 'আরণ্যক' এর সূচনায় আছে একটি প্রস্তাবনা। তার সূত্র ধরে ফ্ল্যাশব্যাকে স্মৃতিচারণ, যে স্মৃতি শেষাংশে আনন্দের নয়, দুঃখের। উপন্যাসের কথক সত্যচরণের হাত ধরেই সভ্যতার বিস্তারের নামে অর্থ আর ক্ষমতার কুঠারের নির্মম স্বার্থে বিনষ্ট হয়েছিল প্রকৃতির নিভৃত কুঞ্জবন। চাকরির খাতিরে এই অন্যায়ের শরিক হবার অপরাধস্খলনের জন্য তার অন্তর্জাত স্বীকারোক্তি হিসেবেই এর পরে মূল উপন্যাসের অবতারণা। সেই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে প্রকৃতি আর মানুষের সম্পর্কের নতুন নতুন মাত্রার উন্মোচন। লবটুলিয়া, ফুলকিয়া, নাড়া বইহারের অরণ্যানী এবং তার সঙ্গে জুড়ে থাকা মানুষের মিছিল সত্যচরণের জীবনদৃষ্টি বদলে দেওয়ার অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আপাতশান্ত ভঙ্গিতে প্রকৃতিকে স্পর্শ করে থেকেও মানবদরদী সত্যচরণের চোখ দিয়ে অরণ্যের পণ্যায়ন, ধনতন্ত্রের আগ্রাসন, সামন্ত ও ধনতান্ত্রিক ভূমিসম্পর্ক, ঔপনিবেশিক শাসকের মৌলিক অরণ্যনীতির অসামঞ্জস্য, আদিম সংস্কৃতির বিনষ্টি, অরণ্যানীর ভূমিপুত্রদের অসহায়তা, দুর্বলের ওপর সবলের শাসন-শোষণের স্বরূপ সম্পর্কে আভাস দিয়েছে আরণ্যক। এখানে আজও ভানুমতীর একটি চরম প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য হলেও সত্যচরণের মতই পাঠকের রসনা স্তব্ধ হয়ে যায়- 'ভারতবর্ষ কোনদিকে?'[৪]

'আরণ্যক' উপন্যাসের কথক সত্যচরণ একজন শিক্ষিত বাঙালি যুবক। প্রথমে অরণ্য জগতে সে বহিরাগত এবং প্রাথমিক পর্বে এই পরিবেশের প্রতি অপ্রসন্ন। স্থানীয় লোকেদের ভাষা, ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। ধীরে ধীরে সে পরিবর্তিত হয়েছে। অনুভব করতে সমর্থ হয়েছে প্রাণবান প্রকৃতি এবং আরণ্যক জীবনছন্দকে- "দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল।"[৫] কলকাতাবাসী যুবক এখানকার ভীষণ নির্জনতা এবং সম্পূর্ণ বন্য জীবনযাত্রার অসহনীয়তা কাটিয়ে উঠে প্রকৃতির সাহচর্যেই স্বাধীনতা এবং মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। প্রকৃতি এখানে মূল আখ্যানের প্রেক্ষাপট মাত্র নয়, সে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র। নিদারুণ গ্রীষ্ম, দিগন্তপ্লাবী বর্ষা, হাড়কাঁপানো শীত সত্যচরণের সহনক্ষমতার পরীক্ষা নিয়েছে অবিরত। আর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সত্যচরণ পেয়েছে অমূল্য সম্পদ-"প্রকৃতি তাঁর নিজের ভক্তদের যা দেন তা অতি অমূল্য দান।"[৬] তবে সত্যচরণ এও জেনেছে "প্রকৃতিকে যখন চাহিব, তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে, অন্য কোনো দিকে মন দিয়াছি যদি, অভিমানিনী কিছুতেই তাঁর অবগুণ্ঠন খুলিবেন না।"[৭] এই জীবনেই সে আরও উপলব্ধি করেছে মানুষ আর প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের সম্পূর্ণতাকে। আরণ্যকের পটভূমিতে উঠে আসা নানা মানুষ সত্যচরণের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। রাজু পাঁড়ে, ধাওতাল সাহু, ধাতুরিয়া, কুন্তা, মঞ্চী, মটুকনাথ পাঁড়ে, যুগলপ্রসাদ, ভেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের মত মানুষেরা এসেছে তাদের ছোট-ছোট চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার দিনলিপি নিয়ে। বিশেষত সৌন্দর্যপূজারী যুগলপ্রসাদ যেন এই অবশ্যম্ভাবী অরণ্য ধ্বংসের চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান প্রতিবাদ। তার স্বপ্ন এই পৃথিবীর বুকে সবুজের অভিযান অক্ষুণ্ণ রাখা। নিজের সমস্ত সামর্থ্য ব্যয় করে ভূস্বত্বহীন সেই যুগলপ্রসাদ লবটুলিয়া বইহারের বুকে বুনে দিতে চায় নতুন নতুন ফুলের আলপনা। ঔপনিবেশিক নীতি অনুযায়ী শিক্ষিত বলার মত ডিগ্রি তার নেই, কিন্তু তার এই দৈনন্দিন যাপনে মিশে থাকা সবুজের স্বপ্ন অরণ্যবিনাশের লোভী চক্রান্তের বিরুদ্ধে নিরুচ্চার স্লোগানহীন এক বিপ্লব।

এই আরণ্যক পরিবেশেই সত্যচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দী আর রাজকন্যা ভানুমতীর। অপরাহ্নের ছায়া ঘনায়িত মেঘে, শৈলশ্রেণির চূড়ায়, রোদে রাঙা প্রাচীন বটের মৌনমুখরতায়, গুপ্ত গিরিকন্দরে রাজ-সমাধিতে দাঁড়িয়ে সত্যচরণ প্রত্যক্ষ করেছে আর্য-আধিপত্যের চাপে সর্বহারা অনার্যের বিপর্যয়ের ইতিহাস। যারা পরাজিত তবু আদর্শহীন নয়। প্রান্তিক এই মানুষেরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানে না, তাদের সঙ্গে হওয়া ছলনা সম্পর্কে জানে না, এমনকি আলোকিত ভারতবর্ষের নাম পর্যন্ত জানে না। ছলনার গতিবিধি সম্পর্কে অজ্ঞ বলেই শাসকের অরণ্যনীতির মৌলিক অসামঞ্জস্যে বিপন্ন তাদের বাসস্থান, বিলুপ্তপ্রায় তাদের সংস্কৃতি। অরণ্য-রমণীরা তাদের সারল্যে সত্যচরণকে মুগ্ধ করেছে। ভানুমতীর আদিম নারীসত্তা সংস্কার ও বন্ধনের চাপে মূর্ছিত নয়। মঞ্চীর মধ্যে যেন স্বয়ং বনলক্ষ্মী

আবির্ভূতা। কিন্তু সকলেরই ভাগ্যে প্রতারণা আর নির্বাসনের ললাটলিপি। প্রাচীন বনভূমির বিনাশের পাশাপাশি প্রাচীন সারল্যেরও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন। উন্নতির নামে প্রকৃতিধ্বংসের এক জটিল রাজনীতি বর্তমানে পরিবেশবাদীদের ভাবিত করেছে। কিন্তু সমকালে কোন বিশেষ মতবাদের শরিক না হয়েও বিভূতিভূষণ তাঁর মাউথপিস ক্যারেকটার সত্যচরণের মুখ দিয়ে ধনতন্ত্রের ন্যায্যতা বিষয়ক প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন- "মানুষ কি চায়— উন্নতি না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে?"[৮] মানবদরদী বিভূতিভূষণ 'আরণ্যক'এ শান্ত, মন্থর গতিতে বয়ে চলা জীবনপ্রবাহের মধ্যে দিয়েই দেখিয়েছেন মানুষের খাদ্যের মত মৌলিক চাহিদার সংস্থানের মধ্যে নিহিত থাকা অসাম্যকে, জাত-পাতের ব্যবধানকে। যেখানে ভাত বড়লোকের খাবার। তাই বিনা নিমন্ত্রণে একমুঠো ভাত খেতে পাওয়ার আশা নিয়ে কাছারিতে উপস্থিত হয় দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মানুষগুলো। অথবা কাছারির পুণ্যাহ উৎসবে চীনা ঘাসের দানা, টক দই, ভেলিগুড়, লাড্ডুর আয়োজন থাকলেও জাতে দোসাদ হবার অপরাধে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে তিনটি স্ত্রীলোককে শিশুদের নিয়ে ভিজতে হয়, পাতে কেবল চীনারের দানা নিয়ে। আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পেটভাতা এবং মজুরি-দাসত্বের বিষয়টিও তাঁর নজর এড়ায়নি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই উপন্যাসে সূচনা থেকে সমাপ্তিতে সুপ্রাচীন অরণ্যানী বিনাশের আশঙ্কার বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়েই ব্যক্ত হয়েছে ভবিষ্যতের পৃথিবীর মুষলপর্বের ইতিকথা। অরণ্যের পণ্যরূপ এখানে স্পষ্ট। ধনতন্ত্রের আগ্রাসনে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের শ্রম দুইই এখানে বিক্রয়যোগ্য। রাষ্ট্র ব্যক্তিমালিকানা আরোপ করে অরণ্যসন্তানদের বাঁচার উৎস থেকে সুকৌশলে তাদের বঞ্চিত করছে। মানুষ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি থেকে। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রকৃতির সঙ্গে তার লগ্নতাকে ভুলিয়ে দিয়ে তার বৈরিতাকে আরও প্রকট করে তুলছে। সত্যচরণ যে ভেবেছিল "এমন সময় হয়তো আসিবে দেশে যখন মানুষ অরণ্য দেখিতে পাইবে না। শুধু চাষের ক্ষেত আর পাটের কল; কাপড়ের কলের চিমনি চোখে পড়িবে",[৯] তার অন্যথা হয়নি। এমনকি তার ঐন্দ্রজালিক কুহকিনী আশার ছলনায় ভোলা মন যে ভেবেছিল নাড়া, ফুলকিয়া বইহার গেলেও মহালিখারূপের পাহাড় বা ধন্‌ঝরি পাহাড়ের বনভূমি হয়তো অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে অনাগত দিনের জন্যে, তার সে আত্মপ্রতারক আশাই বরং ভবিষ্যতে ভ্রান্ত প্রমাণ হয়েছে তার উত্তরপুরুষদের প্রকৃতিনাশী ক্রিয়াকলাপে। 'আরণ্যক'এ জঙ্গলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মুনাফালোভী একপাক্ষিক প্রতিক্রিয়াশীল অরণ্যনীতির অংশীদার ছিল জমিদার, ইজারাদার, মুৎসুদ্দি থেকে ব্রিটিশ শাসক সকলেই। সত্যচরণের চাকরির শর্তই ছিল এই জঙ্গলমহালের বিলিব্যবস্থা করে রাজস্ব আদায়ের পথ প্রশস্ত করা। ক্রমশ এই অরণ্য এবং আরণ্যক মানুষগুলোকে অন্তর থেকে ভালোবেসে ফেললেও তার সাধ্য ছিল না এই অরণ্যবিনাশ রোধ করে ভূমিপুত্রদের হৃত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার। অর্থের বলে জমির মালিকানা লাভ করা জমিদার বা ইজারাদার থেকে শুরু করে

মধ্যসত্ত্বভোগীদের লাঠির জোরের সামনে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়ে অরণ্যের আদি অধিবাসীরা উৎখাত হয়ে যাচ্ছিল তাদের নিজেদের আজন্মের ঠিকানা থেকে। ম্যানেজার সত্যচরণের সীমাবদ্ধ প্রতিরোধ সত্ত্বেও লুণ্ঠিত হচ্ছিল অরণ্যমাতা এবং অরণ্যরমণীরাও। এই আশ্রয়হীন মানুষগুলোর জন্য দরদ অনুভব করলেও সীমিত ক্ষমতায় সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ সম্ভব ছিল না সত্যচরণের পক্ষে। নিজের হৃদয়ের নির্দেশের ওপরেও ছিল অন্নদাতা প্রভুর আদেশ। 'মোটা সেলামী' ও 'বর্ধিত হারে খাজনার লোভে' গৃহহীন, আশ্রয়হীন পুরনো প্রজাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নতুন প্রজাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার নির্দেশনামা। যা দীর্ঘদিন অগ্রাহ্য করার শক্তি সত্যচরণের ছিল না। হৃদয়ের দাক্ষিণ্যে দু'এক জনকে প্রথাগত ভূমি-সম্পর্কের বাইরে জমি দিলেও মূলত ধনতান্ত্রিক নগদ-সম্পর্কে জমির বিলিব্যবস্থারই ব্যাপ্তি বিস্তৃত হচ্ছিল সত্যচরণের চোখের সামনে, তারই হাত ধরে। লাঠি, বন্দুক, অর্থের জোরে রাজপুত ইজারাদার, ভূম্যধিকারী রাসবিহারী সিং, ছটু সিং, নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালাদের ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল। পীড়িত হচ্ছিল দরিদ্র, ভূমিহীন অরণ্যজীবী মানুষগুলো। তার চোখের সামনে নিঃশেষ হয়ে গেল প্রকৃতির অতুলনীয় সৌন্দর্যসম্ভার, গজিয়ে উঠতে লাগল নোংরা ঘিঞ্জি বস্তি, তার মধ্যে অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ঘরবসত তৈরি করল কলেরা, বসন্তের মড়কের সম্ভাবনা, হতভাগ্য গাঙ্গোতাদের উন্নতি বলতে এই। অথচ হাজার বিঘা জুড়ে নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদনের ভবিষ্যৎ পরিণাম অনাবৃষ্টি বা খরা, প্রগতির ভারে মানুষের নিজের মৃত্যুশয্যা রচনা। সত্যচরণ জানত সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীকে শিখিয়েছে বিপুল আস্ফালনে, শক্তি ও ক্ষমতার মদমত্ততায় নিজের চাহিদা এবং অধিকৃত স্থানকে আরও বাড়িয়ে তোলার, দখলদারির দাপটে দুর্বলকে কোণঠাসা করার নিপুণ কৌশল। হিংসা, বিষ আর স্বার্থপরতায় তাড়িত আত্মকেন্দ্রিক মানবজাতি নিজের চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ এবং অন্তঃস্থ মনুষ্যত্বকে বিনাশ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থতাই নিয়তি জেনে নিরুপায় মধ্যবিত্ততায় নিরাপদ বৃত্তে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর কী বা করার ছিল তার! এদের সকলকে অরক্ষিত রেখে আসার অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে সংবেদনশীল সত্যচরণ প্রত্যাবর্তন করেছিল নগরে। এই কাহিনির এখানেই সমাপ্তি, আবার পরিবেশবাদী দৃষ্টিকোণে এখান থেকেই হয়তো এক নতুন সূচনাও বটে। 'আরণ্যক'-এর স্রষ্টা প্রকৃতিমুগ্ধ বিভূতিভূষণ সাহিত্যজগতে ছিলেন একক যাত্রী। নিজস্ব প্রতিষ্ঠানভূমিতে তাঁর অধিষ্ঠান ছিল অবিচল। প্রকৃতি তাঁর জীবনদর্শনের কেন্দ্রকোরক। তিনি অনুভব করেছিলেন প্রকৃতি আর মানুষ যুক্ত হয়ে আছে এক অন্তরতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কম্পনরেখায়। প্রকৃতিপ্রেম তাঁকে মানুষের কাছে টেনে এনেছিল, এইসব তথাকথিত নগণ্য মানুষদের মধ্যে তিনি অনুভব করেছিলেন প্রকৃতির সাহচর্যে অন্যরকম মহত্ত্বের দীক্ষাকে। আজ যখন প্রকৃতির ওপর নির্যাতন করতে করতে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন, তখন বর্তমান সময় আর মহাসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিবেশ এবং প্রকৃতির

বিপন্নতা নিয়ে বিশ্বব্যাপী দুশ্চিন্তার প্রেক্ষিতে আরণ্যকের গুরুত্ব আরও বেড়ে ওঠে। চারপাশের গোধূলিসন্ধির নৃত্যের মধ্যে উপনীত হয়ে মনে হয় 'আরণ্যক' পুনঃপাঠের সময় সমাগত।

তথ্যসূত্র:

১. Glotfelty, Cheryll, Fromm, Harold (Ed.), 1996, The Ecocriticism Reader: Landmarks in literary Ecology, Georgia, University of Georgia Press, p.xix

২. Ibid, p.15

৩. Ibid, p.xviii

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ভাদ্র ১৪১৫, আরণ্যক, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃ. ১৬৫

৫. ঐ, পৃ. ১৬

৬. ঐ, পৃ. ৬৪

৭. ঐ, পৃ. ৬৪

৮. ঐ, পৃ. ১৬৬

৯. ঐ, পৃ. ১৬৪

পারস্পরিক সম্পর্কের ভাষা : বিষয় ও বৈচিত্রতার নিরিখে

স্বপন সুতার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ভাষা হল সম্পর্ক ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। এক বা একগুচ্ছ শব্দ ও লিখিত প্রতীক, আবার কখনও শুধুমাত্র অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সঙ্গে মনের ভাব বিনিময় করে থাকে। তবে এই শব্দ এবং লিখিত প্রতীক বা অঙ্গভঙ্গি সর্বত্র যে এক নয় তা স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়। ভাষার এই ভিন্নতার একটি অন্যতম প্রধান কারণ হল পারস্পরিক সম্পর্ক। সমাজে সম্পর্কের শেষ নেই। ভাইবোন, বন্ধু, শত্রু, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রেমিক-প্রেমিকা, কর্মী, নিত্যযাত্রী, অভিজাত-অনভিজাত এ ধরনের নানা সম্পর্ক থাকে সমাজে একে অপরের। সম্পর্কের বৈচিত্রের কারণে ভাষাতেও আসে একাধিক পরিবর্তন। প্রতিনিয়ত সমাজে একে অপরের সঙ্গে নিত্যনতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেমন বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রেমিক-প্রেমিকা, নেতা-নেত্রী-জনগন, ক্রেতা-বিক্রেতা, মালিক-কর্মী, অভিজাত-অনভিজাত, সমালোচক, সমকামী ইত্যাদি। দেখতে গেলে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের কোনও না কোনও সম্পর্ক রয়েছে। সকলের সঙ্গে ভাষা আলাদা। অর্থাৎ যাকে রেজিস্ট্রার চেঞ্জ বলা হয়। এর প্রধান কারণ সম্পর্ক। সম্পর্ক এক থাকলেও আবার স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তা পরিবর্তিত হয়। যেমন আগে যে ধরনের বাক্য ব্যবহৃত হত আধুনিক সম্পর্কে তা পরিণত হয়েছে একটা ইমোজি কিংবা কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অক্ষরে।

সূচক শব্দ: ভাষা, পারস্পরিক সম্পর্ক, রেজিস্ট্রার চেঞ্জ, ভাষা বৈচিত্র, প্রণয়ের ভাষা, ইঙ্গিতের ভাষা, সংকেতের ভাষা।

মূল আলোচনা:

বাংলা ভাষার নানা ছাঁচ নানা ভঙ্গি। ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফুটে ওঠে। সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের কোনও শেষ নেই। রক্তের সম্পর্ক তো আছেই এ ছাড়াও প্রতিনিয়ত সমাজে একে অপরের সঙ্গে নিত্যনতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেমন বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রেমিক-প্রেমিকা, নেতা-নেত্রী-জনগন, ক্রেতা-বিক্রেতা, মালিক- কর্মী, অভিজাত-অনভিজাত, সমালোচক, সমকামী ইত্যাদি। মানুষ প্রতিনিয়ত ভিন্নভিন্নভাবে ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছে। কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষভাবে। ভাষার বৈচিত্র কেমন হবে তা নির্ভর করে বক্তার সামাজিক পরিচয়, সমাজে মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন এবং

তার মানসিক, শারীরিক পরিস্থিতির ওপর। এক একটি সামাজিক স্তরে বক্তা এক একরকমভাবে কথা বলে। শুধু বক্তাই নয় শ্রোতাও এই বৈচিত্রের অন্যতম নির্ণায়ক।

প্রথমে ধরা যাক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক। শিক্ষক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথপ্রদর্শক। তাদের ভাষা, কথা বলার ভঙ্গি, ব্যবহারের ধরন, ছেলেমেয়ের ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের উপস্থাপন কৌশল, বাচনভঙ্গি ও শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তেমনই ছাত্রছাত্রীদেরও ভাষাবোধ সম্পর্কে বেশ সচেতন থাকতে হয়। একজন শিক্ষার্থীর নিজস্ব ও পারিবারিক শিক্ষা-সংস্কৃতি ফুটে ওঠে তার ভাষার মাধ্যমে। এমন কী ছাত্রছাত্রীদের ভাষায় শ্রদ্ধা, বিনম্রতা ও স্বচ্ছতা না থাকলে শিক্ষকের সঙ্গে তথা সমাজের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে না। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যেও আবার আছে একাধিক স্তর। যেমন— প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। বয়স এবং শ্রেণির স্তর অনুযায়ী শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষা অনেকাংশেই নির্ভরশীল। ছোটদের ক্ষেত্রে শিক্ষক যেমন বাচ্চাদের মতন করে ছড়ার সাহায্যে অঙ্গভঙ্গি করে পড়া বোঝান, উঁচু শ্রেণির ক্ষেত্রে তার ভাষা হবে আবার অন্যরকম। সেখানে তিনি আবার যথেষ্ট ব্যবহারিক প্রকৃতির। যেমন কোনও শিক্ষক যদি কোনও বইয়ের বিষয় গুরুগম্ভীর ভাষায় গড় গড় করে পড়িয়ে যান তবে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর কাছে তা বুঝতে পারা শ্রমসাধ্য হয়ে উঠবে। কিন্তু তিনি যদি যথেষ্ট সহজ সরল ও বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে বোঝান তবে তার ক্লাসটা তাদের কাছে বেশ লোভনীয় হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন হাওয়া খেলে পেট ভরে না, আহার করলে পেট ভরে কিন্তু আহারটা হজম করার জন্য হাওয়া খাওয়াও দরকার। কথাটা এক্ষেত্রেও যথার্থ খাটে। কোনও বিষয় বোঝানোর জন্য একজন শিক্ষক শুধু পাঠক্রমের ভাষাগুলোকে ব্যবহার করলেই তা যথেষ্ট নয়। যেমন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক খানিকটা বন্ধুর মতো। শিক্ষক পড়াশোনার বাইরেও অনেক ধরণের আলোচনা যদি করে থাকেন যেমন— 'কী রে মেয়েটি তোর প্রোপজাল একসেপ্ট করল?' কিংবা 'চল একটু চা খেতে খেতে গল্প করি।' এই ভাষা বন্ধুত্বের। সেক্ষত্রে শিক্ষকের দেওয়া উপদেশ সে কখনওই অগ্রাহ্য করতে পারবে না। এ কারণেই শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সুসম্পর্কের জন্য পাঠক্রমের বহিরাগত, ভাষাগত ও বিষয়গত উপকরণ একান্ত প্রয়োজনীয়। এক একরকম শিক্ষকের ভাষাবোধ এক এক রকমের হয়ে থাকে। যেমন কোনও শিক্ষক শুধুই পড়িয়ে যান, আবার কোনও শিক্ষক পড়ানোর পর পরই বলেন, 'বুঝেছিস তো?' যা ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক জড়তা কাটিয়ে স্বতঃস্ফূর্তি সম্পর্ক তৈরি করতে সহায়তা করে। আবার শিক্ষক যদি রূঢ় প্রকৃতির হন তবে ছাত্রদের ভাষাতেও আসে নানা কৃত্রিমতা। যেমন— 'বেশি জিজ্ঞেস করিস না। স্যার খিচ খেয়ে যাবে।'

ভাষার গঠনগত ও ভঙ্গিগত দিক সবক্ষেত্রে সমান নয়। শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যেকার সংলাপ যে ভাষায় হবে, বন্ধুদের ভাষা নিশ্চয়ই তা হবে না। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে বন্ধুদের মধ্যেও আবার বয়সভেদে অথবা স্থান, কাল, সংস্কারভেদে ভাষা

পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। যেমন শৈশবে যখন বন্ধুরা একসঙ্গে গল্প করে তখন কার কাছে কী খেলনা আছে, কার ক'টা নতুন জামা, কার মা বাবা বেশি ভালবাসে এ সব নিয়ে কথাবার্তা হয়। নতুন খেলনা দেখলেই বলে, 'কী সুন্দর রে, আমাকে দিবি এক দিন খেলব।' এ সময় ভাষার গঠনগত দিক অনেক সময় সুসজ্জিত থাকে না। আবার যখন তারা শৈশব অতিক্রম করে বয়ঃসন্ধিতে পড়ে তখন তাদের মধ্যে ভাষার গঠন ও বিষয় বৈচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। এখানেও আবার লিঙ্গভেদে ভিন্ন ভাষা লক্ষ্য করা যায়। মেয়েদের ও ছেলেদের ভাষা পৃথক হয়। "পুরুষের এমন কিছু নিজস্ব অভিবাচন (expression) আছে যা নারীরা বোঝে কিন্তু নিজেরা তা কখনো বলে না। অপরদিকে নারীদেরও কিছু নিজস্ব শব্দ এবং পদচয় (Phrase) আছে, যা পুরুষেরা কখনো ব্যবহার করে না, ব্যবহার করলে হাস্যাস্পদ বলে বিবেচিত হবে। এভাবে তাদের কথাবার্তায় এমনটি মনে হয় যে নারীরা পুরুষদের থেকে আলাদা কোনো ভাষা ব্যবহার করছে।" ছেলেবন্ধুরা যেমন বলে, 'ভাই কেমন আছিস?' উত্তর আসে, 'বিন্দাস আছি'। 'সকাল সকাল মাথা চাটিস না তো', 'মালটা(অপরবন্ধু) খিচ খেয়ে গেছে', 'ঝাঁট জালাস না', 'ওর সঙ্গে কে রে মালটা(মেয়ে)? নতুন গার্লফ্রেন্ড না কি।' এছাড়াও বিভিন্ন খিস্তি খাস্তা দিয়ে অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ করে থাকে। তবে আবার সম্ভ্রান্ত পরিবারের বন্ধুদের মধ্যে ভাষায় এতটা অশ্লীলতা দেখা যায় না। সেখানে খানিকটা সংযমতা লক্ষণীয়। আবার মেয়ে বন্ধুরা যখন কথা বলে বেশিরভাগটাই বেশভূষা কেন্দ্রিক কথোপকথন হয় অথবা বয়ফ্রেন্ড নিয়ে কথাবার্তা চলে। যেমন— 'বাহ! তোর ড্রেসটা তো খুব সুন্দর। কোথা থেকে কিনলি রে?' তবে যৌবনে বন্ধুদের যেমন ভাষা বার্ধক্যের আবার তেমন নয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ক্ষেত্রে আসে মার্জতা। যখন ছোকড়াদের দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ হয় বলে, 'কী রে শালা, কোথায় ছিলিস?', 'আরে হারামি কখন আসবি?' এ ধরনের খিল্লি যুক্ত ভাষা বার্ধক্যের বন্ধুদের মধ্যে দেখা যায় না। তখন দেখা হলে হেসে সম্মোধন করে অথবা বলে 'কী রে ভাল আছিস? অনেকদিন পর দেখা।' বর্তমানে বন্ধুদের ভাষা বিনিময়ের অপর একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া। সেখানে তারা বিভিন্ন রকম স্ট্যাটাস, স্টিকার, ইমোজী ও ছবির মাধ্যমে মনের ভাব বিনিময় করে থাকে। যেমন— যখন কেউ খুশি থাকে তখন বন্ধুদের শেয়ার করে 'feeling happy' এবং পাশে হাসির ইমোজী। এভাবেই বন্ধুদের মধ্যে ভাষার বিস্তর বৈচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। আবার মন খারাপ হলে স্ট্যাটাস দেয় কোনও দুঃখের ছবি কিংবা শেয়ার করে 'feeling sad' আর সঙ্গে থাকে কান্নার ইমোজী।

পরিবারের কথা বলতে প্রথমেই বলা দরকার সেখানে পিতা, মাতা, সন্তান, দাদু, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, ভাই, বোন, কাকা, জেঠু প্রভৃতি একাধিক সম্পর্ক রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্তার সময় ভাষাও এক রকমের হবে না। পরিবারের পৃথক পৃথক সম্পর্কের ভাষাও পৃথক হয়ে থাকে যেমন—ভাই-বোনের কথা বলতে প্রথমেই মনে পড়ে অপু-দুর্গার কথা। সুখ-দুঃখে, আপদে-বিপদে কেউ কারও

সঙ্গ ছাড়েনি। আমের কুশি জারানো, ঝড়ে আটকে যাওয়া কিংবা মায়ের কাছে মার খাওয়া সবক্ষেত্রেই ওদের বন্ধুত্ব যেন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দিদির কানে যখন ভাই 'পিদিমের তেল' লাগিয়ে দিতে চায় দুর্গার সব অভিমান, ব্যথা যেন নিমেষে বিলীন হয়ে যায়। দুর্গা যখন এই মাঠ, বন, খাল, বিল, আমতলা থেকে চিরকালীন বিদায় নিল, তখন যেন ভাই দিদির পরিপূরক কিছু খুঁজে পেল না। তার জগৎ হয়ে উঠল নিঃসঙ্গ, বিমর্ষ। ভাই-বোনের সম্পর্ক চিরকালই যেন এমনটাই। ভাষা হয়ে ওঠে সেখানে একান্ত আপন। ভাষা কখনও ঝগড়ার, কখনও অভিযোগের, কখনও ব্ল্যাকমেইলের, কখনও আবার ভালবাসার। যেমন— 'মা দেখ, দিদি আমার পেন নিয়ে নিয়েছে', তেমনই দিদি আবার বলে, 'তুই দিবি না কি মাকে বলে দেবো', 'অনেক পড়েছিস, আয় তোর মাথা ম্যাসাজ করে দিই।' কখনও দাদা আবার শাসন করে বলে, 'তোর সঙ্গে ছেলেটা কে ছিল রে?' ভাই-বোনের সম্পর্কের এই বৈচিত্রতা ভাষার মাধ্যমে আরও মধুর হয়ে ওঠে।

সন্তানের কাছে এ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশ্রয় পিতা-মাতা। বয়সের বিভিন্ন ধাপে পিতা-মাতা ও সন্তানের ব্যবহারেও ভাষায় আসে নানা পরিবর্তন। শৈশবে সন্তানদের প্রতি মা বাবার ভাষায় একটা কোমলতার আবরণ লক্ষ্য করা যায়। তারা শিশুদের মতোই নকল করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলে থাকেন। যেমন— 'তি লে আমার খোকন তি তরে', 'দাদ্‌দা কই?', 'ভয়, জুজু, যায় না বাবা।' এ ছাড়াও একাধিক ছড়ার মাধ্যমে বা গল্পের ছলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলে। সন্তান যখন বয়ঃসন্ধিতে যায় তখন মা-বাবার কথার মধ্যে যেন একটু শাসন থাকে। একই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের ভাষাতেও আসে কিছু অস্বাভাবিক উগ্রতা। যেমন— 'কী রে তোর বাবা দেখল আজ ছুটির পর তুই বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরছিলি। কী ব্যাপার! বড্ড বার বেড়েছো মেয়ে।' প্রত্যুত্তরে মেয়ে বলে, 'ধুর বকবক করো না তো। কি হয় একটু ঘুরতে গেলে, আমি কি এখন ছোট নাকি?' এ উগ্রতা আবার কিছু বছর পর থাকে না। সন্তানের কথাবার্তায় তখন সংযমতা আসে, আসে ভাষার সূক্ষ্ম বোধ। আবার বাবা-মা বার্ধক্যে উপনীত হলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলে মেয়ের ব্যবহার পিতা-মাতার মতো যত্নবান। শাসন করে, যত্ন নেয়, ভাল খারাপ যুক্তি দেয়। যেমন— 'বাবা বয়স হয়েছে তোমার। তোমায় না বলেছি একা একা না বলে কোথাও বেড়োবে না।' কিছুক্ষেত্রে আবার দেখা যায় ভাষার ভয়ঙ্কর রূপ যখন সন্তানের কাছে পিতা মাতা বোঝা হয়ে ওঠে 'মেলা প্যান প্যান করো না। বয়স হয়েছে যেটা বোঝো না সেটা কেন বলো? চুপ করে থাকতে পারো না।' অথবা বৌমা যখন বলে, 'বয়স হচ্ছে আর তোমার বাবার খাই খাই স্বভাব দিন দিন বাড়ছে।' তখন এ ভাষার যন্ত্রণার কাছে যেন সন্তানকে কোলে পিঠে মানুষ করার স্নেহের ভাষাও পরাজিত হয়।

দাদু-ঠাকুরমা ও নাতি-নাতনীর সম্পর্ক চিরকালই বেশ মজার। ঠাট্টা, রসিকতা, স্নেহ বিনিময় এ সম্পর্কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই এর প্রভাব ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। যেমন নাতি ঠাকুরমাকে বলে, 'ও বউ কি কর?' অথবা দাদু যখন বলে, 'কি

গো দাদুভাই, নাতবউ খুঁজবো নাকি?' এসব খিল্লি, প্রহসনের মধ্যে বেঁচে থাকে দাদু-নাতির স্নেহের সম্পর্ক। ভাষার গুরুত্ব যেখানে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। এ যেন এক উপলব্ধির বিষয়।

ধ্বনি, শব্দ বা ভাষা এমন এক যানবাহন যাকে অবলম্বন করে খুব সহজেই পৌঁছানো যায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, আস্বাদন করা যায় এক অনুভূতি থেকে আর এক অনুভূতির। আর অনুভূতির যেক্ষেত্রে ভাষা সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল প্রণয়ের। ভাষার বৈচিত্রতা সূক্ষাতিসূক্ষ দিকগুলোও এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যখন প্রেমিকা বলে, 'আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না, তোমার কোনও কিছু উপকার করতে পারলে আমার নিজেরই ভাল লাগে।' ভালবাসার ভাষা হয় খানিকটা এরকমই। যেন তপ্ত রোদে এক শীতল স্নেহের ছায়া। আবার কখনও সেই ভাষাই হয়ে ওঠে আগুনের তপ্ত শিখা। 'কতো টাকা রোজগার তোমার? কতটুকু তোমার দাম?' প্রেরণার বদলে ভালবাসার মানুষটার থেকে শোনা এমন ভাষা মৃত্যুর থেকেও ভয়ঙ্কর।

আধুনিক সমাজে প্রণয় নিবেদনের ভাষা খানিকটা আলাদা। এখন মানুষ অনেক সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করে। যেমন— 'আমার সঙ্গে ডেটে যাবি?' কখনও আবার এক্ষেত্রে ইশারা বা ইঙ্গিতই হয়ে ওঠে প্রধান ভাষা। তবে ভালবাসার প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষাতেও বৈচিত্রতা দেখা যায়। সম্পর্কে ভালবাসা থাকলে ভাষা হয় মধুর। তখন কথায় কথায় সোনা, বাবু, জান বলে সম্বোধন করে আবার সেটি না থাকলেই গালি-গালাজে নেমে আসে, তা কখনও আবার ভয়ের ভাষার রূপ নেয় 'তুমি ছেড়ে দিলে মুখে অ্যাসিড মারবো' , 'তোমার নামে থানায় কমপ্লেন করব' ইত্যাদি। স্বামী-স্ত্রীর বাক্যালাপ থেকে ভাষায় কিছুটা ভিন্নধর্মীতা দেখা যায় বিবাহের পূর্বের প্রেমের মধ্যে। আবার পরকীয়ার ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার হয় পৃথক। পাত্র-পাত্রীর দেখাশোনার ক্ষেত্রেও ভাষা হয় অন্যধরনের। লজ্জা সেখানে প্রধান ভাষা। বিবাহের পূর্বে ভাষায় দেখা যায় নিরাপত্তাহীনতার ছাপ, সংযমবোধ ও আবেগজড়িত শব্দ। যেমন— 'হ্যাঁ গো, তোমার বাবা মানবে তো?', 'তুমি কখনও ছেড়ে চলে যাবে না তো আমায়?' বিবাহের পর ভাষার ছন্দ, ধ্বনি ও শব্দে আসে নানান পরিবর্তন। 'এই যে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ। বলি বাজার কে করবে? রান্না হবে কবে শুনি', 'তোমাকে চিনি না আবার, হাড়ে হাড়ে চিনি।' পরকীয়ায় আবার সম্পূর্ণ অন্যধরনের ভাষাভঙ্গি। গোপনীয়তা যেন সেখানে ভাষার মূল উপাদান। গলা চেপে কথা বলা, আড়চোখের চাউনি, অন্যমনস্কতার অছিলায় সন্তর্পনে ছুঁয়ে দেওয়া ভীরু আঙ্গুল। এভাবেই ক্রমশ তৈরি হয় পরকীয়ার নিজস্ব পরিভাষা। যাকে চাওয়া হয়নি তবু সে যেন এসে গেছে দুই নারী-পুরুষের মাঝে অবৈধ, সামাজিক অনুমোদনবিহীন কাজেই সে পারে না সোচ্চার হতে। একটা মিসকলের অপেক্ষায় কাটাতে হয় গোটা রাত্রি। আসলে পরকীয়ার জন্য কোন সঞ্চয় থাকে না আলাদা করে যা থাকে সবই ব্যবহৃত। এমন কী ভাষাও।

বর্তমানে প্রাসঙ্গিক হোক অথবা অপ্রাসঙ্গিক সকল আলোচনাতেই রাজনীতি আমন্ত্রিত। বাজারে, দোকানে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, অনুষ্ঠানে সবস্থানেই রাজনৈতিক আলোচনা তুঙ্গে। বর্তমানে প্রায় সবাই রাজনীতিবিদ। রাজনীতির ভাষা খানিকটা কেরোসিন তেলের মতো। ক্ষণিকের মধ্যেই তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায়, খবরের কাগজে ও টেলিভিশনে রাজনৈতিক ভাষার ব্যাপক চর্চা থাকার কারণে খুব সহজেই সর্বস্তরের মানুষের কাছে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন— 'দানা ভরে দেব।' এখানে দানা শব্দের মানে যে গুলি তা এত দিনে কেউ না জানলেও রাজনীতির সংস্পর্শে বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই জানে। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী বা কর্মীদের ভাষা আবার স্থান, কাল, পাত্রভেদে ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। যেমন কর্মীরা যখন জনসংযোগ করার উদ্দেশ্যে প্রচার করে তখন ভাষা একরকম। আবার যখন বিরোধীদের মুখোমুখি হয় তখন ভাষার উগ্রতা যেন ভবিষ্যৎ ভাবায়। 'আমাদের কর্মীর গায়ে একটুও আঁচড় পড়লে কেলিয়ে শ্মশান করে দেবো।' 'জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও!' আবার অনেক সময় কিছু কিছু সাধারণ কথা যেন দলের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। যেমন— 'খেলা হবে', 'জয় বাংলা', 'জয় শ্রী রাম'। এগুলো অর্থের দিক থেকে সাদামাটা শব্দ হলেও বিরোধী দলের সামনে বললে মুহূর্তেই তা হিংসার পরিপূরক হয়ে ওঠে। ঈশ্বরও যেন সেখানে নিতান্তই ছলের উপাদানমাত্র। রাষ্ট্রনেতাদের উদ্দেশ্য কেবল ছলে বলে কৌশলে জনমত তৈরি করা। তাই এ ভাষাতে মিথ্যা, চাটুকারিতা ও প্রতিশ্রুতি স্থান পেয়েছে। বন্ধুত্ব ও মানবিক ভাষা সেখানে অনেক আগেই হারিয়েছে।

সমাজে আরও একটা সম্পর্কের ক্ষেত্র ক্রেতা-বিক্রেতা। ক্রেতা বিক্রেতার নাম শুনলেই মনে আসে হাট, বাজার, দোকান, ফেরিওয়ালা প্রভৃতির কথা। এদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই একটি নিজস্ব ভাষারীতি রয়েছে। একজন ক্রেতা অথবা বিক্রেতার রোজকার জীবনের সঙ্গে ভাষার একাধিক বৈচিত্রতা জড়িয়ে আছে। কিছু কিছু শব্দও যেন বাজার, দোকানপাট এসবের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন— থলে, ফর্দ, হাইব্রিড, চালানি, লোকাল প্রভৃতি। বাজার অথবা দোকানপাট কিংবা ফেরিওয়ালাদের একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় উভয়ক্ষেত্রেই যেন ভাষার এক পৃথক পৃথক ছন্দ রয়েছে। যেমন বাজারে 'জলের দরে', 'আজকে কেনা দামে দিয়ে দেব', 'সস্তা হয়ে গেল', 'খুব টাটকা', 'মাত্র আর কজন।' 'পেয়ারা বাগানে জল ঢুকে গেছে' এইসব কথাগুলো ছন্দের রূপে যেন সুর করে বেজে ওঠে। শুধু বিক্রেতা নয় ক্রেতাদের ভাষার বৈচিত্রতাও বেশ লক্ষণীয়। যত সস্তাই হোক না কেন ক্রয়ের শেষে বলবেই 'কত দেব?', 'বাবা এত দাম গলা কেটে নেবে নাকি!', 'সবজি বাজারে যেন আগুন।' আবার বেশি দরাদরি করলেও প্রত্যুত্তরে আসে, 'মাগনা নাকি?' এরপরেও ঘ্যানঘ্যান করলে বলে বসে, 'যান বিক্রি নেই।' দোকান বা ফেরিওয়ালার আবার ভিন্ন সুর। মুদি দোকানে মাঝে মধ্যেই শোনা যায় দোকানদারের কণ্ঠে নানা সুরের গান। আবার কখনও শুধু গুনগুন অথবা ক্রেতা বিক্রেতার চরম আড্ডা। যে কোনও একটি বিষয় উপস্থাপিত

হলেই হল যেন কেরোসিনে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। ফেরিওয়ালারা আবার হাঁকতে হাঁকতে যায় ‘হরেক মাল ১০ টাকা।’ এখন আবার নতুন ট্রেডিশন। ফুচকা, ফেরিওয়ালা, ঘটিগরম ইত্যাদি বিক্রেতারা মুখে উচ্চারণ করে না। ঘন্টা, গান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ভাষা ব্যক্ত করে। শপিং মলে আবার বিক্রেতাদের সরাসরি কিছু বলতে দেখা যায় না। সেখানে আবার বড় বড় পোস্টারে লেখা হয় ‘Buy 1 Get 1 Free’, ‘50% off’, ‘Offer is for Today, Hurry up’ অথবা শপিং মলের ভেতরে মাইকে চলতে থাকে প্রচার ‘আজকে জিনস্ প্যান্টে পেয়ে যান আকর্ষণীয় ছাড়’, ‘টি-শার্ট নিয়ে যান একটির সাথে একটি ফ্রি’, ‘কোল্ড ড্রিঙ্কস্-এ রয়েছে ৩৫% ছাড়।’

সারাদিন এক কথা কয়েকশোবার হয়তো আমরা বলতে পারব না, বলার প্রয়োজনও পড়ে না। কিন্তু ভিক্ষুকরা কিছু নির্বাচিত ভাষার মাধ্যমেই প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। ভিক্ষুকেরও আবার শ্রেণী অনুযায়ী ভাষার ব্যবহারে বৈচিত্রতা দেখা যায়। যে অন্ধ সে গান করে বা এক কোনায় বসে ‘বাবু দাও না’ জপ করতে থাকে। যে আবার বোবা তার প্রধান ভাষা দেহভঙ্গি তথা বিভিন্ন ইশারা। কেউ কেউ আবার তাদের ভিক্ষা চাওয়ার প্রধান ভাষা করে তোলে তাদের পঙ্গুত্বকে। এদের মধ্যে যারা আবার শিশু তারা লোকেদের হাতে পায়ে ধরে। মাঝেমধ্যে হাসে খেলে কখনও হাত দিয়ে ইশারা করে টাকা চায়। প্রত্যুত্তরে সাধারণ মানুষের ভাষা কখনও হয় স্নেহের কখনও বিরক্তির আবার কখনও রাগী ধরনের। যেমন কেউ বলে, ‘টাকা হবে না, কী খাবি বল। কিনে দিচ্ছি।’ কেউ আবার বলে, ‘সর সর, কেটে পর এখান থেকে।’ কেউ বিরক্ত হয়ে বলে, ‘উফ্, এদের জ্বালায় রাস্তায় বেরোনোরও উপায় নেই।’ কেউ বা আবার শুধু ঘাড় নাড়িয়ে নিঃশব্দেই বলে দেয় যে দেবে না বা নেই। হয়তো এই সমস্ত সম্পর্ক সমাজের নিতান্তই গৌণ বিষয়ের মধ্যে পড়ে তবু ভাষার যে প্রয়োগ বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে দেখা যায় তা অত্যন্ত বৈচিত্রময়।

অত্যাধুনিক সম্পর্কের ভাষায় প্রযুক্তি অনেক জরুরি। সাম্প্রতিককাল প্রযুক্তি নির্ভর। পারস্পরিক সম্পর্কেও যা গভীর ছাপ ফেলেছে। সেই সঙ্গে সে তৈরি করে ফেলেছে নিজস্ব এক ভাষাজগৎ। মানুষ এখন নতুন নতুন বিষয় ও ভাবনাকে প্রকাশ করতে চায় শর্টকাট পদ্ধতিতে। কত কম সময়ে কত বেশি কথা বলা যায় তাই যেন ইউজারদের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। ফলে ভাষাজগতে আবির্ভাব ঘটে চলেছে মনের ভাব প্রকাশের নিত্যনতুন কৌশল। আর সেই চেষ্টাকেই যেন সার্থক করে তুলেছে সোশ্যাল মিডিয়া। সম্পর্ক তৈরি হয় এখন প্রোফাইল দেখে কিংবা পোস্ট, কমেন্ট, ইমোজির মাধ্যমে। এটিই যেন এখনকার ভাষা। কেমন আছিস? এর উত্তর আসে কেবল একটি ইমোজি। এবং উভয়েই এতে সন্তুষ্ট। ভাষা বাংলা থাকলেও ফন্ট হয়েছে কখনও ইংরেজি কখনও কয়েকটি সিম্বল। মানুষ সামনাসামনি কথা বলার চেয়ে টেক্সট মেসেজ, ভয়েস বা ভিডিও কল, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইন্সটাগ্রামের চ্যাটে এখন বেশি

আগ্রহী। কয়েকটা সংকেত চিহ্ন সে ক্ষেত্রে খুব সহজেই কয়েকটি বাক্যের স্থান নিয়ে নেয়।

পরিবর্তনই জগতের নিয়ম। মানবসভ্যতা তার আদি খোলস ত্যাগ করে আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়েছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাষার নানা পরিবর্তনও ঘটেছে। কালে কালে তা বদলেছে, আবার স্থানে স্থানে, সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে, কাজকর্মের প্রকোষ্ঠে তা বদলায়, ভবিষ্যতেও বদলাবে।

তথ্যসূত্র:

১। নাথ মৃণাল, 'ভাষা ও সমাজ', প্রকাশকাল: ১৯৯৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৭

বঙ্গীয় কবিদের রূপকে প্রতিফলিত ধনী-দরিদ্র সম্পর্কের চিত্র

বিশ্বময় বেরা
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ,
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ - সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা হয়। কারণ সাহিত্যে সমকালীন সমাজের চিত্র নিহিত থাকে। প্রত্যেক কবি তার সমাজ সম্পর্কে সচেতন এবং সংবেদনশীল। তাই সমাজের বিভিন্ন প্রকার সদর্থক-নঞর্থক, গ্রাহ্য-ত্যজ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি সাহিত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করে থাকেন। সেরকম স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজের ধনী-দরিদ্র সম্পর্কের চিত্রও পরিবেশিত হয়েছে সমকালে রচিত রূপকসাহিত্যে এই অভিমত পোষণ করাই যায়। রূপকানুসারে একই বঙ্গভূমির বুকে, একই আলো-বাতাসে লালিত-পালিত হয়েও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই বিভেদের ধারা কেমন ছিল, অর্থনৈতিক বৈষম্য-সামাজিক বৈষম্য-মানসিক বৈষম্য উভয় শ্রেণীর মধ্যে কতটা ক্রিয়াশীল ছিল, কর্তৃত্ব-বশ্যতা-প্রভুত্ব-প্রবঞ্চনা-অবজ্ঞা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্র উন্মোচনের জন্য এই প্রবন্ধ নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছি। বঙ্গীয় সংস্কৃত রূপকগুলির সমীক্ষার মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র সম্পর্কের চিত্র উদঘাটন সম্ভব।
সূচক শব্দ - বঙ্গীয়রূপক, আধিপত্যবিস্তার, অধীনতা, অবমানা, হীনমন্যতা, শ্রেণীচেতনা, প্রবঞ্চনা।

ভুমিকা- ন্যায়ের দৃষ্টিতে এবং ধর্মের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষ মূলতঃ সমান হয়ে থাকে। ধনী এবং দরিদ্র নামে বিশেষ কোন সম্প্রদায় সমাজে বিরাজ করে না। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে সকল ভোগ্য বস্তু উপায় উপকরণের উপর নির্ভর করতে হয় মানুষকে। সেই উপায় উপকরণগুলো মানুষ তার যোগ্যতা অনুসারে অর্জন করে থাকে। এইসব অর্জিত উপাদানের পরিমাণের মালিকানার উপর মানুষের কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব-আধিপত্য প্রভৃতি নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তিতে প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করার সামর্থ্য থাকে, বা যে ব্যক্তি প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয় তাকে সাধারণত বিত্তবান বা সম্পদশালী ব্যক্তি বলা হয়। যে ব্যক্তি তা পারে না সে দরিদ্র ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন হয়। অথচ উভয় ক্ষেত্রের ব্যক্তিসকল একই প্রকৃতির বুকে পরিপালিত হচ্ছে। উভয়ের মধ্যেই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বিভেদ অনুভূত হয় এবং দৃষ্টিগোচরও হয়। এই বিভেদের কারণে একশ্রেণীর মানুষের দ্বারা প্রভাব বিস্তরণ, আধিপত্য বিস্তরণ, বঞ্চন, শোষণ, অবহেলন প্রভৃতি সম্পাদিত হচ্ছে কিনা, অপরদিকে অন্য আরেক শ্রেণী মানুষ প্রভাবিত, অধীনস্থ, অবহেলিত,

প্রবঞ্চিত, শোষিত প্রভৃতি হচ্ছে কিনা, এই সম্পর্কের দ্বারা বঙ্গীয়সমাজ কতটা প্রভাবিত হয়েছিল, সদর্থক ও নঞর্থক ভাব কেমন ছিল? এইসব বিষয়ের সামগ্রিক চিত্র উন্মোচনের জন্য ওই সময়ে কবিদের রচিত রূপকগুলির পর্যালোচনা প্রয়োজন।

বঙ্গীয় কবি বলতে মূলত বঙ্গপ্রদেশস্থ সংস্কৃত কবি। আধুনিক বঙ্গীয় সমাজ বা স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজের অঙ্গভূত অংশ 'ধনী-দরিদ্র সম্পর্ক' এখানে ইপ্সিত বিষয়। ওই সময়ে সংস্কৃত কবিদের রচিত রূপকগুলি এই প্রবন্ধ নির্মাণের জন্য কাঙ্ক্ষিত। রূপক বলতে নাটক, প্রকরণ, প্রহসন, ভাণ, বায়োগ, ডিম, অংক প্রভৃতি। শোধপ্রবন্ধ নির্মাণ হেতু কিছু বঙ্গীয় কবি এবং তাদের সংস্কৃত রূপক নির্বাচন করা হয়েছে এবং সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ রচিত পঞ্চাঙ্ক সমন্বিত 'বিষয়াকাঙ্ক্ষণং' নাটককে ধনি-দরিদ্র বৈষম্যের সুস্পষ্ট চিত্র উল্লিখিত। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে প্রকাশিত বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য-রচিত পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট 'শার্দূলশকটং' প্রকরণে এবং একাঙ্কবিশিষ্ট 'বেষ্টনব্যায়োগঃ' প্রহসনে সম্পদশালী শিল্পপতিদের অতিরঞ্জিত জীবন যাত্রা এবং দৈন্যপীড়িত শ্রমিকদের করুণ জীবন যাত্রা, অবজ্ঞা-বঞ্চনাময় অর্থোপার্জনের কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রীজীবন্যায়তীর্থের 'সাম্যসাগরকল্লোলং' নাটকে দরিদ্র-শ্রমজীবি মানুষের অর্থ উপার্জনের বিষাদগ্রস্ত কাহিনী, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে প্রকাশিত তাঁর একাঙ্কবিশিষ্ট 'দরিদ্রদুর্দৈবং' অপর প্রহসনে সম্পদশালী বণিকের ধনগত দাম্ভিকতা ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপার্জনের করুণ কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর একাঙ্কবিশিষ্ট 'বিবাহবিড়ম্বনং' প্রহসনে দাসী-কঙ্কের, ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রণবপারিজাতে প্রকাশিত তাঁর একাঙ্কবিশিষ্ট 'ক্ষুৎক্ষেমীয়ং' অপর প্রহসনে পাচক-ভৃত্য-দাসীর, ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশিত একাঙ্কবিশিষ্ট 'চিপিটকচর্বণং' তাঁর আরেকটি প্রহসনেভৃত্য-দাসী-মন্থরা-পঙ্গুরামের, ১৯৮৪ সালে গৌরী ধর্মপাল রচিত 'জননী' নাটকে দরিদ্র পরিচারিকার, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মঞ্জুষা থেকে প্রকাশিত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য রচিত দ্ব্যংকবিশিষ্ট 'অনুকূলগলহস্তকং' প্রহসনে রামাবতার-বিন্ধ্যাচলের, ১৯৫৯ সালে মঞ্জুষাতে প্রকাশিত অংকদ্বয়সমন্বিত তাঁর আরেকটি প্রহসন 'মণিকাঞ্চনসমন্বয়ং'- এ দরিদ্র শর্শরীক-দর্দূরকের লাঞ্ছনা-অবজ্ঞা-বঞ্চনাময় অর্থোপার্জনের কাহিনী বর্ণিত। রূপকগুলিতে উল্লিখিত প্রত্যেকটি নিম্নবিত্ত দরিদ্র চরিত্র স্ব স্ব কর্তব্যে দায়িত্বশীল ও নিষ্ঠাপরায়ণ। এখানে প্রত্যেকেই বহু কষ্ট করে উপার্জন করে পরিবারের ভরণ-পোষণের যোগান দেয়। প্রতিদিনের সংসার খরচ পরিচালনার জন্য সব সময় তারা চিন্তিত থাকে। বস্তুত এখানে একদিকে দুর্বিসহ জীবন যাপনের করুণ চিত্র বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে ধনী ব্যক্তিরা আড়ম্বর জীবনযাত্রা উপভোগ করে, সমাজের দরিদ্র নিম্নস্তরের মানুষের প্রতি দায়-দায়িত্ব বা কর্তব্য পরায়ণতার বিষয়ে তারা উদাসীন।

কর্তৃত্ববিস্তার - গৃহস্থালীর বিবিধ সাংসারিক কর্ম নিষ্পাদনের জন্য ধনী ব্যক্তিরা পরিচারিকা বা চাকর নিয়োগ করে থাকে। জননী-ক্ষুৎক্ষেমীয়ং-চিপিটকচর্বণং-অনুকূলগলহস্তকং-বিবাহবিড়ম্বনং-কাঞ্চনকঞ্চিকং এই রূপকগুলিতে চাকর-চাকরানির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল চাকর-চাকরানি প্রত্যেকেই দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ তাদের কাছে নেই। তাই তারা অর্থ উপার্জনের জন্য যেকোনো পরিস্থিতিতে যে কোন মূল্যে যেখানে খুশি সহজ ভাবে নিযুক্ত হয়ে যেতে পারত। ধনী ব্যক্তিরা তাদেরকে সেভাবেই নিযুক্ত করত। অর্থাৎ ভৃত্যদের প্রয়োজনীয়তা টাকে হাতিয়ার করে ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের ইচ্ছে মতো তাদের ব্যবহার করে। এই পরিচারিকা বৃত্তিতে অধীনতা-নিয়ন্ত্রণ-উপেক্ষা-অবমাননা-অপমান-অনাদর-স্বল্প পারিশ্রমিক প্রদান প্রভৃতি বিষয় নিহিত থাকে এটা জানা সত্ত্বেও তারা সেই কাজে প্রবৃত্ত হয়। মনিকাঞ্চনসমন্বয়-নাটকে এরকম কর্তৃত্ব বিস্তারের চিত্র দেখা যায়। সেখানে ধনপতি দশ টাকা বেতনের বিনিময়ে শর্শরীক এবং দর্দূরক নামক দরিদ্র ব্যক্তিকে চাকর হিসেবে নিযুক্ত করে -"এতদর্থং গ্রাসাচ্ছাদনাভ্যধিকং রূপ্যকদশকাত্মকং মাসিকং বেতনং প্রতিজনং প্রদেয়ম্। ব্যবস্থেয়ং যদি রোচতে ময়া সার্ধম্ আগম্যতাম্।"[১] স্বাধিকার পরিত্যাগ করে তারা ধনপতির কথা মত কাজ করে। না শুনলে কর্মহারা হতে হবে। এরকম চিত্র চিপিটকচর্বণেও দেখা যায়। সেখানে পঙ্গুরাম কপালীর যজ্ঞদ্রব্য বিনাশ করায় তাকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় - "অদ্য দাস্যাঃপুত্রং বিতাড়য়িষ্যামি।"[২] এইরকম আরো অনেক চিত্র শার্দূলশকট ও বেষ্টনব্যায়োগে দেখতে পাওয়া যায়। বেষ্টনব্যায়োগে শিল্পপতির কথা অনুসারে কাজ না করে আন্দোন করায় তাদের বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করে। একই কারণে শার্দূলশকটে কর্মীদের বেতন কেটে নেয়।[৩] বেষ্টন ব্যায়োগ নাটকে শিল্পাধীশগণ শিল্পালয়ে নিযুক্ত দরিদ্র শ্রমিকদের বেতনসংস্কার-ওভার ডিউটি-পারিশ্রমিক-মহার্ঘ ভাতা-সুচিকিৎসাপ্রদানরূপ বিবিধ আর্থিক সুবিধা না দিয়ে বঞ্চিত করে রেখেছে।[৪] অনুকূলগলহস্তকে গৃহকর্ত্রী যা আদেশ করে চাকরদেরকে তা মুখ বুজে পালন করতে হয়, এটা যামিনীর উক্তিতেই প্রতিভাসিত হচ্ছে- "যামিনী - মৌনমাশ্রিত্য মৎবচনং ক্রিয়তাম।"[৫] বেতন বাড়ানোর কথা বললে কেবলমাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। এরকম চিত্র বিবাহবিড়ম্বনে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে কঙ্ক নামক ভৃত্যের বেতন বৃদ্ধির আবেদনকে অজুহাত করে কাজে লাগিয়ে রতিকান্ত তাকে দিয়ে সকল কাজ করিয়ে নেয়, এটা রতিকান্তের উক্তিতে স্পষ্ট - "যদি ঘটকযত্নঃ সফলো ভবেত্ তে বেতনবৃদ্ধিরবশ্যং ভবিতা।"[৬]ধনী-দরিদ্র বিষয়ে ধনী ব্যক্তিরা কখনো কায়িক পরিশ্রম করে না, কিন্তু বিলাসবহুল জীবনযাপন করে। শ্রমিকরা, বিরামহীন ভাবে কায়িক পরিশ্রম করে যায় এবং কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ছুটি হয় না। তারা দুর্গম-ভয়ংকর স্থানে গিয়ে কার্য সম্পাদন করে - এর উল্লেখ শার্দূলশকটেও সাম্যসাগরকল্লোলে পাওয়া যায়।[৭] অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ধনী ব্যক্তিরা

অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে থাকে অর্থলোক ধনী ব্যক্তিরা শঠ আচরণের দ্বারা বলপূর্বক সবকিছু হরণ করে। ধনী ব্যক্তিদের এরূপ আচরণের দ্বারা সমাজে দৈনতা সংঘটিত হয়- "লুব্ধাস্তথাপি ধনিকাঃ খলবৃত্তিবশ্যা দৈন্যং নয়তি হি জনং বলকূট রিক্তম্।"[৮] বিষয়াকাঙ্ক্ষণং নাটককেও সমান চিত্র দেখা যায় - "অর্থবলেন সর্বং হি কর্তুমর্হো ধনী সদা দৃষ্টং প্রত্যক্ষতস্তত্তু সর্বৈর্নগরবাসিভিঃ।"[৯]

অবমাননা - ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে দরিদ্র ব্যক্তিদের সম্বন্ধ সাধারণত লাভ-ক্ষতির হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ধনী ব্যক্তিরা ধনী ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং সঙ্গতি বিধান করতে ইচ্ছা করে। এর কারণ হলো পারস্পরিক আর্থিক সমৃদ্ধি। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্বন্ধ যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক তাই তাদের সম্বন্ধ সুন্দর হয় না। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে যদি সুস্থ সম্বন্ধ স্থাপিত আর তাহলে ধনীর আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। কোন ধনী ব্যক্তি এটা চায় না। এইরকম চিত্র দরিদ্রদুর্দৈবে দেখতে পাওয়া যায়। দরিদ্র বক্রেশ্বর শর্মার জন্য ধনহানি হোক এটা বিত্তশালী বণিক চায় না। তাই তাকে উপেক্ষা করার জন্য সে শঠতার আশ্রয় নেয়। দরিদ্র বক্রেশ্বর শর্মা যাতে ধনপতির গৃহে গিয়ে ভিক্ষা যাচন করতে না পারে সেই ব্যবস্থা করেছিল ধনী ব্যক্তিটি। সে নিজের বাড়ির ঠিকানার ব্যয়সাপেক্ষ-বিস্তৃত-বিভ্রান্তিকর পথনির্দেশ দেয়।[১০] এরকম শঠতাচরণ অবমাননার নামান্তর। বেষ্টনব্যায়োগ ও শার্দূলশকট রূপকে সম্পদশালী শিল্পপতিরা দরিদ্র শ্রমিকদের সামান্য পারিশ্রমিকটাও কুকুরকে খাওয়ার দেওয়ার মতো তাদের মুখে ছুড়ে দেয় - "স্বল্পপারিশ্রমিকং দদাতি অস্মভ্যং যথোচ্ছিষ্টং কুক্কুরেভ্যো ভোগবিলাসিনঃ।"[১১] পল্লীকমলে কন্যাদর্শনের জন্য প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ও সম্পদশালী প্রভঞ্জন সপরিবারে ব্রহ্মপদের গৃহে আগত। তারা অর্থদম্ভবশত দরিদ্র ব্রহ্মপদ এবং তার পরিবারকে হেয় প্রতিপন্ন করে। ব্রহ্মপদের পরিবার সামর্থ্য অনুযায়ী অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাদের আতিথ্য সংবিধান করে। কিন্তু প্রভঞ্জনের পরিবারের তাতে রুচি হয় না। তারা অধিক বিলাসব্যাসনপূর্ণ আতিথ্য কামনা করে, তাই সপরিবার প্রভঞ্জন তাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং কটু ভাষায় তাদের অবমাননা করতে থাকে। বিলাসব্যসনপূর্ণ আতিথ্য সংবিধানে দরিদ্র ব্রহ্মপদ এর সমর্থ্য নেই এটা তারা এতটুকুও বোঝার চেষ্টা করেনি - "চণ্ড- (সরোষম্) ততঃ কথং ত্বমস্মান্ অত্র নিমন্ত্রিতবান্? অসীমা খলু তব স্পর্ধা! প্রভঞ্জন- দীনহীনক্ষীণজনানাং হস্তে অস্মাকং ঈদৃশী লাঞ্ছনা অসহনীয়ৈব। পারিষদঃ- (সদর্পম্) অস্মাকং বিশ্ববরেণ্যো রাজামহোদয়ঃ অসীম-কৃপাপরবশো ভূত্বা যুষ্মাকম্ ইদং পর্ণকূটীরং পদরজসা ধন্যং কৃবান্। ... পথিকুক্কুর আদ্রিয়মাণো মস্তকমারোহতি ইতি ।"[১২] কমলকলিকা ও রুপকুমারের সাক্ষাতে দ্বারা ঈর্ষান্বিত হয়ে বিত্তশালী মার্তন্ড দরিদ্র কন্যা কমলকলিকাকে দ্রোহাত্মক ভাষায় অবমাননা করে - "মার্তণ্ড- (হুঙ্কারৈ) তুচ্ছাতিতুচ্ছায়াঃ পল্লীবালায়াঃ ঈদৃশী স্পর্ধাঃ? অসহনীয়মেতত্। ভবতু, অহমপি জানে প্রতিহিংসাগ্রহণপদ্ধতিম্।"[১৩] দরিদ্র ব্রহ্মপদের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ

হয়ে মার্তন্ড তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়।[১৪] কর্তব্যে অবহেলা উপেক্ষা বা ভ্রান্তি হলে প্রভুরা ভৃত্যদের কঠোর ভাষায় তিরস্কারের সুরে অবমাননা করে। এইরকম অবমাননার চিত্র চিপিটকচর্বণং, জননী, মণিকাঞ্চনসমন্বয়ং, অনুকূলগলহস্তকং, ক্ষুৎক্ষেমীয়ং এই রূপকগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। চিপিটকচর্বণে যজ্ঞের দ্রব্যসামগ্রী নষ্ট করার জন্য ভৃত্য পঙ্গুরামকে কপালী কঠোর ভাষায় অবমাননা করে - "অধুনৈব ত্বং পরকীয়পদযুগলংকরে কৃত্বা বহির্গচ্ছ, অন্যথা প্রহারেণ ত্বাং হনিষ্যামি ।"[১৫] জননী নাটকে গৃহকর্ম সম্পাদনে গৃহে আসতে বিলম্ব হওয়ায় গৃহিণী দাসীকে তিরস্কারের সুরে অবমাননা করে।[১৬] অনুকূলগলহস্তকং নাটকে যুক্তিহীন উপদেশ প্রদানের জন্য যামিনী রামাবতারকে তিরস্কার করে।[১৭] মণিকাঞ্চনসমন্বয় নাটকে কর্তব্যে অবহেলার জন্য শর্শরীক ও দর্দূরককে ভৎর্সনা করে ধনপতি। ক্ষুৎক্ষেমীয়ে গৃহে আগত অতিথিকে যথাযতভাবে আতিথ্যসংবিধান না করায় রঙ্গনাথ ভৃত্যকে কটু ভাষায় অবমাননা করে।[১৮]

হীনমন্যতা - বিদ্যাহীনবশত শ্রমিকরা বা দরিদ্র জনেরা প্রায়শই আত্মজ্ঞানহীন হয়। বিদ্যাহীনবশত এবং ধনীদের দ্বারা শোষণবশত শ্রমিকরা এবং দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত লোকেরা নিজেদেরকে হীন মনে করে, অর্থাৎ হীনমন্যতা অনুভব করে। নির্ধনত্ব হেতু তারা পরিবারের ন্যূনতম ব্যয়ভার বহন করতে অসমর্থ হয়, পরিবারকে ন্যূনতম সুখ প্রদানে সামর্থ্য তাদের নেই। ধনীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং প্রভাবশালীত্বের কারণে তারা সর্বদা বিনীত আনুগত্যপূর্ণ আচরণ করে থাকে, নতমস্তকে সবকিছু মেনে নেয়। ইচ্ছা থাকলেও প্রতিরোধ করতে পারে না। এইসব কারণ সমূহের দ্বারা তারা সর্বদা হীনমন্যতা অনুভব করে। শার্দূলশকটং, পল্লীকমলং, বেষ্টনব্যয়োগঃ, কাঞ্চনকুঞ্চিকং এই রূপকগুলিতে হীনমন্যতার চিত্র পাওয়া যায়। পল্লী কমলে দরিদ্র নৌচালক রূপকুমার হীনমন্যতা অনুভব করে -"সাধারণনৌচালকেভ্যোঽপি দীনতরো হীনতর ক্ষীণতরশ্চ।"[১৯] বেষ্টনব্যয়োগ রূপকে শ্রমিকরা হীনমন্যতা অনুভব করে তা এক শ্রমিকের বচনেই পরিস্ফুট- "সঞ্জয়- আ জন্মনঃ ক্ষুধার্তা বস্ত্রহীনা বয়ম্। কো যচ্ছতি গ্রাসাচ্ছাদনযোগ্যং বর্তনম্ অস্মভ্যম্।"[২০] কাঞ্চনকুঞ্চিকং নাটকে সমান চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, এটা কর্ম থেকে ছাঁটাই হওয়া এক দরিদ্র শ্রমিকের উক্তিতেই স্পষ্ট।[২১]

শ্রেণী সচেতনতা - একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকল নাগরিকরা স্বজনদের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে থাকতে চায়,সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সংসর্গে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। ফলতঃ স্ববর্গীয়জনের মধ্যে তারা স্বজাতিত্ব, একাত্মতা অনুভব করে। বস্তুতঃ নিম্নবর্গীয় নাগরিকদের মধ্যে এইরকম চিত্র প্রধান ভাবে পরিলক্ষিত হয়। পারস্পরিক সুখ-দুঃখ-আনন্দ-পরিহাস-পারস্পরিক সহায়তা প্রদান-স্বতঃস্ফূর্ত সান্নিধ্য লাভ প্রভৃতি বিষয়গুলি তাদের মধ্যে প্রায়শঃ পরিদৃষ্ট হয়। এখানে পারস্পরিক দুঃখ-মোচন, পারস্পরিক আনন্দ-উপভোগ, পারস্পরিক বিপদের অপনোদন ইত্যাদি বিষয়গুলি এখানে বিদ্যমান থাকে। মহৎ সংকট আপতিত হলে সকলে মিলেই তা

প্রতিরোধ করে। যেহেতু তাদের জীবনশৈলী সমান, উদ্ভূত দুঃখের কারণও সমান, নিজেদের অর্থ উপার্জনের স্তরও সমান তাই তারা সমব্যথীপরায়ণ সহায়তাপরায়ণ হয়ে থাকে। বেষ্টনব্যায়োগঃ সাম্যসাগরকল্লোলং এবং শার্দূলশকটং নাটকে উল্লিখিত শ্রমিকরা সকলেই দরিদ্র এবং নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর। পারস্পরিক সংসর্গ লাভ এবং সংগতি বিধানের দ্বারা এই নিম্নবর্গীয় শ্রমিকরা সমস্তরীয় ব্যক্তিগণের প্রতি একাত্মতা অনুভব করে। ফলে তারা সবাই নিজ নিজ বর্গান্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি অনুগত এবং শ্রদ্ধাভাজন থাকে। একের সুখে সবাই সম্মিলিত হয়ে সুখ অনুভব করে, বিপদ এলে সবাই সম্মিলিতভাবে সেই বিপদের প্রতিরোধ করে। শার্দূলশকটং নাটকে দরিদ্র রত্নকরের সহকর্মী চিত্রভানু দুর্ঘটনায় মৃত। ফলে চিত্রভানু পরিবারে মহৎ সংকট আপতিত হয় - "তস্য তরুণী পত্নী শিশুপুত্রশ্চ মহাকষ্টমাপন্নৌ।"[২২] সেই সংকট থেকে তার পরিবার রক্ষা পাবে কিভাবে? এই বিষয়ে রত্নাকর এবং অন্যান্য সহকর্মীরা চিত্রভানুর পরিবারের করুণ পরিস্থিতি অনুভব করতে থাকে। তা থেকে কিভাবে সেই পরিবারটিকে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে তারা সচেষ্ট হয়ে ওঠে। যদি চিত্রভানুর স্ত্রীকে একটি কাজ পাইয়ে দেওয়া যায় তাহলে পরিবারটি রক্ষা পাবে এই চিন্তা করে তারা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার মুখ্য পরিচালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনার আবেদন জানাবে - "মুখ্যপরিচালকাত্ প্রার্থয়িষ্যে সাহায্যম্।"[২৩] এর দ্বারা এখানে সহমর্মিতার চিত্র প্রস্ফুটিত। দরিদ্র নিম্নবিত্ত শ্রেণীর হিতসাধনের জন্য নিম্নবিত্ত লোকেরাই এগিয়ে এসেছে এই চিত্র রূপকগুলিতে বারবার পরিলক্ষিত হয়। সাম্যসাগরকল্লোলে সহায়হীন-নিম্নবিত্ত-মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে গ্রামেরই দরিদ্র নিম্নবিত্ত যুবক।এখানে মুমূর্ষু ভারবাহী দরিদ্রকে শুশ্রুষা এবং সেবার দ্বারা বাঁচিয়েছে এই দরিদ্র গ্রাম্য যুবক - "মুমূর্ষু ভারবাহী যমসদনাত্ প্রত্যাবর্তিতঃ শুশ্রুষয়া।"[২৪] শার্দূলশকটে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অন্য জায়গায় আবেদন করলে তা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না তাই তারা স্ববর্গীয় জনের কাছেই আবেদন করে, কারণ তারা জানে যে স্ববর্গীয় জনেরাই তাদের বিপদগ্রস্ত মানুষের গুরুত্ব, মর্মবেদনা, মমত্ব প্রভৃতি অনুভব করে তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে - "পরন্তু মহাবিপদি নিপতিতোঽহম্। উদ্ধরং মাং বন্ধুজনম্।"[২৫] আর্থিক অনটনে ভুক্ত পরিমল, পরিবারের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রত্যেক দিন দুই বেলা চিন্তা করতে হয়, নিজের মনের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে হয়। সে স্ত্রীয়ের চিকিৎসার জন্য সহকর্মী অরিন্দমের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সে সাহায্য পেয়ে উপকৃত হয়েছে একথা তার উক্তিতেই স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় - "দরিদ্রস্য বন্ধুর্দরিদ্র এব।"[২৬] কাঞ্চনকুঞ্চিকং পল্লীকমলং নাটকেও সমান দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় দরিদ্র জনের সাহায্য প্রদানে স্ববর্গীয় জনেরাই কেবলমাত্র এগিয়ে এসেছে এবং পাশে থেকেছে। উপরিউক্ত সকল রূপকগুলিতে ধনী ব্যক্তি সঙ্গে ধনী ব্যক্তির যে সম্পর্ক পাওয়া যায় তা মূলতঃ আর্থিক সমৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে। এদের মধ্যে শ্রেণীচেতনার দিকটি কেবল অর্থকেন্দ্রিক।

উপসংহার – উপরিউক্ত পর্যালোচনায় পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজে ধনী-দরিদ্র সম্পর্কের মধ্যে তিনটি বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ ধনী ব্যক্তির সঙ্গে ধনী ব্যক্তির সম্পর্ক, দ্বিতীয়তঃ দরিদ্র ব্যক্তির সঙ্গে দরিদ্র ব্যক্তির সম্পর্ক, তৃতীয়তঃ ধনী ব্যক্তির সঙ্গে দরিদ্র ব্যক্তির সম্পর্ক। প্রথম প্রকার সম্পর্কে অর্থ-প্রতিপত্তির কারণে ধনীব্যক্তির মধ্যে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তৈরি হয় এবং সুসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে যতক্ষণ আর্থিক সমৃদ্ধি হতে থাকে। ধনীব্যক্তিরা সমাজের সব থেকে মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণীরূপে বিবেচিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে সমপর্যায়ভুক্ত লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করার বা সংস্পর্শে সংসর্গে থাকার থাকার প্রবল প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এর মূল কারণ হলো মানসিক নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তা বিশ্বাস আর্থসামাজিক সহায়তা সংস্কৃতির অনুসরণ প্রভৃতি। দ্বিতীয় কারণ হলো অবাধ ও স্বতস্ফুর্ত মিশ্রণের বা সংস্পর্শে আসার সুযোগ। এই বিষয়গুলি পারস্পরিক ভিন্ন শ্রেণীর প্রতি বিদ্যমান থাকে না, পার্থক্য থাকেই - “দীনস্য সংখ্যা ধনিনা ন ভূয়তে লভ্যং ততো নৈব কদাপি সান্ত্বনম্। নিত্যং হৃদন্তর্যদি রৌতি যন্ত্রণং বন্ধোর্হি বাক্যং প্রশমায় কল্পতে।।”[২৭] তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র সম্পর্কের মধ্যে প্রতিপত্তি, অধীনতা, আধিপত্য, অবমাননা, শোষণ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা প্রভৃতির একমুখী প্রবাহ দেখা যায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দরিদ্ররা সর্বদা সব রকম আর্থিক সুবিধা দ্বারা বঞ্চিত। তাই অর্থবলের কাছে দরিদ্ররা অবদমিত অবনমিত। দরিদ্রদের ন্যূনতম জীবনযাপন করার সামর্থ্য থাকে না অন্যদিকে ধনীদের বিলাসিতাপূর্ণ রঙীন জীবন যাত্রা বিরাজিত। সামাজিক দৃষ্টিতে মর্যাদাহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি এবং মনস্তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে হীনমন্যতা, চিন্তাশক্তির বিকাশ না হওয়া প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। ধনী-দরিদ্র সম্পর্কে মূল আধার হলো ধন এবং শ্রম। অর্থাৎ শ্রমপ্রদানে অর্থ প্রাপ্তি এবং অর্থ প্রদানে শ্রমপ্রাপ্তি দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু মূল্যের দৃষ্টিতে অর্থ এবং শ্রমের মধ্যে ব্যস্ত সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে যেভাবে শ্রম প্রদত্ত হচ্ছে সেই অনুপাতে ধন প্রাপ্তি হচ্ছে না। অতএব বৈষম্য মূলক সম্বন্ধ বিরাজ করছে। বস্তুত সামাজিক-মানসিক-আর্থিক বৈষম্যের কারণে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিস্তৃত ব্যবধান বিরাজিত। এবং বিরাজমান থাকবেও। অর্থাৎ ধনীরা প্রভূত ধনের ধারক এবং দরিদ্ররা সর্বদা ধনহীন এই নিয়মই চলছে। অতএব দরিদ্র ব্যক্তিরা সর্বদা ধনী ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত - এটা চিরসত্য রূপেই প্রতিপন্ন। এই প্রবন্ধটি পাঠ করলে পাঠকগণ ষাট-সত্তর দশকের বঙ্গীয় সমাজে ধনী-দরিদ্র সম্পর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি অনুভব করতে পারবে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সম্পর্কের মূল্যমান বিচার করতে পারবে।

অন্ত্যটীকা

১. মণিকাঞ্চনসমন্বয়ং, প্রথমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ১১৫

২. চিপিটকচর্বণং, প্রথমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৩
৩. শার্দূলশকটং, প্রথমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩
৪. বেষ্টনব্যায়োগঃ, প্রথমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ১১
৫. অনুকূলগলহস্তকং, দ্বিতীয়াংক, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৮
৬. বিবাহবিড়ম্বনং, প্রথমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫১
৭. সাম্যসাগরকল্লোলং, প্রথমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৬৭
৮. শার্দূলশকটং, প্রথমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩
৯. বিষয়াকাঙ্ক্ষণং, পঞ্চমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ১০২
১০. দরিদ্রদুর্দৈবং, প্রথমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭
১১. শার্দূলশকটং, প্রথমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫
১২. পল্লীকমলং, চতুর্থদৃশ্য, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৭
১৩. তদেব
১৪. তদেব, অষ্টমদৃশ্য, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫২
১৫. চিপিটকচর্বণং, প্রথমাংক, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৩
১৬. জননী, প্রথমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫
১৭. অনুকূলগলহস্তকং দ্বিতীয়াঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৮
১৮. ক্ষুৎক্ষেমীয়ং, প্রথমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ১১৪
১৯. পল্লীকমলং, চতুর্থদৃশ্য, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৪
২০. বেষ্টনব্যায়োগঃ, প্রথমাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ১২
২১. কাঞ্চনকুঞ্চিকং, তৃতীয়াংক, পৃষ্ঠাঙ্ক ১২
২২. শার্দূলশকটং, চতুর্থাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৮
২৩. তদেব
২৪. সাম্যসাগরকল্লোলং, দ্বিতীয়মুখসন্ধি, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৫৪
২৫. শার্দূলশকটং, চতুর্থাঙ্ক, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩২
২৬. তদেব, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৩
২৭. তদেব, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩১

তথ্যসূত্র

১. ঘোষাল, বনবিহারী. *অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা, পারুল প্রকাশনী, ২০২১.
২. চৌধুরী, রমা. *পল্লীকমলং.* কলকাতা, প্রাচ্যবাণী, ১৯৬৯.
৩. দুবে, এস সি. *ভারতীয় সমাজ.* দিল্লি, ন্যাসান্যাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৬.
৪. ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ. *অনুকূলগলহস্তকং.* কলকাতা, মঞ্জুষা, ১৯৫৯.
৫. ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ. *মণিকাঞ্চনসমন্বয়ং.* কলকাতা, মঞ্জুষা, ১৯৫৭.

৬. ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকুমার. *বেষ্টনব্যয়োগঃ.* কলকাতা, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭১.
৭. ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকুমার. *শার্দূলশকটং.* কলকাতা, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭১.
৮. ভট্টাচার্য, শ্রীজীব. *ক্ষুৎক্ষেমীয়ং.* কলকাতা, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭২.
৯. ভট্টাচার্য, শ্রীজীব. *চিপিটকচর্বণং.* কলকাতা, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭২.
১০. ভট্টাচার্য, শ্রীজীব. *বিবাহবিড়ম্বনং.* কলকাতা, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬১.
১১. ভট্টাচার্য, শ্রীজীব. *সাম্যসাগরকল্লোলং.* কলকাতা, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৬.
১২. মহাপাত্র, অনাদিকুমার. *ভারতীয় সমাজব্যবস্থা.* কলকাতা, সুহৃদ পাব্লিকশন, ২০১৫.
১৩. মুখোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ. *বিষয়াকাঙ্ক্ষণং.* হাওড়া, হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ, ২০০৮.
১৪. হাবিব, ইরফান. সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে. কলকাতা, ন্যাসান্যাল বুক এজেন্সি, ২০২২.

‘সুখলতার ঘর নেই’ উপন্যাস ; হরিশংকর জলদাসের একটি অন্য জেলেজীবন

খুকুমণি বাগ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
এগরা সারদা শশিভূষণ মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ(Abstract)- হরিশংকর জলদাসের ‘সুখলতার ঘর নেই’ উপন্যাসটি বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় একটি নতুন ইতিহাস সংযোজন করেছে। বঙ্গোপসাগরের বুকে নৌকা ভাসিয়ে রেখে হরিশংকর জলদাস দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর মাছ ধরেছেন। তাই কেবল জেলে সম্প্রদায়ের জীবনকে তিনি বোঝেননি, বুঝেছেন জলের তলায় থাকা মাছেদের জীবনকেও। খুব কাছ থেকে দেখা জীবনকে ‘সুখলতার ঘর নেই’ উপন্যাসে নির্মাণ করেছেন। এই উপন্যাসের পটভূমি বঙ্গোপসাগরের তলায় থাকা মাছের জীবন।
সূচক শব্দ(Key word)- মৎস সমাজ ও জীবন, স্বেচ্ছাচারী শাসক, বর্ণ বিভাজিত সমাজে প্রেম, মানব ও মানবেতর সম্পর্ক।

মূল আলোচনা(Discussion)-

‘সুখলতার ঘর নেই’ উপন্যাসের ব্লার্বে লেখা আছে– **“মাছেদেরও সমাজ জীবন আছে। আছে মৎস সম্প্রদায়। তাদের আছে প্রেম-অপ্রেম, রিরংসা-ক্রোধ। প্রয়োজনে এরা লুণ্ঠন করে, রাহাজানি করে। যুদ্ধও করে। তাদের চিকিৎসক আছে। গায়ের রং আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের জার্সির মত।... হরিশংকর জলদাস মাছেদের মুখে কথা বসিয়ে মৎস্যজীবনের গল্প বলেছেন। এতদিন মৎস্যজীবীদের আখ্যান শুনিয়েছেন তিনি, সুখলতার ঘর নেই-এ শোনাচ্ছেন মৎস্যজীবনের বৃত্তান্ত।”**[1]

এই উপন্যাস প্রমাণ করে এই মাটির পৃথিবী কেবলমাত্র মানুষের নয়। এই পৃথিবীতে এমন অনেক প্রাণী আছে যারা মানুষের মতোই জীবন যাপন করে। কিন্তু মানুষ তা বুঝতে চায় না। ফলত সকলের বুকের উপর পা দিয়ে মানুষ হেঁটে চলে। তারা নিজেদের প্রয়োজনে সকল প্রাণীকে বা প্রকৃতিকে ব্যবহার করে। তাই মানুষের বোধ থেকে হারিয়ে যায় অন্যান্য প্রাণীর জীবনকে নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রক্রিয়াটি। কিন্তু সব মানুষ যে পৃথিবীতে থাকা প্রাণীদের ভুলে যায়নি তার প্রমাণ হরিশংকর জলদাস। অন্যান্য জেলেদের মতো তিনি কেবল মাছই ধরেননি। তিনি খানিক স্পর্শকাতর, সৃষ্টিশীল বলে তিনি মাছেদের জীবনটাকেও অনুভব করতে পেরেছেন। আর সেই দেখা কে মিলিয়ে দিয়েছেন মানুষের জীবনের সঙ্গে। সুখলতা যে একটি ইলিশ মাছের নাম তা লেখক না বলে দিলে বোঝাই যেত না। এতখানি সাদৃশ্য

তৈরি করেছেন তিনি মানুষের জীবনের সঙ্গে মাছেদের জীবনকে। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে।

'সুখলতার ঘর নেই' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ টুকু পড়লে বোঝবার উপায় থাকে না এই উপন্যাসের চরিত্র মাছেরা। উপন্যাসটি পড়তে শুরু করলে পাঠক মনে করবে সুখলতা এবং রতিকান্ত কোন মানুষের নাম। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে লেখক খোলসা করবেন এই উপন্যাসের চরিত্র, প্রেক্ষাপট, স্থান এবং সময়কে। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এভাবে – **"আশ্বিন। ভোর হয়েছে। তেমন করে আলো ফোটেনি। সূর্যের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরো কিছুক্ষণ।"**[২] এ আমাদের চিরচেনা অভ্যস্ত ছবি। খুব পরিচিত দিনের এই সময়টা। লেখক যখন আবার বলেন – **"এখন রোদ উঠেছে। ভিজে ভিজে রোদ। একটুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই রোদের তেজ কম। মিষ্টি মিষ্টি। আশ্বিনের বাতাসে বেগ নেই। ফুরফুরে। রোদ-বৃষ্টি-বাতাস এই তিনে মিলে মোহনীয় পরিবেশ।"**[৩] এই পরিবেশটিকে আমরা মানুষেরা খুব ভাল করে চিনি। কিন্তু জলের তলাতেও যে মাছেদের ঠিক এমন পরিবেশে রচিত হয় তা ভাবলে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। প্রথম পরিচ্ছেদে এই পরিবেশ রচনা করে লেখক আমাদের জানান যে – **'গত রাত ছিল সুখলতা রতিকান্তের বাসর রাত।'**[৪] আবার আমরা ধরে নিই লেখক বোধহয় সেই আবার এই একঘেয়েমি সম্পর্কের বর্ণনা দিচ্ছেন। শুরুতেই যখন আমরা নায়ক নায়িকার বাসর রাতের কথা বলছি তাহলে উপন্যাস জুড়ে নিশ্চয়ই তাদের দাম্পত্য জীবনের অবসাদের কথাই পড়বো। হয়তো কিছুটা অবসাদের কথা আমরা পড়ব কিন্তু সেটা মানুষের নয় মাছেদের কথা। 'বাসর রাত' এই কথাটার সঙ্গে আমরা যখন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এসে পৌঁছাব তখন আবার একবার আমরা হোঁচট খাবো। এই উপন্যাসের প্রতি পংক্তিতেই লুকিয়ে আছে অদ্ভুত রস। আমরা একটি পরিচ্ছেদ পাঠ করার পর গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসবো এমনও হয়?।

এই উপন্যাসের কাহিনীতে রয়েছে যে, মাছেদের সর্দার হলেন বিনোদ। তিনি খুবই বিবেচক একজন সর্দার। সমস্ত মাছেদের সমাজে তাই তিনি খুব জনপ্রিয়। তিনি তার বিবেচনা দিয়ে সমস্ত মৎস্য প্রজাকে তার নিজের অনুকূলে রাখতে পেরেছেন। যেহেতু মাছেদের সমাজে এই নিয়ম আছে যে সর্দারের পুত্র পুত্রই সর্দারের মৃত্যুর পর সর্দার হবে। তাই বিনোদ সরদারের একমাত্র ছেলে পঞ্চু নিজের পিতাকে হত্যা করে সর্দার হতে চেয়েছে। মাছেদের ডাক্তার হীরামোহনের থেকে নিজের পুত্রের কুকীর্তির খবর পেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। তারপর নিয়ম অনুসারে পঞ্চু সর্দার হয় এবং যেহেতু সে প্রথম থেকেই অনাচারী এবং উদ্ধত স্বভাবের। তাই সর্দারীর সুযোগে তার অনাচারী অন্যায় কারীর মনোভাব আরো বেড়ে যায়। সে সমাজে অন্যায়কারীর পক্ষ নেয়, মেয়েদের দিকে কুনজরে তাকায়। লেখক লিখেছেন – **"পঞ্চুর আমলে জলধির মৎস্য সমাজের মাৎস্যন্যায় শুরু হল।...সরদার হয়েই পঞ্চু শাসনের সঙ্গে শোষণটাকে**

যুক্ত করল।”[৫] পিতার অনুপ্রেরণায় পঞ্চুর ছেলে জগাইও হয়ে উঠলো স্বেচ্ছাচারী। পিতা ও পুত্রের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের মিলন হওয়ার ফলেই এই গোটা উপন্যাস পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

মৎস্য সম্প্রদায়ের সোমনাথ ইলিশের মেয়ে সুখলতার দিকে কুনজরে তাকায় জগাই। সুখলতা পাঙাশ মাছ রতিকান্তকে ভালোবাসে এবং তাকেই বিয়ে করবে এ কথা জানার পরও জগাই তার বাবার কাছে সুখলতাকেই দাবি করে বসে। রতিকান্ত সুখলতাকে নিয়ে যেদিন নিজের বাড়ি যাওয়ার জন্য রওনা দেয় সেদিনই জগাই মাছেদের দলবল নিয়ে গিয়ে সুখলতার ভাইকে প্রবলভাবে আহত করে সুখলতাকে তুলে নিয়ে চলে যায় হুলাইন পর্বতে। কিন্তু সুখলতাকে জগাই ভোগ করতে পারে না। বাধা হয়ে দাঁড়ায় জগাইয়ের বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যমুনা। এরপর সোমনাথ ইলিশ মাছেদের দল, রতিকান্ত পাঙাশ মাছেদের দল এবং তাদের রাজা হাঙরদের সাহায্য নিয়ে জগাইদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ ঘটায়। দুপক্ষেরই প্রচুর মাছ মারা যায়। তারপর পঞ্চু ও জগাইয়ের মৃত্যুর পর যুদ্ধের অবসান হল। রতিকান্তদের দল জিতে গেল। রতিকান্ত জিতে গেলেও রতিকান্ত সুখলতাকে গ্রহণ করেনি। কারণ সে জগাইয়ের সজ্জা সঙ্গিনী হয়েছে। জগাইয়ের মা যমুনা রতিকান্তকে অনেক বোঝানোর পরও রতিকান্ত বিশ্বাস করে না যে সুখলতা জগাইয়ের শয্যাসঙ্গিনী হয়নি। তাই সে বলে- **“তুমি ভাবছো আমি তোমার জন্যই যুদ্ধ করেছি। না, আমি তোমাকে উদ্ধার করার জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করিনি। আমি যুদ্ধ করেছি আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করার জন্য। যুদ্ধ করেছি কেউ যাতে বলতে না পারে পাঙাশ গোষ্ঠীর বউকে জঘন্য জগাইরা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল, রতিকান্তরা তাকে উদ্ধারের জন্য কোন যুদ্ধ করেনি। আজ যুদ্ধ শেষ। হত্যা করেছি আমি জগাইকে। তুমি স্বাধীন। যেদিকে মন চায়, চলে যেতে পারো তুমি।”**[৬] তারপর সুখলতা চূড়ান্ত বেদনায় চিন্তামণি নামক জেলেদের জালের সামনে নিজেকে ভাসিয়ে রাখে।

এছাড়াও এই উপন্যাসে মনুষ্য সমাজের মতোই আছে নানান বিশ্বাস লোকাচার। যেমন - মানুষের মতো মাছের সমাজও পাড়া মহল্লায় বিভক্ত। তাদের গ্রামগুলোর নাম অদ্ভুত - জলধি, কমলদহ, চৈতন্যপুর, বালুছড়া, ঘোড়ামারা, মদনগঞ্জ - এরকম আরও। মাছেদের সমাজনীতিও আছে। মাছেদের সর্দার মুখ্যরা সেই সাধারণ মাছেদের সমাজ রীতি পদ্ধতি মেনে চলতে নির্দেশ দেয়। যেমন - মেয়েরা বিয়ের পর স্বামী সহ ছয় মাস বাপের বাড়িতে থাকবে। বিয়ের সময় বর বধূকে একই জাতের হতে হবে, জাতের বাইরে বিয়ে করা চলবে না। এছাড়াও মাছেদের আছে মনোকামনা পর্বতে বিরিক্ষি গাছ। যার তলায় দাঁড়িয়ে তারা তাদের মনোবাসনা পূরণের জন্য প্রার্থনা জানায়। তাছাড়া মাছেদের মুখেও ভাষা আছে। অঞ্চলভেদে, গ্রাম ভেদে সেই ভাষার পার্থক্য আছে। তবে বঙ্গোপসাগরের মাছেরা সবাই সবার ভাষা বোঝে। মাছেদের সমাজে নারীদের কণ্ঠস্বর মিহি, পুরুষদের কণ্ঠস্বর মোটা। সর্দারদের কণ্ঠস্বর কর্কশ। প্রয়োজনে

এবং অপ্রয়োজনে অবলীলায় সর্দারদের মুখ দিয়ে গালিগালাজ বেরিয়ে আসে। কেননা তারা বিশ্বাস করে মাছ সমাজকে শাসনে রাখার জন্য গালিগালাজের বাড়া নেই। এমনকি মৎস্য সমাজেও জায়গা জমি নিয়ে লড়াই হয়। বঙ্গোপসাগরের জলের তলাকার মাছেদের কথা লেখক হরিশংকর জলদাস এই উপন্যাসে এনে পাঠকুলকে একটি নতুন জীবনের খোঁজ দিয়েছেন। এবং এই নতুন মৎস্য জীবনটাকে যে তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন তার একটা প্রমাণ তিনি দিয়েছেন এই উপন্যাসে চিন্তামণি জেলে কে এই উপন্যাসের স্থান দিয়ে। এই উপন্যাসে উল্লিখিত চিন্তামণি জেলে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মাছ ধরে। চিন্তামণির বাড়ি উত্তর পতেঙ্গায়। সে মাঝারি গোছের বহদ্দার। বঙ্গোপসাগরে তার তিনটি জাল পাতা থাকে। সঙ্গে থাকে তার দুই পুত্র গেঁজেল ঝলক আর প্রেমিক পুলক। চিন্তামণির বড় পুত্র ঝলক সে তার স্ত্রী হাঁইচনিবালাকে নেশার ঘোরে বেদম মারে। চিন্তামণি এই পুত্রটির ওপর সবসময়ই অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে। আর ছোট ছেলে পুলক লেখক যার নামের আগে বিশেষণ দিয়েছেন 'প্রেমিক' বলে। জেলেপাড়ায় গুড়ামোহনের মেয়ে চুমকিকে ভালোবাসে সে। তাকে দেখে গানের কলি ভাঁজে। এই পুলক চরিত্রটি নির্মাণে লেখক খানিক নিজ ব্যক্তিগত জীবনকে মিশিয়েছেন। পুলক নদীতে বাবা এবং দাদার সঙ্গে মাছ ধরতে যায়।

কার্তিক মাসের বঙ্গোপসাগরে ঝড় জল নেই বলে সমুদ্রের স্রোত নেই। তাই জেলেরা সারি সারি জাল পেতে রাখে বঙ্গোপসাগরের গহীন জলে। সুখলতা জ্যোৎস্না বিলাসী, রতিকান্ত কে নিয়ে জলের উপর চলে আসে জোৎস্নায় মাখামাখি হওয়ার জন্য। এমন সময় সুখলতা নিজেকে বাঁচাতে পারলেও রতিকান্তের কাঁটা থাকার কারণে সে চিন্তামণিদের জালে আটকে যায়। যত নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে ততই জড়িয়ে যায়। স্রোত কমে এলে চিন্তামণির জালটি জলের ওপর ভেসে ওঠে। তখন পুলক চিন্তামণির জালটি টেনে তুলতে যায় এবং দেখে যে জালে একটা বিরাট পাঙাশ মাছ পড়েছে। পুলকের চোখ দিয়ে আমাদেরকে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখান – **"আচমকা তার চোখে পড়ে সুখলতার ওপর। দেখে - বড়সড়ো একটা ইলিশ পাঙাশটির চারিদিকে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে যাচ্ছে। বারবার জলের ওপর একবার মাথা তুলছে, আবার জলে ডুব দিচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে পাঙাশটির গায়ে এসে ঢুস দিচ্ছে। মাঝে মাঝে ঠোঁট দিয়ে পাঙাশের মুখটিতে কি যেন করছে, বুঝতে পারে না পুলক। শুধু বুঝতে পারে, কিছু একটা হয়েছে। এই বিজাতের মাছ দুটোর মধ্যে কোন একটা ঘটনা আছে। নইলে কেন ইলিশটির এরকম কৈছালি? টানে জোর কমিয়ে দেয় পুলক। অবাক হয়ে ইলিশটির দিকে তাকিয়ে থাকে। সুখলতা তার অস্থিরতা আরো বাড়িয়ে দেয়। একবার এদিকে একবার ওদিকে ঘুরতে থাকে। একসময় জলের ওপর মাথা ভাসিয়ে রেখে কি যেন বলতে চায় ইলিশটি। অদ্ভুত দুর্বোধ্য এক ধরনের শব্দ পুলক এর কানে ভেসে আসে।... উৎকর্ণ পুলক অবশেষে বুঝতে পারে, বিচিত্র এই শব্দ তরঙ্গ ইলিশটির মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে। কি বলতে চায় ইলিশটি? ভাবে পুলক। পাঙাশটির মুক্তি চায় কি**

ইলিশটি? যদি তা-ই হয়, তাহলে কেন? উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি?... স্বামী-স্ত্রী না হোক, প্রেমিক-প্রেমিকা তো হতে পারে! ভিন্ন দুই জাতের মানুষদের মধ্যে প্রেম-পিরিতি, এমন কি বিয়েও তো আকছার হচ্ছে এই পৃথিবীতে। মানুষদের মধ্যে যদি ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিয়ে প্রেম হতে পারে, তাহলে মাছেদের মধ্যে অসুবিধা কোথায়? নিশ্চিত পাঙাশ আর ইলিশটির মধ্যে প্রেম আছে। নইলে ইলিশটির মধ্যে এত আকুলি বিকুলি কেন?”[৭]

এই দৃশ্য দেখার পরই পুলকের চুমকির কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় তারা দুজন দুজনকে কি পরিমাণ ভালোবাসে। আজকে যদি পুলকের কিছু হয় তাহলে চুমকি কেঁদে কেঁদে পাড়া মাথায় করবে। এই অনুভবের বশবর্তী হয়ে পুলক পাঙাশ মাছটিকে ছেড়ে দেয়। আর দেখে যে ইলিশ মাছটি এসে পাঙাশ মাছটির গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর তারপর – **“মাছ দুটো জলের ওপর মাথা তোলে। অদ্ভুত এক আওয়াজ করে পুলকের দিকে মাথা ঝুকায়। তারপর জলের নিচে ডুব দেয়। অপার এক তৃপ্তির আভা পুলকের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তার মনে হতে থাকে, পুলক গিয়ে যেন চুমকির সঙ্গে মিলিত হলো। এ যেন ইলিশটির মুখ ঘষা নয়, এ যেন তার চোখ-মুখ-ঠোঁট জুড়ে চুমকির সোহাগের চুমু দেওয়া।”[৮]**

পুলক প্রেমিক বলেই সে মানবেতর প্রাণী মাছেদের বেদনা বুঝতে পেরেছে। লেখক হরিশংকর জলদাস সৃষ্টিশীল, স্পর্শকাতর, অনুভূতিশীল লেখক বলেই মাছেদের নিয়ে এমন লেখা লিখতে পেরেছেন। এই উপন্যাসে পুলকের মতো চরিত্র সৃষ্টি করে লেখক দেখালেন সব জেলে কেবলই মাছ ধরে না। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার “বঙ্গীয় শব্দকোষ” অভিধানে জেলে শব্দের অর্থ লিখেছিলেন ‘যারা মৎস্য হিংসা করে’। কিন্তু এই উপন্যাসে পুলক চরিত্র সৃষ্টি করে হরিশংকর জলদাস প্রমাণ করেছেন সব জেলে মৎস্য হিংসা করে না। কেউ কেউ আবিষ্কার করতে পারেন নিজেদের প্রেম বেদনার সঙ্গে মানবেতর প্রাণীর প্রেম বেদনার সাদৃশ্য।

তথ্যসূত্র:

১) জলদাস হরিশংকর, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪২৫(ফেব্রুয়ারি ২০১৯), সুখলতার ঘর নেই, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন।

২) জলদাস হরিশংকর, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪২৫(ফেব্রুয়ারি ২০১৯), সুখলতার ঘর নেই, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, পৃষ্ঠা-১।

৩) জলদাস হরিশংকর, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪২৫(ফেব্রুয়ারি ২০১৯), সুখলতার ঘর নেই, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, পৃষ্ঠা-১।

৪) জলদাস হরিশংকর, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪২৫(ফেব্রুয়ারি ২০১৯), সুখলতার ঘর নেই, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, পৃষ্ঠা-১।

৫) জলদাস হরিশংকর, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪২৫(ফেব্রুয়ারি ২০১৯), সুখলতার ঘর নেই, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, পৃষ্ঠা-১৮।
৬) জলদাস হরিশংকর, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪২৫(ফেব্রুয়ারি ২০১৯), সুখলতার ঘর নেই, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, পৃষ্ঠা-১৬৭।
৭) জলদাস হরিশংকর, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪২৫(ফেব্রুয়ারি ২০১৯), সুখলতার ঘর নেই, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, পৃষ্ঠা-১০৭।
৮) জলদাস হরিশংকর, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪২৫(ফেব্রুয়ারি ২০১৯), সুখলতার ঘর নেই, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, পৃষ্ঠা-১০৯।

লোকসংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতায় সাঁওতাল জনজাতির জীবনচর্যায় অতিপ্রাকৃত শক্তির ভূমিকা : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

করম চাঁদ মান্ডি
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : এই গবেষণাধর্মী নিবন্ধে সাঁওতাল জনজাতিদের জীবনচর্যায় অতিপ্রাকৃত শক্তির ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। এই অতিপ্রাকৃত শক্তি সাঁওতাল জনজাতিদের মধ্যে এক অদৃশ্য আকর্ষণের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার ও সভ্যতার বিকাশের আগে থেকেই সাঁওতাল জনজাতি মানুষেরা জাদুবিদ্যা, ওঝা বা গুনিনদের বিভিন্ন গুপ্তবিদ্যায় নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হত। আজও বহু আদিবাসী জনজাতি প্রাচীন চিকিৎসায় অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত শক্তিতে পুরোপুরি আস্থা রাখে। তারা মনে করে রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য একজন প্রকৃত চিকিৎসকের চেয়ে একজন গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারী চিকিৎসক ভালো পরামর্শদাতা। আদিবাসী অধ্যুষিত সাঁওতাল জনজাতিদের মধ্যে এই রকম গুপ্তবিদ্যা বিশ্বাসের মূল কারণ হল তাদের চরম দারিদ্র্যতা ও উচ্চশিক্ষার অভাব। আমাদের দেশে এখনও বহু আদিবাসী জনজাতি চরম দারিদ্র্যতার নীচে বসবাস করে। এই সমস্ত দীন-দরীদ্র মানুষের পক্ষে ভালো চিকিৎসকের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই তাদেরকে বাধ্য হয়েই একজন গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারী চিকিৎসকের কাছে দ্বারস্থ হতে হয়। ওই জাদুকরী চিকিৎসক অতিপ্রাকৃত শক্তি স্বরূপ রোগ নিরাময়ের জন্য তাদেরকে মাদুলি, কবজ ইত্যাদি ধারণ করার পরামর্শ দেয়। এই সমস্ত গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারীদের গুপ্তবিদ্যা বা অতিপ্রাকৃত শক্তি কীভাবে সাঁওতাল জনজাতিদের জীবনচর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে তা মূল নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ :-সাঁওতাল, সংস্কৃতি, জীবনচর্যা, অতিপ্রাকৃত শক্তি, তুকতাক, আত্মা, ডাইনি, ওঝা, ঐশীশক্তি, সর্বপ্রাণবাদ।

মূল আলোচনা :

লোকসংস্কৃতি হল লোকসমাজের মানুষদের ঐতিহ্য পরম্পরায় জীবনচর্যা ও মনন-চর্চার ফসল। মানুষের জীবনচর্চার বস্তুগত ও অবস্তুগত তথা শৈল্পিক অনুভূতির যে সম্যক কৃতি তাই-ই হল সংস্কৃতি [১]। আদিম আচার-অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার,

আদিম ধর্মভাবনা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে সাঁওতাল জনজাতির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

ভারতের মাটিতে সাঁওতাল জনজাতির বসবাস আদিম যুগ থেকে। তারা প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড (Proto-Australaid) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত [২]। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ।প্রায় সব জেলাতেই সাঁওতাল জনজাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে তারা মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মালদহ জেলায় পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আসছে। এইসব জায়গায় তাদের যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তা রীতিমতো ইতিহাস প্রসিদ্ধ বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এমনকি ভারতের বাইরে বাংলাদেশ ও নেপালেও সাঁওতাল জনজাতি দেখা যায়। সাঁওতাল জনজাতির মানুষেরা যেমন বিভিন্ন পরবের নাচে-গানে, অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে তেমনি তারা বহুবিধ অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতিও গভীরভাবে আস্থা বা বিশ্বাস রাখে। ভারতীয় আদিবাসী জনজাতিদের জীবনচর্যা পর্যালোচনা করলেই বহুবিধ অতিপ্রাকৃত শক্তি পরিলক্ষিত হয়। এই 'অতিপ্রাকৃত শক্তি' বলতে বোঝায় 'বোঙ্গা' বা' আত্মা বা মানুষরূপী ভূত' [৩]। অর্থাৎ মানুষের জন্মলগ্ন থেকে এক অজানা ভয় মানুষকে ঘিরে আছে। সে ভয় থেকে মানুষ এখনও মুক্ত হতে পারেনি। সাধারণত প্রত্যেক মানুষের জীবনে এই অতিপ্রাকৃত ব্যাপার কিছু না কিছু ঘটে থাকে। যা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বোঝানো যায় না। যা কেবল মনের মধ্যে অনুভব করা যায়। অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে আমাদের সকলের মনের গভীরে একটা আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ জাগে। যা বিশ্বজগতের সাথে বিজড়িত হয়ে আছে। এই বিশ্বজগৎকে অতিক্রম করে থাকে বিদ্যমান কার্যকর এক অশরীরী শক্তি। সাধারণ মানুষ এই অশরীরী শক্তির প্রতি একটা পূর্ণ বিশ্বাস গ্রহণ করে থাকে। তাদের কাছে এই বিশ্বাস ভৌতিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক বা মানবিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কিন্তু তা উপলব্ধি বা অনুভূতির মাধ্যমে সহজ ও সত্য বলেই প্রতিভাত হয়।

এই অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রয়াস আদিবাসী জনজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। বেশিরভাগ আদিবাসী জনগোষ্ঠীই আত্মায় বিশ্বাসী। তাদের মতে আত্মা দুই প্রকার। একটি হল 'দেহগত আত্মা' ও আর অন্যটি হল 'মুক্তআত্মা' বা 'স্বাধীন আত্মা'। মানুষ যখন ঘুমোয় তখন এই 'মুক্ত আত্মা' সাময়িক ভাবে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। সেই সময় এই আত্মা নানান স্থানে ঘোরাফেরা করে আবার সেই দেহে ফিরে আসে। এর ফলে মানুষ বিভিন্ন স্থানের সব ঘটনা স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পারে। আবার এই আত্মা অন্যের দেহেও প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু 'দেহগত আত্মা' হল খুব বিপদজনক আত্মা। এই আত্মা একবার মানুষের শরীর থেকে বেরিয়ে গেলেই আর ফিরে আসে না। তখন মানুষের মৃত্যু ঘটে। মানুষের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যা সাঁওতালিতে 'বোঙ্গা' নামে পরিচিত [৪]। সাঁওতাল জনজাতিদের বিশ্বাস সমস্ত জাগতিক ঘটনার পেছনে বোঙ্গাদের হাত থাকে। তাদের

মতে, 'ওরাঃবোঙ্গা' এবং 'আবগেবোঙ্গা' হল সাঁওতালদের পারিবারিক দেবতা। এইসব বোঙ্গারাই তাদের পরিবারের রক্ষাকর্তা এবং জাগতিক সমৃদ্ধি দান করেন। তাই তারা এইসব বোঙ্গাদের সাথে মধুর সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করে। বাড়িতে কারোর অসুখ বিসুখ হলে এইসব শুভাকাঙ্ক্ষী বোঙ্গাদের প্রতি তারা আবেদন জানায়। এইসব শুভাকাঙ্ক্ষী বোঙ্গারা স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রার ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও সাঁওতাল সমাজে কিছু কিছু অনিষ্টকারী বোঙ্গাও রয়েছে যারা তাদের সমাজের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। মানুষের ভালোমন্দের জন্য এঁরা অনেকাংশে দায়ী। তাই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বিভিন্ন রকম পূজার্চনা অর্পণ করে থাকে।

ভারতের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে অবস্থিত সাঁওতাল জনজাতিদের মধ্যে এখনও অতিপ্রাকৃত শক্তির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাদের জীবনচর্যায় প্রতিফলিত সেইরকম কিছু অতিপ্রাকৃত শক্তির ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হল –

- **তুকতাক বা মন্ত্র :-** 'তুকতাক' হল এক ধরনের জাদুমন্ত্রের প্রচেষ্টা। বিভিন্ন অঞ্চলের পারদর্শী গুনিন, ওঝা ও জাদুকরেরা নির্দিষ্ট কতকগুলি শব্দকে অঙ্গভঙ্গি সহকারে বিভিন্ন উদ্দেশে ব্যবহার করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের ওঝা সম্পন্ন ব্যক্তির অভাব নেই। কোনো ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা কোনো বিপদ-আপদ ঘটলে ওই সকল পারদর্শী ওঝা সম্পন্ন ব্যক্তিরা অসুস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে নানা ধরনের মন্ত্র পাঠ করতে থাকে এবং তার সাথে সাথে অসুস্থ ব্যক্তির আপাত-মস্তক হাত বুলাতে থাকে। আবার কখনো কখনো পানীয় জলকে মন্ত্রপূত করে তা অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করার ব্যবস্থা করে দেয়। সেই মন্ত্রপূত জলের প্রভাবে অসুস্থ ব্যক্তির ব্যাধি সেরে ওঠে। এছাড়াও সাঁওতাল জনজাতিরা শিকারে বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে নানা রকমের মন্ত্র পাঠ করতে থাকে এবং যাতে তারা খুব সহজে শিকার করতে পারে এবং কোনো কিছুর সমস্যার সম্মুখীন যাতে না হয়। আবার কোথাও যাত্রা করার পূর্বে সাঁওতাল জনজাতিরা নানা রককের মন্ত্র পাঠ করে থাকে, যাতে তাদের যাত্রাকালীন কোনো রকম বিপদ-আপদ না ঘটে। সাঁওতাল জনজাতিদের মতে এগুলি কেবলমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ সমষ্টি নয় – এর মধ্যে রয়েছে অতিপ্রাকৃত শক্তি [৫]।
- **জাদুতন্ত্র বা Magic :-**সভ্যতার আদি যুগ থেকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী যাদুবিদ্যা বা Magic এ বিশ্বাসী ছিল। এই বিশ্বাস থেকে আজও সাঁওতাল জনজাতি সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হতে পারেনি। তারা মনে করত প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের ঘটনার পেছনে কোনো না কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির হাত আছে। এই প্রাকৃতিক শক্তিকে বশে আনার কৃত্রিম পন্থা থেকেই যাদুর উৎপত্তি। "বিখ্যাত ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক স্যার জেমস ফ্রেজার মনে করেন যাদু হল প্রাকৃতিক

নিয়মের নকল বা অনুকরণ পদ্ধতি, একটি ভ্রান্ত বিজ্ঞান ও বিফল কলাকৌশল” [৬]।

যাদুর দুটি দিক আছে – একটি হল তাত্ত্বিক দিক এবং অপরটি হল ব্যবহারিক দিক। প্রথমটি কার্যকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান আরোপ করে এবং দ্বিতীয়টি ব্যবহারিক জীবনে চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে তার প্রয়োগ ঘটায়। এই ব্যবহারিক যাদুর প্রচলন এখনও বহু আদিবাসী সমাজে লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন ধরনের ওঝাগিরি, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, জলপড়া ইত্যাদি সমপর্যায়ের যাদুকৌশল।

আমাদের দেশে যাদুতন্ত্র বিশ্বাসকে ভিত্তি করে আদিবাসী সমাজে রোগ নির্ণয় ও রোগমুক্ত করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। নানা রকম রোগের সঙ্গে নানা প্রকার অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণা জড়িত। অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলিকে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও তা কিন্তু যুক্তিনির্ভরশীল হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে কোনো গ্রামে মহামারি হলে দেব-দেবীর অপ্রসন্নতাই মূল কারণ হিসাবে অনুমান করা হয়। আদিবাসী গ্রামগুলিকে ‘গ্রামবাঁধা’ মন্ত্রস্বরূপ আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেঁধে দেওয়া হয়। যাতে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে কোনো রোগ গ্রামে প্রবেশ করে প্রাণনাশ ঘটাতে না পারে। সাঁওতাল সমাজের ‘পুরোহিত’ অর্থাৎ মাঝি গ্রামের চার সীমানায় ‘গ্রামবাঁধা’ মন্ত্র পড়ে মুরগি বুলি দিয়ে দেব-দেবীর সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে গ্রাম বেঁধে দেন। এগুলির মধ্যে কোনো যুক্তিনির্ভরশীল কারণ পাওয়া যায় না। তাই এইসব মন্ত্রগুলি অতিপ্রাকৃত শক্তি হিসেবে কাজ করে।

- **মানা** (Mana) :- মানা হল এক প্রকারের ঐশীশক্তি। যা অন্যান্য শক্তি থেকে আলাদা। এই ঐশীশক্তিকে অতিপ্রাকৃত বা অশরীরী শক্তির বিকাশ বলে ধরে নেওয়া হয়। এই শক্তি অনেকটা বিদ্যুতের মতো গতিশীল। অর্থাৎ যার কর্মক্ষমতা বা দক্ষতার মূলে রয়েছে এই শক্তি। এই ঐশীশক্তির প্রভাবে কোনো প্রাণী বা বস্তু বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়। তাছাড়া কোনো ব্যক্তির পরাজয়ের পেছনে এই ঐশীশক্তির অভাব লক্ষ করা যায়। তাই একজন সৈনিক এই সমস্ত ঐশীশক্তিকে নিজের মধ্যে আহৃত করে উত্তম যোদ্ধারূপে পরিগণিত হয়। ছোটোনাগপুরের সাঁওতাল, মুন্ডা, হো সম্প্রদায়ের মানুষ ‘বোঙ্গা’ বিশ্বাসকে ঐশীশক্তির নামান্তর বলে স্বীকার করে।
- **সর্বপ্রাণবাদ** (Animism) :- সর্বপ্রাণবাদের অন্যতম প্রবক্তা হলেন Marrett। তাঁর মতে বিশ্বে সব কিছুর মধ্যেই প্রাণের উপস্থিতি এবং অশরীরী যাদুশক্তি অনুভব করা যায়। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ সর্বপ্রাণবাদে গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে –

“সারি সারজম বুটারে ধিরিগে বোঙ্গা।
ধিরিগেবন বঙ্গায় বাহারে।” [৭]

অর্থাৎ সত্য শালগাছের তলায় পাথরেই তাদের ধর্মীয় দেবতা। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে তারা পাথরকেই দেবতা মেনে পূজো করে। 'বাহা' পরব তাদের ধর্মীয় উৎসব। তাই তারা 'বাহা' পরবে জাহের থানে দেবতা স্বরূপ পাথরকে পূজো করে। তারা মনে করে কেবলমাত্র জীবন্ত বস্তুর মধ্যেই নয়, সকল পদার্থের মধ্যেই অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে।

সাধারণ মানুষ অথবা সাঁওতাল জনগোষ্ঠী প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আত্মার কল্পনা করে থাকে। তারা মনে করে এই আত্মার জন্যই প্রাণী জীবন্ত থাকে আর আত্মা না থাকলে জড় পদার্থে পরিণত হয়। তাদের মতে আত্মা হল এক কায়াহীন ছায়া বা বাষ্পের মতো যা অপ্রতীয়মান বা অদৃশ্য থাকে। মানুষের অতীন্দ্রিয়ের সাহায্যে এর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

- **জড়-প্রাণবাদ (Animatism) :-** জড়-প্রাণবাদ হল এক প্রকারের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের মাধ্যমে কোনো জড় পদার্থকে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বলে কল্পনা করা হয়। সাধারণত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই জড়-প্রাণবাদ সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্বাসী। তারা মনে করে যে-কোনো শক্তি যে-কোনো বস্তুতে বিরাজমান থেকে সাধারণ মানুষের ভীতি বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে। যেমন সাঁওতাল জনজাতিরা তাদের ধর্মীয় উৎসব 'বাহা' পরবে দেবতাস্বরূপ পাথরকে পূজো করে থাকে। তারা ভাবে যে পাথরই তাদের আদি দেবতা অর্থাৎ মারাংবুরু। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকে। এছাড়াও কোনো প্রাচীন জলাশয়ে সাধারণ মানুষ স্নান করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখে পড়তে হলে জলাশয়ের প্রতি ভীতির সঞ্চার জাগে। ফলে সাধারণ মানুষ ওই জলাশয়কে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারা মনে করে ওই জলাশয়ের অতিপ্রাকৃত শক্তি রয়েছে এবং তার ফলেই সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর মুখে পড়তে হয়।
- **ভবিষ্যৎ কথন :-** আদিবাসী সমাজে 'ভবিষ্যৎ কথন' হল অতিপ্রাকৃত শক্তির এক বিশেষ দিক। তারা মনে করে যে-কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির রহস্য উদঘাটনের জন্যে প্রত্যেক গুণিনকে দক্ষতা অর্জন করতে হয় ভবিষ্যৎ কথন পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতির জন্য কতকগুলো উপাদান যেমন- জল, তেল, সরষে, নুন ও হলুদ গাছ একান্ত প্রয়োজন। সাঁওতাল জনজাতিদের মধ্যে এই জলপড়া, তেলপড়া, সরষে পড়া ইত্যাদি বিষয়ক মন্ত্র এখনও বহুল প্রচলিত আছে। তারা মনে করে গ্রামের গুণিন কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে এই সমস্ত মন্ত্র প্রয়োগ করে দিলেই সেরে ওঠে। গুণিন এই সমস্ত জলপড়া, তেলপড়া, সরষে পড়া ইত্যাদি বিষয়ক মন্ত্র প্রয়োগ করে এক হাতের পাঁচ আঙ্গুলের নখদর্পণে পরিণত করে এবং তারই সাহায্যে দুষ্টুশক্তির অবস্থান লক্ষ করতে পারে। আবার কখনো কখনো কোনো ব্যক্তির বিপদ-আপদ অথবা ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে সে সম্পর্কেও গুণিন ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে।

- **ডাইনি ও ওঝাদের গুপ্তবিদ্যা :**-সাঁওতাল জনজাতিদের মধ্যে 'ডাইনি' ও 'ওঝাদের' গুপ্তবিদ্যা সম্পর্কে বিচিত্র রকমের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের বিশ্বাস 'ডাইনি' মাত্রই যে-কোনো ব্যক্তিকে চোখের নিমেষে শেষ করে দিতে পারে। তাই তাদের সমাজে 'ডাইনি' ভীতি বড়ই ভয়ংকর। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কোনো এক ব্যক্তি হঠাৎ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কিংবা রোগে জরাজীর্ণ অবস্থায় মারা গেলে, ডাইনির মারণমন্ত্রের প্রভাব পড়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। তখন তারা গ্রামের একমাত্র রক্ষাকর্তা ওঝা বা গুণিনের কাছে পরামর্শ নিতে ছুটে আসে। তারা মনে করে ওঝা বা গুণিন ছাড়া নিরাপত্তার জাদুমন্ত্র আর কারও হাতে থাকে না। তাই সাঁওতাল জনজাতি মানুষেরা যে-কোনো বিপদে-আপদে ওঝা বা গুণিনের শরণাপন্ন হয়।

অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্পর্কে সাঁওতাল জনজাতিদের মধ্যে যে সমস্ত ধ্যান-ধারণা প্রচলিত তারই কিছু কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দেশে বহু রকমের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত। এই সমস্ত বিশ্বাসের ফলেই আদিবাসী সমাজে গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারীদের বিচিত্র রকমের অতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রিয়াকলাপের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

তথ্যসূত্র :

১। সেনগুপ্ত, শ্যামশ্রী বিশ্বাস, (জানুয়ারি, ২০১২), "লোকপ্রসঙ্গ : অন্দর বাহির", কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং। পৃষ্ঠা – ১৪

২। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, (মে, ১৯৮৭), "পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ –প্রথম খন্ড" কলকাতা, সন্তোষী প্রিন্টার্স। পৃষ্ঠা – ১৮৫

৩। ঘোষ, অমলকুমার, (জুলাই, ১৯৮৯), "বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত", কলকাতা, পুস্তক বিপণি। পৃষ্ঠা – ৪

৪। মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, (অক্টোবর, ২০০৪), "আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি", লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃষ্ঠা – ২৯৬

৫। ভৌমিক, প্রবোধকুমার, (জানুয়ারি, ১৯৯৪), "প্রত্যন্ত বাংলায় গুপ্তবিদ্যা", কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং। পৃষ্ঠা – ১৪৮

৬। মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, (অক্টোবর, ২০০৪), "আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি", লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃষ্ঠা – ৩০১

৭। কর্মকার, জলধর, (২০২১), "ঐক্য ভাবনায় সাঁওতালি সমাজ ও সংস্কৃতি", নিউ দিল্লী, ট্যুরিয়ান পাবলিকেশন। পৃষ্ঠা- ৩২

সাম্যবাদী চেতনায় উদ্ভাসিত : কবি কাজী নজরুল ইসলাম

পুতুল বৈদ্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
জলঙ্গী মহাবিদ্যালয়, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ

সংক্ষিপ্তসার : সাম্যবাদের আদর্শ বুকে আঁকড়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বমানবতার কথা ঘোষণা করেন। বিশ্বমানব সংসারে তিনি মানুষকেই ভালোবাসার কথা বলেছেন। তিনি শ্রমিক শ্রেণির বঞ্চনার, শোষণের দুঃখকথা বর্ণনা করেছেন। স্বার্থান্বেষী মানুষের দল রাজনীতি বা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে পৃথিবীকে কলুষিত করছে প্রতিমুহূর্তে। কবি তারই প্রতিবাদে সোচ্চার। তিনি ঘূণধরা সমাজকে সংস্কার করতে বদ্ধপরিকর। তিনি সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচার ব্রিটিশ শাসক এবং কালোবাজারী লোভী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। বিদ্রোহের আগুন বুকে নিয়ে কবি অবহেলিত বঞ্চিত মানুষের বাঁচার মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন তাঁর কবিতাগুলিতে। নজরুল ইসলামের কবিতায় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সাধারণ মানুষের সংগ্রামের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি দারিদ্র্য, নিপীড়িত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আর্ত-বেদনাকে তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়।
সূচক শব্দ : সাম্যবাদ, বঞ্জনা, শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী, আর্ত-বেদনা।

মূল আলোচনা :

গাহি সাম্যের গান---
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান! ('সাম্যবাদী'/ সর্বহারা)

কাজী নজরুল ইসলাম(১৮৯৯-১৯৭৬) বিংশ শতাব্দীর প্রধান বাঙালি কবি। দুঃখ-দারিদ্র্যময় বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনচর্যায় কবি নজরুল ইসলামের জীবন আবর্তসংকুল। অল্প বয়সে পিতৃহারা, ইসলামিক শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চা, সেনাবাহিনীর জীবন—সব মিলিয়ে নজরুল ইসলাম বাস্তব জীবন, সমাজ ও দেশ উপলব্ধি করেছেন প্রত্যক্ষভাবে। পরাধীন ভারতবর্ষের চিত্র যেমন তাঁকে ব্যথিত করেছে, তেমনি সমাজের নানান বৈষম্যও তাঁর হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ ঘটিয়েছে। তাঁর অন্তরাত্মা বিদ্রোহের আগুনে বিস্ফোরিত। প্রতিবাদী ও সাম্যবাদী চেতনায় উদ্ভাসিত তাঁর কবি চেতনা। সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকগণ বহমান রবীন্দ্র-আধুনিকতার মোহজালে বিমুগ্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা ছাড়া বাংলা সাহিত্য জগৎ-এ নতুন কোন ভাবনার অবকাশ ছিল না। ঠিক তখনই কাজী নজরুল

ইসলাম উপমহাদেশের মুক্তির জন্য উপযোগী স্বাধীনতার ভাষা ব্যবহার করে বাংলা কাব্যাকাশে আবির্ভূত হলেন। তাঁর কবিতায় প্রতিবাদের ভাষা, নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ভাষা, গরীবের বঞ্চনার ভাষা উদ্ভাসিত হয়ে বাংলা কাব্যজগতকে নতুন দিশা দান করেছে। বাংলা কাব্যজগতে রাবীন্দ্রিক মায়াজাল ছিন্ন করে নজরুল ইসলামের এই আবির্ভাব সমগ্র কবিকূল অপার বিস্ময়ে রবীন্দ্রকাব্যজগৎ থেকে বাংলা কাব্যের নতুন রাস্তার সন্ধান পেয়ে যান। মুসলিম পরিবারে জন্ম হওয়ার ফলে তিনি ইসলামিক সংস্কৃতি এবং ভাষা কবিতায় ব্যবহার করে বাংলা কাব্যে নতুনত্বের আমদানি করেছেন। তাঁর তেজদীপ্ত উচ্চারণ বাংলা কবিতাকে অন্য মাত্রা দান করেছে। স্বাধীনতা, মানবতাবাদ এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের অকপট ঘোষণায় তাঁর কবিতাগুলি ভাস্বর। নজরুল ইসলামের কবিতায় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সাধারণ মানুষের সংগ্রামের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা চিন্তার বৈচিত্র্য, অবজ্ঞার চেতনা এবং অত্যাচার প্রতিরোধের আহ্বান দ্বারা চিহ্নিত। তিনি তাঁর কবিতায় মানবতাবাদ ও সাম্যবাদ এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সর্বদা কথা বলেছেন। তাঁর কবিতাগুলি সামাজিক ভাষ্যের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তিনি দারিদ্র্য, নিপীড়িত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আর্ত-বেদনাকে তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়।

আগ্নেয়গিরির ধূমাগ্নির মতো কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যাকাশে আবির্ভূত হয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের আত্মগ্লানিতে তিনি জর্জরিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে কোন কবি এত কঠোর ভাষায় তিরস্কৃত করেননি। দেশের মুক্তি ও ব্রিটিশ বিতাড়ন এবং নিপীড়িত সাধারণ মানুষের জন্য অধিকার আদায়ের কথা তাঁর কবিতা বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে উপস্থিত হয়। ‘‘উপমহাদেশের মুক্তির জন্য উপযোগী স্বাধীনতার ভাষা উচ্চারণকারী কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম। আধুনিক বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কবি। যার কবিতায় ঔপনিবেশিক শাসক শোষণের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। আর মুসলমান কবিদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যাপকভাবে হিন্দু দেবদেবী ও পুরাণকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি তার সময়কার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে গানে কবিতায় ভাষা দিতে গিয়ে গিয়েও। ‘পিনাকপাণির ডমরু ত্রিশূল ধর্মরাজ্যের দণ্ড’ এরকম একটি পঙ্‌ক্তি রচনার সাধ্য তার সমসাময়িক কোনো কবির পক্ষে কল্পনারও অতীত ছিল।’’[১] কাজী নজরুল ইসলাম যেন ‘বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির’। তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি বাংলা কাব্যের জগতে একটি মাইলস্টোন। বিদ্রোহের আগুন ও প্রতিবাদের ঝড় নিয়ে সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করে মানবিক ও সাম্যবাদী চেতনার স্ফুরণে তাঁর কবিতাগুলি উদ্ভাসিত। নজরুল ইসলামের প্রতিবাদী সত্তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে ‘অগ্নিবীণা’(১৯২২), ‘বিষের বাশি’(১৯২৪), ‘ভাঙ্গার গান’(১৯২৪), ‘সাম্যবাদী’(১৯২৫), ‘সর্বহারা’(১৯২৬), ‘প্রলয় শিখা’(১৯৩০)

প্রভৃতি কাব্যে। কবি নজরুলের অন্তরাত্মার প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের ভাষা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতায়। টর্নেডোর মহা প্রলয়ের মতো তাঁর কবি সত্তা সমস্ত নৃশংসতাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে চায়। তিনি যেন অকাল বৈশাখীর বিদ্রোহী-সূত এই বিশ্ব-বিধাত্রীর। কবি সাইক্লোন হয়ে নিমেষে ধবংস করতে চান সমস্ত নিপীড়ন-শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচারকে। বিদ্রোহের আগুনে কবি-মন উন্মাদ। যৌবনের মত্ততায় কবি যেন আগ্নেয়গিরির বহ্নি, পৃথিবীর ভূ-কম্পন। তিনি চির-দুর্জয়। তিনি চির বিদ্রোহী বীর এক চির উন্নত শির। শোষণ-পীড়ন-অত্যাচারের জ্বালা-যন্ত্রণা কী পরিমাণ হৃদয়ে জমলে কোন কবি বলতে পারেন- তিনি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবানের বুকে এঁকে দিতে চান পদচিহ্ন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম অকুতোভয়। কবি সেদিনই শান্ত হবেন যেদিন বিশ্বের সমস্ত অনাসৃষ্টি ধ্বংস হবে:

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
(‘বিদ্রোহী’/ অগ্নি-বীণা)

‘বিদ্রোহী’ শুধু নজরুল ইসলামের কবিতার রাজ্যে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ধারায় উজ্জ্বল সংযোজন। ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি সর্ববন্ধন মুক্ত ব্যক্তি মানুষের আত্মজাগরণ। মানুষ যদি নির্ভীক, মুক্ত ও স্বাধীন হতে চায় তাহলে তাকে এই আত্মজাগরণ ঘটাতে হবে। এ জাগরণ ব্যক্তির খেয়াল মাত্র নয়, এটি সমষ্টির মুক্তি আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। কবি কাজী নজরুল ইসলাম ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। সমসাময়িক পরাধীন ভারতবর্ষের বেদনা কবি চিত্তকে উন্মথিত করেছে। একই সঙ্গে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি কামনা করেছেন। তিনি নতুন বিশ্ব সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছেন।

কবি নজরুল ইসলাম মেকি ধার্মিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার। জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা একটি সমাজকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। সমাজের এই মূল সম্যসাকে কবি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। জাতপাতের নামে সমাজের উঁচুজাতের হাতে নীচুজাতের প্রতিনিয়ত অত্যাচার-উৎপীড়ন-নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার বাস্তব ছবি নজরুল ইসলাম ‘জাতের নামে বজ্জাতি’ কবিতায় তুলে ধরেছেন। মানবপ্রেম এবং মানবতাই যে প্রকৃত মানুষকে মানুষ করে তুলতে পারে – তা তিনি বারবার বলেছেন। হিন্দু এবং মুসলমানের গোঁড়ামিত্ব পরিত্যাগ করে প্রকৃত মানববন্ধনে উভয়কে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করেছেন তিনি। একটি সুস্থ সমাজ গড়ার ডাক দিয়েছেন তিনি। কারণ “জাতপাতের কঠোরতা এ সমাজকে করে তুলেছে অচল, অনড়, মৃৎবৎ। জাত জাত করে সমস্ত দেশটা যে উচ্ছন্নে গেল, সে জ্ঞান আমাদের লুপ্ত হয়েছে। নজরুল তাই জাতির পাঁতি মানেন না, বিদ্রোহ

করেন। সংস্কারমুক্ত সুস্থ সবল ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে চান তিনি। না, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাননি তিনি। আপোস করেননি।"[২] জাতির ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হচ্ছে মানুষের মন্যুষত্ব বিসর্জিত হয়েছে বলেই। মানুষ বিবেকবোধ বন্ধক দিয়েছে অন্যের কাছে। কিংবা বলা যায় মানুষ তার আপন সত্ত্বাকে বিকিয়ে দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষময়তায়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানুষের মনুষত্ব ও হারিয়ে যাওয়া বিবেকবোধকে জাগ্রত করার ব্রত গ্রহণ করেছেন। 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' ও 'আমার কৈফিয়াৎ' কবিতা দুটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ। 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতাটিতে কবি হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ ও দাঙ্গার বিরুদ্ধে সাবধান মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। মানবতার ধ্বজাধারী কাণ্ডারীকে আরও শক্ত হাতে হাল ধরে মানবসভ্যতার অগ্রগমনের যাত্রাপথের কথা ঘোষণা করেন কবি। "তিনি সমগ্র ভেদ-বিভেদ-কলুষিত ভারতের মধ্যে এবং হিংসা-হানাহানি-বিধ্বস্ত ভারত জনজীবনের মধ্যে প্রদীপ্ত আধ্যাত্মিকতার অনির্বাণ বহ্নি। এই আধ্যাত্মিকতা প্রসারিত হয়েছিল জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে, সার্থক মনুষ্যত্বের আদর্শে উদ্বোধিত হবার আহ্বানে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে অনুপ্রেরণা সঞ্চারের তীব্র আগ্রহে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজতজয়ন্তী সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন—"আমাকে কেবল মুসলমান বলে দেখবেন না। আমি যদি আসি, আসব হিন্দু-মুসলমান সকল জাতির ঊর্ধে—যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাঁরই দাস হয়ে।" মানুষ—মানুষ—মানুষ: ধর্মীয় সংকীর্ণতা নয়, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প নয়; আগামী দিনে চলার পথ মানব-হৃদয়-বন্ধন—দেশের জনজীবনে ঐক্য—"[৩] মানবতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মন্ত্র হৃদয়ে নিয়ে তিনি ঔপনিবেশিক শাসকদলের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কবি তাই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন—

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ মুক্তি পণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

('কাণ্ডারী হুশিয়ার'/সর্বহারা)

কবি আরও উচ্চারণ করেন—

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার!
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুশিয়ার!

('কাণ্ডারী হুশিয়ার'/সর্বহারা)

ব্রিটিশ শাসকগণ বাঙালি জাতিকে তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার রাজনৈতিক মত্ততার বিরুদ্ধে কবি সোচ্চার হয়েছেন। তাদের সেই চক্রান্তকে উপলব্ধি করে কবি হিন্দু-মুসলমান জাতির ঐক্য বন্ধন বজায় রাখার আহ্বান করেছেন। কবি তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানকে ব্যর্থ হতে দিতে চান না। তাঁরা তো নিজের জাতের জন্য বলিদান দেন নি। তাঁরা দেশের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। নজরুল ইসলাম তাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাঙালি জাতিকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম মানবতার দূত রূপে বাংলা কবিতার জগতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি মানবতার পক্ষে কলম ধরেছেন। সত্য-ন্যায়-মানবতা-সাম্যবাদ-অধিকার আদায়ের জন্য সাধারণ মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠে মানব কল্যাণের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি। হিন্দু-মুসলমান সমাজের ঠুনকো সাম্প্রদায়িকতার জন্য কখনোই দেশের ক্ষতি হোক তিনি তা চাননি। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'ছুঁতমার্গ' প্রবন্ধে তাঁর অন্তরের কথা ব্যক্ত করেছেন—''হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমা-হারা মুক্তির মাঠে দাঁড়াইয়া—মানব!—তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বলো দেখি, ''আমার মানুষ ধর্ম।' দেখিবে, দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই উপেক্ষিত জন-সঙ্ঘকে বুক দাও দেখি, দেখিবে এই দেহের ঈষৎ পরশ পাওয়ার গৌরবে তাহাদের মাঝে ত্যাগের একটা কী বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগে! এই অভিমানীদিগকে বুক দিয়া ভাই বলিয়া পাশে দাঁড় করাইতে পারিলে ভারতে মহাজাতির সৃষ্টি হইবে, নতুবা নয়। মানবতার এই মহা-যুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলো যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ—তুমি সত্য।''[৪] কবিকে সমসাময়িক কালের নিন্দুকেরা, রাজনৈতিক দলের মাতব্বর দালালেরা, মেকি ধার্মিকগণ বিভিন্ন ভাবে তাঁকে আক্রমণ করেছেন। এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও সমালোচনা করেছেন। তাঁর কাব্য শুধুমাত্র যৌবনের উচ্ছ্বাস—এমন কথাও শুনতে হয়েছে তাঁকে। সমালোচকগণ তাঁর কাব্য ভবিষ্যতে বাংলা কাব্যের জগতে ঠাঁই করতে পারবে না বলে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু কবি এসবের কোন পরোয়া করেননি। ভবিষ্যতের চিন্তা তিনি করেন না; তিনি বর্তমানের সমস্যাকে তুলে ধরে বর্তমানের কবি হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। তিনি কোন পলিটিক্সের নাগপাশে নিজেকে আবদ্ধ করেননি। তিনি সাম্যবাদের মন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই তিনি ভণ্ড ধার্মিক ও ভণ্ড মতাদর্শের রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায়। কবির কবিতা নিন্দুকগণের ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু তাঁর কবিতার বিদ্রোহের আগুনে ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ে গিয়েছিল সেদিন। তাই 'রাজ-সরকার রেখেছে মান!' অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার তাঁর কবিতার মূল্য বুঝেছেন। তাঁর কবিতা সে সময়ে জনগণের অন্তরে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল। স্বদেশ স্বাধীনতার জন্য শুধু

পথ চেয়ে অপেক্ষা করলে চলবে না কিংবা ক্ষুধার আগুন পেটে নিয়ে ভিক্ষে করলে চলবে না। অধিকার লড়াই করে আদায় করে নিতে হয়। যে দেশের স্বার্থলোভী ভণ্ড রাজনীতিবিদরা স্বাধীনতার নাম করে কোটি কোটি ক্ষুধার্ত শিশুর গ্রাস নিজেরা ভোগ করে। সে সমাজে স্বরাজ আশা সম্ভব নয়। জীবন সংগ্রামে ব্রত কবি কাজী নজরুল ইসলাম এসব কিছুই পরোয়া করেন না। তিনি আপোষহীন ভাষায় প্রতিবাদের আগুন ঝরান তাঁর কবিতায়:

> পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
> মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে!
> প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
> যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!

('আমার কৈফিয়াৎ'/ সর্বহারা)

সাম্যবাদের আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে কবি বিশ্বমানব সংসারে মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেছেন। স্বার্থান্বেষী মানুষের দল মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে সমাজ, দেশ ও পৃথিবীকে করে তুলেছে কলুষিত। এই স্বার্থান্বেষী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কবি অসন্তুষ্ট ও প্রতিবাদী। তিনি দুর্বল-নিপীড়িত মানুষের পাশে বরাবরই দাঁড়িয়েছেন। 'কুলি-মজুর' কবিতায় কবি এই দুর্বল শ্রেণির মহা-বেদনা উপলব্ধি করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী, বুর্জোয়াদের প্রতি কবি ঘৃণা বর্ষণ করেছেন। ঘূণ ধরা সমাজে অন্তঃসারশূন্য বিশ্বমানবতার বন্ধনে আবদ্ধ সমাজ। কবি সেই সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন সাম্যবাদের বাণী অন্তরে ধারণ করে। তিনি মানুষের মাঝে, সমাজের বুকে ভেদাভেদকে ভীষণভাবে অপচ্ছন্দ করতেন। সমকালীন সময়ে তাঁর কবিতাগুলি ছিল যেন আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভার মতো। তাঁর কবিতাগুলি বাংলা কাব্য জগতে এক প্রোজ্জ্বলিত শিখার ন্যায়। যেগুলি চিরকাল প্রতিবাদী চেতনার মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে রাখে।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন কোন নিয়মের বেড়া জালে আটকা পড়ে থাকেনি। তাঁর জীবনপ্রবাহের মতো তাঁর কবিতাগুলিও নিজস্ব চিন্তা চেতনায় উদ্ভাসিত। নজরুল ইসলাম ছিলেন এক মহৎপ্রাণ। যিনি বাঙালির অফুরন্ত আবেগ, বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস এবং প্রবল প্রাণশক্তিকে আপন আত্মায় ধারণ করে সারা জীবন বিদ্রোহ, সাম্য ও মানবতার মর্মবাণী শুনিয়েছেন। অনাচার ও আত্যাচার প্রতিরোধে উৎপীড়িতের চিরদিনের প্রেরণা তিনি। নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-জৈন-বৌদ্ধ-শিখ-পারসিক সহ সকল ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতা-সংগ্রাম চিন্তা, সাম্যবাদ, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ—সবকিছুকে ঐক্যসূত্রে বেঁধেছেন। "যেন তিনি এক রাজ্যহারা মুগ্ধ মুসলমান রাজা যিনি শিবের গাজন গেয়ে উপনিবেশিক দাসত্বকে তার বিপুল প্রজাসাধারণকে বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছেন।"[৫] বাংলা সাহিত্যজগতে প্রতিবাদী ও সাম্যবাদী চেতনায় উদ্ভাসিত কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন বীণা থেমে যায়

১৯৭৬ সালের ২৯শে অগাস্ট। যে কবি সারাটা জীবন স্বদেশ ও নিপীড়িত মানুষের জন্য কলম ধরেছেন সেই কবি জীবনের শেষ যাত্রায় আপন জন্মভিটেয় স্থান পাননি। কবির ছোটবেলার ডাকনাম 'দুখু মিঞা', জীবনের অন্তিম পর্যায়েও সেই নাম সার্থক হয়ে যায় তাঁর ক্ষেত্রে। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার সঞ্জীবনী সুধা আজও অন্যায় অবিচার প্রতিবাদের ভাষায় মুখর।

তথ্যসূত্র :

১. আল মাহমুদ। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, 'নজরুলের ভাষা বিদ্রোহ', পৃষ্ঠা-৪৫, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, আদর্শ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২. পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা(১৯০৬)। কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা। মানস মজুমদার, 'কাজী নজরুল ইসলামঃ আপোষহীন কবি', পৃষ্ঠা-৩২।

৩. পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা(১৯০৬)। কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা। স্নেহময় সিংহ রায়, 'বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাবনায় স্বদেশ ও বিশ্ব', পৃষ্ঠা-১১২।

৪. পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা(১৯০৬)। কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা। কাজী নজরুল ইসলাম, 'ছুঁতমার্গ', পৃষ্ঠা-৮।

৫. আল মাহমুদ। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, 'নজরুলের ভাষা বিদ্রোহ', পৃষ্ঠা-৪৭, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, আদর্শ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. আল মাহমুদ। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, আদর্শ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২. দীপ্তি ত্রিপাঠী। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়। দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, জুলাই ২০০৩, কলকাতা।

৩. নজরুল ইসলাম। সঞ্চিতা। ডি এম লাইব্রেরী, ঊনষট্টিতম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪, কলকতা।

৪. নজরুল ইসলাম। সঞ্চিতা। ডি এম লাইব্রেরী, ঊনষট্টিতম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪, কলকতা।

৫. রফিকউল্লাহ খান। কবিতা ও সমাজ। মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৬. সৈয়দ আলী আহসান। আধুনিক বাংলা কবিতা। গতিধারা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, ঢাকা, বাংলাদেশ।

শ্রী অরবিন্দ'র দর্শনে রাষ্ট্রের ধারণা : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

তাপস পাটোয়ারী
গবেষক, দর্শন বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় সংক্ষেপ: শ্রী অরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০), একজন বিশিষ্ট ভারতীয় দার্শনিক, যোগী এবং জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি এমন এক রাষ্ট্র ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন যা আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক মাত্রার সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলিকে সংযুক্ত করে। মানব চেতনার ক্রমবর্ধমান উন্নতি সাধন করতে গিয়ে মানুষের চূড়ান্ত আধ্যাত্মিকতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মানুষ স্বাধীনতা চায়, সম্ভবের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতাই মুক্তি। কারণ স্বাধীনতা ব্যতীত জীবন পরিপূর্ণ নয়। তার সাথে ব্যক্তি নিরাপত্তা এবং যৌথ উন্নত সামাজিক জীবন চায়। কিন্তু মানুষ একসাথে সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সত্তা হওয়ায় দুটো সত্তার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো যায় না। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি মানুষের পৃথক পৃথক দিকগুলিকে উপস্থাপন করে। শ্রী অরবিন্দ তাই মানুষের পৃথক পৃথক দিকগুলিকে স্বীকার করেও এক সামগ্রিক বিশ্বতন্ত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি *মানব যুগচক্র* নামক গ্রন্থে এই বিশ্বতন্ত্রের এক রূপ উপস্থাপন করেন। যে বিশ্বতন্ত্রে স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি ঈশ্বর প্রদত্ত গুণাবলী থাকবে। সেই বিশ্বতন্ত্রে এক অতুলনীয় নতুন জীবাত্মা মানব জাতির হাল ধরবে। সেই বিশ্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা কিরূপ হবে সেই আলোচনা করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।
মূল শব্দ: আধ্যাত্মিকতা, স্বাধীনতা, ব্যষ্টি-সমষ্টি, রাষ্ট্র-সমাজ, ঐক্য-বৈচিত্র্য, নৈতিকতা।

ভূমিকা

শ্রী অরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০), একজন বিশিষ্ট ভারতীয় দার্শনিক, যোগী এবং জাতীয়তাবাদী, এমন একটি রাষ্ট্রের ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন যা আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক মাত্রার সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলিকে সংযুক্ত করে । মানব চেতনার ক্রমবর্ধমান উন্নতি সাধন করতে গিয়ে মানুষের চূড়ান্ত আধ্যাত্মিকতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন মানুষ স্বাধীনতা চায়, সম্ভবের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতাই মুক্তি। কারণ স্বাধীনতা ব্যতীত জীবন পরিপূর্ণ নয়। এক'ই সাথে ব্যক্তি নিরপত্তা এবং যৌথ উন্নত সামাজিক জীবন চায়। মানুষ একসাথে সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সত্তা হওয়ায় দুটো সত্তার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো কঠিন। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি

মানুষের পৃথক পৃথক দিকগুলিকে উপস্থাপন করে। অতীতে মানুষ একে অন্যের সাথে খারাপ আচরণ করেছে। তারা একে অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে অনেক মূল্য দিয়ে। শ্রী অরবিন্দ তাই মানুষের পৃথক পৃথক দিকগুলিকে স্বীকার করেও এক সামগ্রিক বিশ্বতন্ত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি *মানব যুগচক্র* নামক গ্রন্থে এই বিশ্বতন্ত্রের এক রূপ উপস্থাপন করেন। যে বিশ্বতন্ত্রে স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি ঈশ্বর প্রদত্ত গুণাবলী থাকবে। সেই বিশ্বতন্ত্রে এক অতুলনীয় নতুন জীবাত্মা মানব জাতির হাল ধরবে। এ বিষয়ে শ্রী অরবিন্দ "জগনাথের রথ" নামক প্রবন্ধে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা খুব প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে,

> *আদর্শ সমাজ মনুষ্য-সমষ্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন, জগন্নাথের যাত্রার রথ। ঐক্য স্বাধীনতা জ্ঞান শক্তি সেই রথের চারি চক্র। মনুষ্যবুদ্ধির গঠিত কিম্বা প্রকৃতির অশুদ্ধ প্রাণস্পন্দনের খেলায় সৃষ্ট যে সমাজ, তাহা অন্য প্রকার। এটি সমষ্টির নিয়ন্তা ভগবানের রথ নহে, মুক্ত অন্তর্যামীকে আচ্ছাদিত করিয়া যে বহুরূপী দেবতা ভগবৎ-প্রেরণাকে বিকৃত করে, ইহা সমষ্টিগত সেই অহঙ্কারের বাহন। এটি চলিতেছে নানা ভোগপূর্ণ লক্ষ্যহীন কর্ম্মপথে, বুদ্ধির অসিদ্ধ অপূর্ণ সঙ্কল্পের টানে, নিম্নপ্রকৃতির পুরাতন বা নূতন অবশ প্রেরণায়। যতদিন অহঙ্কারই কর্ত্তা, ততদিন প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব,—লক্ষ্য জানা গেলেও সেদিকে সোজা রথ চালানো অসাধ্য। অহঙ্কার যে ভাগবত পূর্ণতার প্রধান বাধা, এই তথ্য যেমন ব্যষ্টির, তেমনই সমষ্টির পক্ষেও সত্য।*

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা শ্রী অরবিন্দের রাষ্ট্রের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করবো। সেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে নিয়ে কীভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে তার রূপরেখা পাওয়া যাবে। এবং কেবল ব্যক্তি বা সমষ্টিকে গুরুত্ব দিলে কি সমস্যা হতে পারে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাবো। আমরা মূলত তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। যাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত এবং এই ব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত তার একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে যা খুবই প্রাসঙ্গিক।

সমাজ ও রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি (Spiritual Basis of Society and State)

শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে মানব সমাজের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য রাষ্ট্রসহ, আধ্যাত্মিক বিকাশকে সহজতর করা। তার মতে, রাষ্ট্রের কাজ হলো এমন পরিস্থিতি তৈরি করা যা ব্যক্তির এবং সমষ্টির আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি সহজতর করতে পারে। তিনি মূলত জড়বাদী ও অর্থনৈতিক-কেন্দ্রিক (materialistic and economic centric) শাসন ব্যবস্থার বিপরীত কথা বলেন। কেননা সেই ব্যবস্থা যথার্থ নয়। উদাহরণ হিসাবে তিনি জার্মানির নাৎসী শাসনব্যবস্থা এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা বলেন। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রের মূল ভূমিকা নাগরিকদের উচ্চতর চেতনা ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে লালন করা। তাই রাষ্ট্রের প্রকৃত সফলতা পরিমাপ করা উচিত

তার আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও আলোকপ্রাপ্তিকে (enlightenment) লালন করার ক্ষমতা দিয়ে। তাঁর মতে, "The chief bent of our twentieth century thought has been an exaggerated individualism, a passionate vindication of the rights of the ego, the fullness and freedom of its individual expression... A new society will come in which a greater harmony, unity, mutuality will be the principle. But this cannot be unless the human mind opens to the truth of the Spirit." তাঁর মতে, সমাজ গঠিত হয় ব্যক্তি নিয়ে। ব্যক্তি বলতে কেবল নশ্বর দেহধারী জীব নয় অথবা মন ও শরীরের এমন কোন রূপ নয়—যা একসাথে সম্মিলিত হতে পারে এবং বিলীন হতে পারে। ব্যক্তি হল এক সত্তা—শ্বাশত সত্যের জীবন্ত শক্তি, একটি আত্মা যা নিজেকে প্রকাশিত করছে। তাই সমাজ, গোষ্ঠীর বা নেশনের প্রাথমিক নীতি ও মৌলিক উদ্দেশ্য তার আপন আত্মচরিতার্থতা সাধন করা এবং ব্যক্তির আত্মচরিতার্থতার সাহায্য করা। শ্রী অরবিন্দের মতে, তারা প্রত্যেকে নিজেকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করে চলছে। নিজের মধ্যে আপন সত্তার ধর্ম ও শক্তির বিষয়ে অবহিত হয়ে পরিপূর্ণভাবে তাঁকে চরিতার্থ করে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে। আসলে তিনি বলেন, ব্যক্তির মত সমাজের এক শরীর, এক বিকাশশীল মন আছে। এই শরীর ও বিকাশশীল মন পরিচালিত হয় আত্মা দ্বারা। তবে সেই আত্মাটি ব্যক্তি আত্মা নয়, তা গোষ্ঠী আত্মা। যা একবার আপন স্বতন্ত্রতা লাভের পরে আত্ম সচেতন হতে বাধ্য হয়। গোষ্ঠী আত্মার সমষ্টীগত কার্যাবলী, মানসিকতা ও প্রাণজ আত্মা প্রকাশশীল জীবনকে বিকশিত করার সাথে সাথে সে পূর্ণরূপে নিজেকে খুঁজে পেতে পারে। তাই রাষ্ট্রের, দেশের, সমাজের, নেশনের উচিত ব্যক্তির আত্মসচেতন হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ প্রদান করা।

তবে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও তাদের মধ্যে প্রভেদ আছে। ব্যক্তি আত্মা থেকে গোষ্ঠী আত্মা আরো বেশী জটিল। কারণ গোষ্ঠী আত্মার শরীর সত্তার উপাদানগুলি প্রাণময় অবচেতন কোষের সমাহার নয়। তা বহু সংখ্যক আংশিক আত্মসচেতন মননশীল ব্যক্তি দ্বারা গঠিত। তাই গোষ্ঠী আত্মা নিজেকে খুঁজে পেতে অধিক সময় নেয়। ব্যক্তি আত্মাগুলির যথাযথ স্ফূরণে সাহায্যের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে খুঁজে পেতেপারে।

কিন্তু কেন রাষ্ট্র আমাদের এমন আত্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করবে? উত্তরে শ্রী অরবিন্দ বলেন, আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি আমাদের সত্তার অনেকগুলো অংশ আছে। সে অংশগুলি আপাত ও প্রতিনিধি স্বরূপ। তা প্রকৃত সত্তা নয়। প্রকৃত সত্তা এক। আমরা আপাত সত্তায় বাস করি এবং তাঁকে প্রকৃত সত্তা বলে ভুল করি। তাই আমাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি ও দুঃখ কষ্ট ঘটে। আত্মজ্ঞান আমাদের জানায় পরম সত্তা এক, এই পরম সত্তার বিভিন্ন অংশ হল ব্যক্তি সত্তা, গোষ্ঠীসত্তা, রাষ্ট্র সত্তা প্রভৃতি। কিন্তু এই অংশ সত্তাগুলিকে আমরা প্রকৃত সত্তা বলে মনে করি বলে ভ্রান্ত হই।

এই ভুলভ্রান্তির সুত্রপাত কীভাবে ঘটে? অর্থাৎ কখন আমরা আপাত সত্তাকে প্রকৃত সত্তা বলে ভুল করি, তা বিচার করতে গেলে শ্রীঅরবিন্দের সামাজিক স্তরবিন্যাসের কথা বলা প্রয়োজন। জার্মান ঐতিহাসিক কার্ল ল্যাম্প্রেখ্ট (Karl Lamprecht) সামাজিক বিবর্তনের কতকগুলি স্তরের কথা বলেছেন। এই পর্যায়গুলিকে তিনি নাম দিয়েছেন যথাক্রমে প্রতীকমূলক (symbolic), আদর্শমূলক (typal), প্রথামূলক (conventional), ব্যষ্টিতান্ত্রিক (individualist) এবং বিষয়ীগত (subjective)। শ্রী অরবিন্দ ল্যাম্প্রেখ্টের স্বীকৃত সামাজিক পর্যায়গুলিকে গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রত্যেকটি পর্যায়ের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট’র কথা বলেছেন। তিনি বলেন, এই ভুলের সুত্রপাত হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক যুগ থেকে বিষয়ীগত যুগের বিবর্তনের ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। শ্রী অরবিন্দ তাঁর মানবযুগচক্র নামক গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন এই যুগের সব থেকে বড় ভুল হল ব্যক্তিগত অহংকে গোষ্ঠীগত অহং-এ পর্যবসিত করা। এবং ব্যক্তিগত অহং-এর ভুলকে গোষ্ঠীগত অহং-এর ভুল বলে চিহ্নিত করা। আসলে ব্যক্তি যখন তাঁর সত্তার ধর্ম অনুসন্ধান করতে চায় তখন সে দুটি মনস্তাত্বিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে সেই অনুসারে জীবন নির্বাহ করতে চায়। সেই সত্য দুটি হল- অহং তার আপন সত্তা নয়, এক’ই সত্তা সর্বভূতে বিরাজমান। এবং আত্মা সেই বিশ্বজনীন বিদ্যসত্তার একটি অংশ। শ্রী অরবিন্দের মতে, ব্যক্তির পূর্ণতা এই অহমাত্মক বুদ্ধিবৃত্তি, প্রাণশক্তি ও শারীরিক কুশলের চরম বিকাশ নয়। অথবা তার মনের কামনা বাসনার অপর্যাপ্ত পরিতৃপ্তি নয়। ব্যক্তির পূর্ণতা হল অন্তরের দিব্যসত্তার জ্ঞান, শক্তি, প্রেম ও বিশ্বজনীনতার পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত করা।

কিন্তু সেই পূর্ণতা সহজে পাওয়া যায় না। কেননা বাস্তবিকভাবে ব্যক্তি কিছু হয়ে উঠতে চায়, ক্ষমতা লাভ করতে চায়, জ্ঞান লাভ করতে চায়। ব্যক্তির এই চাওয়াগুলি ন্যায় সঙ্গত। তাই এগুলি চরিতার্থ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু সেখানে মাথায় রাখতে হবে যে উক্ত চাহিদাগুলি চরিতার্থ করা শুধুমাত্র অহমাত্মকভাবে সম্ভব নয়। কিন্তু কেন তা অসম্ভবভাবে সম্ভব নয়? তাঁর মতে, অহমাত্মক ভাবে কোন কিছুকে গ্রহণ করতে চাইলে অন্য অহং এর সাথে সর্বদা সংগ্রাম বা সংঘর্ষ হয়। ফলে তারা পরস্পর ধ্বংস হয়। অহম ভাবে কোন কিছুকে গ্রহণ করতে চাইলে আজকে বিজয়ী হলেও আগামীতে পরাজিত ও নিহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা অন্যকে সংহার করে অপরকে শোষণ করে আমরা আসলে নিজেদের বিপজ্জনক অবস্থায় নিয়ে আসি।

কিন্তু আমরা সর্বদা অহম বর্জিত ভাবে কর্ম করতে পারি না। যখন কোন ব্যক্তি অহম বর্জিত কর্ম করতে যাবে কিন্তু সে কর্ম করতে সক্ষম হবে না, তখন তার কি করা উচিত? সহজ কথায় যার আত্মজ্ঞান হয় নি সে কোন কর্ম করবেন? উত্তরে শ্রী অরবিন্দ বলছেন আমরা যতদিন না আত্মজ্ঞান লাভ করি ততদিন মানুষকে অহমাত্মকভাবে কাজ করতে হয় কারণ তাদের অজ্ঞানতায় সেই জীবন একমাত্র জীবন। এবং এই জীবনযাপন হল ঈশ্বর প্রদত্ত প্রবৃত্তি। কাজেই জীবন যাপনে নিবৃত্ত না হয়ে বরং তাদের

অহমাত্মক জীবন যাপন করতে হবে—তবে সেটা সংযত ভাবে—আইন, নীতিজ্ঞান এবং ব্যাবহারিক জ্ঞানের দ্বারা যেটুকু নিয়ন্ত্রণ তাঁরা প্রকৃতি কাছে এবং অভিজ্ঞতায় শিখেছে সেই অনুসারে কর্ম করতে হবে।

এখানে ব্যক্তিকে অন্য একটি সত্যকে মাথায় রাখতে হবে। সেটি হল ব্যক্তি কেবল একক নয়, সে তার অন্য সকল সগোত্রের সাথে মিলিত হয়ে আছে। আমাদের স্বরূপ ব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলেও এর সাথে সাথে বিশ্বজনীন রূপ প্রকাশিত হয়। তাই এই দুয়েই নিজের নিজের পথে পূর্ণতা অর্জন করতে হয়। তবে তারা একে অন্যকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। সেখানে ব্যক্তি নিজের বিকাশের জন্য অর্থাৎ আত্মতুষ্টির জন্য অপর সঙ্গীদের অগ্রাহ্য করার কোন আধিকার থাকে না। আবার সমাজের বা রাষ্ট্রের আত্মচরিতার্থতার জন্য ব্যক্তিকে নিষ্পেষিত করার কোনো অধিকার থাকে না। এখানে 'অধিকার' কথাটিকে শ্রী অরবিন্দ কোন সামাজিক, নৈতিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেননি। তিনি 'আধিকার' কথাটিকে কেবল অস্তিত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে বলেছেন। কারণ ঐভাবে সমাজ, গোষ্ঠী, বা ব্যক্তি কেউ তাদের পূর্ণতায় বিকশিত হতে পারে না। যখনই সমাজ ব্যক্তিকে নিষ্পেষিত করবে তখনই সে তার অঙ্গে আঘাত করবে আবার ব্যক্তি কেবল নিজেকে বিকশিত করতে পারবে না কারণ তার বর্তমান উৎস অন্য সঙ্গীদের সাথে ঐক্য ও সমষ্টিতে। এই সত্যদুটি যর্থার্থ ভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে কখনই তারা নিজে নিজেকে বিকশিত করতে পারবে না। এই সত্যদুটির উপলব্ধির মাধ্যমে তারা একে অন্যের আত্মতুষ্টির সাহায্য করবে। তিনি বলছেন, “The question is whether there is not an inherent trend of social development which can be foreseen and made the basis of an intelligent effort to guide the growth of human society in the lines of its greater possibilities and highest potentialities. The ideal must necessarily be one which will take up and harmonize the two conflicting tendencies of individual freedom and social unity."

কিন্তু প্রশ্ন হল এই সত্যদুটির উপলব্ধির মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে কী? তার উত্তরে বলা যায় না। আসলে এই সত্যদুটির উপলব্ধি প্রথম ও প্রাথমিক এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ন। এছাড়াও রাষ্ট্রের আরোও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যেগুলির যথাযথ পালনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ই নিজ নিজ লক্ষ্য অর্জন করবে। সেগুলি হল—

সমন্বিত উন্নয়ন (Integral Development)

শ্রী অরবিন্দের মতে, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত মানব জীবনের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক দিকগুলির সমন্বিত উন্নয়ন। তাই যে রাষ্ট্রব্যবস্থা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ভৌত সম্পদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তাকে তিনি সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের নীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমনভাবে গড়ে তোলা

উচিত যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুস্থতা এবং অগ্রগতির সমর্থন করবে। তাঁর মতে, All problems of existence are essentially problems of harmony. They arise from the collision between the different parts of our being and our attempt to harmonize them."

স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব (Freedom and Individuality)

শ্রী অরবিন্দ সমষ্টির থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে তার স্বতন্ত্র ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশে জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে রাষ্ট্রের উচিত ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং লালন করা, যাতে মানুষ তাদের আত্ম-আবিষ্কার ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এই ব্যক্তিত্বের উপর জোর দেওয়া সামাজিক ঐক্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং বিভিন্ন ব্যক্তিগত প্রকাশ ও প্রতিভার বিকাশের মাধ্যমে প্রকৃত সাদৃশ্য অর্জিত হয়। তাই রাষ্ট্রকে সর্বদা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব উদযাপিত ও সমর্থিত হতে পারে। তিনি বলেছেন "True freedom is not the liberty to do whatever one likes; it is to be free to fulfill the true purpose of our being."

ঐক্য ও বৈচিত্র্য (Unity and Diversity)

সমাজের ঐক্যের পক্ষে কথা বলার সময়, শ্রী অরবিন্দ বৈচিত্র্যকেও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করেন যে প্রকৃত ঐক্য হলো পার্থক্যগুলিকে দমন করা নয় বরং সেগুলিকে বৃহত্তর, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামোর মধ্যে সামঞ্জস্য করা। রাষ্ট্রের উচিত এমন একটি ঐক্য প্রচার করা যা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত অভিব্যক্তিগুলিকে সম্মান করে এবং অন্তর্ভুক্ত করে। শ্রী অরবিন্দের মতে, সমাজের সমৃদ্ধি তার বৈচিত্র্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়, এবং রাষ্ট্রের উচিত বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সুবিধা প্রদান করা। তাঁর মতে, "Unity is the basis of the new age, but not uniformity. Unity is that in which differences exist but do not separate."

বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গি (Evolutionary Perspective)

শ্রী অরবিন্দ মানব সমাজকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়া হিসাবে দেখতেন, যেখানে রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি ইতিহাসকে ক্রমবর্ধমান উচ্চতর চেতনার স্তরের প্রগতিশীল উন্মোচন হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন, যেখানে রাষ্ট্র এই উচ্চতর পর্যায়গুলিকে প্রতিফলিত ও সমর্থন করার জন্য বিবর্তিত হয়। এই বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করে যে রাষ্ট্রের রূপ ও কার্যকারিতা স্থির নয় বরং বৃহত্তর আধ্যাত্মিক ও ভৌত পূরণের দিকে ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। রাষ্ট্রকে তাই তার জনগণের ক্রমবর্ধমান চেতনা ও প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দিয়ে অভিযোজিত ও রূপান্তরিত হতে হবে। তাঁর কথায়, "The steps of evolution are a series of

ascensions, each carrying us to a higher plane of our becoming. Each stage brings out new powers of the spirit and instruments of its manifestation."

নৈতিক ও নৈতিক ভিত্তি (Ethical and Moral Foundation)

শ্রী অরবিন্দের মতে, রাষ্ট্রের ভিত্তি নৈতিক এবং নৈতিক নীতিগুলির উপর নির্ভর করা উচিত। শাসনব্যবস্থাকে ন্যায়পরায়ণতা (ধর্ম) দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত এবং সাধারণ মঙ্গল লক্ষ্য করা উচিত, সংকীর্ণ স্বার্থ এবং ক্ষমতার রাজনীতিকে ছাড়িয়ে। নেতা এবং প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত নৈতিক মান বজায় রাখা এবং সততা, সহানুভূতি এবং ন্যায়বিচারের অনুভূতি নিয়ে কাজ করা। রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি একটি ন্যায়পরায়ণ এবং সমান সমাজ গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেখানে সমস্ত ব্যক্তি তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অর্জন করতে পারে। তাঁর উক্তি হল "The principle of dharma, or right action, is the guiding light of governance. When dharma declines and adharma rises, the balance of society is disturbed."

নেতৃত্বের ভূমিকা (Role of Leadership)

শ্রী অরবিন্দ রাষ্ট্রে আলোকিত (enlightened) নেতৃত্বের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, শাসকের শুধুমাত্র প্রশাসনিক দক্ষতা বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতি থাকা উচিত নয়। নেতাদের সাধু এবং দূরদর্শী হওয়া উচিত যারা সমাজকে তার উচ্চতর উদ্দেশ্যের দিকে অনুপ্রাণিত এবং পরিচালিত করতে পারে। আলোকিত নেতৃত্ব আধ্যাত্মিক সত্য, নৈতিক নীতি এবং সমস্ত নাগরিকের কল্যাণের প্রতিশ্রুতির গভীর বোঝার সাথে জড়িত। এমন নেতারা শাসনের জটিলতাগুলিকে সঠিক দিশা দেখাতে সক্ষম হয় যর্থার্থ জ্ঞান ও সহানুভূতির মাধ্যমে। তাঁর কথায় "A true leader is one who rises above the ego, who lives in the spirit and serves the divine purpose."

উপসংহার (conclusion)

শ্রী অরবিন্দের রাষ্ট্র ধারণা আধ্যাত্মিক বিবর্তন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, নৈতিক শাসন এবং আলোকিত নেতৃত্বকে সংহত করে। তার দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতা মানবতার আধ্যাত্মিক এবং বিবর্তনীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত করে প্রচলিত রাজনৈতিক তত্ত্বগুলিকে অতিক্রম করে। শ্রী অরবিন্দের মতে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক সত্তা নয় বরং একটি গতিশীল এবং বিবর্তিত জীব যা মানব চেতনার সমষ্টিগত অগ্রগতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সামগ্রিক এবং গভীর দৃষ্টিভঙ্গি সমসাময়িক সময়ে শাসন এবং সামাজিক বিকাশ পুনর্বিবেচনা করার জন্য মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

আসলে শ্রী অরবিন্দের রাষ্ট্রের ধারণাটি তাঁর অধিবিদ্যা থেকে নিঃসৃত হয়েছে। যেখানে ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং মানুষ, এবং মানুষের সামাজিক কর্তব্যগুলিকে একটি কৃত্রিম

সমগ্র হিসাবে দেখা হয়। *গীতা* ও *দি লাইফ ডিভাইন* নামক গ্রন্থে এই দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রী অরবিন্দের পরম বাস্তবতা হল *সত-চিৎ আনন্দ* । কিন্তু তা কোন বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। অভিজ্ঞতার সাধারণ জগতের (সসীম জগত) সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। পরমের সাথে বাস্তব জগতের ব্যাখায় তিনি বিশেষ পথ গ্রহণ করেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে পরম বাস্তবতাই শুদ্ধ হওয়াই একমাত্র বাস্তবতা। অভিজ্ঞতামূলক অস্তিত্বের জগতটি কেবল একটি বিভ্রম। কিন্তু শ্রী অরবিন্দ বলেন, এই ব্যাখ্যাটি সন্তোষজনক নয় কারণ এটি ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে অভিজ্ঞতামূলক অস্তিত্বের বিশ্বকে উপেক্ষা করে। তাই তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার জগতকে মান্যতা দিয়েছিলেন। শেষ করবো শ্রী অরবিন্দের "জগনাথের রথ" নামক প্রবন্ধের বক্তব্য দিয়ে। তিনি সেখানে বলছেন,

> *অনেক সমবেত মনুষ্যের একত্র কর্ম্ম করিবার উপায় যে সংহতি, তাহাই সমাজ নামে খ্যাত। শব্দের উৎপত্তি বুঝিয়া অর্থও বোঝা যায়। সম্ প্রত্যয়ের অর্থ একত্র, অজ্ ধাতুর অর্থ গমন ধাবন যুদ্ধ। সহস্র সহস্র মানব কর্ম্মার্থে ও কামার্থে সমবেত, এক ক্ষেত্রে নানা লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, কে আগে যায় কে বড় হয়, তাহা লইয়া বস্তাধবস্তি— competition— যেমন অন্য সমাজের সঙ্গে তেমন পরস্পরের সঙ্গেও যুদ্ধ ও ঝগড়াবাঁটি—এই কোলাহলের মধ্যেই শৃঙ্খলার জন্য, সাহায্যের জন্য, মনোবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নানা সম্বন্ধ স্থাপন, নানা আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ফলে কষ্টসিদ্ধ অসম্পূর্ণ অস্থায়ী কিছু, ইহাই সমাজের, প্রাকৃত সংসারের চেহারা।*
>
> *ভেদকে ভিত্তি করিয়া প্রাকৃত সমাজ। সেই ভেদের উপর আংশিক অনিশ্চিত ও অস্থায়ী ঐক্য নির্ম্মিত। আদর্শ সমাজের গড়ন ঠিক ইহার বিপরীত। ঐক্য ভিত্তি; আনন্দ-বৈচিত্র্যের জন্য —ভেদের নয় —পার্থক্যের খেলা। সমাজে পাই শারীরিক, মানসকল্পিত ও কর্ম্মগত ঐক্যের আভাস, আত্মগত ঐক্য সংঘের প্রাণ।*

গ্রন্থপঞ্জী:

মুখোপাধ্যায়, ডঃ জয়ন্তী, *সংগ্রাম দশকে শ্রী অরবিন্দ*, ২০১২, কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ

শ্রী অরবিন্দ, *মানব যুগচক্র*, অনু- মনোজ ভট্টাচার্য্য, ২০০৩, পণ্ডিচেরী: শ্রী অরবিন্দ আশ্রম।

শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য-জীবন*, অনু- অনির্বান, ২০১৩, পণ্ডিচেরী: শ্রী অরবিন্দ আশ্রম

Mukherjee Haridas, Uma Mukherjee, *Sri Aurobindo's Political Thought 1893-1908*, 2015, Kolkata: The National Council of Education Bengal

Sri Aurobindo, *The Life Divine*, 2013, Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram Trust.
Sri Aurobindo, The Human Cycle, The Ideal of Human Unity & War and Self- Determination, 1997, Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram

শিবরাম চক্রবর্তীর ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ উপন্যাসে অন্য এক কাঞ্চন

অন্নপূর্ণা মাহাত
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ উপন্যাসে রূপকথার জগতের কাঞ্চনকে আমরা পায় না। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতিতে বাড়ির বড়োরা যখন ভীতসন্ত্রস্ত, অন্যদিকে কিশোররা তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্বরাজের জন্য তথা দেশের জন্য। কলকাতার শহরতলিতে এই শিশুরা দেখেছে তাদেরই সমবয়সী পথে পথে ফ্যান ভিক্ষা চাইছে। এমনকি ডাস্টবিনের পাশেও খাবারের জন্য চলছে মানুষ ও কুকুরের লড়াই। এমতবস্থায় কাঞ্চনকে এক বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু রূপে দেখতে পায়।

সূচক শব্দ : স্বরাজ, রূপকথা, খিদে, কলকাতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাস্তবতা, হাস্যরস, বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা।

মূল আলোচনা:

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজের প্রতিচ্ছবি সাহিত্যে দেখা যায়। সাহিত্য হল মানুষের একান্ত নিজস্ব ভাবনাচিন্তার বহিঃপ্রকাশ, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতিতে বিভিন্ন চরিত্রের সংঘাত। দেশের প্রত্যেকটি শিশু ভবিষ্যতের নাগরিক। মায়ের গর্ভবস্থা থেকেই সরকার দেশের প্রতিটি শিশুর প্রতি দায়বদ্ধ। সেরকম সাহিত্যিকরাও যেনো অলিখিত দায়বদ্ধতা শিরোধার্য করে শিশু কিশোর সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন।

এবারে বলার বিষয়, শিশু সাহিত্য আসলে কাদের কাছে উপাদেয়। শিশু কারা? আবার কিশোরই বা কারা? শিশুকিশোর সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন সমালোচক তাদের বিভিন্ন অভিমত জানিয়েছেন, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘মুকুল’ পত্রিকায় বলেছেন--- ‘যাহাদের বয়স ৮/৯ হইতে ১৬/১৭ এর মধ্যে ইহা প্রধানত তাহাদের জন্য।’[১]

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন – ‘শিশু সাহিত্য বলে কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নেই, এবং থাকতে পারে না। কেননা শিশু পছন্দ সাহিত্য শিশু ব্যাতীত আর কেউ রচনা করে না। শিশু সাহিত্য বলে কোন জিনিস নেই, এবং থাকা উচিত নয়। তবে শিশু পাঠ্য না হোক, বাল্যপাঠ্য সাহিত্য আছে এবং থাকা উচিত। এ সাহিত্যে সৃষ্ট করবার সংকল্প অতি

সাধু। কেননা শিশুশিক্ষার পুস্তকে যে বাদ পড়ে যায়, --অর্থাৎ সে আনন্দ যুগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এ সাহিত্যের সৃষ্টি।'[২]

শিশু আমাদের বাঁচার রসদ। ছোটদের মন নিষ্কলুষ, পবিত্র, সরল, নির্মল। তাদের মধ্যে সব রকমের ভালোবাসার ছোঁয়া থাকে। মানুষের কর্ম ব্যস্ততার মাঝেও শিশুদের নিষ্পাপ হাসি তাদের আচার ব্যবহার সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। শিশু সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শিশু তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কে চিনতে শেখে, চিনতে শেখে জীবনকে, জীবনের বহু রূপকে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শিশুসাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী (১৩ ডিসেম্বর, ১৯০৩ - ২৮ আগষ্ট ১৯৮০)। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদের জরুরবানা অঞ্চলে। শিবরাম চক্রবর্তী কলকাতার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে শিবরাম চক্রবর্তীর জুড়ি মেলা ভার। তিনি অকপটে স্বীকার করেন প্রেরণার জন্য নয়, তিনি লিখেন প্রাণের দায়ে আরো বলেন গায়ে জোর নাই তাই রিক্সা টানতে পারি না, তার বদলে আমি কলম টানি। কলমের প্রতি টান আমার অতটুকুই।

বিদ্যালয়ে পড়ার পর তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংস্পর্শে আসেন। তিনি যুগান্তর, বিজলী, আত্মশক্তি, ফরোয়ার্ড পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ করেন। বেশিরভাগ সময় তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় টিকাটিপ্পান্নী 'আপনি কি হারাইতেছেন আপনি জানেন না', 'বীসংবাদ', 'বাঁকা চোখ', 'অল্পবিস্তার' ফিচার লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

শিবরাম চক্রবর্তী কবিতা লেখার মধ্য দিয়েই সাহিত্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'মানুষ ও চুম্বন' (১৯২৯)। শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন 'ষোড়শী,' এছাড়াও 'তোতলামি সারানোর স্কুল', 'মামা ভাগ্নে', 'দেবা না জানন্তি', 'প্রেম বিচিত্র বস্তু', 'উদ্বাস্তবিক' ইত্যাদি নাটক রচনা করেন।

তিনি ছোটদের সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন ১৯৩৫ সালে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পঞ্চানন অশ্বমেধ' গল্পটির মধ্য দিয়ে। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থ গুলি হল- 'শুঁড়ওয়ালা বাবা', 'কাকাবাবুর কাণ্ড', 'কালান্তর লাল ফিতা', 'মন্টুর মাস্টার', 'কলকাতার হালচাল'। শিশু সাহিত্যে কল্পনা পিয়াসী মনের চেয়ে বাস্তব জীবনে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার প্রতিই শিশু সাহিত্যের লক্ষ্য হয়ে ওঠে তাঁর লেখনীতে।

শিবরাম চক্রবর্তীর জনপ্রিয় সাড়া জাগানো উপন্যাস 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৩৫) উপন্যাস। এই উপন্যাসটি লেখার পূর্বে তিনি 'পলাতক' নাম রাখেন, কিন্তু উপন্যাসটিতে অসহযোগ আন্দোলন আদি রসাত্মক, সরকারের বিরুদ্ধাচারণ হওয়ায় তিনি পুলিশের ভয়ে পরবর্তীকালে নাম রাখলেন 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। এই উপন্যাসটি থেকে পরবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে ঋত্বিক ঘটক 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' সিনেমা তৈরি

করেন। ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ উপন্যাসটির নাম শুনলে মনে মনে গুন গুন করে ওঠে কবীর সুমনের ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ শিরোনামের গানটি-

“বাড়ি থেকে পালালেই অরিনোক্কো
সাঁকো পেরিয়েই দেখা হাওড়ার ব্রিজ।
অনেক ঘুইরাশ এসে কলকাতা আসা।
শ্যামল মিত্রের গলায় প্লে ব্যাক।’

উপন্যাসটিতে প্রথমেই দেখা যায়, তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের বাল্য কিশোর কাঞ্চন বাবার বকুনি খেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে যায়। বাল্য বয়সে শিশুর অত্যাধিক খিদে পায়, সেই খিদে মেটানোর জন্য তাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও আবিষ্কার করতে হয়। দেখা যায় গ্রামের পুরুত ঠাকুরের ছেলে বিনোদের সঙ্গে কাঞ্চনের বনিবনা ঠিকঠাক চলতো না। বাড়িতে বাড়িতে পুজো করার সুবাদে বিনোদ দই, ঘি, বাতাসা, নারকেল নানা রকম খাবার পেত। কাঞ্চন সেই খাবারে একদিন ভাগ বসাতে যায়। এ হেন কাজের জন্য পিতার কাছে বকুনি খায় কাঞ্চন। সেই অভিমানে ঠিক করে, বাড়ি থেকে পালিয়ে যে দিকে দুচোখ যায় কাঞ্চন সেই দিকেই যাবে। পথের শেষে ট্রেন এসে দাঁড়ালে কাঞ্চন সেই ট্রেনে উঠে পড়ে এবং ট্রেনে টিকিট চেকার টিকিট চেক করতে চাইলে কাঞ্চন সজোরে বলে – ‘আমি কি আপনার গাড়ি চেপেছি নাকি। আমি তো বেড়াতে এসেছি’।[৩] কাঞ্চন টিকিট চেকারের কাছে উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। খিদে পেলেও পকেট শূন্য অবস্থায় কীভাবে অর্ধেক টাকার দাম মিটিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে শূন্য পকেটে হাত দিতে দিতে বলে- ‘তোমার যা রান্না আর আমি যা খেয়েছি তাতে তোমাকে এক পয়সাও দেওয়া উচিত নয়। আমি কিছুই দেব না।’[৪]

শিশু কিশোর মনের কল্পনার বিস্তার কাঞ্চনের চরিত্রে ধরা পড়ে। কলকাতা যাওয়ার সময় কলকাতাকে নিয়ে তার কত কাল্পনিক চিত্র, কলকাতায় নাকি দিন রাত সমান, রাতে চাঁদের আলো উঠোনে পড়তে পাই না। এত আলো রাস্তায়। সব ইলেকট্রিক। রূপকথার রাজপুরীর মতো বড় বড় বাড়ী। আর কত লোকজন, গাড়ি ঘোড়া, সিপাই শাস্ত্রী কত কী।

হাওড়া পুলের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারই সমবয়সী একটি ছেলে কাঞ্চনকে খোকা বলে ডাকলে আত্মসম্মানে লাগে। সেই ছেলেটিকে কোন রকম প্রশ্রয় দিতে চাইনি কাঞ্চন, কারণ তারই সমবয়সী ছেলে কিনা তাকে খোকা বলে – ‘সে হল গিয়ে কাঞ্চন তাদের পাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সব ছেলেই তাকে সম্ভ্রম করে চলে। আর তাকেই বলে কিনা খোকা। খোকা তো যারা দুধ খায় হামাগুড়ি দেয়। মন্টু, ন্যাপলা ওরা খোকা।’[৫] শিবরাম চক্রবর্তী অতি সহজেই হাস্যরসের মধ্য দিয়ে শিশু মনের দিকটি তুলে ধরেছেন। ছেলেটির কাছে তাই সে জাহাজের কথা শুনতে চাইনি, কাঞ্চন ছেলেটিকে জানায় সে পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে জাহাজ করে। এই কথা শুনে ছেলেটি আবিষ্ট হয়ে কল্পনা করতে লাগলো – ‘তার ও এমন ইচ্ছা করে। সেও একদিন

জাহাজে চেপে পৃথিবী ভ্রমণ করতে চায়- সেই ‘আশী দিনে ভূপ্রদক্ষিণের’ লোকটার মত। আজ যেমন এই পথে দেখা হয়েছে তেমনি কোনদিন হয় কোনো জাহাজে কি কোনো বিদেশে ওদের আবার দেখা হবে।’[৬]

কাঞ্চনের বাল্য চঞ্চল মনে কখনও নিজের অর্থ উপার্জনের কথা ভাবে আবার মিনিকে দেখে রামসীতার মতো তাদের বিয়ের কথা ভাবে। মিনির সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা ভাবলে নিজেকে সংযত করে নেয় আর ভাবে- ‘না এখন মিনি সঙ্গে দেখা করাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এখন মিনি কিছুতেই তাকে ‘রেসপেক্ট’ করবে না। না, সে বড় হয়ে ......। মোটরে চেপে যাবে সে, গায়ে থাকবে সিল্কের পাঞ্জাবী হাতে রিস্ট-ওয়াচ, বুকপকেটে ফাউনটেন্ পেন।’[৭]

যে বয়সে শিশুদের বিকেলে পড়ন্ত রোদে কিংবা বৈশাখের ঝড়ে আম কুড়ানোর কথা কিংবা গ্রীষ্মের দুপুরে পুকুরে সাঁতার কাটার কথা সেই বয়সেই কাঞ্চনের মতো একাধিক শিশুকিশোর স্বরাজ সম্পর্কে জানতে চাই। দেশের জন্য প্রাণ দিতে চায়। কারণ স্বদেশী আন্দোলন তখনও চলছে। জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা শহরে রাতে বাতি বন্ধন নির্দেশ করা হয়েছে। বিকেল হলে ভলেন্টিয়াররা মার্চ করে ঘোরে এবং যে বাড়িতে আলো জ্বলে তাদেরকে সতর্ক করে দেয় আলো বন্ধ করা নির্দেশ দেয়। বাড়ির বড়দের চোখে সবসময় ত্রাসের সঞ্চার। যে বয়সে রূপকথা শোনার কথা উপন্যাসিক দেখিয়েছেন সেই বয়সে কাঞ্চনরা নিজেদের কে দেশ সেবার কাজে উৎসর্গ করতে চাইছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সান্নিধ্য কামনা করেছে। কাঞ্চন বাবার চাইতে মাকে বেশি ভালোবাসতো তাঁকে খুশি করার জন্য একটু বিলাসিতা দেওয়ার জন্য অর্থ উপার্জন করে সে মায়ের জন্য অনেক কিছু জিনিস কিনতে চায়। বাড়িতে পার্সেল পাঠিয়ে বাবাকে অবাক করে দিতে চাই। –‘বাবা ছুটে বেরিয়েছেন। উঁহু- বাবার নামে নয়, মার নামে। মার নামে এত বড় পার্শ্বেল কখনো আসেনি। মনে মনে ভারী হিংসে হয়েছে বাবার। যেমন হিংসে তেমনি হয়েছে কৌতুহল। বাবা পিয়নকে তাড়া দিচ্ছেন, ‘দাও না আমাকে!আমারই তো বৌ তারই নামে এসেছে, আমাকে দিতে দোষ কি? পিয়ন বলছে, উঁহু হুকুম নেই। রেজিস্টারী কিনা মার সই চাই।’[৮]

কাঞ্চন মিনিদের বিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখে ফুটপাতের ধারে মানুষ ও কুকুরকে খাবারের জন্য লড়াই করছে, এই সময় খাদ্যের কালোবাজারি দ্রব্যেমূল্য বৃদ্ধির কারণে কাজের সন্ধানে গ্রামের বহু মানুষ শহরে একত্রিত হয়। শহরে এসে অভুক্ত মানুষ খাদ্যাভাবের ফলে ফেলে দেওয়া ফ্যানের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরছে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ‘কলকাতার যীশু’ কবিতায় যে ছেলেটি রাজা তোর কাপড় কোথায় প্রশ্ন করতে দ্বিধাবোধ করেনি সেই রকমই স্বরাজের কথা এলে কাঞ্চন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্ন করেছে- ‘আচ্ছা গরিব মানুষদেরও স্বরাজ হবে তো? স্বরাজ হলে তারা ভালো খেতে পাবে পরতে পাবে ?......... গরীবদের আবর্জনা ঘেঁটে আর পথের এটোকাটা কুড়িয়ে খেতে হবে না তো’।[৯]

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার যে রাজপুত্র রাজকন্যার কথা বলেছেন তারা বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করেছে। তাদের মনে জীবনানন্দ দাশের ভাষায় ‘স্বপ্ন নয়- শান্তি নয়- ভালোবাসা নয় /হৃদয়ের মাঝে একবোধ জন্মলয়’।[১০] শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর লেখা প্রসঙ্গে বলেছেন তাঁর লেখায় তিনি ছোটদের কখনোই ছোট করে ধরেননি। অবোধ শিশু বলে গণ্য করেন নি কখনো, লেখকের সমকক্ষ বলেই ধরেছেন, তাদের বয়স্ক বন্ধুর মত বিবেচনা করে বড় হওয়ার উপদেশ নয়, বড়দের স্বাদ পেয়েছে তার লেখায়।

জলতৃষ্ণায় কাতর কাঞ্চন রাস্তার ধারে লোহার চৌবাচ্চা জল খেতে গিয়ে পাহারাদার জানায় সে জল ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ির জন্য কাঞ্চনের তখন গভীর মননদীপ্ত প্রশ্ন আমাদেরও স্বচকিত করে সে বলেছে ঘোরার জন্য জল আছে মানুষের জন্য নেই। কলকাতার ফুটপাতের কথা অভুক্ত মানুষের কথা কলকাতার ফুটপাতে রাত কাটানো, রাস্তাকে কেন্দ্রিয় চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ঋতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘Streets in Motion: The Making of Infrastructure, Property, and Political Culture in Twentieth-century Calcutta ’বইটিতে। এছাড়াও গল্পে কাঞ্চনের পাশাপাশি ভোম্বল, কনক, মিনি চরিত্রের নানা চিত্র-বৈচিত্র্যে অল্প মধুর হাস্যরসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিবরাম চক্রবর্তী বলেন – আসলে আমি হচ্ছি ছোটদের লেখক, ছোট লেখক।

উপন্যাসটি তিনি লিখেছেন বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে। এই সময় দেখা যায় বঙ্গভঙ্গ বিভাজন। দেশের উত্তাল পরিস্থিতি যেখানে প্রতিটি মানুষ প্রতিনিয়ত বাস্তব জীবনের সঙ্গে লড়াই করছে। শিশুরা তাদের রূপকথার কথা ভুলে গিয়ে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না। শিবরাম চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বলেছেন – ‘আমার নিজের কী মনে হয় জানিস? শিশু সাহিত্যের সেই স্বর্ণযুগ নেই । শিশুই নেই তো শিশু সাহিত্য। শিশু কোথায় এখন ? শিশুরা জন্মায় না জন্মালেও বাঁচে না বেশিদিন। মানে ঐ শৈশব অবস্থাটা অতি ক্ষণস্থায়ী এখন। সময় গতিতে শিশুরা সব বয়স্ক হয়েই জন্ম নিচ্ছে। দেখতে দেখতে বুড়িয়ে যাচ্ছে। দেহের দিকে নয় মনের দিক থেকে। কল্পলোকের গল্পকথা এখন অচল। [১১]

কাঞ্চন চরিত্রের মধ্যেও আমরা সেই অভিজ্ঞ শিশুকে দেখতে পায়। সে প্রখর আত্মসচেতন, শিবরাম চক্রবর্তী শব্দ, উপমা, বাক্য উপস্থানায়, কল্পনায় রং মিশিয়েছেন তা সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। আদতেই বলা যায় শিশু সাহিত্য নিয়ে লেখালেখি শুরু হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, উইলিয়াম ক্যারি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের হাত ধরে। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির রাধাকান্ত দেব, রামকমল মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখার মধ্য দিয়ে। তাঁরা নীতিকথার মধ্য দিয়ে শিশু চরিত্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে ‘বালক’ পত্রিকা, ‘সখা-সখী’ পত্রিকা থেকে

শুরু করে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' পত্রিকার মধ্য দিয়ে শিশু সাহিত্যে ধারাটি প্রবাহমান হয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশু-কিশোর সম্পর্কে তাঁর 'ছেলেভুলানো' ছড়ায় বলেছেন- 'ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ-কাল-শিক্ষা- প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের মত কত নতুন পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু শিশু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। ..... এই যে শিশু এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে শিশু প্রকৃতির সৃজন।'[১২]

শিবরাম চক্রবর্তীর শিশু সাহিত্যে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, রূপকথার গল্প নেই। তাঁর উপন্যাসে জীবনের কঠিন লড়াইয়ের গল্প আমরা দেখতে পায়। সময়ের সঙ্গে সবকিছুই পরিবর্তনশীল সাহিত্যও সেইরকম ভাবগত আঙ্গিকগত বিবর্তন ক্রমশ ঘটেই চলেছে। কালের প্রবাহে শিশু কিশোর সাহিত্যের স্বরূপ ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়ে চলেছে। শিবরাম চক্রবর্তী 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' উপন্যাসেও আপাত মজার বিষয়ের মধ্যে গভীর জীবন বোধের হাতছানি এবং শিশুদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকটিও সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে ড্যানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুসো, জোনাথন সুইফটস এর 'গেলিভার ট্রাভেলস' রচনাটি শিশুদের মন ছুঁয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুলের রচনায় শিশু কিশোর মনের কাল্পনিক রূপকথার দিক টি দেখা যায়, কিন্তু শিবরাম চক্রবর্তী ছোটদের গভীর জীবনসত্যের, জীবনবোধর দিকটি তুলে ধরেছেন। ১৯৭৫ সালে তিনি আনন্দ পুরস্কার পান প্রদত্ত মানপত্রের লেখা হয়েছে-

> বাংলা সাহিত্যে আপনি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান, কল্পনার এক অক্ষয় ভাণ্ডার নিয়ে আপনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন এই শতাব্দীর প্রায় শুরুর দিকে। একদিন যে সব শিশুরা আপনার রচনার মুগ্ধ হয়েছিল আজ তাদের পুত্র কন্যা এবং পৌত্রীরা ও সমানভাবে আপনার সম্পর্কে আকৃষ্ট। তিন পুরুষ ধরে আপনি শিশুদের কাছে রসের কান্ডারি। শুধু শিশুদের কাছে নয়। একসময় আপনি দেশাত্মবোধক রচনাতে গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন। আপনি লিখছেন বাস্তবধর্মী নাটক। চিন্তামূলক প্রবন্ধ এবং কাব্য রচনাতেও আপনার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবকিছু ত্যাগ করে আপনি শিশুদের জন্যই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছেন। বাংলা সাহিত্য আপনার কাছে ঋণী।

এখানে রূপকথায় হারিয়ে যাওয়া কিশোর কাঞ্চনকে দেখি না বরং প্রখর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, যুক্তিবাদী, প্রতিবাদী, জিজ্ঞাসু মনের অন্য এক কাঞ্চনকে দেখি যা শিবরাম চক্রবর্তী এক অনবদ্যরূপে শিশু কিশোর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের জগতে শিবরাম চক্রবর্তীর অবদান অনস্বীকার্য।

তথ্য সূত্র-

১. শাস্ত্রী, শিবনাথ (সম্পাদক), ‘মুকুল’ দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৯৫, জুলাই আগস্ট)।
২. চৌধুরী, প্রমথনাথ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, শিশু সাহিত্য, সবুজপত্র, ৩য় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, পৃ:৪৪৬-৪৪৯।
৩. চক্রবর্তী, শিবরাম, শ্রাবণ ১৩৫৩, ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’, কলকাতা, দি বুক এম্পারিজাম লিমিটেড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭।
৪. তদেব পৃ -৯।
৫. তদেব পৃ-১৬।
৬. তদেব পৃ -১৬।
৭. তদেব পৃ-৬৭।
৮. তদেব পৃ-৪১।
৯. তদেব পৃ-৪৬।
১০. দাশ, জীবনানন্দ, শ্রাবন ১৪২৩, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, কলকাতা, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, ভারবি প্রকাশন, পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৭।
১১. চক্রবর্তী, শিবরাম, অগ্রহায়ন ১৩৬৭ বৈশাখ ১৪০১, ‘ঈশ্বর-পৃথিবী-ভালোবাসা’, কলেজ রো কলিকাতা-৯, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭।
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯০৭, ছেলে ভুলানো ছড়া ১ লোকসাহিত্যে, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’, দশম খন্ড,প্রবন্ধ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ:১৪৮।
https://pagefournews.com/children-literature-shibram-chakraborty/

শিকড়ের খোঁজে : শচীন দাশের দুটি উপন্যাস

দুর্লভ শীল
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বিভিন্ন কারণে মানুষ ছিন্নমূল হয়েছে বার বার। ছিন্নমূল মানুষদের মনে থাকে শিকড়ে ফেরার টান। এই সব ছিন্নমূল মানুষদের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছেন শচীন দাশ; যিনি নিজেও বাস্তব জীবনে ছিন্নমূল। তাঁর 'নদী তরঙ্গের আয়না' ও 'শিকড়' উপন্যাস দু'টিতে দু'টি ছিন্নমূল চরিত্রের শিকড়ের সন্ধানে যাত্রা ও পুনরায় শিকড়হীন হয়ে পড়ার কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় ধনপতি ও বুড়ি শিকড়ে ফিরেও ছিন্নমূল হয়ে পড়েছে। আসলে শিকড়ে ফেরা যায়না, ফেরার আকাঙ্খায়, যন্ত্রণায় যাপন চলে।

সূচক শব্দ : ছিন্নমূল, শচীন, শিকড়, উৎখাত, নদী, পরিবার।

মূল আলোচনা :

'ছিন্নমূল' শব্দটি *'ছিন্ন'* এবং *'মূল'* এই দুটি শব্দের সংযোগে গঠিত হয়েছে। *'ছিন্ন'* অর্থাৎ ছেদিত, কর্তিত বা ছেঁড়া হয়েছে এমন বা উৎপাটিত। আর *'মূল'* এর অর্থ শিকড়। অর্থাৎ শিকড় সহ উৎপাটিতই হলো ছিন্নমূল। যে সব মানুষ কোনো না কোনো কারণে নিজের জন্মস্থান, বাস্তুভিটা, বসতবাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে বা নিজের বাসভূমি থেকে হয়েছে বিচ্যুত বা বিতারিত তারাই ছিন্নমূল মানুষ। মানুষের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে যদি লক্ষ্য রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে মানুষের উচ্ছেদ হওয়াটা মানুষের জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রাকৃতিক কারণে যেমন, তেমনই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কারণেও মানুষ স্থান পরিবর্তন করেছে। তথাকথিত 'উন্নয়নে'র চাপেও মানুষকে হতে হয়েছে উচ্ছেদের শিকার। কখনও তাদের করা হয়েছে উৎখাতও। কখনও পরিস্থিতির চাপে মানুষ নিজের দেশেই অন্যত্র গমন করেছে। আবার কখনওবা আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করেছে। অর্থাৎ আবহমানকাল ধরে মানুষের ছিন্নমূল হওয়ার প্রক্রিয়া সক্রিয় থেকেছে এবং তা চলতেই থাকবে।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের কথাকার শচীন দাশ নিজেও একজন ছিন্নমূল মানুষ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে ঘটনা সবচেয়ে বেশি মানুষকে একসঙ্গে ছিন্নমূল করেছিল তা হল *'দেশভাগ'*। দেশভাগের পরে ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় শচীন দাশের বাবা–কাকা–জেঠারা পূর্বপাকিস্তান থেকে পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে এপার বাংলায় পালিয়ে আসেন। তারপর স্টেশনের প্লার্টফর্ম হয়ে তাদের আশ্রয় হয় জবর দখল কলোনিতে। এই জবর দখল কলোনিতেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা শচীন

দাশের। ফলে ছোটোবেলা থেকেই তিনি দেখেছেন ছিন্নমূল মানুষদের লড়াই। অনুভব করেছেন তাদের যন্ত্রণাকে। তিনি বুঝেছেন মানুষ যে কারণেই ছিন্নমূল হয়ে পরুক না কেন, শিকড়ে ফেরার তাগিদ তাদের অবচেতনে থাকবেই; আর সময় সুযোগ পেলে শিকড়ে ফেরার টান বাস্তবায়িত করার পথে এগিয়ে যাবেই। তাই তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ছিন্নমূল জীবন যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তার মধ্যে *'নদী তরঙ্গের আয়না'* ও *'শিকড়'* উপন্যাস দু'টিতে দু'টি ছিন্নমূল চরিত্রের শিকড়ের সন্ধানে যাত্রা ও পুনরায় শিকড়হীন হয়ে পড়ার কাহিনি চিত্রিত হয়েছে।

'নদী তরঙ্গের আয়না' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ধনপতির দুটি জীবন পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য উপন্যাসে ধনপতি *'ট্রুলি আপরুটেড'*। শচীন দাশ একই সাথে উপন্যাসের আখ্যানভাগে মনসামঙ্গলের কাব্যের কাহিনির সময়কাল ও সেই সময়কাল থেকে মোটামুটি ৫০০ বছর পরের অর্থাৎ একুশ শতকের সময়কালে জনজীবনের পরিবর্তনকে অঙ্কন করেছেন। এতটা ব্যবধানের সময়কালের সমাজ ইতিহাসকে এক ফ্রেমে ধরতে তিনি এক অভিনব কায়দা নিয়েছেন। রূপকথার জগতের ব্যঙ্গমা—ব্যঙ্গমিকে তিনি নামিয়ে এনেছেন বর্তমান সময়ে। তার সাহায্যেই বর্তমানের ধনপতিকে তিনি নিয়ে গিয়ে ফেলেন পাঁচশত বছর পূর্বের জীবনে।

বর্তমান জীবনে তার কোনো শিকড় নেই। বর্তামানের ও অতীতের জীবনে সে নদীকে তথা নিজেকে খোঁজে। বর্তমান জীবনে প্রথমে তাকে বন্যায় উচ্ছেদ হয়ে পরিবার সহ ক্যানিং—এ মাতলার বাঁধে আশ্রয় নিতে হয়। তারপর তাদের সেখান থেকেও উঠতে হয়। আসলে বানভাসি মানুষ ধনপতির নিজের কোনো জায়গা নেই। তাই পঞ্চায়েত যেমন বসিয়েছে তাকে তেমন বসতে হয়েছে। উঠিয়ে দিলেই উঠে গেছে। এরপরে ধনপতির আশ্রয় হয় টালিগঞ্জের রেল ঝুপরিতে। কিন্তু তাকে সেখান থেকেও উৎখাত করা হয়। ধনপতির আশ্রয় হয় নোনাডাঙায়। এহেন ধনপতি মাঝে মাঝেই একটা নদীকে খোঁজে। লোকে বলে ধনপতির ভরে পায়। তাই মাঝে মাঝেই সে উধাও হয়ে যায়। পক্ষী বলে, *"যে নদীটি ঢুকেছে ওর মাথায় তার কথা তো বলতে পারব না তবে লুপ্ত নদীগুলির ধারার মুখে ওকে নিয়ে দাঁড় করাতে পারব।"*[৯] এই পক্ষীই ধনপতিকে নিয়ে যায় পাঁচশ বছর আগে ধনপতির পূর্বজীবনে। ধনপতি তার বৌ আলাপিকে বলে যে সে শুধু এক নদীকে দেখে। নদী পাড়ে গাঁ—গঞ্জ দেখে। দেখে এক সুন্দর নৌকা। নৌকাটা যেনো নদীতে জল *'ভেইঙে ভেইঙে'* যাচ্ছে। অর্থাৎ ধনপতী নিজেকে তথা তার শিকড়কে খোঁজে। কিন্তু কিছুই মনে পড়েনা তার।

পক্ষী ধনপতিকে ৫০০ বছর পূর্বের জীবনে নিয়ে গিয়ে গাঙুর নদীর তীরে দাঁড় করায়। এই জীবনে যখন ধনপতি অবস্থান করে তখন তার আর বর্তমান জীবনের কিছু মনে থাকে না। এই জীবনেও সে নদীকে খোঁজে। পক্ষী যখন ধনপতিকে অতীত জীবনে নিয়ে যায় তখন আমরা দেখি সেই জীবনে ধনপতি নিঃসঙ্গ। তার কিছুই মনে পড়ে না। ধনপতি মনে করতে পারে না নিজের নাম, মনে করতে পারে না কিভাবে সে এখানে

এলো। এমনকি সে যে নদীকে দেখে সেই নদীর নাম কি তাও মনে পড়ে না তার। শুধু মনে পড়ে একটা নদী, আর নদীঘাটে ময়ূরপঙ্খি নৌকা, আর নদী পাড়ে একটি হাটের কথা। কিন্তু ধনপতির প্রচেষ্টা চলতেই থাকে নিজেকে আবিষ্কার করার। এক ঘোরের মধ্যে সে স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করে আত্ম আবিষ্কারের চেষ্টা করে চলে। শেকড়হীন ধনপতি একদিন নিজেকে তথা নিজের শেকড়কে আবিষ্কার করে। ধনপতির মনে পড়ে অনেক কিছুই। তার আসল নাম ধনপতি নারায়ণ দত্ত। নদীর ব্যাধির অনুসন্ধানে গিয়ে সে আর ফিরে আসতে পারেনি। সে এখন দক্ষিণদ্বার গ্রামে পূর্বপাড়ায় নিজের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু ধনপতির চেহারা আর পোষাক অন্যরকম ছিল। ধনপতি সব কিছু ঠিকঠাক বললেও স্ত্রী কিঙ্কিনি তাকে স্বামী হিসেবে চিনতে পারেনি। অগত্যা বিদায় নিতে হয় ধনপতিকে। *“ধনপতির কি কোনো দেশ আছে এক্ষণে, নাকি কোনো গ্রাম? না গৃহ আছে, পরিবার আছে, পুত্র আছে, বন্ধু ও আত্মীয় আছে?”*[২] এইভাবে পূর্বের জীবনে সব ফিরে পেয়েও পুনরায় ছিন্নমূল হয়ে পড়ে ধনপতি।

শচীন দাশের *‘শিকড়’* উপন্যাটি প্রকাশিত হয় ১৪০৬ সালে শারদীয়া *‘সংবাদ উত্তরপ্রান্ত’*তে। উপন্যাসটি এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এই উপন্যাসে বুড়ি নামে একটি মেয়ের শিকড়ের খোঁজে যাত্রা এবং সব ফিরে পেয়েও পুনরায় ছিন্নমূল হয়ে পরার কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। প্রভাতী ওরফে বুড়ির বাল্যকালেই মাতৃবিয়োগ ঘটে। পিতা আবার বিয়ে করলে সৎ মায়ের কাছেই বড় হতে থাকে সে। সৎ মা প্রথম প্রথম তাকে উপেক্ষা করলেও আস্তে আস্তে অত্যাচার করতে শুরু করে। আর নতুন মায়ের কোলে সন্তান আসা মাত্রই অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে গালাগাল ও মারধোরে পৌঁছায়। এই অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ বুড়ি তাই মাঝে মাঝেই পালিয়ে চলে যেত মাসির বাড়ি। বাবার সাথে দু’চারবার গিয়ে বাড়িটা চিনে নিয়েছিল বুড়ি। বুড়ি দেখেছিল তাদের বাড়ির কাছেই রেল স্টেশন। সেই স্টেশনে রেলে উঠে পরের স্টেশনে নেমেই মাসির বাড়ি যেতে হয়। পাঁচ বছর বয়সের বুড়ি নতুন মায়ের অত্যাচারে সেদিনও স্টেশনে গিয়ে রেলে উঠেছিল। কিন্তু রেল আর পরের স্টেশনে থামেনি। কারণ সেটি ছিল দূরপাল্লার রেল। অনেক স্টেশন পরে যখন রেল থামল তখন বুড়ির কান্না দেখে তাকে স্টেশন মাস্টারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলেও বুড়ি বাবার নাম বললেও টাইটেল বলতে পারেনি, বলতে পারেনি তাদের বাড়ির পাশের স্টেশনের নামও। অগত্যা বুড়ির স্থান হয় হোমে। এরপর সারা স্টোভার নামের একজন শিক্ষিকা তার নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে দত্তক নেয় বুড়িকে। বুড়ির স্থান হয় মার্কিন মুলুকের বোস্টনে। নতুন নাম হয় জুডিথ স্টোভার। এখানে এসেই বুড়ির পুনর্জন্ম ঘটল। বুড়ি ভুলে গেল তার ভাষা, তার নিজস্ব সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও আচার আচরণ। অর্থাৎ বুড়ি হয়ে পড়ল ছিন্নমূল একজন মানুষ।

কিন্তু সারা স্টোভারের মৃত্যুর পরেই বুড়ি আবিষ্কার করল এক ডায়েরি। যা থেকে বুড়ির কাছে তার জীবন রহস্য উন্মোচিত হলো। বুড়ির ভেতরে উঠল ঝড়। এই ঝড়কে সে সামলাতে পারেনি। তার বারবারই মনে হয়েছে যে মাটিতে তার জন্ম, যে মাটি তার পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি, যেখানে আজও রয়েছে তার বাবা–মা ও ভাই, সেই পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি কি সে একবারও খোঁজ করবে না? তাই সে ভারতের বাসিন্দা বোস আঙ্কেলের সাথে পরিচিত হলে বোস আঙ্কলকে নিজের ইচ্ছার কাথা খুলে বলেছিল। প্রিয় বন্ধু হ্যারিস টিভিতে বিজ্ঞাপন দেবার পরিকল্পনার কথাও বলেছিল। আসলে বুড়ি নিজের শিকড়ের খোঁজ পাওয়ার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিল।

সৌভাগ্য বশত বোস আঙ্কেলের ছাত্র অনীকের মাধ্যমে খোঁজ পাওয়া গেল বুড়ির পিতা হরনাথ ব্যানার্জির। বুড়ি ভারতবর্ষে এসে নিজের বাড়ি ফিরল। কিন্তু কে জানত সব পেয়েও তাকে আবার হারাতে হবে সব কিছু। এক রাত্রে বুড়ি শোনে তার সৎ মা তার বাবাকে বোঝাচ্ছে কিভাবে বুড়ির সাথে সুন্দর ব্যবহার করে বুড়ির থেকে সবকিছু হাতিয়ে নিলে আর সারাজীবন কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু হরনাথ রাজি হয়না। পরের দিন হরনাথ একটা টিকিট কেটে মেয়েকে ট্রেনে তুলে চিরদিনের মতো বিদায় দেয়। বুড়ি পুনরায় *'রুটলেস'* হয়ে পড়ে। সারা পৃথিবীতে কত লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে রুটলেস। বুড়িও তাদের একজন হয়ে বাকি জীবনটা ছিন্নমূল যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেরাবে।

এই দু'টি আখ্যানের বয়ানেই সময় কথা বলে যায়। কালের নিয়মে মানুষের শিকড় যেমন ছিন্ন হয় তেমনই নতুন করে শিকড় প্রোথিতও করে। তবুও শিকড়ের টান ফল্গু ধারার মতো প্রবাহিত হয়ে চলে। এই বিশ্বায়নের যুগে যতই আমরা আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়ে চলেছি ততই আমাদের শিকড় ছিন্ন হয়ে চলেছে। তাই নানা উপায়ে আমরা শিকড়ে ফেরার চেষ্টা করি। ধনপতি কিংবা বুড়ি তো শুধু একটা প্রতীক মাত্র। এদের মধ্যে দিয়েই লেখক আমাদের শিকড়ে ফেরার সুপ্ত বাসনাকে উস্কে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১) দাশ, শচীন/প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৯/"নদী তরঙ্গের আয়না"/করুণা প্রকাশনী/পৃ. ১৬

২) তদেব/পৃ. ১৫৬

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা:

১) দাশ, শচীন/প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৯/"নদী তরঙ্গের আয়না"/করুণা প্রকাশনী

২) দাশ, শচীন / শারদীয়া১৪০৬ / "শিকড়" / সংবাদ উত্তরপ্রান্ত(পত্রিকা)

৩) মণ্ডল, নাজিবুল ইসলাম সম্পাদিত / জানুয়ারি–জুনসংখ্যা২০১৬ / 'সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা, শচীন দাশ স্মরণ সংখ্যা' / সমকালের জিয়ন কাঠি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১) অধ্যাপক ড. সাধন কুমার সাহা, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের ভাষা প্রবণতা

শুভদীপ দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, তেহট্ট

সারসংক্ষেপ : বিগত এক দশকে বাংলা উপন্যাসের ভাষাগত প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে তা হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাচুর্য। সাধু-চলিত, কথ্য-অকথ্য, প্রচলিত-অপ্রচলিত, প্রথাগত-প্রথাবিরোধী ভাষা ব্যবহারে অকপট ঔপন্যাসিকদের লেখনীতে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। মূল ধারার প্রকাশনা সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনও এই সময়ের নিরীক্ষামূলক উপন্যাস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের এই আলোচনায় গত এক দশকের এমনই কিছু উপন্যাসের পর্যালোচনা করব যা ভাষাগত ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবি রাখে।
সূচক শব্দ : স্ল্যাং, নাগরিক মনন, শব্দ চয়ন, আত্মতার ভাষা।

মূল আলোচনা :

ভাবের বিচিত্র রূপকে শব্দের সীমিত পরিসরে প্রকাশ করার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ভাষার ঐশ্বর্য। যে কারণে ভাষার সাধনা যে কোনো জাতির আত্মিক পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে তোলে, তার জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে আরও স্বতন্ত্র করে তোলে। সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপের মধ্যে গদ্যে এই বৈশিষ্ট্য আরও বেশি করে ধরা পড়ে, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কথ্যভাষার কাছাকাছি। সেই কারণে বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ক্রমেই বাঙালি চেতনার দ্যোতক হয়ে উঠেছে। এই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজন এমন কিছু সাহিত্য সৃষ্টির যা ভাষাগত ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগ দাবি করে। বিগত এক দশকে প্রকাশিত এমনই কিছু উপন্যাস আমাদের আলোচ্য যা সেই দাবিকে পূরণ করে।

সুরজিৎ সেনের 'শহর সংস্করণ' (২০১৪) একবিংশ শতকের মহানাগরিক মননের আত্মতার সংকটকে একেবারে খোলাখুলি উপস্থাপিত করে আমাদের কাছে। গ্রাফিক্স, ছবি সহযোগে এই উপন্যাস যেমন এক দর্শনীয় অভিজ্ঞতা তেমনই এর ভাঁজে ভাঁজে ব্যক্তিক আততি এতটাই নগ্নভাবে হাজির হয় যা প্রবল অস্বস্তিকরও বটে। শিল্প-

সংস্কৃতি-রাজনীতি-ড্রাগস-কর্পোরেট কালচার- যৌন ফ্যান্টাসি সবকিছুকে মিলিয়ে আমাদের দৈনন্দিন শহুরে জীবন উঠে আসে আত্মমগ্ন সংলাপের ঢঙে—

> কোনো বই (সফ্‌ট কপি বা হার্ড কপি) পড়তে পারে না। কালো কালো অক্ষরেরা সারিবদ্ধ পিঁপড়ের মতো হেঁটে যায় মাথার ভেতর দিয়ে গোপন গর্তে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে ছুরিটা পড়ে আছে টেবিলে, পাশে খালি গ্লাস আর বোতল। কয়েকটা মরা পোকা।
>
> ‘কেমন আছ’? বা ওই ধরনের প্রশ্ন কজন এড়াতে পেরেছে? অভিও পারেনি। উত্তরে ‘খুব খারাপ রে বোকাচোদা’ বলার কথা বহুবার ভেবেও, ‘ভালো’ ছাড়া আর কিছু বেরিয়ে আসেনি মুখ দিয়ে। আর ‘ভালো’ না বললেও কে তাকে বিশ্বাস করবে? তার চোখে সানগ্লাস, পরিষ্কার কামানো গাল, গায়ে টি শার্ট, পরনে ব্লু জিন্‌স, পায়ে বিদেশি স্নিকার, দোকানের কাউন্টার থেকে বেরিয়ে আসছে কনট্রাসেপ্টিভ পিল কিনে, তারও বায়োডাটা আছে, আছে এইচ.আই.ভি নেগেটিভ রিপোর্ট।[১]

একদিকে ভোগবাদী জীবন বৃত্তান্তের উলঙ্গ বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে সামাজিক সংযমের অসহায় স্বীকারোক্তি— এই যৌথ সংলাপের আধারেই গড়ে উঠেছে ‘শহর সংস্করণ’। সুরজিৎ সেনের ভাষার স্মার্টনেস অবশ্যম্ভাবীভাবে মনে করায় সন্দীপনের গদ্যকে, যা তীক্ষ্ণ সেরিব্রাল অথচ প্রবল নমনীয়। স্ল্যাং এখানে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে নয়, কথোপকথনের স্বাভাবিক ছন্দেই ব্যক্ত হয়। নাগরিক ক্লান্তি মস্তিষ্ককে শূন্য করে দেয়, আত্মহননের হাতিয়ার নেশাতুর সময়ের উচ্ছিষ্ট সাক্ষী হয়ে পড়ে থাকে। নিরাসক্ত অথচ কৌতুকময় ভঙ্গিতে লেখক সেই অবস্থার নিখুঁত বিবরণ দিয়ে যান পাঠকের উদ্দেশে।

অনুপম মুখোপাধ্যায়ের ‘পর্ণমোচী’ (২০১৬) সাহিত্যের প্রথাগত পাঠকের কাছে এক অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে। আখ্যানের শুরু থেকেই যৌন দৃশ্যের সোজাসাপ্টা বর্ণনা ‘সুশীল সমাজ’এর পরিশীলিত মননে সজোরে ধাক্কা মারে। যৌন দৃশ্যের পাশাপাশি স্ল্যাং-এর অবাধ ব্যবহার এই আখ্যানকে আরও বেশি অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি দান করেছে। আখ্যান নির্মাণের প্রশ্নে ন্যারেটিভের কুশলী বয়ন ‘পর্ণমোচী’র অন্যতম বিশিষ্ট দিক। তিনটি চরিত্রের মধ্যে ন্যারেশানের ক্রমাগত অদল-বদলে এমন এক ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিকোণ তৈরি হয় যা পাঠকের কাছে আখ্যানের সামগ্রিক অবয়বকে তুলে ধরে। এরই সঙ্গে চলে পাঠকের উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সুলভ কথকের নিজস্ব বক্তব্য—

> সরি, পাঠক। আপনি হয়ত চাইছিলেন না বাস-টাস আসুক এই গল্পে। হয়ত বাসে উঠলে আপনার গা ঘুলোয়। বাসে পাবলিকের অসভ্যতা আপনাকে পীড়া দেয়। কিন্তু কিছু করার নেই। সৌমিত্র-সুচিত্রার 'সাত পাকে বাঁধা' সিনেমাটা দেখার পর থেকেই বাসে প্রথম দেখাটা আমার অবসেশন। এরপর থেকে অসীম বাইক নিয়ে ইউনিভার্সিটি যাবে। ওরও সুবিধেই হবে এতে। লাইসেন্স আছে কিনা জিজ্ঞাসা করবেন না প্লিজ।
>
> আপনি পাঠক, পুলিশ তো নন।[২]

লেখক-পাঠক সংযোগে টেক্সটের যে বিকল্প পাঠ গড়ে ওঠে সেখানেই এই উপন্যাসের সাফল্য। তুমুল পর্নোগ্রাফিক আবেদনের মধ্যেও বাজার লালিত সাহিত্য সম্ভার থেকে 'পর্ণমোচী'কে পৃথক করে দেয় এর গঠন কৌশল, আর তাকে যোগ্য সঙ্গত দেয় ভাষার দুঃসাহসিক ব্যবহার। 'বাঁড়া', 'চোদনা', 'ঠাপ', 'গুদ' ইত্যাদি তথাকথিত যৌন অপশব্দের মুহুর্মুহু প্রয়োগে সমগ্র আখ্যান জুড়ে এমন এক প্রতিবেশ তৈরি হয় যা মান্য-অমান্যের সীমারেখাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। এই ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য এতটাই সহজ-স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চরিত্রের সংলাপে উঠে এসেছে যে কখনোই তা আরোপিত বলে অনুভূত হয় না।

সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত যে আখ্যান ভাষা বৈশিষ্ট্যে সর্বাধিক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে তা হল 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' (২০১৭)। সন্মাত্রানন্দের এই আখ্যান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনেতিহাসকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। যদিও কাহিনির মূলসূত্রটি লুকিয়ে আছে চিরন্তনী নারীসত্তার অন্বেষণে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে যা জীবনকে লালিত করে চলেছে। তবে বিষয়ে নয়, এই আখ্যানের অভিনবত্ব লুকিয়ে আছে এর গঠন কৌশলে। যে কোনো আখ্যানের কথনরীতি মূলত সময়ের সাধারণ ধারণাটিকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে, যেখানে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এক সুনির্দিষ্ট পারম্পর্যে গ্রথিত থাকে। 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' সময়ের সেই স্বাভাবিক ধারণাকেই নস্যাৎ করে দিয়ে বিস্তার লাভ করেছে। সময়ের তিনটি স্তর বারবার কাহিনিতে শুধু উঠে আসেনি, একে অপরের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার একরৈখিক বিন্যাসকেই ঘুলিয়ে দিয়েছে। এই আখ্যানে মূলত দশম-একাদশ শতক, ত্রয়োদশ শতক আর একবিংশ শতকের সময়ক্রমে কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে। আর এই ভিন্ন ভিন্ন কালের স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে আখ্যানে পৃথক পৃথক ভাষা-রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন লেখক। সময়ের বিন্যাসে ভাষাগত বৈচিত্র কতখানি স্পষ্ট হতে পারে তার কিঞ্চিৎ নমুনা পেশ করলেই বিষয়টি প্রাঞ্জল হবে—

> ভ্রমরের মত নীলাভ মেঘডুমুর শাটিকা, যার অভ্যন্তরভাগ হ'তে রক্তবর্ণ অন্তরীয় আভাসিত, শ্বেত রাজহংসের পক্ষের মত দৃঢ়পিনদ্ধ শুভ্র কঞ্চুলিকা, সুনীল উত্তরী পীনোন্নত বক্ষদেশকে আবৃত ক'রে স্কন্ধের উপর বিলম্বিত ও দীর্ঘিকার মন্দবাতাসে উড্ডীন। আর্দ্র ও সুকুঞ্চিত কেশরাশি অগুরুগন্ধে সুরভিত, সযত্নে কাঁকই দিয়ে বিনানো সে কেশভার দুই বেণীর আকারে সুচারুরূপে গাঁথা, ক্ষুদ্র একটি বকুলমালা যেন তৃতীয় একটি বেণীরচনা করেছে, এই তিন বেণীর সমাহারে সৌন্দর্যের ত্রিবেণীতীর্থ পট্টজাদ ফিতা দ্বারা গ্রন্থিত, তদুপরি স্বর্ণিল সুসূক্ষ্ম তার দ্বারা কুন্তলরাশি সুবেষ্টিত।[৩]

ত্রয়োদশ শতকের ভাব-বিহ্বলতা যেন আক্ষরিকভাবে পাঠকের সামনে এসে হাজির হয়। পাঠকের কাছে কালের দুরতিক্রম্যতা ভাষার গাম্ভীর্যে হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য পরিক্রমণ। সমাসবদ্ধ পদ সমৃদ্ধ দীর্ঘ বাক্য, সংস্কৃতানুসারী তৎসম শব্দ মণ্ডিত এই আলঙ্কারিক বর্ণনা সহস্রাব্দ প্রাচীন সময়কে আমাদের কাছে জীবন্ত করে তোলে। সুদূর অতীতের রহস্যময়তা, গাম্ভীর্য, উৎকণ্ঠা— শুধুমাত্র ভাষার কুশলী বয়নে কতখানি প্রাঞ্জল হয়ে উঠতে পারে তা 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' পাঠেই বোধগম্য হয়। এরই পাশাপাশি লেখক একবিংশ শতককে যখন আখ্যানে তুলে ধরেন সেখানেও ভাষা স্বাতন্ত্র্য সমানভাবে লক্ষিত হয়—

> গাইছি তো। বহুতবার গাইছি। কত শিশুর মা অইছি, তাগো শিয়রে বইয়া হেই গান গাইয়া ঘুম পারাইছি। আমার মনের মানুষ ঘরে আইল না দেইখা বর্ষারাতে হুইয়া হুইয়া নিজের মনে হেই গান গাইছি। চক্কু জলে ভাইসা গেছে। কত বাপের গলা ধইরা এই গান গাইয়া আবদার করছি। কত্তোবার হেই গানডা গাইতে গাইতে সোয়ামীর বুকে মাথা থুইয়া ঘুমাইছি। বহুতবার গাইছি। আরও বহুতবার গামু।[৪]

পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষার আদর্শ প্রয়োগ, ছোটো ছোটো বাক্য, চলতি বুলি— সবকিছু মিলিয়ে ভাষা যেমন দ্রুত লয়ের হয়েছে, তেমনই অতি সহজে আখ্যানকে তার কাঙ্ক্ষিত পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। ইতিহাসের এমন এক মহাপুরুষকে আশ্রয় করে এই আখ্যান গড়ে উঠেছে যাঁর সম্বন্ধে যতটা না জানা যায়, তার চেয়ে বেশি অজানা রয়ে গেছে। সমগ্র আখ্যান জুড়ে কাঙ্ক্ষিত শব্দ যোজনায় লেখক এমন এক ভাষা-পরিসর নির্মাণ করেছেন যেখানে সেই অজানাকে আবিষ্কারের গোপন আনন্দ, উৎকণ্ঠা,

কৌতূহল অতি সহজেই লক্ষিত হয়। এই টান টান গল্প বলার আবহেই রয়েছে আরেক অন্তঃসলিলা মননের আন্তর্বয়ন, আখ্যান জুড়ে যা অদ্ভুত এক প্রশান্তি ছড়িয়ে রাখে। নাগরিক ক্লান্তি, ইতিহাসের রহস্য উদ্ঘাটন, সহস্রাব্দের ব্যবধান— সবকিছু পেরিয়ে বহুদূর কোনো নির্জন নদীতটে বসে থাকা একাকী কবির আত্মকথন এই আখ্যানকে বড়ো মায়ায় জড়িয়ে রাখে। পাঠ শেষেও যে মায়া পাঠকের মননে দীর্ঘ স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' (২০১৭) শুধু সময়ের বিন্যাসকেই নয় সাহিত্য সংরূপের প্রথাগত ধারণাটিকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। চরিত্র হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন গৌতম বুদ্ধ, বড়ু চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কমলকুমার মজুমদার, সাদাত হাসান মান্টো, ঋত্বিক ঘটক, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অরুণেশ ঘোষ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, অমিয়ভূষণ মজুমদার, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, নবারুণ ভট্টাচার্য— সারস্বত সমাজের এমনই সব নাম। আখ্যানের মাঝে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আর বিরসা মুণ্ডাও হাজির হন। সংবাদপত্রের রিপোর্ট, শিরোনাম, চিঠি, পোস্টার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গোপন রিপোর্ট, দেবব্রত বিশ্বাসের গান, নিধুবাবুর জলসা সমস্ত কিছু নিয়ে গড়ে উঠেছে এর আখ্যান শরীর। এই সব কিছু মিশে গেছে এমন এক কালবৃত্তে যা সময়ের একরৈখিকতাকে তছনছ করে দিয়েছে। আসলে 'ঠিক সময়ও নয়, একটা সময় থেকে আরেকটা অন্য সময়ের মাঝখানে যে গুপ্ত দরজা, সেখান দিয়ে এক কাল থেকে আরেক কালে যাওয়া আসা সম্ভব, সেই দরজাটাই এই উপন্যাসের প্রধানতম চরিত্র ও চালিকাশক্তি।'[৫] সময় আর চরিত্রের এই অভিবনবত্বের মাঝে যোগ্য সঙ্গত দেয় তীক্ষ্ণ আখ্যান ভাষা, কাটা কাটা বাক্যে সরাসরি যা আছড়ে পড়ে পাঠকের মস্তিষ্কে—

> কাল, মাঝরাত অবধি দেউলটিতে। দিগন্ত পর্যন্ত ফাঁকা একটা মাঠ। চাটাই বিছিয়ে। পাঁচজন। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের ভগ্নিপতি রমলাকান্ত (ইনি কালীপ্রসন্নর বাবার বিয়েতে নীতবর হয়েছিলেন বলে জানা গেল কালই), আর মধুসূদন দত্ত। হাতে হাতে বাংলার পাঁচ-পাঁচটা বড়ো খাম্বা। হু হু করে হাওয়া আসছে চারদিক থেকে। পূর্ণিমা শেষের আধভাঙা চাঁদ। খোলা আকাশ। তারা ভরা। . . . তুমুল হৈ হল্লা, ঝগড়া করছেন কালীপ্রসন্ন আর বঙ্কিমচন্দ্র। সিপিএম আর মাওবাদী রাজনীতি নিয়ে। গান্ধী আর মার্ক্স নিয়ে। শরৎচন্দ্রের বাড়ির কাছেই পাঁচজনের এই অভিসার।

> গ্রামটাকে তাঁর উপন্যাসের মতোই লাগল, এখনও। পুরনো বাড়ি। দোকান। রাস্তা। গাছ। জঙ্গল। চেনা চেনা বড্ড।[৬]

বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে লেখক শব্দ যোজনায় অধিক মনোনিবেশ করেছেন। বিচ্ছিন্ন শব্দ আর পূর্ণ যতির সমন্বয়ে আখ্যান ভাষা হয়ে উঠেছে ঋজু, লক্ষ্যভেদী। শ্লেষ আর নস্টালজিয়া হাত ধরাধরি করে গ্রথিত হয়েছে এমনই এর ভাষা সৃজন। ভাষা-সাহিত্যের যে চিরায়ত মানদণ্ডগুলি আমাদের মননে এতদিন 'আদর্শ' হয়ে থেকেছে লেখক তার প্রত্যেকটিকে অস্বীকার করেছেন, তৈরি করতে চেয়েছেন সেই 'আদর্শ'এর প্রতিস্পর্ধী বয়ান। প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা এই আখ্যানে কোনো নির্ধারণযোগ্য বিষয় হিসাবে স্থান পায়নি, স্থান-কাল-পাত্র অতিরেকে তা অনুভবের চিন্তাস্রোত হয়ে উঠেছে। স্থান-কাল-পাত্রের ত্রিমাত্রিক অবস্থানকে ভাঙতে গেলে যে অনির্ণেয়তার ভিন্ন এক পরিসর তৈরি করতে হয়, 'বঙ্কিমচন্দ্র'এর ভাষা-মানচিত্রে সেই পরিসরই নির্মিত হয়েছে।

উন্নয়নের থাবায় প্রকৃতি যেভাবে প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের তোয়াক্কা না করে, প্রকৃতি লালিত জনজাতির হিতাহিতের কথা না ভেবে যেভাবে সমাজকে 'এগিয়ে নিয়ে যাওয়া'র প্রচেষ্টা চলছে, সেই 'উন্নতি'র নির্মম সত্য বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে সাদিক হোসেনের 'মোন্দেলা' (২০১৯) উপন্যাসে। মোন্দেলা নামক কাল্পনিক এক ভূখণ্ডকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা এই আখ্যানে লেখক পাহাড়, নদী, নক্ষত্র— সবকিছুই গড়ে তুলেছেন কাল্পনিক নামে। আসন্ন 'জারিথ' (উন্নয়ন)-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় মোন্দেলার জনগণ, কল্পলোকের আখ্যান হয়ে ওঠে সাম্প্রতিক ইতিহাসের মত সত্য। সাধারণ মানুষের সহজ অথচ অনমনীয় এই সংগ্রাম মোন্দেলার ইতিহাসকে নতুন ভাবে ভাবিত করে। ইতিহাসের বাক্ বদলের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা কাল্পনিক এই ভূখণ্ডের মানবিক সম্পর্কগুলিও প্রকৃতির লালনেই বিস্তার লাভ করে—

> প্রকৃতির তাণ্ডব শেষ হয়েছে। এখন নিরাপদ, সুস্থির, দুপুরের ঘুমের মতো স্নিগ্ধ, শুধু উপস্থিতিটুকু টের পাওয়া যায়, আধিক্য কিছুমাত্র নেই— এমন আয়তন, হ্যাঁ, এমনি আয়তন সে মুঠোর মধ্যে টের পেল। সে চেপে ধরছিল। ছেড়ে দিচ্ছিল। আবার চাপ দিচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে, ঝটিকায় নয়, নির্দিষ্ট ছন্দে বাসাটার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা পাখিটার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। . . . দানিস তার মুখ থেকে বিতিরার আঙুল নামিয়ে দিল। এইবার সে প্রায়-অস্ফুট বুকের দিকে তাকাল। পাঁজরের উপর বহু কৃপণতায় যেন মাংসপিণ্ডদ্বয় আটকিয়ে আছে। কৃপণতা নয়; সে নিজেকে শুধরে নিল। সংযম সে এই শব্দটি উচ্চারণ করল।[৭]

মোন্দেলার শব্দ চয়নে লেখক যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আস্ত একটি ভূখণ্ড শুধুমাত্র ভাষার কৃৎ-কৌশলে কীভাবে জ্যান্ত হয়ে উঠতে পারে তার আদর্শ উদাহরণ মোন্দেলা। অপরিচিত জগতের অজানা রহস্য, রীতি-নীতি, সংস্কার, ভাব-ভালোবাসা সবকিছুই উপস্থাপিত হয় যথাযথ ভাষায়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের সূক্ষ্ম কাব্যিক অনুভূতি জেগে থাকে আখ্যানের সর্বত্র। কোথাও কোথাও জীবনানন্দের কবিতার পঙক্তি সরাসরি উঠে আসে আখ্যান শরীরে, কিন্তু মোন্দেলার মায়াময় জগতে তা কখনোই প্রক্ষিপ্ত বলে অনুভূত হয় না। ভাষার এই আত্মীকরণ সমগ্র আখ্যান জুড়ে এতটাই সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে যে মোন্দেলা আর কোনো কাল্পনিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে না, মোন্দেলা হয়ে ওঠে সর্বকালের শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক।

অলোকপর্ণার ‘রণ বিশ্বাস কারো নাম নয়’ (২০১৯) এমন এক বিষাদ গাথা যা আমাদের গোপনতম ইচ্ছেগুলোকে খোলা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চায়। অবদমিত, অকালমৃত সেই সব ইচ্ছে সমূহের যদি নামকরণ করা হয় তবে তা হবে রণ বিশ্বাস; সেই কারণেই রণ বিশ্বাস কোনো বিশেষ্য পদ থাকে না, হয়ে ওঠে আমার-আপনার অন্তরতম সত্তার বিশেষণ। আমাদের সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কগুলো, পারিবারিক অতি আপন আত্মীয়তাগুলো কতখানি অসাড়, ঠুনকো, ক্লেদাক্ত হতে পারে তার সাক্ষী রণ বিশ্বাস। বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আখ্যানের ভাষাও হয়ে ওঠে গহীন, গোপন, অন্তরতম সত্তার আত্ম উন্মোচনকারী শব্দ প্রবাহী—

> এই প্রথম আমি গোটা আমাকে আয়নায় নগ্ন দেখছি। আমার চোখ আমার মেদহীন হালকা সাদাটে শরীরটার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। আমি দেখলাম আমার বুকে, লিঙ্গদেশে, বগলে, গালে বয়ঃসন্ধি স্পষ্ট হয়ে আছে। আমার গলার সাদা পাতলা চামড়ার নিচে নড়তে থাকা অ্যাডামের আপেলটাকে দেখলাম আমি। . . . আমার হাতের ফ্যাকাসে নখগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। আমার তীক্ষ্ণ নাকের ওপর সদ্য সেলাইয়ের দাগ দেখলাম। আমার মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুলের ঝাঁক দেখলাম।
> যেন, এই প্রথম আমি আমাকে দেখলাম।
> দেখলাম, কেমন যেন আবছা হয়ে আছি।
> আপনি কখনো নিজেকে দেখেছেন, এভাবে?
> আত্মা অবধি দেখেছেন?[৮]

আত্ম দর্শনের এই বিবরণ, পাঠককে সম্বোধন করে এই চিরন্তন জিজ্ঞাসা ক্ষণিকের জন্য হলেও আমাদের স্তব্ধ করে দেয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নগ্ন থেকে নগ্নতরতায় উত্তীর্ণ হতে হতে রণ বিশ্বাস আবিষ্কার করে নিজের বিবর্তিত সত্তাকে; বয়ঃসন্ধির ক্রান্তিকালে নিষিদ্ধ সুখের আস্বাদনে বিধ্বস্ত রণ বিশ্বাস অনুভব করে অন্তরতম ক্লান্তিকে। এই ক্লান্তি মানুষকে আনন্দে হাসায় না, দুঃখে কাঁদায় না, অনুভূতি শূন্য এক অসাড়তা সর্বদা গ্রাস করে থাকে অস্তিত্বকে। অস্তিত্বের এই বিষণ্ণতা ধীরে ধীরে রণ বিশ্বাসকে এক অধুনান্তিক অবমানবে রূপান্তরিত করে, সর্বগ্রাসী সেই বিষণ্ণতার ভাষ্যই হয়ে ওঠে আখ্যান শরীরের ভাষা কাঠামো।

একবিংশ শতকের নাগরিক জীবনের পৌনঃপুনিকতার ফাঁক-ফোঁকরের মধ্য দিয়ে যে হতাশা-ফুর্তি-দুঃখ-আনন্দ সবকিছু বেরিয়ে আসতে চায়, শহরের রাজপথে নাগরিক ক্লান্তি যে বন্ধনহীন মুক্তির স্বপ্ন দেখতে চায়, শুভদীপ মৈত্রের 'গুলজার নগরের পক্ষী ও নাগর' (২০২০) সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার গল্পই শোনায়। নগর কলকাতার পার্ক স্ট্রিট-সদর স্ট্রিট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই আখ্যান ধীরে ধীরে সমগ্র মহানাগরিক জীবনের আকৃতি হয়ে ফুটে ওঠে। নগর কলকাতার নৈশ জীবন, নেশাতুর আড্ডা, কর্পোরেট জগতের রাজনীতি— সবকিছু ছাপিয়ে সেই আকৃতিই বারবার উঠে আসে আখ্যানের পাতায় পাতায়—

> এই যে কেসি দাসের মিষ্টির দোকানের থেকে একটু উত্তরমুখী এগিয়ে জিরচ্ছে, চারপাশ দিয়ে লোকের মিছিল, গাড়ির আওয়াজ, হর্ন, মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর— তা বছরের পর বছর ধরে এক, এক মরীচিকা তৈরি করে আসছে, একটার পর একটা 'মিথ' যা বোঝায় এটাই উন্নতি, এটাই প্রগতি, এই জীবনটাই স্বপ্নের জীবন— অথচ এই যে ক্যাকোফনি এই যে ক্লান্তিকর দৃশ্য এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে দীপেশ যে জিরচ্ছে তার চোখের সামনে সেটা বদলে ফুটে উঠছে না নিরিবিলি পাহাড়ি পাকদণ্ডী বেয়ে একটা ছোট চুড়ো, যেখানে কুয়াশা ঢাকা গাছের থেকে জানা-অজানা পাখির ডাক ভেসে আসে আর দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা, দার্জিলিঙের পুরো রেঞ্জ দেখা দেয়— মিলিয়ে যায়। এমন দৃশ্য সে এই মুহূর্তে কল্পনা করতে পারবে না, তার ক্লান্তি সেই জন্য শরীরে থেকে যায়, মনের মধ্যে জাঁকিয়ে বসে আরো অন্ধকার— তাকে শেখানো হয়নি সুন্দর জীবন কাকে বলে অথবা

> জীবনে সৌন্দর্যের প্রয়োজন— ইউটিলিটেরিয়ান শহরে সে আরেকটা বোড়ে মাত্র।[৯]

যে প্রাতিষ্ঠানিকতা চাকচিক্যময় অন্তঃসারশূন্য নাগরিক জীবনকেই আদর্শ বলে তুলে ধরতে চায়, ব্যক্তি মানুষের অসহায় অভিব্যক্তি সেই শূন্যতাতেই গুমরে মরে। প্রদর্শনধর্মিতার উত্তুঙ্গ বাসনা আর ঐকান্তিক ইচ্ছে সমূহের অবদমনের প্রতিযোগিতায় শহুরে জীবন ক্রমেই নরক গুলজারে পরিণত হয়। সদর স্ট্রিট অঞ্চলের পানশালা, রেস্তরাঁ, সস্তার হোটেল, ড্রাগ্স— এই আখ্যানকে পৃথিবীর সমস্ত মহানাগরিক জীবনের রোজনামচা করে তোলে। কংক্রিটের জঙ্গল থেকে পালাবার পথ খুঁজে মরা বিভিন্ন চরিত্র আখ্যানের পরতে পরতে ধীরে ধীরে একত্রিত হয়। গুলজার শহরের যান্ত্রিকতা পেরিয়ে উন্মুক্ত সমুদ্রের সুনীল বিস্তারে তারা মুক্তি পেতে চায়, মিলতে চায় নিজেদের গোপনতম ইচ্ছেগুলোর সঙ্গে। লেখক সেই স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের ক্রমিক ইতিহাস রচনা করেছেন আদ্যন্ত নাগরিক স্মার্টনেস সহযোগে; এ ভাষায় স্থবিরতার কোনো স্থান নেই, ঝরঝরে ভাষায়, ছোটো ছোটো বাক্যে এর বক্তব্য সারাসরি উপস্থাপিত হয় পাঠকের সামনে।

বিগত এক দশকের উপন্যাসের ভাষা পর্যালোচনা মাত্র এই কয়েকটি আখ্যানের মাধ্যমে কখনওই সম্পূর্ণতা পেতে পারে না, কিন্তু সীমিত পরিসরে কিছুটা ধারণা দিতে পারে। বর্তমানে সময়ের জীবন জিজ্ঞাসা, বাঙালি সংস্কৃতি, ভারতীয় রাজনীতির পট পরিবর্তন বাংলা সাহিত্যেও প্রভাব ফেলছে। দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা আর ইংরেজি-হিন্দি ভাষার আগ্রাসন বাঙালির সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠছে। সমসাময়িক কথাসাহিত্যে তার ছাপও পড়ছে। এমতাবস্থায় বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করে আখ্যান নির্মাণে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, সাহিত্য দর্শন গড়ে উঠছে, তার স্বরূপ অনুসন্ধানই ছিল আমাদের এই সন্দর্ভের অন্বিষ্ট। বিষয়ের অভিনবত্বে, গঠনগত কৌশলে, ভাষার বৈচিত্রে এই সময়ের উপন্যাস আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির চলিষ্ণুতাকেই প্রতিভাত করে, দক্ষ হাতে বাংলা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না।

তথ্যসূত্র :

১. সেন, সুরজিৎ, ২০১৪, ‘শহর সংস্করণ’, কলকাতা, দেশের আগামীকাল, বর্ষ ১ সংখ্যা ৩, পৃষ্ঠা ১১৯
২. মুখোপাধ্যায়, অনুপম, মার্চ ২০১৬, ‘পর্ণমোচী’, বালুরঘাট, মধ্যবর্তী, পৃষ্ঠা ১৬-১৭
৩. সন্মাত্রানন্দ, মে ২০১৮, ‘নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা’, কলকাতা, ধানসিড়ি, পৃষ্ঠা ১২৬
৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৮৩

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্জুন, ২০১৭, ‘বঙ্কিমচন্দ্র’, কলকাতা, বৈভাষিক, পৃষ্ঠা ৫১

৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৫২

৭. হোসেন, সাদিক, ২০১৯, ‘মোন্দেলা’, কলকাতা, খোয়াবনামা, পৃষ্ঠা ২৬-২৭

৮. অলোকপর্ণা, ২০১৯, ‘রণ বিশ্বাস কারো নাম নয়’, কলকাতা, আজকাল, পৃষ্ঠা ১১৬-১১৭

৯. মৈত্র, শুভদীপ, ২০২০, ‘গুলজার শহরের পক্ষী ও নাগর’, কলকাতা, সোপান, পৃষ্ঠা ৯০-৯১

মুসলিম নারী জাগরণের প্রাসঙ্গিকতায় সওগাত পত্রিকা (১৯১৮-১৯৪৭) : একটি পর্যালোচনা

মহ. আজিম আলি
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ,
রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

সারসংক্ষেপ:- সমাজ-হিতৈষণার ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উপনিবেশিক সময়কালে বাংলার নবজাগরণের একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম ছিল পত্র-পত্রিকা। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে সচেতনতা বোধ জাগ্রত হতে দেখা দেয়। নব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের উদ্যোগে পত্র-পত্রিকার উদ্ভব হয়। এরূপ কিছু পত্রিকা হচ্ছে কোহিনুর (১৮৯৮) ,নবনূর (১৯০৩), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮), সওগাত (১৯১৮) প্রভৃতি। এইসব পত্রিকার লেখকগণ স্বাতন্ত্র্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার অনুসারী ছিলেন। একটি পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বহুসামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্টিত করে সাহিত্যিকগণ মুসলিম সমাজে নানা ধরনের সমস্যা বিশেষত নারী মুক্তি ও জাগরণ পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আলোকপাত করে মুসলিম সমাজের কাছে তুলে ধরেছিলে।যখন অন্যান্য সম্প্রদায় নারীরা শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাচ্ছিল তখন মুসলিম নারীরা সমাজে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক যেমন অশিক্ষা, নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, পর্দাপ্রথা, তালাক প্রভৃতি সমস্যায় ডুবেছিল এবং তখন এই রূপ সমস্যাগুলি দূরীভূত করার পথ দেখিয়েছিল সওগাত গোষ্ঠী তার লেখনির মাধ্যমে। মুসলিম সম্পাদিত কোনো পত্রিকায় এর আগে মানুষের ছবিসহ নানাবিধ একরঙা ও তিনরঙা হাফটোন ছবি এবং ব্যঙ্গ চিত্র ছাপা হয়নি। কিন্তু চিরাচরিত বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে নাসিরউদ্দীন সওগাতে প্রাতঃস্মরণীয়, ঐতিহাসিক, বিদুষী ভদ্রমহিলাদের ছবি এবং কার্টুন চিত্র ছাপতে শুরু করলেন। এই পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম মুসলিম নেতৃবৃন্দের সভাসমিতির বিবরণসহ ছবি ছাপানো হয়েছিলো।

সূচক শব্দ:- সওগাত পত্রিকা, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন,কাজী নজরুল ইসলাম, অবরোধ প্রথা, নারী শিক্ষা।

প্রতিপাদ্য বিষয়:-

সমাজ সৃষ্টির প্রাথমিক যুগ থেকে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বর্তমান যুগের এই সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সৃষ্টির বিকাশ সাধন হয়েছে। এমনকি ধর্মরক্ষা এবং রাষ্ট্র রক্ষার কঠোর পরীক্ষায় নারীও যুগে যুগে লৌহ কঠিন পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছেন।

আবার বিশ্বের প্রতিটি দেশের সমাজ অগ্রগতির মাপকাঠি হলো সে সমাজে নারীর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক গুণের বিকাশ এবং নারীর আত্মবিকাশের উপযোগী সুযোগ সুবিধা। সমাজে নারীর অবস্থান আলোচনার অপরিহার্য উপাদান হলো সে সমাজে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন। জীবনের প্রতিটি ধাপে নারী কিভাবে নানা সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং কোন প্রক্রিয়ায় সে এই সমস্যাগুলি সমাধান করে- সেটিও সমাজে নারীর অবস্থান নিরূপিত করে। বাংলার নারীসমাজ প্রাচীনকাল নানাভাবে উপেক্ষিত। শত শত বছর ধরে সামাজিক রীতিনীতি নামে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা নারীকে অধস্থন অবস্থায় থাকতে হতো। পারিবারিক গৃহস্থলীর দায়িত্ব পালন সন্তান প্রতিপালন ও প্রতিষেবা করে উত্তম স্ত্রী হওয়া ছিল তাদের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং একমাত্র লক্ষ্য।এতদিন পর্যন্ত সঠিক শিক্ষার অভাবে নারী তার প্রতিভার পরিচয় সম্যকরূপে দিতে পারেনি। মহিলারা লেখাপড়া শিখে অথবা অন্য কোন গুণাবলী অর্জন করে পুরুষের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিকঅথবা সামাজিক ভূমিকা পালন করবে সেটা যুগেরপরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাশিত ছিল না।কালের গতির সঙ্গে সমাজও ধীরে ধীরে পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলেছে। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে সমাজ উপলব্ধি করেছে। একসময় দু-একজন নারী ব্যক্তিগত গুণাবলীর অধিকারী হলেও সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে তাদের প্রতিভার বিকাশের কোন সুযোগ ছিল না।

বাঙালি নারীর অধঃপতিত অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হয় উনিশ শতকের নবজাগরণ ও নারী মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে। এই আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ছিলেন *রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭- ১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ -১৮৯১), কেশব চন্দ্র সেন (১৮৪৩-১৮৮৪)* প্রমুখ উদারপন্থী ও মানবতাবাদী মনীষী.উনিশ শতকে নবজাগরণের পরিক্রমায় নারী জাগনের ইতিহাস সঙ্গত কারণে যুক্ত হয়। এভাবে ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু সমাজে যে নারীজাগরণ শুরু হয় উনিশশতকের শেষের দিকে প্রতিবেশী মুসলিম সমাজে তার ছোঁয়া লাগে। নারী বিষয়ক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে মুসলিম সমাজের সার্বিক অধঃপতনের অন্যতন কারণ ছিল মুসলিন নারী জাতির হীন অবস্থা। সমাজের এই নিশ্চুপ অংশের উন্নতি ব্যতীত সমাজের অগ্রগতি যে রুদ্ধ হয়ে থাকবে, তারা এটি সঠিক অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, অবরোধ প্রথা, যথেচ্ছ তালাক, নারী শিক্ষার বাধ। ইত্যাদি সমস্যা দূরীকরণে সচেষ্ট হন। নারীকেন্দ্রিক নানা সমস্যার মধ্যে পর্দা বা অবরোধ প্রথা ও নারী শিক্ষার প্রশ্নে কিছু কিছু বুদ্ধিজীবীর মধ্যে ভিন্নমতও দেখা যায়। সংখ্যায় কম হলেও রক্ষণশীল সমাজে প্রগতিপন্থীদের চেয়ে এদের প্রভাব অধিক অনুভূত হয়। ফলে বিবর্তনের সূচনা বিলম্বিত হয়। এ সময় বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে সমাজের অর্ধাংশ অধঃপতিত নারী জাতির অবস্থার উন্নয়ন না ঘটানো

পর্যন্ত সমাজের সার্বিক অগ্রগতি সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে সৈয়দ আমির আলী(১৮৪৯-১৯২৮), ইসমাইল হোসেন সিরাজী(১৮৮০-১৯৩১), ফরজুনেশা চৌধুরানী(১৮৪৭-১৯০৩), রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) প্রমুখ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

সওগাত মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদক কর্তৃক ৮ জাকারিয়া স্ট্রিট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং প্রিয় নাথ কর্তৃক ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিন্ডিকেট, ১৪৮ বারানসি ঘোষ স্ট্রিট , কলকাতা থেকে মুদ্রিত। অগ্রহায়ণ ১৩২৫ , প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২রাডিসেম্বর ১৯১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮, মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০, দাম পাঁচ আনা।[১] পত্রিকার শিরোনামের নিচে উল্লেখ ছিল, *সচিত্র মাসিক পত্র।* সওগাতের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে পঞ্চম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক হিসেবে *মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের* নামের সঙ্গে আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদদের (১৮৬৯-১৯৫৩) নাম যুক্ত ছিল।এই পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত উদার ও প্রগতিশীল। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশের পর এটি অনিবার্য কারণবশত এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে এর প্রকাশনা শুরু হয়। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের পর এই পত্রিকাটি অনিয়মিত হয়ে পড়ে।[২] ১৯৫০ (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) খ্রিস্টাব্দে ৩৩ তম বর্ষ প্রকাশিত হয়। ১৩৫৯ এ অগ্রাহায়ন মাসে পুনরায়ঢাকা থেকে প্রকাশনা শুরু হয়। কিন্তু আমার আলোচ্য সময়কাল ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এটি ছিল নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত এবং বাংলা ভাষায় মুসলমান পরিচালিত প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। এই প্রসঙ্গে সম্পাদক **মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন** বলেন;

> *"কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার জন্য বাংলার মুসলিম সমাজে কেউ ছবিসহ প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে সাহসী হননি। প্রথম সংখ্যা সওগাত বের হওয়ার পর চিন্তাশীল সাহিত্যিক সমাজ ও তরুণদের কাছে অভিনন্দন লাভ করি।.... প্রথম সংখ্যা বিশেষ করে মুসলিম নারীদের ঐতিহাসিক ছবি চাপা হয়। এই ছবি ছাপা কে কেন্দ্র করে গোড়া মোল্লা শ্রেণীর লোকেরা সওগাতের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে।....কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেন আমি কিরকম মুসলমান? ....ফরিদপুরের বিখ্যাত পীরবাদশা মিয়ার কাছ থেকেও পত্র পাই। ....তাঁর পত্রে লিখেছিলেন যে সওগাত খুব ভালো পত্রিকা হইয়াছে। কিন্তু আপনার কাগজে পুরুষ ও নারীর ছবি ছাপার দরুণ ইহা ঘরে রাখিয়া নামাজ পড়া যায় না।"*[৩]

বিশ শতকের প্রথম বছরে (১৯০৩) প্রকাশিত বিখ্যাত *'নবনূর'* পত্রিকার সম্পাদক **সৈয়দ এমদাদ আলী** সওগাতের আত্মপ্রকাশে খুশি হয়ে লিখেছিলেন ;

> *"আজ তোমায় নূতন করিয়া আশীর্বাদ ও অভিনন্দন করি। অতীতের সকল গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া আজ তুমি আবার নূতন উৎসাহ ও উদ্যমে তোমার নবীন কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তোমার এ যাত্রা সফল হউক-বিজয় যাত্রা হউক।*

বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ শিক্ষায় অনুন্নত; সুপ্তিতে মগ্ন। তোমার সকল প্রাণ দিয়া তাহার মধ্যে শিক্ষার সুপ্রচার কর, তাহার সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দাও। সাহিত্যের ভিতর দিয়াই জাতির জীবন গঠিত হয়। তুমি নবচেতনার পশরা লইয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিতরণ কর। ... ধর্ম ও কর্মকে তাঁহাদের বরণ করিয়া লইতে হইবে। ধর্মের অনুসরণ ও কর্মের অনুগমনের ভিতরেই তাঁহাদের সকল উন্নতি নিহিত রহিয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমানের সাহিত্য আজ ম্রিয়মাণ, পঙ্গু, অবসাদগ্রস্ত। সৈয়দ আলাওল, দৌলত কাজী, সৈয়দ মুর্তুজা, সৈয়দ হামজা, শাহ গরিবুল্লাহ প্রভৃতি মনীষা-সম্পন্ন কবিগণ যে মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনকার্য্যে ও জীবনপণ করিয়াছিলেন, সে সাহিত্য আমাদের অবহেলায় ও অনাদরে বড় হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ... সেই আমাদের চলার পথ অন্য পথ নাই। আসরিক শক্তির ভিতরে মুক্তি নাই, মুক্তি মুক্তি জ্ঞানানুসরণে, তৃপ্তি জ্ঞানানুসরণে।”[৪]

মাসিক সওগাত, বার্ষিক সওগাত , মহিলা সওগাত, এবং শিশু সওগাত প্রভৃতির মাধ্যমে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে মুসলিম সাহিত্যের অন্যতম স্থপতি হিসেবে **মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (১৮৮৮-১৯৯৪)** নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সওগাতের দৃষ্টিভঙ্গিই সে কালের পটভূমিতে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পরিচালিত সম্পাদিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে *সওগাতকে* বিশিষ্ট করে রেখেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সংখ্যায় ঐতিহাসিক ভাবে খ্যাত কতিপয় মুসলমান মহিলার পরিচয় দান করেছেন। প্রথম পর্বের সওগাতের সাহিত্যিক তাৎপর্য নিরূপণের জন্য এর একটি প্রতিবেদন- *বর্তমান বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়* এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। মুসলিম প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেলেও এর উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে কম গুরুত্ব দেয়া চলে না।[৫] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তৎকালীন সমাজের সমালোচনার তোয়াক্কা না করে তাঁর দৃঢ়চেতা মনোবলের পরিচয় দেন **মহিলা সওগাত** (১৩৩৬, প্রথম সংখ্যা) প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “*বলা বাহুল্য তৎকালে ভারত তথা এশিয়ার কোন সাময়িকপত্রের ইতিহাসে বিশেষ মহিলা সংখ্যা ছাপা হয়েছে বলে জানা যায়নি। আমি নিজের অন্তর থেকে অনুভব করেছিলাম এরূপ প্রকাশনার দ্বারা আমাদের মহিলারা বিশেষ উৎসাহিত হবেন এবং ক্রমে তাদের চিন্তাধারাও বিকাশ লাভ করবে।*” [৬]**ফজিলাতুন্নেসা (১৯০৫-৭৭)** তাঁর *মুসলিম নারীর মুক্তি* শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন;

“এই ‘মুক্তি’ শব্দটি বলতে এখানে আত্মার মুক্তিই বুঝায়। আত্মার মুক্তি অর্থে স্বাধীন ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে সমাজের ও জগতের কাজে নিয়োজিত করে নিজের বিচার ও বিবেক বুদ্ধি দ্বারা নিজেকে চালিত করাই বুঝায়। ধর্মগ্রন্থ এবং সাধু বাক্য প্রভৃতিকে আমি বিচার বুদ্ধি বিকাশের সহায়ক উপায় বলেই মনে করি। এগুলোর দ্বারা বিচার বুদ্ধি আড়ষ্ট হয়ে গেলে এদের প্রকৃত

উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়।... নারীত্ব ভুলে গিয়ে, নিজের আমিত্ব ভুলে গিয়ে শুধু ভোগ্যবস্তু হয়ে থাকা আর নারী সহ্য করবে না।” [৭]

১৯৩০ সালে এ পত্রিকার মহিলা সংখ্যায় *জানানা মাহফিল*এ নারী লেখকদের ছবি ছাপানো হলে সম্পাদক **নাসিরউদ্দীন** প্রতিক্রিয়াশীল সমাজপতিদের দ্বারা আক্রান্ত হন। **সওগাত** পত্রিকার স্লোগান ছিল –‘*নারী না জাগলে জাতি জাগবে না*’। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নারী সমস্যার কথা উঠে আসে এ পত্রিকায়। নারী জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সওগাতে কয়েকটি কবিতাও ছাপা হয়। এরকম একটি কবিতা নিম্নরূপ-

জাগো নারী, জাগো তুমি বাজাইয়া ভয়াল বিষাণ,
অত্যাচারী মাতিয়াছে গাহ তারি সর্বনাশা গান।
অত্যাচার অপমানে তোর বুকে যে দিয়েছে দাগা
চিত্তের সকল দাহ তারি তরে জাগা, তুই জাগা। [৮]

মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার অপসারণের জন্য যুক্তিবুদ্ধির চর্চা কার্তিক ১৩৪০ (১০ বর্ষ, ১ সংখ্যা) মহিলা সংখ্যায় পরিলক্ষিত হয়। **মহিলা সওগাতে** (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) কবিতা লিখেছিলেন *বেগম সুফিয়া এন হোসেন, কুমারী মলিনা হালদার, কামিনী রায়, শ্রী বিমলা দেবী, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, শামসুন্নাহার ইউসুফ, শ্রী প্রসন্নময়ী দেবী, শ্রী সুষমা দেবী, শ্রীমতী রাধারানী দেবী*। প্রবন্ধ লেখেন রাজিয়া খাতুন, ‘ইসলামে নারীর স্থান’; মিস্ আছিয়া মজিদ বি.এ. ‘শিক্ষা’; শ্রী সরলাবালা সরকার ‘নারীজাতি ও রাজনীতি’; কুমারী শ্রীমতী ছায়াদেবী ‘স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত’; শ্রী নীহারবালা দেবী ‘গালিচার কথা’; শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, ‘সমস্যা’ প্রভৃতি বিষয়ে। সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বাঙালী মুসলমান নারী সমাজের চর্চার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ১৩৩৬ থেকে ১৩৫২ সালের মধ্যে মোট ছ'টি মহিলা সওগাত প্রকাশিত হয়। [৯]

সওগাত পত্রিকা মুসলিম নারীসমাজের হৃদয়বিদারক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই পত্রিকার মতে তখন নারীদের জীবন্ত সত্তাকে অস্বীকার করে সংস্কারবদ্ধ সমাজ তাদের দেহ ও মনকে জড়পিণ্ডের মতো করে রেখেছিল। স্ত্রীশিক্ষা ছিল নিষিদ্ধপ্রায় এবং বাংলা শিক্ষাকে পাপকাজ মনে করা হত। পরিবারে কঠোর অবরোধ প্রথা চালু ছিল, পর্দাভঙ্গের ভয়ে কঠিন পীড়াতেও ডাক্তার দেখানো হত না। ধনীর স্ত্রীরা ছিল ভোগের বস্তু এবং গরিবের স্ত্রীরা ছিল ক্রীতদাসী স্বরূপ। উৎপীড়ন, নির্যাতন, অবজ্ঞা ছিল তাদের চিরদিনের সঙ্গী, স্বামী কথায় কথায় তাদের তালাক দিত। বিয়ের সময় তাদের সম্মতি নেওয়া হত না, কৌলীন্য ও পণপ্রথা চালু ছিল, পিতা ও স্বামীর সম্পত্তি থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখা হত এবং ধর্মীয় অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না। মেয়েদের সামাজিক জীবন বলতে কিছুই ছিল না।[১০]

১৯১৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিন যুগ ধরে সওগাতের অসংখ্য লেখকের রচনা মুদ্রিত হয়। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১),*

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৬১), বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৫২), এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), প্রভাবতী দেবী (১৮৯৬-১৯৭২) প্রমুখ। সওগাতের মুখ্য লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৫), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)* প্রমুখ। সাহিত্য সংস্কৃতির সকল শাখায় সওগাতের লেখক গোষ্ঠী সমকালীন সমস্যা শনাক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে সমর্থিত প্রধান বিষয় হলো স্ত্রী শিক্ষা ও নারী জাগরণ। বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছালে সামাজিক উন্নতি সম্ভাবনা সম্পর্কে **ফিরোজা বেগম** মত প্রকাশ করে বলেন;

> *"নারী জাতিকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহারা শুধু উপযুক্ত গৃহিণী বা উপযুক্ত মাথা হইয়া উঠে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বামীর উপযুক্ত পরামর্শদাত্রী ও সত্যকার সহধর্মিনী হইয়া ওঠে আজ সত্যই মুসলিম মাতা- ভগিনীদের শিক্ষা চাই, মুক্তি চাই। শিক্ষাভাবে স্বাস্থ্যভাবে বাঙালি মুসলিম নারীগণ আজ ও শূন্য। মধ্যবিত্ত সমাজের সহিত জাহাজের পরিচয় আছে তাহারা জানেন যে ,ঘরে ঘরে আছে কেবল দায়িত্ব কিন্তু প্রীতি নাই ,কম্ম আছে অবসর নয়।এই সমস্তের অন্তরালে কি মানুষ গড়িয়া উঠতে পারে।"* [১১]

সওগাতে পর্দাপ্রথা সম্পর্কে লেখা হয়;

> *"পর্দাপ্রথা বর্জন করিয়া তুরস্ক অশেষ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। আজ তুর্কী নারী তাই তুরস্কের যাবতীয় কল্যাণ আন্দোলনে পুরুষের সমকক্ষতা হইয়া তাহার শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সর্বত্রই তুর্কী নারীর অবাধ গতি........পর্দা প্রথা আমাদের প্রাণশক্তি খর্ব করিতেছে। আপনারা সত্যকার দেশপ্রেমিক ও সমাজ হিতৈষীর মত এই সর্বনাশী পর্দাপ্রথা একেবারে তুলিয়া দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করুন।"* [১২]

বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার মুসলিম সমাজের পশ্চাদপদতা দূরীকরণে যাঁদের ভূমিকা স্মরণীয়, **রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)** তাঁদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।সওগাতের জন্মলগ্ন থেকেই বেগম রোকেয়া এই পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা হিসেবে যুক্ত ছিলেন। মাসিক সওগাতে রোকিয়ার মুদ্রিত রচনার সংখ্যা **১১**টি। তন্মধ্যে একটি কবিতা, দুটি গল্প ও আটটি প্রবন্ধ।মুসলিম নারী সমাজের জন্য গভীর দরদ এবং কর্তব্যবোধ থেকেই রোকেয়া নারীশিক্ষার প্রচলন করেন। নারী কেবল পুরুষের আজ্ঞাবহ দাস নয়, নারী তার স্বীয় মেধা ও কর্মে পুরুষের ন্যায় স্বাবলম্বী হওয়ার যোগ্যতা রাখে- এই সত্যকে রোকেয়া হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই

তিনি সবার আগে নারী শিক্ষাকেই একমাত্র প্রয়োজনীয় কর্তব্য বিবেচনা করেন। শিক্ষা কেবল স্বামী, সন্তান, সংসারের জন্য নয় বরং নারীর আত্মোন্নয়নের জন্য- এ সত্য তিনি মনে প্রানে উপলব্ধি করেছিলেন। *অবরোধ প্রথা* প্রসঙ্গে রোকেয়া তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বলেছেন;

> *"অবরোধ প্রথাকে প্রাণ ঘাতক কার্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না। অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।"* [১৩]

সমকালীন পুরুষতান্ত্রিক মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষা যে একটা সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে, এই দৃষ্টিভঙ্গির তিনি সমালোচনা করে বলেছেন;

> *"মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রীশিক্ষায় ঔদাস্য। ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটা কত আলীগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর করিয়াই পুলসিরাত (পারলৌকিক সেতু বিশেষ) পার হইবেন- আর পার হইবার সময় স্ত্রী ও কন্যাকে হ্যাণ্ড ব্যাগে পুরিয়া লইয়া যাইবেন। বিশ্ব নিয়ন্তা বিধাতার বিধান যে অন্যরূপ-সে বিধি অনুসারে প্রত্যেককেই স্ব স্ব কর্মফল ভোগ করিতে হইবে।"* [১৪]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে যাদের তেজোদীপ্ত লেখনী আমাদের গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজকে বিচলিত করে তাদের মধ্যে একজন মিসেস **এম. রহমান** পারিবারিক নাম মাসুদা খাতুন (১৮৮৫-১৯২৬)। মুসলমান সমাজে প্রচলিত পর্দাপ্রথা ও নারী অধিকার সম্পর্কে তিনি যুক্তিসম্মতভাবে আলোচনা করে বলেন;

> *"ইসলাম আমাদিগকে কারা প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ থাকতে, জড় পুত্তলিকার মত গৃহসজ্জার উপকরণ হয়ে থাকতে বলেনি, জ্ঞানলাভ অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছে। আমরা ইসলামের সহযোগিনী, চাই রণাঙ্গনে সঙ্গিনী।.... আমরা চাই আমাদের মধ্যে বিরাট মাতৃত্ব জাগাতে, চাই মঙ্গলসাধিকারূপে পবিত্র ইসলাম ও খেলাফতের সেবা করতে। কে আমাদের পথ রোধ করবে? সমাজরূপী শয়তান? কখনই পারবে না।"* [১৫]

কাজী আবদুল ওদুদ(১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হোসেন (১৮৯৭-১৯৩৮) এবং অন্য সদস্যেরা সওগাত পত্রিকায় বাঙালী মুসলমান সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও সামাজিক আচার আনুগত্য, সংস্কারপ্রিয়তা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বাঙালী মুসলমান সমাজে বাংলাভাষার স্থান, পর্দা ও স্ত্রী স্বাধীনতা, স্বতন্ত্র সুযোগ সুবিধা প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। **আবুল হোসেন** সমকালীন মুসলমান সমাজের বিধিনিষেধ ,নিয়ন্ত্রণও বিড়ম্বনাকে তুলে ধরে বলেছেন;

"মুসলমান সমাজ এত কঠোর বিধিনিষেধেয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যে, এর মধ্যে চিত্তের বিবিধ ক্ষুধা নিরায়ণ করবার মত বেশী উপকরণ নাই, সেজন্য মুসলমান সমাজের চিত্ত আজ অন্য সমাজের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে। সহস্র বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ধর্মবিধি পীড়িত মুসলমানের শুষ্ক নীরস চিত্ত আজ প্রতিবেশীর আনন্দের পানে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে-সেটা চিত্তের স্বভাব-ধর্ম। সে আনন্দ ও রুচির বৈচিত্র্যই স্মৃতিলাভ করে-নিষেধ তাকে বিড়ম্বিত করে মাত্র। মুসলমানের গৃহ নিয়ানন্দ-বিশেষত মুসলমানের নারী সমাজ নিতান্ত হতশ্রী-তার কারণ শিক্ষা ও পর্দায় কঠোর সংস্কার ,যাতে করে মুসলমান নারী আনন্দ কি তার আস্বাদ পেতে পারেনা। এই চিত্তহারা নিরানন্দ গৃহে অধিকতর নিরানন্দ জীবনানন্দে-বঞ্চিত, হীন স্বাস্থ্য, বৈচিত্র্য-তৃষ্ণায় যায় চিত্ত নিরন্তর কাতর অন্য সমাজের শ্রী আনন্দ দেখে যার চিত্তে অপূর্ব উল্লাসজমে উঠেছে, কি করে নিষেধের বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হতে চায়? নিষেধ তার নিকট মৃত্যু-নিষেধ তখন লঙ্ঘন করাই তার নিকট জীবন, সেইটাই তার নিকট অতি সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।" [১৬]

বাংলার মুসলিম মেয়েরা শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে পশ্চাদপদ ছিল। একশ্রেণীর রক্ষনশীন মুসলিম নারী শিক্ষার তীব্র বিরোধী ছিলেন। বাঙালি মুসলমান সমাজে মেয়েদের শিক্ষারমুসলমান সমাজে মেয়েদের আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান করা যুক্তিসঙ্গত কিনা এ বিষয়ে তৎকালীন পত্র-পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই তাদের বিরোধিতার কথা ব্যক্ত করেন। **১৯১৯** সালে সওগাত পত্রিকায় **নুরুন্নেসা খাতুন** *নারীজাতির শিক্ষা* শীর্ষক প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে; *" ইসলামীয় জ্ঞান বর্জন করে ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের মতো মুসলমান মেয়েদের মিশনারি স্কুলে গমন করা অনভিপ্রেত, যতদিন না পর্যন্ত মুসলমান মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল স্থাপন করা যাচ্ছে ততদিন গৃহের মধ্যেই তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।"* [১৭] আবার নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি নিয়ে সওগাত পত্রিকায় **ফজিলতুন্নেসা** অনেক গল্প ও প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর লেখা 'মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' (১৩৩৪), 'নারীজীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ' (১৩৩৫) এবং 'মুসলিম নারী মুক্তি' (১৩০৬) বাংলার নারীজাগরণে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেন;

"শিক্ষিত সকলেই জানেন যে, শিক্ষা হিসেবে আমাদের দেশ জগতের অন্যসব দেশের তুলনায় কত পেছনে পড়ে রয়েছে। নারীশিক্ষার আয়োজন আবার এরই মধ্যে কত অসম্পূর্ণ। তার মাঝেও আমাদের সম্প্রদায়ে এই অসম্পূর্ণতা অনেক বেশী! তাই আমি আজ বিশেষ করে মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাটাই মুসলিম তরুণদের সামনে ধরে দিতে চাই। অবরোধের আবরণ থেকে বাইরে এসে জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমি পেয়েছি।.... তাদের জীবনের এত বড়ো অসম্পূর্ণতা যে শুধু তাদেরই নষ্ট

করছে তা নয়, এর ভিতর দিয়ে একটা ধ্বংসোন্মুখ প্রভাব সমাজকে সমগ্রভাবে প্রতিনিয়ত নীচের দিকে টানছে।” [১৮]

সওগাত তারুণ্য, প্রগতি, সর্বাধুনিক ও সর্বাগ্রগামী চিন্তা চেতনার পরিপোষক ছিল।সওগাত পত্রিকাটির সাথে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পর্ক পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন হতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। **কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯- ১৮৭৬)** সওগাত পত্রিকায় বাঙালি নারী সম্পর্কে লিখেন;

“কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ তাহা মনেও করতে পারি না। আমাদের কন্যা জায়া জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ...আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে নারী।... এখন আমাদের তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চিরবন্দিনী মাতা ভগ্নিদের উদ্ধার সাধন।” [১৯]

সওগাত এর প্রগতিশীলতার জন্য রক্ষণশীল মহলের আক্রমণের শিকার হয়। মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) ও তাঁর পত্রিকা মোহাম্মদী (প্রকাশকাল ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ) এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এমনকি সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন রক্ষণশীলদের দৈহিক আক্রমণেরও শিকার হন।মোহাম্মদী বা অন্যান্য রক্ষণশীল পত্রিকা নয়, বাঙালি ও বাঙালি নির্বিশেষে দু-চারজন পিরও সওগাত-এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে ফুরফুরার পির মোহাম্মদ আবু বকরের বেশ ভূমিকা ছিল। ‘ভণ্ডের দল’ শিরোনামে এঁদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়; *“আজ বাঙ্গলার মুসলমান সমাজে ভণ্ডামীর রাজত্ব চলিয়াছে। সাহিত্যের পবিত্র অঙ্গনে এই ভণ্ডামী এমন বিকৃত রূপ লইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সেই সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকা আর আমরা সমীচীন মনে করিতেছি না। আমাদের এক বৃদ্ধ সহযোগী। বিনা যুক্তি এবং বিনা প্রমাণে আমাদিগকে বহুবার 'কাফেরী' ও 'নাস্তিক্যের' ফৎওয়া দিয়াছেন।.. তার উপর তিনি আমাদের কয়েকজন লেখককে যে রূপ গালিগালাজ করিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাহার পাক মুখেই শোভা পায়।”* [২০] তবুও সওগাত স্বীয়নীতি ও কর্মপদ্ধতি থেকে সরে আসেনি। সওগাতে'র উদারনৈতিকতার স্বরূপ সহজে উপলব্ধি করা যায় *মোহাম্মদী* পত্রিকার সঙ্গে এর দ্বন্দ্বের মধ্যে। ধর্ম ও সংস্কৃতি, নারীর অধিকার ও ভূমিকা, সাহিত্যের ভাব ও উদ্দেশ্য-এসব বিষয়ে এই দুই সমকালীন পত্রিকার যে মতভেদ তা বাঙালী মুসলমান সমাজের দুই বিপরীতমুখী প্রবণতাকে সামনে টেনে এনেছিল। একথা বলা অসঙ্গত হবে না , যে পরিণামে 'সওগাতে'র উদারনৈতিক আদর্শই বাঙালী মুসলমান সমাজে বিশেষতঃ তরুণদের কাছে, অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। আধুনিক

শিক্ষা, ললিত- কলা, চর্চা, নারী প্রগতি, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে তরুণ মুসলিম লেখকগণ আরো জোরালোভাবে লেখনী পরিচালনা করে। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে, পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনের ক্ষেত্রে সওগাত-গোষ্ঠী পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেন। মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার অভাব সম্পর্কে সওগাতের লেখকেরা সচেতন ছিলেন। অবরোধ প্রথার বিষময় ফল সম্পর্কে তাঁরা সমাজকে সতর্ক করে দেন এবং নারীর অধিকার সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ আছে সওগাতের পৃষ্ঠায়। তাইবাংলার মুসলিম নারী জাগরণের ইতিহাসে সওগাতের এই প্রগতিশীল ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১) আনিসুজ্জামান, (নভেম্বর ১৯৬৯), *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৮৩১-১৯৩০), ঢাকা,* বাংলা একাডেমি, , পৃ.২৫৬।

২) বাংলাপিডিয়া , https://bn.banglapedia.org

৩) মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, (চৈত্র ১৩৩৬), *ইসলাম ও মুসলমান,* সওগাত।

৪) এমদাদ আলী সৈয়দ, (আষাঢ়১৩৩৩), *শুভাশিস,* সওগাত।

৫) খান ইসরাইল, (ডিসেম্বর ২০০৫), *মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (১৯৩১*-১৯৪৭), ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ.৮৮।

৬) নাসিরউদ্দিন মোহাম্মদ, (পৌষ ১৩৩৭), সওগাত, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ,* পৃ.৫০।

৭) ফজিলাতুন্নেসা, (ভাদ্র ১৩৩৬), *মুসলিম নারী মুক্তি,* সওগাত।

৮) ঐ।

৯) জামান লায়লা, (ডিসেম্বর১৯৮৯), *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা (১৯১৮-১৯৪৭),* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ.৩৩।

১০) হোসেন আনোয়ার, (জুন২০১৪), *স্বাধীনতাসংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১,* কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, পৃ.৩৯।

১১) বেগম ফিরোজা, (ভাদ্র ১৩৩৬), *আমাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা,* সওগাত।

১২) বেগম সুরাইয়া, (বৈশাখ ১৩৩৬), *পর্দাপ্রথা প্রগতি বিরোধী,* সওগাত।

১৩) হোসেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত, (চৈত্র ১৩৩৩), *বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি,* সওগাত।

১৪) ঐ।

১৫) রহমানএম., (ভাদ্র ১৩৩৬), *পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা,* সওগাত।

১৬) হোসেন আবুল, (ভাদ্র ১৩৩৩), নিষেধের বিড়ম্বনা, সওগাত।

১৭) খাতুন নুরুন্নেসা, (কার্তিক ১৩২৬), নারী জাতির শিক্ষা, সওগাত।

১৮) ফজিলাতুন্নেসা, (অগ্রহায়ণ ১৩৩৪), মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সওগাত।

১৯) ইসলাম কাজী নজরুল, (১৩৩৯), *অবরোধ ও স্ত্রী শিক্ষা,* সওগাত; উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান ও মালেকা বেগম (সম্পাদিত), *নারীর কথা বাঙালি নারীর অধিকার সম্পর্কিত ভাবনা,* ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৮৬-১৮৭

২০) রহমান হাবিব, (২০১৩) *বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব,* কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, পৃ.৫৪।

বিরোধী ভাবধারা ও প্রতিবাদের ভাষায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা : একটি বিশ্লেষণী পাঠ

মো: সিদ্দিক হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ

বিংশ শতকের চল্লিশ দশকের কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একদিকে মানব দরদী অন্যদিকে প্রতিবাদী। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হলেও শৈশব থেকেই গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর রচিত বেশির ভাগ কবিতার মধ্যেই রয়েছে প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের ভাষা। অন্যায়কে তিনি কখনো আপস করেননি। জীবনে চলার পথে যেখানেই তিনি অন্যায় দেখেছেন, সেখানেই তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রতিবাদের ভাষা। আর এই প্রতিবাদের ভাষাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর করিতায়। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তে-ভাগা আন্দোলন, ১৯৫৯ থেকে খাদ্য আন্দোলন, চীন- ভারতের যুদ্ধ, পুলিশ ও মহাজনদের অত্যাচার, মে দিবসের রক্তাক্ত ইতিহাস তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতা সমসাময়িক কালের দলিল; আবার বলা যায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রতিবাদের অস্ত্র। যে কারনে হয়তো শঙ্খ ঘোষ বীরেন্দ্র সমগ্রে, ১ম খণ্ডের সূচনায় বলেছেন- "সমস্ত অর্থেই বাংলার সবচেয়ে প্রতিবাদী এই কবি; তাঁর কবিতা যেন আমাদের সামনে একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরে, আমাদের হৃদয়ের ইতিহাস আর আমাদের সময়ের ইতিহাস"। যন্ত্রনাদগ্ধ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানব দরদী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাম্যবাদী আদর্শে নতুন এক ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যারা আকাশ বিষাক্ত করে, জল কালো করে, বাতাস ধোঁয়ায় কুয়াশায় ক্রমে অন্ধকার করে, চারিদিকে ষড়যন্ত্র করে; তাদের উদ্দেশে কবি "আমার ভারতবর্ষ" করিতায় উল্লেখ করেছেন-

“আমার ভারতবর্ষ চেনেনা তাদের
মানেনা তাদের পরোয়ানা
তাঁর সন্তানেরা ক্ষুধায় জ্বালায়, শীতে চারিদিকের প্রচণ্ড মারের মধ্যে
আজও ঈশ্বরের শিশু, পরস্পরের সহোদর।”

কৈশোরকাল থেকেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে বামপন্থী ভাবধারা স্পষ্ট হতে থাকে এবং ১৯৪২ এ তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্বিরোধ এবং পার্টির বিভাগ কবিকে আন্দোলিত করে এবং তাঁর ফলে কবির

মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিবাদী স্বভাব। এ প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভূমিকায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যাইয়ের বক্তব্য- "অনুভব কোন প্রশ্নের উত্তর নয়। সময়, স্বদেশ, মনুষ্যত্ব কবি কবিতা, কবিতার পাঠক কোথাও যদি একসূত্রে বাঁধা যেতো? হয়তো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত। "আর এই অনেক প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করতেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে উঠে এসেছে প্রতিবাদের ভাষা, সুর, আদল। মানুষের জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে এই অনেক প্রশ্ন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শোষিত, লাঞ্চিত, অবহেলিত, বুভুক্ষ, নিরন্ন মানুষদের ন্যূনতম অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অভাব দেখে কবির কলমে উঠে এসেছে প্রতিবাদ।

শতবর্ষে পরেও আজ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা কেন পাঠ্য? আজকের সামাজিক অবস্থা, মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন, রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজা আসে যায়' কবিতার কয়েকটি পংক্তি এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে-

"রাজা আসে যায় রাজা বদলায়
নীল জামা গায় লাল জামা গায়
এই রাজা আসে ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের রং বদলায়
দিন বদলায় না।"

সত্যিই! দিন যেন বদলায় নি। জীবনে যাপনে সমাজে সভ্যতায় সাধারন মানুষকে আজও যে অত্যাচারের, অবিচারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা পাঠককে অবগত করার অবকাশ নেই। 'রাজনীতি' শব্দের অর্থ রাজার নীতি। কিন্তু এই নীতি যখন রাজতন্ত্রের, পুঁজিবাদীদের, শাসক সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারন মানুষের জন্য সহজ, সরল স্পষ্ট এবং নিরপেক্ষ হবে তখনই তা দেশের, সমাজের, সভ্যতার জন্য ইতিবাচক হয়ে উঠবে। অথচ আজকের রাজনীতি বলা যায় দলীয় সিংহাসন লাভের একমাত্র মাধ্যম। আর যে কারনেই আমাদের সমাজে আজ সবকিছু থাকা সত্ত্বেও না পাওয়ার বেদনা মাথা চারা দিয়ে ওঠে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, পোশাক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচারের নামে চলে প্রহসন। শোষিত, উৎপীড়িত, উপেক্ষিত মানুষদের জন্য কবি তাই আক্ষেপ করেন। আবার এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য প্রতিবাদী মানুষের যে ভীষণ অভাব তাঁর প্রমান "মহাদেবের দুয়ার" কবিতা-

"যারা কথা বলছে তারা বোবা
যারা শুনছে সকলেই

জন্ম থেকে বধির। অথচ
সভায় মিছিলে তিলধারণের ঠাঁই নেই।
যারা উপস্থিত তারা বহুদিন মৃত
কিন্তু সকলেই হাততালি দিচ্ছে...."

মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। নিজের প্রাপ্যটুকু দাবী করার সাহস যেন মানুষের নেই। প্রাসঙ্গিকতায় 'প্রতিবাদ" কবিতার কথা উঠে আসে-

"গর্ভের সন্তান আর তারও পর যারা আসবে
আর যারা ইতিমধ্যে হামাগুড়ি দিচ্ছে, বইখাতা নিয়ে স্কুল
বিংবা কারখানায়
যে সব শিশু, বালক-বালিকা
স্বাধীন দেশেই যারা জন্মেছে, স্বাধীন দেশে জন্মাবে,
তাদের স্বাস্থ্য ঘরবাড়ি পড়াশুনা নিয়ে
তাদের মুখের ভাত নিয়ে এই খেলা ..."

স্বাধীন স্বদেশ যেন আজ নরকে পরিণত হয়েছে। কিন্তু স্বার্থপর মানুষ আমাদের জন্মভূমি নিয়ে, আমাদের নগর, গ্রাম, খামার, কারখানা, দেশের সীমান্ত, দেশের ভিতর পোস্টাপিস, রেলগাড়ি, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, দেশের ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নাচ, গান, ছবি, নুন, আর রুটি নিয়ে অদ্ভুত খেলায় মত্ত, এই অদ্ভুত খেলায় সাধারন মানুষ প্রতিনিয়ত নিরন্ন, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত। স্বাধীনতা লাভের ৭৩ বছর পরেও আমরা পুঁজিবাদীদের দ্বারা চালিত। সাম্যবাদী সমাজ ব্যাবস্থা আজও আমাদের কাছে স্বপ্ন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, "বীরেন্দ্র কবিতা লিখে গেছেন সরাসরি জীবনের জন্য, জীবনের তাগিদে তিনি কবিতা না লিখে পারেনি নি। কাজী নজরুলের কবিতায় যেমন বিদ্রোহী স্বতা প্রবলভাবে ঘোষিত হয়েছে তেমন ভাবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রতিবাদ প্রত্যক্ষভাবে পাঠকের সামনে হাজির হয়নি। তিনি প্রথমে পাঠক কে দেশ, সমাজ, পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেছেন; অতঃপর ধীরে ধীরে পাঠক কে তাঁর কবিতা পঠনের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী মনস্ক করে তুলেছেন। স্বদেশকে তিনি তুলনা করেছেন নিরন্নের দেশ, উলঙ্গের দেশ বলে। যেখানে মানুষ নিরাশ্রয়, হাত-পা ভাঙা, বোবা, মুখে রক্ত তোলে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নেড়িকুত্তা, দূর থেকে লেজ নাড়ে আর দয়া ভিক্ষা চাই ইতর মন্ত্রীর কাছে, তাঁর পোষা সর্দারের কাছে নতজানু হয়। সমসাময়িক স্বদেশের চিত্র গুলি চলছে' কবিতায় অপরুপভাবে ফুটিয়ে তোলেন কবি-

"গুলি চলছে, গুলি চলছে, গুলি চলবে এই না হলে শাসন?

গুলির মুখে উড়িয়ে দেওয়া চাই!
ভাত চাইতে গুলি, মিছিল করলে গুলি, বাংলা বন'ধ
গুলিবিদ্ধ রক্তে ভাসে আমার ঘরের বোন, আমার ভাই!"

তৎকালীন স্বাধীন ভারতের রাজধানী কলকাতার বুকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে কবি ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন **"একেই বলে গণতন্ত্র: এরই জন্য কবিতার সর্দার সাহিত্যের মোড়লেরা কেঁদে ভাসানঃ"** যেসব মানুষ প্রাণ থাকতে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি; শাসকের রক্তচক্ষু দেখে ভয় না পেয়ে গর্জে উঠেছে; সেই সব মানুষদের আহ্বান করেছেন কবি। জরাজীর্ন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে, নতুন প্রত্যয় নিয়ে আগুনে পুড়ে... দীপ্তিমান নবজাতক হয়ে সর্বহারা মানুষের গান করতে চেয়েছেন কবি। আর তাই নতুন প্রত্যয় কবিতার দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন-

"সর্বহারার শৃংখল ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই
কিন্তু অর্জন করার আছে-
পুরোনো বস্তাপঁচা বিশ্বাস গুলির বিপরীত
কোন নতুন প্রত্যয়, যা একদিন মানুষকে সত্যিকারে ধর্ম শেখাবে।"

যে দেশের মাটিতে আমার জন্ম যে মাটিকে আশ্রয় করে আমি বড় হয়ে উঠেছি, যাকে আমি শুধু দেশ না ভেবে মা-এর সম্মান দিয়েছি; যে জন্মভূমিতে আমি আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষা দিতে চাইছি; সেই দেশেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সাধারণ মানুষের অবস্থান কোথায়? তা "আমি যখন শূন্যে ঝুলে থাকি" কবিতার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে-

"ছোটবেলায় আমি ছিলাম
পরাধীন দেশের বোকা মানুষ,
তখন আমার মাথার উপর
আকাশ বলতে কিছু ছিল না।
বড় হয়ে এখন আমি একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক,
এখন আমি 'অ-আ-ক-খ পড়তে জানি
লিখতে জানি। অথচ কোন স্বাধীন দেশেই-
আমার পা রাখার জায়গা নেই।"

আর এই পা রাখবার ব্যবস্থা করতেই তিনি রচনা করেকছিলেন একের পর এক প্রতিবাদী কবিতা। সমাজের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে তিনি দায়বদ্ধ হয়ে কলম ধরেছিলেন। তার কবিতায় দেশপ্রেমের পাশাপাশি ছিল অসহায় দরিদ্র জনগণের

ক্ষুধাতুর পিপাসার আর্তনাদ। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে যারা এক মুঠো ভাত সংগ্রহ করতে পারছে না তাদের উদ্দেশ্যে 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ' কবিতায়-

“আশ্চর্য ভাতের গন্ধ, রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজও ভাত রাধে
ভাত বাড়ে ভাত খায়।
আর আমরা, সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে, প্রার্থনায় সারারাত।”

পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে, অথচ স্বাধীন দেশে ফুটপাত হয়েছে অসংখ্য মানুষের বাসস্থান। বস্ত্রের অভাবে শিশু আজ ন্যাংটো, শিশুর মুখে খাবার তুলে দিতে না পারায় মা লুকিয়ে মোছেন চোখের জল, "ফুটপাতের কবিতা'য় "ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়। যদিও তার খিদেয় পুড়ছে গা”। বিপন্ন এই স্বদেশ, বিপন্ন স্বদেশের মানুষ, যারা শত শতাব্দীর শ্রমে, পরিচ্ছন্ন সততায় মানবিক শুভেচ্ছায় নতুন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছে; আর সেই সমাজে কামার, কুমোর, তাঁতী, জেলে, চাষী, শ্রমিক সবই একযোগে কাজ করবে, নিয়ে আসবে সবুজ ফসলে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ- কোথায় তাদের মান? এমনকি-

“কোথায় তাদের ঘর? ত্রিপুরায়, আসামে বাংলায়,
সাঁওতাল পরগনায়, দক্ষিণাত্যে মেঘালয়। ঘর কোথায়?
পাহাড়ে, জঙ্গলে চা-বাগান্ কয়লা খনিতে, (অথচ ভারতবর্ষ তাদের)”

কবি পাঠক কে যেন প্রশ্ন করেছেন- দেশ থাকতে তাদের দেশ নেই কেন? কেন তারা কুঁজো হয়ে কাজ করে, আধপেটা খাই বিনা চিকিৎসায় মরে; কিংবা কপালের জোরে বেঁচে থাকে। মনুষ্যত্বের এই নিদারুণ অবমাননা থেকেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপলব্ধি করেছিলেন যতদিন স্বদেশ হবে পুঁজিবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, শাসক হবে শোষকের যন্ত্র, বিচারক হবে অন্ধ, শিক্ষা হবে অর্থনীতির গোলাম, দেশর নেতা হবে স্বার্থপর ততদিন সমাজ ব্যবস্থায় থাকবে বৈষম্য। কুশবিদ্ধ শরীরটাকে যারা পেরেক দিয়ে এ- ফোঁড় ও-ফোঁড় করে তাদের কিছু আসে যায় না। আজকের কিছু মানুষ ভুলে গেছে মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাদের কাছে যত হত্যা তথ্য জয়। এই প্রসঙ্গে 'নরক' কবিতায়-

“কেননা হত্যায় সত্য, হত্যা ধর্ম। কে মারে এবং কাকে মারে, এই নষ্ট
চরিত্রের ভিড়ে কেউ নেই হিসেব নেবার। শুধু হত্যা চাই। শতে শতে
হাজারে হাজারে বালক-বালিকা শিশু পরস্পরের মৃতদেহ মারিয়ে
এ-ওর রক্তে হাতের নিশান লাল থেকে আরও গভীর,....”

ক্ষমতাশালী মানুষদের হাতে বলি হচ্ছে লক্ষ-কোটি সাধারণ মানুষ। যেন কেউ মন্ত্রী হয়ে এই সব মানুষের প্রেম, মানবতা কিনে নেয়। সাধারণ মানুষদের পশুর মত বধ করে আহলাদিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কিভাবে সমগ্র পৃথিবীর সাধারণ মানুষদের অস্তিত্বকে হীন করে দিচ্ছে তার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে 'কবিতায়-

"কোথাও আর নদী পাহাড় আকাশ
কোথাও আর ঘুমিয়ে থাকার ছ-ফুট জমি নেই।"

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমাজের প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের কথা তার কবিতায় তুলে ধরেছেন। কৃষক, শ্রমিক, শিশু যুবক- যুবতী, শিক্ষক-ছাত্র, ডাক্তার, পুরোহিতগণ, মন্ত্রী-আমলা, পুলিশ, গুপ্তচর, খুনি, গুন্ডা, সাংবাদিক এমনকি বেশ্যা ও বেশ্যালয়ের কথা পর্যন্ত। সমসাময়িক রক্তাক্ত ঘটনাকে তিনি উপেক্ষা করেননি; যা ঘটেছে, এমনকি যা ঘটতে পারে, তার আভাসও দিয়েছেন তাঁর কবিতার মধ্যে। চারিদিকে মানুষের সীমাহীন লোভ, রাষ্ট্রদম্ভে স্ফীত বৃকোদর দানবদের স্বেচ্ছাচারিতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। তাই কবি রোমান্টিকতার মোড়কে কবিতার গন্ডীকে সীমিত না রেখে যুগযন্ত্রনার বিপন্ন মানুষদের কান্নাকে ভাষা দিয়েছিলেন কবিতার আকারে। এ প্রসঙ্গে উত্তর পাড়াঃ কলেজ হাসপাতাল 'কবিতাটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে-

"রক্ত রক্ত শুধু রক্ত, দেখতে দেখতে দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়
শিক্ষক-ছাত্রের রক্তে প্রতিটি সিঁড়িতে, ঘরে, চেয়ার্ চৌকাটে,
বারান্দায়ে ..."
এই তোমার রাজত্ব খুনি! তার ওপর কি বাঁহবা চাও?
আমরাও দেখব, তুমি কতদিন এইভাবে রাক্ষস নাচাও!

সামাজিক অবক্ষয় বহমান সময়ের দাবি স্বীকার করে দেশভাগের যন্ত্রনা হৃদয়ে নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। যদিও প্রথম জীবনে কবি প্রেমের কবিতা রচনা করেছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রেম দিয়েই তো সব মানুষের জীবন শুরু হয়। কিন্তু বীরেন্দ্র ছিলেন মানবতাবাদী; তাই যখনই তিনি মানবতার অপমান দেখছেন, প্রচলিত রোমান্টিক প্রেমকে সরিয়ে তখনই তার প্রতিবাদী কণ্ঠ থেকে অগ্নুৎপাত বেরিয়ে এসেছে। প্রেমকে করে তুলেছেন দহনের শক্তি, পরিবর্তিত সৌন্দর্যবোধ ও বৈপ্লবিক চেতনা সমৃদ্ধ। প্রান্তিক, বঞ্চিত, অবমানিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি মানুষের পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করতে চেয়েছেন। উৎপীড়িত আপামর জনসাধারণকে কবি বোঝাতে চেয়েছেন কোথায় যাবো? এই পৃথিবী আমার, আমাদের। তোমরা যতই মারো এই জন্মভূমি ছেড়ে যাবো না কোথাও। কার পাপ এ

রক্তের ভিতরে যে আমরাই হব শুধু বঞ্চিত। কোন একদিন আসবে যখন আসমান ছেয়ে যাবে পতাকায়, ফেস্টুনে, গর্জনে মনে হবে দৃশ্যের দর্পণে বুঝিবা দ্রুত পৃথিবী বদলাবে। রম্যাঁ রলাঁ: মানুষের নাম 'কবিতাটি প্রাসঙ্গিক এক্ষেত্রে-

"... আমরা কর্তব্য শিখি স্বদেশের
নিরাপত্তা, গণতন্ত্র, পবিত্র সংবিধান, আইন স্বাধীনতা
স্বদেশের নিরাপত্তা
স্বদেশের... নিরন্ন দেশে, উলঙ্গের দেশে
সত্যি কারের মানুষের নাম আমাদের মুখে আজ..."

বাস্তব জগতে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন কোটিপতি হওয়া নয়, আলিসান প্রাসাদে ঘুমানো নয়, সোনার থালায় নানাবিধ ব্যঞ্জনের পরিপূর্ণ অন্নভোজন নয়: তাদের কামনা দুই বেলা দু-টুকরো পোড়া রুটি। এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক রুটি দাও 'কবিতাটি-

"এ এক মন্ত্র! রুটি দাও রুটি দাও.
বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাওঃ
সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা
হেসে দিতে পারি স্বদেশের স্বাধীনতা।"

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে দেশের সাধারণ মানুষ যখন রুটি, ভাতের জন্য শহরের রাস্তায় ভিড় জমিয়েছিল তখন কবি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার মানুষ আগুনের পথে হাঁটছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কে বাঁচায়, কে বাঁচে' ছোট গল্পের প্রধান চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের পাশে একা দাঁড়িয়েছিল, নিজের মাইনের সমস্ত টাকা রিলিফ ফান্ডে দিয়ে, নিজের পরিবারের খাদ্য দিয়ে; কিন্তু অসংখ্য ক্ষুধিত মানুষের ক্ষুধা মৃত্যুঞ্জয় নিবারণ করতে পারে নি, গল্প শেষে মৃত্যুঞ্জয় নিজেই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছিলেন নিজে একাই সংগ্রাম করে এই সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব না। তাই তিনি লেখনীর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করতে চেয়ে ছিলেন; প্রান্তীয় মানুষের কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা দিতে চেয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী, স্বার্থপর শাসকদের ধিক্কার জানিয়ে ছিলেন তাঁর কবিতা দিয়ে, এ প্রসঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে-

"শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার,
তোদের প্রাসাদে জমা হল
কত মৃত মানুষের হাড়,
হিসাব দিবি কি তার?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা

ভেঙেছিস ঘরবাড়ি
সে কথা কি আমি কখনো
জীবনে মরনে ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার
স্বজনহারানো শ্মশানে
যদি আমি কেউ হই
তোদের চিতা আমি তুলবই।”

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমন এক বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন যার দ্বারা শ্রমজীবী মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে নতুন এক ভারতবর্ষ গড়তে পারে। যে ভারতবর্ষে রাস্তা হবে সবার জন্য। কোন দ্বেষ, হিংসা, বৈষম্য থাকবে না। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সেই ক্রান্তিকালে, যখন কিছুদিনের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের গঠন ও তারপর সেই সরকারের পতন, নকশাল আন্দোলনের জন্ম, চারিদিকে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যা, পুলিশের ভয়ানক অত্যাচার, বেকারত্বে পরিপূর্ণ শহর-গ্রাম, জন-জীবন, বহু যুবকের তাজা প্রাণ অচিরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ যখন একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারছে না; সেই মুহূর্তে প্রতিবাদী সত্তা নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একের পর এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়:- মহাদেবের দুয়ার (১৯৭১), ওরা যতই চক্ষু রাঙায়' (১৯৬৮), নভেম্বর-ডিসেম্বরের কবিতা, (১৯৭১), আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা (১৯৭৩), রাস্তায় যে হেঁটে যায়' (১৯৭২) মানুষখেকো বাঘেরা লাফায়' (১৯৭৩) ইত্যাদি যা সমসাময়িক সময়ে এবং বর্তমান সময়ে পাঠ্য হিসেবে যথাযথ। বেঁচে থাকার তাগিদে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কবি। ব্যাংঙ্কে, সার্ভে প্রকল্পের কাজে, টিউশানি, স্কুল মাস্টারি প্রভৃতি; আবার তাঁর সাহিত্য জীবন ও গণবার্তা, ক্রান্তি, অরনি, অগ্রণী, কবিতা, পূর্বাশা, বসুমতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সঙ্গে যুক্ত ছিল। এর ফলে তার জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ছিল বিস্তৃত। কবি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন- **আমার কবিতা কোনদিনই চল্লিশের প্রগতিশীল কবিতার কবিদের কাছ থেকে অন্ন বা জল সংগ্রহ করে নি। বরং আমি নিজের কবিতাকে যতটা বুঝি, আমার কবিতার শিকড় অন্যখানে, সেখানে আজও যারা জলসিঞ্চন করেছেন তারা সবাই দলছুট একক কবি- যেমন জীবনানন্দ, তারপর নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ**। একক এবং স্বতন্ত্র কবি হবার আকাঙ্খায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে কবিতার বিষয়বস্তু করেছিলেন। যেখানে শুধু শিল্পের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কবিতা রচনা করেননি; সমাজের উন্নয়নে কবিতা কে ব্যবহার করেছিলেন হাতিয়ার রূপে। আর এখানেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমসাময়িক কবিদের থেকে স্বতন্ত্র। প্রাসঙ্গিকতায় নন্দীগ্রাম ও

সিঙ্গুরের চাষিদের জমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে লিখিত মৃদুল দাশগুপ্তের 'ক্রন্দনরতা জননীর পাশে' কবিতার কথা উঠে আসে-

"ক্রন্দনরতা জননীর পাশে
রাজেশ বিশ্বাস
এখন যদি না-থাকি
কেন তবে লেখা, কেন গান গাওয়া
কেন তবে আঁকাআঁকি?"

সাম্যে আস্থাবান, সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং আশাবাদী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক সংকটকে, বেঁচে থাকার গ্লানিকে কবিতায় তুলে এনেছিলেন অনবদ্য মহিমায়। পরিমিত বোধ সম্পন্ন, অতিকথন বর্জিত কথন রীতিতে বিশ্বাসী, প্রশ্ন মুখর, প্রতিবাদী, বিদ্রুপ প্রবণ কবি তাই জন্মভূমি আজ 'কবিতায় ব্যক্ত করেছেন-

"একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।
এখনো রাত শেষ হয়নি;
অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর।"

স্বদেশের মূল শক্তিই হল মাটি এবং মানুষ। মাটি থেকে যে ফসল জন্মায় তা দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলে। কৃষক ও মাটির উর্বরতা হলো স্বদেশের প্রাণের স্পন্দন। আর সে কারণেই মানুষ পারে মাটির আশ্রয়ে সভ্যতার সম্পদকে আরও উন্নত করতে। দেশ কাল এবং স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় কবির কাছে মাটি এবং মানুষ একাত্ম হয়ে ওঠে। মা এবং স্বদেশের প্রতীক হয়ে উঠে মাটি। অত্যাচারী শাসক শ্রেণী কে, মাটি ও মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে সরিয়ে দেবার প্রয়াস গ্রহণ করে তবে তা সম্ভবপর হবে। মাটি ও মেহনতী মানুষকে যে শাসকশ্রেণী অবহেলার চোখে দেখে; একমাত্র সাহসিকতা ও নির্ভীকতার দাঁড়াই তাদেরকে পরাজিত করা যাবে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এর বক্তব্য এক্ষেত্রে পরিধানযোগ্য- **'জীবন বিষয়ে বীরেন্দ্রর প্রবল দায়িত্ব চেতনা ও জীবন বাস্তবের নিগূঢ় দাবিতে ব্যক্তি প্রেম থেকে গভীর মানব প্রেমে তার উত্তরণ, অপরদিকে শান্তি ও শূন্যতা নিয়ে রোমান্টিসিজম। এই দুইয়ের সংঘাতে শেষ পর্যন্ত কবি হৃদয় জয়ী হল বাস্তব জীবন ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা।'**

বাস্তব জীবন ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা কবির মধ্যে প্রবল ভাবে ছিল বলেই, সমসাময়িক অরাজকতাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। আর এই কারনেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে যুব সমস্যার কবি বলা যেতে পারে। প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যের

ডুবে না থেকে যুগের প্রয়োজনে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ডঙ্কা বাজাতে, শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কলম হাতে নিয়েছিলেন। ন্যায়বান, বিবেকবান, সুন্দরের পূজারী হলেন কবিরা। খোলা বই-এর মত জগত ও জীবনকে পড়ে ফেলায় ক্ষমতা তাদের থাকে বলেই কবিরা হয়ে ওঠেন সত্যদষ্টা। আদর্শ কবিরা শুধু তাঁদের সমকালে নয়, ভাবীকালের রথের সারথি হয়ে নিজের বিবেককে জাগরুক রাখেন, মনুষ্যত্বকে অনির্বাণ রাখেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এর মধ্যেও আমরা খুঁজে পাই বিবেকের জাগরণ মানুষের মনুষ্যত্ব। আর যে কারণে কবি তার শ্রেষ্ঠ কবিতা -এর (১৯৮০) দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কবি স্বয় লিখেছেন- **'শুধু বেঁচে বর্তে থাকায় তো একজন মানুষের অন্বিষ্ট নয়। নিজের ছোট্ট চিলে ঘরটিতে বসে একতারা বাজিয়ে সারা জীবন প্রেম আর ও প্রেমের গান গাওয়া- তাও নয়... অর্ধেক জীবন তো তার পায়ের নিচে কোন মাটিই থাকে না। তাহলে কি রকম রাস্তায় একজন মানুষের? একজন কবির?'** আসলে কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সন্ত্রাসের নাটকীয় রূপ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অশান্তির আগুন। আর তাই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির পরিশুদ্ধিতার জন্য তাঁর রাস্তা হয়েছিল প্রতিবাদের। যে রাস্তায় হেঁটে কবি একদিকে অসহায়, উৎপীড়িত মানুষের কণ্ঠে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাষা ও তাদের পাশে সহমর্মিতা, সহানুভূতি জানাবার মানুষদের অন্বেষণ করতে চেয়েছেন; অন্যদিকে তেমনি স্বার্থপর মানুষদের মুখোশ খুলে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ ও বিবেককে মনুষ্যত্বের আয়নায় প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন।

স্বদেশের বিপন্ন পরিস্থিতিতে জনগণের বিবেক ও মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখতে চেয়েছিলেন 'কবি। তিনি অনুভব করেছিলেন মানুষের নৈতিক মূল্যবোধই পারে সুন্দর স্বতিময় সমাজ ব্যবস্থা গড়তে। আশাবাদী কবি তাই স্বদেশ প্রেমের মহিমায়, প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নবজীবনের গান গেয়েছিলেন। তারই প্রমাণ পাই **'আন্তর্জাতিক প্রহসন নয়, সত্তিকারের পৃথিবীর জন্য'** কবিতায়-

"একটা পৃথিবী চাই -
শুকনো কাঠের মত মায়েদের
শরীরে কান্না নিয়ে নয়
তাদের বুকভর্তি অফুরন্ত ভালোবাসার
শস্য নিয়ে।"

মানুষের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন কবি। জীবনের ও সমাজের সব সংকট, অস্বস্তি, অশান্তি, অসহায়তার অবসান ঘটাতেই যেন কবির আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলা কাব্য জগতে। কবি শঙ্খ ঘোষ তাই বলেছেন- 'সত্তর সালের অল্প আগে থেকে সমস্ত দশকজুড়ে জেগে উঠতে থাকে তার ক্ষুব্ধ মুখ্যচ্ছবি,

সমস্ত ভন্ড তা আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের বিবেক ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর বিরামহীন প্রতিবাদে। সেই প্রতিবাদে কাব্য রীতির অনেক পুরনো শর্ত নিশ্চয়ই ভেঙে ফেলেন তিনি, ভেঙে ফেলেন ছন্দ প্রতিমার অনেক প্রাক-সংস্কার, শিল্পিত কবিতা লেখা হলো না বলে ছন্দ বিলাপও করেন কখনওবা। নিরাভরণ ঘোষনার ভাষাই বা পথচলতি দৈনন্দিন রূঢ়তায় ছড়িয়ে দেন তিনি কবিতা, আর কবিতা বিচারের এক নতুন মানে তখন আমাদের তৈরি করে নিতে হয়। তাঁরই কবিতার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ সামনে রেখে। 'তাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সমসাময়িক সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে আজও শ্রমজীবী মানুষের নতুন পৃথিবী গড়ার অন্যতম পথ ও পাথেয় হিসেবে আমাদের কাছে অনবদ্য ভূমিকা অবতীর্ণ হয়ে থাকবে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র. শ্রেষ্ঠ কবিতা. সপ্তম সংস্করণ, দে জ পাবলিশিং, মে ২০১৯।

২. চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র.নির্বাচিত কবিতা. সম্পাদনা পুলক চন্দ, প্রথম সংস্করণ, দে জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০০।

৩. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার.আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস. পুনর্মুদ্রণ, প্রজ্ঞা বিকাশ, আগস্ট ২০০৯।

৪. মজুমদার, জহর সেন.কবিতার দ্বীপ কবিতার দীপ্তি. প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সঙ্গী, ২০০৮।

৫. আচার্য, ড. দেবেশ কুমার.বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস. (আধুনিক যুগ, ১৮০০-১৯৬০). দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, জানুয়ারি ২০০৭।

৬. মুখোপাধ্যায়, তরুণ.বাংলা কবিতা অনেক আকাশ. প্রথম প্রকাশ, প্রজ্ঞা বিকাশ, মার্চ ২০০৩।

৭. সোম, কৃতী.আধুনিক বাংলা কাব্যের ধারা বৈচিত্র্য. প্রথম প্রকাশ, প্রমা প্রকাশনী, বৈশাখ ১৪১২।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পথের পাঁচালী” উপন্যাসে বিভূতিভূষণের বাসস্থান বারাকপুর, তৎসংলগ্ন অঞ্চল ও তাঁর বিচরণ-ক্ষেত্রগুলির প্রভাব

মনোজ কুমার মণ্ডল
সহকারী শিক্ষক, বাংলা বিভাগ,
নন্দ প্রসাদ হাই স্কুল (উঃ মাঃ), নকশালবাড়ি, দার্জিলিং

সারসংক্ষেপ: সুসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বারাকপুরের শান্ত-সুনিবিড় প্রাকৃতিক পরিবেশের কোলে লালিত-পালিত হন। গ্রাম-বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিভূতি-উপন্যাসের পরতে পরতে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। ইছামতী ও বারাকপুর সংলগ্ন এলাকাগুলি বিশেষ করে শ্রীপল্লী, গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর-বাড়ি, মাঝেরগ্রাম রেল স্টেশন ও কিছুটা দূরবর্তী আড়ংঘাটার যুগলকিশোর মেলা প্রভৃতি তাঁর উপন্যাসে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছিল। অনেক সাহিত্য সমালোচক মনে করেন, ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের নিশ্চিন্দিপুর আসলে বিভূতিভূষণের জন্মস্থান বারাকপুর। কেননা বারাকপুরের মনোরম পরিবেশের সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরের গাছপালা, নদীনালা সমৃদ্ধ স্নিগ্ধ পরিবেশের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার উত্তর ২৪ পরগনার নহাটার নিকট ‘নিশ্চিন্তপুর’ নামে একটি অখ্যাত গ্রামের সঙ্গে ‘পথের পাঁচালী’র নিশ্চিন্দিপুরেরও প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক মিল আমরা খুঁজে পাই। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়ির প্রসঙ্গ আছে। বর্তমান সময়েও গঙ্গানন্দপুর বাজার সংলগ্ন স্থানে একটি ভগ্নপ্রায় মন্দিরের উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি। যেটি পূর্বে গাজিবাবার মন্দির নামে পরিচিত ছিল। সুবিখ্যাত এই মন্দিরটির প্রসঙ্গটিও বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরতে ভোলেননি। বিভূতিভূষণের বসতবাড়ি থেকে মাত্র ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মাঝেরগ্রাম স্টেশনটির প্রসঙ্গও ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে। যদিও বিভূতিভূষণ মাঝেরগ্রাম স্টেশনটিকে ‘মাঝেরপাড়া’ স্টেশন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অপুরা যখন নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম ত্যাগ করে কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল তখন এই মাঝেরপাড়া বা মাঝেরগ্রাম রেল স্টেশনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছিল। আবার ‘পথের পাঁচালী’, ‘ইছামতী’ ও ‘অশনি সংকেত’ উপন্যাসে আড়ংঘাটার সুবিখ্যাত যুগলকিশোর মেলার প্রসঙ্গও কাহিনি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় যেখানে হরিহর ভাগ্যান্বেষণে গিয়েছিলেন। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আমরা আষাঢু হাট ও আষাঢুর ঘাটের প্রসঙ্গ পাই। অপুরা নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ করার সময় আষাঢু ঘাট পার হয়েছিল বলে জানতে পারা যায়।

এছাড়া 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'পথের পাঁচালী' ও 'ইছামতী' উপন্যাসের কাহিনিবয়নের ক্ষেত্রে রানাঘাট স্টেশনের প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি ছাড়াও চাকদা বা কালীগঞ্জের ঘাটে গঙ্গাস্নান প্রসঙ্গও বেশ গুরুত্বের সঙ্গে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।
সূচক শব্দ: নিশ্চিন্দিপুর, সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর-বাড়ি, মাঝেরপাড়া, যুগলকিশোর, গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, আষাঢু, রানাঘাট, চাকদহে গঙ্গাস্নান।

মূল আলোচনা:

সুসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মুরাতিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর বিহারের ঘাটশীলায় তিনি লোকান্তরিত হন। আর তিনি লালিত-পালিত হন বনগ্রাম মহকুমার 'ইছামতী' তীরবর্তী বারাকপুর গ্রামে। বারাকপুরের শান্ত-সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভূতিমানস গঠনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তেমনি তাঁর উপন্যাসের বিশেষ ধারা বা genre গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গ্রামবাংলার শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ বিভূতি-উপন্যাসে শুধু বাহ্যিক প্রভাব হিসেবে দেখা দেয়নি, প্রকৃতি যেন এখানে জীবন্ত রূপ ধারণ করে উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছিল। তাইতো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকে প্রকৃতি-কেন্দ্রিক ঔপন্যাসিক, গ্রামবাংলার সহজ-সরল কথাকার ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করে থাকেন। প্রকৃতি যেন তাঁর উপন্যাসে কথা কয়। যদিও আমরা বর্তমান নিবন্ধে প্রকৃতি-কেন্দ্রিক বিভূতিভূষণকে বিবেচনা না করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মননে তাঁর বাসস্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের অবদান ও উপন্যাসে তাঁর প্রভাব কতটা পড়েছিল- তা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবো। তাঁর বসতবাটী ছিল চালকি-বারাকপুরে, বর্তমানে যা শ্রীপল্লী-বারাকপুর নামে পরিচিত। বর্তমান নিবন্ধে আমরা তাঁর বাসস্থানের পার্শ্ববর্তী এলাকার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করব এবং বিভূতিমনন গঠনে এই সমস্ত প্রভাবগুলি কতটা কার্যকরী হয়েছিল এবং বিভূতিসাহিত্যে তার প্রভাব কতটুকু পড়েছিল– তা জানতেও প্রয়াস পাবো।

বিভূতিভূষণকে নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, কিন্তু সমস্ত গবেষণাতে প্রায় প্রকৃতির প্রভাব, আধ্যাত্মিকতার প্রভাব, অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের প্রভাব নিয়েই বেশি আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো থেকে বিভূতিভূষণের মানসগঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় না। আমরা জানি লেখকের মানসগঠনে তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, সমাজ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের একটা প্রভাব থাকে। আর এরই ভিত্তিতে বিভূতিভূষণকে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিভূতিভূষণ সম্পর্কে নতুন তথ্যের সন্ধান করতে পারবো বলে আশাবাদী আমরা। বিভূতিমানস গঠনে ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাঁর বাসস্থান বারাকপুর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলসমূহের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক) নিশ্চিন্দপুরের খোঁজে:

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২ মে বুধবার মহালয়ের দিন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী" উপন্যাস প্রেসের গণ্ডি ছেড়ে পাঠকের হাতে আসে। এই উপন্যাস তাঁকে খ্যাতির চরমবিন্দুতে পৌঁছে দেয়। যদিও বিভূতিভূষণের সাহিত্যে হাতেখড়ি হয় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে "প্রবাসী" পত্রিকার মাধ্যমে। তাঁর প্রথম গল্প "উপেক্ষিতা" প্রকাশের মধ্য দিয়ে। "পথের পাঁচালী" উপন্যাসের মূল ঘটনা আবর্তিত হয়েছে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে। কবিশেখর কালিদাস রায়ের লেখা পত্রের উত্তরে বিভূতিভূষণ জানিয়েছিলেন- "পথের পাঁচালীর গ্রাম্য চিত্রগুলি সবই আমার স্বগ্রাম বারাকপুরের। জেলা যশোহর। গ্রামের নীচেই ইছামতী নদী।" আবার কালিদাস রায় তাঁর "বিভূতিভূষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন- "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান ও পিতৃভূমি যশোহর জেলার বারাকপুর গ্রামের একটি পল্লীতে। এই পল্লীতেই তাঁহার বাল্যজীবন কাটিয়াছিল। ...পথের পাঁচালীতে বর্ণিত গ্রামখানি লেখকের নিজেরই গ্রাম। ইহারই প্রাকৃতিক পরিবেশ পথের পাঁচালীতে বর্ণিত হয়েছে। পথের পাঁচালীতে যে ইছামতী নদীর কথা আছে- তাহা এই গ্রামের নিকট দিয়াই প্রবাহিত।"

(চিত্র-১: বারাকপুরে বিভূতিভূষণের বসতবাড়ি সংলগ্ন বিভূতিভূষণ ঘাট, কচুরিপানা আচ্ছাদিত ইছামতীর বর্তমান অবস্থা)

বারাকপুর ও তার সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বিভূতিমননে প্রভাব বিস্তারকারী ইছামতী নদী আজও প্রবহমান। এছাড়া আজও এখানে প্রচুর পরিমাণে বাঁশবন, কচুবন, লতা-পাতা, পুকুর, খাল, বিল প্রভৃতির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। যা আমাদের হৃদয়পটে নিশ্চিন্দিপুরের স্মৃতিটাকে জাগ্রত করে। এছাড়া আমরা এই বারাকপুরকে কেন্দ্রে রেখে তার চারপাশের অঞ্চলগুলিকে খুঁজতে থাকলে দেখব বারাকপুর থেকে দক্ষিণে উত্তর ২৪ পরগনার নহাটার কাছে "নিশ্চিন্তপুর" নামে একটি গ্রামের অস্তিস্ব আজও বর্তমান। বিভূতিভূষণের (জন্ম: ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর, মৃত্যু: ১ নভেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ) সমকালেও এই গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় "পথের পাঁচালী" রচনার সময় গাছপালা-বাঁশবন-পুকুর-ডোবা-নালা সমৃদ্ধ এই স্থানকে হয়তো মাথায় রেখেছিলেন। বিভূতিভূষণের বাড়ির নিকট হওয়ায় এই স্থান সম্পর্কে বিভূতিভূষণ অবগত ছিলেন, একথা আমরা ধরে নিতেই পারি।

(চিত্র-২: উত্তর ২৪ পরগনার নহাটার নিকটস্থ নিশ্চিন্তপুর গ্রাম)

এবার এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করব। এই অঞ্চলে "পথের পাঁচালী" প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ৯৫ বছর পরে গিয়েও আমরা দেখতে পেলাম অসংখ্য বৃক্ষরাজ ও বাঁশবন দিয়ে ঘেরা এই গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" উপন্যাসের নিশ্চিন্দিপুরের হুবহু সাদৃশ্য আছে। সন্ধ্যা হলেই এই 'নিশ্চিন্তপুরে'ও পাখির কলকলানি শুনতে পাওয়া যায়। আজও সন্ধ্যা নামতে না নামতে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে যায় 'নিশ্চিন্তপুর' গ্রামখানি, যা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। আমরা আরও জানতে পারলাম গ্রামের অধিকাংশেরই জীবিকা কৃষিকাজ। গ্রামের চারিদিকেই সবুজের সমারোহ- বাগান, মাঠ-ঘাট বিরাজ করছে। বিভূতিভূষণ "পথের পাঁচালী" উপন্যাসের "নিশ্চিন্দিপুর"-এর প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনার সময় হয়তোবা নহাটার নিকটবর্তী এই 'নিশ্চিন্তপুরে'র প্রাকৃতিক শোভা বিভূতিভূষণ হৃদয়মুকুরে রেখেছিলেন, এ কথা বলা যেতেই পারে। যদিও সবটাই নিবিড় গবেষণার বিষয়।

(চিত্র-৩: নিশ্চিন্তপুর গ্রাম)

খ) গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর-বাড়ি:

বিভূতিভূষণ স্মৃতিঘাট থেকে গঙ্গানন্দপুরের দূরত্ব মাত্র ৯.৭ কিলোমিটার। "পথের পাঁচালী" উপন্যাসে গঙ্গানন্দপুর সম্পর্কে বলা হয়েছে –"গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর-

বাড়িতে সর্বজয়ার পূজা মানত ছিল। ক্রোশ তিনেক দূরে কে পূজা দিতে যায়– এইজন্য এ-পর্যন্ত মানত শোধ হয় নাই।”[১]

বিভূতিভূষণের বসতবাড়ি থেকে গঙ্গানন্দপুরের দূরত্ব ১০ কিলোমিটারের কম। এই উপন্যাসে আছে গঙ্গানন্দপুর সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়িতে সর্বজয়া একা যেতে পারত না, কারণ তার দূরত্ব ছিল তিন ক্রোশ। আমরা জানি এক ক্রোশ=২.২৭২ মাইল। অর্থাৎ তিন ক্রোশ=২.২৭২×৩=৬.৭৮৬ মাইল। আবার ১ মাইল=১.৬১ কি.মি.। অর্থাৎ ৬.৭৮৬ মাইল=৬.৭৮৬×১.৬১=১০.৯২৫ কি.মি.। উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনি অনুসারে বিভূতিভূষণের বসতবাড়ি থেকে গঙ্গানন্দপুরের দূরত্ব মোটামুটি একই আছে। এবার আমরা গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়ির খোঁজ করার চেষ্টা করব। গঙ্গানন্দপুরে আমরা দু'টি মন্দিরের খোঁজ পাই। যার মধ্যে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটির অবস্থান গঙ্গানন্দপুর বাজার-সংলগ্ন স্থানে। পূর্বে এটি গাজিবাবার মন্দির নামে পরিচিত ছিল। অনেক পূর্বে মন্দিরের সম্মুখে প্রায় এক মাস ধরে মেলা অনুষ্ঠিত হতো। হিন্দু-মুসলমান সর্বধর্মের মানুষেরা এই মেলায় অংশগ্রহণ করতেন এবং তারা মনস্কামনা পূরণের আশায় মন্দির সংলগ্ন অশ্বত্থ গাছে ইটের টুকরো ঝুলিয়ে দিয়ে আসতেন। মনস্কামনা পূরণ হলে ওই ইট-পাটকেল নামিয়ে পুজো দিয়ে তবেই বাড়ি ফিরতেন। উপন্যাসে দেখি সর্বজয়াও গঙ্গানন্দপুরে মানত করেছিলেন। বর্তমান সময়েও ওই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সংলগ্ন অশ্বত্থ গাছে ইট-পাটকেল ঝুলিয়ে মানত করা হয়। গঙ্গানন্দপুর বাজার থেকে প্রায় ৭০০ মিটার দূরে আরও একটি মন্দিরের অস্তিত্ব আমরা পাচ্ছি। ওখানে বর্তমানে কালী ও রাধা-কৃষ্ণের প্রতিমা রাখা আছে। তারা আজও পূজা পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই মন্দিরটি অর্বাচীন।

(চিত্র-৪: গঙ্গানন্দপুরের অর্বাচীন মন্দির)

তাইতো আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, “পথের পাঁচালী” উপন্যাসে সর্বজয়ার মানতের প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে বিভূতিভূষণ হয়তো গাজিবাবার মন্দিরটিকেই হৃদয়পটে রেখেছিলেন।

(চিত্র-৪: গঙ্গানন্দপুরের বাজার সংলগ্ন ধ্বংসপ্রায় ঠাকুর-বাড়ি বা গাজিবাবার মন্দির)

গ) মাঝেরপাড়া স্টেশন:

"পথের পাঁচালী" উপন্যাসের অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমরা মাঝেরপাড়া স্টেশনের উল্লেখ পাই। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র নীরেন গোকুলের বউকে নিজের বাসস্থানের দূরত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছিল-

> "-এখান থেকে রেলে প্রায় দু'দিনের রাস্তা। আজ সকালের গাড়িতে মাঝেরপাড়া স্টেশনে চড়লে কাল দুপুর-রাত্রে পৌঁছানো যায়।"[২]

এছাড়াও অপুরা যখন গ্রাম ত্যাগ করে কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হয় তখনও আমরা মাঝেরপাড়া স্টেশনের উল্লেখ পাই। ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদে আছে-

> "গাড়ি চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব-দুলুনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া-থাকা হীরু গাড়োয়ান, সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ি বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলো সটসট করিয়া দুদিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে- কী বেগ! এরই নাম রেলগাড়ি!"[৩]

এখানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝেরপাড়া হিসেবে যে স্টেশনের বর্ণনা দিয়েছেন তা আসলে মাঝেরগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন। মাঝেরগ্রাম স্টেশনটি বিভূতিভূষণের জন্মস্থান বারাকপুর থেকে মাত্র ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বিভূতিভূষণের অনেক যাতায়াত ছিল এই স্টেশনে। মাঝেরগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন পূর্ব রেলওয়ে অঞ্চলের শিয়ালদহ রেল বিভাগের বনগাঁ–রানাঘাট লাইনের একটি রেলওয়ে স্টেশন। রানাঘাট-বনগাঁ কর্ড লাইনের একেবারে মধ্যবর্তী স্টেশন হলো মাঝেরগ্রাম।

সে যাই হোক, "পথের পাঁচালী" উপন্যাসে অপু তার জন্মভূমিকে ত্যাগ করার অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে লাভ করেছিল মাঝেরপাড়া বা মাঝেরগ্রাম থেকে ট্রেন ছাড়ার পরেই। আর এজন্যই "পথের পাঁচালী" উপন্যাসে এই স্টেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। মাঝেরগ্রাম স্টেশনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসতবাড়ি বারাকপুরের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এই স্টেশনের সঙ্গে তাঁর একটা অন্তরের যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। তাইতো তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র আখ্যানবস্তু থেকে এই

মাঝেরগ্রাম স্টেশনটিকে বাদ দিতে পারেননি। যদিও ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে মাঝেরগ্রাম স্টেশনটিকে তিনি মাঝেরপাড়া স্টেশন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

(চিত্র-৬: মাঝেরগ্রাম স্টেশন)

ঘ) আড়ংঘাটার যুগলকিশোর:

“পথের পাঁচালী”, “ইছামতী” ও “অশনি সংকেত” উপন্যাসে আড়ংঘাটা যাওয়ার প্রসঙ্গ আছে। “পথের পাঁচালী” উপন্যাসের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে গোকুলের বউ রেলগাড়ি চেপে যুগলকিশোরের মেলা দেখতে গিয়েছিলেন বলে নীরেনকে জানিয়েছিলেন-

> “সেই ও-বছর পিস্‌শাশুড়ি আর সতুর মা’র সঙ্গে আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দেখ্‌তে গিইছিলাম। সেই আমার জম্মের মধ্যে কম্ম- রেলগাড়িতে চড়া!”[৪]

রাধা-কৃষ্ণের মিলনের সাক্ষী আড়ংঘাটা যুগলকিশোর মন্দির। আড়ংঘাটায় অবস্থিত বর্তমান মন্দির প্রাঙ্গণে যে বকুল গাছ আছে তার নীচে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী রাধার যুগলমূর্তি। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজে হাজির থেকে পুরোহিত দিয়ে মহা আড়ম্বরে এই যুগলমূর্তির পুজো করিয়েছিলেন। এই যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠা থেকেই এই মন্দিরের নামকরণ হয় যুগলমন্দির। কথিত আছে, যুগলকিশোর দর্শন করলে মহিলারা অনাথিনী হন না। এই প্রার্থনা মনে নিয়েই মহিলারা এখানে ভিড় জমান। আর এই ভিড়ে সামিল হয়েছিলেন “পথের পাঁচালী” উপন্যাসের গোকুলের বউ, সতুর মা, সর্বজয়ারা। বিভূতিভূষণ তাঁর একাধিক উপন্যাসের আখ্যানবস্তু নির্মাণ করার ক্ষেত্রে আড়ংঘাটার যুগলকিশোর মেলার প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে থাকতে পারেননি। কেননা বিভূতি-সমকালীন সময়ে জনমানসে এই আড়ংঘাটার যুগলকিশোর মেলার বিশেষ প্রভাব ছিল।

(চিত্র-৭: আড়ংঘাটা যুগলকিশোর মন্দির)

ঙ) গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর:

"পথের পাঁচালী" উপন্যাসের ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের প্রসঙ্গ আমরা পাই। উপন্যাসের কাহিনিবস্তু অনুসারে জানা যায়, হরিহর রায় নিজের ভাগ্যান্বেষণের জন্য গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর গিয়েছিলেন-

> "এবার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় পরিচয় ছিল না। শহর-বাজার জায়গা, একটা না একটা কিছু উপায় হইবে এই কুহকে পড়িয়াই সে সেখানে গিয়াছিল।"[৫]

"পথের পাঁচালী" উপন্যাসের ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ থেকে আমরা জানতে পারি, কৃষ্ণনগরের কাছে একটা গ্রামে একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন গৃহদেবতার পূজা-পাঠের জন্য ব্রাহ্মণ খুঁজছিলেন। সেখানে একটা কাজ জুটে যায় হরিহরের। এখানে হরিহরের আদর-আপ্যায়নে কোনোরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল না। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের কয়েকদিন কাজ করার পরে দুর্গাপুজো চলে আসে। বাড়ি যাওয়ার সময় গৃহকর্তা হরিহরকে দশ টাকা প্রণামী দেন। সেইসঙ্গে তিনি যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় ভাড়াও হরিহরকে প্রদান করেন।

নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত ছিল এই গোয়াড়ী বাজার বা গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগর একটি অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ। মহারাজা কৃষ্ণনগরের আমলে ও তার পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। গ্রামাঞ্চল থেকে অনেকেই ভাগ্যের সন্ধানে এখানে এসে উপস্থিত হতেন। "পথের পাঁচালী" উপন্যাসের হরিহরও এখানে ভাগ্য পরীক্ষায় এসেছিলেন। প্রথমে কিছুটা নিরাশ হলেও শেষে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পেরেছিলেন আমাদের হরিহর।

চ) আষাঢুর হাট ও ঘাট:

"পথের পাঁচালী" উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আমরা আষাঢুর হাটের প্রসঙ্গ পাই। অপু ছোটোবেলায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়তে যেত। বিকালবেলা প্রায়ই দিনু পালিত অথবা রাজু রায় আসতেন গুরুমহাশয়ের সঙ্গে গল্প করতে। এই রাজু রায় মহাশয়ের বক্তব্যে আমরা আষাঢুর হাটের প্রসঙ্গ পাই-

> "রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া কিভাবে আষাঢুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছেন সে গল্প করিতেন।"[৬]

এছাড়া "পথের পাঁচালী" উপন্যাসের ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদে অপুরা নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ করার সময়ে আষাঢুর ঘাট পার হয়েছিল বলে জানা যায়-

> "আষাঢু বাজারের নিচে খেয়ার বেত্রবতী পার হইবার সময় চাঁদ উঠিল, জ্যোৎস্নার আলোয় জল চিক্‌চিক্ করিতেছিল। আজ আষাঢুর হাট, কয়েকজন হাটুরে লোক কলরব করিতে করিতে ওপার হইতে খেয়ানৌকায় এপারে আসিতেছে। অপুদের গাড়িসুদ্ধ পার হইয়া ওপারে উঠিল। অপু বাবাকে বলিয়া আষাঢুর বাজার দেখিতে নামিল।"[৭]

(চিত্র-৮: আষাঢু ব্রিজ)

আষাঢু হলো উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ব্লক ও বাগদা ব্লকের সংযোগকারী একটি অঞ্চল। এটি বাগদা থানা সংলগ্ন একটি জনপদ। আষাঢুর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কোদালিয়া নদী। বহুকাল আগে থেকেই এখানে একটি বড়ো বাজার গড়ে উঠেছিল। বিভূতি-সমকালীন সময়েও এই বাজারটি বেশ জমজমাট ছিল। তার বর্ণনা আমরা "পথের পাঁচালী" উপন্যাসে পেয়ে যাই। খেয়া ছিল এখানে যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। পূর্বে বাগদা ব্লকের সঙ্গে বনগাঁ ব্লকের যোগাযোগ রক্ষা করা হতো এই খেয়া পথেই। বর্তমানে আষাঢুতে সেতু বা ব্রিজ নির্মাণ করে এই দুই ব্লকের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা হয়। কৃষিকাজ ছিল এই অঞ্চলের মানুষদের প্রধান জীবিকা। এছাড়াও মৎস্য-শিকার, নৌকা চালানো এখানকার মানুষদের অন্যতম উপজীবিকা হিসেবে পরিগণিত হতো। বিভূতিভূষণের মানস গঠনে ও উপন্যাসের আখ্যানবস্তু নির্মাণে এই আষাঢু অঞ্চলটির বিশেষ প্রভাব পড়েছিল।

ছ) রানাঘাট স্টেশন:

এই রেলওয়ে স্টেশনটি ১৮৬৩-১৮৬৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে তৈরি করে। সেই সময় এই স্টেশনটি কলকাতা (শিয়ালদহ)-কুষ্টিয়া লাইনের অংশ ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবাধ যাতায়াত ছিল এই রানাঘাট স্টেশনে। তাইতো বিভিন্ন উপন্যাসের কাহিনি বয়নে এই রানাঘাট স্টেশনটিকে বারে বারে স্থান দিয়েছেন। "আদর্শ হিন্দু হোটেল", "পথের পাঁচালী" ও "ইছামতী" প্রভৃতি উপন্যাসের প্লট গঠনে রানাঘাট স্টেশন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

জ) চাকদহে গঙ্গাস্নান:

নদিয়ার একটি প্রাচীন জনপদ চাকদহ বা চাকদা। পুরাণে কথিত আছে ভাগীরথী নদী(গঙ্গা) আনয়নকালে প্রচণ্ড বর্ষণের কারণে ভগীরথের রথের চাকা এখানে বসে যায়। পরে তিনি সেই চাকা পুনরায় টেনে তোলেন। ফলে ওখানে একটি প্রকাণ্ড দহের সৃষ্টি হয়। পরে সেই স্থান গঙ্গার জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সেই থেকে এই স্থানের নাম হয় 'চক্রদহ' বা চক্রদ্বীপ। কালক্রমে এই স্থানের নাম 'চক্রদহ' বা 'চক্রদ্বীপ' থেকে চাকদহ বা চাকদা'তে রূপান্তরিত হয়েছে।

অন্য একটি মতে, গঙ্গা দেবীকে আনয়নকালে রথের চাকা প্রোথিত হয়ে যায় এই স্থানে এবং এখানকার নাম হয় চক্রদহ, অপভ্রংশে চাকদহ। কারও কারও মতে সুদূর অতীতে চাকদহের নাম ছিল 'প্রদ্যুত্নগর', এটা আরও একটি পৌরাণিক মত। ভৌগোলিক মতে গঙ্গা নদীর বিভিন্ন সময়ে গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলে চক্রাকারে বিরাট একটি দহের সৃষ্টি হয়। সেই অনুযায়ী এ অঞ্চলের নাম হয় 'চক্রদহ' বা 'চাকদহ'। চাকদহের ইতিহাসে জগদীশ পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ মূর্তি ও এই জগন্নাথ বিগ্রহকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত স্নানযাত্রার উৎসব ও মেলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় পালিত হতো জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার উৎসব। যা এখানকার একটি সর্ববৃহৎ ও সুপ্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান। স্থানীয় ও বহিরাগত মানুষেরা অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য অনেকটাই বাড়িয়ে তুলতেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীরা সকলে গঙ্গাস্নান সেরে তবেই বাড়ি ফিরতেন। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের ত্রিংশো পরিচ্ছেদে আমরা চাকদার গঙ্গাস্নানের উল্লেখ পাই-

> "- এই তো সেদিন এক বৎসর আগেও নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে কত রাত্রে শুইয়া যখনই সে ভাবিত, সুবিধা হইলে একবার চাকদা কি কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানে যাইবে, তখনই তাহা সম্ভবের ও নিশ্চয়তার বহু বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছে- আর আজ?"[৮]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালেও অনেকেই পুণ্য অর্জনের জন্য চাকদা বা কালীজঞ্জের নিকট দিয়ে বয়ে চলা গঙ্গার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতেন। তাইতো বিভূতিভূষণ গঙ্গাস্নানের প্রসঙ্গকে তাঁর উপন্যাসে স্থান দিতে ভোলেননি। গঙ্গাস্নানের এতটাই মাহাত্ম্য ছিল।

শেষকথা:

উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন তখন তাঁর অভিজ্ঞতায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা ও পরিচিত ভৌগোলিক স্থানগুলোকে তাঁর উপন্যাসে স্থান দিয়েছিলেন এবং সেই স্থানের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক পরিবেশকের সুন্দরভাবে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশগুলো আমাদের মনন-গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাইতো স্বভাবতই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারপাশের স্থানগুলোও বিভূতিভূষণের মানসগঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেইসঙ্গে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোও তাঁর মানসগঠনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। তাইতো বিভূতি-উপন্যাসের প্লট গঠনে এগুলোর গুরুত্বকে কখোনোই অস্বীকার করা যায় না। আমরা বিভূতিভূষণের সমকালীন সময়ে স্থানগুলোর অবস্থান ও গুরুত্ব যেমন বিচার করার চেষ্টা আমরা করলাম, ঠিক তেমনি করে স্থানগুলোর বর্তমান অবস্থাটাও তুলে ধরতে প্রয়াসী হলাম।

তথ্যসূত্র:

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র-১৩৭৯, অষ্টাবিংশ মুদ্রণ-১৪১৭, “পথের পাঁচালী”, কলকাতা-৭০০০৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রা: লি:, পৃষ্ঠা-১৫৩ (অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ)

২) পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৯৭ (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)

৩) পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ১৬৫ (ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

৪) পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-৯৭ (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)

৫) পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৩৫ (ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ)

৬) পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-৫৭ (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ)

৭) পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৬৪ (ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

৮) পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৬৮ (ত্রিংশো পরিচ্ছেদ)।

সার্ত্রের দর্শনে ঈশ্বর

পারমিতা দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
জে. কে. কলেজ, পুরুলিয়া

সংক্ষিপ্তসার : সাত্রের অস্তিবাদী দর্শনের মর্মকথা হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিমর্যাদা। নাস্তিকতা হল তার অস্তিবাদী চিন্তাধারার মূল উৎস। তিনি ঈশ্বর বিহীন এক সমাজের চিন্তা করেছেন। এই সমাজের ভিত্তি হবে মানবতা। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'Being and Nothingness' নামক মূল দার্শনিক গ্রন্থে তিনি মানুষ ও জড়বস্তুর পার্থক্য করেছেন একটি বিশেষ দৃষ্টি কোণ থেকে। মানবসত্তা, চেতন এবং অপূর্ণ। কিন্তু বস্তু স্বভাবতই অচেতন ও পূর্ণ। মানুষের রয়েছে সম্ভাবনা। সে কারণে সে সর্বদাই নিজেকে পরিবর্তন করে। সে নির্বাচন করে। কিন্তু পূর্ণসত্তা। তার সত্তা পূর্ণ, স্থায়ী ও নির্দিষ্ট। মানুষের স্বভাবের মধ্যে রয়েছে স্ববিরোধীতা। সে বস্তুর স্বভাব পূর্ণতাকে আয়ত্ত করতে চায়। কিন্তু সে চেতনাকে হারাতে চায় না। অর্থাৎ সে একইসঙ্গে চেতন– অচেতনের ধর্মবিশিষ্ট হতে চায়। সার্ত্র এই ধারণাকে ঈশ্বর বলেছেন। এই মিলন অসম্ভব। তাই ঈশ্বররের ধারণাও 'অর্থহীন আবেগ' ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতক্ষে সার্ত্রের প্রতিবাদ ছিল খ্রীষ্টান ধর্মের কল্পিত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। যেখানে ঈশ্বর সার্বিক সত্ত্বা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রন করেন। সার্ত্র মনে করেন মানবসত্তা স্বাধীন বলে তার সারধর্মকে ঈশ্বর বা অন্য কোনো সত্তা নির্ধারিত করেন। সে প্রথম অস্তিত্বশীল হয়ে এবং পরে নিজের সারধর্ম গড়ে তোলে। সার্ত্রের অস্তিবাদী দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করা নয়। কারণ অস্তিবাদী দর্শনের মূল কথা হলো 'অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্ববর্তী'। এটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকা বা না থাকার উপর নির্ভর করে না। সার্ত্রের ঈশ্বরের ধারণাকে তাঁর অস্তিবাদী দর্শনের একটি বড়ো অসঙ্গতি মনে করা হয়। কারণ তিনি নিজেই দাবী করেন ঈশ্বরবিহীন এই পৃথিবীতে এমন কোন মানদণ্ড নেই যার ভিত্তিতে আমরা আমাদের আচরণকে ন্যয়ঙ্গত বলে প্রতিপালন করতে পারি। মানুষ নিজেই পরিস্থিতি সাপেক্ষে নিজের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। সুতরাং ঈশ্বরের ধারণা মানুষের স্বাধীন্তাকে সীমিত করে। সার্ত্রের কাছে মানুষের ঈশ্বর হবার আকাঙ্খা আকস্মিক বা ইচ্ছাকৃত নয় বরং তা মনস্তাত্তিক ও স্বভাবগত। যাই হোক না কেন মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা সে নিজেই। কারণ স্বাধীন সত্তা হিসাবে নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব একমাত্র তারই, ঈশ্বর তার ভাগ্যনিয়ন্তা নন।

মূলশব্দ : স্বাধীনতা, নাস্তিকতা, অস্তিত্ব, দায়িত্ববোধ।

মূল আলোচনা :

অস্তিবাদী দার্শনিক সার্ত্রের দর্শনে ব্যক্তির অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা প্রধান হয়ে উঠেছে। তার দর্শনের মূল ভিত্তি নাস্তিকতা। নীটশে বলেছিলেন, "ঈশ্বর মৃত"। তার অর্থ ঈশ্বর কোন এক সময় জীবিত ছিলেন। সার্ত্র বলেন, মানুষের অস্তিত্বের নিকট ঈশ্বর অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয়। তিনি যে পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তা ঈশ্বরবিহীন কিন্তু ব্যক্তির মর্যাদা ও মানবতাভিত্তিক, চিন্তাজগতে তার মতবাদ ধর্মবিরধী ও বিপ্লবাত্মক।

মধ্যযুগে খ্রীষ্টান দার্শনিকদের মূল কাজ ছিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা। খ্রীষ্টান দার্শনিক সেণ্ট অ্যানসেলম বলেন, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ থাকলে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব লঘু হয়। ঈশ্বরের সারধর্ম থেকে তার অস্তিত্ব আনিবার্য ভাবে নিঃসৃত হয়। দেকার্তও ঈশ্বরকে সর্বদোষরহিত বলে বর্ণণা করেন। সুতরাং ঈশ্বরের সারধর্মই ঈশ্বরের যথার্থ অস্তিত্বকে সূচিত করে। কিন্তু মানুষের সারধর্ম ও অস্তিত্বের এরম কোন অনিবার্যতা নেই। তাই মানুষের অস্তিত্ব অযথার্থ হয়ে পড়ে।

অস্তিবাদীরা এই ধরণের তত্ত্ব বিরোধী। সার্ত্রের অস্তিবাদী চিন্তাধারার মূল উৎস হল নাস্তিকতা। তার দর্শনে ব্যক্তির স্বাধীনতা, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্বই প্রধান হয়ে উঠেছে। মানুষ বংশগতি, প্রবণতা বা ঈশ্বর প্রদত্ত কোন গুণ নিয়ে জন্মাতে পারে। কিন্তু সে আপন স্বাধীনতায় নিজের কর্মের মধ্য দিয়ে নিজের সারধর্ম গড়ে তোলে। এই প্রসঙ্গে 'Being and Nothingness' নামক মূল গ্রন্থে সার্ত্র মানুষ ও বস্তুর পার্থক্য করেছেন। বস্তুকে তিনি স্ব-স্থিত সত্তা বলেছেন। এগুলি স্থায়ী এবং সীমাবদ্ধ। যেমন একটি বই কেবলমাত্র একটি বই-ই তার বেশী বা কম কিছু নয়, কিন্তু মানবসত্তা স্বহেতু সত্তা। স্বহেতু সত্তার চেতনা অসীম সম্ভাবনাময়। সে প্রশ্ন করে। পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলিকে নঞর্থকভাবে তাৎপর্য প্রদান করে। চেতনার অন্তস্থিত হল শূন্যতা। মানবসত্তার অস্তিত্ব অসত্তাকে নির্দেশ করে। মানুষের অন্তঃনিহিত সম্ভাবনাই তাকে পরিবর্তনের দিকে চালিত করে। এই পরিবর্তনের কারণ হল স্বাধীনতা। সার্ত্রের মতে, মানবসত্তা স্বাধীনতায় দণ্ডিত। স্বাধীন মানবসত্তা স্বভাবতই অপূর্ণ। সে একদিকে স্বস্থিত সত্তা বা জড়বস্তুর পূর্ণতাকে লাভ করতে চায় আবার স্বহেতু সত্তা বা চেতনাকে তার ভিত্তি করতে চায়। মানুষের জীবনের আদর্শ হল চেতন ও অচেতনের মিলন। যেখানে চেতনার অস্তিত্বও থাকবে আবার বস্তুর পূর্ণতাও বিরাজ করবে। সার্ত্র এরই নাম দেন ঈশ্বর। মানুষের পরম উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর হওয়া। এই ইচ্ছারই অপর নাম স্বাধীনতা। এক অর্থে স্বাধীনতা ও ইচ্ছা মানবসত্তার অন্তঃস্থিত শূন্যতাকে পূরণ করতে চায়। কিন্তু ব্যক্তি তার স্বাধীনতার চরম লক্ষ অর্জনে ব্যর্থ হয়। কারণ চেতন ও অচেতনের মিলন একটি স্ববিরোধী ধারণা। তাই মানুষের ঈশ্বর হওয়ার প্রচেষ্টাও নিস্ফল হয়ে যায়। মানুষকে তাই তিনি 'অর্থহীন আবেগ' বলে আখ্যা দেন। ঈশ্বর বিহীন পৃথিবীতে মানুষ নিঃসঙ্গ জগতে পরিত্যক্ত। মানুষ যখন এইভাবে স্বাধীনতায় দণ্ডিত হয় তখন সে সম্পূর্ণ

নিঃসঙ্গ, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হয়। সে জগতে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে কিন্তু সমগ্র মানবজাতির নিকট দায়বদ্ধ। নির্বাচনের অসীম স্বাধীনতাই অবস্থায় নিমজ্জিত করে।

ঈশ্বর সম্পর্কে সার্ত্রের ধারণা আত্মগত ও মনস্তাত্ত্বিক। অস্তিবাদের মূল চিন্তাধারার সঙ্গে এর কোন সংগতি নেই। তাই তিনি নিজের ত্রুটি স্বীকারও করেছেন। যাইহোক তার ঈশ্বর সম্পর্কীয় ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে। সার্ত্রের নাস্তিকতার মূল উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় যে কোন ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। স্পিনোজা এবং লাইবনিজ - এর আধুনিক ধারণা অনুযায়ী ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা এবং সর্বনিয়ন্তা। তাহলে মানুষের স্বাধীনতাই সীমিত হয়ে পড়ে। সার্ত্রের এই মত আসলে অস্তিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

প্রশ্ন হল সার্ত্রের মতবাদ ঈশ্বরের স্বরূপ কি যথার্থভাবে নিরুপণ করেছে? আসলে খ্রিষ্টান ধর্মের কল্পিত ঈশ্বরই তার প্রতিবাদের লক্ষ। মানুষ যেহেতু নিজের সারধর্ম নিজেই সৃষ্টি করে তাই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ অযৌক্তিক বলে তিনি মনে করেন। তবে, মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমান করা তার উদ্দেশ্য নয়। তিনি কখনো ঈশ্বর বিষয়ে কারণ বিষয়ক যুক্তি, উদ্দেশ্যমূলক যুক্তি, তাত্ত্বিক যুক্তি আলোচনা করেননি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর নেই।

ঈশ্বরকে চেতন ও অচেতনের মিলন বলে বর্ণনা করেছেন সার্ত্র। এক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত ঈশ্বরের কথা বলেন। চেতন ও অচেতনের সমন্বয় মানুষের একটি আকাঙ্খা বা চরম লক্ষ্য। ব্যক্তির মনের আকাঙ্খা বা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বলে সার্ত্রের ধারণা মনস্তাত্ত্বিক। অর্থাৎ, সার্ত্রের ঈশ্বর অতীন্দ্রিয়, পরম সত্তা নয়-তা জাগতিক।

সার্ত্রের মতবাদের বড় অসঙ্গতি হল তার ঈশ্বর সম্পর্কীয় ধারণা। কারণ তার দাবী হল মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। ঈশ্বর বিহীন এই পৃথিবীতে কোন সার্বিক নীতি মানদণ্ড-এর উপর ভিত্তি করে সে নিজের কার্যকলাপ পরিচালিত করে না। আপন পরিস্থিতি ও নির্বাচনের দ্বারা সে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও নির্বাচন ভিন্ন হতে পারে। তাই সার্বিকভাবে স্ব মানুষই ঈশ্বর হতে চায়-একথা বলা যায় না। তবে, এক্ষেত্রে সার্ত্র বলেন, ইচ্ছাটি মানুষের স্বভাবগত। ফলে মানুষের স্বাধীনভাবে নির্বাচনের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। তবে, মানুষের আকাঙ্খারও ভিন্নতা আছে। আমরা ঈশ্বর ছাড়াও বিভিন্ন বস্তুর আকাঙ্খা করতে পারি। সুতরাং ঈশ্বর হবার আকাঙ্খার মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা সীমিত হয় না। কিন্তু একথাও সত্য আমরা যাই আকাঙ্খা করি না কেন তা ঈশ্বর হবার আকাঙ্খারই প্রকাশ মাত্র। এটি স্বাধীনতা তত্ত্বেরই পরিপন্থী। কারণ আকাঙ্খা বাধ্যবাধকতা বা অপরিহার্য্যতাকে নির্দেশ করে। এর সঙ্গে স্বাধীনতার কোন সঙ্গতি নেই। সার্ত্র নাস্তিকতা দিয়ে তার দর্শন শুরু করেন। ডস্টয়েভস্কির ‘ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে সবকিছু সম্ভব’- এই নাস্তিক ধারণা দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই সার্বিক নৈতিকতার ধারণা প্রবর্তন করে তিনি অস্তিবাদের মূল সার্ত্রের বিরোধিতা করেছেন। মানুষের নির্বাচনের লক্ষ সকলের

মঙ্গলের জন্য নির্বাচন। বিপরীত ভাবে তিনি বিশ্বাস ঈশ্বর না থাকলেও সবকিছু সম্ভব হওয়া উচিত নয় বরং তার মতানুসারে, প্রত্যেকের উচিত বিশেষ সার্বিক নীতি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করা। সার্ত্রের নৈতিকতার ধারণার উৎস হল নাস্তিকতাবাদ। এমন কোন অভিজ্ঞতা পূর্ব সার্বিক নীতি নেই যার দ্বারা আমাদের আচরণকে ন্যায়সংগত বলে দাবী করা যায়। নৈতিক জীবনযাপনের জন্য ঈশ্বরের ধারণা অপরিহার্য নয়। বৌদ্ধধর্মে কোন ঈশ্বরের ধারণা নেই। ঈশ্বরের ধারণা ব্যতিরেকে উন্নতমানের নৈতিক জীবনযাপন সেখানে সম্ভব। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে প্রচলিত মূল্যবোধগুলির উৎস হল বিশেষ বিশেষ ধর্ম। খ্রিষ্টান, ইসলাম ও হিন্দুধর্মের নৈতিক মূল্যবোধগুলির উৎস ঈশ্বর ধারণা। কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে নৈতিকতা হল ঈশ্বরের ধারণার পূর্বগামী। কারণ সততা, মঙ্গল, দয়া, সত্যবাদিতা প্রভৃতির অর্থ পূর্ব থেকে জানি বলেই আমরা তা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। আসলে সার্ত্র মনে করেছিলেন ঈশ্বর অবিশ্বাস করলে সমাজ থেকে মূল্যবোধের ধারণাও অন্তর্হিত হয়। ডস্টইয়েভস্কির উক্তিটির প্রকৃত ভাবার্থ অনুধাবন তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

সার্ত্র তার বিভিন্ন লেখায় দেখিয়েছেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের ফলে মানুষের স্বাধীনতার কোন হানি হয় না। ঈশ্বরের প্রাধান্যকে তিনি অস্বীকার করেন। মানুষ তার স্বাধীনতার জোরে সার্বিক নৈতিক নিয়মকে অস্বীকার করতে পারে। সার্ত্রের 'The Files' নাটকটি তারই প্রমাণ। সেখানে 'অরিষ্টিস' নামক চরিত্রটি স্রষ্টা জিউসের আধিপত্য মানতে নারাজ। সে স্বাধীন এবং তার কাজের জন্য সে জিউসের কাছে দায়বদ্ধতা স্বীকার করে না। স্রষ্টা জিউস তাকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সৃষ্টির পর তার উপর জিউসের কোন অধীকারবোধ সে অস্বীকার করে। বস্তুত পক্ষে সার্ত্র দেখাতে চেয়েছেন এমন কোন ঈশ্বর সৃষ্ট নৈতিক নিয়ম নেই যা আমরা মেনে চলতে বাধ্য। স্বাধীনভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ নিজের নৈতিক মূল্য সৃষ্টি করে। একজন চিত্রকর নিজের খেয়ালে কল্পনার স্বাধীনতায় মনোমুগ্ধকর চিত্র রচনা করেন। নৈতিকতার ক্ষেত্রেও এইরকমভাবে পরিস্থিতি সাপেক্ষে মূল্য নির্ধারনের ক্ষমতা ব্যক্তির রয়েছে। এখানে দার্শনিক কান্টের সাথে তার বিরোধ রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ ও জাতিস্বার্থের মধ্যে দন্দ দেখা যায়। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দেন সার্ত্র। কান্টের মতে প্রতিটি মানুষকে উপায় হিসাবে না দেখে লক্ষ হিসাবে দেখা উচিত। সার্ত্র বলেন পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যক্তিই ঠিক করতে পারে কোনটি লক্ষ ও কোনটি উপায়। এক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠিত সার্বিক নিয়মকে তিনি অস্বীকার করেন।

সার্ত্রের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তিনি বলেন আমরা যদি এমন এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি যার ইচ্ছানুযায়ী আমরা পরিচালিত হই তাহলে আমাদের ক্ষমতা খর্ব হয়। ঈশ্বর বিহীন এই পৃথিবীতে মানুষ পরিত্যক্ত হয়েছে। যেখানে নিজের ইচ্ছা ও কাজের মাধ্যমেই তার ব্যক্তিসত্তা অর্থপূর্ণ হয়। তার পরবর্তীকালে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তিনি নিজেই কাটাতে চেয়েছেন। সেখানে তিনি বলেন, আমরা নিজের জন্য নির্বাচন করি না–

সকলের জন্য নির্বাচন করি। ব্যক্তির নিজ কর্মের জন্য সমগ্র মানবসমাজের কাছে দায়বদ্ধতা আছে। তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকলেও এমনকি কোন সার্বিক নীতি না থাকলেও বিপরীভাবে সার্ত্র বিশ্বাস করেন প্রত্যেকের উচিত বিশেষ সার্বিক নিয়মানুসারে কার্য সম্পাদন করা। সার্ত্র যদিও এই সার্বিক নীতিগুলির কোন মানদণ্ড দেননি তবু সকলের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেককে সৎ ইচ্ছা, সৎ উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে ঈশ্বর সম্পর্কে সার্ত্রের মতবাদের আরও একটি দিক রয়েছে। সেখানে তিনি বলেন যদি উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় তাহলেও সেই ঈশ্বর মানুষের কোন কাজে আসবে না। কারণ সংকটময় পরিস্থিতিতে মানুষকেই আপন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, নির্বাচন করতে হয়। বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে তার মতবাদের সাদৃশ্য এখানে লক্ষণীয়। মানবতাবাদী দার্শনীক বুদ্ধদেব বিশ্বাস করতেন মানুষকেই তার নিজ মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে। সার্ত্রও স্বাধীন মানষের উপর বিশ্বাস রেখেছেন। তার মতে ব্যক্তিস্বাধীনতা সমাজের মঙ্গলের বিপরীত হবে না। ঈশ্বরের ধারণা ব্যতিরেকেও ব্যক্তিমানুষ মূল্যবোধ সম্পন্ন ও নৈতিক সমাজের স্রষ্টা হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী:

- Jean-paul Sartre, Existentialism and Humanism, trans. Philip Mairet, London,1970. P.25
- Ibid, P.24
- Ibid, P.26
- Robert G. Alson. An Introduction to Existentialism, New York, 1962. P.85
- John MacQuarrie, Existentialism, Penguin Books, 1987. P.29
- Jean-paul Sartre, Being and Nothingness, tran, Hazle E. Barnes, London. 1957. P.25
- Ibid,P.566
- Soren Kierkegaard, Stages on Lif's Way, trans. Walter Lowric, Princeton. P.43
- Soren Kierkegaard, Attack upon "Christendom". trans. Walter Lowric, Princeton.1968. P.191
- Soren Kierkegaard, The Concept of Dread. trans. Walter Lowric, Princeton.1957. P.37
- Soren Kierkegaard, Concluding Unscientific Posteript. trans. David F. Swenson and Walter Lowrie, Princeton. 1941. P.328

- Ibid, P.327
- Ibid, P.188
- Ibid, P.189
- Soren Kierkegaard, The Sickness Unto Death. trans. Walter Lowrie, Princeton. 1941. P.17
- Soren Kierkegaard, Philosophical Fragments. trans. Howard V. Hong. Princeton, 1962. P.16.

সাগরদ্বীপের লোকসমাজ ও লোকউৎসব

হরিপদ মহাপাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই দ্বীপটি বারবার প্রকৃতির খেয়ালে ভেঙে চুরমার হয়েছে। তাই এই অঞ্চলে বারবার নতুন করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। ১৮৪২ খ্রিঃ পরবর্তী সময়ে মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড থেকে বহু মানুষ এসে বসবাস শুরু করে আবার ১৯৬০-৭০ এর দশকে চব্বিশ পরগনা ও বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু মানুষরা এসে সাগরদ্বীপে বসবাস শুরু করে। সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় দ্বীপ হল সাগর দ্বীপ। আজ থেকে প্রায় ৭০-৮০ বছর আগেও এই দ্বীপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। দ্বীপটির দক্ষিণ অংশে জঙ্গলের জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশালাক্ষীর থান তৈরি হয়। সেই সময় সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল জঙ্গলের হিংস্র জীব-জন্তুর হাত থেকে এই দেবী সাধারণ মানুষকে রক্ষা করে। এই মন্দিরের দেবতা আজ ও সাধারণ মানুষের কাছে জাগ্রত দেবতা হিসাবে পরিচিত।প্রত্যেক বছর শীতকালে এই মন্দির প্রাঙ্গণে বিশালাক্ষী দেবীর পূজা উপলক্ষে বেশ বড় মেলা আয়োজন করা হয়। মন্দিরে পূজা উপলক্ষে সাধারণ মানুষ তাদের মনোস্কামনা পূর্ণ হয় বলে নানা ধরনের মানত শোধ করে থাকে।
সূচকশব্দ- সাগর দ্বীপ, লোকসমাজ, লোক উৎসব, সমাজ, সংস্কৃতি।

মূলপ্রবন্ধ

আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের কাছে বনবিবির বিশেষ জনপ্রিয়তা রয়েছে সাগরদ্বীপের তপোবন, চন্ডীপুর, রামকুয়ার, জীবনতলা প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রামবাসীরা বনবিবির পূজা করে থাকেন, ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় রামকুয় অঞ্চলে দেখা গিয়েছে একটি অশ্বস্থ গাছের গোড়ায় একটি পাথর রয়েছে। সেই পাথরটিকে দেবতারূপে পূজা করা হয়। এই দেবতাকে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই পূজা করে থাকে। আগেকার দিনে গভীর জঙ্গলে মধু সংগ্রহ বা শিকারে যাওয়ার সময় এই দেবীকে পূজা করে যাত্রা শুরু করা হয়। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে বনবিবির মেলা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে।

লোক সমাজে বিভিন্ন অপদেবতা, ভূত-প্রেত বা অপঘাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাগরদ্বীপে বিভিন্ন গ্রামে আটেশ্বরের পূজা করা হয়। এই গ্রামগুলিতে আটেশ্বরের কোনো মূর্তি নেই। সাধারনতঃ অশ্বস্থ, গামা গাছের গোড়ায় এই দেবতার পূজা করা হয়, আটেশ্বর দেবতার উদ্দেশ্যে সিন্নি নিবেদন করা হয়। বতর্মানে

সাগরদ্বীপের তপোবন অঞ্চলে এই দেবতার পূজার প্রচলন রয়েছে। প্রাচীনকালে জঙ্গল এবং সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত থাকায় সাগর দ্বীপে ব্যাপক সাপের উপদ্রব ছিল।

আদিবাসী সমাজ -

সাগরদ্বীপের ভূমি উদ্ধারের সময় থেকে উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চল এবং ছোট নাগপুর মালভূমি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আদিবাসী শ্রমিকরা বন কাটার জন্য সাগর দ্বীপ আসেন। প্রকৃতপক্ষে আদিবাসী শ্রমিকদের অবদান সাগরদ্বীপের উন্নতির পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বহু বিপদ উপেক্ষা করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সাগরদ্বীপের গভীর বন কেটে চাষযোগ্য জমি তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, রাস্তাঘাট, বিভিন্ন বড় বড় ঘেরি নির্মানে ও এদের গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমানে এই সমাজের উপর বৃহত্তর হিন্দু সমাজের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। কারণ বহু আদিবাসী মেয়ের সঙ্গে হিন্দু ছেলের বিয়ে হয়েছে এবং বহু আদিবাসী ছেলের সঙ্গে ও হিন্দু মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। তার ফলে দুই সমাজের সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। আদিবাসী সমাজের মধ্যে ও কয়েকটি ভাগ রয়েছে যেমন কিস্কু পদবীর লোকেরা রাজবংশের। মুর্মু পুরোহিত সম্প্রদায়ের। হেমব্রম অভিজাত কুমার, সোরেন সিপাহী সম্প্রদায়ের, টুডু পদবীর মানুষেরা বাদল নাচের সঙ্গে মান্দরীয় বাদক। সাগর দ্বীপে আদিবাসী সমাজে ৪ টি পর্ব উদযাপন করে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ মোটা সুতীর গামছা, কাপড় এবং অলঙ্কার হিসেবে মহিলারা বাজু, বাংলা, বটকল, ধামা, পাট কাঁটা, কোমর বিছা পরিধান করে থাকে। আদিবাসী সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে পন প্রথার প্রচলন রয়েছে। বর কনে নির্বাচিত হওয়ার পর পুরোহিতের উপস্থিতিতে সিন্দুর দানের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদিত হয়। সাগর দ্বীপের আদিবাসীদের বিনোদনের জন্য মোরগ লড়াইয়ের আয়োজন করা হয়।

হাট সংস্কৃতি

প্রাচীনকাল থেকে এই দ্বীপের সাধারণ মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য ১৫-২০ কিঃমিঃ পথ পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করত। সাগর দ্বীপে দুটি হাট ছিল। যথাচেমাগুড়ি হাট ও রুদ্র জানার হাট। মূলত এই দুটি হাটের উপরই সাগর দ্বীপের সমস্ত মানুষ নির্ভরশীল ছিল। চেমাগুড়ি হাট বসত রবি ও বৃহস্পতিবার এবং রুদ্র জানার হাট বসত বুধ ও সোমবার। হাটে মাটির চালাঘর, হেরিকেনের বদলে তৈরি হয়েছে ছোটো গুমটি, বৈদ্যুতিক আলো, কোথাও কোথাও পাকা দেওয়াল টালি চালাও দেখা যায়। হাট পরিচালিত হয় নির্দিষ্ট নির্বাচিত কমিটির সাহায্যে। হাটের সমস্ত দোকানদারেরা মিলে প্রত্যেক বছর কালী পূজোর আয়োজন করে থাকে। তবে গ্রামের হাটগুলি বর্তমানে নতুন পন্য বিক্রির বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। বর্তমানে কালী বাজার, চেমগুড়ি, বামুন খালি হাটগুলি বিশেষ জনপ্রিয়।

ভূত-প্রেত-সংস্কার

দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের সমাজে মৃত মানুষের আত্মাকে নিয়ে নানান ধরনের সংস্কার গড়ে উঠেছে। তার ব্যতিক্রম হয়নি সাগর দ্বীপের গ্রামগুলিতে। এখনও বহু মানুষ রাতের বেলায় শশ্মানের পাশ দিয়ে যেতে ভয় পায়। আবার কোনো সময় কেউ যদি শশ্মানের পাশ দিয়ে যায়, সে রাম নাম করতে করতে দ্রুত গতিতে ঐ স্থান ত্যাগ করে। তাছাড়া দুপুর বেলায় অশ্বস্থ গাছের আশেপাশে ছোটো ছেলেমেয়েদের যেতে দেওয়া হয় না। কোনো সময় যদি ছোটদের শ্মশানের পাশের রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তাদের মাদুলি বা তাবিজ পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাছাড়া বর্তমানে চন্ডীপুর অঞ্চলে কোনো কোনো লোককে নাকি ভূতে ডেকে নিয়ে যায় এরকম জনশ্রুতি আছে। তাই আগাম সতর্কতা হিসেবে, কেউ যদি মনে করে তাকে ভূতে ডাকতে পারে, সে নিজের বাড়িতে ঢাকা, ঢোল, মাইক বাজায় যাতে ও ব্যক্তি ভূতের ডাক শুনতে না পায়।

সাগর দ্বীপের বারোমাস্যা:

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ চলতে থাকে। সাগর দ্বীপের সমাজে ও প্রত্যেক মাসে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে দেখা যায়।

বৈশাখ - বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। বৈশাখের প্রথম দিন সাগরের সাধারণ মানুষ অনেক ভোরে ঘুম থেকে উঠে চাষের জমিগুলোত খড় দিয়ে ধুনি জ্বালায়। তাছাড়া প্রত্যেক জমিতে আগুন জ্বালানোর সময় বসুন দেওয়া হয়।এই সময় আবর্জনা পুড়িয়ে দিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করার ধাপ মনে হয় এটাই। পয়লা বৈশাখে রীতি অনুসারে প্রত্যেক পরিবারে দুপুর বেলায় সাত রকমের তরকারি রান্না করা হয়।

জৈষ্ঠ্য- এই মাসে জামাই ষষ্ঠী বাঙালির এক জনপ্রিয় পারিবারিক রীতি।

আষাঢ় - এই মাসে মহা ধুমধামের সঙ্গে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এবং জমিকে পূজা করে চাষের কাজ শুরু হয়।

শ্রাবণ - শ্রাবণ মাসে ঝুলন যাত্রা ও শিবের মাথায় জল ঢালা বিশেষ দর্শনীয়।

আশ্বিন - আশ্বিন মাসে সাগর দ্বীপে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তপন, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপুজোর দিনে বিশেষ কিছু নিয়ম পালিত হয়।

কার্তিক - এই মাসে রাস ও জগদ্ধাত্রী পূজা হয় সাগর অঞ্চলে।

অগ্রহায়ণ - অগ্রহায়ণ মাসে সাগর দ্বীপে নাগমেলা, মনসামেলা, বিশালাক্ষী মেলা বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়। নতুন ধান ওঠার উপলক্ষে ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব পালিত হয়।

পৌষ- পৌষ মাসে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম গঙ্গাসাগর মেলা আয়োজিত হয়।

মাঘ- মাঘ মাসে মাঘী পূর্নিমা উপলক্ষে সমুদ্র স্নানের রীতি প্রচলিত আছে।

ফাল্গুন - অন্যান্য জায়গার মত সাগর দ্বীপে এই মাসে দোল উৎসব ও শিবরাত্রি পালিত হয়।

চৈত্র- এই মাসে নীল পুজো করা হয়। চড়ক উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় গাজন গান অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ কয়েকটি মেলা- সাগর দ্বীপে গঙ্গাসাগর মেলা ছাড়াও বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় বড় মেলা আয়োজিত হয়।

কৃষি মেলা - সাগর দ্বীপে কৃষিজাত দ্রব্য, শাক সব্জী, ফলমূলের প্রদশর্নী উপলক্ষে চার-পাঁচদিনের একটি বড় মেলা আয়োজিত হয়। এই মেলার সব বয়সের মানুষই সন্ধেবেলায় ভিড় জমায়। কৃষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নানান স্বাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলামুখী দর্শককে সমৃদ্ধ করে।

গোষ্ঠ মেলা- শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলার একটি গুরুত্বপূর্ণ লীলা হল গোষ্ঠ লীলা। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাকে উপলক্ষে করে চেমাগুড়িতে আয়োজিত হয় গোষ্ঠ মেলা। চেমাগুড়ি যেহেতু সাগরের নৌ-বন্দর। তাই এই মেলায় বহু দুর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে।

সমাজে নারী সম্প্রদায়কে কীভাবে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে ভোগ্য পণ্য করা হয়েছে। তার ছবি ও স্পষ্ট হয়। তাছাড়া পুরুষ সম্প্রদায়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মহিলাদের ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত ধরা পড়ে। তবে আশার কথা এই যে ধীরে ধীরে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারী সমাজকে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও সম্মান করে হচ্ছে।

গ্রন্থসূচী:

১. গায়েন ব্যাসদেব (সম্পা) শাশ্বত আলাপন, এস. এ. পাবলিকেশন, বসিরহাট-২০১৬.।
২. চক্রবর্তী বরুন কুমার- লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান, দে'জ পাবলিকেশন, বসিরহাট -২০১৫।
৩. বর্মন সন্তোষ কুমার আদি সুন্দর বনের ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি। টিস্কু প্রেস কলকাতা ২০১৩।
৪. মিস্ত্রী সুভাষ - লোকায়ত সুন্দরবন, লোক প্রকাশন, সোনারপুর ২০১৩।
৫. সরকার প্রনব (স্পা) স্বদেশ চর্চা, লোক প্রকাশন, সোনারপুর -২০০৮।
৬. সরকার প্রনব (সম্পা) সুন্দরবনেরর আঞ্চলিক জীবন, বিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতি, লোক প্রকাশন, সোনারপুর-২০১০।

নেপালের রাজতন্ত্রের বিবর্তন এবং গণতন্ত্রে উত্তরণ পর্বের এক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণমূলক আলোচনা

রাজীব প্রামানিক
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সারসংক্ষেপ (Abstract) : নেপাল হল দক্ষিণ এশিয়ার একটি একটি ল্যান্ড লক্টড দেশ,পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র এবং রাজতান্ত্রিক দেশ। হিমালয়ের কোলঘেঁষে টিকে থাকা ভারত ও চীনের মাঝামাঝি অবস্থিত একটি বাফার রাষ্ট্র ।নেপালের রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং অতীত থেকে বর্তমানের কোন পথে এসেছে তা আলোচিত হয়েছে এই লেখাতে। নেপালে গণতন্ত্রের পথে প্রধান কাঁটা হলো রাজতন্ত্র। নেপালের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দীর্ঘদিনের। আধুনিক নেপালের রূপকার পৃথ্বী নারায়ন শাহ-এর ১৭৬৮ সালে প্রতিষ্টিত দুশো চল্লিশ বছরের শাহ্ রাজবংশের শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটিয়ে ২০১5 সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ রিপাবলিক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে নেপাল। রাজনীতির মূল কেন্দ্রীয় বিষয় হল ক্ষমতা। আর এই ক্ষমতাকে নিয়ে নেপালের দুই রাজবংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। একদিকে শাহ ও অন্যদিকে রানা রাজবংশের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই দেখা যায়। রাজতন্ত্রে স্বাভাবিক ভাবেই রাজা রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন কিন্তু ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশদের সাহায্যে রাজ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জং বাহাদুর রানা ক্ষমতার অধিকারী হন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। এই সময় থেকে নেপালে রাজার নামে দেশ পরিচালিত হলেও বিচার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে চলে আসে। তিনি রাজাকে দেশের সম্মাননীয় জায়গায় রেখে এটাও প্রতিষ্ঠা করেন যে রানা বংশ হতে বংশপরম্পরায় প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং এই ব্যবস্থা চলে প্রায় ১০০ বছরেরও অধিক (১৯৫১ সাল পর্যন্ত)।এরপর শাহ্‌রাজবংশ তথা রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতায় দেশ শাসিত হতে থাকে যা চলে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। ১৯৯০ সালে এসে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সময়ে কমিউনিস্ট দলের উদ্ভব ঘটে ও নেপালের রাজনীতি বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। এ সময় রাজার অধীনে থেকে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার দ্বারা নেপাল পরিচালিত হতে থাকে। ২০০৮ সালে এসে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রেরও অবসান ঘটে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয় নেপাল।

নেপালে এই রাজবংশ প্রায় ২৪০ বছর ধরে টিকে ছিল। কিন্তু এই রাজবংশের টিকে থাকার কারণ কী ছিল?কিংবা নেপালি রাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ভিত্তিকি ছিল?

রাজতন্ত্র নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কিসের উপর জোর দিয়েছিল। পাশাপাশি নেপালের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভারত ও চীনের ভূমিকা কি ছিল তা আলোচনা করা।

মূল শব্দ (Key word) : গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, রানা ও শাহ্ রাজবংশ, নেপালি কংগ্রেস, হিন্দু সংস্কৃতি, নেপালি কমিউনিস্ট পার্টি।

ভূমিকাঃ

নেপালের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দীর্ঘদিনের। ২০১৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ রিপাবলিক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে নেপাল। ফলস্বরূপ আধুনিক নেপালের রূপকার পৃথ্বী নারায়ন শাহ-এর ১৭৬৮ সালে প্রতিষ্টিত দুশো চল্লিশ বছরের শাহ্ রাজবংশের শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। রাজতন্ত্রে স্বাভাবিক ভাবেই রাজা রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন কিন্তু ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশদের সাহায্যে রাজ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জং বাহাদুর রাণা ক্ষমতার অধিকারী হন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। এই সময় থেকে নেপালে রাজার নামে দেশ পরিচালিত হলেও বিচার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে চলে আসে। তিনি রাজাকে দেশের সম্মাননীয় জায়গায় রেখে এটাও প্রতিষ্ঠা করেন যে রাণা বংশ হতে বংশপরম্পরায় প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং এই ব্যবস্থা চলে প্রায় ১০০ বছরেরও অধিক (১৯৫১ সাল পর্যন্ত)। এরপর শাহ্ রাজবংশ তথা রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতায় দেশ শাসিত হতে থাকে যা চলে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। ১৯৯০ সালে এসে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সময়ে কমিউনিস্ট দলের উদ্ভব ঘটে নেপালের রাজনীতি বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। এ সময় রাজার অধীনে থেকে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার দ্বারা নেপাল পরিচালিত হতে থাকে। ২০০৮ সালে এসে এই সাংবিধানিক রাজতন্ত্রেরও অবসান ঘটে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয় নেপাল।

সেই জন্য আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিকে তিনটি পর্বে বিভাজিত করে আলোচনা করা হল, যথা –

ক। রাজতন্ত্রের ভিত্তি ও বিবর্তন,

খ। নেপালের রাজতন্ত্র বনাম জন আন্দোলন

গ। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

নেপালের রাজনীতিতে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাবঃ

নেপালের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে তার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বোঝা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অন্যভাবে বললে ভূগোল যখন সার্বভৌমত্বের নির্ধারক এই ফর্মুলাটি নেপালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হিমালয়ের কোলঘেঁষে প্রতিবেশী দুই দেশ ভারত-চিনের মধ্যে অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়ার ভূমি বেষ্টিত দেশ নেপাল। দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র নেপাল, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত দিক থেকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত, (যথা - হিমালয় বা পার্বত্য অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল এবং

তরাই অঞ্চল)। নেপালের উত্তরে রয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমে রয়েছে ভারত। চীন ও ভারতের এর মধ্যে নেপাল হলো এক বাফার বা মধ্যমা রাষ্ট্র। ভারতের পাঁচটি অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে নেপালের সীমানা সংযুক্ত। যথা- উত্তরাখণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ। নেপালের মোট সীমানা ২,৯২৬ কিলোমিটার, যার মধ্যে চীনের সঙ্গে সংযুক্ত ১,২৩৬ কিলোমিট্র অন্যদিকে ১,৬৯০ কিলোমিটার সীমানা ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত। ভারতের সাথে যেমন নেপালের প্রায় ১০০০ মাইল উন্মুক্ত সীমান্ত রয়েছে তেমনি চিনের সাথে ও প্রায় ৭৫০ মাইল সীমান্ত রয়েছে।[১] নেপালের সঙ্গে চীনের সীমানা কোন বিবাদ না থাকলেও ভারতের সঙ্গে নেপালের নির্দিষ্ট সীমানা নিয়ে সমস্যা রয়েছে।

রাজতন্ত্রের ভিত্তি ও বিবর্তনঃ

নেপালের রাজতন্ত্রের যদি রাজনৈতিক ভিত্তি কি সেটা বুঝতে হয় তাহলে আমাদের নেপালের রাজতন্ত্রের বিবর্তনকে আলোচনা করতে হবে। নেপালের রাজতন্ত্রের একটা দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। নেপালের রাজতন্ত্রের ইতিহাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ হল রানা ও শাহ্ রাজবংশ। এরা প্রায় দুশো বছর ধরে রাজ্য শাসন করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে পৃথ্বী নারায়ণ শাহ্ হিমালয়ের পাদদেশে কয়েকটি অঞ্চলকে এক জায়গায় করে গোর্খা সাম্রাজ্য তথা আধুনিক নেপালের প্রতিষ্ঠা করেন। এই পৃথ্বী নারায়ণ শাহ্ ছিলেন ঐক্যবদ্ধ নেপালের প্রতীক এবং তিনি যে অঞ্চলটি দখল করেছিলেন সেটি ছিল আসল হিন্দুস্থান। বর্তমান দিনের তুলনায় নেপালের সীমানা বৃহৎ ছিল। সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং, এর অংশ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের সঙ্গে পরাজয়ের ফলে এই অংশগুলি ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায় অর্থাৎ ব্রিটিশ উত্তরাধিকার সূত্রে ওই অংশগুলো এখন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। কাজেই সাংস্কৃতিক বা ইতিহাস গত দিক দিয়ে এদের সঙ্গে বাংলা বা ভারতের কোন মিল নেই।

পরবর্তীকালে নেপালের প্রধানমন্ত্রী ভীম সেন থাপা (১৮০৬-৩৭) প্রধানমন্ত্রী পদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রানা-বংশের বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথ প্রশস্ত করে তোলেন। ১৮৪৬ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর জঙ্গি বাহাদুর রানা কোড হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে নেয়। ১৮৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত রাজাপদকে (শাহদের) নিয়মতান্ত্রিক প্রধান-এ পরিণত করে রানা রাজবংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রীর (প্রকৃত ক্ষমতা) শাসন পরিচালনা করেন। অর্থাৎ রানারা ক্ষমতায় আসে এবং শাহ্ রাজবংশকে টিকিয়ে রাখে। এই সময় থেকে রানারা প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী অন্যদিকে শাহ্‌রা হচ্ছে নাম মাত্র শাসকে পরিণত হয় ।এই রাজবংশের মানুষরা বেশিরভাগ ছিলেন পাহাড়ি (ব্রাহ্মন ও ছেত্রী)। এরা নিজেদের বর্ণ অবস্থানকে রাজনৈতিক ভাবে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। আগে শাহরা বলপূর্বক ভাবে নানা স্থান দখল করে বিভিন্ন জায়গাতে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল কিন্তু রানারা এসে সেই ব্যবস্থাকে একটা আইনগত রূপ দেয় মুলকি আইন প্রতিষ্ঠা করার

মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ ক্ষমতায় এসে তাদের শাসনকে সামাজিক বৈধতার জন্য মুলকি আইন নামে একটি আইন কার্যকর করে। মুলকি আইন হলো সামাজিক বর্ণ ব্যবস্থা, যেটা বৈধতা পেয়ে আসছিল সেই সমাজের ঐতিহ্য, অভ্যাস ও মৌখিক ইতিহাসের মধ্য থেকে কিন্তু এই আইনের কোন আইনগত দলিল ছিল না। রানারা এটাকে একটা আইনগত কাঠামোর মধ্য দিয়ে নিয়ে আসার জন্য মুলকি আইন নামে একটি আইন তৈরি করে। তৎকালীন সময়ে নেপালি জনসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল । একটি হল তাগাধারী (উচ্চবর্ণ) এবং অন্যটি হলো মাতওয়ালী (নিম্নবর্ণ)। এই তাগাধারীদের মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা। এই তাগাধারীদের মধ্যে দুই ধরনের শ্রেণী অবস্থান দেখা যায় একটি হল মাধেসি (সমতল) এবং অন্যটি হল পাহাড়ি উচ্চবর্ণের লোকেরা।

এই বর্ণ বিভাজনের মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থাকে একটি রাজনৈতিক আইনগত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করল তারা অর্থাৎ এতদিন যে বাহুবলের সাহায্যে শাহ্‌রা শাসন করেছিল সেটিকে আইনগত রূপ দিয়ে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো রানাবংশ। ফলে রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র দেশের সর্বত্র সমান ভাবে প্রযোজ্য হতে লাগলো এবং রাণা ও শাহ্ রাজবংশের ভিত্তি আরো ভালোভাবে স্থাপিত হল। যে আইনগত কাঠামোটি তৈরি হল সেটি অবশ্যই হিন্দু সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে ছিল। রাজতন্ত্র বৈধতা পেয়েছিল এখান থেকেই। ঐশ্বরিক মতবাদ অনুযায়ী রাজা হল ঈশ্বরের প্রতিনিধি নেপালের জনগণ তাদের রাজাকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করতেন এবং তার বিরোধিতা করা মানেই স্বয়ং ভগবানের বিরোধিতার সমান বলে তারা মনে করতেন সুতরাং পরবর্তীকালে দেখা যায় যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে (২০০৮ অবধি) যে ধরণের সরকারই আসুক না কেন সেখানে কিন্তু রাজতন্ত্র টিকে ছিল এবং রাজকীয় সৈন্য সেই আইনকে টিকিয়ে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। যেমন ১৯৬০ সালে যখন দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল তখন নির্বাচিত সরকার এর বিরোধিতা করেননি। ফলে রাজতন্ত্রের যে একটা ভিত্তি ছিল সেটি হল হিন্দু সংস্কৃতি, প্রথা, লোকাচার সেটা বোঝা যায়। সুতরাং হিন্দুত্ববাদ ও রাজতন্ত্র উভয়ই একে অপরের পরিপূরক ছিল। হিন্দুত্ব যেমন বলে রাজা হল ঈশ্বরের প্রতিনিধি তেমনি রাজারা ও ছিলেন কঠোর হিন্দু সুতরাং হিন্দুত্ববাদকে কেন্দ্র করে সেখানে এক ধরনের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল সুতরাং রাজতন্ত্রের যে রাজনৈতিক বৈধতা ছিল সেটি এসেছে ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে। আর সেটা হলো হিন্দুধর্ম এবং তার প্রমাণ হিসেবে মুলকি আইন তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল। যারা নেপালি কংগ্রেস তৈরি করেছিল তারা ভীষণভাবে হিন্দু ধর্মের সমর্থক ছিল। ফলে স্বাভাবিক ভাবে রাজতন্ত্রকে তারা কখনোই অবলুপ্ত করতে চায়নি।[২]

এই অংশে রাজতন্ত্রের টিকে থাকার লড়াই-এর পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থার মাথাচাড়া দেওয়ার ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, সেটি আলোচনা করা হল। নেপালের রাজতন্ত্র বনাম জনগণ বা গণতন্ত্রের লড়াই দীর্ঘদিনের, বিশ শতকের শুরু থেকে রানা স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নেপালি জনগণের ক্ষোভ বাঁধতে শুরু করে ত্রিশ দশকের

মাঝামাঝি সময়ে থেকে। ভারতে বসবাসকারী প্রবাসীরা রানা শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম জন আন্দোলনে অংশ নেয়।

সেই সময় থেকে নেপালের জনগণের আন্দোলনকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা –

১। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বহুদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন,

২। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অথবা অকমিউনিস্ট আন্দোলন বনাম কমিউনিস্ট নেতৃত্বের পরিচালিত আন্দোলন।

রাজতন্ত্রের অধীনে বহুদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় যেসব রাজনৈতিক দল অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল তারা হল নেপালি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল অন্যদিকে প্রজাতন্ত্র বা রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার মুখ্য নেতৃত্ব ছিল সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল, এরা সাধারণত মাওবাদী নামে পরিচিত।[৩]

কংগ্রেসের নেতৃত্বে বহুদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনঃ-

রাজতন্ত্রের অধীনে বহুদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রথম শুরু করেছিলেন নেপালি কংগ্রেস দলটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৫০এর দশকে। নেপালি কংগ্রেসের মতো নেপালি কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পঞ্চাশের দশকে নেপালে তারা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করেছিল সেটি ছিল এইরকমই যে তারা রানা প্রধানমন্ত্রীর "পদ"কে অবলুপ্ত করেছিল অর্থাৎ রাণা প্রধানমন্ত্রীর নামে যে ক্ষমতা ছিল সেই ক্ষমতা তারা পার্লামেন্টের হাতে তুলে দিয়েছিল। যে ক্ষমতা একজন প্রধানমন্ত্রী ভোগ করেছিল সেটাকে ভেঙে দিয়ে তারা 'সংসদীয় গণতন্ত্র' নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখানে পুরো ক্ষমতা তিনটে শ্রেণীর মধ্যে কুক্ষিগত থাকলো প্রথমত, রাজা দ্বিতীয় পক্ষ হল রাণা এবং পার্লামেন্টের হাতে তথা নেপালি কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে।সুতরাং নেপালি কংগ্রেস তারা কখনোই রাজতন্ত্রের অবসান চাইনি। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে কমিয়ে দিয়েছিল। যেটা ষাটের দশকের পরে রাজা মহেন্দ্রের হাতে দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়েছিল।[৪] রাজা মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ (১৯২০-১৯৭২) ক্ষমতায় এসে নিজের তৈরি সংবিধানের অধীনে পার্লামেন্টর নির্বাচন ঘোষণা করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে দ্য কনস্টিটিউশন অফ কিংডম অফ নেপাল নামে আইন তৈরির মাধ্যমে প্রথম বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেন। ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে নেপালি কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপালের সহ অনেকগুলি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বি পি কৈরালার প্রধানমন্ত্রীত্বে এই সরকার প্রায় দেড় বছর স্থায়ী ছিল। ১৯৫০-১৯৫৯ এই সময় কালে নেপালে প্রথম প্রজন্মের গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় যে নেপালে দুই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল একটি হলো উচ্চবর্ণ বা এলিটদের রাজনৈতিক

সংস্কৃতি এবং অন্যটি হলো জনসংস্কৃতি। প্রথম পর্যায়ে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ঘটলো সেটা কেবল মাত্র উচ্চবর্ণের এলিট শ্রেনির সংস্কৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যার ফলে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুবাদী সংস্কৃতি প্রচলিত থাকে এবং একেই কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের প্রক্রিয়া তথা নেপালিকরণ সেখানে প্রায় ১৯৯০ দশক অবধি চলতে থাকলো। তবে ১৯৯০ সালে নেপালের রাজনীতিতে মাওবাদীদের উত্থান ঘটলে নেপালি সমাজে আস্তে আস্তে করে এই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে জনগণের মধ্যে। যার শেষ পরিণতি ২০০৮ সালে আমরা দেখতে পাই।

রাজা মহেন্দ্রের আমলে নেপালের এই রাজনৈতিক আন্দোলন ফিকে হয়ে আসে। ১৯৬১ সালে রাজা মহেন্দ্র দলহীন পঞ্চায়েত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, এবং রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যবস্থা ২৮ বছর ধরে কার্যকরী ছিল।[৫] নেপালে এই সময়কালে দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছিল। যেহেতু এখানে তখন ও নেপালের জনগণ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে মান্য করত সেক্ষেত্রে এই আদেশ ছিল তাদের কাছে ঈশ্বরের আদেশ। তারা সরকারের বরখাস্ত বা নির্বাচন নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না কারণ গণসংস্কৃতি বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সেটা তখন ও অবধি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে রাজা মহেন্দ্র এই সময় গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ গঠন করেছিল। আর এই পরিষদের বিভিন্ন পদে রাজার মনোনীত ব্যক্তিকে বসানো হয়েছিল। এছাড়া সেই সময় নেপালে তিনটি ভাষায় রেডিও ব্রডকাস্টিং করা হত। মহেন্দ্র ক্ষমতায় আসার পর থেকে কেবলমাত্র নেপালি ভাষায় রেডিও সম্প্রচার হত অর্থাৎ এখানে এক ধরনের “এক জাতি এক রাষ্ট্র” ধারণা গড়ে ওঠে এবং সেটি হল হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারণা।এর আর একটি উদাহরন দেওয়া যেতে পারে। ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ অবধি নেপালকে দেখানো হয়েছিল এক হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেশ হিসেবে কিন্তু ১৯৯৯ সালে যখন জনগণনার এক রিপোর্ট আসে সেখানে বলা হয় নেপালে ৬৯ টি জনজাতি রয়েছে তার আগে কোথাও একবারের জন্য বলা হয়নি এইসব জনজাতির কথা এবং ২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্টে ১২৫ টি এথিনিক জনজাতির কথা বলা হয় সুতরাং নেপালি রাষ্ট্র প্রথম থেকেই বহুত্ববাদী রাষ্ট্র ছিল। রাষ্ট্র সেন্সাস রাজনীতির মধ্য দিয়ে নেপালী রাষ্ট্র আসলে সুচতুর ভাবে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে নেপালকে দেখিয়ে আসলে নিজেদের শাসনের বৈধতাকে সুনিশ্চিত করেছিল। অর্থাৎ যত হিন্দুকরণ হবে রাজতন্ত্র তত বৈধতা পাবে এই মতের বিশ্বাসী ছিলেন নেপালি রাজারা।[৬]

নেপালের দশম রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ (১৯৮৫-২০০১) প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক পশ্চিমি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ভারতবর্ষ ও চীনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। তিনি শুধুমাত্র বৈদেশিক সম্পর্কই নয়, তার সাথে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯০ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে নেপালের রাজনীতি উত্তাল হয়। ফলে তিনি একটি স্বাধীন ও

নিরপেক্ষ সংবিধান সংশোধন কমিশন গঠন করেন। পরবর্তীকালে যার ভিত্তিতে নেপালে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু নেপালের ইতিহাসে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে ২০০১ সালে ১লা জুন। সেদিন নৈশ ভোজের সময় রাজা বীরেন্দ্রসহ রাজ পরিবারের সকল সদস্য খুন হয়েছিলেন।[৭]

রাজনৈতিক দলগুলো গুপ্ত সমিতি হিসেবে কাজ করছিল বিশেষ করে কমিউনিস্ট ও মাওবাদী দলগুলি। আবার নেপালি কংগ্রেস দলগুলি ক্ষমতা পুনরায় ফিরে পাবার আশায় জনগণকে বোঝাতে শুরু করেছিল। আশির দশকে নেপালের অভ্যন্তরে চরম মাওবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। এই সময় রাজতন্ত্র এবং মাওবাদীদের মধ্যে তীব্র আন্দোলন ও সংঘাত দেখা যায়। তারা বিগত শতাব্দীর ৯০-এর দশকে পূর্ব ইউরোপ থেকে কমিউনিজমের পতনের পর সারা বিশ্বজুড়ে উদার গণতন্ত্রের হাওয়া বইতে শুরু করে। নেপালেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নেপালের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল নেপালি কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট গণেশ মানসিং এর নেতৃত্বে একত্রিত হয় এবং ৩০ বছরের পুরনো পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পতন ঘটিয়ে বহুদলীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছিল এই সমস্ত দলগুলির কাছে প্রধান লক্ষ্য। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯০ সালে নেপালি কংগ্রেস সভাপতি কৃষ্ণ প্রসাদ এর নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, সংসদীয় সরকার ও বহুত্ববাদী সমাজ গঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেটা দ্বিতীয় জনগণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদাহরণ বলা যেতে পারে।[৮]

প্রজাতন্ত্র বা রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলনঃ

৯০-এর দশকে ঠান্ডা লড়াইয়ের পরবর্তীকালে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে সারা পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গণতন্ত্রের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লেও নেপালের রাজনৈতিক চরিত্রটা ঠিক-এর উল্টোদিকে ছিল। সেখানে প্রতিবেশী দেশ চীনের মাও সে তুং এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের হাওয়া বইছিল। একদিকে চীনের মাওবাদ মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশ, যারা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নেপালের রাজতন্ত্রকে সরিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, অন্যদিকে ১৯৭০ দশকে ভারতে সংঘটিত হওয়া নকশালবাড়ি আন্দোলন দ্বারা নেপালের মাওবাদী আন্দোলন প্রভাবিত হয়েছিল। মাওবাদী নেতা প্রচন্ড ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান কর্ণধার। মাওবাদী আন্দোলনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল প্রথমত, ব্রিটিশ শাসন সূত্রে পাওয়া ভারতের আধিপত্যবাদ থেকে নেপালের অর্থনীতির মুক্ত করা,যেমন সুগৌলি চুক্তি ১৯২৩ ও ১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ এর সঙ্গে জোট বেঁধেছে নেপালের রাজতন্ত্র সুতরাং ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও রাজতন্ত্র থেকে নেপাল কে উদ্ধার করা মাওবাদী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই জন্য মাওবাদীরা প্রচন্ড-এর নেতৃত্বে তাদের তৈরি করা ৪০ দফা

কর্মসূচিতে ১৯৫০ সালের চুক্তি বাতিলের কথা উত্থাপন করেছিল এবং তারা ভারতকে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে শ্রেণিশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।[৯]

নেপালে বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র সামান্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল অবধি নেপালের শাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে একদিকে রাজতন্ত্র অন্যদিকে মাওবাদীদের মধ্যে লড়াই-এর মধ্য দিয়ে সে দেশের ইতিহাস পরিচালিত হয়েছে, ফলস্বরূপ নেপালের রাজনীতিতে অস্থিরতা, অনুন্নয়ন, দারিদ্র্য, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি প্রভৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজা জ্ঞানেন্দ্র (২০০১ – ২০০৮) ২০০১ সালে প্রাসাদ হত্যাকাণ্ডের পর জ্ঞানেন্দ্র নেপালের পরবর্তী রাজা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। রাজা জ্ঞানেন্দ্র ২০০২ সালে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবাকে বরখাস্ত করেন এবং তিনি রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। এরপর ২০০৫ সাল অবধি এককভাবে তিনি নেপাল শাসন করেন এবং এই সময়ে গোটা নেপালে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায়। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে। মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নেপালি সেনাবাহিনী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, এইরকম অস্থির পরিবেশে ২০০৬ সালে ২১ শে নভেম্বর নেপাল সরকার এবং নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) এর মধ্যে একটি সার্বিক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ১০ বছর ধরে চলা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবসান ঘটে। এই চুক্তির কিছু শর্ত ছিল। শর্তগুলি হল -

ক। রাজতন্ত্র এর বিলোপ সাধন

খ। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার শর্ত

গ। অন্তবর্তীকালীন সংবিধানের আলোকে ১৯০০০ মাওবাদী গোরিলা যোদ্ধাকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এই চুক্তি একদিকে যেমন শান্তি স্থাপনের প্রশ্নে ঐতিহাসিক বলা যায় অন্যদিকে শত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বহুদলীয় গণতন্ত্র তৃতীয়বারের জন্য প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা উজ্জ্বল হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[১০]

এই চুক্তির ফলে স্থায়ীভাবে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে আক্ষরিক অর্থেই নেপাল একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ২০০৮ সালের শুরুতে রাজনৈতিক দলগুলি দীর্ঘ আলোচনার পর সংবিধান সভা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়, এক কক্ষ বিশিষ্ট সংবিধান সভার ৬১০টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১০ ই এপ্রিল, ২০০৮ সালে। এই সংবিধান সভার দায়িত্ব বর্তায় দেশের ভবিষ্যৎ ‘সংবিধান’ রচনা। সদস্যগণ তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়, ২৪০ জন সদস্য নির্বাচিত হয় এক সদস্য বিশিষ্ট আসন থেকে, ৩৩৫ জন নির্বাচিত হয় সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব মূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং বাকি ২৬ টি আসন পূরণ করা হয় মনোনয়ন-এর মাধ্যমে এবং সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশনেই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নেপালকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায় যে নেপালে এতদিন রাজতন্ত্র টিকে থাকার মুল কারন হল হিন্দু রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা লোকাচার। রাজতন্ত্র নিজে বেঁচে থাকার জন্যে হিন্দু রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নেপালিকরনের সঙ্গে যুক্ত করেছে অর্থাৎ হিন্দু রাজনীতি সংস্কৃতিকে বেশি করে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এক প্রকার হিন্দুকরণ নেপালি করণ করেছে। নেপালের রাজতন্ত্রের বিবর্তন ও গণতন্ত্রের উত্তরণের পথটা সহজ ছিল না, একদিকে নেপালের অভ্যন্তরে রাজনীতির কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে দুই রাজবংশ রানা ও শাহ্‌রাজবংশের রাজাদের মধ্যে সিংহাসন দখলের লড়াই ও ষড়যন্ত্র এবং অন্যদিকে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার এক প্রাণপণ চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে অপরদিকে ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত সীমাবদ্ধতা প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার সূত্রের অদৃশ্য অধীনতামূলক মিত্রতার সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে। সুরক্ষা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে প্রতিবেশী দেশ ভারতের মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে নেপাল। ঠিক একই রকম ভাবে ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ভারতের বিকল্প মিত্র চীনের সঙ্গেও সম্পর্কে জড়িয়েছে। যে জন্য দুটি প্রবণতা দেখা গেছে নেপালের রাজনীতিতে ১৯৯০ দশক অবধি। ভারতে প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত নেপালি জাতীয় কংগ্রেস ভারতপন্থী দল ক্ষমতায় এলে ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক ভালো ও ঘনিষ্ঠ হয়েছে, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু রাজা মহেন্দ্র ছিলেন। অন্যদিকে নেপালে মাওবাদী দল (১৯৯০ দশকের পরে) ক্ষমতায় এলে চীনের সঙ্গে নেপালের সখ্য বা ঘনিষ্ঠতা বাড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে ।২০০৮ সাল অবধি নেপালের সঙ্গে চীন ও ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগোনো ও পাল্টা এগোনো নীতি উভয় দেশ গ্রহণ করেছে, তবে এই সময় কালে ভারত চীনের থেকে বেশি নেপালে ওপর তার আধিপত্য বজায় রেখেছিল কিংবা তাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠে ছিল। ২০০৮ সাল পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি চিন নেপালের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে এক প্রকার দূরত্ব বজায় রেখেছে অন্যদিকে অর্থনৈতিক সাহায্য এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নেপাল-চীনের সঙ্গে এক প্রকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং নেপালের রাজাকে সমর্থন করেছে। চিন- নেপালের রাজনৈতিক পরিবর্তনে সাহায্য করেছে যতটা না তার থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে এবং নেপালের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিকল্প শক্তি হিসেবে।

তথ্যসূত্র:

১। Whelpton, John,(2005). A History of Nepal, New York: Cambridge University Press, abstract.

২। Mistry, A.(2011). Ethnic Politics in Nepal: A Theoretical Outlook. Blueroan Publishing, Ahmedabad, Gujarat.

৩। Bhandari ,Surendra,(2014) Self-Determination & Constitution Making Process, Springer. Singapore,pp.1-40.

৪। Ibid, pp. 64-160.

৫। Rahul, R.(2005). Royal Nepal: A Political History. Vikas Publishing House, New Delhi.

৬। Op.cit. (ref.no.2), p30-62.

৭। মিত্র, দেবাশীস. ও নন্দী, দেবাশীস. (2014) দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্র মাত্রা ও প্রবণতা, এভেনেল প্রেস, পৃষ্ঠা নম্বর ২৭-৩১।

৮। ঐ, পৃষ্ঠা নম্বর ৩২-৩৪।

৯। বক্সী, দীপক, সম্পাদনা (2009) চিন্তন একটি মার্কসীয় অন্বেষণ প্রয়াস, ষষ্ঠ সংখ্যা, এপ্রিল

১০। Thapa, deepak & bandita, sijapati,(2003) A kingdom under siege, the print house, kathmandu, Nepal.

সামাজিক অবস্থানের নিরিখে মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক কথ্যভাষা

রাকিব
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

ভাষার পরিবর্তন পরম্পরার একটি অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে ভাষাতত্ত্ববিদরা চিহ্নিত করেছেন বিচ্ছিন্নতা বা বিভাজন প্রক্রিয়াকে। যদি একই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী কোন কারণে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কদাচিৎ পরস্পরের সাথে যোগাযোগ বা দেখাসাক্ষাৎ ঘটে তবে তাদের মধ্যে বিশাল ভাষাগত পার্থক্য সৃষ্টি হতে বাধ্য। এই বিচ্ছিন্নতার কারণ বহুবিধ, যার অন্যতম হলো ভৌগোলিক দূরত্ব, রাজনৈতিক পৃথকীকরণ, পারস্পরিক মতপার্থক্য এবং অপর্যাপ্ত যোগাযোগ। এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বা উপভাষার জন্ম হয়।

বিশ্বের বহু ভাষার ক্ষেত্রেই এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ হল ইংরেজি ভাষা। মার্কিনী, ক্যানাডীয়, অস্ট্রেলীয় এবং অন্যান্য ইংরেজি ভাষাভাষীর ইংরেজি এবং যুক্তরাজ্যের ইংরেজি যাকে ইংরেজি ভাষার মূল উৎপত্তি স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ভিন্নতর নিঃসন্দেহে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের বাংলা এবং বাংলাদেশের বাংলাতে চারিত্রিক ও ব্যবহারিক পার্থক্য রয়েছে অনেক।

আবার একথাও সত্যি একই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেও সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের প্রভাবে ভাষাগত বিচ্ছিন্নতা বা বিভাজন ঘটতে পারে। তবে এর ব্যাপকতা অবশ্যই সংকীর্ণ পরিসরে হয়ে থাকে। যদি বিভিন্ন উপভাষা একই ভৌগোলিক সীমারেখায় কোন একটি ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সহঅবস্থান করে তবে এই ভাষাগুলি পরস্পরকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রভাবিত করে এবং সবগুলি ভাষাতেই কমবেশি পরিবর্তন আসে। এটি মূলত হয় পারস্পরিক সমঝোতা স্থাপনের প্রয়োজনে। বাংলা ভাষার আজকের রূপটা এই পরিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। সেখানে মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক কথ্য ভাষাও ভাষা পরিবর্তনের নিয়মে নিজ বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। বর্তমান নিবন্ধপত্রে মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ভাষা কীভাবে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হচ্ছে তা নিয়েই আলোচনা।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভৌগোলিক সীমারেখা

বৃহত্তর মুর্শিদাবাদ জেলারভাষা ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল স্বতন্ত্র হয়েছে একদিকে পদ্মা নদী বাংলাদেশ সীমান্তরেখা নির্মান করেছে, অন্যদিকে গঙ্গা (এই অঞ্চলে ভাগীরথী নদী নামে পরিচিত) নদী এই অঞ্চলের মাঝ বরাবর প্রবাহিত। পাশাপাশি এই গঙ্গা নদীর ফারাক্কা ব্যারেজ মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে ও উত্তরপূর্বে পার্শ্ববর্তী মালদা জেলার সীমানারেখা নির্ধারণ করেছে। এই জেলার দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্বে বর্ধমান ও নদীয়া জেলা।

মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমে বীরভূম, ঝাড়খণ্ড ও সাঁওতাল পরগণা (বিহার)। এই বেষ্টনীর মধ্যকার যোগাযোগ-ঘনিষ্ঠতার ঐক্য নিয়েই গড়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল।

মুর্শিদাবাদের ভৌগোলিক সীমানা মুর্শিদাবাদের ভাষার বৈচিত্র্য সাধনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা যদি লক্ষ করি তাহলে দেখব, পশ্চিমবঙ্গের একেক অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার রয়েছে একেকটি পৃথক রূপ। ২৩টি জেলার আঞ্চলিক ভাষার কমপক্ষে রয়েছে ২০টি পৃথক রূপ। উদাহরণস্বরূপ পরিলক্ষিত হয় মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি (রাজবংশী ভাষা) এমন কয়েকটি জেলার আঞ্চলিক ভাষা এতটাই দুর্বোধ্য যে, অন্য অঞ্চলের লোক তা সহজে বুঝে উঠতে পারেন না। বর্তমানে বাংলা ভাষার যে মান্য রূপলাভ করেছে, কলকাতা তার প্রাণকেন্দ্র। কলকাতার মান্য ভাষা রাঢ়ী উপভাষার মধ্যে পড়ে। মুর্শিদাবাদও ঠিক তাই।

ভাষা বৈচিত্র্যের কারণসমূহ

মুর্শিদাবাদ জেলার ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে হলে ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সচলতার কথা স্মরণ রাখতে হবে। ২০১১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী গ্রামাঞ্চল প্রধান মুর্শিদাবাদে শতকরা ৮০.২৮ অংশ গ্রামাঞ্চল এবং ১৯.৭২ অংশ শহরাঞ্চল। এই গ্রামাঞ্চল প্রধান মুর্শিদাবাদে মানুষ কৃষিজীবী ও ছোটখাটো ব্যবসায়ী এবং পরিযায়ী শ্রমিক।

আমরা যদি মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজনদের কথাবার্তা শুনি বা লক্ষ করি তাহলে মুর্শিদাবাদের কোথাও কোথাও ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের অবস্থান লক্ষ করব। এই জেলার প্রধান শহর ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র বহরমপুর হলেও আর অন্যান্য ছোট ছোট শহরতলীগুলিতে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী মানুষের উপস্থিতি দেখব, যাদের ভাষাগত প্রভাবে মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ভাষা বিকাশ লাভ করেছে ও মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ভাষা পরিমণ্ডল গঠিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে সমগ্র ভারত জুড়ে বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলা ভাগ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ (অর্থাৎ ভারত) এবং পূর্ব পাকিস্তান (আধুনা বাংলাদেশ) দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে রূপ নেয়। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্থান (আধুনা বাংলাদেশ) থেকে বহু মানুষ এদেশে আসেন। তাদের কেউ কেউ মুর্শিদাবাদে বসতি স্থাপন করেন। দেশ বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ উভয় অধ্যায়ে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বিপুল পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই দেখা গেছে। এরফলে এই অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের স্বাভাবিক রূপ পরিবর্তিত ও বিপর্যস্ত হয়।

গ্রীয়ার্সন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীগণ মুর্শিদাবাদ জেলার আঞ্চলিক ভাষাকে রাঢ়ী উপভাষার অনুসারী বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু সমগ্র মুর্শিদাবাদ পরিভ্রমণ করলে দেখা মিলবে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন উপভাষার প্রভাব বর্তমান। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর ও উত্তরপূর্বে মালদা ও বাংলাদেশের রাজশাহী অবস্থান করছে। এই অঞ্চলগুলি বরেন্দ্রী উপভাষার মধ্যে পড়ে। আবার পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা ও ঝাড়খণ্ড অবস্থান করছে। যা ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মধ্যে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই বরেন্দ্রী ও ঝাড়খণ্ডী উপভাষা দ্বয়ের প্রভাব মুর্শিদাবাদ জেলার এই প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষদের ভাষার মধ্যে পড়েছে। তেমনি দেশবিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের সময় আধুনা বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষদের বঙ্গালী উপভাষার প্রভাব পদ্মানদীর ধার বরাবর মুর্শিদাবাদের সীমান্ত অঞ্চলগুলির ভাষার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

এবার আমরা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদের ভাষায় বিভিন্ন ভাষার প্রভাব লক্ষ করব।

[ক] আমরা যদি মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত লক্ষ করি, তাহলে দেখব এই জেলার সীমান্ত বরাবর সাঁওতাল পরগণা (বিহার) ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অবস্থান। এখানে পাশাপাশি দুটি হিন্দি ভাষী রাজ্যের মানুষের সঙ্গে বসবাস করে। এর ফলে এই জেলার ফারাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ান প্রভৃতি এলাকার মানুষদের মুখে হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত বাংলা লক্ষ করা যায়। যেমন-

১। তুখে ট্যাখা হামি দিচ্ছি না? (মুর্শিদাবাদ)
২। তোকে টাকা আমি দিচ্ছি না। (মান্য বাংলা)
৩। তুই হামাকে চিনিস না? (মুর্শিদাবাদ)
৪। তুই আমাকে চিনিস না। (মান্য বাংলা)

মুর্শিদাবাদের বাংলা	হিন্দি ভাষা	বরেন্দ্রী উপভাষা
হামি	হাম	হামি
হামাক	হামকো	হামাক

আমি>হামি শব্দটি হিন্দি 'হাম' শব্দের প্রভাবে ব্যবহৃত অনুমান করা যেতে পারে। আবার আমাকে>হামাকে শব্দটির ক্ষেত্রে হিন্দি 'হামকো' শব্দের যেমন প্রভাব রয়েছে তেমনি বরেন্দ্রী উপভাষার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

তাছাড়া জীবিকার প্রয়োজনে মুর্শিদাবাদের মানুষ যেমন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যান, তেমনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এখানে আসেন। ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাদের ভাষার প্রভাব মুর্শিদাবাদের মানুষের মধ্যে পড়ে। এই জেলার বহরমপুর, কাশিমবাজার, আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, জঙ্গীপুর এলাকায় হিন্দি ভাষী মানুষের দেখা মেলে। বিশেষ করে এই সমস্ত এলাকার রেল কলোনীগুলিতে হিন্দি ভাষার প্রাচুর্য লক্ষ করার মত। এছাড়াও বর্তমান সময়ে হিন্দি চলচ্চিত্রে প্রভাবে সমগ্র মুর্শিদাবাদের মানুষের মুখে আধো আধো হিন্দি বাংলা মিশ্রিত ভাষা শোনা যায়।

[খ] এই জেলার রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর, লালগোলা, ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, সাগরদিঘী প্রভৃতি অঞ্চলের কথ্য ভাষায় অনুনাসিক ধ্বনির প্রবণতা দেখা যায়। যেমন-

মান্য বাংলা	মুর্শিদাবাদের বাংলা
হাসি	হাঁসি
হাড়ি	হাঁড়ি
ঘোড়া	ঘুঁড়া

যা মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষাকে স্বাতন্ত্রতা প্রদান করেছে। রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর, লালগোলা, ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ, রানীনগর, সাগরপাড়া, জলঙ্গী প্রভৃতি অঞ্চলগুলি বাংলাদেশের সীমান্তে রাজশাহী, কুষ্টিয়া বরাবর অবস্থিত। এর দরুন এই অঞ্চলগুলির ভাষাতে বাংলাদেশী ভাষার বিশেষ করে রাজশাহী ও কুষ্টিয়ার ভাষাগত টান লক্ষ করা যায়। যেমন-

৫। ওরে তুরা কনে গেলি? (কুষ্টিয়া)
৬। ওরে তোরা কুণ্ঠে গেলি। (মুর্শিদাবাদ)
৭। যে কেনে ছিলাম, সেকেনেই আচি। (কুষ্টিয়া)
৮। যেখ্যানে ছিনু, সেখ্যানেই আছি। (মুর্শিদাবাদ)
৯। এ কি ভাত রান্দিছিস? ভাত যে সাঁটি গিইচে। (কুষ্টিয়া)
১০। এ কি ভাত রানছিস? ভাত যে স্যাঁয়টা গ্যালছে। (মুর্শিদাবাদ)
১১। দেইখা চ্যালাইতে পারছিস না, কেনে কি কইরেছি? (রাজশাহী)।
১২। দেখ্যা চাল্যাতে পারছিস না , কেনা কি কোর্যাছি? (মুর্শিদাবাদ)।

কিংবা,

১৩। তোমরা রা কাড়না ক্যেনা?
১৪। তোমরা কথা বলছ না কেন? [কথা>রা; বলছ>কাড়না]।

আমরা দেখতে পাচ্ছি বৈশিষ্ট্যগতভাবে ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কুষ্টিয়া ও রাজশাহী উভয় অঞ্চলের ভাষার প্রভাব স্পষ্ট।

[গ] মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম, নবগ্রাম, ভরতপুর, বরোয়া, কান্দীর কিছু কিছু অংশ প্রভৃতি অঞ্চলে, বলতে গেলে প্রায় সমগ্র কান্দী মহকুমার কথ্য ভাষা সমগ্র মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষা থেকে কিছুটা অন্যরকম। যেমন-

পদ	মান্য বাংলা	মুর্শিদাবাদের বাংলা
সর্বনাম	আমি তুই/তুমি	আমু/মু তু
বিশেষ্য	প্যান্ট	পেন্ট

বিশেষ্য/ক্রিয়া	স্নান	ডুব
ক্রিয়া	এসেছে	আলছে

[ঘ] মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বদিকে অবস্থিত নদীয়া জেলা। নদীয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে বিশেষ করে রানীনগর, জলঙ্গী, ডোমকল, হরিহরপাড়া, বেলডাঙ্গা, রেজিনগর প্রভৃতি এলাকায় মানুষের ভাষার এমন কোন বিশেষ টান লক্ষ করা যায় না। এই অঞ্চলগুলির ভাষার কথ্য রীতি অনেকটা রাঢ়ী উপভাষার মতো। তবে স্থানীয় ক্ষেত্রে ভাষার যেউচ্চারণগত বৈচিত্র্য দেখা যায় সেগুলি হল—

মান্যভাষা	**মুর্শিদাবাদের ভাষা**	**বৈচিত্র্য**
তাড়াতাড়ি	তারাতারি	উচ্চারণগত তারতম্য
রক্ত	অকত	'র' ধ্বনির লোপ/বিলোপন
উকিল	রুকিল	'র' ধ্বনির আগম/সংযোজন
স্মরণ	সড়ণ	র>ড় (মূর্ধণীভবন)
রিক্সা	এসকা>এসকো	ধ্বনি বিপর্যাস

তাছাড়াও ক্রিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন—নিয়ে এস> নিই আনো/লিয়া আনো ইত্যাদি।

মুর্শিদাবাদে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যাধিক্য। স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে আরবী, উর্দু, ফার্সী ভাষার প্রভাব দেখা যায়। যেমন,- জল>পানি; স্নান>গোসুল; পিতা>আব্বা/আব্বাজান/ বাপুজান; আকাশ>আশমান প্রভৃতি ধর্মীয় শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। তাছাড়া সমগ্র মুর্শিদাবাদ জুড়েই আরবী, উর্দু, ফার্সী ভাষার আধিক্য লক্ষ করার মতো। লালবাগ, ধুলিয়ান প্রভৃতি অঞ্চলে উর্দু ও হিন্দি মিশ্রিতভাষায় মানুষকে কথা বলতে দেখা যায়।

যাই হোক ড. গ্রীয়ার্সন, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীগণ মুর্শিদাবাদ জেলার বাংলা ভাষাকে রাঢ়ী উপভাষার মধ্যে রাখতে চেয়েছেন। তাঁরা হয়তো মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরে ব্যবহৃত ভাষার উপর ভিত্তি করে রাঢ়ী উপভাষার ভাগের মধ্যে রেখেছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ভাষা রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত হলেও ভাষা বৈচিত্র্যের গুণে স্বতন্ত্র।আমরা এবার মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ভাষার স্বাভাবিক বৈচিত্র্যগুলি দেখব—

ধ্বনিগত বৈচিত্র্যঃ-(Phonological Variation)

ক। স্বরধ্বনি সংযোজন

মান্য বাংলা	**মুর্শিদাবাদের বাংলা**	**ধ্বনিগত বৈচিত্র্য**
স্কুল	ইস্কুল	ই (আদি স্বরধ্বনিসংযোজন)

ষ্টেশন	ইষ্টেশন	ই (আদি স্বরধ্বনিসংযোজন)
নাহলে	নাইলে	ই (মধ্যস্বরধ্বনি সংযোজন)

খ। ব্যঞ্জনধ্বনি সংযোজন

মান্যবাংলা	মুর্শিদাবাদের বাংলা	ধ্বনিগত বৈচিত্র্য
ওজন	রোজন	র (আদি ব্যঞ্জনধ্বনি সংযোজন)
উই	রুই	র (আদি ব্যঞ্জনধ্বনি সংযোজন)
উপবাস	রুপবাস	র (আদি ব্যঞ্জনধ্বনি সংযোজন)
অনুমতি	রনুমতি	র (আদি ব্যঞ্জনধ্বনি সংযোজন)
লেখাপড়া	ল্যাখাপড়হা	হ (অন্ত্যব্যঞ্জনধ্বনি সংযোজন)
বোন	বোহিন	হ (মধ্য ব্যঞ্জনধ্বনি সংযোজন)

গ। স্বরধ্বনি বিলোপন

মান্য বাংলা	মুর্শিদাবাদের বাংলা	ধ্বনিগত বৈচিত্র্য
যাওয়া	যায়া	ও (মধ্য স্বরধ্বনি বিলোপন)
পাওয়া	পায়া	ও (মধ্য স্বরধ্বনি বিলোপন)
খাওয়া	খায়া	ও (মধ্য স্বরধ্বনি বিলোপন)

ঘ। ব্যঞ্জনধ্বনি বিলোপন

মান্য বাংলা	মুর্শিদাবাদের বাংলা	ধ্বনিগত বৈচিত্র্য
রাস্তা	আস্তা	র (আদি ব্যঞ্জনধ্বনি বিলোপন)
রাত	আত	র (আদি ব্যঞ্জনধ্বনি বিলোপন)
জায়গা	জা(অ)গা	য় (মধ্য ব্যঞ্জনধ্বনি বিলোপন)
নাহলে	নাইলে	হ (মধ্য ব্যঞ্জনধ্বনি বিলোপন)
মরলে	মোলে	র (মধ্য ব্যঞ্জনধ্বনি বিলোপন)

ঙ। স্বরধ্বনি রূপান্তরণ

মান্য বাংলা	মুর্শিদাবাদের বাংলা	ধ্বনিগত বৈচিত্র্য
বোতল	বোতুল	অ>ও
কোন	কুন	ও>উ
পেট	প্যাট	এ>অ্যা
দেশ	দ্যাশ	এ>অ্যা

পিষা	পেষা	ই>এ
লেজ	ল্যাজ	এ>অ্যা
ঝাঁটা	ঝ্যাঁটা	আ>অ্যা
ছানা	ছ্যানা	আ>অ্যা
কেন	কেন্যা	অ>অ্যা
এসেছে	(অ্যা)য়াসছে	এ>অ্যা; এ>অ

চ। ব্যঞ্জনধ্বনি রূপান্তরণ

মান্য বাংলা	মুর্শিদাবাদের বাংলা	ধ্বনিগত বৈচিত্র্য
কথা	কতা	থ>ত
কাঁথা	ক্যাঁথা	আ>অ্যা
রথ	অথ	র>অ
বিনা	বিনি	আ>ই

ছ। বিপর্যাস

মান্য বাংলা	মুর্শিদাবাদের বাংলা
বাক্স	বাস্ক/বাস্কো/বাসকো
রিক্সা	এসকা/এসকো/রিস্কা
সিক্স	সিস্ক/সিসক
বাতাসা	বাসাতা

জ। নাসিক্য ভবনের প্রবণতা বিশেষ ভাবে দেখা যায়।

মান্য বাংলা	মুর্শিদাবাদের বাংলা
হাসি	হাঁসি
হাড়ি	হাঁড়ি
ঘোড়া	ঘুঁড়া

ঝ। 'ন' ধ্বনির 'ল' ধ্বনিতে রূপান্তর মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ভাষায় লক্ষ করা যায়।

নদী	লদী/ লদ্দী	ন>ল
নয়তো	লয়তো	ন>ল
নতুন	লতুন	ন>ল

ঞ। অল্পপ্রাণতা মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন-

লেখাপড়া	লেকাপড়া	খ>ক
বধ	বদ	ধ>দ

ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃতঋণ শব্দের প্রযোগ দেখা যায়। যেমন-

মান্য বাংলা	মুর্শিদাবাদের বাংলা
হর্ণ	হরেন
গভর্নমেন্ট	গরমেন্ট
ডিপটিউবওয়েল	ডিপ্টিকল
ড্রাইভার	ডাইভার
ইন্টারেস্ট	ইনটরেস
সিগন্যাল	সিগনেল

ঠ। 'য়' ধ্বনির উচ্চারণ 'ইঅ' ধ্বনির প্রভাব কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়।
উদা:- পয়সা>পাইসা; সময়>স'ম ইত্যাদি।

ড। শব্দ মধ্যস্থিত সংকোচন এই অঞ্চলের মধ্য পরিলক্ষিত হয়।
উদা:- জায়গা>জা'গা; পয়সা>পা'সা।

ঢ। উচ্চমধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'এ' স্থানে নিম্নমধ্য অর্ধবিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'অ্যা' এর উপস্থিতি লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য (প্রকৃতপক্ষে 'এ' ধ্বনি এবং 'অ্যা' ধ্বনি এই উভয়ের মাঝামাঝি উচ্চারণ যা লিখে দেখানো যায় না)।
উদা:- দেশ>দ্যাশ; মেয়ে>ম্যায়া।

ণ। শব্দের আদিতে 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে।
উদা:- হল>হোলো; করত>কোরত; অফিসের>ওফিসের; অব্দি>ওব্দি ইত্যাদি।

ত। শব্দ মধ্যস্থিত 'অ' ধ্বনির বিবৃত 'আ' ধ্বনিতে পরিনত ঘটে।
উদা:- ফয়সালা>ফাইসালা; সময়>সোমায়; পয়সা>পাইসা।

থ। ক্রিয়া উচ্চারণে সংক্ষিপ্ত হয় এবং মধ্যাক্ষর লুপ্ত হয়।
যেমন- গেলাম>গেনু; করলাম>করনু; খেলাম>খানু; ছিলাম>ছিনু।

দ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নঞর্থক বাক্যের না-কো/ নি-কো শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—
১। তুই যাবি না-কো।
২। তোমার পড়া হয়নি-কো।

ধ। সম্বোধনসূচক বাক্যের ক্ষেত্রে 'গো' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—
১। চলো গো/ কি গো চল।
২। খায়া (খাওয়া) হয়াছে গো। (মুর্শিদাবাদ)।
৩। খাওয়া হয়েছে গো। (মান্য বাংলা)।

রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য (Morphological Variation):

মান্য বাংলা	মুর্শিদাবাদের বাংলা
জামা	পিরহান/জামা
তরকারী	সালুন/মালিস
সামান্য	অ্যাৎটুকুন
অনুরোধ	ব্যাগাত্তা
কোমর	মাজা
আলো (সূর্যের)	চিকাস
তামাশা	কুহ্যারা
পথ	ঘাঁটা
স্নান	গোসুল/ডুব

আঞ্চলিক ভাষায় অন্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষার প্রভাব:

রাঢ়ী উপভাষা মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাষা হলেও আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় এধরণের বৈচিত্র্যের সাধনের ক্ষেত্রে অভিবাসনকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ সুপ্রাচীনকাল থেকে আগত বহু মানুষেরা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য, জীবিকার সন্ধানে, পেশার তাগিদে কাজের খোঁজে এখানে এসেছেন। জীবিকার জন্য তারা আর ফিরে না গিয়ে এখানকার জলবায়ু, এখানকার মানুষকে ভালোবেসে এখানেই বসতিস্থাপন করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে মারোয়াড়িদের কথা। তারা অতীতকাল থেকে বাণিজ্য করার বাসনা নিয়ে এসে এখানেই থেকে গেছেন। বহরমপুর, আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, লালগোলা, জঙ্গীপুর, রঘুনাথগঞ্জ, ঔরঙ্গাবাদ ও ফারাক্কা প্রভৃতি অঞ্চলে মাড়োয়াড়িদের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এরা মূলত রাজস্থান, গুজরাত ও হরিয়ানা থেকে ব্যবসাবাণিজ্য করতে এসে এখানে থেকে গেছেন। তাদের ভাষার সাথে বাংলা ভাষা কোথাও মিশে গেছে। অবাঙালি ভারতীয় ও বিদেশি বহু জনগোষ্ঠী মুর্শিদাবাদে এসে এখানকার মুল জনস্রোতে মিশে গেছেন। তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি স্থানীয় ভাষার সঙ্গে মিশে গেছে। সুতরাং মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ভাষা বাংলার সঙ্গে ভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষা মিশে গিয়ে ভাষা মিশ্রণ ঘটেছে। যা মুর্শিদাবাদ জেলায় আঞ্চলিক কথ্য ভাষার বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ।

তাছাড়া এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের (সাঁওতাল, মাল, নাট, ধানুকী, ডোম, বায়েন, হাড়ি ইত্যাদি) জনগোষ্ঠীর মানুষদের বসতি দেখা যায়। এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা স্থানীয় বাংলা ভাষায় সঙ্গে কখনো মিশে গেছে, আবার কখনো তারাই নিজের মাতৃভাষার সঙ্গে স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে ভাষা মিশ্রণ ঘটেছে। এছাড়াও আঞ্চলিক কথ্য

ভাষার বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদে বসবাসকারী চাঁই জনজাতির কথা অস্বীকার করা যাবে না। চাঁই সম্প্রদায়ের ভাষা এই জেলার আঞ্চলিক কথ্য ভাষা থেকে কিছুটা হলেও আলাদা। যা আঞ্চলিক কথ্য ভাষার বৈচিত্র্যের কারণ হতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

বই:-

- চক্রবর্তী. ড. উদয়কুমার, ***নারীরভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*** কলকাতা, ইন্দাস, ২০০৬
- নাথমৃণাল., *ভাষা ও সমাজ,*কলকাতা২০০৯ জানুয়ারি ,নয়া উদ্যোগ ,
- ভট্টাচার্য,পরেশচন্দ্র .*ভাষাবিদ্যা পরিচয়*, কলকাতা জানুয়ারি ,জয়দূর্গা লাইব্রেরী , ২০০৩
- শ,রামেশ্বর .ড.*সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা* ,কলকাতা ,পুস্তক বিপনি , ১৪০৩ ,অগ্রহায়ণ
- সরকার. পবিত্র, *ভাষা দেশ কাল,* কলকাতামিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ , লিঃ, জৈষ্ঠ ১৪১৯

পত্রিকা:-

- ঝা. শক্তিনাথ, *মুর্শিদাবাদ জেলার ভাষাঃ কথ্য বাংলা.* দীপংকর চক্রবর্তী (.সম্পা). *মুর্শিদাবাদ জেলার দুই দশক (২০০৩ – ১৯৮৪).* বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ.(বার্ষিক পত্রিকা) .কলকাতা, পিপলস বুক সোসাইটি, ২০০৯, পৃ-৭৭ . ৮৪
- ঝা. শক্তিনাথ, *মুর্শিদাবাদের লোকভাষা এবং কথ্য বাংলা.* তাপস বসু (.সম্পা).*পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা,* কলকাতা(পত্রিকা) কোরক ,, জানুয়ারি ২০১৩১৪২-১৩২ .পৃ ,

গণমাধ্যমের ভাষা : কৌম সমাজ থেকে সম্ভ্রান্ততা

প্রণব ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ

বিষয় সংক্ষেপ: ভাষা ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় গনমাধ্যমের ভাষা - বাংলা ভাষা। সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের ভাষা হওয়া উচিৎ জনগণের ভাষা, আপামোর বাঙালীর প্রাণের ভাষা - বাংলা ভাষা । বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ দুটি ভাষা রীতি আছে - সাধু ও চলিত। সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যম হিসাবে কোন্ রীতির ভাষা বিবেচ্য, তা আলোচনা সাপেক্ষ। গনমাধ্যমের ভাষার সরলতা, যথাযথতা, স্বচ্ছতা ও প্রত্যক্ষ ভাষণ অত্যাবশ্যক। গনমাধ্যমের ভাষার মধ্যে শব্দচয়ন, বাক্য-বিন্যাস, উচ্চারণবিধি, ব্যাকরণবিধি, বানানবিধি – এই সকল বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। গনমাধ্যমের আরেকটি আঙ্গিক হিসাবে অনুবাদমূলক সংবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের পাশাপাশি ভাবানুবাদও একটি অন্যতম মাধ্যম।

সর্বোপরি, ভাষা পরিবর্তনশীল বিষয়। সময়ের নিয়মে এবং মানুষের প্রয়োজনে নতুন ভাষার গঠন, সংযোজন অথবা পুরানো ভাষার অবলুপ্তি হতে থাকে। সমসাময়িক সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ভাষা ও গনমাধ্যম উভয়কেই প্রভাবিত করে।

সূচক: ভাষা, শব্দ, বাক্য, বানান বিধি, গণমাধ্যম, ফিলোসফিক্যাল ইনভেস্টিগেশন্স্।

ভূমিকা :

ভাষা ভাবের বাহন। মানুষের সহজাত প্রবণতাই হল একের ভাব অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে একইভাবে ভাবিত করা। এভাবে ভাবপ্রকাশ ও ভাব বিনিময়ের তাগিদে বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির মাধ্যমে ভাষার উদ্ভব। অবশ্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি মাত্রই ভাষা নয়। ধ্বনি ভাব প্রকাশের উপযোগী, অর্থপূর্ণ হলে তবে সেই সার্থক ধ্বনি সমষ্টি হয় ভাষা।

হ্বিটগেইস্টাইন তাঁর 'ফিলোসফিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস্' এ বলেছেন ভাষা হল চলমান নদীর মতো। নদী যেমন তার স্রোতধারায় অনেককিছু বয়ে নিয়ে চলে আবার অনেক কিছু রেখেও যায়। তেমান ভাষাতেও চলমান নদীর মতোই কালের বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন কিছু যুক্ত হয় আবার পুরনো অনেক কিছু বিলুপ্ত হয়। এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় হল গণমাধ্যম বা সম্প্রচারের ভাষা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাষার তুল্যমূল্য অলোচনা করাই যুক্তিসংগত হলেও নাতিদীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের মুখবন্ধটুকু করে ওঠাও দুস্কর। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে অনুসন্ধান সীমিত রাখা হচ্ছে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা পরিচয় এর কথা বলতেই হয়, তিনি সেখানে বলেছেন-

> "মুখে মুখে প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষায় কলাকৌশলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষ দল বাঁধা জীব। একলার ব্যবহারে সে আটপৌরে, দলের ব্যবহারে সুসজ্জিত। সকলের সঙ্গে আচরণে মানুষের যে সৌজন্য সেই তার ব্যবহারের শিল্পকার্য। তাতে যত্নপূর্বক বাছাই সাজাই আছে। সর্বজনীন ব্যবহারে ব্যক্তিগত খেয়ালের যথেচ্ছাচার নিন্দনীয়। এক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে ও অন্যকে একটা চিরন্তন আদর্শের দ্বারা সম্মান দেয়।"

গণমাধ্যমের ভাষা: সাধু ও চলিত:

সংবাদমাধ্যম তথা গণমাধ্যমের ভাষা সেটাই হওয়া উচিত যা সর্বোচ্চ সংখ্যক উদ্দিষ্ট শ্রোতা, পাঠক ও দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারে। গণমাধ্যমের ভাষা হিসেবে বঙ্গে বাংলা ভাষাই অধিক ব্যাপৃত ও গ্রহণযোগ্য।

বাংলায় দুটো ভাষা রীতি আছে। একটি হচ্ছে সাধুভাষা। আর একটি মান্য চলিত রীতি। তাছাড়া আছে কথ্য ভাষা। এই কথ্য রীতি গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। তার কারণ কথ্যরীতিতে এক অঞ্চলের সঙ্গে আর এক অঞ্চলের পার্থক্য থাকে। পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় নানা জেলায় কথ্য ভাষা পৃথক। একই রূপ বাংলাদেশেও পরিলক্ষিত হয়। কাজেই কথ্য ভাষায় কোনো কিছু সম্প্রচারিত হলে বা প্রকাশিত হলে তা অনেক লোকের কাছে পৌঁছবে না।

যেমন, পশ্চিমবঙ্গে একটি আঞ্চলিক ভাষার শব্দ হল ডিংলি। যার অর্থ কুমড়ো। এই ডিংলি কথাটি এসেছে ডিঙি লাউ থেকে। এখন যদি সংবাদ প্রকাশের সময় কুমড়ো না বলে ডিংলি বলা হয় তাহলে শুধু সেই বিশেষ এলাকার মানুষ বুঝতে পারবেন, কিন্তু অন্য এলাকার জনগণের তা বোধগম্য হবে না।

সংবাদপত্রে তথা গণমাধ্যমে সাধুভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে নেতিবাচক উত্তরই মেলে। কারণ বর্তমানে এই ভাষার কথা বলার ক্ষেত্রে ব্যবহার খুবই কম। স্বল্প ব্যবহৃত ভাষা গণমাধ্যমের ভাষা হয়ে উঠতে পারে না। তাহলে গণমাধ্যমের ভাষা কেমন হবে? এর উত্তরে বেশিরভাগ ভাষাতাত্ত্বিক, সাংবাদিক ও অন্যান্য চিন্তাবিদ, সমাজতাত্ত্বিক মান্য চলিত ভাষার পক্ষেই রায় দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন, মান্য চলিত ভাষা বলতে কী বুঝব? এর উত্তরে বলা যায়, আমরা যে ভাষায় কথা বলি তার একটা মান্য চলিত রূপ রয়েছে। এটাকে মান্য চলিত রূপ বলা হয় এই কারণে যে, কোনও জেলায়, বা কোনও অঞ্চলের সাহিত্য রচনা থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয়ে লেখালিখি সাধারণত এই ভাষাতেই হয়ে থাকে। তাই এই ভাষাকে শুধু চলিত বলা চলে না।

কেউ বলতে পারেন মান্য বলতে কাদের দ্বারা মান্য? এর উত্তরে বলতে হয় এই মান্যতা সর্বজনের দ্বারা স্বীকৃত। যেমন কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকার ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের মান্য চলিত ভাষা বলা হয়।

আমরা জানি যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলা সংবাদপত্র, পত্রিকা, এমনকী সাহিত্য সাধুরীতির বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষাতেই লিখতেন। আর সব সংবাদপত্রে সাধু ভাষাই ব্যবহার করা হত। এখন কারও মনে হতেই পারে তা'হলে কেন সাধুভাষা ছেড়ে সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমকে মান্য চলিত ভাষার চৌহদ্দিতে পা রাখতে হল। এক্ষেত্রে আবার সেই বিখ্যাত দার্শনিক হুইটগেইস্টাইন-এর কথা এসে পড়ে। তিনি তাঁর 'ফিলোসফিক্যাল ইনভেষ্টিগেশনস' এ স্পষ্টই বলেছেন, ভাষা গড়ে ওঠে মানুষের প্রয়োজনে। ভাষার প্রয়োজনে মানুষ নয়। কাজেই ভাষার ব্যবহারও মানুষের স্বার্থেই হওয়া উচিত। তিনি আমাদের এও দেখিয়েছেন যে কেমন করে কালের নিয়মে ও মানুষের প্রয়োজনে ভাষা পরিবর্তিত হয়, কীভাবে ভাষার অপ্রয়োজনীয় অংশ ভাষা থেকে আপন নিয়মে বিলুপ্ত হয় এবং মানুষের প্রয়োজনে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য ভাষার মধ্যে যুক্ত হয়। যখন সাধুরীতিতে সব কিছু সম্প্রচার ও উপস্থাপন করা হত, তখন তা মানুষের কাছে প্রাসঙ্গিক ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভাষায় অনেক নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হতে থাকল, ফলত ভাষা একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করল, যার একটি গ্রহণযোগ্য রূপ হল মান্য চলিত ভাষা এবং একই সাথে সাধু ভাষা তার প্রয়োজনের ব্যাপকতা হারাল, তা অনেক ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে থাকল। আর যেহেতু গণমাধ্যমের লক্ষ্য হল সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছনো, তাই স্বাভাবিকভাবেই যে ভাষা বেশি সংখ্যক মানুষের দ্বারা অবগত সেই ভাষাকে কাজে লাগানোই এই মাধ্যমের লক্ষ্য হবে বা হওয়া উচিত।

সাহিত্যধর্মী ভাষা ও গণমাধ্যমের ভাষার পার্থক্য:

কেউ এখন আপত্তি করে বলতে পারেন, এখন আমরা যে সমস্ত সাহিত্য দেখতে পাই, তা তো অনেকেই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লেখা। তা'হলে সাহিত্যের ভাষার ক্ষেত্রে মান্য চলিত ভাষার কড়াকড়ি নেই কেন? কিন্তু একটু বিশেষভাবে দেখলে বোঝা যাবে ঐ সব সাহিত্যগুলি ঐ সকল অঞ্চলের মানুষের বা অন্য কোনো বিষয়ের প্রসঙ্গে লিখিত। আর সাহিত্যের কাজ শুধু ভাষা জ্ঞান দান করা নয়, তার মূল উদ্দেশ্যে হল পাঠকের মনে রসবোধ সৃষ্টি করা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সঞ্চার করা। অর্থাৎ সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে পাঠকের মনে দাগ কাটতে চায়। তাই স্বভাবতই সাহিত্যিক যে বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনের কথা লিখবেন তা ঐ অঞ্চলের চলিত ভাষাতে লিখলে তার প্রাঞ্জলতা অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া সবসময় সাহিত্যিক সকল পাঠকের কথা ভেবে সাহিত্য রচনা করেন না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পাঠক গোষ্ঠীর জন্যও সাহিত্যিককে সাহিত্যকর্ম সম্পাদন করতে দেখা যায়। কিন্তু সংবাদপত্র বা অন্যান্য গণমাধ্যমের কাজ হল কোনও সংবাদ সমস্ত পাঠকের কাছে সার্থক, অবিকৃত ও

প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করা। এক্ষেত্রে পাঠকের মনে রসবোধ জাগ্রত করার কোনও প্রয়োজন সাংবাদিকের নেই। কাজেই সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে সংবাদপত্রাদির ভাষার তুলনা করা ঠিক নয়। তাই সংবাদপত্রের ভাষা মান্য চলিত ভাষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে আবার আমাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা আমরা মান্য চলিত ভাষার ব্যাখ্যায় বলেছি যে, এই ভাষায় সাহিত্য কর্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু সব সাহিত্য কর্ম তো আর মান্য চলিত ভাষায় সম্পন্ন হয় না। তাছাড়া সাহিত্যিকের মান্য চলিতের সঙ্গে আবার সংবাদপত্র, দুরদর্শন ইত্যাদির মান্য চলিতের পার্থক্য আছে। কেননা সাহিত্যিক মান্য চলিত গদ্যরীতি ব্যবহার করলেও এক একজন সাহিত্যিক এক এক রকম কায়দায় লেখেন। কাজেই সাহিত্যিকের মান্য চলিত এবং সংবাদপত্রাদির মান্য চলিত ভাষাকে এক করে দেখলে চলবে না। তা'হলে এখন প্রশ্ন হল আমরা যে মান্য চলিতের কথা বলছি তার প্রকৃত রূপ কী? আর গণমাধ্যমই বা কোন মান্য চলিত ব্যবহার করবে? এক্ষেত্রে অনেকে রাজশেখর বসুর গদ্য সাহিত্যের ভাষাকে আদর্শ বলে মনে করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা মান্য চলিত ভাষা সংক্রান্ত সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয় না।

অনুবাদমূলক ভাষা:

এবার আসা যাক অনুবাদ বিষয়ক সংবাদ বা সম্প্রচারের কথায়। অনেক সময় আমাদের বিশেষ কোনও তথ্য বা সংবাদ অনুবাদ করে উপস্থাপন করতে হয়। সেক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। কেননা প্রত্যেকটা ভাষারই একটা নিজস্ব গঠন কাঠামো আছে। ফলে মূলভাষা থেকে অনুবাদের সময় সেই ভাষার দ্বারা প্রকাশিত ভাবটিকে অনেকক্ষেত্রে পুরোপুরি উপস্থাপন করা যায় না। যেমন, ইংরাজিতে বক্তা এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করল যার অর্থ দ্ব্যর্থবোধক এখন সমস্যা হল বাংলায় অনুবাদ করবার সময় এক্ষেত্রে কী করণীয়। এক্ষেত্রে প্রথমে পুরো বাক্যটিকে বুঝে নিয়ে তারপর তাকে অনুবাদ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে ভাবানুবাদের উপরই জোর দিতে হবে।

অন্যান্য সকল ভাষার মত বাংলা ভাষারও একটা নিজস্ব বাগ্‌ধারা আছে। কাজেই অন্য কোনও ভাষার থেকে যখন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হয় তখন বাংলা ভাষার বাগ্‌ধারার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে আমি ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদের কথা আলোচনা করছি। প্রথমে দেখতে হবে যে, ইংরেজি ফ্রেজগুলির বা শব্দগুচ্ছের কোনও বাংলা আছে কিনা। যদি না থাকে তা'হলে ঐ ভাব বা আইডিয়াটা বহন করছে এমন একটা শব্দ বাংলায় পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে।

তবে অনেকক্ষেত্রে ইংরেজির বাংলা প্রতিশব্দ পেলেও তা ব্যবহার করা যায় না। কেননা সেক্ষেত্রে তা বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ ভাবটা তুলে ধরতে পারে না। কাজেই সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি বা পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী নির্দিষ্ট বাংলা বাগ্‌ধারা বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। যেমন ইংরেজিতে লেখা আছে 'neighbouring area'- যার বাংলা

অনুবাদ হবে প্রতিবেশী পাড়া। কিন্তু বাংলাতে প্রতিবেশী পাড়া কথাটির তেমন চল নেই বা শুনতেও তেমন ভালো লাগে না। তাই এক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে 'পাশের পাড়া'। অনুরূপভাবে কুম্ভিরাশ্রু- র পরিবর্তে মায়াকান্না, আবার করমর্দনের পরিবর্তে 'হাতের নাগালে' ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করাই ভাল। কেননা এগুলি বেশি সংখ্যক মানুষ সহজেই বুঝতে পারে।

সম্প্রচারের ভাষাটি মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসতে হয়। বাগাড়ম্বর অর্থাৎ গালভারী কঠিন শব্দ ব্যবহার না করে সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করতে হবে। অলংকারের ব্যবহার যথা সম্ভব পরিহার করতে হবে। সাধু ও চলিতের যেন মিশ্রণ না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা সম্প্রচারের ভাষা সহজ, সরল ও সকলের বোধগম্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সম্বোধন মূলক ভাষা:

গণমাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় যাদের উদ্দেশ্যে সেটি সম্প্রচারিত হচ্ছে অর্থাৎ দর্শকদেরকে সঞ্চালকের পক্ষ থেকে একটা অভিনন্দন বার্তা জানানোর প্রয়োজন আছে। কেননা এর মাধ্যমে সঞ্চালক প্রথমেই অনেকখানি দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে এবং দর্শকও অনুষ্ঠানটিকে এবং সঞ্চালককে একান্ত নিজের বলে অনুভব করতে পারে।

এখন প্রশ্ন হল ঐ সম্বোধনের ভাষাটা কেমন হলে তা বেশি সংখ্যক দর্শকের মনকে স্পর্শ করতে পারে এবং তা অনেক বেশি আন্তরিক হতে পারে? এক্ষেত্রে সাধারণত দুটি মূল বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে, সঠিক শব্দ চয়ন ও আন্তরিকতা। যাঁরা শব্দ প্রেক্ষণের মধ্যে একটা আন্তরিকতা মিশিয়ে দিতে পারেন তাঁরা অনেক বেশি দর্শকের হৃদয় মাঝে স্থান দখল করতে সক্ষম হন।

১৯২৭ সালের রবীন্দ্র পরিমন্ডলের মধ্যে আকাশবাণীর সূচনা। সেই কারণে দীর্ঘদিন ধরে ব্রাহ্মশালীনতা বোধের অবশিষ্টাংশকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বাঙালি মধ্যবিত্ত। হালকাচালে কথাবার্তাকে একটু খাটো করেই দেখা হয়েছিল, সে সময় সারল্যের পরিবর্তে একটা গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা থেকেছে বহুকাল। সেই কারণে প্রথম দিকে এই সম্বোধনের ব্যাপারটি এত বেশি গুরুত্ব পায়নি। সেক্ষেত্রে সঞ্চালক সরাসরি কোন প্রকার সম্বোধন ছাড়াই অনুষ্ঠানসূচীতে প্রবেশ করতেন। সেক্ষেত্রে সাধারণত ভাব বাচ্যের ব্যবহার বেশি দেখা যেত। এর ফলে ভাষার গাম্ভীর্য যেমন বজায় থাকত, তেমনি তৈরি হত দর্শকের সঙ্গে সঞ্চালকের দূরত্ব। তবে এফ এম (ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেশন) আসার পর এই দূরত্ব অনেকখানি কমেছে। এখানে সঞ্চালকরা দর্শকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ব্যাপারটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন।

এবার আসা যাক এই সম্বোধন সংক্রান্ত নানা সমস্যার আলোচনায়। কৃষি সংক্রান্ত আলোচনায় সঞ্চালকদের সাধারণত শ্রোতাদের কৃষকভাই বলে সম্বোধন করতে শোনা যায়। কিন্তু এখানে সমস্যা হল ভাই বলে কি তিনি সকল কৃষকের দাদার ভূমিকা নিতে চান? তাহলে যে সমস্ত কৃষক ঐ সঞ্চালকের থেকে বয়সে বড় বা বয়স্ক ব্যক্তিরা

তার কাছে ভাই হিসাবে পরিগণিত হয়। আবার অনেকে নিজেদের ভাই সম্বোধনে হেয় বোধ করেন।

ভাই-এর পরিবর্তে বন্ধু শব্দটি ব্যবহার করলে শব্দটি একটু মার্জিত হয় বটে। কিন্তু অনেকে আছেন যারা নিজেদের বন্ধু সম্বোধনে অস্বস্তি বোধ করেন।

তাছাড়া আরও সমস্যা এই যে এখানে কৃষকদেরকেই সম্বোধন করা হচ্ছে, তাহলে যারা কৃষক নন বা কোনও ভাবেই কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত নন, তাদের কি এগুলি শোনা অনধিকার শ্রবণ? অনেকে মনে করেন এক্ষেত্রে সমস্ত শ্রোতাবৃন্দ বলেই সম্বোধন করাই যুক্তিযুক্ত। কেননা তা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে গ্রহণীয় হবে। কেননা প্রচার মাধ্যম কখনো কিছু সংখ্যক মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার জন্য অন্যান্য মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন' না বলে বলেছিলেন- 'ব্রাদারস্ আন্ড সিস্টারস অফ আমেরিকা'। আর তাতে অনেকক্ষণ হাততালি পড়েছিল। আসলে শব্দ ব্যবহারের ভিন্নতাতেই নয়, তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে আন্তরিকতাতেও। সুতরাং গণমাধ্যমের ভাষাকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলবার জন্য, আরও আন্তরিক করে তোলবার জন্য, শ্রোতার হৃদয়কে ছোঁয়ার জন্য প্রতিনিয়ত পাল্টাতে হবে। এটাই স্বাভাবিক। এখানে ভাষার রক্ষণশীলতাকে বজায় রাখতে হবে এমন নয়। তবে তা যেন উদার হতে গিয়ে অশালীন বা অশোভন না হয়ে পড়ে তাও খেয়াল রাখতে হবে।

বাক্য নির্মাণ কাঠামো:

ভাষার বৃহত্তম একক বাক্য। কতগুলো উপাদান নিয়ে তৈরী হয় বাক্য। বাক্য নানা রকমের হতে পারে। গঠনের দিক থেকে সরল, যৌগিক, জটিল ও মিশ্র। ভাবের দিক থেকে সদর্থক, নঞর্থক, প্রশ্নবাচক ইত্যাদি। এছাড়া আছে সাপেক্ষ বাক্য। এই যে এত রকমের বাক্য তৈরী হয় তার প্রত্যেকটিরই আলাদা রকম উদ্দেশ্য থাকে। সম্প্রচারের ক্ষেত্রে কী ধরণের বাক্য ব্যবহার করা উচিত? এর উত্তরে অনেকে বলেছেন সম্প্রচারের ভাষায় বাক্যকে হতে হবে সুষ্ঠু ও অমোঘ জ্ঞাপনের উপযোগী। বেশি বড় আর কুটিল বাক্য এড়িয়ে চলাই সেদিক থেকে বাঞ্ছনীয়। আর প্রত্যক্ষবাচন যে একান্তই জরুরি তা তো বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এসব কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে, সবসময় বাক্য ছোটই হবে, প্রত্যক্ষ হবে, একেবারে নির্মেদ ও হালকা হবে এমন কোন প্রস্তাব করা হচ্ছে না।

এখানে মূলত যে কথাটা বলতে চাওয়া হচ্ছে তা এই যে, বাক্য তৈরীর নিয়মগুলিকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ না করে আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন, কর্তৃবাচ্যের বাক্য কর্মবাচ্য বা ভাব বাচ্যের বাক্যের চাইতে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট, এবং সেই কারণে অনেক বেশি কার্যকর ও

ফলপ্রসূ। কথাটা সাধারণভাবে ঠিক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যকে যেমন করেই হোক পরিহার করে চলতে হবে। সুতরাং বলতে হয়, বাক্যের গঠনটা আসল কথা নয়। প্রধান কথা বক্তার স্বচ্ছতা ও অমোঘতা, যাতে তা সাধিত হয় তেমন বাক্যই ব্যবহার করতে হবে।

শব্দ নির্বাচন ও শব্দ চয়ন:

শব্দ নির্বাচনের সময় শব্দের অর্থবহতা ও যথাযথতার দিকে যেমন খেয়াল রাখতে হয়, তেমনি খেয়াল রাখতে হয় শব্দের বিশুদ্ধতার দিকে। একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা ভাষায় বহু অসিদ্ধ শব্দ বহুল ব্যবহারের ফলে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, প্রচলিত হয়েছে। মর্মান্তিক, জাগ্রত, বিশৃঙ্খলা, পার্বত্য, আন্তর্জাতিক, ইতিমধ্যে, সক্ষম, প্রভৃতি অজস্র এমন শব্দ বাংলায় প্রচলিত হয়েছে যেগুলো সংস্কৃত ব্যকরণ মতে অসিদ্ধ। কিন্তু এই শব্দগুলি পরিহার করে চলব এমন প্রতিজ্ঞা অসম্ভব ও অযৌক্তিক। কিন্তু এই যুক্তিতে নিশ্চয়ই যেকোন অসিদ্ধ শব্দকেই প্রয়োগযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যাবে না। যেমন স্বাধীনোত্তর শব্দটি অনেকেই নির্বিচারে ব্যবহার করেন। কিন্তু শব্দটি হল স্বাধীনতা উত্তর বা স্বাধীনতোত্তর। আরও শব্দ আছে যেগুলি সঠিক নয়। যেমন, কচিবান, ন্যূনাধিক্য, সন্তান সম্ভবা, যুদ্ধমান, অধীতব্য, শব্দশুদ্ধি, দোষস্খালন, সর্বশ্রী, প্রিয়পাত্র প্রভৃতি শব্দ কোনও মতেই ব্যবহার করা উচিত নয়। ন্যূন বিশেষণ, তার সঙ্গে বিশেষ্য আধিক্য যুক্ত করা যায় না। আসলে কথাটি হবে ন্যূনাধিক।

আরও বলা যায়, ক্ষালন ও স্খালন এর মধ্যে বিভ্রান্তির জন্যই একটির জায়গায় অন্যটি ব্যবহৃত হয়। ক্ষালন অর্থ ধুয়ে ফেলা, ধুয়ে পরিষ্কার বা নির্মল করা, স্খালন অর্থ বিচ্যুত করানো, চ্যুত করানো। কাজেই সংবাদমাধ্যম ও অন্যান্য সম্প্রচার মাধ্যমকে দোষক্ষালন, পাপক্ষালন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে হবে, দোষস্খালন বা পাপস্খালন কদাপি নয়। যেমন, পেশন শব্দের অর্থ সুন্দর, মনোহর। কিন্তু তা পেশী শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পেশীবহুল হয়ে পড়েছে। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমকে এরকম শব্দ পরিহার করতে হবে।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষাকেন্দ্রিক শব্দের উৎপত্তি:

অনেক ভাষাবিদ মনে করছেন ইদানীংকালে প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার এক ক্ষেত্রের শব্দ অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দরুন বাংলা ভাষার মর্যাদা নষ্ট হচ্ছে। যেমন, হাঙ্গামা শব্দটা গন্ডগোল বোঝাতে সাধারণত ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞাপন মাধ্যমগুলি কেনাকাটা অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করছেন, তারা পুজো হাঙ্গামা শব্দটি ব্যবহার করছেন। এর অর্থ হল পুজোর কেনা কাটা। 'ধামাকা 'বলতে আবার সাধারণত কোন বিশাল আওয়াজ বা বিস্ফোরক পদার্থের বিস্ফোরণকে বুঝি। কিন্তু এই শব্দটি বিভিন্ন বিজ্ঞাপনমাধ্যম কেনা কাটার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ বা ছাড় অর্থে ব্যবহার করছেন।

কিন্তু কোনও শব্দ যদি ভাষার মধ্যে লোক ব্যবহার দ্বারা জায়গা নিতে পারে এবং তাতে যদি মানুষের বুঝতে কোন অসুবিধা না হয়, তাহলে তা ভাষার মর্যাদা নষ্ট করে বলে অনেকে মনে করেন না। কেননা আগেই বলা হয়েছে ভাষা পরিবর্তনশীল, তা লোক ব্যবহার দ্বারা নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। কাজেই ভাষাকে রাখতে হবে উন্মুক্ত, তাকে নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলা চলবে না। সেই কারণে সংবাদ পত্রে বা অন্যান্য গণমাধ্যমে এই সব ভাষার ব্যবহার ভাষার বৈচিত্র্যকে বৃদ্ধি করে। তাতে তার জাত যায় না। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে কোনও অশালীন ভাষা যেন ব্যবহৃত না হয়।

বানান বিধি:

গণমাধ্যমের ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে বানানের প্রসঙ্গ। বাংলা ভাষার প্রয়োগ-অপ্রয়োগের কোন আলোচনাই বানানকে এড়িয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। সকলেই বানানের সমস্ত নিয়ম মেনে লিখবেন বা বানানের সমস্ত নিয়ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহল থাকবেন এ আশা নিতান্তই দুরাশা। কিন্তু যে বানান শুদ্ধ বা সংগত বা গৃহীত সেই বানান যে কোন লেখককেই জেনে নিতে হবে। যেমন, হিরন্ময় শব্দ মূর্ধন্য ণ এবং মৃন্ময় শব্দে দন্ত্য ন লিখতে হয়। আর এটুকু সচেতনতা বা বিচক্ষণতা একজন লেখকের কাছে সাধারন পাঠক আশা করতেই পারে।

গণমাধ্যম তথা সম্প্রচার ও সংবাদ মাধ্যমে ব্যবহারের জন্য সুভাষ ভট্টাচার্য যে বানান বিধি তৈরি করে দিয়েছেন তার থেকে বিশেষ কতগুলি আলোচনা করা হল। যেমন-

অকস্মাৎ (স্ম নয়)

অকালপক্ব (ক্ক নয়)

অতীশ (তি নয়)

অদ্যাবধি (দ্য নয়)

অধস্তন (অধঃস্তন নয়)

অধ্যবসায় (অধ্যা নয়)

উচ্চারণ রীতি:

ভাষার সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে আসবে উচ্চারণের কথা। তাই গণমাধ্যমের ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটবে না। বিশিষ্ট ভাষাবিদ সুভাষ ভট্টাচার্যকে অনুসরণ করে এখানে চারটি ক্ষেত্রকে উপস্থাপন করা হল

প্রথমত, একান্ন, একাত্তর, একাহারী প্রভৃতি শব্দে বাঙালির মান্য উচ্চারণে প্রথম সিলেবলে অ্যা পাই, এ নয় - অ্যাকান্নো, অ্যাকাত্তোর, অ্যাকাহারি।

কিন্তু আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে পাওয়া যায় একান্ন, একাত্তোর, একাহারি। বুঝে নেওয়া দরকার যে ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মে এসব ক্ষেত্রে অ্যা হওয়ারই কথা।

দ্বিতীয়ত, যুক্তব্যঞ্জনের বিশেষ মান্য প্রবণতা আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে মানা হয় না। অশ্লীল, শ্লেষ, শ্লথ এসব শব্দের মান্য উচ্চারণ তালব্য-শ দিয়ে নয়, দন্ত্য-স দিয়ে, অসসিল, স্লেশ, স্লথো। কিন্তু আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে শুনি অশ্‌লিল, শ্লেশ।

তৃতীয়ত, পদ্ম, বিস্ময় এই সব শব্দের অনুনাসিকতা মান্য ভাষার উচ্চারণে অনেকটাই ক্ষীণ। প্রায় অশ্রুত। কিন্তু আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে অনুনাসিকতা খুবই স্পষ্ট- পদ্‌দোঁ, বিশ্‌শয়।

চতুর্থত, মান্য বাংলায় শব্দের শেষে বদ্ধ সিলেবলে মহাপ্রান ধ্বনি থাকলে তার মহাপ্রাণতা একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, আধফোটা কে আদ্‌ফোটা শোনায়।

আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে মহাপ্রাণতাকে রক্ষার জেরালো চেষ্টা দেখা যায়। এর থেকে বোঝা যায়, আনুষ্ঠানিক ভাষার উচ্চারণ কিছুটা বানানানুগ বা বানান প্রভাবিত, যাকে ভাষাতত্ত্বের ভাষায় spelling pronounciation বলা হয়। উচ্চারণ প্রতিক্রিয়ার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যতি বা বিরাম। বাংলা বাক্যে একটি স্বাভাবিক বিরামের ব্যাপার আছে, তা হল শ্বাস যতি। এক সময় মনে করা হত যে, কথ্য ভাষায় বাক্যের মধ্যে বিরামের জায়গাতেই খানিক বিরতি দেওয়া হবে। কিন্তু ক্রমশ দেখা যাচ্ছে যে, শ্বাস যতিকে আর একমাত্র যতি বলে মনে করা হচ্ছে না। বাংলা বাক্য বলার সময় বাক্যের গঠন ও অর্থ অনুযায়ীও বিরাম বা যতি দিতে হয়। আর তাহলেই বাক্যের অর্থ সহজবোধ্য হবে, জ্ঞাপন হবে অব্যর্থ, অমোঘ। বাক্য যত দীর্ঘ হবে ততই বাক্যের জায়গায় জায়গায় স্বল্প বিরাম দরকার হয়ে পড়ে। যেকোনও ঘোষক বা সঞ্চালকের পক্ষে এই বিরামের জায়গাগুলোকে সঠিক বুঝে নিয়ে বাক্য বলা অভ্যাস করতে হবে।

শব্দেই জব্দ, শব্দই স্তব্ধ। যেকোনও শব্দের অর্থ, বানান, সঠিক প্রয়োগ ও উচ্চারণ নিয়ে অনেক সময় কাজের মাঝে থমকে যেতে হয়। এই সংকটে অভিধানের বিকল্প নেই। তাই অবশ্যই সাংবাদিক থেকে শুরু করে সকল সম্প্রচারককে অভিধানমুখী হতে হবে। তবেই গড়ে উঠবে একটি সঠিক ভাষা প্রয়োগ রীতি।

উপসংহার:

আনুষ্ঠানিক ভাষার ব্যবহারকারীদের অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে ভাষার ব্যবহার যেন আন্তরিক হয়, প্রত্যক্ষ হয়। জ্ঞাপন সুষ্ঠু ও যথাযথ হওয়া একান্তই প্রয়োজন। তাঁদের ব্যবহৃত ভাষাকে গম্ভীর বা ভারী হতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে অযথা লঘুতাও কাম্য নয়। লিখিত ভাষাকে হতে হবে শুদ্ধ, ঋজু ও স্বচ্ছ। বাচনকে হতে হবে স্পষ্ট, যথাযথ ও আন্তরিক। সমস্ত রকম অস্বচ্ছতা, বাহুল্য ও লঘুতা এড়িয়ে চলাই সুবিবেচনার কাজ।

সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের মতো শক্তিশালী আর কি হতে পারে? শিক্ষা বঞ্চিত মানুষের মধ্যে এদের প্রভাব সুবিপুল। অথচ এরাই যদি ক্রমাগত ভুল শেখায়, ভুল দেখায় আর ভুল শোনায়, তাহলে কু-শিক্ষার বাড়বাড়ন্ত রুখবে কে? ভুল বাংলা আর কদর্য বাংলার অগ্রগতি রোধ করা এক সুকঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু

আমরাও নিশ্চয় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব না। বাংলা ভাষার প্রতি যেহেতু দায় আমাদের সকলেরই রয়েছে, তাই আর কিছু না হোক অন্তত এই চিৎকৃত ও লিখিত ভুলের বিরুদ্ধে আমাদেরও সরব হতে হবে। 'ভুল বাংলার তরঙ্গ রোধিবে কে' বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা চলবে না।

ভাষা আমাদের জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে, তাই অনিবার্যভাবে তা জীবন যাপনের দ্বারা পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তনটাই স্বাভাবিক, না হলে আমাদের ভাষা ব্যবহারের সাথে সাথে জীবনও থেমে থাকবে, উন্নতি সম্ভব হবে না সভ্যতা ও সংস্কৃতিরিও। তাই গণমাধ্যমের ভাষা পরিবর্তিত হবে এতে অস্বভাবিকতার কিছু নেই। এই পরিবর্তনকে মুক্ত মনে মেনে নিতে না পারলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। তবে, তার সঙ্গে এদিকেও খেয়াল রাখতে হবে যে, পরিবর্তনের নামে আমরা যেন ভাষার ব্যবহার নিয়ে যথেচ্ছাচার না করি। একটা সাধারণ শিষ্টতা ও মান্যতা বজায় রাখা দরকার। আর এ বিষয়ে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে গণমাধ্যমকেই।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কেমন লিখব কেমন বলব, ভবেশ দাশ (সম্পা), সম্প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গি, গাঙচিল, কোলকাতা, ২০০৭।
২। চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, সম্প্রচারে সম্বোধন, ভবেশ দাশ (সম্পা), সম্প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গি, গাঙচিল, কোলকাতা, ২০০৭।
৩। চৌধুরী, কালিপদ, বাংলা ব্যকরণ ও রচনা প্রসঙ্গ, বানী সংসদ, কোলকাতা ২০০৪।
৪। ভট্টাচার্য, সুভাষ, সম্প্রচারের ভাষাদর্শ, ভবেশ দাশ (সম্পা), সম্প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গি, গাঙচিল, কোলকাতা, ২০০৭।
৫। বন্দোপাধ্যায়, মিহির, সম্প্রচারের এখন তখন, ভবেশ দাশ (সম্পা), সম্প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গি, গাঙচিল, কোলকাতা, ২০০৭।
৬। বন্দোপাধ্যায়, সন্দীপ, সম্প্রচারঃ কথা আর বার্তা, ভবেশ দাশ (সম্পা), সম্প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গি, গাঙচিল, কোলকাতা, ২০০৭।
৭। সরকার, পবিত্র, সাধারণ ভাষা ও সম্প্রচারের ভাষা, ভবেশ দাশ (সম্পা), সম্প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গি, গাঙচিল, কোলকাতা, ২০০৭।
৮। সরকার, প্রিয়ম্বদা, উত্তর - পর্বের ভিটগেনস্টাইন, ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশন্স্, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা ৭০০০১৩, ২০০৭।
৯। Bell,Allan,1997, Language Style and Audience Design; Copeland, Nicholas and Adam Jaworski (ed.),1997, Sociolinguistics, Hampshire London, MacMillan Press Ltd.
১০। Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations (Translated by G.E.M. Anscombe), Basil Blackwell Ltd., Oxford, UK, 1986.

ভারতের পরিবেশ আন্দোলন : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

বাগবুল সেখ
স্নাতকোত্তর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:- বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমগ্র পৃথিবীতে পরিবেশ কে সুস্থ রাখার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে যে নানারকম চিন্তাভাবনা চলছে ভারতবর্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। তাই শুধুমাত্র প্র্যাকটিক্যালি নয়, সাংবিধানিকভাবেও ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে (ধারা ৪৮ক) এবং মৌলিক কর্তব্যে (ধারা, ৫১ক) পরিবেশ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষামূলক বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে বিশেষ করে হায়ার স্টাডিজ যেমন কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পরিবেশ বিদ্যা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পরিবেশ আন্দোলন কি? তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? পরিবেশ দূষণের উৎস এবং উপাদান গুলি কি কি তারা সহজেই শিক্ষক মহাশয়দের মাধ্যমে অনুমেয় করতে পারছে এবং প্রত্যেকটি এলাকাতে তারা জনসচেতনতা মূলক প্রচার করছে। ফলতঃ ছোট বড় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষও পরিবেশ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করছে এবং ভারতবর্ষের যেকোনো অংশে পরিবেশের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রশাসন বা সরকার কোন জনবিরোধী অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে চাইলে জনগণ এবং বেসরকারি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। যেমন চিপকো আন্দোলন, সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন,নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ।
সব থেকে বড় কথা পরিবেশ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে ভারতের বৈচিত্রের মাঝে ঐক্যের রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে। এবং ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের বিরুদ্ধে আদিবাসী ও ভারতের অন্যান্য জাতি, সম্প্রদায় পথে নেমে দাবি আদায় করে আন্দোলন কারীরা ভারতের গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। আরো খুশির খবর ভারত সহ অন্যান্য দেশ গুলি মিলিত হয়ে নানা প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিবেশ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে পৃথিবীকে শান্ত ও সুন্দর রাখার যে প্রচেষ্টা তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

সূচক শব্দ:- পরিবেশ আন্দোলন, ভারত, আদিবাসী,সংবিধান, সরকার, প্রশাসন, গণতন্ত্র, সংগঠন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

ভূমিকা:- ভারতবর্ষে এজাবত যতগুলি সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে যেমন- পরিবেশ আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল পরিবেশ সমস্যা বিষয়ক

আন্দোলন। ১৯৭৪ সাল থেকে ৫ই জুন তারিখটিকে আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালন করি। এখন চলুন প্রথমেই আমরা জেনে নিই পরিবেশ আন্দোলন বলতে ঠিক কি বুঝি? পরিবেশ আন্দোলন হল পরিবেশের সমস্যা গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং সমস্যার সমাধানের যথাযথ চেষ্টা করা, পরিবেশ সংরক্ষণ করা, জীব বৈচিত্র গুলি রক্ষা করা ও পরিবেশের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন আন্দোলন করা হয় তাকে পরিবেশ আন্দোলন বলে। যেমন চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন প্রভৃতি।

চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক পরিবেশ আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি? পরিবেশ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো সমাজের সেই কাজগুলির বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। হোক সেটা ব্যক্তিগত স্তরে, গোষ্ঠীগত স্তরে, প্রশাসনিক স্তরে বা সরকারের যে কোন স্তরে, প্রতিরোধ বা জনমত গড়ে তুলতেই হবে। যেমন বিষ্ণোই আন্দোলন থেকে শুরু করে চিপকো, নর্মদা বাঁচাও, সাইলেন্ট ভ্যালি, বীজ বাঁচাও, প্রভৃতি আন্দোলন এর ক্ষেত্রে আমরা সেটা প্রত্যক্ষ করেছি।

বর্তমান ভারত তথা বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হল পরিবেশগত সমস্যা। বিগত ২ দশকে আমাদের দেশ তথা ভারতবর্ষেই জাতীয় স্তরে এবং স্থানীয় স্তরে মিলে প্রায় 100 টিরও বেশি পরিবেশ সম্পর্কিত সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং তাঁরা কাজ করছে। যদিও বেশিরভাগ সংগঠনগুলোই বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী ধরনের। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই পরিবেশ কেন্দ্রিক ধারণা গুলি মূলত পরিবেশ বিজ্ঞানী এবং সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলির পাঠ্য বইতেই চর্চিত হতে দেখা যেত, কিন্তু আজ সমস্যাটি এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে শুধুমাত্র পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বা স্কুল, কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক বা তাদের শ্রেণিকক্ষেই নয় সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে এটি একটি উদ্বেগের বিষয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলতঃ আজ সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি সমস্ত স্তরেই পরিবেশ সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে নানারকম চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। তাই সমাজের প্রত্যেকটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যাক্তি ও সুশীল সমাজ তাকিয়ে রয়েছে পরিবেশগত সমস্যা গুলির যাতে একটা স্থায়ী ও সুস্থ সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসে।

পরিবেশের অবক্ষয়, পরিবেশ দূষণের উৎস ও উপাদান:- পরিবেশের অবক্ষয় ও দূষণের উৎস দু ধরনের ১) প্রাকৃতিক উৎস ২) অপ্রাকৃতিক উৎস।

প্রাকৃতিক উৎস গুলি হল যেমন

★ ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সালফার ডাই অক্সাইড।

★ প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন যেমন- জলবায়ুর পরিবর্তন গ্রিন হাউস প্রভাব, ওজোন স্তরের বিনাশ।

★ জৈব পদার্থের পচনের ফলে সৃষ্ট মিথেন প্রভৃতি।

পরিবেশের অবক্ষয় ও দূষণের অপ্রাকৃতিক বা মানুষের তৈরি কারণগুলি হলো-

★ অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি হার।

★ সম্পদের অপচয় ও বিনাশ।

★ যুদ্ধ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ।

ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য:

- ভারতের পরিবেশ সম্পর্কিত সংগঠনগুলিকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায় শিক্ষামূলক, উন্নয়নমূলক, ও প্রতিরোধমূলক।
- রামচন্দ্র গুহ তাঁর 'Ideological trends in Indian environmentalism' শীর্ষক প্রবন্ধে চার ধরনের মতাদর্শগত ধারা উল্লেখ করেছেন ১) কট্টর গান্ধীবাদী ২) যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ৩) পরিবেশবাদী মার্কসবাদী এবং সর্বশেষ ৪)বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণবাদি।
- পশ্চিমী দেশের পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের একটা বড় পার্থক্য হল পশ্চিমীরা সবুজ সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, দূষণমুক্ত পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন করে আর ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো প্রধানত গ্রামের গরীব ও প্রান্তিক মানুষের রুজি রোজকারের সঙ্গে তাদের পরিবেশ আন্দোলনের সম্পর্ক।
- ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো পরিবেশ সমস্যাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। ফলতঃ এসব আন্দোলনগুলির বেশিরভাগই অরাজনৈতিক বেসরকারি সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে ভারতের পরিবেশ আন্দোলন গুলিতে মহিলাদের, বিশেষ করে দলিত,উপজাতি মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। (প্রণব কুমার দালাল,ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা ৩৭০,৩৭১,৩৭২)

পরিবেশ আন্দোলন:-

বিঞ্চোই আন্দোলন:- এরা রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে বসবাস করেন। বিষ্ণই সম্প্রদায়ের মানুষেরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, এদের গুরু হলেন গুরু জম্ভেশ্বর। তারা তাদের প্রতিদিনের জীবনচর্চায় প্রায় 29 টি নিয়ম মেনে চলেন তার মধ্যে একটি হলো 'সজীব গাছ কাটবে না' পরিবেশকে রক্ষা করবে। এ সম্প্রদায়ের মানুষজন পরিবেশকে প্রাথমিক জীবনের অঙ্গ বলে মনে করেন। আজ পর্যন্ত যত পরিবেশ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তাদের মধ্যে বিষ্ণই আন্দোলন অন্যতম গুরুত্ব লাভ করেছে কারণ এই আন্দোলন ছিল কয়েকশো বছর (১৭৩০) আগে ঘটে যাওয়া বিঞ্চোই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষদের একটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এবং সেটা গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন, পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন। পরিবেশে গাছের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে সেটা এ সম্প্রদায়ের লোকেরা খুব ভালোভাবে জানত। তাই তাদের সম্প্রদায়ের গাছ কাটা বারণ করা হয়েছিল। অমৃতা দেবী নামে এক স্থানীয় মহিলা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজেও একজন সাধারন

নারীর এই নেতৃত্ব কোন প্রতিবাদ ছাড়াই মেনে নিয়েছিল। ১৭৩০ এর এই বিষ্ণোই আন্দোলনে একটা অভূতপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল সেটা হল গাছকে বাঁচানোর জন্য প্রায় ৩৬৩ জন মানুষ জীবন বলিদান দিয়েছিল। যা খেজারলি হত্যাকাণ্ড ও বিষ্ণোই আন্দোলন নামে পরিচিত। এবং এই বিষয়ে আন্দোলন থেকেই ভারতের আগামী দিনের বা ভবিষ্যতের পরিবেশ আন্দোলন মজবুত হয়েছে এবং চিপকো আন্দোলনের মতো অন্যান্য আন্দোলন গুলি কেউ প্রভাবিত করেছে। তাই এই আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। (ডক্টর অনীশ চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশ,পৃষ্ঠা-৩৯২)

চিপকো আন্দোলন:- এই চিপকো কথাটির অর্থ 'জড়িয়ে ধরা বা চেপে ধরা'। ঠিকাদাররা যখন গাছ কাটতে আসে গ্রামের মহিলারা গাছকে জড়িয়ে ধরত এবং এর ফলে ঠিকাদাররা গাছ কাটতে পারতো না। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে মূলত ১৯৭৩ সালে উত্তরাখণ্ডের গাড়ওয়াল জেলার মন্ডল গ্রামে গাছ কাটার বিরুদ্ধে যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এটি চিপকো আন্দোলন নামে পরিচিত।

এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীরা। এই অঞ্চলের গরীব গ্রামবাসীরা বনাঞ্চল থেকে ফলমূল, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার করতেন। এটা ছিল তাদের বংশানুক্রমিক অধিকার। কিন্তু রাজ্য সরকারের বনদপ্তর তা হরণ করে এবং তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে তারা আর ফলমূল বা কাঠ সংগ্রহ করতে পারবে না।অন্যদিকে ঠিকাদারদের গাছ কাটতে ঢালা অনুমতি দেয়া হয়। এহেনও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ চিপকো আন্দোলন গড়ে ওঠে। গ্রামের মহিলা সহ ওই এলাকার সমস্ত গরিব মানুষজন এই আন্দোলনে শামিল হন।

প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলনকে সুসংঘটিত করার ব্যাপারে সর্বপ্রথম উদ্যোগ নেয় 'দাসহলি গ্রাম স্বরাজ্য মন্ডল' নামে একটি সংগঠন। উত্তরাখণ্ডের গোপেশ্বর গ্রামের অন্তর্গত কিছু সমাজ সেবিকা নিয়ে গঠিত হয়। তারা গ্রামের মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন এবং ক্রমশ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে অগ্রসর হন। সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য বনদপ্তর গোপেশ্বর গ্রাম থেকে খানিকটা দূরবর্তী কেদারনাথের কাছাকাছি হাঁটা রংপুর বনাঞ্চলে গাছ কাটার ব্যাপারে উদ্যোগী হলে এই খবর শোনার পর গ্রামবাসীরা ওখানে হাজির হন। রাতের পর রাত জেগে পাহারা দিতে থাকেন এবং আন্দোলন পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সুন্দরলাল বহুগুনা, চুন্দ্রিকা প্রসাদ ভাট, সরলা বেন, মীরা বেন, গৌরী দেবী, প্রমুখেরা।

চিপকো আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে পেনধা বনাঞ্চলে ঠিকাদারেরা গাছ কাটার উদ্যোগ নিলে গ্রামবাসীরা বলতে গেলে কার্যত মহিলারা গাছকে জড়িয়ে ধরে রাখেন এবং শেষমেশ ঠিকাদারদের পিছু হঠতে বাধ্য করেন। ১৯৭৭ তে আবারও গাছ কাটা কে কেন্দ্র করে হিমালয়ের শান্ত পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। ঠিকাদাররা

কখনো সশস্ত্র পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আবার কখনো স্থানীয় গরিব মানুষদের প্রলোভন দেখিয়ে আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের কাছে তাদের নতী স্বীকার করতে হয়। আন্দোলনের দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতা সুন্দরলাল ও চন্দ্রিকা প্রসাদ কে পুলিশ গ্রেপ্তার পর্যন্ত করে কিন্তু তারা বন্দি অবস্থায় ৬৪ দিন অনশন, ধর্মঘট চালিয়ে সরকারকে প্রায় নতজানু করে ফেলেন।

চিপকো আন্দোলনের গুরুত্ব বা সাফল্য অনেকটাই তার কারণ এই আন্দোলনের চাপে সরকারকে বহু ক্ষেত্রেই পিছু হটতে হয়েছিল। অলকানন্দের অববাহিকা অঞ্চলে বেশ কিছু পাথর তোলার খাত ছিল আন্দোলনকারীরা তাদের আন্দোলনের চাপে ওইসব খাদ বন্ধ করে দেন এবং সেখানে বৃক্ষরোপণ করেন এছাড়াও চিপকো আন্দোলনকারীরা তাদের বিভিন্ন দাবি গুলি সরকারকে মানতে বাধ্য করে এবং আন্দোলনকারীদের চোখে সরকারের কিছু অমানবিক কাজকর্মকে তারা রুখে দিতেও সমর্থ হয়। এই চিপকো আন্দোলন শুধুমাত্র রাজ্য সরকার নয়, কেন্দ্র সরকারের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলত কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হিমালয়ের অরণ্যভূমিতে গাছ কাটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এবং এই আন্দোলন থেকে দক্ষিণ ভারতের 'আপ্পিকো' আন্দোলন ভীষণভাবে প্রভাবিত হয় আর বিশ্বের দরবারে এই আন্দোলন বিভিন্ন অংশের পরিবেশবিদ দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।(প্রণব কুমার দালাল, ভারতের সংবিধান ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা-৩৭৩)

আপ্পিকো আন্দোলন:- ভারতের পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক যে সমস্ত আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের আপ্পিকো আন্দোলন এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই আন্দোলনের মুখ্য নেতৃত্ব ছিলেন পান্ডুরং হেগড়ে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কর্ণাটক রাজ্যের উত্তর কন্নারা জেলায় গাড়োয়ালের চিপকো আন্দোলনের ন্যায় একটি আন্দোলন ঘটেছিল যেটা আপ্পিকো আন্দোলন নামে পরিচিত। আপ্পিকো আন্দোলনের কারণ হলো এই উত্তর কান্নারা জেলায় যে সমস্ত কাগজ শিল্প, প্লাইউড উৎপাদন শিল্প, করাত কল ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে তার জন্য যে কাঁচামালের যোগান সেগুলি আসে ওই নিকটবর্তী অরণ্যের বনভূমি থেকে যার ফলে অরণ্যের আয়তন বা পরিমাণ অনেকখানি হ্রাস পায়। ১৯৫০ সালে যেখানে এই জেলার অরণ্যের আয়তন ছিল ৮০%। ১৯৮০ সালে পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২৫ শতাংশ মতো।ফলতঃ দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসীরা বনভূমি থেকে তাদের যে রুটি রুজি আসতো তা হারাতে থাকে। এছাড়াও নদীতে বড় বড় বাঁধ দিয়ে বাঁধের পিছনে জলাশয় নির্মাণের ফলেও প্রচুর জমি ও বনভূমির ক্ষতি হয়। এই অবস্থা থেকে স্থানীয় পরিবেশকে রক্ষা করতে পান্ডুরং হেগড়ের নেতৃত্বে গাছ লাগানোর কাজ শুরু হয়। কাঠের পরিবর্তে জ্বালানির জন্য গ্রামে গোবর গ্যাস প্লান্ট বসানো হয় বনভূমি অঞ্চলে নানা রকম গাছের বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ

সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অনেক সচেতনতা শিবির করা হয়। (ডক্টর অনিস চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশ, পৃষ্ঠা- ৩৯৩)

সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্ট:- স্বাধীন ভারতের একটি প্রধান বা অন্যতম পরিবেশ আন্দোলন হল সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন। ইংরেজি 'সাইলেন্ট' কথার মানে নিস্তব্ধ এবং 'ভ্যালি' কথার অর্থ হলো উপত্যকা। পালক্কর জেলার পাহাড়ি অরণ্যসংকুল এই পরিবেশ এত শান্ত ও নিশ্চুপ যে একে সাইলেন্ট ভ্যালি বলে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরালার পালককর জেলায় ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যে ঢাকা একটি উপত্যকার নাম হলো সাইলেন্ট ভ্যালি। এর আয়তন ৮৫৯২ হেক্টর। সাইলেন্ট ভ্যালি অঞ্চল বিখ্যাত হল নিবিড় ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যের জন্য।

বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে সমৃদ্ধ শালী সাইলেন্ট ভ্যালি অঞ্চলে কুন্তী নদীর উপরে কেরালা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পক্ষ থেকে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে যায়। কারণ এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে সাইলেন্ট ভ্যালি বৃষ্টি অরণ্যের প্রায় ৮০০ হেক্টর অর্থাৎ মোট বনভূমির প্রায় ১০% এলাকা বাঁধের জলাধার, রাস্তাঘাট, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা,বাড়িঘর তৈরি করতে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই সাইলেন্ট ভ্যালি অঞ্চলের বৃষ্টি অরণ্যকে বাঁচানোর লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে কেরালার একটা বামপন্থী স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞান সংস্থা 'কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের' উদ্যোগে এই আন্দোলন শুরু হয়। যা ভারতে প্রথম ব্যাপক ও সংগঠিত পরিবেশ আন্দোলন। এই প্রসঙ্গেই বলে রাখা ভালো যে W.W.F এবং বনদপ্তরের গবেষকরা সাইলেন্ট ভ্যালিতে জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসেবে এলাকাটিকে ঘোষণার কথা বলেন পরবর্তীকালে অবশ্য সাইলেন্ট ভ্যালি প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এখানে নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ রয়েছে যাকে ইউনিস্কো 2012 সালে 'ওয়ার্লড হেরিটেজ সাইট' এর স্বীকৃতি দিয়েছে।(ডক্টর অনিশ চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশ,পৃষ্ঠা- ৩৯৪)

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন:- নর্মদা হল ভারত তথা মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের একটি অন্যতম প্রধান নদী। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত অমরকন্টক এর মহাকাল পর্বত থেকে এই নদীর উৎপত্তি। নদীটির স্রোতধারা কখনো অরণ্য সংকুল পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আবার কখনো শস্য শ্যামল সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আর এই নদীর পাহাড়ি উপত্যকা অঞ্চলে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস।

ভারত সরকার এই উপত্যকা অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সালে 'নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্প' গ্রহণ করে। এবং ঠিক করা হয় যে এই নদীর উপর ৩০ টি বড় আকারের, ১৮৫ টি মাঝারি আকারে ও তিন হাজারটি ছোট আকারের বাঁধ নির্মাণ করা হবে। সবচেয়ে বড় বাঁধ হবে দুটি। একটা গুজরাটে এবং আরেকটি মধ্যপ্রদেশে। প্রথমটির নাম হবে 'সর্দার সরবর', এবং দ্বিতীয়টির নাম 'নর্মদা সাগর'। এর জন্য মোট অর্থ ব্যয় করা হবে ২৫ হাজার কোটি টাকা। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে ওই অঞ্চলে ব্যাপক প্রতিবাদ ও জনবিক্ষোভ দেখা যায়। এবং এই প্রকল্পের

বিরুদ্ধে যে আন্দোলনটি দানা বাঁধে তা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন নামে পরিচিত । এই আন্দোলনের মুখ্য নেতৃত্বে আছেন মেধা পাটেকার এবং বাবা আমতে। আন্দোলনকারীরা মনে করেন এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তা হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরিকল্পিত পরিবেশ ধ্বংসের একটা প্রকল্প। যার ফলে জলমগ্ন হবে ২৪৩ টি গ্রাম এবং তিন লক্ষ হেক্টর বনভূমি। নদীর অববাহিকায় পলিজমবে। বর্ষায় বাঁধে অতিরিক্ত জল নদীর দুকূল ছাপিয়ে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হবে। বহু প্রাণী অবলুপ্ত হবে, উদ্ভিদের ধ্বংস হবে, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং অন্তত ১০ লক্ষ মানুষ তাদের জমি বাড়ি এবং জীবিকার উপায় হারাবেন। বনসম্পদ ধ্বংস হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আদিবাসীরা তার কারণ বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে বেঁচে থাকে। সব মিলিয়ে পরিবেশ ও বনদপ্তর এর সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে সরদার প্রকল্প রূপায়িত হলে ক্ষতির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৮ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। আর নর্মদা সাগর প্রকল্পের জন্য ক্ষতির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকা। এই নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পটির জন্য বিশ্ব ব্যাংক প্রথমে ৩৫৪৫ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করে কিন্তু নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কর্মীরা তাদের আন্দোলনের ঝাজ যে পরিমাণে বাড়িয়ে ছিল সেই চাপে বিশ্ব ব্যাংক লাভ ক্ষতির উভয় দিকগুলি পর্যালোচনা করে বিশ্ব ব্যাংক ‘পুনরীক্ষণ কমিশনের’ সুপারিশ অনুযায়ী 1993 সালে এপ্রিল মাসে এই প্রকল্পে ঋণ মঞ্জুরের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়। বিশ্বব্যাংক তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেও সরকার তাদের অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বলপূর্বক উচ্ছেদ অভিযান ও বৃক্ষছেদন করে তাদের প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে প্রতিবাদের আন্দোলন ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। শেষমেষ পরিস্থিতির চাপে ১৯৯৭ সালে ভারত সরকার সাময়িকভাবে প্রকল্পের কাজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সরকার পক্ষ থেকে বলা হয় যে নর্মদা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাবটিকে বিবেচনা করা হবে। তবে এসবের মধ্য থেকে আন্দোলন কিন্তু থেমে থাকে নি কারণ আন্দোলনকারীদের মতে এই প্রকল্প রূপায়িত হলে একদিকে যেমন গরিব, খেটে খাওয়া, কৃষক, আদিবাসী ও বিভিন্ন উপজাতি ভুক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা অসুবিধায় পড়বেন তেমনি অন্যদিকে এই প্রকল্প থেকে ধনি চাষি ও গৃহ নির্মাণ ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাই ধনী চাষীরা এই প্রকল্পের পক্ষে পাল্টা আন্দোলনে নেমে পড়েছেন। তাই বর্তমানে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন কেবল নিছক ই একটা পরিবেশ আন্দোলনের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই এটা অনেকাংশে রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। প্রথমদিকে প্রশাসন এই বিপুল কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কোনরকম ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত করেনি পরে আন্দোলনের চাপে তা দিতে সম্মত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সর্দার সরোবর বাঁধের উচ্চতা স্থির হয়েছে ১৩৮ মিটার। (প্রণব কুমার দালাল, ভারতের সংবিধান ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা, ৩৭৪)

এছাড়াও আরো কিছু পরিবেশ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে যেমন **বীজ বাঁচাও আন্দোলন**। ১৯৮৯ সালে বিজয় জার ধারীর নেতৃত্বে গারোয়াল হিমালয়ে চাম্বার কাছে নাগনী গ্রামে।

আবার **তেহরি বাঁধ বিতর্ক** প্রভৃতি।

পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি:- আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা এখন অনেকটাই পরিবেশগত সমস্যাগুলোর উপর নির্ভরশীল। নদীর জল, অঞ্চল ভাগাভাগি, বন ও সমুদ্রের সম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তনের মত পরিবেশগত সমস্যা গুলি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে বা এই বিষয়গুলো নিয়ে রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। যেমন ১৯৮০-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ইরান ও ইরাকের মধ্যে জলাশয়ের নিয়ন্ত্রণের ইস্যু কে কেন্দ্র করে দীর্ঘ যুদ্ধ। পার্বত্য কাশ্মীর উপত্যকা কে কেন্দ্র করে ভারত, পাকিস্তানের মধ্যে ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে বিবাদ রয়ে গেছে। প্রায় ৭ দশক ধরে এলাকা দখল কে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের দ্বন্দ্ব এখনো বর্তমান। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ইস্যুতেই নয় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশ্নেও উত্তর, দক্ষিণ বিভাজন রয়েছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং জলবায়ু পরিবর্তন যদি কার্যকর ভাবে মোকাবেলা না করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে বিশ্বে আরো সংঘাতের পরিমান বাড়বে যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। (অনিক চ্যাটার্জী, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস টুডে, পেজ-৩২০)

উপসংহার:-

উপসংহারের এটা বলা যেতে পারে যে ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত আন্দোলন গুলি হল দেশের দরিদ্র, প্রান্তদেশীয় মানুষজনের অস্তিত্ব ও জীবন রক্ষার তীব্র সংগ্রাম। আমরা জানি ভারত একটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। আর সেই গণতন্ত্রের কিছুটা সাফল্য বা বিস্তৃতি পরিবেশ আন্দোলনের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করা গেছে, যার ফলেই প্রান্তিক সাধারণ জনগণ বিভিন্ন সেক্টরে সরকার বা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলে সরকারের কাছে তাদের দাবিদাওয়া গুলি তুলে ধরতে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। গণতন্ত্রের মানে যে কেবলমাত্র নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোট দেওয়ায় নয় তা বোঝা গেছে। পরিবেশ আন্দোলনকারীরা জনগণকে শক্তিশালী করার জন্য প্রান্তিক মানুষ, দলিত, আদিবাসী,নারী,কৃষক,শ্রমিক, নাগরিক সমাজ সুশীল সমাজ নির্বিশেষে সবাইকে যেভাবে একত্রিত করে অংশগ্রহণ করাতে পেরেছে তাতে ভারতের বহু বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে অর্থাৎ ঐক্য ও মেলবন্ধন গড়ে উঠেছে। আন্দোলনের চাপেই হোক আর জনগণের সচেতনতা থেকেই হোক ভারত কিন্তু পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেছে। যেমন ১৯৯৭ সালে কিয়েটো প্রটোকল(গ্রীন হাউস গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস করা), ১৯৮৭ সালে মন্ট্রিল প্রোটোকল (ওজোন স্তরের সুরক্ষা ও ওজনবিনাশী রাসায়নিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা ও নিষিদ্ধ করা), ১৯৯২ সালে

কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি(জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ জীব বৈচিত্রের সুস্থায়ী উন্নয়ন প্রভৃতি), প্যারিস সমঝোতা প্রভৃতি।

সাধুবাদ জানাই আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ কে সুস্থ রাখতে পরিবেশ দূষণের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বিভিন্ন উৎস গুলি বিনাশের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি গুলি সম্পন্ন এবং কার্যকরী করার চেষ্টা করেছে। আমরা আশা রাখবো একদিন পরিবেশ দূষণ প্রায় সিংহভাগ কমে যাবে এবং পৃথিবী আবার তার শান্ত রূপ ফিরে পাবে। অবশ্য তার জন্য গণআন্দোলন, গণসচেতনতার পথগুলো ভুলে গেলে চলবে না। আর ২০২৪ এর এপ্রিলের মাসে যখন আমি এই পরিবেশ আন্দোলন নিয়ে লিখছি তখন আমার মাথার উপর তাপমাত্রা ৪৩° পার কোথাও ৪৪ ডিগ্রি ৪৫ ডিগ্রি। ভারত তথা বিশ্বের সর্বত্রই প্রায় একই ছবি। তাই আগামী দিন যাতে আমাদের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে না পড়তে হয় তার জন্য সবাইকে একসাথে মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্যসূত্র :

(১) প্রণব কুমার দালাল (২০২০), ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩ ।

(২) ডক্টর অনীশ চট্টোপাধ্যায়, (মে ২০২২), পরিবেশ, টি ডি পাবলিকেশনস প্রা: লি:, কলকাতা ৭০০০১৪ ।

(৩) চন্ডীদাস মুখার্জি (২০২৩), সমাজ ও রাজনীতি পত্রিকা, এভেনেল প্রেস।

(৪) অনাদিকুমার মহাপাত্র, রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, SUHRID PUBLICATION, কলকাতা, ২০০৮।

(৫) ড: তারকনাথ খাঁ, পরিবেশ বিজ্ঞান, কলকাতা বি.এম পাবলিকেশন, ২০০৯ ।

(৬) জার্নাল অফ ডেভলপিং সোসাইটিজ (জুন, ২০১৫), ৩১(২):২৪৯-২৮০ অরুণ কুমার নায়ক।

(৭) M Laxmikant, Indian polity,২০১৮, McGraw Hill Education (India) Private Limited, Chennai.

(৮) Aneek Chatterjee, international relations today, published by Pearson India education service Pvt. Ltd. ২০১৮.

(৯) ResearchGatehttps://www.researchgate.net › 279...(পিডিএফ) ভারতে পরিবেশগত আন্দোলন

অবিভক্ত বাংলায় রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের আদি পর্ব : ১৯৪০র দশক - একটি মূল্যায়ন

চিরঞ্জীব কোনার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, হরিপাল, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ : উনিশ শতকের নবজাগরণের আলোয় শিক্ষিত হয়ে অবিভক্ত বাংলার মধ্যবিত্তদের মধ্যে সবথেকে বেশ রাজনৈতিক সচেতন অংশ হিসেবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা শোষিত, নিপিড়িত মানুষদের ঐক্যবদ্ধকরণ এবং নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে প্রথম লড়াইয়ের ময়দানে নামে বিজি প্রেসের কর্মচারীরা, সরকার তাদের কোন দাবী না মানলে লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয় এবং শেষপর্যন্ত ১৯৪৬ সালে সরকার কিছুটা নতি স্বীকার করলেও সম্পূর্ণ দাবী মানেননি। বিজি প্রেসের কর্মচারীদের এই লড়াইতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যান্য কয়েকটি দপ্তরের কর্মচারীরাও তাদের দাবীদাওয়া ও বঞ্চনার জন্য আন্দোলন শুরু করে। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। যুদ্ধ মিটে যাওয়ার অজুহাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার ৮০০ কর্মীকে বরখাস্তের নোটিশ দেয়। স্বভাবতই ফায়ার ব্রিগেড অ্যাসোশিয়েশন গঠিত হয়ে এই বরখাস্তের বিরুদ্ধে স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু করে, প্রতিটি ফায়ার স্টেশনে ধর্মমট শুরু হয় এবং টানা দশদিন ধর্মঘট হয়, শেষপর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার পর এই ধর্মঘট প্রত্যাহত হয়, কিন্তু সরকারে প্রতিক্রিয়াশীলতা চলতেই থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অবিভক্ত বাংলার প্রথম সর্ববঙ্গীয় সমিতি ছিল মিনিস্টেরিয়াল অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, এই সংগঠনের নেতৃত্ব রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনকে মজবুত করতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব দেন। যদিও স্বাধীনতার আগে তা বিশেষ কার্যকর হয়নি।

১৯৪৬র ডিসেম্বরে যখন দেশভাগ নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা সহ মধ্যবিও সাধারণ মানুষ ভয়ঙ্কর আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৩২ সালে রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটি এবং ১৯৩৭ সালে চ্যাপম্যান কমিটি কর্মচারীদের বেতন সংকোচন করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কর্মচারীদের সামান্য কিছু আর্থিক সুবিধা দিলেও পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে ১৯৪৬র দাঙ্গায় বাংলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হলে ১৯৪৪ সালে চালু হওয়া রেশনিং ব্যবস্থা সাধারণ মানুষদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ জোরদার করে শুরু করে, কিন্তু অদ্ভুতভাবে সরকার এই দপ্তরের কর্মচারীদের ওপর ছাঁটাইয়ের খাঁড়া নামিয়ে আনে, তবে সমিতির লাগাতার বিক্ষোভের জন্য এই ছাঁটাই কার্যকর হয়নি। সরকারের এইসব ভ্রান্ত পদক্ষেপের জন্যই আটটি সংগঠন ফেডারেশন গঠন করতে তৎপর হয় এবং ২১শে জুন ১৯৪৭

ফেডারেশনের প্রথম সমাবেশ হয়, সরকারের ভীতি প্রদর্শন স্বত্ত্বেও প্রচুর সংখ্যক কর্মচারী সমাবেশে হাজির হয়। এরপর দেশ স্বাধীন হলেও সরকারি কর্মচারীদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি ফলে আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

মূলশব্দগুচ্ছঃ - নবজাগরণ, অ্যাসোসিয়েশন, রিট্রেঞ্চমেন্ট, ফেডারেশন।

সূচনাঃ- ১৯৫০ সালে বাংলায় শ্রমিক সংগঠন ও ধর্মঘটের সূচনা হলেও বাংলার মধ্যবিত্তদের প্রকৃত সংগঠিত হওয়া এবং আন্দোলনের জন্মলগ্ন কিন্তু ১৯৪০ এর দশক। এই সময় বাংলার পরিস্থিতি ছিল একটু আলাদা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব বাংলায় তেমন না পড়লেও দানা খাদ্যসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্কট এবং ১৯৪৩-এ বাংলার দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলে। তাছাড়া উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ফলে শিক্ষিত বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী উপলব্ধি করে এই পরিস্থিতির জন্য একমাত্র দায়ী ব্রিটিশ সরকার।

আন্দোলনের বিস্তারঃ যাই হোক বাংলার মধ্যবিত্তদের মধ্যে সবথেকে রাজনৈতিক সচেতন অংশ হিসাবে সরকারী কর্মচারীরা কিন্তু এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন শুরু করে। এক্ষেত্রে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেসের কর্মচারীরা ছিলেন পথিকৃৎ। নিম্ন মজুরী, কঠোর ও দীর্ঘ সময় ধরে শ্রম, প্রেস কর্তৃপক্ষের অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হলে তারা ১৯৪৪-এর নভেম্বর মাসে সাতদিন লাগাতার ধর্মঘট করেন। বাধ্য হয়ে লীগ সরকার দাবিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তার ভিত্তিতে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।[১] কিন্তু দু'বছর অতিক্রান্ত হলেও লীগ সরকার কোনও দাবি পূরণ করেনি। ফলে বাধ্য হয়ে ৮ই জানুয়ারি, ১৯৪৬ থেকে স্বল্পমূল্যে রেশন, বেতনবৃদ্ধি, চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদির দাবিতে বি.জি. প্রেসের শ্রমিকরা লাগাতার আন্দোলন শুরু করে।[২] কিন্তু সরকারের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে অত্যাচার শুরু হলে কর্মচারীরা মিলিত হয়ে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে সরকার পিস সিস্টেম তুলে দেওয়া, বর্ধিত বেতন, সস্তায় অন্যান্য সামগ্রী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। এদিকে ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৬ বেঙ্গল প্রভিনশিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভা থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রেস কর্মচারীদের ধর্মঘটের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন দেওয়া হয়। অবশেষে সরকারের প্রতিশ্রুতির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২৫শে এপ্রিল, ১৯৪৬ ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।[৩] কিন্তু সপ্তাহে ৪৫ ঘন্টার পরিবর্তে ৪০ ঘন্টা কাজের দাবি ছাড়া অন্য কোনও দাবি স্বীকৃত হয়নি, যার ফলে লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের ডা. মৈত্রেয়ী বসুর নেতৃত্বে সিভিল সাপ্লাইজ ড্রাইভার ও ক্লিনাররা সংগঠিত হতে শুরু করে কিন্তু দাবি-দাওয়ার পরিবর্তে যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে রেশন সামগ্রী সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা কমে আসার অজুহাতে ১৯৪৫ সালের

ডিসেম্বরে তাদের উপর সরাসরি ছাঁটাইয়ের আদেশ দিতে থাকে কর্তৃপক্ষ। ২৮শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় এর বিরুদ্ধে ধর্মঘট। কলকাতা ও শহরতলির সমস্ত রেশন সামগ্রী সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ২৯শে ডিসেম্বর ডা. মৈত্রেয়ী বসুর সাথে খাদ্য দপ্তরের কর্তৃপক্ষের আলোচনার ফলে ধর্মঘট স্থগিত হলেও,[৪] সরকার কোনও 'প্রতিশ্রুতি রাখেনি।

উপরন্ত সরকার ড্রাইভারদের মাসিক বেতন ৯০ টাকার পরিবর্তে ৭৫ টাকা করে এবং ওভারটাইম ও মাঝ্জী ভাতা বন্ধ করে দিলে সিভিল সাপ্লাইজ ড্রাইভারদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ শুরু হয়। যুদ্ধ মিটে যাওয়ার অজুহাতে বঙ্গীয় সরকার ১৯৪৬-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারি ফায়ার সার্ভিসের ৮০০ কর্মীকে বরখাস্তের নোটিশ দেয়। ১৯৪৪ থেকেই ফায়ার সার্ভিসে ছাঁটাই শুরু হলেও তা ছিল বিক্ষিপ্তভাবে। কিন্তু একসাথে বিশাল ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ শুরু করেন। ১৯৪৬-এর ৩রা মার্চ-কাশীপুর ফায়ার স্টেশনের এক সাধারণ সভায় নিকটবর্তী ২১টি ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা সমবেত হয়ে শপথ করেন অবিলম্বে এই নির্দেশ প্রত্যাহার করতে হবে, তা নাহলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।[৫] কিন্তু দমকলকর্মীরা শীঘ্রই উপলব্ধি করেন যে সমিতি ছাড়া সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন করা সম্ভব নয়, এই সচেতনতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল ফায়ার ব্রিগেড অ্যাসোসিয়েশন ১১ই মার্চ ১৯৪৬, সভাপতি-মৃণালকান্তি বসু, সম্পাদক-নুর মহম্মদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সমিতির কর্মীদের তৎকালিন রাজনৈতিক দল মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের সাথে যোগাযোগ থাকলেও বিশেষ কোনও রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। যাইহোক, সরকার তাদের অনমনীয় মনোভাব বজায় রাখে এবং তার প্রতিবাদে ১৪ই মার্চ ১৯৪৬, কলকাতার রাজপথে সহস্রাধিক দমকমকর্মী ছাঁটাইবিরোধী মিছিল করে।[৬] কিন্তু তাতেও সরকারের মনোভাব বিশেষ পরিবর্তিত না হওয়ায় ২০শে মার্চ ১৯৪৬, ১৪ দিনের সময় দিয়ে ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৬-এর মধ্যে সরকারকে ছাঁটাই বন্ধের সময়সীমা ধার্য করা হল। ৩০শে মার্চ, ১৯৪৬ দমকল কর্মীদের পূর্ণাঙ্গ এক সমিতি গঠিত হয় যার নাম হয় ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বেঙ্গল। এখানে পূর্বোক্ত বিষয় ছাড়াও বেতন কাটা বন্ধ, বেতনের হার বৃদ্ধি, প্রত্যেকের বেতনের সাথে ২২টাকা হারে মহার্ঘভাতা সংযুক্তিকরণের দাবি করা হয়।[৭] ধর্মঘটের নোটিশের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার দিন ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৬ শহিদ মিনারের নীচে দমকল কর্মীদের এক বিশাল সভা হয়। এস. এন. প্রামাণিকের নেতৃত্বে ধর্মঘটের নোটিশ অনুমোদিত হয়। বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনগুলিতে ধর্মঘটের প্রস্তুতি শুরু হয়। ইতিমধ্যে বাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে সরকার গঠনে উদ্যোগী হয় এবং ভাবী মুখ্যমন্ত্রী সোহরাবর্দী শ্রমিকদের দাবি মীমাংসার প্রতিশ্রুতি দিলে ১৪ই এপ্রিল ধর্মঘট স্থগিত রাখা হয়।[৮] কিন্তু গোপনে সরকার ৩০০ জনকে ছাঁটাইয়ের প্রস্তুতি নিলে শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে ২৩শে এপ্রিল থেকে লাগাতার ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। ২১ তারিখ কলকাতার পুলিশ কমিশনার হুকুম দিয়ে বলেন

কোনও কর্মী ধর্মঘট করলেই বরখাস্ত হবেন। এই হুমকির ফলে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী ফায়ার স্টেশনের কর্মচারীদের মধ্যে দাবানলের মত বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

২৩শে এপ্রিল সকালে সমস্ত ফায়ার স্টেশনগুলোকে পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। কিন্তু পুলিশের হুমকি ও চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে প্রত্যেক ফায়ার স্টেশন থেকে মিছিল এসে পৌঁছাল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, শুরু হল এক বিশাল সমাবেশ। সুবীর প্রামাণিকের সভাপতিত্ব করেন। সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন, ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এদের সমর্থনে এগিয়ে এল।[৯] এদিকে সকাল ৯টার সময় প্রধানমন্ত্রী সোহরাবদীর সাথে সাক্ষাতের জন্য ধর্মঘটীদের কাছে আহ্বান আসে। নূর মহম্মদের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আলোচনায় বসেন। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হয়। ২৬শে এপ্রিল পরবর্তী আলোচনার দিন ঠিক হয়। ধর্মঘটীদের সাহায্য করার জন্য অর্থ সংগ্রহ শুরু হয়। সাধারণ মানুষ তাতে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। ২৪ ও ২৫ তারিখ সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ হয় যথাক্রমে ২৫০ টাকা ও ৮০০ টাকা, সে যুগের পক্ষে এই সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্বপ্রথম প্রকৃত সর্ববঙ্গীয় সমিতি ছিল ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত মিনিস্টেরিয়াল অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন। ১৯৪৪-এর ১৮ই এপ্রিল আলিপুরে সমিতির যে সম্মেলন হয়েছিল তাতে সভাপতি আবুল হাসেম যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তার মূল বিষয় ছিল হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করা। এর থেকে স্পষ্ট হয় এই সমিতির নীতি ও আদর্শ ছিল কতটা উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল। কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি সহ অন্যান্য দাবি-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রেও ওরা সমান সক্রিয় ছিল। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসের সম্মেলনে এরা কনডাক্ট রুলের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কর্মচারীদের উন্নত বেতন, ভাতা প্রদানের দাবি সহ টেলিগ্রাম সরাসরি বাংলার গভর্নর ও ভারতের গভর্নর জেনারেলকে পাঠান এবং তার প্রতিলিপি দেওয়া হয় বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানে। টেলিগ্রামের শেষে লেখা হয় '... If no favourable response is forthcoming government within thirty first of March, 1946, a special session of the conterence be convened to consider the situation. '[১০] আরও একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, কলকাতায় অবস্থিত অন্যান্য সমিতিগুলির সাথে ঐকব্যদ্ধ হওয়াব প্রচেষ্টাও জরুরি। এই প্রস্তাবের বয়ান থেকেই বোঝা যায় প্রাক্-স্বাধীনতা প্রাক্কালে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে ফেডারেশন গঠনের প্রাথমিক চিন্তাভাবনা এই মিনিস্টেরিয়াল সমিতির থেকেই এসেছিল।

১৯৪৬-এর ডিসেম্বর মাসে দেশভাগ একদিকে যেমন নিশ্চিত হয়ে যায়, অন্যদিকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে প্রধানত আক্রান্ত হন মূল্যবৃদ্ধির তীব্রতা ও আর্থিক সঙ্কটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩২ সালে রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটি ৮০ টাকার ঊর্ধ্বে মোট বেতনের কর্মচারীদের বেতনের ১৫% শতাংশ হ্রাস করেছিল।[১১] ১৯৩৭ সালে চ্যাপম্যান কমিটি পুনরায় কর্মচারীদের আরও আর্থিক সুবিধা কমিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়া হলেও কর্মচারীদের আর্থিক দুরবস্থার কোনও সুরাহা হয়নি। উপরন্ত আরও মারাত্মক আকার নেয়।[১২] ১৯৪২ সালের সরকারী কর্মচারীদের জন্য এক প্রস্থ এবং ১৯৪৪ সালে আরও এক প্রস্থ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করলেও তাতে কোনও লাভ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে লীগ সরকার অর্চিবল্ড রোলান্ডের নেতৃত্বে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এনকোয়ারি কমিটি গঠন করে যার মূল দায়িত্ব ছিল কর্মচারীদের বেতন ভাতা সম্পর্কে সুপারিশ করা। এই কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তার গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রস্তাব হল- ১) ৩১৭ নম্বর প্যারাতে বলা হয়েছিল কোনও বেতন বাঁচার মত বেতনের থেকে কম হবে না। ২) উপযুক্ত পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।[১৩] রোলান্ড কমিটির এই ইতিবাচক সুপারিশ সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি শুধুমাত্র কলকাতা, হাওড়া, আলিপুরের রিজিওনাল স্তরের কর্মচারীদের জন্য মাসিক বেতনের ১০ শতাংশ বাড়িভাড়া হিসাবে মঞ্জুর করা হয়। এদিকে ১৯৪৬-এর ১০ই মে শ্রীনিবাস বরোদাচারিয়ার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য পে-কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হয়। এই সুপারিশ নিয়ে রেল, ডাক ও তার প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় এবং কোনটি ধর্মঘটের পর্যায়ে উন্নীত হয়। তবে এই সুপারিশের দ্বারা নিম্নতন কর্মচারীদের বেতন কিছুটা উন্নত হওয়ায় বাংলার লীগ সরকার বিব্রত হয় এবং তড়িঘড়ি ডেপুটি সেক্রেটারি প্রিংলের নেতৃত্বে রোল্যান্ড কমিটির রিপোর্ট রিভিউ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এদিকে ১৯৪০ এর লাহোর প্রস্তাব থেকেই কিন্তু ভারত ভাগের ভীতি দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের মধ্যে কাজ করেছিল। কোনও কোনও সমিতিগুলিতে বাংলায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় লীগ নেতাদের সভাপতি হিসাবে বরণ করতে থাকে। তবে হিন্দু মুসলিমদের গঠিত সমিতিগুলির ভেতরে কখনোই সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের কথা শোনা যায়নি। হিন্দু-মুসলিম শ্রমজীবিদের মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশি-বিদেশী মালিকশ্রেণী কোনঠাসা হয়ে পড়লেও মুসলিম লীগ ভারত ভাগের জন্য ১৯৪৬-এর ১৬ই আগষ্ট যে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'র আহ্বান জানায়,[১৪] তাতে বাংলার বিভিন্ন স্থান ও কলকাতায় শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী গণহত্যার ধ্বংসলীলা। দাঙ্গার এই সুযোগ নিয়ে মালিকশ্রেণী আক্রমণ শুরু করল আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর, ছাঁটাই ও বেতন কাটার আক্রমণ তীব্রতর হল। কলকাতার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কর্মীরা হাজিরা দিতে সক্ষম হলেন না, কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল হাসপাতালগুলো, কেবল দমকলকর্মীরা জীবন বিপন্ন করেও সাধারণ মানুষদের রক্ষা করেন। বন্দরের শ্রমিকরা নিজ নিজ মহল্লায় দলবদ্ধভাবে হিন্দু-মুসলিমকে রক্ষা করতে তৎপর হন। হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেললেও একথা সত্য কিন্তু শ্রমজীবীরা তাদের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য অল্প কালের মধ্যেই আন্দোলনের পথে ফিরতে বাধ্য হন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৪৪ সালের ৩১শে জানুয়ারি থেকে বাংলায় চালু হয় বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা। চাল, ডাল, তেল সহ সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং পোশাক-আশাক রেশনে পাওয়া যেত। বাংলার প্রায় সব জেলাতে কর্মীনিয়োগ চলতে থাকে। বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরাও এই দপ্তরে চাকরীতে যোগ দেন। কিন্তু এই দপ্তর চালু না হতেই অল্প কালের মধ্যে ছাঁটাইয়ের উদ্যোগ শুরু হয়। বাধ্য হয়ে কর্মীরা তাদের সংগঠন তৈরির কাজে উদ্যোগী হয়। ১৯৪৬-এর ৮ই আগষ্ট আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে গঠিত হয় ক্যালকাটা রেশনিং এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন।[১৫] ১৬ই আগষ্ট ভয়াবহ দাঙ্গায় ক্যালকাটা রেশনিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তা সত্ত্বেও রেশনিং সমিতি দমে যায়নি। ১৯৪৬ এর সেপ্টেম্বরে সমিতির নাম পরিবর্তিত হয়ে অল বেঙ্গল রেশনিং এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন হয়, জেলায় জেলায় সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। দাঙ্গাপীড়িত মানুষের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছতে কোনও ত্রুটি রাখেনি কর্মীরা। ১৯৪৬-এর নভেম্বরে দুর্গাপুরে রেশনিং ব্যবস্থা তুলে দিয়ে কর্মীদের ছাঁটাইয়ের চেষ্টা শুরু করে সরকার, তবে সমিতির লাগাতার বিক্ষোভের মুখে তা ফসপ্রসূ হয়নি।

১৯৪৭-এর ১০ই জানুয়ারি ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের ডি.এ. জি.পি.টি. কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে রেশনিং কর্মচারীরা ওই দিন ধর্মঘট করেন। পুলিশ ১৭জনকে গ্রেপ্তার করে এবং পড়ে ছেড়ে দেয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ২৯ মার্চ ১৯৪৭ এক সার্কুলার জারী করে বলে ১০ই জানুয়ারি যারা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন তাদের একদিনের বেতন কাটা যাবে এবং ঐ নির্দেশ সার্ভিস বইতে লিপিবদ্ধ হবে।[১৬] ১৯৪৭ সালের ৩০শে এপ্রিল দপ্তরের স্টোর বিভাগটি তুলে দেওয়ার জন্য প্রায় ৫০০ কর্মচারীদের ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তিতে সমিতির সংগঠন সম্পাদক জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী ও কার্য কমিটির সদস্য মুকুল দত্তকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।[১৭] এভাবে আক্রমণ চলতে থাকলে সারা রাজ্যে রেশনিং কর্মচারীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয় দপ্তরের হেড কোয়ার্টার সহ উপকণ্ঠ দপ্তরগুলোতে বিক্ষোভ সমাবেশ চলতে থাকে কিন্তু কর্মচারীদের উপর জুলুম বেড়েই চলল, সমিতির শক্তিশালী ঘাঁটি টাউন হলকে দুর্বল করার জন্য সংগঠক অমিতাভ দাসগুপ্ত ও কালীপদ নন্দীকে বদলী করা হয়, এছাড়া বন্ড নামে কার্যত এক মুচলেকাতে কর্মচারীদের দিয়ে সই করানো শুরু হয়। যাতে কর্মচারীকে ঘোষণা করতে হত যে, সে অস্থায়ী কর্মচারী তাকে ছাঁটাই করা হলে তিনি কোনও বিরোধীতা করবেন না। এদিকে রেশনিং ব্যবস্থা সরবরাহের জন্য সাপ্লাইজ উইং তৈরি হয়। এখানে যেসব কর্মচারীরা কাজ করত তাদের নিয়োগ হয়েছিল একস্ট্রা টেম্পোরারি প্রথায়। তাই এদের উপর ছাঁটাইয়ের খর্গ নেমে আসত যে কোনও অজুহাতে। রেশনিং কর্মচারীদের আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৪৬-এর নভেম্বরে এরা তৈরী করে অল বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাইজ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, সুনীল ব্যানার্জীকে অস্থায়ী সম্পাদক করা হয়।

১৯৪৭-এর ২১ ও ২২শে জুন কলকাতায় এদের ছাঁটাই বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সমস্ত বাংলা থেকে প্রায় ২০ হাজার হিন্দু-মুসলিম সিভিল সাপ্লাইজ কর্মচারীদের মধ্যে ২০০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিল। এদের মূল দাবি ছিল বিকল্প চাকরির ব্যবস্থা না করে কোনও ছাঁটাই করা যাবে না, বেতন কাঠামো সংশোধন করতে হবে প্রভৃতি। এই দাবিগুলি না মানলে ৩০শে জুলাই ১৯৪৭ পালিত হবে প্রতিবাদ কর্মসূচী। এই সম্মেলন ঘিরে কর্মীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। সম্মেলনের বাজেট ছিল ৩০০ টাকা কিন্তু সংগৃহীত হয় ১৫০০ টাকা, এর থেকে স্পষ্ট কর্মচারীরা আন্দোলনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। দমকল কর্মীরা স্বাধীনতার পূর্বে নতুন করে সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দমকল কর্মীরা 'ওয়ার সার্ভিস' এর কর্মী হিসাবে ঘোষিত হয়েছিলেন, ১৯৪৬-এর ৫ই জুন ভারতের এডভুচান্ট জেনারেল সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান যে, ওয়ার সার্ভিসের কর্মীদের ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ দেওয়া হবে ওয়ার গ্র্যাচুইটি, কিন্তু বাংলার সরকার ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীদের ঐ গ্র্যাচুইটি ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪২ থেকে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ পর্যন্ত দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। কর্মীদের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। ফলে প্রয়োজন হল বৃহত্তর সংগ্রামের, বি.পি.টি.ইউ.সি.-র আহ্বানে ২৯শে জুলাই, ১৯৪৬-এর সাধারণ ধর্মঘটের দিন দমকল কর্মীরাও মিছিল করে যোগ দেন, ময়দানের সমাবেশে। ইতিমধ্যে দাঙ্গা শুরু হলে দমকল কর্মীরা নিজ জীবন বিপন্ন করে তাদের দায়িত্ব পালনে অবিচল থাকেন।[১৮] কিন্তু সরকার নিশ্চুপ ছিল না, ফায়ার কর্মীদের ধর্মঘটের প্রতিশোধ নিতে ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে অক্সিলিয়ার ফায়ার ব্রিগেড ও ক্যালকাটা ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীদের উপর নেমে আসে ছাঁটাই, জরুরি প্রয়োজনে ছুটি দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। দাঙ্গার সময় ভালো কাজ করার জন্য ১০ দিনের অতিরিক্ত বেতনে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর তা আটকে রাখা হয়। এই অবস্থায় দমকল কর্মীরা সিদ্ধান্ত নেয় দ্বিতীয়বার লাগাতার ধর্মঘটের। ১৯৪৭-এর ১২ই জানুয়ারি তৈরি হয় অর্গানাইজিং কমিটি।[১৯] এই সময় সংগঠন যে দাবিগুলি রেখেছিল তা হল যথাযথ গ্র্যাচুইটি প্রদান, ছাঁটাই বন্ধ ও ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্বহাল প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু প্রভৃতি।

সরকার ধর্মঘট মোকাবিলা করার জন্য ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে বেআইনি ঘোষণা করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ প্রেস নোট জারি করে দমকল কর্মীদের কড়া ভাষায় সতর্ক করা হয়।[২০] কর্মীদের আলাদা আলাদা করে ডেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। পরিস্থিতি এমন হয় যে সাধারণ সম্পাদক নুর মহম্মদ পদত্যাগপত্র দিয়ে দেন। প্রশাসনিক হুমকি ছাড়াও ছিল মুসলিম লিগের রাজনৈতিক চাপ. এমনকি কংগ্রেস প্রভাবিত কর্মীরাও সমঝোতার পথে যান। ধর্মঘটের প্রয়াস কার্যত বানচাল হয়ে যায় ও কর্মীদের মধ্যে প্রবল হতাশা তৈরি হয়। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে পরিস্থিতি বদলে যায়। বি.পি.টি.ইউ.সি. অনুগত কর্মীরা দৃঢ়ভাবে সমিতির পাশে দাঁড়ান। নূর মহম্মদ

নিজের ভুল বুঝতে পেরে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে ফিরে আসেন এবং স্বপদে বহাল হন। দমকল কর্মীরা পূর্ণোদ্যমে সংগঠিত হওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এমতাবস্থায় দেশভাগের অনেক আগে থেকেই সমিতিগুলি যৌথ মঞ্চ বা ফেডারেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। দেশভাগের আগে ছাঁটাই ও নানা শ্রেণীর কর্মচারীর প্রতি সরকারের ভ্রান্ত নীতি সেই বাস্তবতাকে প্রমাণিত করেছিল এমতাবস্থায়। ৮টি সমিতি ৮ই জুন ১৯৪৭ আনুষ্ঠানিকভাবে ফেডারেশন গঠনের কথা ঘোষণা করে। ৮টি সমিতি হল- সেক্রেটারিয়েট অ্যাসোসিয়েশন, হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, মিনিস্টেরিয়াল অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, ডাইরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন রাইটার্স বিল্ডিংস মুসলিম এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, সেক্রেটারিয়েটস স্টেনোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশন, রাইটার্স বিল্ডিংস রেকর্ডস সাপ্লায়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট ইনফিরিয়ার সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। ২১শে জুন, ১৯৪৭- ফেডারেশনের সমাবেশে কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।[২১] লিগ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করার জন্য কংগ্রেস কর্মচারীদের এই ক্ষোভকে কাজে লাগাতে শুরু করে। কিন্তু কর্মচারীরা কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ থাকে কারণ তাদের নীতি ছিল সমঝোতাভিত্তিক। তা সত্ত্বেও প্রাক্-স্বাধীনতাকালীন আন্দোলনে ফেডারেশন গঠন ভবিষ্যতের আন্দোলনের দিশারী হয়ে থাকবে। দেশভাগ যত এগিয়ে আসে ততই সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা সরকারী পদের থেকে বেশি হতে থাকে।

পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য অর্থ দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি পুলিন ব্যানার্জী এক প্রেস নোর্ট জারি করে ঘোষণা করেন-"The services of the temporary employees under Government of Bengal will no longer be required with effect from 15th August 1947"।[২২] পুলিন ব্যানার্জীর এই নির্দেশ-কার্যকরি হলে সারা রাজ্যে প্রচুর কর্মচারী ছাঁটাইয়ের মুখে পড়তেন। কারণ দেশভাগের পূর্বে ওপার বাংলার কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা এপার বাংলার কর্মচারীদের তিনগুণ বেশি ছিল। বহু কর্মচারী ওপার বাংলায়-থেকে গেলেও একটা বড় অংশের হিন্দু কর্মচারীরা এপার বাংলায় চলে আসেন।[২৩] এই অবস্থায় স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বদিন ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭ রাইটার্সের ৩নং ও ৪নং ব্লকের মাঝামাঝি স্থানে যেখানে ডেপুটি সেক্রেটারি বসতেন সেখানে প্রায় দুহাজার কর্মচারী বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে ডেপুটি সেক্রেটারি তাদের হুমকি দেয়, এতে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে, তখন চিফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে ছাঁটাইয়ের নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন। স্বাধীনতা পূর্ব দিনের এই সাফল্য আগামী দিনের আন্দোলনকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে স্বাধীনতার পূর্বে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যে অবস্থা ছিল, স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কয়েক

দশকে তার বিন্দুমাত্র বদল হয়নি। দেশ স্বাধীন হলেও সরকারী কর্মচারীদের উপর অন্যায় অবিচাব ছিল অব্যাহত।

সূত্রনির্দেশ:

১. দ্য স্টেটসম্যান, ৭ই জানুয়ারি, ১৯৪৪।
২. স্বাধীনতা, ১২ই জানুয়ারি, ১৯৪৬।
৩. স্বাধীনতা ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৬।
৪. দ্য স্টেটসম্যান, ২রা জানুয়ারি, ১৯৪৬।
৫. স্বাধীনতা, ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৬ ।
৬. স্বাধীনতা, ১৫ই মার্চ, ১৯৪৬ ।
৭. ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বেঙ্গলের কার্যবিবরণী থেকে প্রাপ্ত।
৮. স্বাধীনতা, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৬ ।
৯. স্বাধীনতা, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৬ ।
১০. ১৯৪৬ সালের মিনিস্টেরিয়াল অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ সম্মেলনের কার্যবিবরণী থেকে সংগৃহীত।
১১. গভর্নমেন্ট অর্ডার নম্বর ২৪৩১ এফ বি তাং ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩২।
১২. গভর্নমেন্ট অর্ডার নম্বর ১৯৭৫ এফ বি তাং ২০শে এপ্রিল, ১৯৪২।
১৩. বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল।
১৪. গুপ্ত শুভাশীষ, অক্টোবর ২০১১, বাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের স্মরণীয় ও বরণীয় সংগ্রামের এক অধ্যায় (১৯৪০- এর দশক), এন. বি. এ. কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫০।
১৫. যুগান্তর, ৯ই আগষ্ট, ১৯৪৬ ।
১৬. স্বাধীনতা, ৩০শে মার্চ, ১৯৪৭ ।
১৭. যুগান্তর, ১লা মে, ১৯৪৭ ।
১৮. সংগ্রামী হাতিয়ার, বিশেষ সংখ্যা ২০০৬ পাতা ৪২ ।
১৯. একটি সাক্ষাৎকার শান্তিময় ভট্টাচার্য প্রাক্তন সহ সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, 15th July, 2013. কলকাতা, বিকেল ৫.৩০।
২০. স্বাধীনতা, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ ।
২১. একটি সাক্ষাৎকার তিমির মুখার্জী, প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ১৪ই জুলাই, ২০১৩, উত্তরপাড়া।
২২. দৈনিক বসুমতি, আনন্দবাজার, দ্য স্টেটসম্যান, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭।
২৩. গুপ্ত শুভাশীষ, Ibid, পাতা-৮০।

সুকুমার মাইতির উপন্যাসে বিষয় বৈচিত্র্য

সুরজিৎ মণ্ডল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সুকুমার মাইতির উপন্যাসকে ঊনিশ ও বিশ শতকের সমাজ-ইতিহাসের উত্থান পতনের প্রামাণ্য দলিল বলতে পারি। 'নদী মাটি প্রাণ', 'বধূ মাতা', 'দুই পুরুষ' ও 'উত্তর পুরুষ', প্রভৃতি উপন্যাসে ঐ দুই শতকের মেদিনীপুর তথা সমগ্র পশ্চিমবাংলার সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষি ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় (১৯৭৮ এর বন্যা ও ১৩৪৯ সালের সাইক্লোন) প্রভৃতির চিত্র ভিড় করে আছে। ঊনিশ ও বিশ শতকের কৃষকদের দূরাবস্থা, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, জমিদারী ও মহাজনী প্রথা বাল্যবিবাহ প্রথা প্রভৃতির কথা পাই।

'অদ্বৈত মন্ত্র', 'বাঁশ পাতার সংসার', 'অশ্রুলেখা' ও 'পদাতিক' প্রভৃতি উপন্যাসে রয়েছে বিংশ শতকের শেষ ও বর্তমান শতকের সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, উচ্চ শিক্ষিত যুব সমাজের বেকারত্ব, রাজনীতি(হিংসা, প্রতিহিংসা, স্বজন পোষণ, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব) সাধারণ মানুষের টাকায় ফুলে ফেঁপে ওঠা চিটফাণ্ড, সিণ্ডিকেট ব্যবসার রমরমা প্রভৃতি। এছাড়াও প্রায় সমস্ত উপন্যাস জুড়ে রয়েছে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বহু বিচিত্র উপাদান। অন্যদিকে সুকুমার মাইতির ছোট গল্পগুলির বিষয় বৈচিত্র্যও লক্ষ করার মতো। তাঁর দীর্ঘ জীবন-অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে গল্পগুলিতে। যেমন গ্রামীণ এবং শহুরে জীবন যাত্রার চিত্র, হিন্দু-মুসলিম জীবন যাত্রার চিত্র, কখনো ইতিহাসের প্রসঙ্গ কখনো শবর জনজাতির চিত্র উঠে এসেছে তাঁর গল্পে।

মূল আলোচনা:

কথাসাহিত্যিক সুকুমার মাইতির জন্ম বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না ব্লকে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে মে (বাংলা ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) অত্যন্ত নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবারে। মাধ্যমিক পাশের পর আর্থিক অনটনে পড়াশুনা বন্ধ করতে বাধ্য হন। পরের বছর থেকে গৃহশিক্ষকতা করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে আই.এ. এবং ১৯৬২ সালে বি.এ. পাশ করেন। পরের বছর কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বাংলায় স্পেশাল অনার্স পাশ করেন। তারপর একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহন করেন। ১৯৬৫ তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাশ করেন। ১৯৬৮ তে বিশ্বভারতী থেকে বি. এড. পাশ করার পর পুথি সাহিত্য গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। বিশ্বভারতীর পুথিশালাধ্যক্ষ ড. পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের কাছে। ১৯৭২ সালে নিজ সংগৃহীত পুথি সম্পাদনা করে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের তদান্তীন রামতনু লাহিড়ী আধ্যাপক ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্যের নির্দেশনায় গবেষণা কর্ম সুসম্পন্ন করে ডক্টর্‌য়াল উপাধি লাভ করেন। সাম্প্রতিকালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পেয়েছেন ডি. লিট. উপাধি। সমগ্র কর্মজীবন তিনি সাহিত্য চর্চা ও গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর সাহিত্য সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

উপন্যাস সমূহ - ১) 'দুই পুরুষ' ২) 'নদী মাটি প্রাণ' ৩) 'উত্তর পুরুষ' ৪) 'বধূ মাতা' ৫) 'অদ্বৈত মন্ত্র' ৬) 'বাঁশ পাতার সংসার' ৭) 'অশ্রুলেখা' ৮) 'পদাতিক'।

গল্প সংকলন- ১) পঞ্চাশটি ছোটগল্প ১ম পর্ব ২) পঞ্চাশটি ছোটগল্প ২য় পর্ব।

কাব্য-কবিতা – ১) 'প্রত্যয়' ২) 'শিলালিপি' ৩) 'এ জীবন সমুদ্র সফেন' ৪) 'শঙ্খ জীবন'।

ভ্রমণ কাহিনী – 'এ আমার দেশ ভারতবর্ষ' (৮ টি ভ্রমণ কাহিনীর সংকলন)। স্মৃতিকথা মূলক রচনা – 'মধুময় এ জীবন'।

সুকুমার মাইতির উপন্যাস ঊনিশ ও বিশ শতকের কৃষক জীবনের মর্মান্তিক ইতিহাস। 'নদী মাটি প্রাণ', 'দুই পুরুষ' ও 'উত্তর পুরুষ' উপন্যাস থেকে সেকথা জানতে পারি। কৃষক জীবনের দুর্দশা মহাজনের খাজানা মেটাতে গিয়ে ক্রমশ নিঃস্ব হওয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে উপন্যাস গুলিতে। এছাড়া রয়েছে ভাগ চাষের বিবরণ। উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে মনে পড়ে 'বঙ্গদেশের কৃষক'এর কথা। 'নদী মাটি প্রাণ' এ তিনি কৃষক জীবনের বাস্তব চিত্র এভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন-

"ভারতীয় কৃষক মানেই দরিদ্র কৃষক। কৃষকদের চেহারারই বা কি ছিরি। যেন জীর্ণ শীর্ণ এক একটা কঙ্কাল। হাঁ এক একটা কঙ্কালই তো বটে।"

কৃষিকাজই ছিল লেখকের পূর্ব পুরুষের জীবন সংগ্রামের মূল হাতিয়ার। লেখক নিজেও কিছু সময় জড়িয়ে পড়েছিলেন কৃষিকাজের সঙ্গে। 'দুই পুরুষ' উপন্যাসে উমেশচন্দ্র কে জমিদার নন্দী বাবুদের খাজনা মেটাতে মেটাতে হিমহিম খেতে হয়েছে। উমেশচন্দ্রকে প্রায়ই জমীদারের কাছ থেকে বাইড় করে ধান আনতে হত এবং সময়মত সুদসহ শোধ করতে হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমীদারই মহাজনের ভূমিকা নিত। তখন শাসন ও শোষণের মাত্রা আরও বেড়ে যেত। এই উপন্যাসে লেখক বলেছেন –

"মহাজন যখন ধান বাইড় দিয়েছিল তখন সাদা কাটরিজ কাগজে পঞ্চাননের দু'হাতের পুরো দশটা আঙ্গুলের টিপ ছাপ নিয়ে সাক্ষীর সই করিয়ে নিয়ে মাত্র চার কুড়ি ধান বাইড় দিয়েছিল। সেটা নাকি বেড়ে বেড়ে দেড় কুড়ি হয়েছিল"।

এই বাইড় ধান শোধ করতে না পারার কারণে বহু কৃষকের জমি গ্রাস করে মহাজন। উপন্যাস পাঠে আমরা সেকথা জানতে পারি। এছাড়াও 'বন্ধকী প্রথা'র কথাও জানা যায় বিভিন্ন উপন্যাসে।

সুকুমার মাইতির উপন্যাসে কৃষি জমি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা ও অজস্র আইনি নোটিশের উল্লেখ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই মামলা গুলি করেছে জমিদাররা

সাধারণ কৃষকদের বিরুদ্ধে। এছাড়াও ‘সূর্যাস্ত আইন’ ‘রাজসাক্ষী’ প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা যায়। এদিক থেকে ‘দুই পুরুষ’ ও ‘উত্তর পুরুষ’ উপন্যাস দুটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসে লেখক ‘সূর্যাস্ত আইন’ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন-

“নিলাম। সূর্যাস্ত আইনে নিলাম। কোর্ট কতৃক নিদ্ধারিত দিনে সমূহ খাজানা মেটাতে না পারলে পরে আর একটি নির্দিষ্ট দিনে ঐ সম্পত্তি ডাক নিলামে উঠবে। সেদিন ঐ সমূহ বিষয় সম্পত্তি যিনি সর্বোচ্চ মূল্যে ডাক দিয়ে আদালতে টাকা জমা দেবেন তাকেই দেওয়া হবে সম্পত্তির রায়তি সত্ত্ব।”

সুকুমার মাইতির বহু প্রশংসিত জনপ্রিয় উপন্যাস হল ‘নদী মাটি প্রাণ’। ষাটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসে ১৯৭৮এর মেদিনীপুর জেলাসহ সারা পশ্চিমবাংলার ভয়াবহ বন্যার মর্মান্তিক চিত্র বর্ণীত হয়েছে। লেখক নিজেও বন্যা কবলিত অসহায় মানুষদের একজন। তাই এই উপন্যাস কোনো কাল্পনিক আখ্যান নয় নিজেরই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতিচ্ছবি। ১৯৭৮ সাল সেপ্টেম্বর মাস। চারিদিকে শঙ্খধ্বনি। নদী বাঁধ ভেঙ্গে ময়নায় জল ঢুকতে শুরু করেছে। অসহায় মানুষের ছুটাছুটি হুড়োহুড়ি নদী বাঁধে একটু আশ্রয়ের জন্য।

“নদী- বাঁধে লোকজন পিঁপড়ের সারি দিয়ে ছুটে আসছে। খালি হাতে কেউ নেই। পোটলাপুটলি বেঁধে আসছে অনেকেরই। ... আপন প্রাণের তাগিদে ওরা সবাই এখন একই পথের পথিক। কোন পথে কে কোথায় গিয়ে ঠাই নেবে, ঠাই পাবে কে জানে। শুধু একটু শুকনো জায়গা, শুধু একটু মাথার উপর ছাউনি খুঁজছে ওরা।”

এর পর এগিয়ে আসে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি সংস্থা এবং সেবাশ্রম সংঙ্ঘ। নিয়ে আসে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী। ময়নার তৎকালীন সাংসদ সুশীল কুমার ধাঁড়া ও বি.ডি.ও. অশোকমোহন চট্টোপাধ্যায় বন্যা কবলিত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। এসমস্ত ঘটনা ঐতিহাসিক ও বাস্তব।

‘নদী মাটি প্রাণ’ উপন্যাসের কথক নির্মাল্য। তারই স্মৃতিকথা যেন এ উপন্যাস। ১৩৪৯ সালে নির্মাল্যের বয়স ৫ কিংবা ৬ বছর। সেই সময়ের বিধ্বংসী ঘূর্ণী ঝড়ের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন বিভিন্ন উপন্যাসে। সময়টা তখন আশ্বিন মাস। সংক্রান্তির দিন। নলসংক্রান্তি। সবার বাড়িতে চলছে তখন পিঠে পুলি বানানোর আয়োজন। এমন সময় প্রকৃতি রুদ্র মূর্তী ধারণ করে।

“সন্ধ্যা শুরু হওয়ার কিছু আগে থেকেই আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে এল। ঝড় উঠল। প্রবল ঝড়। ঘূর্ণিঝড়। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে মাতাল করে তুলল গোটা দুনিয়াটাকে। ... কোথায় রইলো গৃহস্থের পিঠেপুলির আয়োজন আর কোথায় জ্বলল সাঁঝ প্রদীপের আলো। প্রবল বর্ষণ এবং ঝড়ে গাছগাছালি উপড়ে পড়লো চালা ঘরের উপর ভেঙ্গে পড়তে লাগলো ডাল পালা। কারু কারু ঘরের চালা উড়ে পড়লো, মাটির দেওয়াল ধ্বসে পড়তে লাগলো।”

নির্মাল্যরা সেদিন আশ্রয় নিয়েছিল মরাইয়ের তলায়। দেওয়াল চাপা পড়ে তাদের দুটি গরুও প্রাণ হারিয়েছে সেদিন।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর শুরু হয় ত্রাণ বিতরণের পক্রিয়া। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে শুরু করে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, সাংসদ, বি.ডি.ও এমনকি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সকলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। 'নদী মাটি প্রাণ' উপন্যাসে সেকথার উল্লেখ আছে –

"কোলকাতা থেকে একটি ক্লাব নিয়ে এসেছে, পলিথিন কয়েক পিস, চিড়া, গুড়, পোশাক আশাক কিছু বেবিফুট, হ্যালোজিন ট্যাবলেট, কয়েকশ দেশলাই এমনকি কিছু ওষুধপত্তরও।"

শুধু মাত্র ত্রাণ সামগ্রী নয় আসতে থাকে অর্থও। শুরু হয় বাঁধ মেরামতির কাজ।

'দুই পুরুষ' উপন্যাসে আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা। পুলিশ গ্রামে গ্রামে এসে ধরপাকড় শুরু করেছে। পুরুষেরা আত্মগোপনের চেষ্টা করছে। পড়ার মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে পুলিশ আসার সংকেত জানিয়ে দিচ্ছে। চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন বানচাল করার জন্য পুলিশের এই অভিযান। ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করে ইংরেজ সরকার চৌকিদার নিয়োগ করে জনসাধারণকে বাগে আনতে চাইছে। ময়নার সুরেন্দ্রনাথ জানার নেতৃত্বে এই আন্দোলন ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। এই আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে পুলিশের লোকেরা বেরাদের খড়ের চালের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গোরা পুলিশের অত্যাচার এভাবে ফুটে বিভিন্ন উপন্যাসে।

'বাঁশপাতার সংসার', 'পদাতিক', 'দুই পুরুষ', 'উত্তর পুরুষ' 'নদী মাটি প্রাণ' প্রভৃতি উপন্যাসে সমকালীন রাজনৈতিক চিত্র ফুটে উঠেছে। রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসা, দলাদলি, স্বজনপোষণ, পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির কথাও তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। যেমন-

"যেখানে কংগ্রেস মেম্বার জিতেছে সেখানে সি পি এম-র লোকেরা ত্রাণ সামগ্রী থেকে বাদ পড়েছে আর যেখানে সি পি এম জিতেছে সেখানে বাদ পড়েছে কংগ্রেসীর বাড়ি। রাজনীতির ঢেউ বয়ে চলেছে জলের ঢেউয়ের তালে তালে।"

বামফ্রন্ট সরকারের গঠনমূলক নীতির কথাও পাই যেমন- ভাগচাষীদের রেকর্ড করে দেওয়া, পে কমিশনের মাধ্যমে সরকারী কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখ আছে বিভিন্ন উপন্যাসে।

'বধূমাতা' উপন্যাসটি নায়িকা কেন্দ্রিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যেন গৃহবধূর মধ্যে দেবীত্বের সন্ধান করেছেন। এখানে গৃহবধূ যেন আপন সুমধুর ব্যবহার ও সেবা যত্নের দ্বারা মমতাময়ী মায়ের মর্যাদা লাভ করেছে। লেখক এই গৃহবধূদের মাতা রূপে সম্বোধন করেছেন। যুগ যুগ ধরে এমন গৃহবধূ আমাদের গৃহাঙ্গনে অবতীর্ণ হোক এটাই যেন লেখকের একমাত্র কামনা। চিন্ময়ের স্ত্রী বিজয়া বাড়ির গৃহবধূ। পরিবারের সকলের প্রতি স্নেহ, প্রেম, মায়া মমতা উজাড় করে দিয়ে বধূ থেকে বধূমাতায় উত্তীর্ণ

হয়েছে পরিবারকে নিয়ে চলেছে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে। এ যেন আমাদের সমাজে নবপরিণীতা বধূদের কর্তব্যবোধ ও মূল্যবোধের জাগরণ। সুরূপা চরিত্রও যেন বিজয়ারই উত্তরসূরি। আধুনিক বধূমাতার আর এক সংস্করণ।

লেখকের জীবনের বহু বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ 'পদাতিক' উপন্যাস। জীবনের পথে চলতে চলতে তিনি যে সকল মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তারই চিত্র ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা, উচ্চ শিক্ষিত যুব সমাজের বেকারত্ব, রাজনীতি(হিংসা, প্রতিহিংসা, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব) সাধারণ মানুষের টাকায় ফুলে ফেঁপে ওঠা চিটফাণ্ড, সিণ্ডিকেট ব্যবসার রমরমা প্রভৃতির চিত্র পাই এই উপন্যাসে। এছাড়াও সাহিত্য সমালোচনা, গবেষক ও গবেষণা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, পূর্ব বাংলার মানুষের প্রসঙ্গ, চাকরির ক্ষেত্র সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে উপন্যাসিকের ধ্যান ধারণার পরিচয় মেলে।

'অশ্রুলেখা' উপন্যাসে পাই পণপ্রথার প্রসঙ্গ। অশ্রুলেখাকে বিবাহের জন্য অনেক পাত্রপক্ষেরই পছন্দ হয়েছিল কিন্তু বিবাহ পর্যন্ত বিষয়টি এগোয়নি। কারণ পণের টাকা। সবক্ষেত্রে কমবেশি পঞ্চাশ হাজার। শেষপর্যন্ত হিমাদ্রিশেখর পনেরো হাজার টাকায় বিবাহ করতে রাজি হয়। এই পনেরো হাজারের তিন হাজার টাকা বাকি থাকার জন্য হিমাদ্রিশেখর সরাসরি পাকড়াও করেছে অশ্রুলেখার দাদা বিনয়ভূষণকে – 'মেজদা আমার বরপণের বাকী টাকাটা?' অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এখনো পণপ্রথার অভিশাপ মুক্ত হতে পারেনি সে বিষয়টি তিনি বলিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরেছেন।

সুকুমার মাইতির 'অশ্রুলেখা' 'পদাতিক' প্রভৃতি উপন্যাসে জাতিভেদ প্রথার চিত্র পাই। পদাতিক উপন্যাসে মাম্পি নামক মেয়েটির পিতা মুসলিম ও মাতা হিন্দু। ভালোবেসে বিবাহ। অর্থাৎ ভালোবাসা জাতি-ধর্মের উর্দ্ধে। মাম্পি নিজেকে পিতার পরিচয় অনুযায়ী মুসলিম বলেই পরিচয় দেয়। অন্যদিকে জেনারেল কাস্টের মেয়ে অশ্রুলেখা বিবাহ করেছে তপশিলি জাতির ছেলে হিমাদ্রিশেখরকে। এখানে আধুনিক শিক্ষিত মেয়ে অশ্রুলেখা বলেছে –

"জাত তো কারু গায়ে লেখা থাকে না, জাত লেখা আছে মানুষের ব্যবহারে মানুষের মণের কোনে।"

ঔপন্যাসিক নিজেই একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। তাঁর অনেক উপন্যাসে বিস্তর জায়গা জুড়ে আছে স্কুল শিক্ষকের ভূমিকা। উপন্যাসে শিক্ষকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তখন শিক্ষকের বেতন নিয়মিত হতনা। 'উত্তর পুরুষ' উপন্যাসে সুকমল বলেছে-

'সেই কবে পুজোর ছুটির আগে বেতন হয়েছিল, আর আজ, মার্চ মাস শেষ হতে চলল। বেতনের সাড়াশব্দ নেই। পুজোর মাসে যে কটা টাকা হাতে এসেছিল তাও কি আপ টু ডেট? না। তখনও বাকি থেকে গিয়েছিল বেশ কয়েক মাসের বেতন।"

আবার বেতন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ দোকান, কাপড় দোকান, মুদি দোকানে টাকা মেটানোর পর সুকমলের পুনরায় হাত ফাঁকা হতে যেত। তখন পাশ গ্রাজুয়েট শিক্ষকের বেতন ছিল ১৬০ টাকা। কোনো বিষয়ে অনার্স থাকলে ২১০ টাকা। মাস্টার ডিগ্রী হলে ২৩০ টাকা। সেকালে শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা যে খুব একটা স্বচ্ছল তা মনে হয় না, অভাবই ছিল নিত্য সঙ্গী।

সুকুমার মাইতির কয়েকটি উপন্যাস গ্রামীণ জীবনভাবনার প্রেক্ষাপটে লেখা। তাই উপন্যাসগুলিতে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানও চোখে পড়ে। যেমন- ক। গ্রাম্য চিকিৎসা ব্যবস্থা। খ। গ্রাম্য ছড়ার উল্লেখ। গ) গ্রাম্য কিংবদন্তী। ঘ) লোকসংগীতের ব্যবহার। ঙ) লোক বিশ্বাস ও সংস্কার। চ) সাপের কামড়ে চিকিৎসা। ছ) টোটকা। (কাছিমের খোল গরুর সিং এ বাঁধা) জ) লবন তৈরী। ঝ) গুনিনের দ্বারা ‘জল বাঁকা’ প্রভৃতি। লোক সাহিত্যের ইতিহাসেও উপন্যাসগুলির মূল্য অপরিসীম।

সংখ্যার বিচারে সুকুমার মাইতির উপন্যাস সংখ্যা মাত্র আটটি। কিন্তু বিষয়বস্তুর বিচারে উপন্যাসগুলি খুবই বৈচিত্রময়। কৃষি, সমাজ, আইন, আদালত, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক সমাজের পূর্বের অবস্থা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই বর্ণীত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। 'নদী মাটি প্রাণ' উপন্যাসে ১৯৭৮ সালের ময়নার তথা মেদিনীপুরের সর্বগ্রাসী বন্যার বাস্তব চিত্র এবং ময়নার জনজীবনের পরিচয় পাই। 'দুই পুরুষ' উপন্যাসে পাই উনিশ ও বিশ শতকের কৃষিজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্র। উনিশ ও বিশ শতকের আইন, বিচার ব্যবস্থ ও জমিদারী প্রথার পরিচয় পাই। নারী চরিত্র সম্পর্কে উপন্যাসিকের বিশেষ ভাবনার পরিচয় পাই 'বধূমাতা' উপন্যাসে। আদর্শ নারী এবং আদর্শ বধূমাতা হিসেবে বিজয়া, সুরুপা চরিত্রগুলি খুবই উল্লেখ যোগ্য। উপন্যাসিক নিজেই ছিলেন একজন গবেষক। তাই লেখকের অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার পরিচয় পাই 'নদী মাটি প্রাণ' উপন্যাসে নির্মাল্যের পুথি সংগ্রহের মাধ্যেমে কিংবা 'অন্ধকার থেকে আলোয়' গল্পে সুয়াতের পুথি সংগ্রহ করা, বই প্রকাশ করা এবং পি. এইচ, ডি. করার মাধ্যমে। সবমিলে বাংলা উপন্যাসের ধারায় জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক সুকুমার মাইতি।

উল্লেখসূচী/তথ্যসূত্র :

১. উপন্যাস চতুষ্টয় ১ম খণ্ড – পৃ – ৭৮
২. উপন্যাস চতুষ্টয় ১ম খণ্ড – পৃ – ৩৫৩
৩. উপন্যাস চতুষ্টয় ১ম খণ্ড, পৃ – ৩৩০
৪. উপন্যাস চতুষ্টয় ১ম খণ্ড, নদীমাটি প্রান, পৃ – ৯৯
৫. উপন্যাস চতুষ্টয় – নদীমাটি প্রাণ ১ম খণ্ড - পৃ – ৩৭
৬. উপন্যাস চতুষ্টয় ১ম খণ্ড – নদীমাটি প্রাণ ১ম খণ্ড - পৃ – ১৪৪
৭. উপন্যাস চতুষ্টয়, নদীমাটি প্রাণ ১ম খণ্ড, পৃ –১৬৩

৮. উপন্যাস চতুষ্টয় ২য় খণ্ড, অশ্রুলেখা-পৃ – ১৯৯

৯. উপন্যাস চতুষ্টয় ১ম খণ্ড, উত্তর পুরুষ-পৃ–৪৩৫

সহায়ক গ্রন্থাবলী-

১। মাইতি, শ্রীসুকুমার। উপন্যাস চতুষ্টয় ১ম খণ্ড। প্রধান সম্পাদক, অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়। বিজন পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র, খড়্গপুর- ৭২১৩০৫। প্রথম প্রকাশ-২০১৯।

২। মাইতি, শ্রীসুকুমার। উপন্যাস চতুষ্টয় ২য় খণ্ড। বিজন পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র, খড়্গপুর- ৭২১৩০৫। প্রথম প্রকাশ-২০২০।

৩। মাইতি, শ্রীসুকুমার। পঞ্চাশটি ছোট গল্প, ১ম পর্ব। প্রকাশিকা, শ্রীমতী গীতা মাইতি। বিজন পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র, খড়্গপুর- ৭২১৩০৫। প্রথম প্রকাশ-২০২১।

৪। মাইতি, শ্রীসুকুমার। পঞ্চাশটি ছোট গল্প, ২য় পর্ব। প্রকাশিকা, শ্রীমতী গীতা মাইতি। বিজন পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র, খড়্গপুর- ৭২১৩০৫। প্রথম প্রকাশ-২০২১।

৫। বেরা, শ্যামল। সুকুমার সৃষ্টির নানা কথা। প্রকাশিকা, শ্রীমতী গীতা মাইতি। বিজন পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র, খড়্গপুর- ৭২১৩০৫। প্রথম প্রকাশ-২০১২।

৬। বেরা, শ্যামল। সুকুমার চর্চা। প্রকাশিকা, তনুশ্রী পাল ও সোমা দাস। সিউড়ি, বীরভূম- ৭৩১১০১।

GST-এর পাঁচ বছর : ভারতে GST-এর রাজ্যভিত্তিক কার্যকারীতার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সুব্রত মজুমদার
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ,
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: পণ্য ও পরিষেবা কর (Goods & Service Tax বা GST) ভারতে 2017 সালে জুলাই মাসে কার্যকর করা হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের রাজস্বের উন্নতি করা। তবে, দ্রুত GST বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কারণে রাজস্ব হ্রাস নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেওয়ায় 2017 সালে রাজ্যগুলির জন্য GST ক্ষতিপূরণ আইন (GST Compensation to States Act) প্রবর্তন করা হয়েছিল। ক্ষতিপূরণের সময়কাল 2022 সালের জুনে শেষ হয়েছে। এহেন সময়কালে COVID-19 মহামারী সমগ্র ভারত তথা ভারতের রাজ্যগুলির অর্থনীতি এবং কর মারফত রাজস্ব সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল। তা সত্ত্বেও, ভারতের মাসিক GST মারফত কর সংগ্রহ প্রায়ে 1.5 লক্ষ কোটি টাকাতে পৌঁছায়। বিভিন্ন গবেষণাপত্রে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনামূলক গবেষণাপত্রে সাধারণভাবে GST এর কর্মদক্ষতা এবং GST কার্যকর হওয়ার আগে এবং পরে রাজ্যগুলির কর কার্যকারিতা আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণাপত্রটিতে GST-এর আগে এবং পরে রাজ্যগুলির কর রাজস্ব সংগ্রহের সহিত রাজস্ব বৃদ্ধির হার, কর GDP (Gross Domestic Product) এর অনুপাত (Tax-to-GDP Ratio), কর প্লবতার (Tax Buoyancy) পরিবর্তন এবং রাজ্যগুলির উপর GST ক্ষতিপূরণ আইনের প্রভাবের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণও করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: পণ্য ও পরিষেবা কর (GST); GST ক্ষতিপূরণ আইন; কর GDP এর অনুপাত; কর প্লবতা।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে বৃহত্তর পরোক্ষ করের অগ্রগতিগুলির মধ্যে একটি হলো পণ্য ও পরিষেবা কর (Goods & Service Tax বা GST)। ভারতবর্ষে এটি কার্যকর করা হয় 2017 সালে 1 জুলাই থেকে। GST প্রবর্তনের মূল প্রত্যাশা ছিল যে যেহেতু এই কর কাঠামো পূর্ববর্তী কর কাঠামোগুলির চেয়ে একটু বেশি সুবিন্যস্ত সেহেতু অধিক সুবিন্যস্ততার কারনে এই কর কাঠামোর অধীনে থাকা রাজ্য সরকারগুলির সাথে সাথে কেন্দ্র সরকারের রাজস্বও সম ভাবে উন্নত হওয়ার সম্ভবনা প্রবল হবে। এই কর কাঠামোর প্রবর্তন একই সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির পূর্বে আরোপ করা বেশ কয়েকটি শুল্ক প্রতিস্থাপনের কারনও। ভারতীয় অর্থনীতিতে রাজ্যগুলির রাজস্ব সার্বভৌমত্ব প্রশ্নবিদ্ধ কারণ তারা সাধারণত কেন্দ্র সরকারের চেয়ে বেশি কর কর্তৃত্ব

প্রদানে আইনতঃ সক্ষম। এরূপ পরিস্থিতে রাজ্যগুলির জন্য টেকসই পাবলিক ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট (Sustainable Public Finance Management, PFM) ও সরকারি আয়ের ধারা যা GST দ্বারা এক প্রকার সম্ভব তা অবশ্যই চালিয়ে যাওয়া উচিত বলে অনেক গবেষকই মনে করে থাকেন (Mukherjee, 2023)।

যাইহোক, শুল্কের এই আইনটি সমস্ত রাজ্যগুলিকে, এই আইন প্রবর্তনের পর থেকে আগামী পাঁচ বছরে, তাদের GST আয়ের 14% হারে বার্ষিক বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পাঁচ বছরের মেয়াদ, 1 জুলাই, 2017 থেকে শুরু হয় এবং ৩০এ জুন, 2022-এ শেষ হয় (Gupta & Rajaraman, 2020)। অপরদিকে এই আইন প্রবর্তনের ফলে রাজ্যগুলির রাজস্ব হ্রাসের সম্ভবনাকে মাথায় রেখে ভারত সরকার GST Compensation to States Act রাজ্যগুলির জন্য 2017 সালে প্রবর্তন করে। এই ক্ষতিপূরণ আইনটি সময়কাল পাঁচ বছর যা শেষ হয় 2022 সালের ৩০এ জুন। ভাগ্যের পরিহাসে, তড়িঘড়ি বাস্তবায়ন করা GST আইনটি স্থিতিশীল অবস্থাতে পৌঁছাবার আগেই COVID-19 মহামারী ভারতবর্ষে আঘাত আনে যা রাজ্যগুলির অর্থনীতিতে কর রাজস্ব কর্তৃক সরকারের আয়ের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ফলস্বরূপ, বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদ এই GST ক্ষতিপূরণ আইনটির মেয়াদ বৃদ্ধির স্বপক্ষে যুক্তি দেন (Rao, 2022)।

ক্ষতিপূরণ আইনটি শেষ হবার ঠিক এক মাস পরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতবর্ষে GST সংগ্রহ প্রায়ে 1.5 লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায় যা ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি উচ্চ নজির সৃষ্টি করে। ঐ আর্থিক বছরের (FY-2023-24) প্রথম কোয়াটারে GST দ্বারা ভারত সরকারের আয় হয় প্রায়ে 1.69 লক্ষ কোটি টাকা (Joseph & Kakarlapudi, 2023)। এইসব পরিসংখ্যানের চুলচেরা বিচারের মাধ্যমে গত ছয় বছরে বিভিন্ন রাজ্যের GST এর রাজস্ব কার্যকারিতা পরীক্ষা করা এবং GST এর আগের সময়ের সাথে এর বৈপরীত্য বিশ্লেষণ এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যাইহোক, গনমাধ্যমে উপলব্ধ বিভিন্ন গবেষণাপত্রের পর্যালোচনার মাধ্যমে এই গবেষণাপত্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ভারতের রাজ্য স্তরে GST-এর আগে ও পরে রাজ্যগুলির কর কার্যকারিতা এবং GST-এর ক্ষতিপূরণ পর্বের অবসানে রাজ্যগুলির উপর প্রভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা।

রাজ্যগুলি থেকে প্রাপ্ত GST রাজস্বের দুটি উপাদান রয়েছে। একটি কেন্দ্র সমন্বিত পণ্য ও পরিষেবা কর (Integrated Goods and Services Tax, IGST) এবং অপরটি রাজ্য পণ্য ও পরিষেবা কর (State Goods and Services Tax, SGST)। GST এর নিয়মানুযায়ী একটি রাজ্যের ভিতরে লেনদেন থেকে সংগৃহীত GST আয়ের 50% কেন্দ্রীয় সরকার তার IGST অ্যাকাউন্টে এবং বাকি 50% রাজ্য তার SGST অ্যাকাউন্টে সরাসরি সংগৃহীত করে। অপরদিকে যখন আন্তঃরাজ্য লেনদেন হয়, তখন পুরো জিএসটি পরিমাণ প্রথমে IGST অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়। তারপর কেন্দ্র

রাজ্যের আর্থিক সম্পর্কের নিয়মানুযায়ী সব কিছু নিয়মের নিষ্পত্তির শেষে গন্তব্য রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে সংগৃহীত GST সমানভাবে বিভক্ত হয়।

এটা অনুমান করা হয় যে, অধিক পরিমাণে SGST সংগ্রহকারী রাজ্যগুলি মোটামুটি ভাবে নিজের রাজ্যের মধ্যেই লেনদেন অধিক পরিমাণে করে থাকে। অন্যদিকে, যে রাজ্যের রাজস্ব বেশিরভাগই আন্তঃরাজ্য লেনদেন থেকে প্রাপ্ত হয় সেই রাজ্যের রাজস্বের উচ্চ শতাংশ IGST থেকে আসে (Mallk, 2021)। যাইহোক, যেহেতু GST একটি গন্তব্য-ভিত্তিক কর (Destination Based Tax), তাই প্রথমদিকে উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি প্রধানত ভোগকারী রাজ্যগুলির তুলনায় কম কর সুবিধা বহন করবে বলেই আশা করা হয়েছিল (Rahang, 2017)।

উচ্চ SGST এর নিরিখে যে সব রাজ্যগুলির নজির এখনো পর্যন্ত দেখা গেছে সেগুলি হলো ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ। ভিন্নভাবে বললে, এই রাজ্যগুলি তাদের খরচের প্রয়োজনের জন্য অন্যান্য রাজ্যের উপর কম নির্ভর করে। অন্যদিকে বিহার, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে IGST অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাপ্ত GST শুল্কের পরিমান অধিক দেখা গেছে। ফলে এইসব রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য অত্যাবশ্যক। গবেষণায় দেখা গেছে যে, কেরালা এবং পাঞ্জাব ছাড়া বেশিরভাগ নিম্ন আয়ের রাজ্যগুলি IGST অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাপ্ত GST শুল্কের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল (Joseph & Kakarlapudi, 2023)। যাইহোক, GST কার্যকর হওয়ার পরে, এটি প্রত্যাশিত ছিল যে কর কাঠামোর সরলীকরণ আসলে রাজ্যগুলির কর রাজস্ব সংগ্রহ বাড়াবে। অথচ বিভিন্ন গবেষণাপত্রে, রাজ্যগুলির দ্বারা সংগৃহীত GST এর পরিমাণ এবং GST সংগ্রহের প্রত্যাশিত পরিমানের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য, প্রকাশিত হয়েছে (Dash & Kakarlapudi, 2022)। তাছাড়া কিছু রাজ্যসরকারের GST রাজস্ব COVID-19 মহামারী দ্বারা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিতও হয়েছে (Dash & Joseph, 2022)।

GST বাস্তবায়নের পরে রাজ্যগুলি সত্যিই লাভ করেছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য, Joseph এবং Kakarlapudi (2023) GST-এর পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ের মধ্যে বার্ষিক GST সংগ্রহের গড় বৃদ্ধির উপর একটি তুলনামূলক সমীক্ষা করেছেন। তাদের গবেষণায়, তারা দেখেছেন যে, বিহার, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো নিম্ন আয়ের রাজ্যগুলি GST প্রয়োগের আগে দ্বি-অঙ্কের কর সংগ্রহের বৃদ্ধির হার নিবন্ধিত করেছিল। অন্যদিকে GST যুগের পরে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতে GST সংগ্রহের হার সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। জিএসটি শাসনের ফলে কেরালা এবং ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলিতে GST সংগ্রহের বৃদ্ধির হার কম হয়েছে। মজার বিষয় হল, কেরালা একমাত্র উচ্চ-আয়ের রাজ্য যার GST সংগ্রহের বৃদ্ধির হার একেবারে সর্বনিম্ন।

একটি দেশের আয়ের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা সাধারনত সেই দেশের কর ও GDP (Gross Domestic Product) এর অনুপাতের (Tax-to-GDP Ratio) দ্বারা নির্ধারিত হয় (Asian Development Bank, 2021)। সেক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত সরকার বুঝতে উচ্চ কর ও GDP এর অনুপাত সর্বদাই গ্রহন যোগ্য (Khan, 2023)। রাজ্যের ক্ষেত্রেও সেই রাজ্যের কর ও সেই রাজ্যের GDP (যাকে সাধারণত Gross State Domestic Product বা সংক্ষেপে GSDP বলা হয়ে থাকে) এর অনুপাত সেই রাজ্যের আয়ের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ মাত্রা নির্ধারণ করে থাকে। বিভিন্ন গবেষণাপত্রে দেখা গিয়েছে যে GST কার্যকর হবার পরে ঝারখণ্ড একমাত্র রাজ্য যার ক্ষেত্রে এই কর ও তার GDP এর অনুপাত (Tax-to-GSDP Ratio) বাকি রাজ্যের থেকে কিছুটা বেশি। অন্যদিকে এই অনুপাতের সর্বাধিক বৃদ্ধির হার 2020-21 সাল থেকে কেবলমাত্র মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবেই লক্ষ করা গেছে। অন্যদিকে কর্ণাটকা এবং ওড়িশা রাজ্য দুটিতে এই অনুপাতের মান GST কার্যকর হবার আগে প্রায়ে সর্বাধিক ছিল। 2018-19 থেকে 2022-23 সাল পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখলে দেখা যায় যে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে এই অনুপাত উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। অন্যদিকে ঝারখণ্ড, মহারাষ্ট্র এবং উত্তর প্রদেশ এই অনুপাতের ভিত্তিতে উদিয়মান রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উল্টদিকে এই অনুপাতের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশ কিন্তু সারণীতে তার স্থান অপরিবর্তিত রেখেছে। যাইহোক, বেশিরভাগ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কর ও তার GDP এর এই নিম্ন গড় অনুপাত এটাই নির্দেশ করে যে এই সব রাজ্য গুলির ক্ষেত্রে করের ভিত্তি আরো প্রসারিত হওয়া সম্ভব ছিল (Joseph & Kakarlapudi, 2023)।

রাজ্যভিত্তিক GST এর কার্যকারীতা বোঝার আর একটি বড় উপায় হলো রাজ্যগুলিতে GST কার্যকর হবার আগে ও পরে রাজ্যগুলির কর প্লবতার (Tax Buoyancy) একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ। কোনো একটি রাজ্যের বা দেশের এক শতাংশ GDP এর পরিবর্তনের ফলে ঐ রাজ্যের বা দেশের যত শতাংশ কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বে পরিবর্তন হয় তাহাই হলো ঐ রাজ্যের বা দেশের কর প্লবতা। কর প্লবতার মান একের বেশি হওয়ার অর্থ হলো দেশের বা রাজ্যের GDP এর বৃদ্ধির চেয়ে কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের বৃদ্ধির হার অধিক। এইরূপ পরিস্থিতিতে সাধারণত সরকারী ঋণের ও সরকারী ঘাটতির হ্রাস হয় (Blanchard, Dell' Aricia & Mauro, 2010)। অপরদিকে, যখন করের প্লবতা একেরও কম হয়, তখন করের রাজস্ব কাঠামোগতভাবে হ্রাস পায় এবং দুর্বল কর সরকারী ব্যয় হ্রাসের অনুপস্থিতিতে রাজস্ব স্থায়িত্বে এক প্রকার ঝুঁকি তৈরি করে। কর প্লবতার মান এক হলে সাধারণত করের রাজস্ব কাঠামোগতভাবে স্থিতিশীল বোঝায় (Hill, Jinjarak & Park, 2022)।

বিভিন্ন গবেষণাতে এটি পাওয়া গেছে যে ভারতবর্ষে ষোলটি রাজ্যের মধ্যে ছয়টি রাজ্য (ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ) GST কার্যকর হবার পর তাদের কর প্লবতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। বাকি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে উচ্চ কর প্লবতা শুধুমাত্র GST কার্যকর হবার পূর্বেই দেখা গেছে। তার মধ্যে বিহার, ছত্তিশগড় এবং অন্ধ্র প্রদেশে GST কার্যকর হবার পূর্বে এই কর প্লবতার মান ছিল সর্বোচ্চ। যাইহোক, GST কার্যকর হবার পর মহারাষ্ট্রে সর্বাধিক এবং তারপর পাঞ্জাবে কর প্লবতা লক্ষ করা গেছে। কর প্লবতার নিরিখে GST কার্যকর হবার পর কেরালার কর প্লবতার মান একের নিচে চলে যায়। অন্যদিকে কর প্লবতার নিরিখে GST কার্যকর হওয়ার আগে গুজরাট পিছিয়ে থাকলেও GST কার্যকর হবার পর এই রাজ্য অনেকটা এগিয়ে আসে (Joseph & Kakarlapudi, 2023)।

সংবিধানে 101 সংশোধনী আইন (2016) অনুযায়ী GST ক্ষতিপূরণ প্রকল্প, GST বাস্তবায়নের কারণে, রাজস্ব ক্ষতি পূরণের জন্য, রাজ্যগুলিকে পাঁচ বছরের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ রাজ্যগুলির প্রকৃত GST সংগ্রহ এবং প্রত্যাশিত GST এর রাজস্বে মধ্যে পার্থক্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোনো একটি রাজ্যের ক্ষেত্রে কোনো একটি আর্থিক বছরে এই প্রত্যাশিত GST রাজস্ব, সেই রাজ্যের 2015-16 আর্থিক বছরের রাজস্বের তুলনায় বার্ষিক চোদ্দ শতাংশ (14%) চক্রাকার বৃদ্ধির হার প্রয়োগ করে গণনা করা হয় (Parmar & Ghosh, 2020)। GST কার্যকর হবার পর যে সব রাজ্যগুলির GST রাজস্ব ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে সেইসব রাজ্যগুলি এই ক্ষতিপূরণের আইনের দ্বারা অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও, পাঁচ বছরের GST ক্ষতিপূরণের মেয়াদ জুন, 2022-এ শেষ হয়েছে।

2022-23 সালে, ঝাড়খন্ড ছাড়া বাকি সমস্ত রাজ্যই প্রত্যাশিত বার্ষিক 14% বর্ধিত হারে GST রাজস্বের লক্ষ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অধিকন্তু, রাজ্যগুলির দ্বারা সংগৃহীত GST রাজস্ব এবং সেই রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত GST রাজস্বের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা গিয়েছিল। রাজ্যগুলির মধ্যে অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থান হল সেই সব রাজ্য যেগুলির GST রাজস্ব সংগ্রহ তাদের প্রত্যাশিত GST রাজস্ব স্তরের সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল (Joseph & Kakarlapudi, 2023)। বিভিন্ন গবেষণাতে এটা অনুমান করা হয়েছে যে যদি এই ক্ষতিপূরণ আইনটির মেয়াদ 2022-23 আর্থিক বছর পর্যন্ত করা হতো তাহলে বেশিরভাগ রাজ্যই তাদের GST রাজস্ব সংগ্রহ কমপক্ষে 20% বৃদ্ধি করতে পারত। উদাহরণস্বরূপ, ছত্তিশগড় এবং পাঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলি তাদের প্রকৃত GST রাজস্ব সংগ্রহের অতিরিক্ত 40.5% এবং 48.9% সংগ্রহ করতে পারত (Joseph & Kakarlapudi, 2023)।

যাইহোক, বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ রাজ্যই GST সময়কালে তাদের কর GDP এর অনুপাতের উন্নতি করেনি। যদিও এই আইন লাগু হওয়ার পরে বেশিরভাগ রাজ্যে কর সংগ্রহে দ্রুত বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা গেছে। কিছু রাজ্যে, উচ্চ

GST রাজস্বের বৃদ্ধির জন্য কিছু অর্থনৈতিক কারণ, COVID-19 মহামারী এবং ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম মারফত কর রাজস্ব গ্রহণের অবদান রয়েছে। যেহেতু GST একটি গন্তব্য ভিত্তিক কর কাঠামো সেহেতু এই কর আইনের বাস্তবায়নের ফলে রাজ্যগুলির কর সংগ্রহের ক্ষমতার কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে, যা বেশিরভাগ রাজ্যেকে GST ক্ষতিপূরণের দিকে পরিচালিত করেছে। অবশেষে, এই পর্যালোচনা ভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে, এই উপসংহারে পৌঁছানো যেতে পারে যে, বেশিরভাগ রাজ্যেই GST ক্ষতিপূরণের মেয়াদকালে তাদের GST রাজস্ব সংগ্রহের প্রত্যাশিত বার্ষিক বৃদ্ধির হার 14% কে নিশ্চিত করতে সফল হয় নি।

তথ্যসূত্র / তথ্যঋণ:

- *Asian Development Bank Report*, 2021.
- Blanchad O, Dell 'Aricia G, & Mauro P (2010): “Rethinking Macroeconomic Policy”, *IMF Staff Position Note*, SPN/10/03.
- Dash S. K & Kakarlapudi K. K (2022): “What Explains Interstate Variation in GST Collection?” GIFT Discussion Paper 2022/02.
- Dash S. K & Joseph J (2022): “Two Years into COVID: What's the State of GST Recovery?”, *Kerala Economy*, 3(4), 28-36.
- Dudine P & Jalles J. T (2017): “How Buoyant is the Tax System 2 New Evidence from a Large Heterogeneous Panel?”, *IMF Working Paper* 17/4.
- Gupta M & Rajaraman I (2020): “Is the 14% Revenue Guarantee to States Justified?”, *Economic and Political Weekly*, 55(47), 18-21.
- Hill S, Jinjarak Y & Park D (2022): “Buoyant or Sinking? Tax Revenue Performance and Prospects in Developing Asia”, *ADB Economics Working Paper* No. 656.
- Joseph J (2023): “Do Digital Payments Enhance Tax Revenue? Evidence from India”, *GIFT Discussion Paper* 01/2023.
- Joseph J & Kakarlapudi K. K (2023): “Six Years of GST: An Interstate Analysis”, *Kerala Economy*, Vol. 04, No. 02.
- Khan A. R (2023): “Low-Tax to GDP Ratio: Causes and Recommendations”, *Journal of Public Policy Practitioners*, 2(1), 38-61.

- Mallick H (2021): “Do Governance Quality and ICT Infrastructure Influence the Tax Revenue Mobilization? An Empirical Analysis for India”, *Economic Change and Restructuring*, 54(2), 371415.
- Mukherjee S (2023): “Revenue Implications of GST on Indian State Finances”, *NIPFP Working Paper* No. 388.
- Parmar C. K & Ghosh P. P (2020): “Predicting Compensation under GST and its Impact on Revenue Growth Post Compensation Period: A Study for the State of West Bengal”, *Vision: Journal of Indian Taxation*, 7(2), 34-44.
- Rahang K (2017): “Goods and Service Tax: A Comprehensive Indirect Tax Reform in India”, *International Journal of Research in Social Sciences*, 7(2), 460-476.
- Rao R. K (2022): “GST, End of Compensation Regime and Stress on State Finances”, *NIPFP Working Paper* No. 22/376.

মাটির শহর কৃষ্ণনগর ও শিল্পীসমাজ

ইন্দ্রাণী দত্ত
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ,
পলাশি কলেজ, নদীয়া

সারসংক্ষেপ : প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষা ধর্ম সাহিত্য সবেতেই এগিয়ে ছিল বাংলার নদীয়া জেলা। বৈচিত্র্যের ভারতের ন্যায় বৈচিত্রের শহর নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগর। নানা ধরনের শিল্প-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এই জেলা শহর। জেলা শহর এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে স্রোতস্বিনী জলঙ্গি নদী। এই জলঙ্গী নদীর অবদান অনস্বীকার্য। এই নদী শহরের মাটিকে করেছে উর্বর এবং নরম। যার ফলস্বরূপ কৃষ্ণনগর সমাদৃত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের জন্য। এই শিল্পের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশ তথাপি সারা বিশ্বে। নানা প্রান্তের মানুষ সমাদার করেছেন এই শিল্পকে। মূলত কৃষ্ণনগরের পূর্ব দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ ঘূর্ণি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মৃৎশিল্প গড়ে উঠেছে। মৃৎশিল্পীর মরমি হৃদয় ও দরদী দৃষ্টির প্রতিফলন ঘটে তার সৃষ্টির উল্লাসে। যার ফলস্বরূপ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি সারা বিশ্বজুড়ে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খাতে প্রভাবিত হয়েছে নদীয়ার মৃৎশিল্পের ধারা। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেলেও আজও তার খ্যাতি অটুট।
সূচকশব্দ : মৃৎশিল্পের সূচনা, প্রথমদিকের মৃৎশিল্পী, বর্তমান পরিস্থিতি।

মহারাজা রুদ্র রায়ের (১৬৭৬ -১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) সময়কালে রেউই গ্রাম বর্তমানে কৃষ্ণনগর। রেউই গ্রামের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণের নাম অনুসারে নামকরণ হয় কৃষ্ণনগরের। তবে মৃৎশিল্পের জয়যাত্রা সূচিত হয় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকেই। জনশ্রুতি অনুযায়ী নাটোর থেকে মৃৎশিল্পীরা কৃষ্ণনগরে আসেন। নাটোর থেকে আগত শিল্পী ও স্থানীয় শিল্পীর সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে কৃষ্ণনগরে মৃৎশিল্প। মায়ের সাথে সন্তানের যেমন নাঁড়ির টান ঠিক তেমনি মৃৎশিল্পীর সাথে রয়েছে মাটির আত্মিক টান। এই আত্মিক টান থেকেই মৃৎশিল্পীরা গড়ে তোলে তাদের শিল্পকর্ম। তবে এখানকার বস্তুনিষ্ঠ রীতির বাস্তব রূপায়ণ অন্যান্য মৃৎশিল্পীদের থেকে তাদের পৃথক করেছে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন-"কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা ছিলেন যথেষ্ট আর্টিস্ট"। অর্থাৎ সামান্য মাটি দিয়ে যে শিল্প তৈরি হয় তা বিস্ময়কর। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পীরা বংশানুক্রমিক ভাবে তাদের শিল্পীসত্ত্বা বজায় রেখেছেন।

মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান হল মাটি। এঁটেল, বেলে ও দোআঁশ মাটি মৃৎশিল্পের জন্য উপযোগী। তিন ধরনের মাটির মিশ্রণ মৃৎশিল্পের জন্য উপযোগী। এই মিশ্রণ চটচটে হয় না। যার ফলে সূক্ষ্ম কারুকার্য করতে সুবিধে হয়। এই মসৃণ মাটি রঙ এর

ক্ষেত্রেওউপযোগী। তবে শুরুতে প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার হলেও বর্তমানে রাসায়নিক রঙ ব্যবহার করা হয়। তবে প্রথম দিকে রঙ চকচকে করতে ব্যবহার করা হতো তেঁতুল বিচের আঠা। এছাড়াও মাটিতে ব্যবহৃত হতো চালের তুঁষ ও কাঠের গুঁড়ো। এছাড়াও মেশানো হতো পাতলা পাটের কুচি। এগুলির সংমিশ্রণে গড়ে উঠতো আদর্শ মাটি। যা মৃৎশিল্পের জন্য অনুকূল ছিল। মাটির উৎকর্ষতার জন্যই কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মৃৎশিল্পে মাটির মতো মৃৎশিল্পীরাও গুরুত্বপূর্ণ। মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত মৃৎশিল্পীরা আদতে কুম্ভকার। প্রথমদিকে মৃৎশিল্পীরা দেব-দেবীর মূর্তি গড়তেন। পরবর্তীকালে কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার পর মিশনারীদের উৎসাহে মৃৎশিল্পীরা বস্তুনিষ্ঠ সৃষ্টি করতে থাকেন। ইংরেজ প্রশাসক চার্লস আর্চার প্রথম কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের নমুনা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন। শুধু মিশনারী নয় রাজপরিবার ও সমাদর করেছেন কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পকে। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় তাঁর “ক্ষিতিশ বংশবলিচরিত” গ্রন্থে মৃৎশিল্পীদের রাজ পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলেছেন।

তবে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর প্রশাসনিক সদর শহর হিসাবে গড়ে ওঠার পর থেকে মৃৎশিল্প খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পায়। ১৮৫১ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত “একজিবিশন অফ দি ওয়ার্কস্ অফ ইন্ডাস্ট্রি অফ অল নেশনস্” এ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী শ্রীরামপাল এর মৃৎশিল্পকর্ম স্থান পায়। ১৮৫৫ সালে প্যারিস অনুষ্ঠিত ‘এক্সপোজিসন ইউনিভার্সেলে দ্য প্যারিস’ প্রদর্শনীতে শ্রীরামপাল এর শিল্পকর্ম স্থান পায়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ‘ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল একজিবিসন” এ শ্রী রামপাল, শ্রী যদুনাথ পাল এর শিল্পকর্ম স্থান পায়। বিদেশে আয়োজিত প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের শিল্পকর্ম বিদেশি শিল্প রসিকদের মুগ্ধ করে। পূর্ণ অবয়ব মূর্তিগুলির জীবন্ত রূপ বিদেশের মনকে জয় করে নেয়। সারা বিশ্বের খ্যাতি অর্জন করে কৃষ্ণনগরের শিল্পবোধ ও শিল্পী সম্প্রদায়।

এই মৃৎশিল্পীরা বংশানুক্রমিক ভাবে শিল্প সৃষ্টির উল্লাসে মেতে ছিলেন। প্রায় ৩০০ বছর আগে এই মৃৎশিল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটে। “West Bengal Census Handbook: Nadia, 1961”-অনুযায়ী মৃৎশিল্পের আদি পুরুষ ছিলেন মোহন পাল। পরবর্তীতে তার উত্তরসূরিরা বংশানুক্রমিক ভাবে এই শিল্পধারাকে বজায় রেখেছেন। প্রথমদিকে মৃৎ শিল্পী শ্রীরাখাল দাস ও শ্রীবিজয় কৃষ্ণ বস্তুনিষ্ঠ মৃৎশিল্প তৈরি করে খ্যাত হন। অন্য আরেক কৃতি মৃৎশিল্পী ছিলেন শ্রীযদুনাথ। যার শিল্পকর্ম শিল্প সন্ধানী হ্যাভেল সাহেব কে মুগ্ধ করেছিল। হ্যাভেল সাহেবের পরামর্শেই তিনি কলকাতার আর্ট কলেজে নিযুক্ত হন। মৃৎশিল্পী শ্রীযদুনাথের শিল্পকর্ম টেক্কা দিয়েছিল ইতালিয় ভাস্কর কে। মৃৎশিল্পী শ্রীযদুনাথ এর হাতে তৈরি হয় কলকাতার তৎকালীন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জীবন্ত মা এর প্রতিমূর্তি। যতীন্দ্রমোহনের পাশাপাশি তৎকালীন বাংলার ছোট-

লাট লিটন শ্রীযদুনাথের প্রশংসা করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়াও শ্রী যদুনাথ এর শিল্পকর্মের প্রশংসা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী মৃৎশিল্পী যদুনাথ প্রসঙ্গে বলেছেন-”আমার ছেলেবেলায় যদুপাল নামক এক ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কারিগর ছিলেন তাকে নির্ভয়ে আর্টিস্ট বলা যায়”। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর বর্ণনায় বোঝা যায় শ্রী যদুনাথ পাল কত বড় মাপের শিল্পী ছিলেন। শ্রীযদুনাথ পালের শিল্পকর্ম প্রশংসা পেয়েছে ইংরেজ শিল্প রসিকদের কাছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড কারমাইকেল প্রমুখ। শুধু বিদেশি নয় সেই সময়কার বিশিষ্ট ভারতীয়দের কাছেও শ্রীযদুনাথপাল প্রশংসা লাভ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য ছিলেন মদনমোহন মালব্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ। তাঁর বাস্তবধর্মী শিল্পচিন্তা যেমন “কাঠুরিয়া কাঠ কাটা”-এইরকম শিল্প চিন্তা তাঁকে যুগের থেকে অগ্রবর্তী করে রেখেছে।

অন্য আরেকজন মৃৎশিল্পী ছিলেন শ্রী কার্তিক চন্দ্র পাল। কালিম্পং এ রবীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে তিনি কবিগুরুর প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কার্তিক চন্দ্র পাল সম্পর্কে কবিগুরু বলেছেন -”কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী শ্রীযুক্ত কার্তিক চন্দ্র পাল আমার যে মূর্তি গঠন করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাহার দ্রুত হস্তের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। য়ুরোপে আমেরিকায় যে শিল্পীর আমার মূর্তি গড়িয়েছেন তাহারা আমাকে ক্লান্তিতে পীড়িত করিয়াছিলেন। ইহার হাতে সে দুঃখ পায় নাই।” অর্থাৎ কার্তিক চন্দ্র পাল যে গুণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কথায় তা আরো পরিস্ফুট হয়। পরবর্তীকালে অন্য এক মৃৎশিল্পী ছিলেন গোপেশ্বর পাল। তিনি প্রথম ৩০ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে যান এবং “ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে” অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে শ্রী বীরেন পাল, শ্রী গনেশ পাল, শ্রী সুবীর পাল তাঁদের শিল্পকর্মে খ্যাতি অর্জন করেন।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সারা ভারতের পাশাপাশি সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। হান্টার সাহেব তাঁর statistical accounts of Bengal গ্রন্থে বলেছেন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ৪,০৬৩ জন কুম্ভকার কৃষ্ণনগরে বসবাস করতেন। তিনি বলেছিলেন সকলে মৃৎশিল্পী না হলেও এরা কলসি, হাঁড়ি নির্মাতা ছিলেন। অর্থাৎ সেই সময়কার বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ এই মৃৎ শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর পাশাপাশি মৃৎশিল্পের চাহিদা ছিল সারা বিশ্ব জুড়ে। ভারতীয় জাদুঘরের সহকারী অবেক্ষক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর “Art Manufacturers of India” গ্রন্থে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের বহু তথ্য তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি সেই সময়কার মৃৎশিল্পের ধার্য মূল্য তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরের চা বাগিচা মডেলের দাম ছিল ১২০০ টাকা।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। কয়েকশো বছর ধরে তার গুনে ও মানে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সারা বিশ্বের খ্যাতি অর্জন করেছিল। তবে বর্তমানে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে এই প্রাচীন শিল্পে। বর্তমানে মাটির গুণগত

মানে সমস্যা, পরিবহনের সমস্যা, মহানগর থেকে দূরত্ব,সরকারি অনুদানের অভাব, এইসব কারণগুলি কোথাও গিয়ে পরবর্তী প্রজন্ম এই মৃৎশিল্প থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সরকারি অনুদান, পরিবহন এর সুবিধা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি সুবিধা পেলে হয়তো আবার ঘুরে দাঁড়াবে কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প পাশাপাশি মৃৎশিল্পীরা।

নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও আজও সমানভাবে মানুষের কাছে আকর্ষণের জায়গা কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর "মৃত্যুক্ষুধা" উপন্যাসে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সম্পর্কে বলেছেন "পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর, যেন কোনো খেয়ালী শিশুর খেলা, শেষের ভাঙ্গা খেলাঘর।" কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ঘটে তাদের শিল্পী সত্ত্বার মধ্যে দিয়ে। আজও পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের কাছে গর্বের জায়গা কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প। মহারানী ভিক্টোরিয়া থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সকলেই মুগ্ধ হয়েছে কৃষ্ণনগরের মৃৎ শিল্পীদের শিল্প কর্মে। আজও শিল্পীরা তাঁদের শিল্পীসত্ত্বাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সদাব্যস্ত। তাঁদের সূক্ষ্ম হাতের জাদুতেই গড়ে ওঠে নতুন নতুন শিল্প ভাবনা। যা মানুষের কাছে আজও বিস্ময়।

তথ্যসূচি :

* চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, ১৪২৯, কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া কাহিনী,কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী।
* চক্রবর্তী,সুধীর,১৯৮৫, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও শিল্পীসমাজ, কলকাতা, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সাইন্সেস।
* চৌধুরী, কমল,২০১৫, নদিয়ার ইতিহাস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।
* উকিপিডিয়া।

‘মানুষের হৃদয়ের প্রীতির মতন এক বিভা’ : জীবনানন্দের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ

অনন্যা ঘোষ
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract) : বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা কবিতার জগতে আগমন ঘটে কবি জীবনানন্দ দাশের। বাংলা কাব্যে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এক ইন্দ্রিয়ানুভূতিময় জগত, যেখানে ধরা পড়েছিল চেতনালোকের রহস্যময় চিত্র। পূর্বজ কবি, বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রভাবকে সচেতনভাবে অতিক্রম করার প্রয়াস থেকেই জীবনানন্দের এই স্বতন্ত্র কাব্যালকের নির্মাণ। এর কিছু পূর্বেই বাংলা কাব্যে রাবীন্দ্রিক সাহিত্যস্বভাব থেকে মুক্তি লাভের সচেতন প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। এর পশ্চাতে কারণ হিসাবে কার্যকরী হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, মানবচৈতন্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে নব বৈজ্ঞানিক ধারণার আবির্ভাব, সামাজিক অবক্ষয়, শুভবোধের বিলুপ্তি। রবীন্দ্রকাব্যালোক থেকে দূরে স্বতন্ত্র কাব্যজগত গড়ে তুললেও বাংলা কাব্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা রূপে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন অনুজ কবি জীবনানন্দ দাশ। ‘রবীন্দ্রনাথ’ শিরোনামাঙ্কিত তাঁর সর্বমোট ছয়টি কবিতা রয়েছে। প্রত্যেক কবিতাই রচিত হয়েছে কবিগুরুর মৃত্যুর পর। রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের অবক্ষয়ী সমাজের প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবনদর্শন এক ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলে কবি মনে করেছেন। ‘ব্যক্তিগত আমি’ –র সংকীর্ণতা অতিক্রম করে মানুষকে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মন্ত্রের শিক্ষা দেবে তাঁর গান বলে আশাবাদী যুদ্ধোত্তর বিপন্ন পৃথিবীর কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কবিতাগুলির গভীরে নিহিত রয়েছে এই স্থির আস্থা। তাঁর ভাষা নির্মাণ কৌশলের স্বকীয়তা প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে উজ্জ্বল।

সূচক শব্দ (Key word) : রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা, বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্ব, সামাজিক অবক্ষয়, প্রেমভাবনা, সৌন্দর্যবোধ, আশাবাদ, বিশ্বমানবতাবাদ।

মূল আলোচনা (Discussion) :

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে যে পাঁচজন কবি প্রথম কবিতায় রাবীন্দ্রিক সুরের মোহজাল ছিন্ন করে স্বতন্ত্র পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাংলা কাব্যজগতকে দুর্বলতা থেকে মুক্তি প্রদান করে যে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিল, তার থেকে মুক্তি লাভ সহজ ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও তদনুসারী কবিগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত রাবীন্দ্রিক

ঐতিহ্যানুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেলেও বিশ শতকের প্রথমার্ধেই একদল তরুণ কবি চেয়েছিলেন কাব্যলোকে স্বাবলম্বী হতে। যদিও এই মনোভাবের পশ্চাতে ছিল সমাজ ও রাজনীতির পটপরিবর্তন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, রুশ বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক ভাবনার উদ্ভব এক নব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আধুনিক মানুষের মনোজগতে। ফলে বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই বাংলা কবিতার জগতে গড়ে উঠেছিল ‘কল্লোল’, ‘কালিকলম’,’প্রগতি’-এর মতো রবীন্দ্র-বিরোধী কবিগোষ্ঠী, যাদের কবিতায় স্থান করে নিয়েছিল সাম্যবাদী সমাজভাবনা, সমাজের নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি, দেহকেন্দ্রিক প্রেমচেতনা।

কবি জীবনানন্দের কাব্যপ্রবাহের গতিপথ রাবীন্দ্রিক জগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে প্রবাহিত হয়েছে, তবে কল্লোল যুগের কবিদের মতো তিনি কবিতার প্রচারধর্মীতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব স্বীকার করেই স্বতন্ত্র পথ বেছে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ভাবনায়, উত্তর-রাবীন্দ্রিক বাংলা কবিতা প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের বিরোধী নয়, বরং বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সাহিত্যিক স্বভাব ও সময়স্বভাব থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা নিয়ে আবির্ভাব ঘটেছিল আধুনিক বাংলা কবিতার। আধুনিক কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ বিশ্বযুদ্ধোত্তর বন্ধ্যা পৃথিবীর কবি টি. এস. এলিয়ট তাঁর ‘Tradition and Individual Talent’ প্রবন্ধে বলেছেন, ঐতিহ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যায় না; তাকে গ্রহণ করতে হয় মননশীলতায় -

> “Tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour.” [১]

একই বক্তব্যের অনুবর্তন শোনা যায় জীবনানন্দ দাশের ‘উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য’ প্রবন্ধে, যেখানে তিনি কবির ক্ষেত্রে ইতিহাসচেতনা ও কালজ্ঞানকে আত্মস্থ করে ঐতিহ্যের অনুসরণের মাধ্যমে নতুন পথে উত্তরণের কথা বলেছেন –

> “কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। কাল বা সময় বৈনাশিক; কিন্তু সে সেই সমস্ত কুয়াশাগুলোকেই কেটে-কেটে চলেছে যা পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার পক্ষে অন্তরায়ের মতো।
> এই সমস্ত চেতনা নিয়েই মানবতার ও কবিমানবের ঐতিহ্য। কিন্তু এই ঐতিহ্যকে কবিতা বা সাহিত্যে রূপায়িত করতে হলে ভাব-প্রতিভার প্রয়োজন যা প্রজ্ঞাকে স্বীকার করে নিয়ে নানারকম ছন্দে অভিব্যক্ত হয়।”[২]

জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরাপালক’ প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম কাব্য থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্বভাব থেকে দূরে এক কাব্যজগত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্য ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’-এর সময়পর্ব থেকে আরও বেশি করে

ধরা পড়তে থাকে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনুজ কবির চিন্তনের পার্থক্য ঘটিয়েছিল বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগপ্রবণতা। আধুনিক পৃথিবীর অবক্ষয়, অধ্যাত্মচিন্তার অভাব, বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবচৈতন্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে নব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবির্ভাব, পাশ্চাত্যে ইমেজিস্ট ও সিম্বলিস্ট আন্দোলনের প্রভাব জীবনানন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যখন দেখা গিয়েছে অবয়বহীন প্রেমভাবনা, আধ্যাত্মিক চেতনা, অবিচল আস্তিক্যবাদ তখন জীবনানন্দের কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে সংশয়ীচেতনা, দ্বান্দ্বিকতা ও বিপন্নতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পূর্ণতার অনুভবের বিপরীতে জীবনানন্দের কবিতায় উঠে এসেছে মৃত্যু, ক্ষয় ও অসুস্থ পৃথিবীর চিত্র। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে বর্ষা ও বসন্ত ঋতু বয়ে আনে দেশ-কাল বহির্ভূত অনন্তলোকের আহ্বান,পরমের সঙ্গে মিলিত হওার একান্ত আকুতি। অন্যদিকে জীবনানন্দের কাব্যে রয়েছে হেমন্তের পাতা ঝরার বিষণ্ণতা ও ধূসরতা। তবে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সচেতনভাবে অতিক্রমে প্রয়াসী হলেও জীবনানন্দের সঙ্গে বিশ্বকবির ভাবনাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় অনেকক্ষেত্রেই। নিজস্ব রচনায় নিছক বাহ্যিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া দ্বারা পরিচালিত হতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, একথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন ‘সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা’ প্রবন্ধে -

> “যেখানে আমি আর-কিছু নই, কেবলমাত্র কবি। সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত; বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পন্ডিত আমার সেই কাব্যসৃষ্টির কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য হয়।”[৩]

একইভাবে কবিতায় প্রচারধর্মীতা বা প্রাক-নির্দিষ্ট চিন্তা বা ধারণার প্রত্যক্ষ প্রকাশের বিরোধী ছিলেন কবি জীবনানন্দ। ‘কবিতার কথা’ প্রবন্ধে কবি বলেছেন:

> “আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা খচিত অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে চায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহলে কবিতা সৃষ্টি হয় না পদ্য লিখিত হয় মাত্র ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু।”[৪]

আধুনিক কবিদের অন্যতম প্রতিভূ জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিক্রিয়া শোনা যায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২২ শে অগ্রহায়ণ লেখা একটি চিঠিতে -

> "তোমার কবিত্ব শক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে।"[৫]

অনুজ কবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য কিছু বিস্ময়ের উদ্রেক করে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা যে সব শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করি, তা কোমল ও আভিজাত্যপূর্ণ। যদিও সাহিত্যিক জীবনের শেষপর্যায়ে এই শব্দ প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্তি দিয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রথম কাব্য থেকেই জীবনানন্দ তাঁর 'প্রেত', 'ঘাস', 'ইঁদুর', 'পেঁচা', 'মাছি', নষ্ট শসা', 'পচা চালকুমড়ো'-এর মতো শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, যা সেই পর্বের কবিতায় ছিল অপাংক্তেয়। এছাড়াও ইউরোপীয় কবিতার প্রভাবে সমকালীন শিল্প- সাহিত্যে যে বিশ্বাসহীনতার যে চিত্র দেখা গিয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে। এই চিঠির উত্তরে জীবনানন্দ বলেন -

> "অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন— পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না।" [৬]

এরপর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ ই মার্চ জীবনানন্দ দাশ তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র একটি কপি প্রেরণ করে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন। ১২ই মার্চ, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কবিগুরু এই চিঠির প্রত্যুত্তরে জীবনানন্দের কবিতার 'স্বকীয়তা' বিষয়ে প্রশংসা করে একটি পত্র প্রেরণ করেন। কাব্যজগতের বৈপরীত্য সত্ত্বেও জীবনানন্দ অগ্রজ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্নেহাশীষ অন্তরে ধারণ করেছেন। তাঁকে 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষী' রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁকে কেন্দ্র করে জীবনানন্দের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামাঙ্কিত প্রায় ছয়টি কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কাব্যসমগ্রে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কবিতা ও পরবর্তী কবিদের উত্তরণের প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর একাধিক প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকার 'রবীন্দ্র সংখ্যা'-য় প্রথম জীবনানন্দ দাশের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কাব্য সমগ্র জীবনানন্দ দাশ' গ্রন্থে মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'আলোপৃথিবী' কাব্যের মধ্যে সংকলিত হয়েছে। সময়ের অলাধ চক্রে বন্দী 'মানুষের হৃদয়ের প্রীতির মতন এক বিভা' রূপে

আবির্ভূত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে মানুষ জীবিত হয়েও যখন মৃতের সামিল হয়েছিল, তখনই প্রাণের বাণী, জীবনের আশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে কবির কণ্ঠে -

> "অনেক সময় পাড়ি দিয়ে আমি অবশেষে কোনো
> এক বলয়িত পথে মানুষের হৃদয়ের প্রীতির মতন
> এক বিভা
> দেখেছি রাত্রির রঙে বিভাসিত হয়ে থেকে আপনার
> প্রাণের প্রতিভা
> বিচ্ছুরিত ক'রে দেয় সঙ্গীতের মতো কণ্ঠস্বরে।"[৭]

অস্থির, সংকটাপন্ন সময়ে প্রেম ও আস্তিক্যের বার্তা বহন করে এনেছেন তিনি। শুষ্ক মরুভূমির মতো বন্ধ্যা পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়েছেন প্রাণের স্পর্শে। তাঁর মহতী প্রতিভার প্রভাবে যা কিছু অশুভ, অমঙ্গলজনক সমস্তই দূরীভূত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে শোষণে-বঞ্চনায় নিষ্পেষিত মেরুদণ্ডহীন মানুষের ক্রমাগত অধঃপতন, মলিনতা গভীরভাবে ব্যথিত করেছে কবিকে। এই নরকগামী মানবজগতের পুনরুদ্ধারের জন্যই তাঁর আগমন। রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব পুনরায় কবি জীবনানন্দের মধ্যে সঞ্চার করেছে আশা। এক উজ্জ্বল পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন কবি, রক্তাক্ত সময় অতিক্রম করে আসা মানুষ যেখানে লাভ করবে শান্তি ও সমৃদ্ধি।

পরবর্তী 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামাঙ্কিত কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্য সংকলনে। পরবর্তীকালে এটিও 'আলোপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আধুনিক কবিরা যখন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধারণা পরিত্যাগ করে কবিতায় পাপ, অবিশ্বাস ও অমঙ্গলের চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে সমাজ ও সভ্যতার কালিক্ষয়ের দ্বারা অমৃত আস্বাদন করতে চেয়েছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ আশ্বাস রেখেছেন নিখিলের প্রতি। অন্ধ, বন্ধ্যা মরুভূমিতে তিনি সূর্যের মতোই প্রাণের উৎস। দৈনন্দিন জীবনযাপনের সংকীর্ণতায় বন্দি মানবাত্মাকে তিনি সন্ধান দিয়েছেন নিখিল মানবজগতের, যেখানে কর্ম ও জ্ঞানের মাধ্যমে সে লাভ করবে মুক্তি।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় অনুজ কবি জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন যুগত্রাতা হিসাবে। সভ্যতার আকাশে তিনি সূর্যের মতোই প্রাণের উৎস বিন্দু। তিনি আজ মানুষের মধ্যে নেই কিন্তু যে মর্মবাণী তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বমাঝে, তার হৃদয়স্পর্শী আবেদন মানুষের মনে জাগিয়েছে আশা। অন্ধকার সময়ও তাঁর মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস ধীশক্তিতে বলিয়ান করেছে আধুনিক মানুষকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনিবার্য নিয়ম অনুযায়ী এই অবক্ষয়ী সমাজ একদিন সত্যিই বিলীন হয়ে যাবে। সেদিন পুনরায় সৃষ্টির আদিপর্যায়ের মতোই পৃথিবী আবার হয়ে উঠবে সমৃদ্ধ –

"তোমার বিভূতি, বাক-বেদনার থেকে উঠে
নীলিমাসংগীতী আমাদের গরিমার বিকিরণে ডুবে,
গড়ে গেছে সব মানুষের প্রাণ : কী করে কল্যাণকৃৎ
অরথের তরঙ্গে জেগে (মোম নিভে গেলে) স্বাতী,
শুক্রতারকার মতন ধীমান
মহা অবয়বদের থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠে আভা
দিতে পারে :"[৮]

প্রকৃতির আগুনের উৎস থেকে একদিন আবির্ভাব ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের। সমস্ত কর্মের শেষে আবার প্রকৃতির বুকেই বিলীন হয়ে গিয়েছেন তিনি। তবু সমস্ত জটিলতা, অন্ধকারের মধ্যেও তিনি আপন ভাস্বরতায় উজ্জ্বল। পতঞ্জলি, প্লেটো, মনু, ওরিজেন, হোমারের মতো প্রবাদপ্রতিম পুরুষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে একই পঙক্তিভুক্ত করেছেন কবি জীবনানন্দ। যুগসন্ধির অন্ধকারে তাঁরা প্রত্যেকেই সঞ্চার করেছিলেন জ্ঞানের আলোক।

১৩৬১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'উষা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামের অপর একটি কবিতা। রবীন্দ্রনাথের দেহান্তর ঘটেছে। তাঁর সৌন্দর্যবোধ, প্রেমচেতনা, ঈশ্বরে অবিচল আস্থার বাণী, যা উচ্চারিত হয়েছিল কবিকণ্ঠে, তা ইতিহাসে লীন হয়েও বিশ্বমানবের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজও ধ্বনিত। সৃষ্টির প্রথম নাদ— সত্য, শিব, সুন্দরের মতো অবক্ষয়ী সময়ের প্রেক্ষাপটে এক সার্বভৌম সত্যের ন্যায় মানুষের চেতনার গভীরে তাঁর মূল প্রোথিত-

"সৃষ্টির প্রথম নাদ— শিব ও সৌন্দর্যের;
তবুও মূল্য ফিরে আসে
নতুন সময়তীরে সার্বভৌম সত্যের মতন
মানুষের চেতনায় আশার প্রয়াসে।"[৯]

'প্রতিক্ষণ' প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত 'জীবনানন্দ সমগ্র' (১৩৯১ বঙ্গাব্দ)-এর প্রথম খন্ডে সংকলিত 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এক যুগপুরুষ রূপে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবী তাঁর জন্য অপেক্ষারত ছিল। পরাহত, ক্ষুব্ধ, অবসাদগ্রস্ত পৃথিবীর ব্যথা নিরাময় হয়েছিল তাঁর মতো মহামানবের আগমনে-

"তারপর তুমি এলে
এ পৃথিবী সলের মতন
তোমার প্রতীক্ষা ক'রে বসেছিল..."[১০]

শুধু মানুষ নয়; কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখির মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণের প্রতিও ছিল তাঁর অপরিসীম করুণা। উপনিষদের 'সোহহং' অর্থাৎ 'ব্যক্তিগত আমি'-র খণ্ডিত সীমাকে অতিক্রম অসীম একের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আনন্দবোধ তাঁকে উন্নীত করেছিল এক পূর্ণতার অনুভবে। হিংসাক্ষুব্ধ পৃথিবীতে তিনি নিয়ে এসেছেন ত্যাগ, ক্ষমা,

সৌন্দর্যবোধের প্রেরণা। অবনত, রূঢ়, বিদ্ধ ও পীড়িত এক দৈত্যসম্রাটের মতো আমাদের যান্ত্রিক পৃথিবী ছিল মৃতপ্রায়। বিশ্বকবির গানের সুতো তাকে বেঁধেছে শান্তি, প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে। আমাদের মনে পড়ে যায় 'রক্তকরবী' নাটকের রাজার প্রসঙ্গ। নিষ্প্রাণ, যান্ত্রিকতার কারাগার থেকে তিনিও মুক্তি পেয়েছিলেন প্রাণের অঙ্গনে -

"এই গান গাহিয়াছ কবি তুমি,
পেয়ে চলে গেছ।
অবনত রূঢ় বিদ্ধ একটি পীড়িত মুখে কোন এক দৈত্যসম্রাটের মতো
আমাদের পৃথিবী— শতাব্দী তাহা শুনিয়াছে
যেমন শুনিয়াছে সল ডেভিডের গান"[১১]

কবিতার শেষে আবার বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন কবি জীবনানন্দ। আলোকপ্রতিম পুরুষ রবীন্দ্রনাথের লোকান্তর ঘটেছে। তাই আবারও হয়তো সুন্দরের হানি ঘটবে, শান্তি বিপর্যস্ত হবে। যদিও শেষপর্যায়ে এই দ্বান্দ্বিকতাকে অতিক্রম করে স্থির প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেও, যান্ত্রিক পৃথিবীর আঘাতে তাঁর কণ্ঠে মানবতার গান রক্তাক্ত হয়ে হলেও কবির শেখানো প্রেম ও সহিষ্ণুতার বার্তা পৃথিবীতে চিরন্তন হয়ে থেকে যাবে -

"ব্যারাকে ধাতুর বাদ্যে হৃদয়ের ধাতব আঘাতে
রুপালি শলার সেই দীর্ঘদেহ গানগুলো বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত হয়ে পড়ে রবে
মৎসনারীদের মৃত শরীরের মতো।
ব্যাথা রবে শুধু।
সহিষ্ণুতা রবে।
প্রেম রবে।"[১২]

জীবনানন্দ দাশ ষষ্ঠ 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামাঙ্কিত কবিতাটি কোনো কাব্যগ্রন্থ বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়নি। এই কবিতায় জীবনানন্দের স্বকীয়তা বজায় থাকলেও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনার প্রচ্ছন্ন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যু নিয়ে আসে এক অবিচল শান্তি। মৃত্যুর মধ্যেই রয়েছে সেই মহাজীবনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশ্বাস। বিপুল কর্মভার বহনের শেষে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন কবি। অবশিষ্ট থেকে গিয়েছে তাঁর সমস্ত কীর্তি, ভালবাসার বাণী। এই কবিতা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার অনুষঙ্গ -

"পৃথিবীর কোলাহল সব ফুরিয়ে গেছে
সেই শেষ ঘুম এসেছে নক্ষত্রের ভিড়ে
এখুনি তাদের আলো নিভে যাবে
পড়ে থাকবে অন্ধকার নিস্তব্ধ চরাচর
পড়ে থাকবে ভালোবাসার চিরকাল

সেই হিম অন্ধকার শান্তির ভিতর
বিধাতার হাতের কাজ ফুরিয়ে যাবে।"[১৩]

আধুনিক বাংলা কাব্যে চেতনাময় জগত নির্মাণ করেছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথকে সচেতনভাবে অতিক্রম করে আধুনিক কবিতা নিজস্বতার পথ বেছে নিয়েছেন যা সাহিত্যের স্বাভাবিক যুগলক্ষণ বলা যেতে পারে। জীবনানন্দের মতে, কবিগুরুর কাব্যে সমাজ ও ইতিহাসচেতনা এক নির্ধারিত সীমায় এসে মন্থর হয়ে পড়েছে। যে পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'সর্বত্রগামী' হতে পারেনি, সেই বিন্দু থেকেই আধুনিক কবিতার যাত্রা শুরু। সমাজব্যবস্থার অসংগতি দূরীভূত করে এক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চাইলেও আধুনিক কবিতার বিশুদ্ধ কাব্যিক আবেগ পরিহার করতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। শিল্প-সাহিত্যের শাশ্বত আবেদনে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। আধুনিক অবক্ষয়ী সময়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর বিরুদ্ধে বাস্তববিমুখতার অভিযোগ উত্থাপিত হলেও বাংলার কবিতার ভিত্তিভূমি তিনিই রচনা করেছেন। আধুনিক কবিরাও প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে অতিক্রম করতে প্রয়াসী হলেও রবীন্দ্রপ্রভাব তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন মননের গভীরে। জীবনানন্দের মতে –

"আমরা এবং বাংলার ঐতিহ্যের মনীষী ছাত্রেরা আমাদের সমর্থন করে এই কথা বলবে যে রবীন্দ্রসাহিত্য ও কবিজীবন দেশ ও জাতির মেরুদন্ড গঠন করতে গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে যেভাবে নিজেকে ক্ষয়িত করেছে, বাঙলা ছাড়া অন্য কোনো দেশে হলে হয়তো বা তার অপেক্ষাকৃত সুব্যবহার হত।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করলেও তাঁকে অস্বীকার করলেও করা সম্ভব নয়। জীবনানন্দ মনে করেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের কবিরা যেমন শেক্সপীয়রকে কেন্দ্র করে নিজেরদের কাব্যবৃত্ত অঙ্কন করেছেন, তেমনই বাংলা কবিতাও অনন্তকাল রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে নিজের জগত গড়ে তুলবে ।

তথ্যসূত্র (References):

১. Eliot,T.S. ,'Tradition and Individual Talent' '*Selected Essays*',2nd Ed., 1934, London, Faber and Faber Ltd, p. 14
২. দাশ, জীবনানন্দ, আগস্ট,২০২১ , 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য','কবিতার কথা', চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, নিউ স্ক্রিপ্ট, পৃ. ২৯
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী সংস্করণ, কার্ত্তিক, ১৩৬৫, 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা', 'সাহিত্যের স্বরূপ', কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ. ৪৪
৪. দাশ, জীবনানন্দ, আগস্ট, ২০২১, 'কবিতার কথা', 'কবিতার কথা', চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, নিউ স্ক্রিপ্ট, পৃ. ৮

৫. সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, পরিশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৭৭, 'রবীন্দ্র-জীবনানন্দ পত্রবিনিময়' 'শুদ্ধতম কবি', ঢাকা, নলেজ হোম, পৃ. ২৫০

৬. তদেব পৃ. ২৫১

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.), জুন, ২০২৩, 'রবীন্দ্রনাথ', 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৫২৭

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.), জুন, ২০২৩, 'রবীন্দ্রনাথ', 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৭৬০

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.), জুন, ২০২৩, 'রবীন্দ্রনাথ', 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৭৭৮

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.), জুন, ২০২৩, 'রবীন্দ্রনাথ', 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮১৩

১১. তদেব পৃ. ৮১৪

১২. তদেব পৃ. ৮১৫

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.), জুন, ২০২৩, 'রবীন্দ্রনাথ', 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮৮৪

১৪. দাশ, জীবনানন্দ, আগস্ট, ২০২১, 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', 'কবিতার কথা', চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, নিউ স্ক্রিপ্ট, পৃ. ২২

উৎপল দত্তের জালিয়ানওয়ালাবাগ : নির্মম হত্যার দলিল

মজিবুর রহমান সেখ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে উৎপল দত্ত এক অবিস্মরণীয় নাম। স্বাধীনতা উত্তরকালে যাঁর আবির্ভাব নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতা রূপে। ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ অবিভক্ত বাংলার বরিশালে তাঁর জন্ম। তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাইতো তাঁর অধিকাংশ নাটকে মানুষের অধিকারের কথা বর্তমান। তবে সেই অধিকার অহিংস নীতিতে নয় বরং ছিনিয়ে নেওয়ার নীতি। উৎপল দত্তের বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'। ১৯১৯ সালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত এই নাটক। যেখানে ইংরেজ জেনারেল ডায়ার এবং তার পঞ্চাশ জন সৈনিক মিলে বারোশত নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করেছিল। 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' নাটকটি রচিত ঐতিহাসিক বিষয়কে কেন্দ্র করে। যার প্রেক্ষাপট ১৯১৯ সালের হত্যাকাণ্ড। পঁচিশ হাজার মানুষের সমাবেশে প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে নিরস্ত্র মানুষের উপরে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। সশস্ত্র রাজনীতি এবং অহিংস কূটনীতির যাঁতাকলে পিষে গেছে শত শত মানুষের প্রাণ, যার মধ্যে রয়েছে নারী শিশু বৃদ্ধ সকলে।

সূচক শব্দ : অহিংসা, বিপ্লব, ইংরেজ, পুঁজিবাদ, হত্যা, সৈনিক, অত্যাচার, স্বাধীনতা।

মূল প্রবন্ধ :

বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে উৎপল দত্ত এক অবিস্মরণীয় নাম। স্বাধীনতা উত্তরকালে যাঁর আবির্ভাব নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতা রূপে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন তাঁর নাট্যজীবনের শেষপর্যায়ে, নবনাট্যের নতুন ভাবধারা নিয়ে যখন শম্ভু মিত্র একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করছেন তখন গণনাট্যের বিপ্লবী চিন্তা নিয়ে আবির্ভাব উৎপল দত্তের। মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী উৎপল দত্তের অভিপ্রায় নাটকের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের পরিবর্তন। যার ফলস্বরূপ তার নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে তীক্ষ্ণ বাস্তবতা। সমাজের যা কিছু সুন্দর যা কিছু কোমল, মোহময় রূপের প্রতি তাঁর কোন আস্থা ছিল না। তাই তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে রুক্ষতা ও রূঢ়তা লক্ষ্য করা যায়। যার কারণে তাঁর নাটকের সংলাপও তীক্ষ্ণ এবং চরিত্রের মতোই রুক্ষ এবং রূঢ়।

১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ অবিভক্ত বাংলার বরিশালে তাঁর জন্ম। তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাইতো তাঁর অধিকাংশ নাটকে মানুষের অধিকারের কথা বর্তমান। তবে সেই অধিকার অহিংস নীতিতে নয় বরং ছিনিয়ে নেওয়ার নীতি। নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে না নিলে তা যে কেউ দেবে না এই পন্থায় তিনি বিশ্বাসী। উৎপল

দত্তের বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘জালিয়ানওয়ালাবাগ’। যা বর্তমানে আলোচ্য বিষয়। **১৯১৯** সালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত এই নাটক। যেখানে ইংরেজ জেনারেল ডায়ার এবং তার পঞ্চাশ জন সৈনিক মিলে বারোশত নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করেছিল।

‘জালিয়ানওয়ালাবাগ’ নাটকটি রচিত ঐতিহাসিক বিষয়কে কেন্দ্র করে। যার প্রেক্ষাপট **১৯১৯** সালের হত্যাকাণ্ড। পঁচিশ হাজার মানুষের সমাবেশে প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে নিরস্ত্র মানুষের উপরে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। সশস্ত্র রাজনীতি এবং অহিংস কূটনীতির যাঁতাকলে পিষে গেছে শত শত মানুষের প্রাণ, যার মধ্যে রয়েছে নারী শিশু বৃদ্ধ সকলে।

বারোটি দৃশ্যে বিস্তৃত নাটকটি শুরু হয়েছে প্রৌঢ় অর্জন সিংয়ের বাড়িতে। অর্জন সিং ইংরেজ শাসিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুবেদার। যিনি ইংরেজদের বিশ্বস্ত সুবেদার। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্লোগান উঠলেই সকলের আগে বিপ্লবীর বুক ঝাঁজরা করতে যিনি প্রথম সারিতে থাকেন। অর্জন সিংয়ের বড় ছেলে গুরদিৎ সিং ইংরেজ সেনাবাহিনির সঙ্গে যুক্ত। গুরদিৎ সিং এবং তার বন্ধু মকবুল যুদ্ধ জয় করে বাড়ি ফিরছে। তাই অর্জন সিং ফুলের মালা দিয়ে পুত্র গুরদিৎ সিং এবং মকবুলকে ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য আকুল হয়ে আছেন। নাটকের প্লট পরিবর্তন শুরু হয়েছে গুরদিৎ এবং মকবুলের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই। একটি হাত এবং একটি চোখের বিনিময়ে গুরদিৎ ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরেছে। ফিরেই পিতা অর্জন সিং এর সামনে উদাত্ত কণ্ঠে জানিয়ে দেয় তারা আর ইংরেজদের পক্ষে লড়াই করবে না, তাদের যুদ্ধ বরং ইংরেজদের বিরুদ্ধে। তারা উপলব্ধি করেছে স্বাধীনতার থেকে বড় অধিকার কিছু নয়। পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলতে তারা তাদের দেশমাতৃকাকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করতে চায়। আর সেই পথের বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়ে স্বয়ং সুবেদার অর্জন সিং মুসাফির। যিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর বন্দুক থেকে বেরোনো গুলি কখনো মিস করে না। গুরদিৎ এবং মকবুল যুক্ত হয়েছে সৈফুদ্দিন কিচলু, সত্যপাল, রেশমাদের দলে। যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী।

সৈফুদ্দিন কিচলু যিনি কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের নেতা, যাঁর মতের সঙ্গে গান্ধীবাদী আদর্শে বিশ্বাসী কানাইয়ালালের বরাবর একটা ঠাণ্ডা লড়াই লেগেই আছে। কানাইয়ালাল জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে ইংরেজের দ্বারা উপকৃত হয়েছে বারবার। যেখানে যুদ্ধ হওয়ার কথা কংগ্রেস বনাম ইংরেজ, সেখানে যুদ্ধ লেগেই আছে সশস্ত্র বিপ্লবী এবং অহিংসার নাম করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি ঘটানো কিছু নেতার। সৈফুদ্দিন কিচলু একজন দাপুটে নেতা, যাঁকে সকলে বিশ্বাস করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পিছুপা হয় না। যেমন রেশমার মতন মেয়ে। যার স্বামী কিনা নিজে না খেয়ে রেশমার জন্য রোজ বাজার থেকে দুটো করে রুটি নিয়ে আসে। যার শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে নিজের মেয়ের থেকেও বেশি ভালবাসে, বিশ্বাস করে। তাদের অভাবের সংসারে

দুবেলা ঠিকমতো খাবার জোটেনা। সেই রেশমাও দেশের স্বার্থে স্বাধীনতা লাভের আশায় মানুষের অধিকারের দাবিতে নিজেকে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করেছে। দরিদ্র হওয়ায় গিরিধারীলাল রেশমাকে নানান কুপ্রস্তাব দিয়েছে। জি. এস. টমসনের বাড়িতে কাজ করার কথা বলেছে। গিরিধারীর প্রস্তাবে রেশমা কখনই রাজি হয়নি। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে সৈফুদ্দিন কিচলুর পরামর্শে টমসনের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে।

রেশমা ব্যাংক মালিক জি. এস. টমসনের বাড়িতে কাজে যুক্ত হয়েছে শিল্পপতি গিরিধারীলালের মাধ্যমে। স্বামীর কাছে, পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে রেশমা একজন পতিতা হিসেবে পরিচিত হয়েছে। আজ আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করছি তা রেশমাদের মতো সাহসী নারীর বলিদানের ফল। অথচ জনতা রেশমাকে বেশ্যা বলে গালি দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি-

> "চন্দ্র।। - দেশশুদ্ধ লোক জানে কেন। ও ফিরিঙ্গির বেশ্যা, তাই।
> জনতা।। - বেশ্যার শাস্তি চাই ! শাস্তি চাই !"

সকলে সম্বিত ফিরে পায় যখন মকবুল বলে-

> "ফিরিঙ্গির বেশ্যা? নির্বোধের দল! সৈফুদ্দিন কিচলুর শিষ্যা রেশমাদেবীর কথা বলছিস? আজকের লড়াইকে যাঁরা সম্ভব করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক যোদ্ধা হচ্ছেন ঐ রেশমাদেবী! একথা এতদিন বলতে পারিনি, এবার বলছি- রেশমাদেবীর আত্মত্যাগে আমাদের এই সংগ্রাম স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। আমাদের নির্দেশে উনি ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে প্রবেশ করেছিলেন ইংরেজের দুর্গে, দিনের পর দিন প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে তাদের গোপন তথ্য পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে, এবং শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে ভোগ করেছেন নির্যাতন ও লাঞ্ছনা। সর্বসমক্ষে আমি ওঁর পা ছুঁয়ে জানাচ্ছি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা।"

রেশমাদেবীর মত শত শত বিপ্লবী সর্বসমক্ষে নীরবে বলিদান দিয়ে দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছে।

গুরবচন সিং যার কথা না বললে নাটকের পূর্ণতা আসে না। গুরবচন সিং সুবেদার অর্জন সিং মুসাফিরের ছোট ছেলে, গুরদিৎ সিংয়ের ছোট ভাই। সশস্ত্র বিপ্লবীরা যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্রের জোগান দিতে চায়। কিন্তু ইংরেজ সরকারের কড়া পাহারায় কেউ সেই কাজ করতে যখন অপারগ তখন এগিয়ে এসেছে গুরবচন সিং। রেলশ্রমিকের কোয়াটারে রাইফেল গেছে মালের লরিতে। কিন্তু রাত থেকে রেললাইন পেরিয়ে কারোর যাওয়ার অনুমতি নেই। গুরবচন যেহেতু ছোট, কেউ যাতে সন্দেহ না করে তাই তার মাধ্যমে টোটার বস্তা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সৈফুদ্দিন কিচলুরা। গুরবচন যখন ধরা পড়েছে তখন নিজেকে মাসুদ কশাইয়ের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছে এবং বলেছে তার বস্তায় মাংস আছে। কখনও বলেছে তার বস্তায় কাচের বোতল আছে। তবুও ইংরেজের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। অর্জন সিংয়ের ছোট ছেলে গুরবচন

বস্তা করে টোটাগুলি নিয়ে যাওয়ার সময় ইংরেজের হাতে ধরা পড়ে অসহনীয় অত্যাচারের পরেও মুখ খোলেনি। ডায়ারের শত অত্যাচারের পরও তার প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়নি গুরবচন। ক্ষতস্থানে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়ার পরও গুরবচন মুখ খোলেনি। এতটাই অত্যাচার করা হয়েছিল যে কঠিন হৃদয় অর্জন সিংও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে এই গুরবচন তারই সন্তান। গুরবচনকে দেখে আমাদের ক্ষুদিরামের কথা মাথায় আসে। যিনি হাসি মুখে ফাঁসিকাঠে উঠেছিলেন। গুরবচন-গুরদিতের মায়েরা তাঁদের সন্তানকে ফাঁসিকাঠে চড়ার অনুমতি দিয়েছেন, বিনিময়ে চেয়েছেন ভারত মাতার মুক্তি। মহিন্দরের উক্তিতে সেই কথায় স্পষ্ট হয়েছে-

> "অন্যায়! তুই পথ দেখিয়েছিস বাবা। তুই এখন আর শুধুই আমার ছেলে না, তুই হাত ধরে নিয়ে চলেছিস কি এক আশ্চর্য আনন্দের পথে, জীবনে যা কখনো পাইনি। তুইও তো চলে যাবি, গুরদিৎ, মাকে কাঁদিয়ে চলে যাবি - একদিন না একদিন - ফাঁসি কাঠে বা লড়াইয়ে মরতে চলে যাবি - চলে যা, দুভায়ে হাত ধরাধরি করে চলে যা দেশমায়ের কাছে। সে মা আমার চেয়ে অনেক ভালো মা। আমি হয়তো একটু কাঁদবো। কান দিসনে। ফিরেও তাকাস নে। কেননা সে কান্নাটা সামান্য একটু অভিমান, আমাকে ভুলে গেলি বলে। ও কিছু নয়।"

এইরকম বিপ্লবী মায়েদের ত্যাগ-বলির বিনিময়ে কাম্য শুধু স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা আদায়ে যতটা না বাধা ইংরেজ শক্তি তার থেকেও বড় বাধা কানাইয়ালালদের মত স্বার্থান্বেষী মানুষ। যারা অহিংসার বুলি আওড়ে দেশটাকে তুলে দিয়েছে ইংরেজদের হাতে।

অহিংস এবং সশস্ত্র বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ইংরেজদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করা। অহিংসার পথে চলা বিপ্লবীরা ইংরেজদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা রেখে সাধারণ মানুষকে একই অবস্থায় রাখতে চেয়েছে। ইংরেজদের হাত শক্ত করতে বারবার এগিয়ে এসেছে কানাইয়ালাল, গিরিধারিলালদের মতো মানুষেরা। নিজেদের আখের গোছাতে তারা নিজেদের সঙ্গীদের গোপন খবর ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছে। অপরদিকে সশস্ত্র বিপ্লবীরা মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করে চলেছে প্রতিনিয়ত। সশস্ত্র বিপ্লবীদের আক্রমণে যখন ইংরেজদের নাজেহাল অবস্থা, পাঞ্জাবে ঢোকার রাস্তা প্রায় বন্ধ তখনই ইংরেজদের হাত শক্ত করতে এগিয়ে এসেছে কানাইয়ালালদের মত মানুষ। কানাইয়ালালের মতে গান্ধীবাদ বনাম বলশেভিক বিপ্লববাদী লড়াই চলছে। সেই লড়াইয়ে জেতার জন্য তারা যেকোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারে। তার কারণ কানাইয়া, গিরিধারীরা জানে বিপ্লববাদ জয়ী হলে তাদের কত বড় সর্বনাশ হবে। তাইতো তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সৈফুদ্দিন কিচলু, সত্যপাল, গুরদিৎদের ধরিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

অর্জন সিংয়ের মতো সৎ মানুষ তার সততার বিনিময়ে কি পেয়েছেন! সারাজীবন ইংরেজের সেনাবাহিনিতে থেকে তাদের হয়ে কাজ করেছে সততার সঙ্গে। নিজের ছেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রয়োজন পরলে যিনি নিজের ছেলের বুকে গুলি চালাতেও পিছুপা হবেন না এমন কথা বলেছেন। অর্জন সিংয়ের ছোট ছেলে টোটার জোগান দিতে গিয়ে যখন ইংরেজদের হাতে বন্দি হয় এবং অত্যাচারিত হয় তখনও তিনি তাকে নিজের ছেলের পরিচয় দেননি। কিন্তু ইংরেজদের অমানবিক অত্যাচারে যখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেননি তখন গুরবচনকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছেন। সারাজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন ইংরেজের সেবায়, তাঁকেও বিশ্বাসঘাতক আখ্যা পেতে হয়েছে।

অহিংসার নাম করে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করেছে কানাইয়ালাল, গিরিধারীদের মতো মানুষেরা। বিপ্লবীদের চাপে যখন ইংরেজদের নাজেহাল অবস্থা, যখন তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে তখন কানাইয়ালাল বারবার বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিয়েছে নানা কৌশলে। শুধু তাদের বন্দি করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। ডায়ারের মতো নিষ্ঠুর মানুষের হাতে হত্যা করিয়েছে শত শত মানুষকে। জমায়েতের নাম করে সাধারণ মানুষকে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক অন্ধকূপে এনে হাজির করেছে। যেখানে চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। শিশু কোলে করে মায়েরা এসেছেন, পিতারা এসেছেন শিশুপুত্রকে কাঁধে নিয়ে কানাইয়ালালকে দেখতে। সকলে এলেও কানাইয়ালাল আসেনি। একটা অন্ধকূপে নিরস্ত্র জনতাকে দাঁড় করিয়েছে কানাইয়ালাল। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবেশদ্বার ছাড়া আর অন্য কোন রাস্তা নেই যে জনতা সেই দিক দিয়ে পলায়ন করবে। যে দিকে রাস্তা আছে সেই দিকটাও দখল করে আছে ডায়ারের সেনারা। ব্রিজ গোপীমোহনের কথায়-

> “মনে রাখবেন এ প্রান্তর থেকে বেরুবার আর কোনো পথ নেই - একমাত্র পথ আগলে রেখেছে ডায়ারের ফৌজ।”

বারবার গুলি বর্ষণে মৃত্যু ঘটে বারোশত জনতার –

> “গুলি লাগছিল লোকের মাথায়, চোখে, মুখে, বুকে, পেটে। একটা ভয়ঙ্কর রোষের গর্জন - জাগলো জনতার মধ্য থেকে। পালাচ্ছে – বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, শিশুর দল। কোথায় পালাবে ? অন্ধকূপ। চারিদিকে প্রাচীর। যুবক যারা তারা প্রাচীরের ওপর চড়তে শুরু করলো, লাফিয়ে ওপাশে পড়ার আশায়-”

অহিংস আদর্শবাদী এবং সশস্ত্র বিপ্লবীদের মনোমালিন্য, অহিংসার নাম করে কানাইয়ালালদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার ফলস্বরূপ বিশাল এই হত্যালীলা সত্যিই রোমহর্ষক। ইংরেজের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার নাম করে অহিংসবাদীরা সাধারণ মানুষকে মরণকূপে এনে হাজির করল যার ফলে শত শত নিরস্ত্র মানুষের প্রাণ

গেল। সাধারণ শ্রেণীর মানুষ যে সবসময় অত্যাচারিত তা আবারও প্রমাণিত এই নাটকের মাধ্যমে।

এইরকম নৃশংসভাবে গুলি চালিয়ে ডায়ারের মতো পাষাণ হৃদয় মানুষেরও আত্মা কেঁপে উঠেছিল সেখানে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের স্বার্থপরতার জন্য সাধারণ মানুষের করুণ অবস্থার জন্য নাট্যকার অহিংস আন্দোলনকেই বেশি করে দায়ী করেছেন। দায়ী করেছেন তাদের যারা নিরস্ত্র মানুষগুলিকে এই অন্ধকূপে এনে হাজির করেছে। জমিদার, রাজা-মহারাজা আর মিল মালিকদের দায়ী করেছেন যারা সবসময় ব্রিটিশদের সাহায্য করেছে। ইংরেজদের থেকে আসল শাসক তো তারাই এই কথাই নাট্যকার তাঁর এই নাটকে সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন।

আকর গ্রন্থ :

১) দত্ত উৎপল, 'উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র' (চতুর্থ খণ্ড), 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট; কলকাতা-৭৩, 'মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ'।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) ঘোষ অজিতকুমার, আগস্ট ১৯৮৫, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', ১১৯ লেলিন সরণি, কলকাতা-১৩, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

ছিন্নমূল মানুষের অস্তিত্বের সংকট : অমর মিত্রের ছোটগল্প

সৌমেন দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ডোমকল কলেজ, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ : আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও বাঙালি জাতির জীবনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিপর্যয় হল দেশভাগ। অমর মিত্র তাঁর গল্পের আঙিনায় তুলে ধরেছেন দেশভাগের পরের জীবন, তার পাশাপাশি অতীতের ফেলে আসা স্মৃতির ছবি। পূর্ববঙ্গ থেকে বাধ্য হয়ে চলে আসা প্রতিটি মানুষের মধ্যে অতীত সম্পর্কগুলো খোঁজার যে তাগিদ লক্ষ্য করা যায় তারই ছবি রয়েছে **'দমবন্ধ'** গল্পে। দেশভাগের ফলে ফেলে আসা অতীতের রোমহর্ষকর স্মৃতিকে এক আধুনিকতার স্পর্শে উজ্জ্বল করে তুলেছে '২৫-১২৫' গল্প। আবার 'অন্ন পরমান্ন' গল্পে সাতচল্লিশের দেশভাগ পরবর্তী জীবনে পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ফেলে আসার স্মৃতির এক গভীর অনুভূতি লক্ষিত হয়। **'হারানো নদীর স্রোত' গল্পে** নদীমাতৃক বাংলাদেশের শুকিয়ে যাওয়া নদীর স্রোতের আবহে মানুষের ফেলে আসা মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ পরিলক্ষিত হয়েছে।
সূচক শব্দ : দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবন, ছিন্নমূল, স্মৃতি, অস্তিত্ব।

মূল আলোচনা :

দেশভাগ তো শুধু সীমারেখা মাত্র নয়, তা ছিন্নমূল মানুষের মনেরও এক দ্বিধাদীর্ণ বিভাজন। বিখ্যাত সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "মহাযুদ্ধের দুর্যোগের রাত্রির পরে উঠে দেখি বিধ্বস্ত জীবন, ঝরা আর মরা পাতার স্তুপ। সেই জ্বর জ্বর সকালে স্বাধীনতার সূর্যালোকও যেন ভালো করে ফুটল না। ইতিমধ্যে আরও একটা সর্বনাশ ঘটে গিয়েছিল কিনা। প্রথমে দাঙ্গা, পরে পার্টিশন।........ সমাজে অস্তিত্বের অস্থিতে মজ্জায় কাপুরুষতার বীজ বাসা বাঁধল। ব্যাপক হারে এই প্রথম। .... মাটির শিকড় যাদের ছিঁড়ে গেছে তাদের বুকে ভালোবাসা বিশেষ অবশিষ্ট থাকে না। বিশেষ, যাদের সম্মান গেছে, সম্পদ গেছে, তারা ক্ষমাহীন তিরস্কারে ভরা চোখে চেয়ে থাকে। নির্বাক অভিশাপ ছিল নাকি? হয়তো ছিল। আগে থেকেই টলোমালো সমাজের ভারসাম্য আর এলো না, কেননা ওঁরা স্থান যদি বা পেলেন, স্থিতি পেলেন না। .... জনগোষ্ঠীর বিরাট একটা ভাগ অর্থনৈতিক স্বস্তি কখনও পেল না। আন্তরিক দিক থেকে তাদের যথার্থ পুনর্বাসন কখনও ঘটেনি। এক দেহে লীন হবে কি, তেল আর জল কতকটা

> আলাদাই রয়ে গেল। যাদের মূল্যবোধ ধসেছে কিংবা যাদের জন্মায়ইনি, স্নেহপ্রীতি স্বাদেশিক মানবিক চেতনা ইত্যাদি, তাদের চিত্তের ফলকে নতুন কোনও মূল্যপাত পড়ল না।"[১]

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও বাঙালি জাতির জীবনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিপর্যয় হল দেশভাগ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দীর্ঘ শাসনকালে স্থানীয় হিন্দু মুসলমানদের ধর্মবিরোধকে ইংরেজরা বারবার তাদের শাসন ক্ষমতা স্থায়িত্বের কাজে ব্যবহার করে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ব্রিটেন সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে উদগ্রীব হয়। প্রায় ২০০ বছর উপনিবেশিক শাসন অন্তে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ভারত তা ছিল খণ্ডিত এবং সমস্যা জর্জরিত। ভারতীয় উপমহাদেশকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে গঠিত হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র। জাতি ও বর্ণের এই বিভাজনের কারণে ভারতের মুসলমানেরা অনেকেই চলে গেলেন পাকিস্তানে আর ইসলাম ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা চলে এলেন ভারতে। নিজভূমে পরবাসী হয়ে নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে রওনা দিলেন অচেনা অজানা দেশে। একদল মানুষ দেশভাগে খুশি হল, কিন্তু অসংখ্য মানুষকে ভোগ করতে হয়েছে উদ্বাস্তু সমস্যার মত নিদারুণ যন্ত্রণা। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছিন্ন হয়ে গড়ে ওঠে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এই দুই দেশভাগের ইতিহাস প্রাথমিকভাবে সাহিত্যে যতটা প্রভাব ফেলেছে তার থেকে বেশি প্রভাব ফেলেছে অত্যাচার ও দাঙ্গার ভয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু বাঙালি জীবনের ইতিহাস।

আমরা বাঙালিরা আজও ভুলতে পারিনি দেশভাগের অমানুষিক অত্যাচার। বাঙালির চিরন্তন বন্ধনকে দ্বিজাতিতত্ত্ব এক বিরাট আঘাত আনে। আর এর থেকেই শুরু হয় রাজনৈতিক স্বার্থসংঘাত লোভ-লালসা। ধর্মীয় বিদ্বেষকে ভিত্তি করে যে বিভেদ দেখা দেয় তাকেই কাজে লাগায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। আর সেইসব সুবিধাবাদী মানুষের দল সম্পর্কের বন্ধনকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে শুধু সম্পর্কের বন্ধনই ছিন্ন হয় না, মাটির টানেও যেন ক্রমে ধূসর হতে শুরু করে। এতদিনের আঁকড়ে ধরে থাকা মানুষের জীবন যেন শিকড় হারিয়ে ছিন্নমূল হয়ে পড়ল। বিষাক্ত রাজনীতি মানুষের জীবনকে মাকড়সার জালের মতো ঘিরে ধরল। দেশভাগের নিষ্ঠুরতা মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদাভেদ যেমন তৈরি করল, তেমনি গড়ে তুলল উভয়ের মধ্যে সুতীব্র ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান।

এত বড় ঘটনা সাহিত্যের প্রভাব ফেলবে এটাই স্বাভাবিক। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের করুণ কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন সাহিত্যিক যেমন- আবু ইসহাক, শহীদুল্লা কয়সা, রাজিয়া খান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি রায়, দেবেশ রায়, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ বাংলা উপন্যাস, গল্প, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা রচনা করেছিলেন। এঁদের

কিছু সময় পরে যাঁরা দেশভাগোত্তর জীবন নিয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র।

অমর মিত্র দেশভাগোত্তর উদ্বাস্তু জীবন সম্পর্কে বলেছেন-

> “উদ্বাস্তু জীবন অভিশপ্ত জীবন। দেশ চলে গেলে গ্রাম চলে গেলে নদী চলে গেলে মানুষ উদ্বাস্তু হয়। বাস্তু ভিটের সঙ্গে গাছগাছালি, নদী, পুকুর, বাগান সবই তো জড়িয়ে থাকে। সাতপুরুষের দেশে যখন অবাঞ্ছিত হয়ে যায় মানুষ, তখন সে সব হারায়, নিজের গ্রাম, নিজের নদী, পুকুরঘাট, বটতলা, ঝাউতলা, হরিতলা। সীমান্তরেখার কুড়ি মাইল দূরে আমাদের গ্রাম ধূলিহর আমাদের নদী বেতনাকে কুড়ি লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের করে দেয়। আর ফেরার উপায় নেই। সব হারানোর হাহাকার ভুলতে সমস্তজীবন লাগে। এক জীবনে হয় না, আর এক জীবন লাগে। দেশ কী, দেশ হলো আমাদের সাতপুরুষের ভিটে, অন্নদা মিত্তির, তস্য পিতা যাদবচন্দ্র মিত্তির, তস্য পিতা চণ্ডীচরণ মিত্তির, তস্য পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্তির, তস্য পিতা...র ভিটেই হলো দেশ। কথায় বলে না গ্রাম দেশ। গ্রামই দেশ। স্বদেশ। আমরা সেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম। উদ্বাস্তু। রিফিউজি। দলে দলে। দেশভাগের পরের প্রথম নয় বছরেই পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এসেছিলেন ২১ লক্ষেরও বেশী মানুষ।”[২]

অমর মিত্র তাঁর গল্পের আঙিনায় তুলে ধরেছেন দেশভাগের পরের জীবন, তার পাশাপাশি অতীতের ফেলে আসা স্মৃতির ছবি। কয়েকটি গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

পূর্ব বাংলা ছেড়ে বাধ্য হয়ে চলে আসা প্রতিটি মানুষের মধ্যে অতীত সম্পর্কগুলো খোঁজার যে তাগিদ লক্ষ্য করা যায় তারই জ্বলন্ত ছবি রয়েছে অমর মিত্রের ‘দমবন্ধ’ গল্পে। গল্পটিতে সম্পর্ক খোঁজার ছবিই নয় পাশাপাশি রয়েছে মানুষের মধ্যে বাঁচার তাগিদ, আর তার জন্য নানান আধুনিক ভাবনা। এই ভাবনার কারণে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে অতীত ঐতিহ্য, মানুষের হৃদ্যতার সম্পর্ক, শুধু রয়ে যায় স্বার্থের খেলা। গল্পের একদিকে প্রভাময়ীর পূর্ববঙ্গের অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরে সম্পর্কের আবর্তে ধরে রাখার প্রয়াস, অন্যদিকে সুরেনবাবুর স্ত্রীর মধ্যে রয়েছে আধুনিক মূল্যবোধহীনতার ছোঁয়া, যেখানে শুধুই বাঁচার তাগিদ, সম্পর্ক রক্ষার অপেক্ষা অর্থ বা প্রতিপত্তি বড় হয়ে ওঠা।

গল্পের শুরুতে দেখা যায় পূর্ববঙ্গ ছেড়ে বাধ্য হয়ে চলে আসা পরিবার বীরেন্দ্র ও তার ভাইয়েরা বিভিন্ন ভাবে বাঁচার চেষ্টা করেছে। বড় ভাই অবশ্য আজ মৃত, কিন্তু তাঁর পুত্র নবনীত আজ আই.এ.এস। পরিবারের কেউ যেমন ভালো চাকরি করলে সকলে গর্ববোধ করে আবার পরিবারের কারো খারাপ কাজ সমগ্র পরিবারকে

অসম্মানের দরজায় পৌঁছে দেয়, যা স্পষ্ট হয়েছে গল্পের শেষে সুরেনবাবুর স্ত্রীর বক্তব্যে। একটি বিবাহের সম্বন্ধকে নিয়ে দুটি পূর্ববঙ্গ ত্যাগী পরিবারের ক্ষণিকের আলাপ আলোচনায় যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানুষের মূল্যবোধ, বাঁচার তাগিদ। তবে যাই হোক না কেন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত দুটি পরিবার সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্ববঙ্গের পরিবারকে বেছে নিয়েছে, এতে বোঝা যায় যে তাদের মধ্যেকার অতীত চিন্তা চেতনার। শুধু দেশভাগ বা তার পরবর্তী নানান প্রতিবন্ধকতা মানুষকে করে তুলেছে অমানুষ। যে পূর্ববঙ্গের মানুষের আতিথেয়তা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না, আজ প্রত্যেকে নিজেরটুকু দেখতেই ব্যস্ত। তাই বীরেন্দ্র তার আই.এ.এস. ভাইপোকে নিয়ে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে যেতে চেয়েছে। তার মনে হয়েছে এতে নগদ টাকাটুকু বাঁচানো যাবে। আসলে এখানে আত্মীয়তা বা সৌজন্যবোধ বড় হয়ে ওঠেনি, বড় হয়েছে নিজের স্বার্থটুকু।

বীরেন্দ্র কিংবা তার পরিবারের মধ্যে যে আধুনিক চলমান জীবনের যান্ত্রিকতা গ্রাস করেছে, তেমনি সুরেনবাবু ও তার পরিবারের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধহীনতার ছবি স্পষ্ট লক্ষিত হয়েছে। যেখানে একটি পরিবার চেয়েছে পূর্ব সম্পর্ক সূত্র ধরে অন্য পরিবারের সঙ্গে একটা নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে, সেখানে সুরেনবাবু বা তার স্ত্রী যেন কিছুতেই তার পুরনো সেই পূর্ববঙ্গের মানবিক বোধগুলোকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। আসলে দেশভাগ, উদ্বাস্তু ও তার পরবর্তী জীবন হয়তো লেখক এখানে বর্ণনা করেননি, তবে এটা বুঝে নিতে হয় আজ দুটি পরিবার যেভাবে বাঁচতে শিখেছে তা অনেক লড়াই ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়েই হয়তো অনেক মানুষের প্রতারণায় কিংবা অনেক কিছু হারিয়ে আজ তারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের মনুষ্যত্ববোধ। তাই প্রভাময়ী যতই অতীতের সম্পর্কগুলো ধরে চেষ্টা করেছেন একটা যোগসূত্র রচনা করতে সুরেনবাবু ও তার স্ত্রী ততই সরে যাচ্ছেন সেখান থেকে। প্রভাময়ীর চালাকি যেন ধরে ফেলে খুলনার বাঁকা সংগ্রামপুরের মেয়ে। তাই সুরেনবাবুর স্ত্রী শুনিয়ে দেয় মসলন্দপুরের মামলাবাজ ফোর টোয়েন্টি দেবরের কথা এবং সঙ্গে জে এল আর অফিসে চাকুরীরত ছেলের কথা। মানুষে মানুষে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে এসে পরিবারের দুর্নাম শুনতে হয়েছে প্রভাময়ীকে। লজ্জা ও অসম্ভব অপমানবোধ তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। লেখক এর বর্ণনা তার অসহায়তায় স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে-

> "প্রভাময়ী কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। পারছিলেন না। চোখের সামনে মহাশূন্য অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই নেই। ঠিক গত রাতের মতো কোথাও কোনো শব্দ নেই। স্তব্ধ আকাশ অন্ধকার তাকে ঘিরে ধরছে ক্রমশ। একা লাগছিল প্রভাময়ীর। খুব একা। কাল রাতে বাতাস টুকুও ছিল। এখন তো তাও যেন নেই। প্রভাময়ী প্রাণপণে অদৃশ্য ট্রানজিস্টারের নব ঘুরিয়ে চলেছিলেন। খুলনা, সাতক্ষীরে, ইছামতী, রূপসা, উতুলি, হড্ডিলি, ফিঙড়ি, ধুলিহর সব পার করে এপারে মসলন্দপুর থেকে চাপা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যেন ইথার তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে

পড়েছে ক্রমশ। সেই শব্দ ঘিরে ধরেছে তাকে। দমবন্ধ হয়ে আসছে একটু একটু করে।”

গল্পটিতে ভিন্নতর জীবন জিজ্ঞাসা ছবি তুলেছেন গল্পকার। দেশভাগ পরবর্তী পূর্ববঙ্গের দুটি পরিবার কথা রয়েছে যাদের মধ্যে শুধু একটাই মিল তারা দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল হয়ে এদেশে উদ্বাস্তুদের মতো জীবনযাপন করেছে। কিন্তু এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে যখন দেশভাগ বাহিত হয় তখন তাদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধগুলো রক্ষিত হয় না, বরং তারা প্রত্যেকে নিজের জায়গা নিয়ে থাকতে চেয়েছে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অন্যকে ব্যবহার করেছে। এমনকি তারা উভয়ে যে সর্বহারা থেকে বাঁচতে শিখেছে সেই সৌজন্যবোধটুকু হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কাছে ছিন্ন শিকড়ের অনুসন্ধান মূল্য পায় না, বরং বড় হয়ে ওঠে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। আর এই অনুভূতি উপলব্ধি করতে পেরেই যেন প্রভাময়ীর দমবন্ধ হয়ে ওঠে।

অমর মিত্রের **‘অন্ন পরমান্ন’** গল্পে সাতচল্লিশের দেশভাগ পরবর্তী জীবনে পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আসা প্রজন্মের স্বপ্ন ও অতীত ফেলে আসার স্মৃতির এক গভীর অনুভূতি লক্ষিত হয়। দেশভাগের পরবর্তীতে ওপার বাংলা ছেড়ে আবীর দত্তের পরিবারকে চলে আসতে হয় এপার বাংলায়। বহুদিন কেটে গেছে, তারপর হঠাৎ করে আবীর পূর্বপুরুষের ভিটে দেখতে যাওয়ায় হঠাৎ দেখা হয়ে যায় শহিদুল হাসানের সঙ্গে। আবিরের পিতা ও তার পরিবারের লোকজন বাস্তু ভিটে দিলওয়ার হোসেনকে বিক্রি করে দাঙ্গা বিধ্বস্ত পরিবেশে এপার বাংলার কলকাতায় চলে আসে। আজ দিলওয়ারও বেঁচে নেই, আবিরের পরিবারেরও কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু আবীর সেই ফেলে আসা ছেলেবেলার স্মৃতি হারিয়ে যায়নি। খুঁজে বেরিয়েছে সেই নস্টালজিয়া, সেই পুকুরের ধার, কলাবাগান, সুপারিবাগান- সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে ফেলে আসা শৈশবের অমলীন সৌন্দর্য গল্পকার তুলে ধরেছেন আবির দত্তের বয়ানে। দিলওয়ারের ছেলে সিদ্দিকী ও তার স্ত্রী হয়তো তাকে চিনতে না পারলেও সেই সুপরিবাগান, সেই পুকুরপাড় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তার পূর্বপুরুষেরা তাকে যেন অন্তর থেকে স্বাগত জানিয়েছে। সিদ্দিকী ও নাজমা তাকে ভাত খেতে বললে সে খায়নি বরং সে চেয়েছে ভিটেমাটির সেই অনুভূতি পেতে। অবশেষে নাজমা যখন আবীরের হাতে তুলে দেয় ভাতগন্ধী পাতা তখন সেই ঠাকুরদার আমলের গাছের অনুভূতি তাকে ভরিয়ে দেয় পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ ও ভালোবাসার ছোঁয়ায়।

ফেলে আসা শৈশবের সেই নস্টালজিক অনুভূতি যেন আবীরের মনে এক গভীর ছোঁয়া মেলে ধরে। গল্পে দেশভাগ পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যেমন ছবি আছে, তেমনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানবিকতার ছোঁয়া যেন এক ভিন্নতর মাত্রা দিয়েছে। অতীতের ফেলে আসা স্মৃতির পরিবর্তন হওয়া সত্বেও আবীর যেন তার স্বপ্নের ছবিকে হাতছানি দিয়ে বেরিয়েছে। গল্পে মানব সম্প্রীতির যে গভীর ছোঁয়া রয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে

দেশভাগ পরবর্তী জীবনের এবং ফেলে আসা স্মৃতির দোলাচলতায় এক বিশিষ্টতা দান করেছেন গল্পকার।

অমর মিত্রের 'হারানো নদীর স্রোত' গল্পটিতে নদীমাতৃক বাংলাদেশের শুকিয়ে যাওয়া নদীর স্রোতের আবহে মানুষের ফেলে আসা মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশভাগ মানুষের জীবনে যে যন্ত্রণা বয়ে এনেছিল তা কালস্রোতে হারিয়ে যায়নি, বরং দেশমাতৃকার সাথে সাথে ফেলে আসা মানুষদের প্রতি যে আত্মিক যোগ লক্ষিত হয়েছে তাতে একটা স্পষ্ট যে দেশভাগের যন্ত্রণা মানুষ হয়তো সাময়িকভাবে ভুলে থাকলেও অন্তরে প্রতি মুহূর্তে মানুষকে কুরে কুরে খেয়েছে যার ছবি স্পষ্ট হয়েছে গল্পটিতে।

অনাথ বিশ্বাস বাইলেনের দু-কামরার ফ্ল্যাটে বর্তমান প্রজন্মের জীবন ভাবনার সাথে সাথে প্রবীণদের দেশভাগ ও ছিন্নমূল জীবনের অসহায়তার ছবি যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি ফেলে আসা অতীত স্মৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। নদী না থাকলে জীবন শুকিয়ে যায় আর তাই পূর্ববঙ্গের কপোতাক্ষ নদীকে ছেড়ে এসে আজও নদীকে ত্যাগ করতে পারেনি মুকুন্দবাবু। তাই কোনোভাবে নদীর তীরের ভাড়া বাড়িটা ত্যাগ করতে পারেননি। এর মধ্যে হঠাৎ বারোদল থেকে আসা পুরনো বন্ধু এজাহার মোজাহারের পরিবারের পুত্র সিকিন্দার আলীর মুখে বারোদলের খবর পেয়ে যেন মুকুন্দবাবু ও তার স্ত্রী ফেলে আসা বারোদলে পৌঁছে যান। উভয়ের সখ্যতার ছবি একদিকে যেমন বন্ধুত্বের আভাস দিয়েছেন গল্পকার, পাশাপাশি ধর্মীয় ভেদাভেদের উর্ধ্বে মানবিকবোধের সঞ্চার ঘটিয়েছেন। তাই একে একে প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদ মুকুন্দবাবু ও তার স্ত্রীকে ব্যথিত করেছে। তবে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হয়েছেন এটা শুনে যে ওপার বাংলার নদী বেদনা, কপোতাক্ষ, শুনাইয়ের জল শুকিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। মনে হয়েছে চঞ্চলা নদী জীবনের ছন্দ ফিরিয়ে দেয় নদী না থাকলে জীবন শুকিয়ে যায়, যার জন্য এতদিন কষ্ট করে ভাড়া বাড়ি ত্যাগ করতে পারেনি সেই ফেলে আসা স্বপ্নের জন্মভূমির সেই নদীগুলো, যাদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে সখ্যতা ছিল আজ তারা মৃতপ্রায়। এই শোকে মুকুন্দবাবু নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। মুকুন্দবাবু অসুস্থ হন, নার্সিংহোমে ভর্তি করতে বাধ্য হয় তার পুত্র। একদিন স্বদেশভূমি ছেড়ে চলে আসা মানুষজন মুকুন্দ পালের অসুস্থতা শুনে নার্সিংহোমে হাজির হয়, যেন নার্সিংহোম হয়ে ওঠে বারোদলের গ্রাম, মনে হয় যেন নদীর স্রোতের মতো বেত্রবতী কপোতাক্ষ ঢুকে পড়েছে নার্সিংহোমে।

গল্পকার দেশভাগ পরবর্তী দুই প্রজন্মের অনুভূতিকে স্পষ্ট তুলে ধরেছেন গল্পের আঙ্গিনায়। মুকুন্দ পাল ও তার স্ত্রী ললিতার অনুভূতিতে স্পষ্ট হয়েছে পূর্ববাংলার ছবি, আনন্দ বেদনার অনুভূতি, আর এটা আরও জীবন্ত হয়েছে হঠাৎ করে সেকেন্দারের আগমন। সেকেন্দারের কথোপকথনে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে মানবিকতার জাগরণ

ঘটাতে চেয়েছেন গল্পকার। কারণ সেকেন্দার চেয়েছে দেশ ছেড়ে আসা মানুষগুলোকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তাই তার মনে হয়েছে-

> "হিন্দুরা শুধু দেশ ছাড়তেছে, ভিটামাটি বাগান পড়ে থাকতেছে, লোভী মানুষের দখল করে নিচ্ছে, হিন্দুদের তাড়াচ্ছে, কিন্তু এটা যেমন সত্যি তেমন সত্যিই তারা দেশ ছেড়েই বা আসতেছে কেন কও দেখি চাচি? ওটা তাদেরও দেশ যদি হিন্দু মুসলমান দুজনেই না থাকে তা একটা দেশে গাঙে পানি থাকে?"

গল্পকথক মুকুন্দের পুত্রের কাছে দেশভাগ বলতে তাদের এই দুই কামরার ফ্ল্যাটে মানুষের আসা ও নিজের বাসভূমি করে ফিরে যাওয়া। কিন্তু দেশের মানুষের সম্পর্কের বন্ধন যে কতটা আন্তরিক তা স্পষ্ট হয়েছে যখন মুকুন্দ রায়কে দেখতে দলে দলে মানুষ নার্সিংহোমে আসা, যেন মনে হয়েছে পুরো বারোদল হয়ে উঠেছে নার্সিংহোম। আর এই মানুষগুলোকে পেয়ে মুকুন্দবাবু আবার পুনরায় বেঁচে উঠতে চেয়েছেন। তাই যে মানুষটা নদী শুকিয়ে যাওয়া কিংবা প্রিয় মানুষগুলোর মৃত্যুর কথা শুনে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সেই মানুষটি আবার দেশের গাঁয়ের আত্মীয় মানুষগুলোকে দেখতে পেয়ে আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছেন।

গল্পকার একদিকে যেমন দেশভাগের ফলে ফেলে আসা জীবন, মানুষের অসহনীয় যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন তেমনি হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে এক গভীর জীবন চেতনাকে তুলে ধরেন, যেখানে মানুষের কাছে তার ফেলে আসা অতীত কিছুতেই হারিয়ে যায় না বরং তা নদীর স্রোতের মতো আজীবনই বহমান।

দেশভাগের ফলে ফেলে আসা অতীতের রোমহর্ষক স্মৃতিকে এক আধুনিকতার স্পর্শে উজ্জ্বল করে তুলেছেন অমর মিত্র তাঁর **'২৫-১২৫'** গল্পে। গল্পে উল্লেখিত চরিত্র অন্তহীন আনন্দলাল বৃদ্ধ বয়সে যোগদান করেছেন সোশ্যাল সাইটে। খুলেছেন একটি ফেসবুক আইডি। বিভিন্ন নামে ফেসবুক আইডি দিয়ে পরিচিত হন অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে। এরই মধ্যে তাঁর পরিচয় হয় বাংলাদেশের পটুয়াখালীর আঁধারকুসুম গ্রামের বাসিন্দা সোমা পারভিনের সঙ্গে। অদ্ভুতভাবে সোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আনন্দলাল পৌঁছে যান পূর্ব বাংলার ছেলেবেলার সাতক্ষীরার জীবনে। পারভিন তাকে শুনিয়েছেন সেন বাড়ি সেনপুকুর, কালভৈরব এর থান, বটের নিচে হাজরা ঠাকুর- এসব সন্ধান দিয়ে ছোটবেলার অতীত স্মৃতি যেন অন্তরে জাগিয়ে দেয়। পারভিনের কথায় আনন্দলাল খুঁজে পান তার মা সুরমা সেন কে, যেন সেই ছোট্ট পাঁচ বছরের স্মৃতি আজ ফেসবুকের জগতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেন পুকুরের পাড়ের হিমসাগর গাছটা যেটা তার ঠাকুমার নিজের হাতের পোঁতা, যা তাকে ছেলেবেলার সুখ ও স্মৃতিতে ভরিয়ে দেয়। অন্যের চোখ দিয়ে ও কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে ফিরে পান আনন্দলাল সেই

দেশভাগের পূর্বের জীবন, যেগুলো তিনি এককালে হারিয়ে ফেলেছেন। একসময় হিন্দু-মুসলমানের যে গভীর সম্পর্ক ছিল তাও যেন স্পষ্ট হয় গল্পের আঙিনায়।

গল্পে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফেলে আসা দেশভাগ পূর্ববর্তী স্মৃতি যেন আনন্দলালকে পৌঁছে দিয়েছে এক গভীরতর জীবন সত্যে। হলুদ পাখি ও বসন্তবৌরিকে একলা গাছের ডালে মন খারাপ করে বসে থাকতে দেখে ক্যামেরাবন্দি করেছিল বন্ধু যা থেকে যেন কল্পনার ছোঁয়ায় পৌঁছে দেয় আনন্দলালকে। গল্পে ফেসবুকের মাধ্যমে যে অসমবয়সির একটা গভীর বার্তালাপের কথা গল্পকার দেখিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সবচেয়ে বেশি বড় হয়ে উঠেছে দেশভাগের ফলে মানুষের জীবনের যন্ত্রণার কথা। যে মানুষ একসময়ে ফেলে এসেছে নিজের জন্মভুমিকে, আজ সেই ফেলে আসা অতীতের সেই স্মৃতি মনের গহনে জ্বলজ্বল করে। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এই স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলা যে অসম্ভব তার প্রমাণ আনন্দলালের পূর্ববাংলার প্রতি অনুভূতির ছোঁয়ায়। গল্পকার গল্পে দুটি অসমবয়সী নারী পুরুষের বাক্যালাপের মধ্যে দিয়ে যেন সেই স্মৃতিসত্তার এক অনাবিল সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

বঙ্গ বিভাজন ও উদ্বাস্তু সমস্যা বিষয়ক অমর মিত্রের গল্প আলোচনা সাপেক্ষে এটাই স্পষ্ট হয় ছিন্নমূল মানুষের জীবনের অস্তিত্বের সংকটের কথাই। আজকের পৃথিবীতে মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং তার পূর্ব প্রজন্মের স্বভূমির মধ্যে দূরত্ব অবশ্যই থাকবে, কিন্তু এই দূরত্বের বেদনা কখনও ঘোচানো সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র :

১) ঘোষ সন্তোষ কুমার, ‘এই বাংলা’, দেশ সাহিত্য পত্রিকা, প্রকাশ- ১৩৭৮, পৃষ্ঠা- ১৫৭-১৫৮।

২) দে অমর, ‘গল্পসরণি’ (অমর মিত্র বিশেষ সংখ্যা), ষড়বিংশতিতম বার্ষিক সংকলন, ২০২২-২৩, পৃষ্ঠা- ২৩।

গ্রন্থপঞ্জি :

১) মিত্র অমর, প্রকাশ- এপ্রিল ২০২৩, ‘গল্প সমগ্র’, ১৮এ টেমার লেন; কলকাতা- ৯, ‘করুণা প্রকাশনী’, পৃষ্ঠা- ১৬৬ (‘দমবন্ধ’)।

২) মিত্র অমর, প্রকাশ- ২০১৬, ‘দেশভাগ: হারানো দেশ হারানো মানুষ’, কলকাতা- ৬, ‘সোপান’, পৃষ্ঠা-২৬৬ (‘অন্ন-পরমান্ন’)।

৩) মিত্র অমর, প্রকাশ- পৌষ ১৪২৪, ’৫১ গল্প’, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট; কলকাতা- ৭৩, ‘মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ’, পৃষ্ঠা- ২২৪ (‘হারানো নদীর স্রোত’)।

৪) তদেব,. পৃষ্ঠা – ২৫, ১২৫, ৫০৬

বনফুলের 'বিদ্যাসাগর' নাটক একটি বটগাছসম

রাকেশ চন্দ্র সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাঙাপাড়া মহাবিদ্যালয়, অসম

সংক্ষিপ্তসার - বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকীয় ধারায় বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সুপরিচিত। মূলতঃ কথাসাহিত্যিক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। বাংলা সাহিত্যে তাঁর কবিতা দিয়ে সাহিত্য জীবনের সূচনা হলেও বনফুল কথাসাহিত্যিক ও নাট্য রচয়িতা হিসেবেই বেশি সমাদৃত হয়েছেন। এখানে একটি কথা বলতে পারি কথাসাহিত্যের ব্যাপক পরিচিতির পরিসরেও ঢাকা পড়ে যায়নি তাঁর নাট্যকর্ম। নাট্যকার বনফুলের পরিচিতির পরিসর সুবিস্তৃত না হলেও তাঁর রচিত নাটকগুলি বিশ শতকীয় বাংলা নাটকের ধারায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। তাই আমরা বলতে পারি, কালের শাসন উপেক্ষা করে বনফুলের নাট্যকর্ম আজও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছে। নানান শ্রেণির নাটক রচনা করলেও বনফুলের একাঙ্ক নাটকে একজন সফল স্রষ্টার পরিচয় বহন করেছেন। তার সঙ্গে জীবনী নাটকগুলি তাঁর নাট্য প্রতিভার স্মরণীয় সৃষ্টি। এই নাটকগুলি জীবনের প্রতি অপরিমেয় অনুরাগ থেকেই এসব নাটক লেখা। এক কথায় এই নাটকগুলি তথাকথিত কোন মহতি ব্যক্তির জীবনের ধারাভাষ্য নয় বরং বলা ভালো আমাদের খুব কাছের বাস্তব সম্মত কোন এক ব্যক্তির জীবনের ধারাভাষ্য।

সূচক শব্দ – বনফুল, নাট্যকর্ম, বিশ শতকীয়, একাঙ্ক নাটক, অপরিমেয় অনুরাগ, জীবনের ধারাভাষ্য।

ভূমিকা - বনফুলের জন্ম ১৯ জুলাই ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বিহারের এক প্রত্যন্ত গ্রাম মণিহারী গ্রামে। পিতার নাম সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এবং মাতা ছিলেন মৃণালিনীদেবী। বনফুলের পৈতৃক আদি নিবাস ছিল পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার শেয়ালখালা গ্রামে। বনফুলের শৈশব শিক্ষা শুরু হয়েছিল গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তিনি ছোটবেলায় কবিতা পাঠের অভ্যাস এবং কবিতা লেখার প্রথম অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর কাকার কাছে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকা বনফুল স্বনামে প্রথম কবিতা 'ঊষা'য় ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায়। এই সময় থেকে তিনি 'বনফুল' ছদ্মনাম ব্যবহার করা শুরু করেন।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে চুরাশিটি কবিতা 'বনফুলের কবিতা' এবং চৌত্রিশটি গল্প নিয়ে লেখা 'বনফুলের গল্প' গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ পায়। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বনফুলের প্রথম নাটক 'রূপান্তর' প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের

আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত সময়কালে বনফুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনী নাটক 'শ্রীমধুসূদন' প্রকাশ পায়। বনফুল তাঁর 'মধুসূদন' নাটক রচনার দুই বৎসর পরে 'বিদ্যাসাগর' রচনা করেন। বিদ্যাসাগরের রচনাকাল তথা প্রকাশকাল ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ। ১৩৫১ বঙ্গাব্দে 'দশভাণ' নামক নাট্যগ্রন্থটি প্রকাশিত। 'দশভাণ' একাঙ্ক সংকল্পের ১০টি একাঙ্ক হল-'শিককাবাব', 'লেহ্য', 'জল', 'অবাস্তব', 'নব-সংস্করণ', 'কবয়ঃ', 'বাণপ্রস্থ', 'অন্তরীক্ষে', 'আকাশ নীল', '১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৮'। এদের মধ্যে 'শিককাবাব' একাঙ্কটি তাঁর শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক রূপে বাংলা নাট্যসাহিত্যে ও নাট্য সমালোচকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। তবে আমরা আমাদের আলোচ্য 'বিদ্যাসাগর' নিয়েই আলোচনা করব।

পর্যালোচনা - বনফুল তাঁর 'মধুসূদন' নাটক রচনার দুই বৎসর পরে 'বিদ্যাসাগর' রচনা করেন। বিদ্যাসাগরের রচনাকাল তথা প্রকাশকাল ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ। নাটকটি নাট্যকার করবী মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নাট্যকার জানিয়েছেন -

"প্রাত:স্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের আলেখ্য একটি নাটকে অঙ্কিত করা শক্ত। আমি তাঁহার জীবনের একটি কার্যকে মূলসূত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটিকে ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।"[১]

এই একটি কার্য হল বিধবা বিবাহ প্রবর্তন। বিদ্যাসাগর স্বয়ং স্বীকার করেছেন তার জীবনের এটি মহত্তম কার্য।সমগ্র সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই কার্যটি তিনি সম্পাদন করেন।আর এই দূরূহতম কার্যটি সম্পন্ন করতে গিয়ে তার চারিত্রিক যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত, নাট্যকার সযত্নে তাকে রূপায়িত করেছেন।

এই নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে- বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম, কলকাতার বাসস্থান ও কর্মাটাড়। সংঘটিত ঘটনাকাল বিধবা বিবাহ প্রচলিত পূর্ব থেকে তার পরবর্তী কিছু কাল পর্যন্ত। তাঁর অনেক লড়াইয়ের ও চেষ্টার ফলে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। এই একটি ঘটনা প্রাধান্য পাওয়া এর মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সময়সাম্য বেশি রক্ষিত হয়েছে। পাঁচ অঙ্কের এই নাটকটিতে মোট পনেরোটি দৃশ্যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো অঙ্কের দৃশ্য খুবই ছোটো। প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, প্রথম দৃশ্যটি ছোটো। দ্বিতীয় অঙ্কের তিনটি দৃশ্য, এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি খুবই ছোটো। তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কের মাত্র দুটি দৃশ্য, পঞ্চম অঙ্কে চারটি দৃশ্য। এই নাটকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র ছাড়া অন্য চরিত্রগুলি সর্বত্র ইতিহাসের মর্যাদা রাখতে পারেনি। তবে চলমান ঘটনাপ্রবাহে চরিত্রগুলি যেন যে যার ইচ্ছে এক একটি স্টেশনে নেমে গেছে- ঘটনাপ্রবাহের গাড়িটি আবার চলছে। অনেকের ভূমিকা অতি সামান্য- কেউ আবার একবারের বেশি নাটকে আবির্ভূত হননি। এর ফলে কালগত সাম্য রক্ষিত হলেও কাহিনি নিবিড় বাঁধনে বাঁধা পড়েনি। বিধবাবিবাহ প্রচলনের সূত্রধরেই যেসব চরিত্র এসেছে তা নয়, যে যুগের অনেক বিখ্যাত চরিত্রকে কোনো কোনো দৃশ্যে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। মূলত

কথাসাহিত্যিক এই জীবনী নাটকে নানা চরিত্রকে তুলে ধরায় লোভকে সংবরণ করতে পারেননি। তবে চরিত্রগুলিতে তথ্য নিষ্ঠার কোনো অভাব দেখা যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহত্তম ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগর মহাশয়। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের এই সিংহ শিশুটি পিতা ঠাকুরদাসের হাত ধরে কলকাতায় এলেন। পাঠ নিলেন সংস্কৃত কলেজে। কলকাতার বিদ্যোৎশাহী মহলে শিরোমনি হয়ে উঠলেন। লাভ করলেন বিদ্যাসাগর উপাধি।ক্রমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে অধিষ্ট হন। সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমে তিনি যুগোচিত পরিবর্তন সাধন করলেন। শুধু সংস্কৃত কিংবা শাস্ত্র অধ্যয়নে সীমাবদ্ধ রইলোনা পাঠক্রম। যুক্ত হল পাশ্চাত্য শিক্ষাও। বিদ্যাসাগর নিজে ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে পন্ডিত। পরে নিজের চেষ্টায় তিনি ইংরেজিতেও পারঙ্গমতা অর্জন করেন। বিদ্যাসাগরের মূলত দ্বিবিধ সত্তা- সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর এবং বিদ্যাবজয় অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর। সত্য কথা বলতে কী বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর জীবনদশাতে কিংবদন্তি পর্যায়ে উন্নীত হন। সুদূর গ্রাম থেকে আসা কপর্দকহীন দরিদ্র ছেলেটিকেই দেখা গেল দয়ারসাগর রূপে। অকাতরে তিনি দারিদ্র দুঃখ পীড়িত মানুষদের আর্থিক সাহায্য করেছেন। পিতা-মাতার প্রতি তার ভক্তি ছিল অসাধারণ। মাতার আদেশে ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে বাড়িতে যাবার জন্য আদিষ্ট হলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর ছুটি মঞ্জুর না করায় তিনি চাকরি ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। চাকরির তুলনায় মাতৃ আদেশ পালন তাঁর কাছে জরুরি মনে হয়েছিল। বর্ষার বিক্ষুব্ধ দামোদর নদ পার হতে কোন নৌকা ও মাঝির সহায়তা না পাওয়ার তিনি সাঁতার কেটে কানায় কানায় ভর্তি তা অতিক্রম করেন নির্দ্ধিধায়। বিদ্যাসাগরের ছিল দুর্লভ আত্মমর্যাদা। তারই অন্যতম নিদর্শন একদিন কাজের দরকারে বিদ্যাসাগরের অফিসে এসেছেন কার সাহেব। দরজা খুলে তো তিনি অবাক। টেবিলের ওপারে বসে আছেন বিদ্যাসাগর। আর তাঁর খড়মশুদ্ধ পা দুটো টেবিলের উপর ঠিক কার সাহেবের মুখোমুখি। সেদিন ওভাবেই সাহেবকে অপমানের জবাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ঋজু শিরদাঁড়ার মানুষটা। এর আগে এই কার সাহেব টেবিলে পা তুলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে অসম্মানিত করায় তিনিও পরবর্তীকালে কারসাহেবকে উপযুক্তভাবে খড়ম অর্থাৎ জুতো শুদ্ধ পা টেবিলে তুলে দিয়ে অপমানের জবাব দিয়েছিলেন। নাটকে দেখানো হয়েছে এজন্য তিনি পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। রাগের মাথায় এমন কাজ করা ঠিক হয়নি বলে তাঁর মনে হয়েছে।

তিরিশ মাইল পদব্রজে গিয়ে তাঁর শিক্ষক ন্যায়ালঙ্কারকে কলকাতায় এনে কলেজের অধ্যাপক পদে বসিয়ে ছাত্রকৃত্য করেছেন। আবার তাঁর এক শিক্ষক অতি বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করায় তাঁকে যথোচিত সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। তাঁর (শিক্ষকের) অল্পবয়সী বালিকা বধূকে নিতান্ত বাধ্য হয়ে গুরুমা সম্বোধন ও প্রণাম করেছেন।

কঠিন রূঢ় সত্য কথা বলায় তাঁর জুড়ি ছিল না। কাউকেই তিনি ছেড়ে কথা বলতেন না।সে বন্ধু হোক বা নিকট আত্মীয় স্বজন। তখনকার দিনে সাতশ টাকার

বেতনের চাকরি তিনি অনায়াসে ত্যাগ করেছিলেন কর্তৃপক্ষের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে অনীহার কারণে। এদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। নাটকে তাঁকে কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মেট্রোপলিটন কলেজের নামোল্লেখ অবশ্য করা হয় নি। বিদ্যাসাগর বাঙালি শিক্ষার্থীদের বঙ্গ বিদ্যা শিক্ষা দানের জন্য রচনা করেছিলেন ‘বর্ণপরিচয়’। তাছাড়া অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। নাটকে উল্লিখিত হয়েছে তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনার কথা। বিদ্যাসাগরের অনুবাদের প্রসঙ্গও এসেছে সীমিত পরিসরে। ‘সীতার বনবাস’ রচনার কথাই বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। বস্তুতঃ অনুবাদক বিদ্যাসাগরের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি অনুবাদ করেছিলেন ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’, ‘শকুন্তলা’। এমনকি শেক্সপিয়ারের ‘Comedy of Errors’ এর বাংলা অনুবাদ ‘ভ্রান্তি বিলাস’ রচনা করেছিলেন।এসব কথা স্বাভাবিকভাবেই অনুল্লিখিত থেকে গেছে। বিপন্ন মানুষকে শুধু আর্থিক সহায়তা করা নয়, তাদের সেবা করতেও দেখা গেছে। মরণাপন্ন কলেরা রুগীর সেবায় তাঁকে আত্মনিয়োগ করাতে দেখা গেছে। কিন্তু সবকিছুকে অতিক্রম করে গেছে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুধাবন করেছিলেন দীর্ঘদিনের প্রচলিত লোকাচার ভাঙ্গা সহজ নয়। মানুষ যুক্তির তুলনায় অভ্যস্ত দেশাচারকেই মান্যতা দেয়। তাই যুক্তি প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিধবা বিবাহের ধর্মীয় সমর্থন লাভে সচেষ্ট হন।

বস্তুতঃ বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে বিদ্যাসাগর যে অন্যন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তা তুলনাহীন। তাঁর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছিল। প্রভূত অর্থ ব্যয় করেছিলেন এজন্য। যারা বিধবা বিবাহ সম্মত হত তাদের অর্থ দিতে হত। ব্যবস্থাপক সভায় আইন পাশ করবার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ছিলেন সাক্ষর সংগ্রহের জন্য। এই নিয়ে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য এমনকি তাঁর স্ত্রীও তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেন। বন্ধুদের সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছে। নির্মম ভাবে সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু নিজ সংকল্পে অবিচল ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। অনেক বিধবা নববিবাহিত হয়। আবার কিছু বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটে। বিদ্যাসাগর শেষ জীবনে মর্মান্তিক কষ্ট পেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর সকল প্রয়াসই বুঝি ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে লোকাচারের কাছে। নি:সঙ্গ বিদ্যাসাগর শেষ জীবনে কর্মাটাড়ে গিয়েছেন একটু শান্তির জন্য। নিরীহ সহজ সরল সাঁওতাল মানুষগুলোকে দেখে ও তাদের সান্নিধ্যে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছেন। কিন্তু সেখানেও ধাওয়া করেছে বিধবা বিবাহ জনিত সমস্যা।ঋণ ভারে জর্জরিত হয়েছেন। নাট্যকার একটি বিষয়কে উপজীব্য করায় নাট্যকারের অন্য একটি নাটক ‘শ্রীমধুসূদন’ এর তুলনায় 'বিদ্যাসাগর' অনেকটাই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর মানবিক সত্তা আদ্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন থেকেছে। ‘শ্রীমধুসূদন’এ একেবারে শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন দর্শণে বৃত্তান্ত যুক্ত হয়েছে। কিন্তু ‘বিদ্যাসাগর’ এ তেমন কিছু যুক্ত করেননি। ক্ষেত্রবিশেষে নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পারম্পর্য রক্ষা করেন নি। এসব একাধিক স্থানে কিঞ্চিৎ কল্পনারও আশ্রয়

নিয়েছেন। কিন্তু পাঠক তা বুঝে উঠতে পারে না। অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে এই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ এবং ঐতিহাসিক ঘটনা। পারম্পর্য রক্ষিত না হওয়া পাঠকের অথবা দর্শকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেন। সমালোচকেরা 'নাট্যকৃতির দিক থেকে এ রচনা (বিদ্যাসাগর) অধিকতর সফল' স্বীকারই। তবে নাটকের অন্তিম মুহূর্তে এক বিধবার সফল বিবাহকে তাঁর সন্তানসহ সুখী দাম্পত্য জীবন যাপনকে যখন 'দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির মাঝখানে দুই একটি একটি সবুজ শিষ' বেমানান বলে মনে করেন সমালোচকেরা। আবার তিনিই স্বীকার করেন,'এই অন্তিম উক্তিতে নাটকের সার্থকতা প্রতিধ্বনিত।'

নাটকের প্রথম দৃশ্যের একটু উল্লেখ করা যেতে পারে –

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য- বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের শয়ন কক্ষ। বিদ্যাসাগরের পত্নী দিনময়ী দেবী পান সাজছেন। বিদ্যাসাগর কাগজ ও কলম ডোবানো নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। পত্নীর দেওয়া পান মুখে দিয়ে বিদ্যাসাগর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন, নিবারণের কতদিন থেকে অসুখ হয়েছে? এই প্রশ্ন থেকেই নাট্যকৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। বিধবাবিবাহের প্রচলনের অনুপ্রেরণার সূচনা এখান থেকেই। বিদ্যাসাগর নিবারণকে দেখতে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের নির্দেশে আর যাওয়া ওঠেনি। মাতৃভক্তিরও একটি আঁচ এখানে পাওয়া যায়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ভগবতী দেবীর কর্তৃত্বাধীনে দিনময়ী দেবী ছিলেন অনেকটা ব্রাত্য। ১৪ বৎসর কোনো সন্তানাদি না হওয়াতে স্বামীর সাহচর্য লাভের জন্য দিনময়ী দেবী ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। দীর্ঘদিন পর বিদ্যাসাগরকে কাছে পেয়ে দিনময়ী দেবী বললেন, 'কতদিন পরে আজ তুমি এলে'! কথাটার মধ্যে আক্ষেপ অনুযোগ ও অভিমান রয়েছে। পতিবিচ্ছেদ কাতরা দিনময়ী স্বামীকে লেখার উদ্যোগ করতে দেখেই বললেন তিনি কি এখন লেখাপড়া করবেন? বিদ্যাসাগর বললেন, তিনি সীতার বনবাস নিয়ে একখানা বই লিখবেন। দিনময়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বই লিখছ বললে?' বিদ্যাসাগর প্রত্যুত্তরে বললেন, সীতার বনবাস। এরপরই দিনময়ী নারীহৃদয়ের স্বামীসঙ্গ লাভের আকৃতি আর অন্তর্বেদনা নিয়ে অত্যন্ত মর্মভেদী ছোট্ট একটি বাক্যে বললেন, 'সীতার দুঃখ বোঝ তুমি'। একমুহূর্তেই দিনময়ী দেবীর হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা দর্শকের সামনে প্রকাশ পেয়ে গেল। ছোট্ট সংলাপও যে কত মর্মভেদী হতে পারে এটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ। যে স্ত্রীর দুঃখ বুঝতে পারে না সে সীতার দুঃখ বুঝবে কী করে। এরপর তিনু ভট্টাচার্যের পত্নী চঞ্চলাকে নিয়ে দিনময়ী একটু রসিকতা করলে করে বললেন, চঞ্চলার ভাগ্য ভালো। বিদ্যাসাগরের মতো তার স্বামী বিখ্যাত নয়। ফলে তাকে স্বামী সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয় না। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যেমন আমরা স্বামী বিদ্যাসাগরকে দেখতে পাই। তবে তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড়োগুণ মানুষের দুঃখে তাঁর আত্মা কেঁদে উঠত।

বনফুল এই সবার জানা বিদ্যাসাগরের জীবনী বর্ণনা করতে চাননি। তিনি চেয়েছেন বিদ্যাসাগরের জীবনের এক অবিস্মরণীয় কীর্তিকে তুলে ধরতে। সেই অবিস্মরণীয় কীর্তি হল বিধবাবিবাহ প্রচলন। বিদ্যাসাগর তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রকে একটি চিঠিতে লিখেছেন -

'বিধবা বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।'

নাট্যকার বনফুল এই একটি ভাবনারই সঠিক রূপ দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবনের সঙ্গে যুক্ত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে তাঁর জীবনের কাহিনী, চরিত্র, তাঁর ব্যক্তিত্ব, সাধনা ও নানা কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরে তেজদীপ্ত বিদ্যাসাগরের চরিত্র এঁকেছেন।

এখানে বলা বাহুল্য নাট্যকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' চরিত এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ অবলম্বনেই নাটকটি লিখেছেন। নাট্যকার নাটকের প্রয়োজনে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, "বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইতিহাস-সম্মত" করতে পারেননি। তবে নাট্যকার চেয়েছেন নাটক সৃষ্টি করতে- কায়মনোবাক্যে যিনি সর্বদাই ক্রিয়াশীল এবং নিজের জীবনের ভাগ্যবিধাতা নিজেই, নিজেই নিজেকে উচ্চতর শিখরে নিয়ে গিয়েছেন,তাঁকে নিয়েই নাট্যকার জীবনী নাটক লিখেছেন। তবে এটাও ঠিক তিনি বিদ্যাসাগরের বহু ঘটনার উল্লেখ না করে শুধুমাত্র একটি ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবনের রসরূপটি তুলে ধরেছেন। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে বিদ্যাসাগরের জীবনী নয়, জীবনের একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে রচিত নাটকই আমাদের আলোচ্য।

এবার অধ্যাপক অজিত কুমার ঘোষের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে:

"বিদ্যাসাগরের পরস্পর বিরোধী গুণগুলি সার্থকভাবে নাট্যকার নাটকীয় পরিস্থিতি ও সংলাপের মধ্যে রূপায়িত করিয়াছেন। তাঁহারসার্থকভাবে নাট্যকার নাটকীয় পরিস্থিতি ও সংলাপের মধ্যে রূপায়িত করিয়াছেন। তাঁহার বজ্রকঠোর সংকল্প ও স্নেহবিগলিত অনুভূতি, অনমনীয় সংগ্রাম ও করুণাসিক্ত ভালোবাসা, অবিচল কর্মনিষ্ঠা ও অদম্য স্বপ্নবিলাস-সবই এই নাটকের মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক বহু লোকের চরিত্রও তাঁহাদের বিশিষ্ট সংলাপের মধ্য দিয়া যথাযথরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের মধ্য দিয়া তখনকার সমাজের বিভিন্নমুখী মত ও পথের চিত্র বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে। বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি মহৎ সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামের জয় এই নাটকের মধ্যে দেখানো হইয়াছে। কিন্তু সেই সংগ্রামের বেদনা ও কারুণ্যই নাটকীয় রসের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। জীবনের কোনো বড়ো মুক্তির জন্য যিনি সংগ্রাম করেন তিনি চিরকালই বড় একা।"[২]

নাটকে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের মহত্তম কার্যটির জন্য যুক্ত সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ হতে দেখালেও সমালোচকদের কাছে এই নাটক ব্যর্থ হয় নি। বিদ্যাসাগরের সময়ে সমাজ যে পরিমাণে সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল সেখানে বিদ্যাসাগরের প্রয়াস হয়তো সাফল্য অর্জন করতে পারে নি ঠিকই, কিন্তু সেজন্য বিদ্যাসাগরকে দায়ী করা যাবে না। তিনি মানবিক দৃষ্টিতে যা কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন তাই আন্তরিকভাবে করেছিলেন। সমাজকে আধুনিক করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। পিছিয়ে পড়া সমাজ এই এতখানি প্রগতিশীল মানুষের প্রগতিশীল প্রয়াসকে যদি মান্যতা দিতে অপারগ হয়ে থাকে,সে দায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের না, সে দায় একান্তভাবে তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে সমাজে বাস করা, ধ্বজাধারী সেইসব মানুষদের। একথা তো ঠিকই বিধবাদের জলন্ত দগ্ধ অসহনীয় জীবন যন্ত্রণা চাক্ষুষ করেও দ্বিতীয় কাউকে তো তার প্রতিকারে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

তথ্যসূত্র :

১। বনফুলের নাটক সমগ্র(প্রথম খন্ড), প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি,২০১৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা- ৪৬৯।

২। ঘোষ, অজিত কুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃষ্ঠা -৩৬৪।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। বনফুলের নাটক সমগ্র (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), অক্ষরবিন্যাস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৯।

২। ঘোষ, অজিত কুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস; দে'জ পাবলিশিং, বইমেলা, প্রথম সংস্করণ ২০০৫।

৩। ঘোষ, অমল কুমার, বনফুলের জীবনী নাটক শ্রী মধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর, পুস্তক বিপণি , কলকাতা -০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

৪। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), চতুর্থ সংস্করণ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।

৫। ভট্টাচার্য ড. সাধনকুমার, নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (অখণ্ড), প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৬।

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে নারীবিশ্ব

নিলুফা খাতুন
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ (Abstract) : বিশ শতকের একজন নারীবাদী কথাকার হলেন আশাপূর্ণা দেবী। ১৯০৯ সালের ১২ জুলাই এক রক্ষণশীল পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং মাতা সরলাসুন্দরী দেবী। ছোটদের জন্য কবিতা ও গল্প লেখার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলেও ১৩৪৩ সাল থেকে বড়দের জন্য গল্প লিখতে শুরু করেন। বড়দের জন্য লেখা তাঁর প্রথম গল্প 'পত্নী ও প্রেয়সী'। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর বিচিত্র জীবনকথা রূপ পেয়েছে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। একদিকে তিনি সমাজ-পরিবারে নারীর প্রতি অবহেলা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার দিকটি যেমন দেখিয়েছেন তেমনি অন্যদিকে সেই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষ্যও রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে আমরা যে নারীচরিত্রগুলিকে পাই তারা বিশ শতকের সাহসী ও প্রতিবাদী আধুনিক নারী।
সূচক/ মূল শব্দ (Key Word) : বিশ শতক, নারীবাদী লেখিকা, আশাপূর্ণা দেবী, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, বৈষম্যমূলক অবস্থান, প্রগতিশীল প্রতিবাদ।

মূল আলোচনা (Discussion)

বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত নারীবাদী লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছিল আশাপূর্ণা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর গল্প-উপন্যাসে আমরা পাই নারীর অন্দরমহলের নানান ছবি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান ও সেই অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী দেশগুলির নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাবে ভারতীয় নারীদের প্রতি সমস্তরকম বৈষম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘটিত হতে দেখা যায়। এই আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল উনিশ শতকের রেনেসাঁ বা নবজাগরণের মধ্য দিয়ে একদল পুরুষ সমাজসংস্কারকের হাত ধরে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা ফুলে প্রমুখ সমাজসংস্কারকরা দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি নির্যাতনের দিকগুলি আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্যও আন্দোলন শুরু হয়। এপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর, বেথুন, অক্ষয়কুমার দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকে বেথুন ও বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা ও তার অগ্রগতির জন্য যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন তা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নারীশিক্ষার প্রতি সমর্থনের মধ্য দিয়ে সফলতা লাভ করেছিল। শিক্ষার হাত ধরে সময়ের পালাবদলের হাওয়া লেগেছিল

মেয়েদের জীবনেও। শিক্ষার মাধ্যমে আত্মসচেতনতাবোধ গড়ে ওঠায় নারীরা লেখনীর মধ্য দিয়ে নিজেদের আঁতের কথা প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। সমাজে নারীর অবস্থানের দিকটিকে তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন সাহিত্যে। ১৯৫৬ সালে বাঙালি মহিলার দ্বারা রচিত প্রথম বই 'চিত্তবিলাসিনী' প্রকাশিত হয়। লেখিকার নাম কৃষ্ণকামিনী দাসী। ১৯৫৬ থেকে '৬৩ সালের মধ্যে আরও তিনজন লেখিকার বই প্রকাশিত হয়। এঁরা হলেন রামাসুন্দরী দেবী, হরকুমারী দেবী ও কৈলাসবাসিনী দেবী। সমাজ ও দেশের উন্নতিতে পুরুষদের সহযোগিতা করা, স্ত্রীশিক্ষার জন্য সর্বস্তরের নারীদের প্রভাবিত করা ছিল এই বইগুলি লেখার প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

পরবর্তী পর্যায়ে মেয়েদের লেখায় উঠে আসে তাদের নিজেদের কথা। সমাজে নারীর বৈষম্যমূলক অবস্থানকে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁরা। এই ধারারই একজন প্রথিতযশা লেখিকা হলেন আশাপূর্ণা দেবী।

১৯০৯ সালের ১২ জুলাই উত্তর কলকাতার মাতুলালয়ে আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম হয়। পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং মাতা সরলাসুন্দরী দেবী। ঠাকুরমা নিস্তারিনী দেবীর কঠোর অনুশাসনের জন্য তিনি প্রথাগত শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। বাড়িতেই নিজ উদ্যোগে পড়াশোনা করেছেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল ছোট থেকেই। মা সরলাসুন্দরীর কাছ থেকে সাহিত্য পাঠের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি। ছোটদের জন্য কবিতা ও গল্প লেখার মধ্য দিয়ে সাহিত্যজীবনের সূচনা করলেও ১৩৪৩ সাল থেকে বড়দের জন্য গল্প লেখা শুরু করেন। বড়দের জন্য লেখা তাঁর প্রথম গল্প 'পত্নী ও প্রেয়সী'।

পনেরো বছর বয়সে আশাপূর্ণা দেবীর বিয়ে হয় শ্রীযুক্ত কালিদাস গুপ্তের সঙ্গে। লেখালেখির জন্য স্বামী ও শাশুড়ির কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলেন।[১] নারীর বিচিত্র জগৎ ও জীবনকে রূপ দিয়েছেন তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। বেশ কিছু গল্পে পুরুষ চরিত্র আঁকলেও নারীচরিত্রদের তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম গল্প 'পত্নী ও প্রেয়সী'-তে আধুনিক নারীর ব্যক্তিত্বে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দীর্ঘদিন ধরে সমাজে বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি পুরুষের হীন ভাবনাকে নস্যাৎ করেছেন লেখিকা। এই গল্পে দেখা যায় গল্পকথক কৈশোরকাল থেকে প্রেমে পড়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। কিন্তু কোন যুবতী নারীই তার কাছে ধরা দেয় নি। নারীর সন্ধান করতে করতে একদিন যখন তার বাড়ি থেকে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যায় তখন সে হতাশ হয়েছে। বিয়ের পর আর সে প্রেম করতে পারবে না ভেবে হাহুতাশ করে। তার ধারণা স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম হয় না। স্ত্রীর ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব নিয়ে একঘেয়ে জীবন কাটাতে হবে তাকে। যে বুদ্ধিমতী, সাহসী নারীকে প্রেমিকারূপে পেতে চেয়েছিল সে নারীকে আর তার কোনদিনই পাওয়া হবে না। যদিও প্রথম দেখাতেই স্ত্রীকে ভালোবেসে ফেলে। স্ত্রীকে ভালোবাসলেও তার প্রেমে পড়েনি তা গল্পকথক আমাদের জানিয়ে দেয়। গল্পকথক বিয়ের আগে প্রেমিকা নারীর

সন্ধানে ব্যাকুল হলেও বিয়ের পর স্ত্রীর বাক্সে একটি যুবকের ছবি দেখে বিয়ের আগে স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ভেবে ক্ষুব্ধ হয়েছে। স্ত্রীকে নানাভাবে গঞ্জনা দিয়েছে। কিন্তু যুবকের আচরণে স্ত্রী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সহাস্যবদনে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করে। কথার মারপ্যাঁচে বুঝিয়ে দেয় যে বিয়ের আগে অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম হওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। স্ত্রীর যুক্তি-বুদ্ধির কাছে পেরে না ওঠায় গল্পকথক স্বামী স্ত্রীকে হিন্দুঘরের মেয়ে বলে খোঁটা দিলে স্ত্রী প্রতিবাদী কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

> "...'হিন্দুর মেয়ে' বলতে তোমাদের ধারণাটা কী? 'নীতি রত্নমালা'র একটি পরিচ্ছেদ? হিন্দুর মেয়ে আইবুড়ো বেলাটাও ভবিষ্যৎ পতিদেবতার নামে উইল করে রাখবে, এই আশা?"[২]

গল্পকথক বিয়ের আগে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেনি জানালে স্ত্রীর দ্বিধাহীন, ধারালো উক্তি—

> "করোনি, সেটা তোমার বুদ্ধুমির জন্যে, আমার জন্যে নিশ্চয় নয়। তবে করলে – আমি তোমার টেবিলের ড্রয়ারে দু'খানা পুরনো প্রেমপত্র, কি চুলের কাঁটা অথবা খ্যাঁদামুখী একটা ফোটো দেখলে মূর্চ্ছা যেতাম না।"[৩]

অর্থাৎ লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী তাঁর 'পত্নী ও প্রেয়সী' গল্পে যে নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন সে আধুনিক যুক্তিসম্পন্ন সাহসী নারী। তার ধারালো উক্তির মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি পুরুষের সংকীর্ণ মনোভাবকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছেন লেখিকা। নারী ব্যক্তিত্বের মর্যাদাপ্রাপ্তি ঘটেছে এই গল্পে।

বিভিন্ন গল্পে নারীর বিচিত্র জীবনকথাকে তুলে ধরেছেন লেখিকা। তাঁর 'আত্মসর্বস্ব' গল্পে আমরা দেখি বিধবা নারী শর্বরীর নিদারুণ জীবনচিত্র। বিধবা হওয়ার পর পিতৃগৃহে একজন নারী কীভাবে অবহেলিত হয়, পরিবারের সবার দেখাশোনার দায়িত্ব তার ওপর গিয়ে পড়ে, নিজেদের প্রয়োজনে মেয়ের মুখে পুনর্বিবাহের কথা শুনে বাড়ির লোক তাকে কীভাবে তিরস্কার করে তারই নির্মম ছবি 'আত্মসর্বস্ব' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন আশাপূর্ণা দেবী। শর্বরীর দুর্দশার চিত্র তুলে ধরলেও শেষপর্যন্ত শর্বরীর কণ্ঠে লেখিকার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। মা সুজাতা প্রথম দিকে মেয়ের পুনরায় বিয়ে দেওয়ার কথা বললেও শেষাংশে দূরসম্পর্কের আত্মীয় নন্তু শর্বরীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে এবং তাতে শর্বরীর মত আছে জেনে মেয়েকে কটুবাক্য শোনায়। বলে মেয়ে-সন্তান এমনই আত্মসর্বস্ব হয়। পাল্টা জবাবে শর্বরী বলে—

> "সে কথা ঠিক মা শুধু মেয়ে-সন্তান কেন, মেয়ে-জাতটাই।"[৪]

এভাবেই আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে সমাজের বঞ্চিতা, লাঞ্ছিতা নারীরা তাদের অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

'ক্যাকটাস' গল্পে দেখা যায় চাকরিসূত্রে পাওয়া ভারতীর কোয়ার্টারে স্বামী শিশির আসতে রাজি হয়নি ভাড়া বাড়ি ছেড়ে। কারণ স্ত্রীর উচ্চস্তরে অবস্থান সে মন থেকে

মেনে নিতে পারেনি। অন্যদিকে ভারতীও নিজের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ায়নি। ছেলে মন্টুকে সঙ্গে নিয়ে কোয়ার্টারেই থেকে যায় সে। চিরকাল নিজের কথা না ভেবে স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী চলার যে প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল ভারতীর স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের অবস্থানকে আঁকড়ে ধরে থাকার মধ্য দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী।

'ফল্গুধারা' গল্পে আছে তুষার মামীর করুণ কাহিনি। গল্পের কথক কিশোরী মীরা। তার মামার বাড়িতেই আশ্রিতার মতো থাকত তুষার মামী। তার স্বামী নিরুদ্দেশ। শ্বশুর মাতাল হওয়ায় নিজের বাড়িতে তুষার মামী থাকতে পারেনি। জ্ঞাতিবাড়িতে তাই আশ্রয় নিয়েছে। নিজের বাড়িতে না থাকলেও মাতাল শ্বশুরকে দুবেলা ভাত খাওয়াতে যেত তুষার মামী। শ্বশুর তাকে নানাভাবে কটুবাক্য শোনাত। মীরার মামার বাড়িতেও তুষার মামীর কোন সম্মান ছিল না। স্বামীর নিরুদ্দেশ হওয়ার জন্য সকলে তুষার মামীকেই দায়ী করত। তার সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বে আত্মীয়-স্বজনরা ঈর্ষাকাতর হয়ে নানাভাবে সমালোচনা করত। মীরা প্রতিদিন তুষার মামীর কাছে যায় শুনে বড়মামী মীরার মাকে সে বিষয়ে সাবধান হতে বলে। মীরার কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তার রাজীব মামা অর্থাৎ তুষার মামীর স্বামী তুষার মামীর সঙ্গে গোপনে দেখা করতে আসত। একদিন বাড়ির সবাই বুঝতে পারে যে তুষার মামী প্রতিদিন কারো সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে যায়। প্রকৃত সত্য না জেনে তুষার মামীর নামে অপবাদ রটে যায় যে সে পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। সবাই তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। মীরার মামার বাড়ি থেকে তাকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার আগে তুষার মামী রাতে নিজেই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। পরের দিন গ্রামেই 'চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপ'-এর মধ্য থেকে তুষার মামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একটি মেয়েকে কতটা লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার হতে হয়, তাদের নামে কলঙ্ক রটানো হয়, আর কীভাবে একাজে প্রধান ভূমিকা নেয় পুরুষতন্ত্রের বাঁধাধরা নিয়মে বড় হওয়া অন্য মেয়েরা তা আশাপূর্ণা দেবী তাঁর 'ফল্গুধারা' গল্পে দেখিয়েছেন।

'সবদিক বজায় রেখে' গল্পে আছে তনিমার মতো মেয়েদের আত্মমর্যাদা বাঁচিয়ে সমাজ-সংসারের সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলার কথা। এই গল্পে সমাজ, স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে তার মৌন প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি অবিচার-অনাচার ও অপমানের বাস্তবচিত্র প্রকাশিত হয়েছে 'ইজ্জত' গল্পে। এই গল্পে প্রধান দুই নারী চরিত্র সুমিত্রা ও বাসন্তী। দেখা যায় বাসন্তীর স্বামী মারা যাওয়ার পর শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ির নিত্য গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে চলে এসে কলকাতা শহরের এক বস্তিতে আশ্রয় নেয়। সঙ্গে নিয়ে আসে মেয়ে জয়ীকে। লোকের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে সংসার চালায় সে।

মেয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়। বাসন্তী একটি অভিজাত পরিবারের অসুস্থ গৃহকর্ত্রীকে দেখাশোনার চাকরি পায়। ভালো বেতনও পায়। তাতে বাসন্তীর সংসারে সচ্ছলতা আসে। মেয়ে ১৪-১৫তে পা দিয়েছে। তাই তার বিয়ের জন্যও টাকা গোছানো শুরু করে সে। সুখের সংসারে একটা সমস্যার সম্মুখীন হয় সে। যে অসুস্থ বৃদ্ধাকে সে সেবা করত তাঁর কাছে রাতে একজন থাকার প্রয়োজন হলে বৃদ্ধার ছেলেরা বাসন্তীকে রাতেও তাদের বাড়িতে থাকার অনুরোধ করে। আগের থেকে এর জন্য দশ টাকা বেশি পাবে সে। না থাকলে তাকে কাজ থেকে বাদ দেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেয়। বাসন্তীর মেয়ে জয়ী রূপবতী কিশোরী। বস্তির ছেলে ছোকরারা তাকে দেখলেই নানাভাবে উত্যক্ত করে। তার ওপর যদি মেয়েকে রাতে বাড়িতে একা রেখে যায় তাহলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। মেয়ের ইজ্জত নষ্ট হওয়ার ভয় বাসন্তীকে অস্থির করে তোলে। কাজটাও সে ছাড়তে পারে না নিজের সংসারের আর মেয়ের বিয়ের খরচের কথা ভেবে।

বাসন্তী গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে প্রথমদিকে ঝিয়ের কাজ নিয়েছিল সুমিত্রার বাড়িতে। সুমিত্রা শিক্ষিতা, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন নারী। বাসন্তী বিপদের দিনে এই সুমিত্রার কাছে ছুটে আসে। বাসন্তীকে তার বাড়িতে রাতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কাকুতিমিনতি করে। জয়ীকে দেখে সুমিত্রার মায়া হয়। কিন্তু বাসন্তীকে কথা দিতে পারে না মহীতোষের কথা ভেবে। অবশেষে বাসন্তীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে সুমিত্রা জয়ীকে নিজের কাছে রেখে দেয়। মহীতোষ বাড়ি ফিরলে সুমিত্রা জয়ীর দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টি তার কাছে বলে। মহীতোষ সুমিত্রার কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। নানাভাবে সুমিত্রাকে তিরস্কার করে। অনেক তর্কাতর্কির পর মহীতোষের কাছে হার মানতে হয় সুমিত্রাকে। জয়ীকে বাসন্তীর কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় সে। সুমিত্রা শিক্ষিতা, মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন নারী। বিত্তশালী পরিবারের গৃহবধূ। তা সত্ত্বেও সে নিজের ইচ্ছায় কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারেও নারী যে কত অসহায়, তাকে যে কত অপমান-গঞ্জনা সহ্য করে জীবন কাটাতে হয় তা সুমিত্রার মধ্য দিয়ে লেখিকা আমাদের দেখিয়েছেন।

একদিকে গরিব বাসন্তী তার মেয়ের ইজ্জত রক্ষার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছে, কারণ গরিবের ইজ্জত যে কোন সময় চলে যেতে পারে এই ভয় তার মধ্যে ছিল। বাসন্তীদের মতো বস্তির গরিব মেয়েদের সামাজিক-পারিবারিক-সাংসারিক অবস্থা তুলে ধরবার পাশাপাশি আশাপূর্ণা দেবী তাঁর 'ইজ্জত' গল্পে আমাদের দেখাতে চেয়েছেন যে ইজ্জত ধনী পরিবারের মেয়েদেরও রক্ষিত হয় না। শারীরিকভাবে তারা নিরাপদে থাকলেও মানসিক দিক থেকে তারাও ইজ্জতহীনতায় ভোগে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তারাও নানাভাবে মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। পরিবারে, সমাজে পুরুষদের দ্বারা অপমানিত হয়, লাঞ্ছনার শিকার হয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরাও।

অর্থাৎ আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ছোটগল্পে যে নারীবিশ্ব রচনা করেছেন সেখানে আমরা দেখতে পাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের অসহায় রূপ। এই অসহায়ত্ব বিভিন্ন গল্পে এসেছে বিভিন্নভাবে। তবে লেখিকা নারীদের প্রতি অবিচার, অনাচার ও অপমানের দিকটি দেখিয়েই শুধু ক্ষান্ত থাকেননি, সেই সঙ্গে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষ্য রচনা করেছেন তিনি তাঁর একাধিক গল্পে। উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে মেয়েদের মধ্যে যে আত্মসচেতনতাবোধ জেগে উঠেছিল তা আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে বিভিন্ন নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে যে নারীচরিত্রদের আমরা পাই, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই বিশ শতকের আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন, নির্ভীক, সাহসী ও প্রতিবাদী আধুনিক নারী। তিনি তাঁর ছোটগল্পে এই আধুনিক নারীদের প্রতিবাদী কণ্ঠ রচনার মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. মণ্ডল তপন (স.), আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প পাঠ ও পর্যালোচনা, কলকাতা : দে'জ, ২০২৪, পৃ. ৬৯।
২. দেবী আশাপূর্ণা, পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প, কলকাতা : সাহিত্যম, পৃ. ২৫২।
৩. ঐ।
৪. ঐ, পৃ. ৬৬।

সহায়ক গ্রন্থের তালিকা :

১. চিত্ত মঙ্গল। নারী নির্যাতন নারী আন্দোলন (১ম প্রকাশ)। কলকাতা : নবজাতক, জানুয়ারি ২০০৬।
২. মাজী বিপ্লব। ইকোফেমিনিজম : নারীবাদ ও তৃতীয় দুনিয়ার প্রান্তিক নারী। কলকাতা : অঞ্জলি।
৩. দেবী আশাপূর্ণা। গল্পসমগ্র (১ম খণ্ড, একাদশ মু.), কলকাতা : মিত্র অ্যান্ড ঘোষ পাবলিশার্স, অগ্রহায়ণ ১৪২৭।
৪. দেবী আশাপূর্ণা। পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প। কলকাতা : সাহিত্যম।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ। বঙ্গসাহিত্যে নারী। কলকাতা : বিশ্বভারতী, মাঘ ১৯৫৭।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (পুনর্মুদ্রণ)। কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী, ২০১০-২০১১।
৭. ভট্টাচার্য সুকুমারী। প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ। কলকাতা : গাঙচিল, আষাঢ় ১৩৫৭।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের পারিবারিক নারীসমস্যা : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

সন্তু ঘোষ
গবেষক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : আমার এই প্রবন্ধটির মূল বিষয়বস্তু হল অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি বিশেষ প্রবন্ধ ‘পারিবারিক নারীসমস্যা’র দার্শনিক পর্যালোচনা। বাংলা সাহিত্যে নারী জাগরণে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হল অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি ১৯২৩ সালের ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘পারিবারিক নারীসমস্যা’ নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটিতে তিনি পরিবারে নারীর পরিস্থিতি, অবস্থান ও গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। নারী সমস্যার মূল প্রোথিত আছে পুরুষতান্ত্রিক ভাবধারায়। পারিবারিক সমস্যা গুলির মধ্যে এই ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং পুরুষতান্ত্রিক ভাবধারা সম্পর্কে আমাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা দরকার এবং নারীবাদের উত্থান এই পুরুষতান্ত্রিক শোষণের ফলস্বরূপ। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে শুরুতেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি কিরূপ এবং নারীবাদের মূল বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করেছি। অতঃপর লেখকের প্রবন্ধের সারাংশ প্রতিপাদন করেছি। পরিশেষে লেখকের বক্তব্যের দার্শনিক পর্যালোচনা সমসাময়িক পরিস্থিতির ভিত্তিতে করা হয়েছে।
সূচক শব্দ : নারী, পারিবারিক, দার্শনিক, অন্নদাশঙ্কর, পুরুষতান্ত্রিক, নারীবাদ, Phallogocentrism ।

[**অন্নদাশঙ্কর রায়** (১৫ মার্চ ১৯০৪ – ২৮ অক্টোবর ২০০২) : তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য বাঙালি কবি ও লেখক। তিনি ভারতের উড়িষ্যা জেলার এক কায়স্থ রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বি.এ পরীক্ষাতেও তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম স্থানাধিকারী হন । ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে এম.এ পড়তে পড়তে আই.সি.এস পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয়বারে পূর্ববর্তী রেকর্ড ভেঙে প্রথম স্থান অধিকার করেন । তিনিই প্রথম ভারতীয় হিসেবে এ গৌরব লাভ করেন। সেই বছরেই তিনি সরকারি খরচে আই.সি.এস হতে ইংল্যান্ড যান। ১৯৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে জগত্তারিণী পদক পুরস্কারে ভূষিত করে। তাকে দেশিকোত্তম সম্মান প্রদান করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার (ডিলিট) উপাধি প্রদান করে।]

মূলবিষয়বস্তু :

নারী সমাজের ধারক ও বাহক। যে দেশে নারী শিক্ষার হার বেশি সেই দেশ ততবেশি উন্নত। ইউরোপে নারী শিক্ষার হার যেমন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি এদেশেও নারী শিক্ষিত হচ্ছে। তবে নারী শিক্ষার মান উন্নত হলেও, নারী সমাজে এখনো অবহেলিত। নারীও সমাজের প্রত্যেক মানুষের মতোই সমমর্যাদা সম্পন্ন তারই প্রচার করে 'নারীবাদ'। এই প্রবন্ধটিতে অন্নদাশঙ্কর রায়ের পারিবারিক নারীসমস্যা বিষয়ে একটি দার্শনিক পর্যালোচনা করব। 'পারিবারিক নারীসমস্যা'-এ বিষয়টি আলোচনার পূর্বে নারীবাদ সম্পর্কে অল্পবিস্তর জানা প্রয়োজন। কারণ নারীবাদের প্রেক্ষাপট জানলে নারী আন্দোলনের অবস্থানটি বোঝা যাবে। 'Feminism' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন চার্লস ফুরিয়ার। 'Feminism' শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ 'Feminisme' থেকে যার অর্থ নারী (woman)। 'নারীবাদ' হল নারীদের জন্য সম্পূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমতা বিশ্বাস। সাধারণভাবে বলা যায় নারীবাদ বলতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রথাগত ধ্যান-ধারণা সমালোচনার ভিত্তিতে নারীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানগত বিশ্লেষণ ও তার মূল্যায়ন। নারীবাদ কোন পুরুষ বিরোধী মতবাদ নয়। নারীবাদ নারী ও পুরুষের সমতার কথা বলে অর্থাৎ সমাজে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার। অধ্যাপিকা বাসসী চক্রবর্তী বলেছেন,- "নারীবাদ হচ্ছে মূলত নারীর মুক্তির জন্যে কিংবা নারীর সমানাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা তত্ত্ব এবং একইসঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।"[১]

এখন প্রশ্ন হল- পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? উত্তরে বলা যায় 'পিতৃতন্ত্র' (Patriarchy) হচ্ছে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে পুরুষেরা প্রাথমিক ক্ষমতা ধারণ করে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক সুবিধা ও সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপন করে। পরিবারের ক্ষেত্রে নারীর উপর কর্তৃত্ব ফলায়। মূলত পুরুষই হল সমাজের মেরুদন্ড। পুরুষের কথায় সমাজের শেষ কথা। পরিবারে যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন পিতা নয়তো স্বামী কেউ একজন নিয়ে থাকে। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভাবে যে নারীরা কোন সঠিক মতামত ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ফলত পরিবারে নারীকে তার নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষরা যেভাবে জগতকে দেখে ও জ্ঞান লাভ করে সেই ভাবেই নারীকে জগতটা দেখতে হয়। কারণ নারীর কোন নিজস্ব মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি নাই। এই ধরনের বিষয়কে Androcentrism বলে। নারীর চিন্তা, ভাবনা সবকিছুই পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটিই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল বক্তব্য।

উক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে জৈবিক লিঙ্গ (Sex) ও সামাজিক লিঙ্গ (Gender)-এর মধ্যে পার্থক্য জানা প্রয়োজন। 'Sex Identity' বলতে ব্যক্তির জৈবিক বৃত্তিকে বোঝায়। ব্যক্তি তার শরীরের গঠন অনুযায়ী সে একজন নারী অথবা পুরুষ। নারীর জীবকোষে কেবলমাত্র XX ক্রোমোজোম থাকে এবং পুরুষের জীবকোষে XY দুই প্রকার ক্রোমোজোম থাকে। শারীরিক কিছু পার্থক্য ক্রোমোজোমের গঠন, হরমোনের প্রকৃতি, স্তনগঠন, যৌনাঙ্গগঠন ইত্যাদি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করে। অন্যদিকে 'Gender Identity' বলতে সমাজ নির্মিত ধ্যান-ধারণাকে বোঝায়। সমাজের সংস্কৃতি, সাধারণ চিন্তা, দর্শন, সাহিত্য 'সামাজিক লিঙ্গ' নির্মাণ করে। অর্থাৎ সমাজের নারীর বিশেষ ভূমিকা আছে যেমন- রান্না করা, স্বামীর সেবা করা, সন্তান পালন করা ইত্যাদি। এরূপ বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা নারীকে বিশেষিত করা হয়। পুরুষ হলে সে অফিসে যাবে, অর্থ উপার্জন করবে ইত্যাদি নির্মিত কিছু কথা ও প্রণালী আছে যা পুরুষ ও নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে Simone de Beauvoir তাঁর 'The Second Sex' গ্রন্থে বলেন,- 'One is not born, but rather becomes, a woman.'[২]

নারীবাদীরা নারীসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেছেন এবং সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এরকমই একজন উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে নারী জাগরণে লেখক ও কবি হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। আবার অন্যদিকে একজন প্রকৃষ্ট নারীবাদী। ১৯২৩ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'পারিবারিক নারীসমস্যা' প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। 'পারিবারিক নারীসমস্যা' প্রবন্ধে তিনি নারীর জীবনে পারিবারিক সমস্যা গুলি তুলে ধরেছেন এবং সেগুলি কিভাবে সমাধান করা যায় তা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন পরিবার ও সমাজে নারীর ভূমিকা অনন্য। পরিবারে ও সমাজে পুরুষের যেমন ভূমিকা আছে তেমনি নারীর ভূমিকা বর্তমান। নারী কখনোই পুরুষের তুলনায় কম নয়। এর জন্য বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'নারী' কবিতায় বলেছেন,-

"সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমনী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি, চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"[৩]

'পারিবারিক নারীসমস্যা' প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় ইবসনের Doll's House-এর নায়িকা নোরার কথা বলেছেন। নোরার জীবন কাহিনী আলোচনা প্রসঙ্গে নারীসমস্যার কথা তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন,- "সর্বপ্রথমে আমি মানুষ, তারপরে পত্নী ও জননী।"[৪] লেখকের বলার অভিপ্রায় হল সমাজে নারী ও পুরুষ সমমর্যাদা সম্পন্ন। নারী সর্বপ্রথম হল মানুষ। তারপর নারী পত্নী ও জন্মদাত্রী জননী। লেখক এপ্রসঙ্গে বলেন, "নারী আর নিজেকে পুরুষের চোখ দিয়ে দেখতে চায় না; পুরুষের সঙ্গে তার যে সমন্ধ সেই সমন্ধ সূত্রে নিজের কথা ভাবতে সে অসম্মত।"[৫]

নারীকে এ-যাবৎ কাল পর্যন্ত আমরা পুরুষের চোখ দিয়ে দেখে এসেছি। ফলে নারী জীবনে বিভিন্ন সমস্যাগুলি দেখা যাচ্ছে।

লেখক 'পারিবারিক নারীসমস্যা' প্রবন্ধে স্ত্রীপুরুষের পরিবার গঠনের কিছু ভাবধারা তুলে ধরেছেন। পরিবার সংস্কার হলে নারী সমস্যার অনেকটা নির্মূল হবে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের উপরে পরিবার গঠন হয়। স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ছলাকলার আশ্রয় নিতে হয়, সেখানে স্ত্রীর দাসত্ববৃত্তি ছাড়া কপালে আর কিছুই জোটে না। নায়িকা নোরা তার স্বামীকে একইভাবে বলেছিল,- "I live by performing tricks for you."[৬] স্বামী-স্ত্রী মধ্যে ভালোবাসা অবসান হলে পরিবার বন্ধন ভেঙে যায়। স্বামী-স্ত্রী মধ্যে প্রণয়ভঙ্গ বা প্রেমের অবসান হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। বর্তমান সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ একটি নিছক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ "যে বিবাহ প্রণায়াত্মক নয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ বা অন্ধ কুসংস্কারে যার জন্ম, নরনারী উভয়েরই তাতে অকল্যাণ, সন্তানেরও অপমান, অবহেলা ও অহিত। প্রণয়ভঙ্গ হলেই বিবাহচ্ছেদ করতে হবে, আর সেজন্যে প্রস্তুত থাকাও চাই।"[৭]

লেখক মনে করেন পরিবারে স্বামী তার স্ত্রীকে স্বাবলম্বী হতে বাধা দেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চায় না নারী কখনো সক্রিয় হয়ে উঠুক। "স্ত্রীপুরুষই যখন পরিবার গঠন করে, তখন স্বামীর উপর থাকে অর্থ সংগ্রহের ভার, স্ত্রীর উপরে অর্থব্যয়ের।"[৮] লেখকের ভাবধারা ফুটে উঠেছে, আমাদের সমাজে নারীকে কখনো স্বাবলম্বন হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। কারণ নারী শিক্ষিত হয়ে গেলে অনেক সমস্যা হবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। নারী স্বাবলম্বন না হওয়ার ফলে স্বামীর কাছে নির্ভর করতে হয়। আমরা দেখেছি নারীর কাছে মাতৃত্ব বোধ গৌরবময়। 'মাতৃত্ব' নারীর কাছে একটি বিশেষ অধিকার। যা তার বিশেষ জৈবিক সামর্থ্যের জন্য সম্ভব হয়। সন্তান লালন-পালন করা নারী একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে, যা পুরুষের নেই। কিন্তু সমস্যা হল- মায়ের ভয় শুধু সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে। সন্তান পালনের জন্য স্বামীর কাছে ভালোবাসার অভিনয় করা। সন্তানের জন্মদান দিয়ে পালনের জন্য স্বামীর মুখ চেয়ে থাকা, একপ্রকার স্বামীর কাছে নীচত্ব স্বীকার করা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চাই নারী সবসময় তার আশ্রয় থাকুক। স্ত্রী স্বামীর উপর নির্ভর হওয়ার ফলে তার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। মাতৃত্ব স্বীকার করতে গিয়ে স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে স্বাধীনতার খাতিরে মাতৃত্ব বলি দেওয়া শ্রেয়। কিন্তু মাতৃত্ব স্বীকার করেও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখাই উচিত। নারী তার সন্তান পালনের মধ্যে দিয়ে মাতৃত্বকে আরও মহিমান্বিত করবে। নারীকে এই অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসতে হলে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। নারী যদি নিজের ভার নিতে দুর্বহ হয় তাহলে সে কিকরে সন্তানের ভার নেবে। লেখক বলছেন, "যেদেশে আর্থিকভাবে স্বাধীনতা আছে সেদেশে পুরুষের আইন তাকে বাঁধতে পারেনি। নারীর অধীনতা, দাসীত্ব ও হীনতা সেইখানেই বেশি যেখানে সে আর্থিক স্বাধীনতা না পেয়ে পুরুষের গলগ্রহ হয়েছে। সেইখানেই পুরুষকে মুগ্ধ করবার জন্যে

যত ছলাকলা, যত বিচিত্র বেশভূষা, যত মোহিনী বিদ্যা, যত মিথ্যাচার। সেইখানে বরপণ প্রথার সৃষ্টি, husband-hunting-এর উদ্ভব।"[৯] নারী যদি আর্থিক স্বাবলম্বী হয় তাহলে তার স্বাতন্ত্র্যতা বজায় থাকে। স্বাতন্ত্র্যতা বজায় থাকলে নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা পায়। ফলতঃ নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

আমরা যদি অতীতের ইতিহাসকে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো নারীর অক্ষমতাকে সুযোগ নিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তাদের প্রতি অত্যাচার করেছে। নারীকে ঘিরে কুপ্রথাগুলি চালু হয়েছে,- বাল্যবিবাহ, স্বামীসেবা, কন্যাদান, বিবাহ, স্ত্রী বিনিময়, সহমরণ, অবরোধ, স্বামীর সৌভাগ্য চিহ্ন ধারণ ইত্যাদি। এমনও অনেক দৃষ্টান্ত আছে ৮০ বছরের বুড়ো সাথে ৯ বছরের বালিকার বিবাহ হয়েছে। এরূপ হওয়ার কারণ হল আমাদের সমাজে নারীকে শুধুমাত্র ভোগ্য হিসাবে দেখা হয়। নারীকে নারী হিসেবে না বোঝা। নারীকে পুরুষের সহায়ক হিসেবে দেখা। অর্থাৎ নারীকে স্বতন্ত্র ভাবে বুঝতে অস্বীকার করা। এরূপ ভাবনাচিন্তার বিষয়কে Phallogocentrism বলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আমাদের দেখিয়েছে, পুরুষ শত খারাপ কাজ করলেও তার কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু নারী যদি কোনরূপ খারাপ কাজ একবার করে ফেলে তাহলে সমাজে তাকে অলক্ষ্মী, হতভাগী ও নোংরা মেয়ে বলে বর্জন করে। এছাড়াও বর্তমান সভ্য সমাজব্যবস্থায় বরপণ মত বিষয়টি খুবই খারাপ। বরপণ হল একপ্রকার নারীকে বিক্রয় করা। **১৯৫১** সালে পণপ্রথা বিরোধী আইন তৈরি হয়। আইনে বলা হয়েছে, পণ নেওয়া ও দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। লেখক বলেন, বরপণ আসলে বর্তমানে কৌলীন্য প্রথার স্বরূপ।

অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন, আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিবাহ হল একপ্রকার নারীকে পরাধীন করে রাখার ফাঁদ। এই পরিবার আবার দাঁড়িয়ে থাকে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির ওপর। বিবাহ তো যৌনমিলনের নির্লজ্জতা ঢেকে দেওয়ার একটা ভাবের আবরণ। কোন মেয়ে বিবাহিত হওয়ার পূর্বে সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে আমাদের সমাজব্যবস্থায় তাকে খারাপ চোখে দেখা হয়। কিন্তু পুরুষদের সেই অর্থে দেখা হয় না। নারীকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। নারী যদি বিবাহে আশ্রয় নিত তাহলে এরকমটা হতো না। তখন নারীর মাতৃত্ব গৌরমময় হত। লেখক বলেছেন, নারীর এরূপ অবস্থার কারণ হল নারী আর্থিকভাবে স্বাধীন নয়। নারী যদি সত্যিই আর্থিকভাবে স্বাধীন হতো তাহলে সে নিজের সন্তানকে পালন করতে পারত। আমরা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় দেখেছি বিবাহ বিচ্ছেদের পর পিতা কখনো তার সন্তানের ভার নিতে চায় না। জন্মলগ্ন থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আমাদেরকে শিখিয়েছে নারী দুর্বল। কঠিন কাজ নারী দ্বারা সম্ভব নয়। এসব বলে অকারণে পুরুষকে মহত্ব দান করা হয়েছে এবং নারীকে অবদমিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Cris Griscom কথা বলা যেতে পারে। তিনি একজন Spiritual Leader এবং Feminist। 'Feminie Fusion' (1991) গ্রন্থে তিনি দাবি করে বলছেন, নারী পুরুষের থেকে শক্তিশালী। মেয়েদের বেঁচে থাকার হার

ছেলেদের থেকে বেশি। তিনি বলেন, ক্রোমোজোম ঘটিত কোন রোগ হলে মেয়েদের (XX) সাপোর্ট আছে; ছেলেদের কোন সাপোর্ট নেই। এই দিক থেকেও নারীরা পুরুষের থেকে এগিয়ে। নারী যে পুরুষের থেকে কোন অংশে কম নয়। নারী পুরুষের থেকে অনেক অংশে এগিয়ে তা আমরা সায়নী দাসকে দেখলে বুঝতে পারব। সায়নী দাস হলেন একজন সাঁতারু (Swimmer)। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরে তাঁর বাড়ি। তিনি নর্থ চ্যানেল পার করছেন। এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসাবে তাঁর এই সাফল্য। নর্থ চ্যানেল পার করতে তিনি ১৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট সময় নিয়েছেন। সুতরাং শারীরিকভাবে নারীরা পুরুষের তুলনায় দুর্বল, তাদের স্বভাব কোমল -এসব পুরুষতান্ত্রিক ভাবানোকে এক লহমায় চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে সায়নীর এই সাফল্য।

অন্নদাশঙ্কর রায় নারীসমস্যার কথা বলতে গিয়ে যেমন পরিবারের খুঁটিনাটি সমস্যাগুলোর উপর আলোকপাত করেছিলেন তেমনি বিবাহ প্রথার গভীরেও যে নারী অবমাননা প্রচ্ছন্নভাবে আছে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার কাছে বিবাহ হল স্ত্রীভোগের অধিকার। বিবাহ এই প্রতিষ্ঠানটিতে নারীকে সর্বদাই পুরুষের তুলনায় নিম্নে স্থান দেওয়া হয়। ফলত অধিকারও ক্ষুণ্ণ বা হানি করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। পুরুষ নারীকে এক্ষেত্রে ভোগ সামগ্রী হিসেবেই দেখে থাকেন। বিবাহ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশে বহুদিন যাবৎ এক বিশেষ শ্রেণীর (পুরুষ) সুবিধার ভোগের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষ একাধিক বিবাহের ছাড়পত্র পান। বিবাহ প্রথাটা যে ভাবে কলুষিত হয়ে চলেছে তাতে লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। যে একদিন এই বিবাহ প্রথার অবসান হয়তো আবশ্যক হয়ে উঠবে। যদিও তা আধ্যাত্মিক কারণে। বিবাহে যে অধিকারবোধ পরস্পরের প্রতি জন্মায় তা লেখকের মতে যথার্থ প্রণয়ের পরিপন্থী। কেননা প্রণয়ের বন্ধন যেখানে দৃঢ় সেখানে অধিকারবোধ কার্যকরী নয়। অধিকারবোধ একপ্রকারের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে এবং বিবাহ একপ্রকার আস্থার জন্ম দেয় যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দুটি মানুষ একে অপরকে পরিত্যাগ করবে না। প্রণয়ের দাবি চূড়ান্ত হলে বিবাহ অনাবশ্যক হত। যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্বার্থহীন শুদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হবে। যে সম্পর্কে আত্মবিকাশ ছাড়া অন্যকোন উদ্দেশ্য থাকবে না। সেই দিন বিবাহবন্ধন অনাবশ্যক হবে। সেই দিন স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধের পূর্ণ পরিণতির দিন।

'পারিবারিক নারীসমস্যা' প্রবন্ধটিকে আমি দার্শনিক পর্যালোচনা করে যেসব বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পেরেছি সেগুলি হল,—

প্রথমত, নারী ও পুরুষের সাম্যের অধিকার নিয়ে মতপার্থক্য আছে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে জৈবিক লিঙ্গগত পার্থক্য থাকলেও সামাজিক পার্থক্য মেনে নেওয়া যায় না। লেখক তার প্রবন্ধে পরিবারে নারীর অবস্থানের কথা বলেছেন। পরিবারে স্বামী তার স্ত্রীকে কতটা অবদমিত করে রাখে তা দেখিয়েছেন। কিন্তু এই বৈষম্য পুরুষতান্ত্রিক

সমাজ ব্যবস্থার ফল। লেখকের চিন্তায় পরিবারে নারীসমস্যা বিষয়টি বর্তমান সমাজে এখনো প্রকটভাবে দেখা যায়। পরিবারে প্রত্যেক মানুষকে নারীর গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করতে হবে। পরিবারের প্রাথমিক সামাজিকীকরণের মধ্যে দিয়ে লিঙ্গ-বৈষম্যের বীজ রোপিত হয়। লিঙ্গ- ভিত্তিক শ্রমের বিভাজন পরিবারের মধ্যে দিয়ে রূপ পায়; পুরুষালি বৈশিষ্ট্য বা নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য পরিবারের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে। ব্যক্তির 'পুরুষ' হয়ে ওঠা বা 'নারী' হয়ে ওঠার প্রথম সোপান পরিবার। সুতরাং পরিবার সংস্কারের মধ্যে দিয়ে নারীর সমস্যা অনেক নির্মূল হতে পারে। কারণ পরিবার সংস্কার হলে একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন অত্যাচার ইত্যাদি জঘন্যতম ঘটনাগুলি ঘটছে তা অনেকটা নির্মূল হতে পারে পরিবার সংস্কার দ্বারা।

দ্বিতীয়ত, 'মা'-এর ধর্ম হল মাতৃত্ব। 'মাতৃত্ব' মেয়েদের সহজাত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য। পরিবারে মায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মা তার শিশুকে গর্ভে ধারণ করে এবং তাকে লালন পালন করে বড় করে তোলে। মায়ের যত্নে, ভালোবাসায় সন্তান বড় হয়ে ওঠে। মা পরিবারে সবার খেয়াল রাখে, বয়স্ক ব্যক্তিদের যত্ন ও সেবা করে। পরিবারের মা সব সময় এরূপ কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকে বলে তার সাথে যত্নে বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। এই বিষয়টিকে যত্ন-নৈতিকতা (Ethic of Care) বলে। অনেকে মনে করেন, নারীর স্বভাবের সাথে যত্ন-নৈতিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর ফলে নারী কোন বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। কিন্তু যত্ন-নৈতিকতা অনুসারে মানুষ শুধু সামাজিক জীব হিসেবে সহজাতভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল নয় বরং শিশু, বৃদ্ধ ও অন্যান্যরা তাদের যত্নের প্রয়োজনে অপরের ওপর অর্থাৎ নারীর উপর নির্ভরশীল। যত্ন-নৈতিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো মা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক মাতা সন্তানের জন্য মঙ্গল কামনা করে। শিশুকে ভালোবাসা মধ্যে দিয়ে মা যেমন শিশুর যত্ন নিচ্ছে, তেমনি সেও তার নিজের যত্ন নিচ্ছে। যত্ন নৈতিকতার ভিত্তিতে শিশু বৃদ্ধ ও অন্যান্যদের যত্নে যেমন প্রয়োজন তেমনি শিশু ও বৃদ্ধরা মায়ের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এখানে একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রীশিক্ষায় বলেছেন,-

"স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া,
মেয়েদের স্বভাব;
দাসী হওয়া নয়।
স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে,
তার মধ্যে দায় নাই।
প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে,
তার মধ্যে দায় নাই"।।[১০]

তৃতীয়ত, নারীবাদ নারীদের নিম্নতর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে। এই নিম্নতর অবস্থানের জন্য দায়ী নারী- পুরুষের লিঙ্গগত বৈষম্য। Kamla Bhasin একজন ভারতীয় উন্নয়নশীল নারীবাদী কর্মী, কবি, লেখক এবং সমাজ বিজ্ঞানী। Kamla Bhasin বলেন, জন্মসূত্রে নারী ও পুরুষ ৯০% একই, শুধুমাত্র ১০% পার্থক্য থাকে। তিনি বলেন, এই ১০% ভিত্তিতে যতো পার্থক্য হয়েছে। যেমন- লিঙ্গগত বৈষম্য, রাজনৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি পার্থক্য।

পরিশেষে বলা যায়, লেখক 'পারিবারিক নারীসমস্যা' প্রবন্ধে পরিবারে নারীর বিভিন্ন সমস্যাগুলি তুলে ধরেছেন এবং নারীর প্রকৃত সমস্যাগুলি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সর্বোপরি মানুষ যদি নারীর প্রতি চিন্তাভাবনা না পরিবর্তন করে অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক ভাবধারায় নারীকে দেখে তাহলে নারী সমস্যা কখনো দূর হবে না। নারীকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক এবং কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে Elinor Burkett বলেন, At its core, feminism is the belief in full social, economic, and political equality for women."[১১]

তথ্যসুত্র:

১. বসু, রাজশ্রী, এবং বাসুদী চক্রবর্তী, (সম্পাদিত) প্রসঙ্গ: *মানবি বিদ্যা,* উর্বী প্রকাশনী,২০০৮, পৃষ্ঠা. ৩৮

২. *The Second Sex*, Tr. By H.M.Parshlev, Penguin Books, Newyork 1949. p-295.

৩. bengaliebook.com/sammobadi-kazi-nazrul-islam

৪. প্রবন্ধ সংকলন, (পারিবারিক নারী সমস্যা, অন্নদাশঙ্কর রায়), প্রাক-স্নাতক বাংলা পাঠ সমিতি (সম্পাদনা), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩, রাজবাটি, বর্ধমান, পৃষ্ঠা. ৭৫

৫. প্রবন্ধ সংকলন, (পারিবারিক নারী সমস্যা, অন্নদাশঙ্কর রায়), প্রাক-স্নাতক বাংলা পাঠ সমিতি (সম্পাদনা), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩, রাজবাটি,বর্ধমান, পৃষ্ঠা. ৭৫

৬. তদেব. পৃষ্ঠা. ৭৫

৭. তদেব. পৃষ্ঠা. ৭৬

৮. তদেব. পৃষ্ঠা. ৭৫

৯. তদেব. পৃষ্ঠা. ৭৮

১০. https://tagoreweb.in/Essays/shikkha-73/strishikkha-6280

১১. Burkett, Elinor, et al., Editors. "Feminism". Encyclopedia Britannica, 27 Aug. 2021.
Accessed on 4 Oct. 2021

গ্রন্থপঞ্জী:

1. Simone De Beauvoir, *The Second Sex*, Tr. H.M. Parshev, Penguin Books, Newyork, 1949.
2. Engels Fredarich, *The Origin of Family, Private Property and t he state*, progress, Moscow, 1974.
3. Friedan, Betty, *The Feminine Mystique*, Norton, 2001.
4. Maitra, Shefali. *Naitikata O Naribad: Darshanik Prekhiter Nana Matra.* 2nd ed., New Age Publishers Pvt. Ltd., 2007.
5. Mazumdar, Rinita. *A Feminist Manifesto: Rape, Reproduction, Revolution.* 1st ed., Anustup, 2013.
6. Benhabib, Seyla. *"Feminism and Postmodernism", Feminist Contentions: A philosophical Exchange*, Routledge, New York, 1995.
7. Mazumdar, Rinita. *A Short introduction to Feminist Theory.* 2nd ed., An Anustup publication. 2010.
8. Mukherjee Kanak, *Women's Emancipation Movement in India*, National Book Trust, New Delhi, 1989
9. Bagchi, Nandita. *Beyond patriarchy: A critique of Western Mainstream Epistemology.* 1st ed., Progressive publishers. 2012.
10. বসু, রাজশ্রী, এবং বাসুদী চক্রবর্তী, (সম্পাদিত) প্রসঙ্গ:*মানবি বিদ্যা,* উর্বী প্রকাশনী, ২০০৮

    প্রবন্ধ সংকলন, (পারিবারিক নারী সমস্যা, অন্নদাশঙ্কর রায়), প্রাক-স্নাতক বাংলা পাঠ সমিতি (সম্পাদনা), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজবাটি, বর্ধমান ২০১৩

মহাপ্রান লালন ফকিরের জীবনী ও সাধনা

হিমাংশু কুমার মণ্ডল
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
সীকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি, বোলপুর, বীরভূম

সারসংক্ষেপ (Abstract):- বিশ্ব দরবারে লালন ফকির একটি বিশেষ পরিচিত নাম। তিনি লালন শাহ নামেও পরিচিত ছিলেন। লালন ফকিরকে এককথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁর অস্তিত্ব তৎকালীন সমাজে এবং তাঁর সেই অস্তিত্বের ছায়া বর্তমানে আমাদের সমাজের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁর অসীম সাধনার জন্য তাঁকে সাধক আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁর সৃষ্টিশীল চিন্তা ভাবনার পরিসর কেবলমাত্র সামাজিক স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এর ব্যাপ্তি অনেকখানি। তিনি একাধারে অধ্যাত্মবাদী, ফকির সাধক, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক এবং দার্শনিক ছিলেন। অন্যদিকে, তাঁর গান এক অভূতপূর্ব শিল্প সৃষ্টি । তিনি নিজেই তাঁর সমস্ত গানের গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক ও ছিলেন । সম্ভবত ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবিভক্ত ব্রিটিশ শাসিত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ অবধি তাঁর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। তিনি মানব ধর্মের সাধক। তাঁর গানের মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 'মানুষ' অর্থাৎ মানব ধর্ম বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে । তাঁর গানের মধ্যে বলা হয়েছে –

"মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি,
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হ'বি।" অর্থাৎ তিনি 'সবার উপরে মানুষ সত্য' আদর্শকে তুলে ধরেছেন।

সমাজকে তিনি জাত ধর্মের ভেদাভেদ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার যেভাবে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরী করেছিল তিনি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, শুধু তাই নয়, তিনি জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদেরকে সমর্থন করেছিলেন। তাই তাঁর লোকোত্তর ধর্মের মাধ্যমে তিনি সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে আকৃষ্ট করেছেন। তাঁর দর্শন এবং গানের ধারা প্রচুর মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। লালনের আত্মদর্শন এবং তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের পরিধি আজ চারিদিকে ব্যাপ্ত। তৎকালীন যুগের ধর্মীয় আচার ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন, ব্রিটিশ শাসিত ভারতে সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়ন, তাদের মধ্যে জাতি ধর্ম বর্ণের ভেদাভেদ, এ সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে তিনি বারবার এই সব নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। তাঁর মানব ধর্মের মূল মন্ত্র হলো মানুষ । তাই তাঁর গানে -

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কিরূপ দেখলাম না এ নজরে।"

সূচক (Key word) : অধ্যাত্মবাদ, মানবতাবাদ, আত্মদর্শন, সমাজ সংস্কারক, ব্রিটিশ শাসিত ভারত।

মূল আলোচনা :

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বছর লালনের ছবিটি এঁকেছিলেন তারই ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ই অক্টোবর পাঁচটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের এই প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন বলেই লালনের জীবদ্দশার একমাত্র ছবি হিসাবে আজই আমাদের সকলের কাছেই সম্পদ হিসেবে আছে। লালন ফকিরের প্রামাণ্য জীবনী উপস্থাপনা মূলত: এক অসাধ্য কাজ কারণ হল লালন তাঁর জীবন সম্পর্কে কোথাও কিছু লিখে যাননি, এমনকি তার শিষ্যরা লালন সম্পর্কে কিছুই বলেননি। যিনি জীবিত কালে সকলের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করেছিলেন, তাই তাঁর জীবন সম্পর্কে জানা এক অসম্ভব কাজ।

লালনের জীবনের শেষের সাত বছর-অর্থাৎ ১৮৮৩ সালে তিনি তার শিষ্য সেবক দের নিয়ে কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া গ্রামে আখড়া তৈরি করেন। কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত 'হিতকরী' নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা বের হতো। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মীর মশারফ হোসেন। ১৮৯০ সালের ৩১ অক্টোবর এই সংখ্যায় লালনের মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছিল। যেসব লালন গবেষকরা এই সাত বছর লালন কে প্রত্যক্ষ দেখেছেন, তাদের লেখাগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ। লালন ছেউড়িয়া তে একটি ঘর তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তার কোন সন্তান ছিল না, কিন্তু পিয়ারা নামে একটি ধর্মকন্যা ছিল এবং তার সাধন সঙ্গিনী ছিলেন বিশখা। তাঁর শিষ্যরা দুটি সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল। তিনি এদেরকে হিতোপদেশ দিতেন। তিনি মাঝে মাঝে শিষ্য- সেবকদের নিয়ে দূর দূরান্তে বেড়িয়ে পড়তেন, হাতে থাকতো একতারা, কোমরে বাঁধা থাকতো ঢুকুরি। বাউল গানের অন্যতম স্রষ্টা কাঙাল হরিনাথ লালনকে চিনতেন, গান শোনাতে লালন প্রায়ই হরিনাথের বাড়িতে যেতেন, এমনকি হরিনাথের সূত্রে লালনের পরিচয় ঘটেছিল মীর মশারফের সঙ্গে। অনেক গবেষক মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল, কিন্তু তার কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে লালনের পরিচয় ঘটেছিল। তিনি ১৮৮৯ সালের ৫ই মে লালনের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন।

১৮৮৩ সালের পূর্বে লালনের জীবন ছিল রহস্যে ঘেরা। ১৯৬৩ সালের লোকগীতির সংগ্রাহক মোহম্মদ মনসুর উদ্দিনের প্রস্তাবে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ছেউড়িয়াতে লালনের আখড়য় গড়ে তোলেন 'লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র'। সেই সময় লালনকে মুসলিম হিসেবে দেখানোর একটা প্রবণতা দেখা যায়। অধ্যাপক আবু তালিব ১৯৬৮ সালে 'লালন পরিচিতি' নামে একটি বই লেখেন এবং এই বইতে তিনি লালন কে জন্মসূত্রে একজন মুসলিম হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন, তিনি এই বইতে আরো

লিখলেন যে, লালন ১৭৭২ সালের যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহাকুমার অধীন হরিশপুর গ্রামে লালনের জন্ম, তাঁর বাবার নাম নবিউল্লাহ দেওয়ান, মা ছিলেন আমিনা। ছোটবেলায় লালন মা ও বাবা হারান। এই সময় লালন সিরাজ সাঁই নামে এক দরবেশ এর বাড়িতে যান এবং শিষ্যত্ব বরণ করেন। সিরাজ সাঁই ছিলেন 'কাহার' সম্প্রদায়ের মানুষ। লালনের যখন ২৬ বছর বয়স তখন সিরাজ সাঁই মারা যান। লালন ফকিরের বেশে নবদ্বীপে গেলে তাঁকে পাদ্মাবতী নামে এক মহিলা আশ্রয় দেয়।

অধ্যাপক তালিব বলেন লালন যখন দক্ষিণ-পূর্ব দেশে ঘুরতে যান তখন তাঁর বসন্ত রোগ হয়। তার ভক্তবৃন্দ তাকে মৃত্যু বলে মনে করে কালিগঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয়। কালিগঙ্গা নদীতে ভাসতে ভাসতে ছেউড়িয়া গ্রামের তীরে পৌঁছায়। মলব শাহ নামে একজন কারিগর তাকে দেখতে পান এবং তাকে সেবাযত্ন করে বাঁচিয়ে তোলেন এবং পরে তিনি লালনের অলৌকিক ক্ষমতার আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মলব শাহ ছেউড়িয়াতে থাকার জন্য একটি ঘর ও তৈরি করে দেন। তখন লালনের ৪৩ বছর বয়স। সেখানে থাকার সুবাদে লালনের প্রচুর শীর্ষ্য জুটে যায়। আবু তালিব লিখেছেন ১৮৮৮ সালের পয়লা কার্তিক শুক্রবার মৃত্যু হয়। আবু তালিব যে বইটি উৎস হিসাবে ব্যবহার করেছেন সেটি প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। লেখক ছিলেন আব্দুল ওয়ালি। আব্দুল ওয়ালি লিখেছেন যে, লালন ছিলেন উচ্চকায়স্থ বংশের সন্তান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আবু তালিব উদ্দেশ্য পরিণতভাবে আব্দুল ওয়ালির অনেক লেখা বাদ দিয়ে একই গল্প তৈরি করেছেন। লালনকে নিয়ে এই ইসলামীকরণের প্রচেষ্টাকে বুদ্ধিজীবীরা কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন।

লালন গবেষক বসন্তকুমার পাল তার বই "মহাত্মা লালন ফকির" প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। তিনি বলেছেন লালন ফকির কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ভাঁড়ারা(ভান্ডারা) গ্রামে গড়াই নদীর তীরে এক কায়স্থ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম মাধব কর, মা ছিল পদ্মাবতী। বাবা মার একমাত্র সন্তান ।লালন শৈশবে পিতৃহীন হন। লালন ছিলেন ধার্মিক। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় খুব অল্প বয়সে সংসারে জড়িয়ে পড়তে হয়। মা ও স্ত্রীকে নিয়ে লালন গ্রামে মধ্যে দাসপাড়ায় ঘর তৈরি করে বাস করতে শুরু করেন।প্রতিবেশী বাউল দাস ও তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে লালন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে গঙ্গায় স্নান করতে যান। তীর্থ থেকে বাড়ি ফেরার পথে গুটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন, তখন তার সঙ্গী সাথীরা তাকে মৃত ভেবে কালিগঙ্গা নদীতে ভাসিয়ে দেন। কালিগঙ্গা নদীতে ভেসে আসা মুমূর্ষু লালন কে উদ্ধার করেন মলব শাহ ও তার স্ত্রী মতিজান। তারা তাকে বাড়িতে নিয়ে সেবাশুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। ভয়ংকর বসন্ত রোগে লালনের একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়। সুস্থ হয়ে লালন তার বাড়িতে এলে পড়া সমাজপতিরা তাকে সেখানে থাকতে দিতে অস্বীকার করে, কারণ হিসেবে তারা বলেন লালন মুসলিম বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করেছে। বাধ্য হয়ে মা ও স্ত্রী এই ব্যবস্থাকে মেনে নেয়, যদিও তার স্ত্রী তার সঙ্গী

হতে চেয়েছিলেন। এর ফলে লালনের সমাজ ও পরিবার সম্পর্কে সব বিশ্বাস টলে যায়। ছেউড়িয়াতে তিনি দার্শনিক সিরাজ সাঁইয়ের সাক্ষাতে আসেন এবং তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। লালনের গানের টানে তৈরি হল তার একনিষ্ঠ শিষ্য সেবকের দল। ১৮৮৩ সালে কুষ্টিয়া শহরে সিরাজ সাঁই এর নির্দেশে তিনি নিজস্ব আখড়া তৈরি করেছিলেন। তিনি এরপর আরো সাত বছর বেঁচে ছিলেন। আধুনিক গবেষকদের কাছে বসন্ত পালের এই আলেখ্য সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে। বাংলাদেশের লালন একাডেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মনসূরউদ্দিন এই প্রচলিত জীবন কাহিনীকে সমর্থন করেন।

ধরে নেওয়া হয় লালন ১৭৭৪ সালে অথবা তার আগে বা পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবেই তাঁর 'জন্মস্থান'নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে লালনের জন্মস্থান নিয়ে চার রকমের মত রয়েছে। যথা -প্রথমত: ১৯০০ সালে আবদুল ওয়ালি ঝিনাইদহ মহাকুমার ও হরিশপুর গ্রামে জন্মেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ ১৯ ৫৫ সালে বসন্তকুমার পাল বলেন লালন অবিভক্ত নদীয়া জেলার কুমারখালীর অন্তর্গত ভাড়ারা গ্রামে জন্মেছিলেন। তৃতীয়তঃ বাউল গানের অন্যতম স্রষ্টা কাঙাল হরিনাথ বলেন লালন জন্মগ্রহণ করেন কুষ্টিয়ার অন্তর্গত গড়াই গ্রামে। চতুর্থত: গবেষক এ.কে.এস নূরের মতে লালন জন্মান যশোহর জেলার ফুলবাড়ি গ্রামে। তাই লালনের জন্মস্থান সম্পর্কে আজও কোনরকম সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। তবে অধিকাংশ গবেষকদের কাছে স্বীকৃত বসন্ত পালের মতই। তবে লালনের জীবন কাহিনী অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে তার গানের মধ্যেই তবে তা থেকে সত্য সংগ্রহ করা সত্যি খুবই কঠিন।তবে তাঁকে জন্মসূত্রে হিন্দু বলে মনে করা হয় তেমনি ১৯৬৩ সালে তার সমাধিকে মাজারে সৌধরূপ দেওয়ার পর থেকে তাকে মুসলিম বলে প্রচার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

"লালন ব্যাহ্যত: মুসলমান ফকির বৎ আচরন করিলেও
খুব সম্ভবত আনুষ্ঠানিক ভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই,
করিলে হিন্দু সমাজে তিনি এতটা শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিতেন না।"- অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় আবার অন্নদাশঙ্কর রায় 'লালন ও তার গান' গ্রন্থে বলেছেন "সম্ভবত তিনি জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন, হিন্দুরা তাকে ত্যাগ করেছিলেন, মুসলিম সংসর্গের দরুন।" লালনের গানগুলিকে ভালোভাবে অনুশীলন করতে না পারলে লালনকে বোঝা সম্ভব নয়। তার গানের মধ্যে যে রহস্যময়তা আছে তা বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তবে তার মূল কারণ হলো তার গানের ভাষা, যে ভাষার নাম সান্ধ্য ভাষা, বা আলো আধারি ভাষা, যার বাইরে এক রকম অর্থ, আর ভিতরে অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। এইরকম একটা গানের কথা প্রসঙ্গে বলা ভালো, সেটি হল-

"আমি একদিন না দেখিলাম তারে,
আমার ঘরের কাছে আরশিনগর

সেথা এক পড়শি বসত করে।"

তিনি জাত পাত ধর্ম এগুলি যে মানতেন না সেটা গানের ভিতর থেকে বলতে চেয়েছেন, তিনি মানুষকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তার একটি এখানে উল্লেখ করা যায়-

"লালন বলে হাতে পেলে
জাত পোড়াতাম আগুন দিয়ে"।

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দু-মুসলমান এই দু ধর্মের কোন রীতিনীতি মানেননি। এমনকি কোন আচার- অনুষ্ঠান তিনি উদযাপন করেননি। লালন মানবধর্ম কে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাই বলে লালন কে ধর্মহীন মানুষ বলে মেনে নিতে পারি না। তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন উঠে আসে যে, জীবিত কালে যে মানুষটি চিরকাল আড়ালে থেকে গিয়েছিল মৃত্যুর পর তাকে আবিষ্কার করা সত্যিই এক অসাধ্য কাজ। তাকে দাহ করা হয়েছিল না সমাধি দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি হদিশ ও পাওয়া যায়। 'হিতকরি' পত্রিকায় লালনের মৃত্যুর পর লেখা হয়- "মৃত্যুকালে কোন সম্প্রদায়ের মতানুসারে তাহার অন্তিম কার্য সম্পন্ন হওয়া তাহার অভিপ্রায় বা উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল ও হরেনাম ও দরকার নাই। তাঁহার উপদেশ অনুসারে আখড়ায় মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাহার সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না । বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাহার জন্য মন্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছে।"

লালনের হিন্দু- মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রচুর শিষ্য ছিল। তাঁর গানের ভিতর যেমন প্রচুর ইসলামী চিন্তার গান আছে, ঠিক তেমনি প্রচুর বৈষ্ণবিক ভাবনার ও গান রয়েছে। তার ইসলামী ভাবনার গান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়-

"আমি ডুব দিয়া রূপ দেখিলাম নদীতে
আল্লাহ আদম মোহাম্মদ
তিন জনা এক নূরেতে নূরেতে।"

আবার তিনি গেয়েছেন" -

সেভাব কি সবাই জানে
যেভাবে শ্যাম আছে বাঁধা
গোপীর সনে।
গোপী প্রেম জানে যারা
শুদ্ধ রসের ভ্রমর তারা।"

এইরকম বৈষ্ণব ভাবধারার গান তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল কারণ তিনি ছিলেন মানবতার সন্ধানী। তাঁর মনে রাধাকৃষ্ণ, মোহম্মদ সব এক, তিনি রাম রহিম কে আলাদা করে দেখেনি, মানবতার নিরিখে সবাইকে তিনি বিশ্লেষণ করতেন। তাঁর একটা গানের বাণী এখানে উল্লেখ করা যায়-

"গর্তে গেলে কূপজল কয়
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়।"

অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান এই সম্প্রদায় গত ভাবে মানুষকে বিচার না করে মানবতার নিরিখে মানুষকে বিচার করার কথাই তিনি বলেন। হিন্দু ছিলেন না মুসলিম ছিলেন এরকম ছকে মানুষকে বেঁধে ফেলা যাবে না।তিনি এটা মনে করতেন জাতের কোন রুপে তার কোন বিশ্বাস নেই। আবার তিনি হিন্দু না মুসলিম এই প্রশ্নের অসাধারণ উত্তর ও দিয়েছেন তার গানের মধ্যে -

"সবাই বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন
লালন বলে আমার আমি জানিনা সন্ধান।”

হিন্দু না মুসলমান এই প্রশ্ন তাঁর কাছে অর্থহীন। তাঁর গান হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনক্ষেত্র তৈরি করেছে। তিনি ছিলেন একজন সমন্বয়বাদী মানুষ। সমন্বয়ের মাধ্যমেই তিনি নিজের নতুন ধর্ম,দর্শন ও ভাবনার কথা তিনি প্রকাশ করেছেন এবং জীবনব্যাপি সেটাকে অবলম্বন করেছেন আর তা হল মানবতাবাদী ধর্ম, মানবতাবাদী চিন্তন।লালন গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে মানুষের কোন বর্ণ ধর্ম গোত্র হয় না লালন তার চিন্তায়, চেতনায়, বিশ্বাসে সব সময়ই মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন ।লালন বলেছেন-

“এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে,
যেদিন হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান জাতি গোত্র নাহি রবে....।"

তাই আমরা বলতে পারি, লালনের ধর্ম বলে কিছুই ছিল না, লালনের যে ধর্ম ছিল তা হল 'মানব ধর্ম'।

আমাদের ভারতবর্ষের ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতায় আসে ।হারিয়ে যায় বাংলার স্বাধীনতা। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের জুলুম অত্যাচার নির্যাতন শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার যেভাবে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক শাসন শোষণ চালাচ্ছিল এবং হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে যেভাবে বিভাজন রেখা তৈরি করেছিলেন, লালন ফকির এই অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। এই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে লালনের সর্বদা অনীহা ও ঘৃনা প্রকাশ পেয়েছে।

লালন গুরুবাদে বিশ্বাস করতেন, তাই লালনের দর্শনে গুরুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়েছে। লালনের গানে তার চিন্তা চেতনায় সঙ্গে পারস্যের সুফি তত্ত্বের অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। লালন এক জায়গায় বলেছেন-

'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি'।

অর্থাৎ মানুষকে ভালবাসলে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়, স্রষ্টার সৃষ্টিকে ভালোবাসলে সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসা হয়। লালন তার গানের মাধ্যমে সমাজের নানা বৈষম্য, সামাজিক বিভেদ, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। হিন্দু ধর্ম ইসলাম ধর্ম এই উভয় ধর্ম সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। দুই ধর্মের

লোকেরা তাকে নিজেদের লোক বলে মনে করতেন। ব্যক্তি জীবনের প্রভাব তার গানগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। তার গানগুলোতে আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ,প্রেম তত্ত্ব, সাধন তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

ইংরেজদের সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেই সময়ে ভারতবর্ষে বিভিন্ন আন্দোলন শুরু হয়েছিল যেমন তিতুমীরের সংগ্রাম, ওয়াহাবি আন্দোলন, ফরাজী আন্দোল্ সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ। জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মেলা গঠনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে শুরু হয় জাতীয় গণজাগনের রূপরেখা। এই সময় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের চিন্তাধার্ রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এই সময়ে কলিকাতা কেন্দ্রিক বাঙালিরা জেগে উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু কলিকাতা থেকে দূরে গ্রামে যেখানে নবজাগরণের ঢেউ প্রবাহিত হয়নি সেই গ্রাম ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত, লালন ফকির সেই গ্রামে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়েছিল। লালন ফকির জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাপক্ষকে সমর্থন করেছিলেন সেই সময় কাঙাল হরিনাথ 'গ্রামবার্ত্তা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি তার পত্রিকায় প্রজাদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেন তার অপরাধ ছিল তিনি জমিদারের দের অত্যাচারের কাহিনী ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। তাই কাঙাল হরিনাথের উপর জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনী আক্রমণ করে। লালন ফকির তার লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে জমিদারি বাহিনীর আক্রমণ কে প্রতিহত করেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন। এখানে একটা বলে রাখা ভালো সেটা হল - যে হাতে তিনি একতারা বাজিয়ে মানবতার জয় গান গেয়েছেন, সেই হাতে লাঠি ধরতে প্রয়োজনে কুণ্ঠাবোধ বোধ করেননি। তাই তিনি তার গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন-

‘সত্য বলো সুপথে চল ওরে আমার মন।’

লালনের গান হিংসা বিদ্বেষ হানাহানি মুক্ত পৃথিবীতে মুক্তি বাণী নিয়ে আসে। মানুষের মনে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ যুক্ত পৃথিবীতে লালনের দর্শন সত্যিই মানুষকে আলোর পথ দেখায়। আজ বর্তমান সময়ে লালনের দর্শন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সময়ের সাথে সাথে লালন ফকির বিশ্ব দরবারে অত্যন্ত সমাদৃত। গ্রামের অবহেলিত লালন এখন বিশ্ব দরবারে বন্দিত। লালনের চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাস বিশ্বের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক দার্শনিক বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করেছেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং আমেরিকান কবি ও চিন্তাবিদ গিন্সবার্গ মতো কবিরা। বর্তমানে তার গান বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। গবেষকদের কাছে লালন হয়ে উঠেছেন এক মহাজ্ঞানী মানুষ।

উপসংহার (Conclusion)

লালন ফকির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বহুমুখী প্রতিভা ও কার্যের দ্বারা তিনি সমাদৃত । কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার ফলস্বরূপ তাঁকে নিয়ে প্রচুর

সমালোচনা হয়েছে। তাঁর জীবনদর্শনের প্রভাব সমাজে জনজীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর দর্শন, জীবন, সঙ্গীত, সাধনা সমাজে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই প্রায় দেড় শতাব্দী আগের লালন যে চিন্তা-চেতনা তৈরি করেছিলেন তা আজও বিশ্বের বহুচিন্তাবিদ, শিক্ষিত সমাজকে প্রভাবিত করে চলেছে এবং দীর্ঘকাল তা করে থাকবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনকে শুধু কবি বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাকে ইংরেজি কবি শেলি সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন 'The village poet evidently agrees with own sage of upanishad who says that our mind comes back baffled in its attempt to reach the unknown being; and yet this poet like the ancient sage does not 'give up adventure of the un infinite thus implying that there is a way lo it's realization.

লালন ফকির চেয়েছিলেন সব ধর্মের ঊর্ধ্বে ওঠে মানবধর্মকে আলিঙ্গন করতে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি সবসময় মানবধর্মকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ‘মনুষ্য ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ‘সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর জীবন দর্শন, মানবতাবোধ তাঁকে মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক হিসাবে পরিচিত করেছে। লালন বাঙালির এক সুরেলা ও গৌরবময় অধ্যায়, যা আজও বাংলার এপারে, ওপারে, ছড়িয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে লালন গবেষক আবুল আহসান চৌধুরীর একটি বিশেষ উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে – “বাঙালিরা জেগে ওঠে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। রামমোহন ছিলেন তার পথপরিদর্শক। কিন্তু বৃহত্তর বাংলাদেশে গ্রামের পর গ্রাম অন্ধকারে ছেয়ে গেছিল। লালন ফকির সেই গ্রামে মাটির প্রদীপ জ্বালান।” লালন, তাঁর গানের মাধ্যমে গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ এনেছিলেন।

তথ্যসূত্র (Reference):-

১) পাল বসন্তকুমার, মহাত্মা লালন ফকির, পাঠক সমাবেশ, ২০১১ , পৃষ্ঠা- ২

২) চৌধুরী আবুল আহসান, লালন সমগ্র, পাঠক সমাবেশ, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৬৫৩, ৬৫৯

৩) চৌধুরী আবুল আহসান, লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পলল প্রকাশনী, ২০০৭, পৃষ্ঠা - ১২৫

৪) রায় অন্নদাশঙ্কর, লালন ও তাঁর গান, শৈব্যা পুস্তকালয়, ১৯৮০, পৃষ্ঠা – ৫০, ৫৬, ৫৮

৫) ঝা শাক্তিনাথ ,ফকির লালন সাঁই ,দেশ কাল ও শিল্প , কলকাতা সংবাদ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা - ৯০

৬) চক্রবর্তী সুধীর , ব্রাত্য লোকায়ত লালন, পুস্তক বিপনী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা – ৫০

৭) বিশ্বাস হেমাঙ্গ ,লোকসংগীত সমীক্ষা,বাংলা আসাম ও কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫, পৃষ্ঠা- ৬৭,৬৮

৮) মিত্র সনৎকুমার, লালন ফকির, কবি ও কাব্য, সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ১০১

৯) ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬৪, পৃষ্ঠা -৬৪২

১০) মাননান আবদেল, অখন্ড লালন সঙ্গীত, রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-১০১

১২) Datta, Rajeswari. "The Religious Aspect of the Baul Songs of Bengal." The Journal of Asian Studies XXXVII (3): 445-455. 1978

১৩) Keith E.Cantu 'লালন সাঁই' – এর বাউলগানে বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রতীক, ভাবনগর, International Journal of Bengal Studies, Volume – 5, Number 5 – 6, June – October 2016.

১৪) Dubey, Muchkund. "The Sadhana of Lalan Fakir. "India International Centre Quarterly, vol 24, no 2/3, pp. 139-50. JSTOR, 1997

১৫) Abdullah, Limon. INFLUENCE OF SUFIAM ON LALON FAKIR. www.academia.edu.

১৬) https:// www.getbengal.com/details/lalon-fakir-s-songs-have-always-mocked-identity-politics.

Chittaprosad Bhattacharya : Art, Activism and socialist realism in India, 1939-1948

Priyanka Das
Independent Researcher
BFA and MFA in Applied Art
Department of Visual Arts
Rabindra Bharati University

Abstract: This article looks at the political and artistic life of Chittaprosad Bhattacharya, an Indian artist who became a major collaborator of the Communist Party of India in the 1930s and 1940s. Being a part of the communist "artist-reporter" team, Chittaprosad produced an enormous lot of sketches and drawings of the Bengal Famine of 1943-44 as a means of communication through his being a social issue advocate and propagator.The article narrates Bhattacharya's journey from an anti-fascist poster artist in Chittagong to a torchbearer in the "cultural front" of communism and tracks how visual arts could be used for propagation and mobilisation. His works, wherein resistance and popular representation were ingrained, define his identity as a party artist.The article also discusses the marginalization of Bhattacharya's and other party-affiliated artists from mainstream modern Indian art narrativesaccording to some critiques, their functional imagery anomalies opposed the set high art spaces. It asks for seriousness with the interaction between art, politics, and ideology during this period and the contribution of leftist assaultive cultural radicalism to the visual-cultural formation of pre-independent India.
Keywords: Chittoprosad Bhattacharya, socialist realism, Art-politics, Bengal Famine, Hungriest Movement, Communist cultural radicalism.

Introduction :

As India approached independence in those eventful years, an individual became a symbol of the nexus between art and politics – Chittaprosad Bhattacharya (1915–1978). An artist, illustrator and political activist, s'Bhattacharya life from being a young graduate in Chittagong to becoming an important artist-reporter of the Communist Party of India (CPI) is a significant juncture in Indian art history. The rise of communism and General Secretary P.C. Joshi's Cultural font made many artist reporters, Bhattacharya's is one of the finest. Bhattacharya's pen and ink outlined the manmade famine visual repertoire of human tragedy,

the cultural squad of IPTA (Indian People's Theatre Association), an outrageous visual image poster of society generating awareness, war and hunger, documenting peoples with his drawing and writings, "popularising culture - taking art to the people" at another level. This paper will discuss Bhattacharya's life and works by focusing mainly on his affiliation with socialist realism from 1939 to 1948 during the war, famine, political cultural shift, society transition, and the final push for independence.

Bhattacharya's famine sketches as well as powerful political posters are some instances of his art that both reported on a decisive period in Indian history as well as personified a new kind of proactive art. His work is an insight into the complex relationships between art, politics and social transformation during mid-twentieth century India. He also represented socially committed art and deeply drew inspiration from socialist realism ideas and communist cultural policy. His career in political background ended in 1948 with the exit of P.C. Joshi.

This essay discusses Bhattacharya's contributions to Indian art concerning the leftist cultural movement, revealing how his artwork shaped and was influenced by political and social contexts within his era. Therefore, anticipate that this will allow us to contribute and aspire to do this to enhance the comprehension of art's part in political movements and the difficulties artists encounter within ideological frames.

Early Years and Political Awakening (1915-1939):

Chittaprosad Bhattacharya was born in 1915C.E. inUndivided Bengal referred to Chittagong. For a native of this place, the problems were more than just trivial as he had to witness the activities of revolutionary nationalists who abounded at that time.Bhattacharya became involved with student activism, graduating from college, and he established contacts with local revolutionaries such as those involved in the famous Chittagong Armory Raid of 1930. This first-hand information on radical politics paved the way for him later to join the communist movement.

It was at this time that his political inclinations evolved alongside his artistic beliefs. Bhattacharya's art perspective experienced sea changes during World War II, although his earlier works had involved more classical modes. This dramatic change was explained in his incomplete autobiography: "I realized that it brought me closer to my own time completely, I understood that Art is not only a weapon or only artist's self-expression but primarily it is one of weapons of whole society." That was a turning point in Bhattacharya's life as a politically inspired artist, and it laid the basis for him to join the Communist Party of India.

Joining the Communist Party (1939-1942):

In 1939 Chittaprosad‘s affiliation with the Communist Party of India formally began with the outbreak of World War II and the fall of Burma to Japanese forces in 1942. With Chittagong now exposed to Japanese bombings, the communists and the Kisan Sabha (Peasant Congress) mobilized anti-fascist resistance in the region.It was during this time that Bhattacharya got his first job asa communist. In this respect, a young peasant cadre from Bengal Provincial Kisan Sabha approached him demanding ‘active support in rousing and uniting the people against Jap-invasion’ This meeting, described by Chittaprosad as a ‘red letter day’ in his life marked his induction into the grassroots network of the party.

The first works that Bhattacharya did for his party were posters against fascism. These were not mere slogan images but complicated visual compositions experimenting with form and style. As he put it: ”These were paintings in every sense in tempera and the wash, and I had experimented freely in form and style as the themes of horrors of war and fascism and valour and heroism”.

The People's War and Cultural Front (1942-1945):

The communist leadership could not fail to notice the talents of Bhattacharya. In 1942, at a peasant‘s conference in Dhalghat Rangamati, he was sighted by P.C. Joshi the General Secretary of the communist party of India. The anti-fascist posters that he had drawn so impressed Joshi that he took him to the party headquarters in Bombay which served as the centre of the communist Cultural Front.

A significant change in the political strategy employed by communists took place at around this time. Following Hitler‘s invasion of the Soviet Union in 1941, the communists expressed their support for British war efforts, viewing it henceforth a ‘People’s War’ against fascism. This policy was controversial among other Indian nationalists but helped them work more openly in spreading propaganda.At Party HQ, Chittaprosad joined many artists, writers, performers and photographers brought together by Joshi. He became integral to numerous cultural organizations affiliated with communism, including the ‘Anti-Fascist Writer’and ‘Artist Association’ and the ‘Indian Peoples ‘ Theatre Association (IPTA)'.

As an artist-reporter for the Party, Bhattacharya did everything. He traveled around, and covered peasant movements, workers ‘strikes and political protests. His drawings and reports appeared in Party papers every week and gave a picture of what the communists were up to and what was happening in India during the war.This was the time when

Bhattacharya developed his style of reportage art – observation and interpretation. His work from this period shows he was getting more and more interested in the lives of common people – peasants and workers. That would be his theme and fit witha communist populist tone.

Documenting the Bengal Famine (1943-1944):

The Bengal Famine of 1943-44 was a turning point in Bhattacharya's life and modern Indian art. The famine, caused by wartime speculation and misgovernment, killed millions and showed the failures of colonial rule. For the communists, the famine was an issue to mobilize around and attack the British government.

Bhattacharya started his famine tours in late 1943 and produced a huge amount of work over the next year. His pen and ink drawings showed hunger and displacement in a journalistic way and with huge human feelings. In 1944, Chittaprosad published 'Hungry Bengal', 22 drawings from his Midnapore tour with his notes. That was the first time an artist was doing visual reportage in India – on-the-spot drawings with written words. His simple line drawings made on cheap paper with minimal tools showed the urgency of the situation.

Chittaprosad Bhattacharya, Bengal famine of 1944 Halisahan, Chittagong, brush and ink on paper, 9.6" x 14", Photo © https://news.artnet.com/partner-content/1244423

Chittaprosad Bhattacharya, BashanaKaibarta, E. R. Hospital, 1944, Brush, pen and ink on paper, Photo © https://map-india.org/why-i-love-art-greedy-eyes-hungry-bengal/

'Hungry Bengal' was part of a huge famine literature produced by the communists– reports, pamphlets, and posters to mobilize and attack the colonial government. Bhattacharya's famine drawings were published in Party papers, used for fundraising and shown in IPTA's Cultural Squad mobile exhibitions. Bhattacharya's famine work went beyond the politics of the moment. His drawings, along with Zainul Abedin's and Somnath Hore, are what we remember the Bengal Famine as. More importantly, the famine work changed the course of Indian art. It brought in grotesque realism and social commentary and broke away from the lyrical and mythological art of India.The impact of Bhattacharya's famine work went further than that. His drawings and others like Zainul Abedin's and Somnath Hore's are what we think of when we think of the Bengal Famine. And the famine work changed Indian art.

Unleashing the Power of Socialist Art (1945-1948):

With the post-war years and India moving towards independence, Bhattacharya's art changed to express this political change. His works became a manifestation of resistance, and class struggle in those days, and turned mainly towards the aesthetics of Socialist Realism and cultural policies of communism.

Bhattacharya's work for the communist after 1945 was pretty diverse. He cranked out all sorts of imagery, from posters for Party meetings and rallies to illustrations for Party publications, and even designs for IPTAperformances. These images often featured brave workers and peasants standing tall, while also showcasing the villains of society – colonial officials, native princes, capitalists, and landlords – being pushed to the sidelines. Imagine a typical Bhattacharya masterpiece

from this time: a buff worker proudly holding a graph showing economic growth on the rise, or a peasant woman with bundles of freshly harvested grain. Meanwhile, the symbols of oppression and exploitation are forcedinto the background. These images fully met the communists' perception of a strong leading working class that was to lead India on the path to a socialist future.

Chittaprosad Bhattacharya,Untitled,linocut, Photo © https://kaloberal.home.blog/2018/08/31/chittaprosad/

The idea of "national in form, socialist in content," a term used by Stalin and feted in communist cultural circles, strongly stamped Bhattacharya's art in this period. What it meant, in the first instance, was the expression of local cultures within the Soviet Union. At the same time, in India, it was taken as an injunction to give indigenous artistic traditions a socialist message.

It is possible to see how Bhattacharya accepted this idea and created an Indian iconography of class struggle. From local pictorial traditions and cultural symbols, he combined with the image of the heroic worker popularised by Soviet Socialist Realism and came up with a unique language of forms that remained true to the roots of Indian culture while it came closest to fulfilling the international communist aesthetic.

Bhattacharya's journey into evolving a socialist aesthetic during those formative years. Interesting how his art captured the spirit of those times and went on to become a powerful tool of political expression.

Art for Everyone: Showing, Sharing, and Connecting:

The art of Bhattacharya, for instance, could closely relate to the cultural policies and structures of the communists in the sense that his pieces would be displayed to their maximum audience through Party publications, political rallies, and conferences, rather than the conventional art galleries or museums, and only at times through mobile exhibitions organized by the IPTA's Cultural Squads.

This way of the display and circulation of its work in an inordinate way impacted how audiences would receive and interpret the pieces. On one hand, it allowed his art to reach a much larger audience than it would have through typical art channels. His images were seen by peasants at Kisan Sabha meetings, by workers at factory gates, and by students at political rallies. The exposure was therefore wide and corresponded to the objective of the communists to make art available to all people and to break down the barriers between high art and popular culture.

Contrarily, it is often the case that the predominantly political and propagandistic context in which Bhattacharya's work was presented led to a very limited understanding of his artistic value. Party critics and cultural theorists, while recognizing its importance for mobilization and documentation, too often failed to deeply engage with its aesthetic qualities or place it within wider artistic movements.Gopal Haldar, a communist cultural theorist and one of the most prominent Bengali literary critics, voiced an opinion that was typical of many Party intellectuals: while he was full of praise for the potential of artist cadres like Bhattacharya to reach the masses, he ultimately saw their principal function as that of supplying "raw material" for more sophisticated artistic creations. This sort of attitude has orientated attention toward the functional and documentation aspects of Bhattacharya's work at the cost of attention toward its artistic innovations, which has done much to begin the process of marginalizing it within mainstream art discourse.

To put it differently,Bhattacharya'sart reached an audience via abnormal channels, thereby making it possible to reach the masses. Yet because of its embedment in a political context, the artistic value was lost and its real worth was received by a few.

Ideological Tensions and Artistic Autonomy:

The relation of Bhattacharya's art to the demands of communist ideology was at times complicated, even filled with tension. Being deeply

committed to the political goals of the Party, the artist also aimed to preserve a bit of artistic independence and enlarge the boundaries of what was permitted by 'proletarian art'. These tensions became more noticeable after 1945 when the communist's cultural policies became more rigid and dogmatic. The Party started insisting that artists strictly adhere to the principles of Socialist Realism and create work that was clearly 'progressive' in content and easily understood by the masses.

Chittaprosad Bhattacharya, Call for Peace, 1952, linocut on paper, 30.5 x 29.6 cm.Photo © https://dagworld.com/chittap2020.html

Though generally committed to such goals, Bhattacharya often found strict interpretations difficult to maintain. Even in his most politically charged work, he managed a complexity and ambiguity that did not always fit the party chains. He experimented with forms and styles drawn from diverse artistic traditions, more often than not imbuing his political images with personal and emotional content.

Chittaprosad Bhattacharya, People's Democratic Front, brush, pen and ink on paper, 1952, 34.8 x 50.8 cm.Photo © https://cpimwb.org.in/november-the-month-of-alternatives-the-month-of-vows-kaninika-ghosh/

These are the wider debates in movements about the place of art inside revolutionary politics. While there were Party theoreticians who sought to define something like ‘proletarian art’ in narrow terms which placed overt political messaging far above aesthetic concerns, others argued for a more nuanced perspective that was sensitive to the complexities of artistic expression and valued formal innovation.How Bhattacharya dealt with issues in these debates, as revealed by his artworks and writings, offers one of the best reflections of the challenges for politically committed artists working under ideological conditions. His experience reflects the ongoing struggle between artistic freedom and political dedication that has characterized much of socially engaged art in the 20th century.

The Partition and Disillusionment (1947-1948):

The partition of India in 1947, with its political reverberations, became a Rubicon in Bhattacharya’srelationship with communism. The latter opposed independence, calling it ‘false’, propagating further revolution, and creating inner conflicts that later resulted in the expulsion of P.C. Joshi, Bhattacharya’s main backer within the Party.

These changes coordinated with a broader change in the communist cultural policies in general. The Cultural Front, built so laboriously under Joshi's leadership, was virtually dismantled. Many of the artists and intellectuals associated with the Party's cultural activities found themselves estranged from the new leadership.For Bhattacharya, this marked the beginning of a period of gradual disengagement from active involvement with the Party. Though ideologically still a communist, he became increasingly critical of the policies being followed by the Party and its attitude toward cultural workers. There was a sense of growing disillusionment reflected in his art in terms of rising isolation and betrayals.The isolation of the artist within the Party was matched by his fading presence in the larger Indian art scene. As India entered the post-independence period, new artistic movements struggled that were more under international modernist directions. Chittaprosad's socially engaged figurative style, so closely identified with the politics of the 1940s, found less purchase in this new artistic landscape.

Legacy and Reassessment:

It was after 1948 that Bhattacharya more or less withdrew from active public life and retained his seclusion in Bombay. All through, making his art—illustrations of children's books, puppets, and linocut prints on social themes like injustice, he never seemed to have stopped making art.

However, all his works remained grossly unrecognized all through his lifetime.

Interest in Bhattacharya's work revived only in the 1970s. In 1978, a monograph on the artist was published by the Lalit Kala Akademi, which is the National Academy for the Arts in India, the year of the death of Bhattacharya himself. Thereby, this response is a little late, but at least it signalled the emergence of a gradual rethinking of Bhattacharya's place among the greats of Indian art. There has been a burgeoning interest among scholars and curators over the last few years in unearthing histories of politically committed art practices in India. His work was perhaps coincidentally revisited for a new meaning, not one of political propaganda but of a milestone in the journey toward socially sensitive work in India.

these reassessments have shed light on some of the integral facets of Bhattacharya's legacy.

- He played an important role in the development of visual language to involve social critique and political opposition that was based on an Indian reality and, at the same time, borrowed from international leftist aesthetics.
- His famine sketches have proven to be valuable historical records and works of art that pushed Indian art towards a more direct engagement with social issues.
- He contributed to expanding the venues and methods of artistic production and exhibition beyond the traditional spaces reserved for the elite.
- The tensions in his work between political commitment and artistic autonomy reflect broader debates about the relationship between art and politics in the 20th century.

Conclusion:

The span of the radical praxis across crucial decades of the 1940s and 1950s in Chittaprosad Bhattacharya's career lends highly special tropes to the intersections of art, politics, and social change in modern India. His work captures, in raw depictions of famine and greatly complex portrayals of class struggle, a very important moment for Indian socially engaged art practice. The fact that Bhattacharya's work has been marginalized in mainstream narratives of Indian art history speaks to larger issues in how politically committed art has been perceived and valued. This experience of his thus underlines the challenge that artists

working within political movements are faced with the political ideology on one hand, and artistic integrity on the other.

Reference:

Pradhan, S.*"Marxist Cultural Movement in India, Chronicles and Documents"*, vol. 1, 2, and 3, National Book Agency Calcutta, 1936-47.

Bhattacharya, C. Ghosh, P.*"Chittaprosad: A Doyen of Art-World"* Calcutta: Shilpayan Artists Society, 1995.

Bhattacharya, C*"Hungry Bengal: a tour through Midnapur District November 1943"*Delhi Art Gallery, New Delhi, 2011.

Bhattacharya, M. *"The Progressive Cultural Movement: The Communist Legacy"* 2, April-June, 2023

Sunderason, S. "AS 'AGITATOR AND ORGANIZER': CHITTAPROSAD AND ART FOR THE COMMUNIST PARTY OF INDIA,1941-*8", Object*, *13*, 76-96

Wille, S. "A Transnational Socialist Solidarity Chittaprosad Prague Connection*"Stedelijk Studies Journal 9* 2019. DOI: 10.54533/StedStud.vol009.art11.)

Indian People's Theater Association, Bulletin no 1, July 1943

Hore, S. *Wounds, An Exhibition by Somnath Hore* Kolkata: The Seagull Foundation for the Arts, 1992), 13, as quoted in Sunderason, pp. 93–94.

Chandra, B.'P C Joshi, A Political Journey," in *Mainstream Weekly XLVI, no. 1*December 22, 2007, (https://www.mainstreamweekly.net/article503.html) September 7, 2019.

Mallik, S.*"Chittaprosad: A Retrospective, 1915 -1978"*, Volume 1, Delhi Art Gallery, 2011.

Huyssen, A.*"Geographies of Modernism in a Globalizing World",* New German Critique, Duke University Press, 2007.

Lowe, K. *"The Fear and the Freedom: How the Second World War Changed Us"* St. Martin Press, October 24, 2017.

Basu, J. "The communist and India freedom Struggl*e", Marxist, XXXVII, 3*–4, July-December 2021

Ghosh, C."Visual Art, Realism and the Issue of Taste: Marxist Cultural Debates in the 1940s*", Social Scienti*st, March-April 2013, Vol. 41, No. 3/4 March-April 2013, pp. 49- 64.

Habib, I. *"The Marxian theory of socialism and the experience of socialist societies",* P.C. Joshi Memorial lecture 1, November 4, 1993.

Chanda, S. "পোস্টারে সোসালিষ্ট রিয়ালিজম ও তার পটভূমিকা", রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, *New series Vol. 22, Rabindra Janmostab Number, 2019, pp. 58-69.*

Aranyak an exceptional Bengali Novel on the geographical context of Bihar

Ujjal Roy
Assistant Professor, Department of Geography,
Sundarban Mahavidyalaya, Kakdwip

Abstract : Aranyak composed between 1937-39 is a famous Bengali novel by Bibhutibhushan Bandopadhyay based on his long & arduous years in northern Bihar, where he came into contact with a part of the world, that even now remains unknown to most of us. Aranyak literarily means of the forest. This novel explores the journey of the protagonist Satyacharan in the dichotomy of the urban & jungle lives. This novel reflects the great novelist experienced in his heart. This novel is a classic in Bengali literature & has influenced many upcoming novelists & intellectuals alike. The whole novel written on the area of northern Bihar and it is formed by the district like Purniya, Munger, Bhagalpur etc. Noygachiya, Fulkiya-boihar, Lobtuliya, Naraboihar are some of the famous places of this novel. The region belongs between the reserve forest of Mohanpura & Koshi river. The language is very clear & practical especially in the time of describing the features of natural beauty in forest. All seasonal changes are very clear in this novel for the simplicity of language. Shortage of water in summer, draught of Bihar, heavy rain, autumn & chill cold of winter is realistic in this novel. Beauty of full moon night in forest is very attractive in this novel for language & presentation. The role of various animal like horse, elephant, dear, Hayne, leopard, tiger are very live & their sound is quite actual in this novel.
Key Word: Aranyak, Forest, Classic, Protagonist, Urban, Language.

Introduction

Aranyak is a Bengali Novel written by the famous nature lover Bibhutibhushan Bandopadhyay, where he drawing the picture of struggle by the common people in the perspective of forest. The middle part of Bihar which is very rich in the variety of natural diversification & the relation of indigenous people of that area are the main theme of this novel. Changing pattern of forest, social structure of rural areas, natural

beauty of Bihar are play the main role to create the plot of this novel which is an unique example in Bengali literature.

The whole novel written as a experience of a Bengali Youngman named Satyacharan who was a manager of Lobtuliya & Naraboihar in the bank of Koshi river under the district of Bhagalpur, Purniya, Munger etc in Bihar. Actually a densely forest area near about twenty to thirty thousand bigha of Purniya district changes into agricultural land in six year by the hand of Satyacharan.

Base of Aranyak

Aranyak composed between 1937-39 is a famous Bengali novel by Bibhutibhushan Bandopadhyay based on his long & arduous years in northern Bihar, where he came into contact with a part of the world, that even now remains unknown to most of us. Aranyak literarily means of the forest. This novel explores the journey of the protagonist Satyacharan in the dichotomy of the urban & jungle lives. This novel reflects the great novelist experienced in his heart. This novel is a classic in Bengali literature & has influenced many upcoming novelists & intellectuals alike.

Geographical Area

The whole novel written on the area of northern Bihar and it is formed by the district like Purniya, Munger, Bhagalpur etc. Noygachiya, Fulkiya-boihar, Lobtuliya, Naraboihar are some of the famous places of this novel. The region belongs between the reserve forest of Mohanpura & Koshi river.

Choice of the study area

(1) The area is in under the north Bihar including Purniya, Bhagalpur, Munger district which is near about T.M. Bhagalpur university.

(2) The novel written in the base of forest which is unique as a creative literature.

(3) The area of novel is in the bank of Koshi. This is one of the main tributary of Ganga & called sorrow of Bihar. The whole area flooded almost every year for this river.

(4) People of the novel is belongs from rural area of Bihar & various caste category. Many ethnic group & caste in this time presented here beautifully.

Hypothesis

(1) Female characters of novel are looking more attractive in the frame of the nature.

(2) Dialogues with local language are very effective if it use properly. Colloquial language is the life line of dialogues.

(3) Nature also can play a role just like a living character.

(4) Social issues are the main target point of a novel.

Language

The whole novel written by Bengali language but contemporary Hindi, Maithili, Sanskrit language also use in various part of the novel. The language is very clear & practical especially in the time of describing the features of natural beauty in forest. All seasonal changes are very clear in this novel for the simplicity of language. Shortage of water in summer, draught of Bihar, heavy rain, autumn & chill cold of winter is realistic in this novel. Beauty of full moon night in forest is very attractive in this novel for language & presentation. The role of various animal like horse, elephant, dear, Hayne, leopard, tiger are very live & their sound is quite actual in this novel.

Dialogues

Dialogue is the life of a novel. Here author use various kind of dialogue & word in different languages to present the novel in front of reader successfully. Some of them are;

1) Satyacharan feel to see Brahma Mahato

Blessed are the meek for theirs is the Kingdom of Heaven.(Page-46).

(2) Dhaturiya sang a song with sweet sound in beautiful way

Raja lijiya salammayn pardesiya. (page-50).

(3) Chika Chikibuli of South Bihar tell by Manchi to Satyacharan. (Page-111).

Dhonjhiri means low hill land. (Page-122).

(4) To describe the nature of life author use the Sanskrit sentence

Naymatya bolhinenlavya. (Page-130).

(5) A local poet Benkateswar Prasad use Sanskrit line to explain the nature of educated person in this way

Bidyotsu Satkobibacha Lovote Prakasong

Chatresu Kutmolsomong Trinobojjoresu. (Page-135).

(6) Song in Jhulon Purnima performed by Bhanumoti
Ajuki Anand, Ajuki Anand
Jhulot Jhuloney Shyamor Chanda. (Page-145).

(7) To explain the old valley of Koshi river in Nara-boihar author write
Pura jatrosrot pulinmodhuna tatra soritam. (Page-154).

(8) Satyacharan apologise to forest
Ha aranya, ha suprachin, amay khomakorio. (Page-154).

(9) Joba answered to Satyacharan her consept about the Bengal is
Nai Bheya, uhake paniboddi naromchey. (Page-162).

(10) Raju comments about the time of good bye of Satyacharan
Hojur, apnicholey gale Lobtuliya Udashoyajabe.
'Udas', a word. Which is use in very large scale in this area.

Characterisation

Author draws various character of Bihar in this novel. Satyacharan is the main figure of this novel. Actually he is a member of middle class Bengali Youngman. Women characters are very powerful in this novel. Many tribal characters also presented in this novel in detail.

Male Character

Satyachran: Main Character of this novel. Who gradually fall in love with nature. But ironically whole forest of lobtuliya destroys in his hand. The total novel presented in front of reader through this character by author.

Jugol Prasad: He also loves nature very much. Who planted various kind of flower like White bim,, Red campian, Fuxglab, Wood animon, Spider lili in the area of Saraswatikund & other areas of forest also.

Dhaturiya: A boy who loves to perform dance. He is a real artist from hearth. His story to learn Chakkarbaji dance from vitoldas is very interesting. He can also perform Nanichora Natuya dance of Munger village type dance.

Dobru Panna: King of Santhal tribe in this area. Fight in santhal revolt against East India Company. Now very poor but his behaviour is very gentle.

Other male character: Rashbihari Singh, Jogru Panna, Nandalal, Ganori, Motuknath, Nakchedi etc.

Female Character

Female Character plays a very powerful role in this novel. Versatility & detailing of those characters in this novel is a wealth of Bengali literature.

Bhanumati: Princes of an ancient royal family. Very gentle and in relation she is the daughter of tribal king Dobru Panna. Author draws this character with all of his attention. She is looking like the daughter of nature in this novel.

Manchi: Very live women character of this novel. She likes to purchase ornaments from fair. She lost her son in pox & the tragic result of this character upset everybody.

Kunda: A lady who loves arajput man, married him but lost everything because she is a daughter of court dancer in Luckhnow. She suffers for caste system of society.

Wife of Rakhal babu: Rakhal babu a Bengali doctor of Bihar who died by diseases but her wife faced lots of financial problem for this reason. She faced identity crisis also in her daily life with her children also.

Tulsi: A character with very little space in the novel. She is the first wife of Nakchedi.

Other female character: Surtiya, Saryu, Dhruva, joba are the also very strong female character in this novel.

Caste system

Untouchbility is a serious problem this era. Rajputs are very aggressive in their social life. They are mainly land lots. Brahmans are also very caste conscious. Manchi could not be able to bath in Sita kund & physically harassed because she is belongs from lower caste. Gangotiis a lower caste who is mainly agricultural labourer. Saonthals, Mundas are also available in those area. Dobru Panna is Saonthal king & a fighter of Saonthal revolt. Bhanumoti bis Saonthal princes. But they are very poor & live into the remote area of forest. Buffalo milk is the main source of income for that family. Kunda is neglected because she is a daughter of court dancer.

Food habits

Most of the people in north Bihar are very poor that time. They mainly eat dust of Mokai, eggs of ant, milk of buffalo, jonai etc. They cannot eat

rice for poverty. They only made some delicious foods like any fry in time of festivals. They are not alcoholic but drink bhang, mahuya etc.

Festivals

Holi is one of the most attractive festivals here. Everybody participate the festival of colours. Rajput like Rashbihari Singh organised grand festivals those days. All are eat rice, hotchpotch during this festival. Sugar, Mara, Laddu etc also available this time. Fair of Masondi a big festival here in autumn season. The roads of this fair just like the Arizona or Naroja desert of South America. Festivals of new crops are also very attractive there. Various kind of stall come there & everybody purchase stationary things, foods, cloths this time. Many local delicious food also available that time. Manchi bye lots of things like small aluminium dish, ring with artificial stone, clay doll, neck less of hinglaj (page-113) that time.

Natural beauty of forest

Satyacharan is the son of mind of author. Satyacharan is a young man of Kolkata. So, at first natural beauty of north bihar embarrass him but gradually he loves nature. The area of discussion is near about Mohanpura Reserve forest, Nara-boihar, Lobtuliya etc. Author show the beauty of every season in the forest area. Fulkiya, Nara-boihar is rich with various types of trees. An enormous kind of spiritual beauty present there that time. Specially in fool moon night it is looking like a heaven. Dudhli-flower of fulkiya in time of spring just looking like a green carpet on field. (page-18). According to Satyacharan saraswati kund is one of the most attractive places of this area. Lots of flowers like spider Lili available here. Purple colour cornflower, shimul etc also present here. Bomaiburu forest is mysterious for the story of unnatural incidents. Hill of Mahalikharup looking likes long blue line (page-63). Sound of birds, beauty of forest flower, and people of forest are looking like dreamland. Orchids, bees cent of Mahuya, bended wild roads all are looking excellent. Peacock, Hayne, Cheetah, tiger all are available here. According to the opinion of author it is looking like Papuya, New-Gini or the ocean of Cambian period.

Conclusion

A Bengali writer written a novel on the north Bihar is a different example which breaks the geographical barrier of Indian literature. Caste problem,

superstations, unequal distribution of wealth, poverty, problems of tribal life & other various social issues describe in detail in this novel. Female characterisation & drawing the different type of character is a specific wealth of this novel. Author describes the forest of Bihar in this novel which is unique and common people from Bengal not familiar with this. Aranyak is a totally different type of novel. Once famous poet Wordsworth describe the beautifulness of nature in poem but here writer do the same things in a novel which is different kind of medium in literature & undoubtedly create a new path for future generation.

References:

1. Das, Gyanandryamohan (1937). "Aranya". Dictionary of the Bengali Language (Self-pronouncing, Etymological & Explanatory) with Appendices (in Bengali) (2nd ed.) Kolikata: The Indian Publishing House. P.246.
2. Edmund Burke; Kenneth Pomeranz (8 April 2009). The Environment and World History. University of California Press. pp. 254-. ISBN 978-0-520-25687-3. Retrieved 5 July 2012.
3. Kusa Satyendra (1 January 2000). Dictionary of Hindu Literature. Sarup& Sons. pp. 20-. ISBN 978-81-7625-159-4. Retrieved 5 July 2012.
4. Datta, Amresh, ed. (1987). "Aranyaka" Encyclopaedia of Indian Literature. New Delhi: Sahitya Akademi. pp. 223-224. ISBN 978-81-260-1803-1.
5. "AranakataPem Banda". Retrieved 9 March 2014.
6. "Asymptote Book Club: In Conversation with Rimli Bhattacharya ". Asymptote Blog. 12 February 2018. Retrieved 2021-09-19.

Migration and citizenship : A study on the based of hampering internal politics of the country

Nila Kesh
Part-time Teacher, Dept.of Political Science
Kulgoria Girls' High Madrasah (H.S)

Abstract : Migration plays a crucial role in reshaping national identities, political landscapes, and social values. This study explores the impact of migration on political dynamics, focusing on how demographic shifts influence election results, policy preferences, and party politics. The integration of migrants often leads to political conflict as different groups vie for resources and representation. The evolving concept of citizenship, from ancient civic engagement to modern multifaceted status, is examined in this context. The paper compares citizenship and migration policies across various countries, including the United States, Germany, Australia, and Japan, highlighting how these policies reflect different approaches to managing migration and integrating newcomers. Citizenship is vital for migrants, offering legal rights, economic opportunities, and social integration, which contribute to their well-being and sense of belonging in a new nation. The study concludes that understanding the interplay between migration and citizenship provides valuable insights into how these factors affect national stability and identity.

Keyword: Migration, Citizenship, Political Stability, Electoral Outcomes, Policy Agendas.

Introduction

Citizenship and migration are two facets of today's political and social environments that are closely related. The dynamics of citizenship change as people transcend national boundaries, reflecting and forming national identities and policies. In the modern global setting, the notion of citizenship has broadened to include a wide range of rights and responsibilities, having previously been restricted to involvement in civic life inside Greek city-states. Many variables, especially globalization,

which adds additional dimensions like dual or many citizenships, have an impact on this shift.Consequently, migration modifies policy agendas, affects electoral outcomes, and modifies demographic patterns, all of which have a substantial impact on national politics. Migration has an impact on social cohesiveness, political stability, and the assimilation of newcomers to different degrees across different countries. This interaction is clear in the various approaches that various countries have taken to citizenship and immigration laws.To understand how global mobility affects domestic politics, one must grasp the intricate link between citizenship and migration. We are able to understand the wider consequences for political stability, social integration, and national identity by looking at the citizenship rules and responses to migration of various nations.

The concept of citizenship

In a political community, citizenship is a legal status that comes with a set of rights and obligations. It has changed throughout time as a result of intellectual, social, and political advancements. Throughout antiquity, citizenship was defined by voting and holding public office in the city-states of ancient Greece. Citizenship was therefore linked to involvement in civic life and governance. Contemporary views place equal emphasis on a person's legal position as well as their collection of rights, which include social, political, and civil rights.

Due to the complexity of identity and belonging in a worldwide society, globalization has broadened the definition of citizenship to include transnational components like dual or multiple citizenships. Consequently, citizenship is a dynamic and multifaceted idea that keeps altering to adapt to shifting social and political environments[i] (Faist, 2007; Marshall,1950; Patterson,1993).

Impact of Migration on National Politics

Countries' politics are greatly impacted by migration, which affects both internal policies and foreign ties. Political stability, election results, and policy agendas can all be impacted by migration in different ways.

1. **Political Stability:** Political stability in the host nation may be threatened by migration. Increased rivalry for resources, such as jobs, housing, and public services, could result from high

migration rates. Political instability and societal unrest may be exacerbated by this rivalry. For example, in nations where migration is significant, there can be an increase in nationalist movements or xenophobic emotions, which could upset the political balance[ii] (Smith, 2020).

2. **Electoral Outcomes:** Migration-related changes in the population might affect the results of elections. Communities of immigrants may change their voting habits and political priorities. For example, political parties may modify their platforms to suit the interests and concerns of these communities in nations with sizable immigrant populations. Election outcomes and policy directions may be impacted by this change[iii] (Jones & Lee, 2021).
3. **Policy Agendas:** Government policy objectives are impacted by migration. Immigration, integration, and social welfare policies frequently take center stage in political discussions. Governments may choose to impose restrictions or allow migration in response to public opinion and political pressure. Long-term effects of these policies may include effects on social cohesiveness, national identity, and economic growth[iv] (Williams, 2022).

Citizenship and migration status of various countries

Policies regarding immigration and citizenship differ greatly throughout nations, reflecting differences in social, legal, and economic contexts. Gaining knowledge about these differences can help one better understand national identity and global mobility patterns.

1. **United States:** The Immigration and Nationality Act (INA) is the main law that governs the immigration laws in the United States. It permits a range of visas, such as those under the humanitarian, work-based, and family-sponsored categories. According to the jus soli principle, naturalization or birthright are the three ways that one might obtain U.S. citizenship[v] (U.S. Citizenship and Immigration Services, 2023).
2. **Germany:** Germany has a formalized citizenship policy that is principally grounded in the jus sanguinis (right of blood) premise.

However, jus soli now apply to children born in Germany to foreign parents as a result of recent revisions. A focus on labour migration and asylum procedures, migration strategies are also in line with EU legislation[vi] (Federal Office for Migration and Refugees, 2023).

3. **Australia:** Australia has a highly regulated immigration system that emphasizes skilled migration via point-based schemes. Naturalization is the process of obtaining citizenship, and it involves passing a citizenship test, living in the country, and speaking English fluently. With provisions for refugees, Australia's policies also reflect its humanitarian commitments[vii] (Department of Home Affairs, 2023).
4. **Japan:** The majority of Japan's citizenship rules are founded on jus sanguinis. The focus of restrictive immigration rules is on highly skilled workers and particular industries. Although long-term stay and evidence of integration into Japanese society are prerequisites for naturalization, it is still conceivable[viii] (Ministry of Justice, 2023).
5. **Canada:** The immigration system in Canada is renowned for its variety of routes, which include family reunion, skilled worker programs, and refugee resettlement. Naturalization is the process via which citizenship is obtained; prerequisites include residence, linguistic ability, and familiarity with Canadian laws and history[ix] (Immigration, Refugees, and Citizenship Canada, 2023).
6. **Brazil:** Jus soli and Jus sanguinis are both present in Brazil's citizenship rules. With initiatives to draw in skilled labour and promote family reunification, the nation has lax immigration laws. Through naturalization, one can become a citizen of Brazil, subject to residency and language criteria[x] (Ministry of Justice, 2023).
7. **India:** The foundation of Indian citizenship is jus sanguinis. The nation has tight standards for foreign nationals and restrictive immigration rules. A lengthy residency time and evidence of integration are prerequisites for naturalization[xi] (Ministry of Home Affairs, 2023).

8. **South Africa:** The citizenship rules of South Africa prioritize economic mobility and offer opportunities for naturalization and permanent residency. The national plans seek to strike a balance between the demands of the economy and social integration[xii] (Department of Home Affairs, 2023).
9. **United Kingdom:** The point-based immigration system in the UK is notable for emphasizing skills and qualifications. A life in the UK exam, residency, and language competency are prerequisites for naturalization, which is the process by which citizenship is obtained[xiii] (Home Office, 2023).
10. **France:** The foundation of both jus sanguinis and jus soli is found in French citizenship rules. The nation has extensive immigration laws that cover a range of topics related to migration, such as employment, reuniting with family, and asylum. A residency duration, proficiency in the language, and assimilation into French society are prerequisites for naturalization[xiv] (French Office for Immigration and Integration, 2023).

The Importance of Citizenship for Migrated People

As a formal acknowledgement of one's rights and legal standing within a nation, citizenship is vital for people who have immigrated. Gaining citizenship opens up a world of advantages and safeguards that are vital for a person's integration and well-being in a new nation. For many, it's more than simply a formality.

1. **Legal Rights and Protections:** First and foremost, citizenship offers immigrants essential legal rights and protections. It guarantees the right to a fair trial, protection under national laws, and access to the judicial system. For immigrants who could experience difficulties or discrimination in their new homeland, this legal status is crucial. For example, voting rights are frequently conferred by citizenship, enabling people to influence laws that impact their lives and participate in national governance[xv] (Smith, 2023).
2. **Economic Opportunities:** Additionally, citizenship gives migrants access to the economy. Access to professional licenses and jobs that could be denied to non-citizens is made possible by it.

Furthermore, residents are entitled to social services and benefits, including health care, education, and unemployment assistance, all of which are essential to their integration into society and economic stability[xvi] (Johnson, 2022).

3. **Social Integration and Identity:** Beyond the legal and financial spheres, social integration depends on citizenship. It helps people feel like they belong and have an identity in their new nation. Having citizenship enables immigrants to actively engage in public life, form relationships within the community, and add to the social and cultural fabric of their new home. This inclusion fosters social cohesiveness and lessens feelings of loneliness[xvii] (Brown, 2021).

Conclusion

Migration significantly impacts a nation's internal politics and citizenship laws by altering demographic dynamics, influencing electoral outcomes, and shaping policy agendas. This often leads to increased political conflict and shifts in policy focus. The concept of citizenship has evolved from ancient civic participation to a multifaceted modern status, encompassing legal rights, social and economic dimensions, and adapting to global mobility complexities. Variations in citizenship policies across countries, such as the United States, Germany, and Australia, illustrate diverse approaches to managing migration and integrating newcomers. Understanding these differences provides insight into how migration affects national identities and political stability.

For migrants, citizenship is necessary since it provides access to resources, legal rights, and social integration possibilities, as well as important protections. It builds a sense of belonging and strengthens the social fabric by serving as a link between immigrants and their new nation.

Reference

---

i Faist, T. (2007). *The dual role of citizenship: Political and social dimensions*. Palgrave Macmillan. PP.18.
Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge University Press. PP. 5.

Patterson, S. (1993). *The city-state and the global community*. Routledge. PP. 42.

iiSmith, J. (2020). *The Politics of Migration: A Global Perspective*. Cambridge University Press. PP. 112.

iiiJones, A., & Lee, S. (2021). *Migration and Electoral Politics*. Oxford University Press. PP. 87.

ivWilliams, R. (2022). *Policy Responses to Migration*. Routledge. PP. 143.

vU.S. Citizenship and Immigration Services. (2023). *The Immigration and Nationality Act and U.S. Citizenship: A Comprehensive Guide*. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office. PP. 14.

viFederal Office for Migration and Refugees. (2023). *Migration and citizenship in Germany*. Berlin: Federal Office for Migration and Refugees. PP. 9.

viiDepartment of Home Affairs. (2023). *Australian migration policies and citizenship*. Canberra: Australian Government. PP. 12.

viiiMinistry of Justice. (2023). *Citizenship and immigration in Japan*. Tokyo: Ministry of Justice. PP. 8.

ixImmigration, Refugees and Citizenship Canada. (2023). *Canadian immigration and citizenship guide*. Ottawa: Government of Canada. PP. 15.

xMinistry of Justice. (2023). *Brazilian Citizenship and Immigration Laws: A Comprehensive Guide*. Brasília: Ministry of Justice Publications. PP. 11.

xiMinistry of Home Affairs. (2023). *Indian citizenship and migration policies*. New Delhi: Government of India. PP. 10.

xiiDepartment of Home Affairs. (2023). *South Africa's Immigration and Citizenship Policies: A Comprehensive Guide*. Pretoria, South Africa: Department of Home Affairs. PP. 13.

xiiiHome Office. (2023). *UK immigration and citizenship system*. London: Home Office. PP.16.

xivFrench Office for Immigration and Integration. (2023). *French immigration and citizenship*. Paris: French Office for Immigration and Integration. PP.14.

xvSmith, L. (2023). *Legal rights and protections for migrated individuals*. Law and Society Journal, 56(3). PP. 40-55.

xviJohnson, R. (2022). *Economic benefits of citizenship for immigrants*. International Economic Review, 45(2). PP. 110-125.

xviiBrown, T. (2021). *The social impact of citizenship on migrants*. Global Publishers. PP. 78.

Governance Reforms for Quality Enhancement in Indian's Higher Education System

Shubhra Singha Chowdhury
Research Scholar, Dept. of Educational Studies,
School of Education,
Mahatma Gandhi Central University
&
Asheesh Srivastava
Professor, Higher Education Policy,
Inter University Centre for Teacher Education,
Banaras Hindu University : An Autonomous Centre of UGC

Abstract : Higher education institutions in India can be classified into universities and colleges, and they are governed based on two main criteria: the method of establishment and the types of programs they offer. Consequently, these institutions are regulated according to these two aspects. The University Grants Commission (UGC), established under the University Grants Commission Act of 1956, is primarily responsible for overseeing the governance of higher education institutions in India. The UGC's duties include creating regulations related to grants, institutional norms and standards, and setting minimum qualifications for teaching and research staff.

In addition to the UGC, other statutory bodies like the National Council for Teacher Education (NCTE), the All India Council for Technical Education (AICTE), and the Bar Council of India (BCI) are responsible for regulating specific types of higher education institutions within their respective domains. These authorities establish guidelines that cover various aspects such as educational standards, curriculum requirements, faculty qualifications, infrastructure norms, degree conferral rules, and the fees charged by institutions.

Overall, the governance of universities in India operates on two levels: the UGC and decentralized domain-specific authorities like the AICTE and NCTE, depending on the programs offered. For colleges, an additional layer of governance is provided by their affiliating universities,

which imposes further regulations. As a result, higher education institutions in India must adhere to the norms and standards set by at least two regulatory bodies, while individual colleges are required to comply with the rules established by three authorities.

Key Word- *Governance, Higher Education, Governance Reform.*

INTRODUCTION

The issues of governance in higher education appear to be twofold. First, there is the challenge of dealing with multiple regulatory bodies, which leads to overregulation as institutions must comply with various regulations. This has created a situation where colleges and universities must navigate a complex web of regulations and permissions from statutory bodies to conduct courses, award degrees, appoint faculty, and manage other routine activities. Therefore, it is crucial to decentralize authority in higher education and harmonize the rules set by statutory authorities, the UGC, and individual universities across all programs to ensure consistency. Governance in higher education should aim to provide universities with greater academic autonomy in designing programs and curricula.

The current UGC regulations for private universities need revision to grant them the academic freedom to introduce new, interdisciplinary programs. Existing regulations prevent universities from offering new degree programs that are not on the UGC's approved list, and they risk penalties for attempting to do so. These regulations should be updated to allow universities the flexibility to offer such degrees. Otherwise, there is a risk of limiting interdisciplinary approaches in higher education, which could result in degree programs that fail to provide students with a comprehensive education.

The rapid and unplanned growth of the higher education sector presents significant challenges to the quality of education. The issues of governance and regulation within higher education are closely linked to decision-making processes.

To ensure effective governance in higher education:

An Education Commission made up of academic experts will be established every five years to advise the MHRD. This commission will

identify emerging knowledge areas, disciplines, and domains, as well as suggest reforms in pedagogy, curriculum, and assessment in line with global trends and national needs.

Effective Governance of Higher Education

1 . Governing bodies of higher education institutions will be restructured to include multiple stakeholders, such as industry representatives, Faculties, Students and alumni. Transparent guidelines will be established for their composition and selection.

2. A move towards a university system that integrates undergraduate, postgraduate, and doctoral studies will be encouraged. Faculty will be involved in teaching both undergraduate and postgraduate courses, enhancing the synergy between teaching and research. Universities will be multi-disciplinary, rather than focusing on a single discipline.

3. The State will work towards implementing the recommendations of previous policies from 1968 and 1986/92 to establish an Indian Education Service (IES), with HRD as the controlling authority. In the interim, a special recruitment drive by UPSC will be conducted, selecting candidates from existing academic and administrative positions in various states, with state concurrence.

4. Separate education tribunals will be created at both the central and state levels to address litigation and public grievances against government and private educational institutions. These tribunals will be chaired by a retired High Court Judge and will have the authority to use summary procedures for the swift resolution of cases.

5. The Government acknowledges the positive role of students' unions in promoting democracy and strengthening governance processes, discussions, and pluralism. However, it has been noted that many disruptive activities on campuses are led by outsiders or students who remain enrolled far beyond the expected duration of their courses. A study will be conducted to prevent such individuals from influencing student politics, disrupting academic activities, and misusing institutional facilities.

6. All higher education institutions will be required to implement effective grievance redressed mechanisms, adhering to the principles of natural justice.

7. The current affiliating system will remain in place, but a cap of 100 affiliated colleges per university will be imposed. Universities with more than 100 affiliated colleges will be restructured accordingly.

8. Funding for public higher education institutions will be norm-based, with incentives for activities that promote excellence. These institutions will be required to develop perspective plans with clear milestones and timelines, ensuring both autonomy and accountability in financial and administrative matters.

Reform Governance for Quality Education

When it comes to quality, reforms in governance are critical. Quality assurance has become a top priority in higher education policy, as post-secondary education must equip graduates with new skills, a broad knowledge base, and diverse competencies to thrive in an increasingly complex and interconnected world. Quality is a multifaceted concept, requiring multiple mechanisms for assurance and management at both individual and institutional levels.

Sustaining and enhancing quality in higher education is crucial. The central government has a constitutional duty to coordinate and set standards for higher education, research institutions, and scientific and technical bodies. To achieve this, it is vital to engage all stakeholders in establishing internal processes that prioritize quality. A single institution of excellence cannot meet the extensive demands of higher education; instead, quality must be a priority for all institutions, with excellence emerging from well-governed and high-quality institutions.

India's higher education sector has seen rapid and unprecedented expansion, leading to diversification but also posing challenges in maintaining quality. In response, external quality assurance agencies were established in the 1990s. The University Grants Commission (UGC) set up the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) in 1994 to accredit universities and general higher education institutions, while the All India Council for Technical Education (AICTE) established the National Board of Accreditation (NBA) the same year to accredit specific programs and institutions. NAAC evaluates and certifies educational quality based on seven criteria. However, there is an urgent

need to reform the entire higher education sector, starting with regulatory structures and extending down to individual institutions.

Possible approaches for reform:

Develop independent quality assurance frameworks: Address the quality gap in higher education by implementing mechanisms like the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) within institutions, aligning them with the standards set by external quality assurance bodies.

Transparent governance structure: Ensure the appointment of Vice-Chancellors and Professors through a transparent and competitive process.

Restructure regulatory bodies: Review and streamline existing regulatory bodies to reduce their complexity and enhance their effectiveness.

Autonomy with accountability: Re-align regulatory functions to promote institutional autonomy, shifting the focus from regulation to facilitation. This includes single-point clearances for grants, encouraging institutions to achieve global standards, and granting degree-awarding powers and autonomous status to colleges. To support student mobility, uniformity in syllabi and curricula should be established through frameworks like the Choice Based Credit System (CBCS), which should be adopted by all institutions.

Reconsider multiple entrance exams: Re-evaluate the need for multiple entrance and eligibility exams, and explore the possibility of a single national test. A National Testing Service could be developed through consultation and debate to standardize this process.

Allow foreign education providers: Permit foreign educational institutions to operate in India, fostering international collaboration and enhancing the global quality of education.

Adopt norm-based funding: Shift from subjective, inspection-based funding to a norm-based approach to improve efficiency in grant disbursement. The UGC, which channels funds to central and state universities and colleges, should adopt this approach.

Support state universities: Address the significant funding constraints and governance issues faced by state universities and their affiliated

colleges, which account for over 90% of enrollment and suffer from poor quality.

Grant autonomy to central educational institutions: Increase autonomy for central educational institutions to improve their governance and quality.

Prevent unfair practices: Ensure that merit is the sole criterion for admissions by preventing and prohibiting unfair practices. Strictly enforce penalties for capitation fees and misleading advertisements.

Conclusion

India is currently implementing academic reforms aimed at improving the quality of education while expanding access to higher education. These reforms are particularly focused on state-level institutions, where more than 90% of the country's approximately 30 million higher education students are enrolled. The government's efforts include increasing funding for historically underfunded state universities and colleges, alongside introducing a range of reforms. These reforms encompass greater institutional autonomy, the establishment of a new credit accumulation and transfer system, updated assessment protocols, student-centered syllabi, and regular curriculum revisions. The goal of these changes is to leverage India's demographic advantage by producing graduates who are better equipped to meet the demands of the country's rapidly growing economy.

The implementation of these reforms is already underway. In addition to broadening access to higher education, the 12th Five-Year Plan emphasizes the need for deeper academic reforms. Institutions are being encouraged to shift from an "input-centric and credential-focused" approach to a "learner-centric" model. This shift is to be achieved through regular curriculum updates, the adoption of a choice-based credit system, continuous and comprehensive student evaluations, a cumulative grade point system, and revised marking and grading methods. Curriculum reforms also include introducing credit requirements for elective courses outside a student's major and designing syllabi and programs that focus on learning outcomes aligned with labor market needs. The Ministry of Human Resource Development's 2013 Rashtriya Uchchattar Shiksha Abhiyan (RUSA) policy document outlines these

12th Plan reform initiatives in higher education. The RUSA initiatives build upon earlier plans introduced in 2009 under the UGC's Action Plan for Academic and Administrative Reforms and are set to be implemented through the end of the 13th planning period (2017-2022).

References:

1. Altbach, P.G.; Reisberg, L.; Rumbley, L.E. (2009). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution (report prepared for the World Conference on Higher Education). Paris: UNESCO
2. Harman, J.C.G. (2009).'New challenges for higher education: Global and Asia-Pacific perspectives'. In: Asia Pacific Education Review, 10, 1–13.
3. IIEP-UNESCO. 2012. 'Higher education reforms and revitalization of the sector'. Higher Education Forum, Vol. 9, pp. 173–187.
4. National Education Congress summary report on the education, youth and sport performance for the academic year 2007–2008 and the academic year 2008–2009 goals.
5. Varghese, N.V. (Ed.) (2009). Reforms in higher education: Institutional restructuring in Asia. 6. www.mygov.in/sites/default/files/mygov_1442771273125909 71.pdf
7. www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/GRHE.pdf

An analytical study on Information Literacy among the students of Vivekananda Central Library, J.K. College, Purulia

Basana Das
Librarian
Vivekananda Central Library, J.K.College

Abstract: Accessing right information in right time for right purpose is a prerequisite of success not only in education but also in life. The skill behind this is 'Information literacy'. Present paper highlights its importance in higher education. The study is carried out to find out the level of information literacy awareness and skill of students of Vivekananda Central Library. It is based on the fact that information literacy instruction course is missing in the curriculum. The authors try to analyze the status of student's information need and information gathering and utilizing the information for academic purpose. After assessment, the authors intent to suggest different remedial measures to develop IL among the college level students to face the information requirements qualitatively for their effective study.
Key Words: Information literacy, higher education, Information gather and utilization, remedial measures, Curriculum, Vivekananda Central Library.

1. Introduction:

Information Literacy is a skill required to find out, retrieve, analyze and use of information. An age of information explosion; lot of information is available in different formats irrespective of geographical boundaries. Users have access to lot of information but it is very difficult for them to select the right and relevant source. Here information literacy programs play a major role or solution which makes individual a lifelong learner. Information literacy programs teach effective skills to retrieve the relevant required information from right sources. Information literacy and information access is every individual's fundamental right. In the present study efforts are made to understand awareness of information literacy

program, searching skills, available ICT infrastructure in their library to cope information literacy programs and impact of information literacy program among student's community of Vivekananda Central Library, J.K.College of Purulia. Vivekananda Central Library conducts information awareness programme to the entry level of the student and use PPT of library for delivering this programme once in a year. Main focuses of this programme are library information, E-resources, OPAC etc.

2. Objectives of the study:

The objectives of the study are the following:

To know the availability of information and communication technology infrastructure;

To know the impact of information literacy programmes on the utilization of library resources;

To study information literacy skills for benefit of the students;

To know the students' opinion for the need of information literacy as a part of their curriculum; and

To suggest best practice in Information Literacy.

3. Scope and coverage of the study

This study was confined to the students of Vivekananda Central Library, J.K. College, Purulia. Total 105numbers of respondents were considered for this study.

4. Methodology:

Data were collected from 105Arts undergraduate students of Vivekananda Central Library, J.K. College through questionnaire and personal interview. After collecting the data, it was tabulated and analyzed and at the end the conclusion was drawn and finally put some suggestions.

5. **Data analysis and findings:**

5.1: Number of respondents visiting the library

Option	No. of Respondents	Percent age
Yes	102	97
No	3	3
Total	105	100

Table 1 shows that out of 105 respondents, 102 respondents were visiting the library for some or the other purposes and rest 3 respondents were not visiting the library. It shows that 97% of the respondents are visiting the library and 3% were not visiting the library.

5.2: Frequency of visiting the library

Options	Respondent	Percentage
Daily	30	29
Weekly	58	55
Monthly	12	11
Rarely	5	5
Total	105	100

Table 2 show that 58 (55%) respondents visited the library daily. 30 (29%) of the respondents visited the library once in a week. 12(11%) respondents visited library once in a month and 5 (5%) of respondents visited library rarely.

5.3: Purpose of visiting the library

Options	Respondent	Percentage
Study purpose	31	30
Issue/Return of books	45	43
Access to E-resources	12	11
News Paper reading	11	10
OPAC searching	6	6
Total	105	100

Table 3 show that out of 105 respondents 31 (30%) respondents visited the library for study purpose. 45(43%) of the respondents visited library for issue /return purpose. 12(11%)of the respondents visited library to access E-resources, 10%the respondents visited library for newspaper

reading purpose and 6% of the respondents visited library for searching of OPAC.

5.4: Types of resource used by the respondents

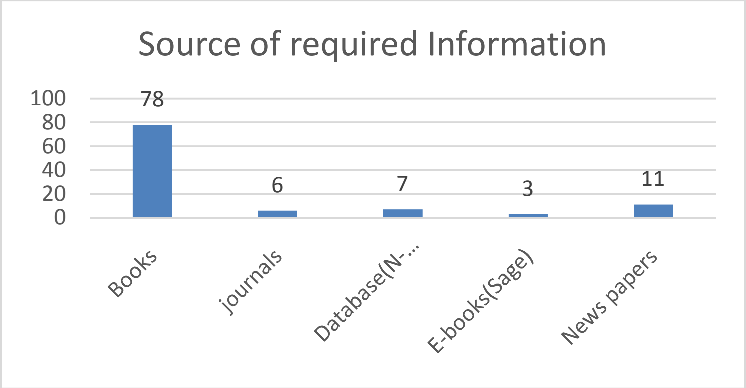

Figure 1 shows that 74% of the respondents used books, 6% of the respondents used journals, 7% of the respondents used N-List and10% of the respondents used Newspapers.

5.5: Different forms used by the respondents

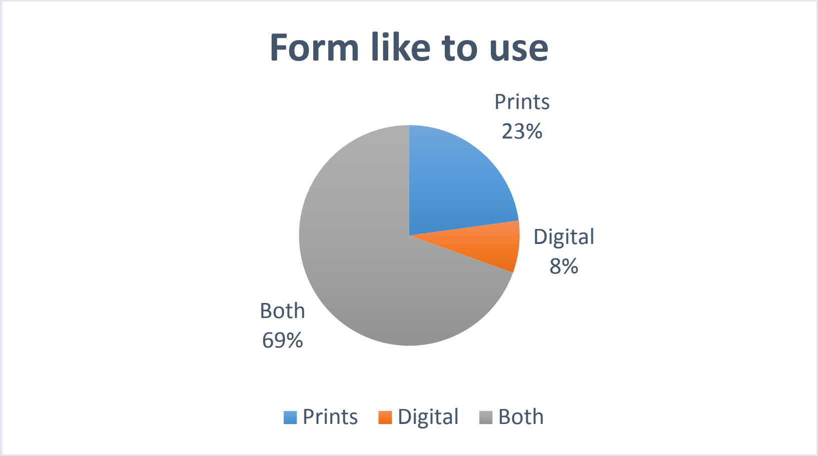

Figure 2 shows that 23% of the respondents liked to use print form of resources, 8% of the respondents liked to use digital form of resources and 69% of the respondents liked to use both print and digital form of resources. Most of students collect required information through books and internet sources as they have to appear for the exams and hence, they use curricular supporting books.

5.6: Preferences of Search engines by the respondents

Search engines	Frequency	Percentage
Google(http://www.google.com)	87	82.86
MSN(http://www.msn.com)	4	3.81
Yahoo(http://www.yahoo.com)	7	6.67
Alta Vista (http://www.altavista.com)	05	4.76
Others	2	1.90
Total	105	100

Table 4 shows that the majority of the respondents (82.86%) preferred using Google, while 3.81%preferred MSN and 6.67% of the respondent preferred Yahoo and 4.76% used Alta Vista while a small percentage (2%) used other search engines.

5.7: Opinion of the respondents regarding the help comes from Library personnel

Options	Frequency	Percentage
Yes	92	88
No	12	11
No Response	1	1
Total	105	100

Table 5 shows that 88% of the respondents opined that they get the help from the library personnel; 11% of the respondents opined that they did not get any help from the library personnel and 1% respondents did not provide any answer.

5.8: Awareness of subscribed E-resources by the library

Options	Frequency	Percentage
Yes	95	90.47
No	10	9.53
Total	105	100

Table 6 shows that out of 105 respondents, 90.47% of the respondents were aware of availability of E-resources in the library and 9.53% of the respondents were not aware of E-resources.

5.9: Awareness of N-List Programme and E-resources from different sources

Different Sources	Frequency	Percentage
Faculty	06	5.71
IL Program	91	86.67
By Friend	08	7.62
Total	105	100

Table 7 shows that 5.71% of the respondents came to know about E-resources and N-List programme from faculty members; 86.67% of the respondents came to know through IL program and 7.62% of the respondents came to know through friends.

5.10: Different problems faced by the respondents while accessing e-resources

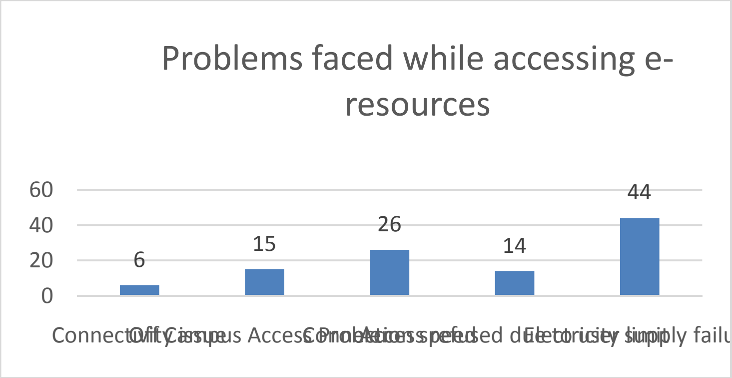

Figure 3 show that 14% respondents faced difficulty in accessing E-resources due to off campus access problem. 6% respondents faced difficulty due to connectivity issue. 25% respondents opined that Connection speed was hurdle for accessing E-resources and 13% respondents faced problem with user limitations and 42% respondents opined that electricity supply failure was the cause for not accessing e-resources.

5.11: Participation in the library orientation programme

Options	Frequency	Percentage
Yes	98	93.33
No	07	6.67
Total	105	100

Table 8 shows that out of the 105 respondents, 93.33 % respondents participated in the orientation programme while the remaining 6.67 % participants failed to attend the orientation programme. The participation tendency of student's showed that majority of the students were eager to get acquainted with the library orientation programme in which they get familiar with the library services, rules and regulation etc.

5.12: Opinion of the respondents whether Information literacy program should be part of the syllabus

Option	Frequency	Percentage
Strongly agree	30	28.57
Agree	42	40
Disagree	26	24.76
Don't know	7	6.67
Total	105	100

Table 9 shows that 28.57% respondents were strongly agreed, 40% were agreed, 24.76% were disagreed and 6.67% did not provide their Opinion whether Information literacy program should be part of the syllabus. It is observed that 68.57% of the respondents gave their opinion that information literacy program should be part of their curriculum.

5.13: Opinion of the respondents regarding use of library resources effectively after attending Orientation program

Option	Frequency	Percentage
Strongly agree	75	71.43
Agree	23	21.90

Disagree	3	2.86
Don't know	4	3.81
Total	105	100

Table 10 shows that 71.43% of the respondents were strongly agreed regarding use of library resources effectively after attending the Orientation program; 21.90% of the respondents were agreed about it and 2.86% of the respondents were disagreed about it and 3.81% don't know.

5.14: Accessing ICT Literacy Skills among Users

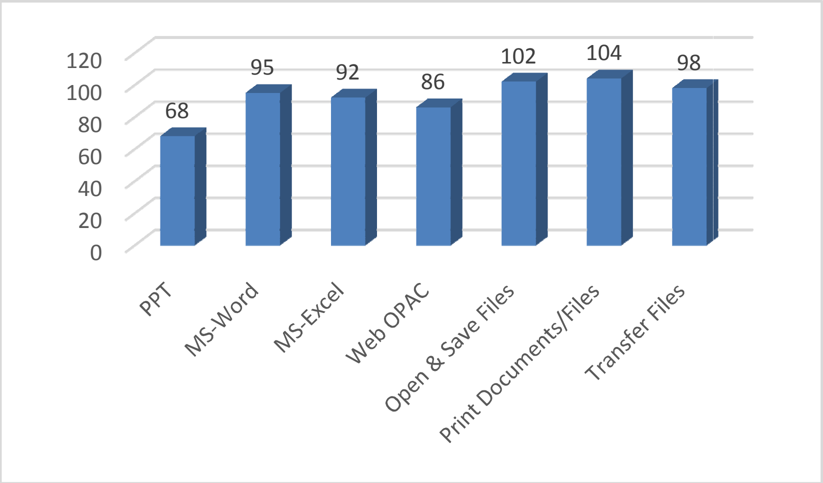

Figure 4 shows that out of the 105 students 68(65%) judged their ability to ICT literacy skills in this manner in PPT. Out of the 105 students 95(90%) have able to use MS-Word. Out of the 105 students 92(88%) were knowledge about MS-Excel. Out of the 105 students 86(82%) have ability to use Web OPAC. Out of the 105 students 102(97%) can open and save files. Out of the 105 students 104(99%) can print documents or files. Out of the 105 students 98(93%) were able to transfer files.

5.15: Assessing Internet Literacy Skills among users

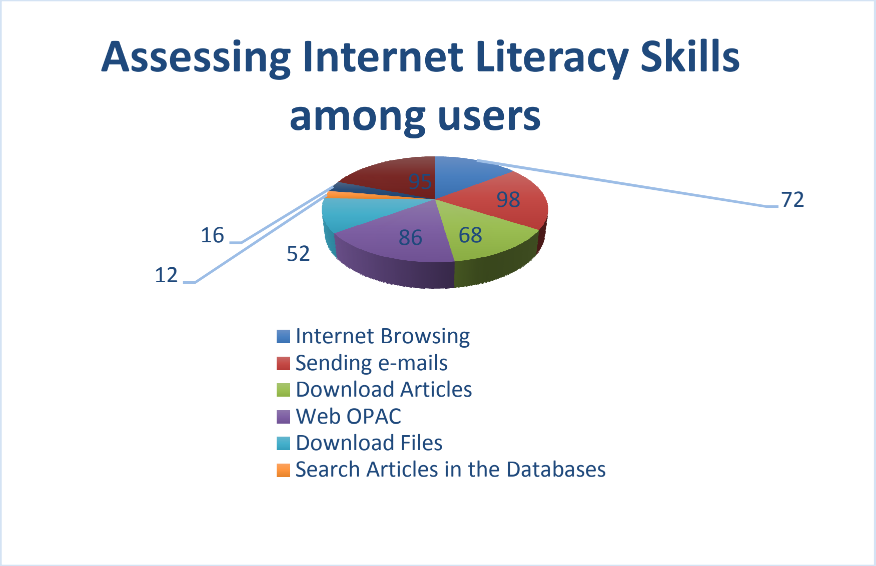

Figure 5 shows that out of the 105 students 72(69%) have internet browsing skills. Out of the 105 students 98(93%) had knowledge to send emails. Out of the 105 students 68(65%) and 52(50%) have been downloaded articles and files. Out of the 105 students 86(82%) browsed Web OPAC Out of the 105 students 12(11%) had skill to search articles in the online database. Out of the 105 students 16(15%) have skills of Video Conferencing. Out of the 105 students 95(90%) knew to attach files to an email. It is observed that most of users are internet literate.

6. Conclusion:

Every year libraries are spending large amount of money in subscribing e resources. The information literacy is compulsory for students / users of any discipline. This study shows that respondents were aware of subscribed e-resources in the institution and know the skills how to use them effectively. Information literacy skills are required to everyone to find, retrieve, analyze and use the information effectively. These skills are directly linked with lifelong learning and critical thinking. Library orientation programme was conducted in the institution to make the students aware of the various facilities being provided in the library and to provide information about the usage of those facilities in the best possible manner but this is not framed properly and no proper

information literacy training is organized for the students. Information Literacy is need of the hour. Based on the analysis and interpretation, this survey considers that the continuous training and other methods should be adopted in order to achieve the literacy skills among the users. It should be a part of education system. So a proper integrated curriculum, collaboration or strategy should include Information Literacy learning, to empower students to use non-print and other media that enhance their skills and regular sessions will definitely make students to information literate and helps the society to make information literate society

7. Suggestions:

 The rapid development in ICT has brought a revolutionary change in the organization and management of information.

 Information literacy is very important for young generation and is social cause.

 Information literacy is essential not only for students but for faculty also.

 Information literacy is important for library users and also it is most important in R&D institutions.

 To reach and increase awareness among users about library services information literacy is very essential. Information literacy is a tool by which we can reach our prospective users and able to increase the utilization of library and its services.

8. References:

Behrens, S.J.(1994). A conceptual analysis and historical overview of information literacy. College and research libraries, 55(4).

Deshpande, N., & Shelar, V. (Dec.16-18, 2005). Information literacy program for academic libraries. In Seminar papers, 51th all India conference on Libraries, information literacy and lifelong learning, Kurukshetra, New Delhi: Indian Library Association, 267-268.

Karisidappa. C.R.,& Kavita, H.C. (2005). Information literacy for life learning. ILA Bulletin,41(1).

Marcum, J.W. (2002). Rethinking information literacy. Library Quarterly. 72(1)

Computer phobia among educators in the age of digital living

Sunil Kumar Baskey
Assistant Professor
Department of Education
Rabindra Bharati University
&
Pallabi Banerjee
M.Ed. Student (4th Semester)
Rajendra Academy For Teachers' Education
Gopalpur, Durgapur, Paschim Bardhaman, West Bengal

Abstract: In present scenario computer has become vital part of our daily life. According to Ursavas O.F. & Karal H. (2009, p.71) the similar term for computer phobia is computer anxiety, techno phobia, techno stress, cyber phobia and computer aversion. The present study aims to compare the computer phobia among educators in relation to certain variables like experience, age, gender, and locality. Random sampling method was adopted for the collection of data for this study. The standardized tool Computer Phobia Scale (CPS) by S. Rajasekar & P. Vaiyapuri Raja was adopted to measure the effect of variables in relation to certain demographic variables. The statistical techniques used were t-test and ANOVA. The result revealed that there exists a significant difference of computer phobia between male educators and female educators (t= 2.078, p= 0.04); more and less experience educators (t= 2.980, p= 0.003) and computer phobia also differ on the basis of age group of educators (F= 57.038, p= 0.00); academic discipline of educators (F= 33.45, p= 0.00). We all must be aware about the phobia to use not only computers but also use of any types of technological device. It should be recommended that the use of such devices should not be extreme so that human will be addicted. It is recommended that some intervention programme should be arranged in the form of seminars or conferences or workshop to reduce the level of computer phobia among educators.

Key Words: Computer Phobia, Educators, Digital living.

Introduction:

In the age of digitalisation, integration of Technology in education has become increasingly essential. It stands as a mark of pivotal advancement, promising to enhance learning experiences and effectiveness. Though, amidst this transformation a notable challenge still persists: computer phobia among educators. Computer phobia greatly restricts the use of computers. According to Jay (1981) the term involves avoiding discussions or thoughts about computers, experiencing extreme fear or anxiety towards them and facing hostile thoughts about them, some teachers often experience it while using computers or various digital tools in their professional atmosphere. As we all know the widespread availability and necessity of technology in the modern education system, computer phobia can not only create obstacles in effective teaching learning systems but also make a significant impact in their total professional development and identify a difficult situation that tests their ability and flexibility in adapting technology oriented educational systems. According to the National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE) 2009, teacher quality depends on various factors such as, teacher's status, remuneration, conditions of work, and professional development. In today's era, professional development for teachers is quite impossible without knowledge of using digital technology, and tools e.g computers, in the education system. It is noteworthy that an educator's attitude towards technology and their usage of it influences the future success of Technology in education (Roblyer, 2003) and consequently they are expected to use various teaching methods such as Computer Assisted Instructions (CAI) but due to computer phobia the integration of computers in the classroom situation sometimes becomes limited. Several researches have explored that there are so many factors which are associated with it such as gender, computer experiences, teacher training programs and they have been examined in relation to computer phobia. Hence, in the age of digital living a Study on computer phobia among educators is important to understand, analyse and assess the level of their computer-related anxiety as well as to identify several factors that cause this phobia.

Significance:

The study on computer phobia among educators is crucial in various ways. They are as follows:

- It helps to understand why some educators are afraid of using computers or any digital tools.
- By knowing the reasons for this fear, we can find ways to help educators to feel more comfortable with technology in their professional setting.
- This study is also vital because using computers and digital tools can make teaching and learning better. If teachers overcome their fear, and find out the reasons behind it, they can use these tools efficiently to improve their teaching besides helping students learn more effectively.

Literature Review:

Singh (2023) conducted a study on measurement of computer phobia among student teachers. The study revealed that the 73.5% of the student teachers reported no computer phobia, 12.5% and 14.0% of them reported low and moderate to high computer phobia respectively. In this study the mean scores difference among region wise student teachers' computer phobia was compared by F-test. F-value was found 4.02 (df1=3, df2=60) and was significant at 0.02 level. There was a significant difference in East, West, North and South region's student teachers. The relationship was also measured between subscales of computer phobia scale. The correlations were negative and significant.

Suvera (2020) conducted a study on computer phobia of male and female B.Ed. trainees. The sample consisted of 360 B.Ed. College trainees. The sample was selected in terms of Gender (male and female), Area (rural and urban) and Type of Students (Arts, Commerce and Science) in equal proportions, drawn randomly method. Computer phobia was measured by Computer Phobia Scale- Rajasekar & Vaiyapuri Raja. (2005). The result revealed that there was significant difference between Computer phobia of Male and Female B.Ed. trainees; rural and urban B.Ed. trainees and Computer phobia of Arts, Commerce and Science B.Ed. trainees.

Gupta (2018) conducted a study on computer phobia among secondary school students. The sample for the studyrandomly selected from 320 students of class 8th from four government and four private secondary schools located at Faridabad district of Haryana state. The schools were selected on the basis of convenient sampling whereas simple random technique. The Computer Phobia Scale developed and standardised by the investigator was used to collect the data. The results revealed that majority of secondary school students were experiencing moderate level of computer phobia. The students having extremely high phobia should be motivated to change their perception towards use of computer. Findings showed that rural secondary schools were more phobic towards computer in comparison to urban secondary schools. Similarly, girls were experiencing more computer phobia than the boys of secondary schools.

Prakash (2016) conducted a study on computer phobia among senior secondary school teachers. In this study the investigator used computer phobia scale given by Dr. S. Rajasekar and Dr. P. Vaiyapuri Raja. Purposive sampling was done and 100 teachers were selected. The result revealed that Female teachers possess more computer phobia in comparison to male teachers and Private school teachers possess more computer phobia in comparison to Government school teachers. Similarly, Arts teachers possess more computer phobia in comparison to science teachers and Urban teachers possess more for computer phobia in comparison to rural teachers.

Research Methodology:

- **Variables**
  - **Dependent Variables-**
    - Computer Phobia
  - **Demographic Variables-**
    - Gender (Male and Female)
    - Locality (Rural and Urban)
    - Experience (More and Less)
    - Marital Status (Married and Unmarried)
    - Age (High, Middle and Low)

- Academic Discipline (Language, Social Science and Science)

- ***Research Problem:***

"Computer phobia among educators in the age of digital living"

- ***Objectives of the study:***

1. To study and compare the computer phobia among educators in gender variation.
2. To study and compare the computer phobia among educators in locale variation.
3. To study and compare the computer phobia among educators in experience variation.
4. To study and compare the computer phobia among educators in marital status variation.
5. To study and compare the computer phobia among educators in age group variation.
6. To study and compare the computer phobia among educators in academic discipline variation.

- ***Hypotheses:***

The following hypotheses have been formulated based upon the above objectives

Ho1: There is no significant mean difference of computer phobia score between male and female Educators.

Ho2: There is no significant mean difference of computer phobia score between rural and urban Educators.

Ho3: There is no significant mean difference of computer phobia score between more and less experience Educators.

Ho4: There is no significant mean difference of computer phobia score between married and unmarried Educators.

Ho5: There is no significant mean difference of computer phobia score between old age, middle age and young age Educators.

Ho6: There is no significant mean difference of computer phobia score between language, social science and science Educators.

Delimitations of the Study

1. The study is delimited to a sample of 90 educators.
2. The study is delimited to Paschim Bardhaman district only.

3. The study is delimited to educators of Private colleges only.

➢ ***Sample:***

- **Sample size:**

A total of 90 educators were selected. A sum of 90 educators including 43male educators and 47 female educators will constitute the actual sample.

- **Sample frame:**

Table-1: Structure of sample

Demographic Variable	Category	Frequency	Percentage (%)
Gender	Male	47	52.22%
	Female	43	47.78%
Locale	Rural	46	51.11%
	Urban	44	48.89%
Experience	More	34	37.78%
	Less	56	62.22%
Marital Status	Married	51	56.67%
	Unmarried	39	43.33%
Age Group	Upper	20	22.22%
	Middle	32	35.56%
	Lower	38	42.22%
Academic Discipline	Language	28	31.11%
	Social Science	37	41.11%
	Science	25	27.78%

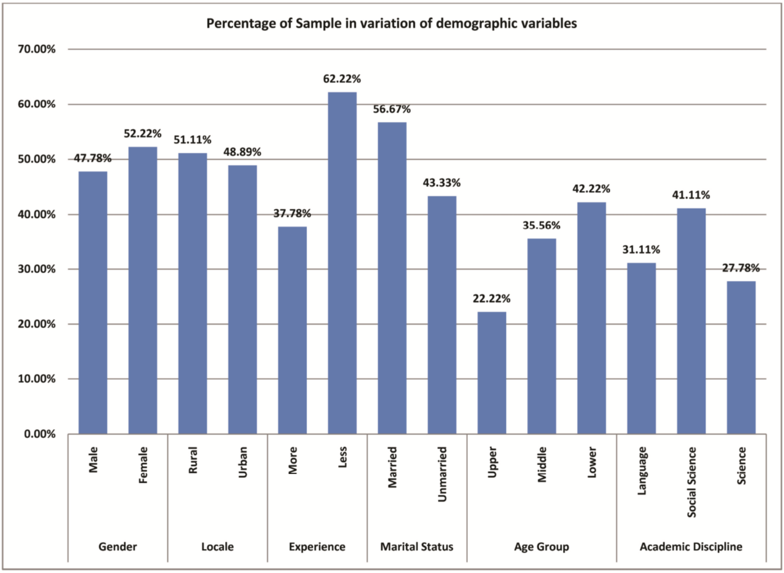

Figure-1: Showing percentage of sample in the variation of Demographic variables

- ***Operational definition:***

Computer Phobia: When any person who experiences anxiety about computers and especially about their use. In this study Computer phobia is an extreme fear of using computers.

Educator: The term "Educators" commonly refers to both those who educate prospective teachers and those who educate practicing teachers. In this study Educator refer to the teachers who teach B.Ed./M.Ed. trainees.

Gender: Only male and female educators were considered in this study.

Locality: In this study educators are of rural area is considered as rural educators and educators are of urban area is considered as urban educators.

Experience: The length of work is considered as experience in this research and length of experience is divided in two categories i.e. more (more than 10 years) & less (less than 10 years).

Age: The researchers consider the age group of educators in three category i.e. Upper age group (45 years to 60 years), Middle age group (35 years to 45 years) & Lower age group (25 years to 35 years).

Marital Status: In this study the researchers consider the married male or female educators and unmarried male or female educators.

➤ ***Tools:***

For the collection of the data for the present study, the investigators used **Computer Phobia Scale (CPS)** by S. Rajasekar & P. Vaiyapuri Raja. This scale consists 29 statements divided into three dimensions—I. Personal Failure, II. Human vs. Machine Ambiguity, III. Convenience. The maximum possible score could be 116 and the minimum could be zero.

Analysis and Interpretation

Testing of Hypotheses

In order to test all the null hypotheses the significant differences in mean scores of computer phobia in relation to gender, locale, experience, age group, marital status and academic discipline were calculated. For the comparison between the groups and testing of null hypotheses, Group statistics like Mean, S.D, S.E, S.E. of mean and inferential statistics like ‘t’ test and ANOVA were done. The results were presented in table

Table-2: Group statistics of Computer Phobia in variation of different demographic variable

Categorical variable		N	Mean	S.D	SE of Mean
Gender	Male	43	57.7	19.270	2.810
	Female	47	65.56	16.301	2.485
Locale	Rural	44	63.04	18.999	2.864
	Urban	46	59.93	17.568	2.590
Experience	More	34	55.71	20.268	3.476
	Less	56	64.95	16.104	2.152
Marital Status	Married	51	59.76	18.645	2.610
	Unmarried	39	63.67	17.702	2.834
Age Group	Upper	20	85.05	7.591	1.697
	Middle	32	61.22	11.527	2.037
	Lower	38	49.24	14.336	2.325
Academic Discipline	Language	28	75.64	13.013	2.459
	Social Science	37	47.89	14.272	2.346
	Science	25	65.64	14.203	2.840

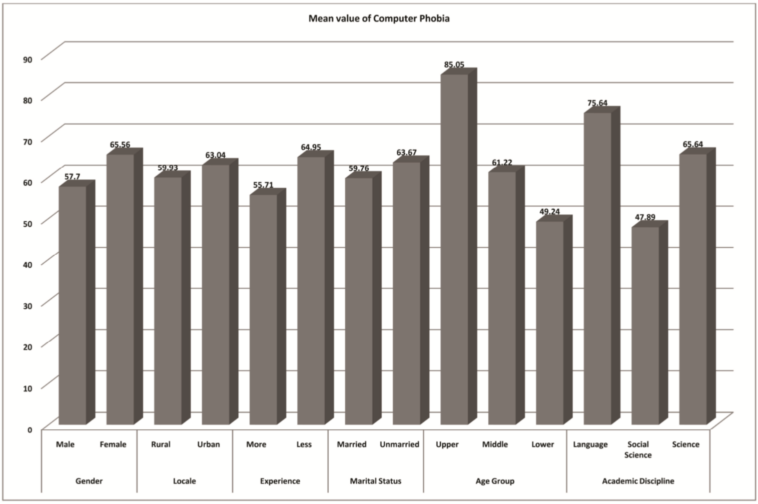

Figure-2: Graphical presentation (Bar Diagram) showing mean_ Academic stream wise

From the above table-2 it was observed that there was a difference in the means score and standard deviation of computer phobia score of educators in demographic variable variation shown in the figure-2. Therefore, the independent sample t-test and ANOVA were adopted to find out the whether there was any significance difference exists in group variations.

Table-3: Independent sample t-test assuming equal variances

Computer Phobia		t-test for equality of means			
		t-stat	df	t-critical	Sig. (2-tailed)
Demographic Variables	Male vs Female	2.078*	88	1.98	0.04
	Rural vs Urban	0.806	88	1.98	0.42
	More experience vs Less Experience	2.980*	88	1.98	0.003
	Married vs Unmarried	1.005	88	1.98	0.31

*At 0.05 level

Table-4: ANOVA

Computer Phobia		ANOVA						
		Source of Variance	SS	df	MS	F	p	F-Critical
Demographic Variables	Upper vs Middle vs Lower Age group	Between	16809.04	2	8404.51	57.038	0.00	3.10
		Within	12819.29	87	147.34			
		Total	29628.32	89	-			
	Language vs Social Science vs Science Age Group	Between	12880.57	2	6440.283	33.45	0.00	3.10
		Within	16747.76	87	192.502			
		Total	29628.32	89	-			

*At 0.05 level

Interpretation pertaining to Null Hypothesis-1 (H_O1)

The table-2 showed that the mean score of female educators was greater than the mean score of male educators. But table no-3 revealed that in case of comparing the mean score of computer phobia of male and female educators, the calculated t-value was 2.078 and p value was 0.04 (p less than 0.05). Hence, t was significant at 0.05 level of significance. So, the null hypothesis (H_O1) was rejected. And it was concluded that the computer phobia of male educators were significantly differ from female educators.

Interpretation pertaining to Null Hypothesis-2 (H_O2)

The table-2 showed that the mean score of rural educators was greater than the mean score of urban educators. But table no-3 revealed that in case of comparing the mean score of computer phobia of rural and urban educators, the calculated t-value was 0.806 and p value was 0.42 (p more than 0.05). Hence, t was not significant at 0.05 level of significance. So, the null hypothesis (H_O1) was accepted. And it was concluded that the computer phobia of rural educators were not significantly differ from urban educators.

Interpretation pertaining to Null Hypothesis-3 (H_O3)

The table-2 showed that the mean score of less experience educators was greater than the mean score of more experience educators. But table no-3 revealed that in case of comparing the mean score of computer phobia of

more and less experience educators, the calculated t-value was 2.980 and p value was 0.003 (p less than 0.05). Hence, t was significant at 0.05 level of significance. So, the null hypothesis (H_O1) was rejected. And it was concluded that the computer phobia of more experience educators were significantly differ from less experience educators.

Interpretation pertaining to Null Hypothesis-4 (H_O4)

The table-2 showed that the mean score of unmarried educators was greater than the mean score of married educators. But table no-3 revealed that in case of comparing the mean score of computer phobia of married and unmarried educators, the calculated t-value was 1.005 and p value was 0.31 (p more than 0.05). Hence, t was not significant at 0.05 level of significance. So, the null hypothesis (H_O1) was accepted. And it was concluded that the computer phobia of married educators were not significantly differ from unmarried educators.

Interpretation pertaining to Null Hypothesis-5 (H_O5)

The table-2 showed that the mean score of educators in the upper age group was greater than the mean score of educators in the middle age group; similarly the mean score of educators in the middle age group was greater than the mean score of educators in the lower age group. But table no-4 revealed that in case of comparing the mean score of computer phobia of upper, middle and lower age group educators, the calculated F-value was 57.038 and p value was 0.00 (p less than 0.05). Hence, F was significant at 0.05 level of significance. So, the null hypothesis (H_O1) was rejected. And it was concluded that the computer phobia of educators significantly differ in age group variation.

Interpretation pertaining to Null Hypothesis-6 (H_O6)

The table-2 showed that the mean score of language educators was greater than the mean score of science educators; similarly the mean score of science educators was greater than the mean score of social science educators. But table no-4 revealed that in case of comparing the mean score of computer phobia of language, science and social science educators, the calculated F-value was 33.45 and p value was 0.00 (p less than 0.05). Hence, F was significant at 0.05 level of significance. So, the null hypothesis (H_O1) was rejected. And it was concluded that the computer phobia of educators significantly differ in age group variation.

Major Findings

1. There exists significant difference ($t= 2.078$, $p= 0.04$) of mean computer phobia between male and female educators.
2. There was no significant difference ($t= 0.806$, $p= 0.42$) of mean computer phobia between rural and urban educators.
3. There exists significant difference ($t= 2.980$, $p= 0.003$) of mean computer phobia between more and less experience educators.
4. There was no significant difference ($t= 1.005$, $p= 0.31$) of mean computer phobia between married and unmarried educators.
5. There exists significant difference ($F= 57.038$, $p= 0.00$) of mean computer phobia between upper, middle and lower age group educators.
6. There exists significant difference ($F= 33.45$, $p= 0.00$) of mean computer phobia between language, social science and science educators.

Conclusion

Computer phobia is a major issue in the age of digital era. We all from little age to old one use different technological devices including computer for easy access information and teaching learning content and various academic and administrative works are also done by teachers and educators in different institutions. But excessive use of such technological devices may lead to anxiety and stress which eventually cause to computer phobia. So it is very important factor for educators as use it for academic and personal purposes. Mentally disturbed educators may become a burden to the college and society. This study reveals that the educators also suffer from computer phobia. There exists significant difference of computer phobia of male and female educators as well as more and less experience educators. The difference is also exists in the different age group of educators and across different academic discipline. So we should care for the upper age group educators, language educators, female educators and less experience educators as they suffer from computer phobia with high values. The researcher hopes that this study will be very useful to find out and control the mental health of educators by preventing and controlling from the use of computer. This study must have a greater impact family, society and nation. Only mentally healthy

educators can create mentally healthy trainees who will make better society and our nation.

Reference:

Chen, K T. (2012).Elementary efl teachers' computer phobia and computer self-efficacy in Taiwan.TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(2), 100- 107.

Giacomo, D D., et al. (2019).Psychological Barriers to Digital Living in Older Adults: Computer Anxiety as Predictive Mechanismfor Technophobia. Behav. Sci. 9, 96; doi:10.3390/bs9090096

Gil-Flores, J. et al. (2008). Computer use and students' academic achievement.Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education, 49(A), 1112-1121.

Gupta, A., &Kapri, U C. (2018).A comparative study of computer phobia among secondary school students.Journal of Emerging Technology and Innovative Research, 5 (12), 720-726.

Lalruattluanga, F. (2012).A study on computer phobia among secondary school teachers within Aizawl city in relation to age group, professional status, marital status and type of family. IJFANS, 11 (11), 1501-1509.

Mcilroy, D., Sadler, C, &Boojawon, N. (2007). Computer phobia and computer self-efficacy :Their association with undergraduates use of university computer facilities. Computers inhuman Behaviour, 23, 1285-1299.

Noor-UI-Amin, S. (2014).Computer attitude among higher secondary school students in district Srinagar (J&K). Academia Journal of Educational Research, 2(4), 079-086.

Prakash, V. (2016).A study of computer phobia among senior secondary school teachers. International Journal of Advanced Education and Research, I (4), 51-53.

Rosen, L D., & Sears, D C. (1987).Computerphobia.Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 19 (2), 167-189.

Saxena, M K., et al. (2014). A Study of Computer Phobia among Prospective Teachers. Learning Community: 5(2 and 3), 129-136.

Singh, K. (2023). Measurement of computer phobia among student teachers.International Journal of Arts & Education Research, 12 (3), 94-98.

Suvera, P., & Tailor, P R. (2020).Computer phobia: a comparative study of male and female B.Ed. trainees. The International Journal of Indian Psychology, 8 (1), 388-392.

An Indian Foster Child in The West : A Study of Select Poems of A.K. Ramanujan

Arunima Karmakar
Assistant Professor
Department of English (U.G.&P.G.)
Trivenidevi Bhalotia College, Raniganj

Abstract : Hailed as one of the most prolific poets of Indian English literature, A.K Ramanujan's poetry stands in stark contrast to other Indian English poets in his use of language, theme, and metaphor. Born in Mysore, Ramanujan moved to Chicago and settled in Chicago. Being an expatriate, he could hardly forget his Indian origin, and thus most of his poems are replete with Indianness. He was a pragmatic formalist who presented a lucid picture of Indian culture and ethos through his poems. He builds a replica of contemporary India in the mind of every reader. His poems represent the conflict between past and present, East and West. His poems depict his hybrid identity as he presents his mental dilemma as he oscillates and vacillates between two antithetical cultures, the East and the West. Being born into a Tamil Brahmin family, crossing the black waters, settling in a foreign land, and finally marrying a Syrian –Christian lady, he projects himself as an epitome of hybridity as he copes with multivalences like origin and exodus, settlement and diaspora, repeated departure and unfinished return to the roots. His poems depict self-reflexivity, traditionalism and postmodernism, Indianness and Westernization, nationalism, and internationality. This paper seeks to explore some of his poems like *A River*, *Obituary*, *Death and the Good Citizen, Waterfalls in a Bank*, and *A Hindu to His Body* to establish the fact that Ramanujan unlike his other contemporary Indian poets concentrates on the glorious cultural heritage of India.

Keywords:- Hybridity, transculturation, Indianness, ambivalence, Westernness.

Born into a hardcore Tamil Srivaisnava Brahmin family which migrated to a Kannada-speaking backdrop of Mysore, Attipat Krishnaswamy

Ramanujan, was one of the most prolific Indian English poets. In his childhood, he flourished with English and Sanskrit in his astronomer father's study upstairs, Tamil in his mother's kitchen downstairs, and Kannad in the streets, outdoors. His father was a professor of mathematics and his mother was a housewife. As he grew up, being an adult, he disrupted the orthodox taboos of Brahminism and crossed the black waters which was an act of blasphemy. As he reached America, he consumed meat, married a Syrian-Christian woman, Molly Daniel, and even tried to get converted to Buddhism. Thus his life is like an unending sojourn where he seems to be caught in an eternal web of shifting and multivalences. The illustrious legacy of poetry left by him is an outcome of the dialectical interplay between his Indian upbringing and American encounter, his self, and the experience of the other. His works are marked with complexity, sophistication, and richness which make him one of the poets of excellence in the realm of Indian English poetry. S. Krishnan recollects the words of Ramanujan where he says, “All you have to do is to make it clear that my interest in poetry is central to my being and all my work.”[1]

Ramanujan was born in 1929, Mysore, in undivided India. In 1958, he went to the United Statesfor pursuing his Ph.D. in Linguistics at Indiana University. In 1962, he was appointed as a professor at the University of Chicago where he served for over thirty years. Since he was born and brought up in a multilingual family, he had a good knowledge of the rich Indian culture and heritage. He was a poet and translator who studied linguistics, mythology, poetics, folklore, and South Indian and English literature. Though he was born in India, he moved to the U.S. in 1959 and remained there until his death, yet he could never forget his mother and motherland. He lived in India till the age of thirty. His poetry highlights the fact that he lived in the reminiscence of Indian culture. Being an Indian, he was alienated from his roots and thus suffered from problems of subjectivity and identity. His poetry surfaces his existential problems as he encounters a completely different culture and life in an alien land. Since India was a British colony that suffered under the hegemonic imperial powers, he could hardly cope up into secluded life in the colonizer's land. His life was affected by the cross-cultural and

religious encounters in America as he was also aware of his cultural rootlessness.His poems explore the theme of alienation and a quest for roots.

While the term 'hybridity' in horticulture refers to the act of bringing forth a third hybrid species by the cross-breeding of two species by grafting or cross-pollination, according to Homi K. Bhabha, the concept of hybridity originated due to the interaction of colonizer and the colonized, which creates a contradictory, ambivalent third space. It is in this third space that bears the burden and meaning of culture and the cultural statements are thus constructed. The colonizer and the colonized are mutually dependent in the mutual construction of their subjectivities. The purity of culture is thus untenable. Hybridity thus refers to the cross-cultural exchange which negates the concept of imbalance and inequality of power relations leading to transculturation. Bhabha's concept of Hybridity thus focuses on the strategic reversal of the process of domination through denial. In the postcolonial discourse, hybridity thus represents the colonial impact that results in dissecting and shattering the colonized identity, ideology, and culture. He says that "It is significant that the productive capacities of this Third Space have a colonial or postcolonial provenance. For a willingness to descend into that alien territory . . . may open the way to conceptualizing an international culture, based not on the exoticism of multiculturalism or the diversity of cultures,but on the inscription and articulation of culture's hybridity."[2]The postcolonial critics thus try to de-historicize and de-locate cultures from their temporal, spatial, linguistic, and geographical contexts, leading thereby to an abstract, globalized concept of the textual which obscures the specificities of a particular cultural situation.

Bhabha's third space thus provides articulation to the production space for the new forms of cultural meaning negating the existing boundaries and interrogating the existing categorizations of culture and identity. It is the ambivalent site for the cultural meaning which lacks any primordial unity of fixity. Bhabha also enunciates the concept of ambivalence where he talks of the complex mix of attraction and repulsion that characterizes the relationship between a colonizer and the colonized. The colonized subject is never fully opposed to the colonizer.

It thus highlights compliant subjects who mimic the colonizer and this mimicry is close to mockery. Ambivalence decentres authority or colonizer from its power so that the authority gets hybridized being inflected by other cultures.

Transculturation refers to the cultural transformation due to the influx of new cultural elements and the loss or alternation of existing ones. It was coined by the Cuban anthropologist Fernando Ortiz. It is a continual process of exchange, a kind of socialization where one learns and unlearns cultural understanding. It is like seeing oneself in the other. The most common example of transculturation is colonialism. It is a global phenomenon accompanied by multiculturalism, war, ethnic conflict, racism, interracial marriage, *et al.* Since Ramanujan had stayed in both cultures, Eastern and Western, he was aware of both cultures. The more he was alienated from his motherlandand resided in an advanced urban society of America, he got more and more conscious of his hybrid and dichotomous identity. This proves that alienation takes place in a state of cultural displacement, mutilation, and disorder.

Ramanujan was blessed with a treasure trove of memories that over time refused to corrode. He kept intact his originality despite being subjected to the onslaughts of various influences. He maintains poise in his life as he establishes equilibrium and lived successfully in both cultures simultaneously. He presents life as an interplay of alienation and belongingness, sorrow and joy which occurs and recurs periodically. Published in *The Striders* in 1966, the poem, *A River*, by Ramanujan focuses on the river Vaikai which is regarded as the seat of Tamil culture. Rivers played a pivotal role in the development of Indian civilization. All civilizations flourished on the banks of several rivers. In Hinduism, rivers are believed to have a divine origin. It symbolizes liberating consciousness which purifies everyone who comes in contact with it. Each river is considered the manifestation of a god or goddess. Thus Hindus worship the river as mother and offer their prayers. They make the auspicious dip into the rivers to wash away their sins and misfortunes.

River Vaikai has lost significance in a spiritually bankrupt world. The poem is a good-humoured satire of the old and new Tamil poets who are indifferent toward human suffering at the time of the devastating

floods. These poets highlight only the outer beauty of the river negating its inner deeper significance. They felt that writing about the devastating effect of the river on human life would mar the poetic beauty associated with their poems. Ramanujan reveals the bitter truth with sheer harshness for her preferred humanism over sensationalism. Although he became a permanent resident of the Western modern world, his Indian sensibility was sharpened as he could vividly reconstruct the reality of Indian villages during floods during monsoon. His physical displacement from his roots and psychological alienation strengthens his belongingness. He could feel the pain of the Indian common people during natural calamities like floods. His description of the river during the summer is worth noting.

...a river dries to a trickle
in the sand
barring the sand-ribs,
straw and women's hair
clogging the water gates
at the rusty bars.[3]

His poetic eye captures every minute detail of the landscape in summer. It suggests the emotional sterility and dearth of human concern on the part of Indians. The poet seems to criticize the observation of various unscientific and orthodox religious rituals like the emersion of women's hair and other non-disposable things as offerings into the river water which has a disastrous effect on the environment. Though he was a hardcore follower of Hinduism, yet he seems to act practically thereby unfolding his unique ambivalent identity. He seems to praise the Western culture which is much more scientific and takes care of the environment and takes preventive measures to reduce environmental pollution.

Ramanujan's poetry is what Matthew Arnold calls 'a criticism of life'. He is no visionary but a social realistic critic. He presents the grim truth.

...it carries away
in the first half-hour
three village houses

a couple of cows
named Gopi and Brinda
and one pregnant woman.[4]

As the mother's womb turns into a parental grave of the unborn and unnamed twins, Ramanujan highlights the adverse effect of the floods which is not restricted to the present generation but also on the future generations. He points to the existential problems that the inhabitants of Indian society encounter.

His roots are hard to detach and are responsible for his creativity. Despite his long sojourn in America, he never forgets his origin and carries along the whole baggage of his past Indian experiences which find expression in his poems. Expatriation, which brings forth a rift between self and home, serves as a dynamic and enriching force. He presents a realistic picture of India – both urban and rural. He presents the dirt, the misery, the unpleasant, the exploitation, and the corruption with a cold detachment.

Ramanujan's authentic Indian identity or self finds expression in his faithful and true portrayal of things as they are. In the poem, *Death and the Good Citizen*, Ramanujan makes a detached and passive comparison between the Eastern and Western concepts of observing the final rites of a dead person. He asserts the characteristics of a 'Good citizen' who is a good animal. He proposes that-

…Good animal yet perfect
citizen, you, you are
biodegradable, you do
return to nature. [5]

Ramanujan believes in the belief that after death, our bodies revert to their earthly elemental components as we find in the Book of Genesis (3:19) of the King James Version of the Bible which states, "*Dust thou art, and unto dust shalt thou return*". While the Hindus believe in reincarnation and cremate the dead ones as it is the quickest way to release the soul for a new afterlife in a different form. He gives a vivid ritualistic and ubiquitous way of handling the dead body in India. He says-

…But

you know my tribe, incarnate
unbelievers in bodies,
they'll speak proverbs, contests
my will, against such degradation.
Hidebound, even worms cannot have me: they will cremate
me in Sanskrit and sandalwood,
have me sterilized
to a scatter of ash.[6]

Ramanujan's unique ironical depiction conjures no sentimentality but is accompanied by coldness for his sacrosanct attitude towards the dead body.In contrast to the Eastern concept of cremation of the dead, westerners bury the dead bodies in coffins. He says-

…they'll lay me out in a funeral
parlor, embalm me in pesticide,
bury me in a steel trap, lock
me so out of nature
till I'm oxidized by left-
over air, withered by my own
vapors into grin and bone.[7]

He directs mild criticism against the Western sophisticated concept of burial of the dead for there is no scope for a return to nature for the dead person's tissues are not grafted further. Western people have modified and modernized their life so much so that they go to a funeral parlor, dismantle the body parts, and believe in organ donation. They preserve the body parts like pickles and get transplanted into foreign bodies, thereby arresting the natural process of metamorphosis. When they bury the rest of the mutilated dead body, they use pesticides to drive off worms and conceal them in a steel trap far away from the reach of nature.

It seems that he directs mild irony upon both worlds without visibly anchoring his subjective preferences. He projects his cold in-differentness which baffles the readers. He deliberately isolates himself without giving any value judgment. He asserts no choice which asserts the inner-outer dialectic of self as both worlds inevitably exist for him. He has experienced both worlds and readers are inconclusive about his

take on the mode of treatment of the dead bodies for he is neither sad nor happy. He cherishes the wish of being cremated in Sanskrit and sandalwood. Thus at the end, he seems to end on an ambiguous note for he refrains from expressing his subjective preferences.

His juxtaposing of the nostalgic past with the immediate seeks no comparative evaluation but rather attests to his attempt to put dialectically opposite things together. He gives no verdict but rather "*leaves the poem to speak for itself in the mind of the reader and form a gestalt*".[8]His poems are remarkable for their sensibility and vision.In his poem *Obituary,* which appeared in the collection, *Relations*, 1971, Ramanujan makes a mock-ironic newsreel presentation of the uneventful life of the poet's father. He vents out his intense concern and grief for the family members. The dead father has left debts, daughters, a bed-wetting grandson, a dilapidated house, a changed mother, and more than one annual ritual. The father leaves a legacy of liability for the bereaved family rather than assets. In the ironic mold, he transmutes personal feelings into art which presents the true picture of India to the outer world. The poem presents the aftermath of the father's death in the typical Indian patriarchal society, the eldest male member being the only bread earner, bestowed with all the duties of the family. He portrays how the woman who had once been the source of creation and inspiration, after the demise of her husband, is rendered insignificant in this patriarchal society. The concept of womanhood being a curse in Indian society is vividly captured within the micro-corpus of this poem. It is a critique of the poet's father and his incapabilities. He even gives a brief catalog of the rituals observed after the death of the father.

…several spinal discs, rough,
some burned to coal, for sons
to pick gingerly
and throw as the priest
said, facing east
where three rivers met
near the railway station.[9]

He does not only stop by peeping into the socio-cultural milieu of India but also exposes the deepest level of universality of life by

pondering upon the familial scene and digging into the doctrines of Hinduism.

Although set at a bank in Hyde Park, Chicago, Illinois, the poem, *Waterfalls in a Bank,* is one of the most exquisite poems of Ramanujan which exhibits his rich texture of thought, intense awareness of his Indian culture, systematic organization of subjects and the immediate contrast between past – present, East – West. The sight of the man-made waterfall in the lobby of the bank transports him to his past days and he gets engaged in a free association of images. Images from his native land flood his mind. The reference to '*wavering snakeskins*' and 'cascades of muslin' reminds him of the tyrannous British colonial rule which had intentionally destroyed the Indian indigenous muslin industry to supplant it with imported British goods. He also refers to the 'living and dying children', war at 'Biafra', 'bombsites', 'Assam politics' to metaphorically relate to the evil effects of the war upon human society, migration, and the devastating effects of the colonial rule upon a nation. He presents the Indian family where the old doting grandmother is acting as a midwife while her daughter is giving birth to the child and four lemons are kept outside to provide good omens.

> *...As I transact with the past as with another*
> *country with its own customers, currency,*
> *stock exchange, always*
> *at a loss when I count my change.* [10]

By using the language of commerce, the poet tends to make the readers aware of the wide gap he has witnessed in both time and culture, between the past and present. In his life, he has witnessed two different cultures and he ends up unsatisfactorily at a loss as he attempts to bridge the gap between two cultures. He feels that what he possesses in the present is less than what he had in the past. His Indianness harks back as he talks of the paralytic sadhu who urinates on the red oleander flower while hobbling along the pebbled street-side near the poet's childhood home. The headlights of the passing car fall upon the stream of urine and he describes it as 'yellow diamonds', 'instant rainbows', and 'spurts of crystal'. The way the poet transforms a private act into a sublime,spiritual, and precious one is something worth noting. The old sadhu being a

representativeof the Eastern ancient spiritual culture is juxtaposed against the Western product of civilization, the headlights of the car.

As he ponders on his present locale, Chicago, he talks of the blizzard which occurred in January 1979 and how the Mayor lost in the election due to the failure in clearing the snow. Although, the Western modernized world is depicted as the epitome of perfection and activeness, Ramanujan, by dint of his hybrid identity seems to highlight the inefficiency on the part of the Western government. India being a colonial nation is not that developed and the government lack effectiveness due to the dearth of a modernized system. Ramanujan does not sing paeans of praise for the Westbut presents reality as it is like a mere spectator. He is undisturbed and thus concludes "*…And my watchers watch, from their nowhere places*".[11]This passive part of the self of the poet is not confined within the boundaries of time and space and therefore gives an objective and truthful picture of both worlds.

The unique vision of Ramanujan adheres to things as they are, and confers a kind of objectivity. His indifference originates from his belief in the concept of 'sthitaprajna' of the Bhagawad Gita which refers to a man of steady wisdom. It is because of the interaction, absorption, and the synthesis of two cultures, which result in his wonderful poetic creation. His poetry is not merely a product of his native Indian milieu but a symbiosis of the East and the West.

The more he feels alienated from his homeland, he becomes conscious of the richness of Indian culture and heritage. His Indianness is not just his past but something that he constantly lives in. He boldly acknowledges this influence of his inherited values, affirms them, and thus reminiscences about the places and the people of the past. Despite his alienation from the motherland, his poems are replete with Indian sensibility. His loss of identity resulted in his awareness of the value of his roots and thus he makes an effort to affirm his identity regarding his past. His alienation has failed to make him a stranger to his motherland and has intensified his pull for motherland thereby awakening his poetic sensibility. His encounter with the global multicultural world unfurled his critical and rational outlook toward the rich cultural and spiritual heritage of the East.

Thus we can conclude that although Ramanujan remained physically alienated from his place of origin, he was never psychologically far away. His alienation has intensified his bond with his motherland. He stayed in the best part of the world but his attachment to the Eastern world remained and aggravated with time. His poems are artifacts that bear testimony to his achievement, for they expressed the interaction, absorption, and synthesis of the dialectically opposite cultures of the East and the West.

References:

1. Krishnan, S., August 16 – September 15,1993, "A Poet's Quest", Indian Review of Books, Vol. 2, No. 11, p.28.
2. Bhaba, Homi K., 2006, "Cultural Diversity and Cultural Differences," *The Post-Colonial Studies Reader*, Ed. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, New York, Routledge, p. 155.
3. Ramanujan, A.K., 1996,*The Striders*, London, OUP, p. 128.
4. Ramanujan, A.K., 1996,*The Striders*, London, OUP, p. 129.
5. Ramanujan, A.K., 1986, *Second Sight*, Delhi, OUP, p. 25.
6. Ramanujan, A.K., 1986, *Second Sight*, Delhi, OUP, p. 26.
7. Ramanujan, A.K., 1986, *Second Sight*, Delhi, OUP, p. 27.
8. Dulai, Surajit, S., 1989, "First and Only Sight: The Center and the Circles of A.K. Ramanujan's Poetry", Michigan, Asian Studies Center, Michigan State University, p.151.
9. Ramanujan, A.K., 1971, *Relations*, London, OUP, p. 41.
10. Ramanujan, A.K., 1995, *The Collected Poems*, London, OUP, p. 189.
11. Ramanujan, A.K., 1995, *The Collected Poems*, London, OUP, p. 190.

WORKS CITED:

1. Bhaba, Homi K., 2006, "Cultural Diversity and Cultural Differences," *The Post-Colonial Studies Reader*, Ed. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, New York, Routledge.
2. Dharwadker, Vinay, Ed., 1999, *The Collected Essays of A.K. Ramanujan*, New Delhi, OUP.

3. Dulai, Surajit, S., 1989, “First and Only Sight: The Center and the Circles of A.K. Ramanujan’s Poetry”, Michigan, Asian Studies Center, Michigan State University.
4. Krishnan, S., August 16 – September 15,1993, “A Poet’s Quest”, Indian Review of Books, Vol. 2, No. 11.
5. Ramanujan, A.K., 1971, *Relations*, London, OUP.
6. Ramanujan, A.K., 1986, *Second Sight*, Delhi, OUP.
7. Ramanujan, A.K., 1995, *The Collected Poems*, London, OUP.
8. Ramanujan, A.K., 1996, *The Striders*, London, OUP.

'Value Education' in Schools : An Overview of Value Education in School in India from the Vedic Era to the Present

Soma Bhattacharya
Assistant Professor, Department of Education
Chandernagore College
Chandannagore, Hooghly, W.B.

Abstract: Value education in schools in India has evolved from the Vedic era to the present day, with a focus on the principles of the true, good, and beautiful. The epics like Ramayana, Bharatha, and Bhagavatam, along with literature like the Upanishads and Aaranyakas, have laid the foundation for Indian philosophy, lifestyle, and ethical values. However, recent incidents of crime, murder, agitation, violence, immorality, rape, corruption, bribery, self-centered egoism, youth unrest, communal violence, and cybercrime have negatively impacted the future generation's ability to learn, develop a creative mindset, think positively, enjoy literature and culture, and build well-rounded personalities. The relationship between parents, children, and teachers is deteriorating due to the rapid rise of scientific and technical progress. Value education aims to support students' moral and spiritual growth, fostering a cohesive, socially responsible, and culturally literate individual.

Value education is a process that teaches and learns about important ideas in society, aiming to help students understand and reflect these values in their attitudes, behavior, and contributions to society through good citizenship and ethical practice. It enables individuals to live successful lives as responsible citizens and deepens their understanding of life's perspective. Value education focuses on our relationship and conduct with society, aiming to develop a solid learning environment that improves academic performance and helps students acquire lifelong social and interpersonal skills.

The objectives of value education include developing a child's physical, mental, emotional, and spiritual parts of their personality, growing civic responsibility, fostering a sense of national unity and

patriotism, fostering a democratic lifestyle, giving kids the freedom to choose morally based on strong moral values, enhancing a person's whole development, fostering mindsets and advancements in sustainable development, growing acceptance and comprehension of various religious beliefs, raising awareness of values, their importance, and their role, and being aware of the different types of living and non-living things and their interactions with their surroundings.

Value education is deeply rooted in Indian philosophy and culture, with educational institutions playing a crucial role in raising values. It is essential in today's culture, as the pursuit of knowledge and ethical practices is crucial for a successful and responsible life.This study focuses on value education from the Vedic era to the present, as well as the roots of India's value crisis and the roles that teachers play in helping students develop values.

Keyword: *value, value education, value system, roll of teacher.*

INTRODUCTION:

Value is defined by a continuum of importance, an end state of existence, or an enduring belief. Such modified human behaviour is beneficial to his own growth as well as the advancement of society, the country, and global understanding. In terms of education, Satyam, Shivam, and Shundaram—the trinity of the principles of the true, the good, and the beautiful—offer a values-based standard for human life. The complete truth about the universe and human life governs all of our behaviour in a good and beautiful way. The epics like the Ramayana, Bharatha, and Bhagavatam, as well as other works of literature like the Upanishads and Aaranyakas, have laid the foundation for Indian philosophy, lifestyle, and the upholding of ethical values. Their language has also contributed to an ongoing renaissance, developed with opulent literature. Reports of crime, murder, agitation, violence, immorality, rape, corruption, bribery, self-centred egoism, youth unrest, communal violence, cybercrime, etc., are all over the newspapers, magazines, and other news media these days. Everybody learns about these incidents, which have had a negative impact on the future generation's ability to learn, develop a creative mindset, think positively, enjoy literature and culture, and build well-

rounded personalities. We typically see in our society that young people have a great deal of respect for our culture, religion, morals, and social values. The relationship between parents and children and teacher students is deteriorating as a result of the rapid rise of scientific and technical progress.. Value crisis in home, school and society has been seen at large at present time. Arrogance, procrastination, lustfulness, dishonesty, insincerity, lack of punctuality, disrespect for parents, teachers, and elders, disregard for work culture and entrepreneurial activities, and a greater reliance on others have all contributed to the erosion of values in the younger generation, making them more indiscriminate everywhere, create a culture of gun ownership, and want everything they can get their hands on quickly and dirty. Education is the only process by which a learner gets a good life. But in the in the present day, education's primary importance is the transmission of knowledge and the cultivation of occupational skills.The aim of education is to provision a child's whole growth and establish a personality that is well-adjusted among all of the students. In order for the child to be cohesive, socially responsible, and culturally literate, it must constantly work to progress all aspects of human intelligence. Value education is an educational approach that aims to support students' moral and spiritual growth. Education cantered around values has an impact on an individual's behavior and personality.

WHAT IS VALUE EDUCATION

Values education is a process by which teaching and learning about the ideas that a society deems important. While this learning can take place a number of forms, the underlying aim is for students not only to understand the values, but also to reflect them in their attitudes, behaviour and contribute to society through good citizenship and ethical practice.

In the words of John Dewey (1966), “Value education means primarily to prize to esteem to appraise, holding it dear and also the act of passing judgment upon the nature and amount of its value as compared with something else”.

M.K. Gandhi said "The real difficulty is that people have no idea of what education truly is. We assess the value of education in the same manner as we assess the value of land or of shares in the stock-exchange

market. We want to provide only such education as would enable the student to earn more. We hardly give any thought to the improvement of the character of the educated. The girls, we say, do not have to earn; so why should they be educated? As long as such ideas persist there is no hope of our ever knowing the true value of education". value education put emphasizes on our relation and conduct with society.

IMPORTANCE OF VALUE EDUCATION

In our lives, we need value education to become successful human beings as well as good citizens.Value education is needed for the sanctity of human life, as is the need for parental control of children in families. Value education is important for authority, and maintaining the law and total disregard for rules and regulations are necessary to control crime and corruption. Value education can prevent the abuse of alcohol and drugs and protect women and children from abuse. It can increase respect for other people and property.

Value education is deep-rooted in Indian philosophy and culture. Educational institutions play a important part in the raise of value. The Vedas and Upanishads form the source of motivation for value education. Accouding to Patil (2013)Value-based education is desperately needed in today's culture, as the quality of our lives has declined. While there has been a significant rise in the amount of education, the quality has declined.

In this regard**,** Yogi (2008) said that , A value-based education includes not just the subject matter but also the scheduling of the classroom, the utilization of various learning styles, extracurricular activities, and family involvement. The value-based education is intended to support the fullest possible development of the heart, mind, and body as well as a productive channelling of life energy into endeavours that promote the growth of the personality on the inside as well as the outside.

Veda and Value system:

The four main principles for a happier life, according to ancient Indian philosophy, are artha (economic values of riches), kama (psychological values of pleasure), dharma (moral values), and moksha (liberation). The only way to live a moral life is to receive a value education that exclusively opposes major sins. Our actions and beliefs are grounded in

values, which include virtues, ideals, and attributes. Values are tenets of guidance that mold our conduct, attitudes, and worldview.

Vedas are the oldest sacred books of Hinduism. Indian literature begins with the Vedas. They were probably composed beginning about 1400 B.C. There is no writer of Vedas and is believed to be originated from the Divine Consciousness. Hindu law permitted only certain people to hear the Vedas recited, and so the works became surrounded by mystery. Vedas is divided into Samhita, Brahmana, Aranyaka, and Upanishad. The Vedas are also called Samhitas

Samhita: Samhita contains the original texts of the Vedas viz., verses and hymns.

Brahmana: Brahmana is the application of the verses containing interpretation of the twenty Brahmanas survived to this age.

Aranyaka: it discusses the importance of rituals and the meaning behind the rituals.

Upanishad: Upanishad deals with philosophical questions. Shankaracharya wrote commentaries on 11 Upanishads and these are considered as the main Upanishads. Isavyasa, Kena, Prasna, Mandukya, Yogasara, Katha, Brihadaranyaka, Chhandogya, Mundaka, Taittiriya, Aitareya, and Kaivaly are same name of Upanishads.

The short descriptions of the four Vedas are given below:

The Rg Veda: According to some academics, the Rg dates as early as 12000–4000 BC. The Rig-Veda gives us information not only on the early Vedic religion and their Gods but also on the social condition, religious, political and economic background of the Rg-Vedic civilization of those days. Sama Veda, Yajur Veda and Atharva Veda were compiled after the age of the Rg Veda and are ascribed to the Vedic period.

The SamaVeda: The Sama Veda consist of verses taken from Rig-Veda with reference to sacrifices. It is a liturgical collection of melodies. Its hymns are set to musical notes. Some of the songs in the Sama Veda were reserved for the priests to sing during Yajna ceremonies.

Yajur Veda: It consist of hymns concerning sacrifices. The Yajur Veda is also a liturgical collection and was made to meet the demands of a ceremonial religion. The Yajur Veda has two parts - the white and the black.

The Atharva Veda : Atharva Veda is completely different from the other three Vedas. It is important from the perspective of knowing the history of science and sociology in India. This Veda sheds light on the beliefs of the people. Some Mantras are used to fend off evil spirits that are responsible for illness and suffering, while others are meant to bring success in life.

Buddha and value system :

The purpose of the Jataka stories is to teach people virtue, honesty, self-sacrifice, and other useful lessons that depict earlier incarnations of the Buddha. The Jataka Tales were composed in 300 B.C. to impart morality and knowledge to humanity. Since then, Jataka tales have developed into entertaining and educational storybooks. The bright fables of "Jataka" are meant to teach people morals, honesty, selflessness, and other instructive lessons. Stories from the Jataka depict previous incarnations of the Buddha, sometimes in the guise of animals or birds and other times as humans or the future Gautama Siddhartha.

VALUE EDUCATION IN PRE & POST-INDEPENDENCE:

In The British period they took a completely impartial stance on religion and value education.

- According to **CABE – (1943-46**) value education was the accountability of home and community.They highlighted on spiritual land moral education.
- **University Education Commission (1948-1949)**.. It was suggested that morality serve as a guiding concept for personal growth. Studying the biographies of notable individuals should impart moral education; college classes should begin with reciting prayers; and students should be encouraged to read about a variety of religions in order to comprehend the commonalities and points of agreement among them, as well as to learn about the core ideas of various faiths.
- **Secondary Education commission (1952–1953)**. This commission highlighted on character building as the major goal of education. It emphasizes the distinction between religious and moral education and stresses the need to liberate education from

the hold of religion for the benefit of both individual and societal growth.

- **Education Commission of 1964–1966** put the spotlight on education and national development. It highlighted on the value viz., **democracy, socialism, and equality of all religions**. Therefore, the committee placed a high focus on developing abilities through science and technology as well as promoting the balanced growth of moral and human values.
- **UNESCO (1972)** believed that concepts of international understanding, world peace, and human unity should be promoted in the educational system.
- A national education system built on a National Curricular Framework with a common core and other flexible components is envisioned under **the National Policy on Education (NPE), 1986**. The common core curriculum encompasses crucial information that fosters national identification, such as the history of India's liberation movement and constitutional obligations.
- **NPE—Programme of Action (1992)**attempted to incorporate value education's several components into the curricula at every level of education, from elementary to secondary.
- **The National Curriculum Framework for School Education (2000)** advanced a plea to integrate value education into the curriculum.
- **National Curriculum Framework (2005)**explains the necessity of restating our dedication to the idea of equality in the face of diversity and the interconnectedness of all people in order to advance ideals that encourage tolerance, compassion, and peace in a multicultural society.
- **The National Education Policy (NEP), 2020** provides to include in the curriculum ethical reasoning, traditional Indian values and all basic human and Constitutional values (such as seva, ahimsa, swachchhata, satya, nishkam karma, shanti, sacrifice, tolerance, diversity, pluralism, righteous conduct, gender sensitivity, respect for elders, respect for all people and their inherent capabilities regardless of background, etc).

- **The National Education Policy (NEP-2020)** aims to enhance moral principles, human rights, and constitutional values in young people and the general public by implementing substantial changes to the educational system. . The NEP 2020 emphasizes the need of providing children with a range of educational experiences in order to cultivate ethical qualities like integrity, empathy, respect, and responsibility.

Gandhiji proposed all round development of the child. He identified certain values as the basis for establishment of new social order in India. They are truth, Non-violence, Democracy, Sarvadharma Sambhava, equality, selfrealisation, purity of end and means, self discipline and cleanliness.

The National Education Policy (NEP) - 2020 of India places a strong emphasis on a number of fundamental values. The following are a few of the fundamental principles of the NEP-2020:

1. **Inclusivity and Equity**: The NEP-2020 encourages equal access to quality education for all.
2. **Quality and Excellence**: The policy highlights the significance of providing high quality education at all levels.
3. **Holistic Development**: The NEP-2020 acknowledges the need of fostering students' holistic development, encompassing their mental, social, emotional, and physical health.
4. **Multilingualism and Cultural Diversity**: he strategy promotes the preservation and advancement of many languages and cultures in recognition of India's great linguistic and cultural diversity.
5. **Ethical and Moral Values**: Fostering moral principles, social responsibility, and ethical values in pupils is highly valued by the NEP-2020. It aims to in still virtues like social justice, honesty, compassion, integrity, and respect for others.
6. **Environmental Consciousness**: The policy in stills environmental consciousness and sustainability ideals in education and acknowledges the pressing need to address environmental concerns.

7. **Digital Literacy and Technology Integration**: To improve access, engagement, and innovation in education, the NEP-2020 promotes the use of technology in teaching and learning processes.
8. **Critical Thinking and Creativity**: Students' critical thinking, problem-solving, and creative abilities are fostered by the policy.
9. **Lifelong Learning**: The NEP-2020 acknowledges the value of lifelong learning and the ongoing requirement for skill development for all ages of individuals.
10. **Global Citizenship**: The policy promotes the internationalization of education, global collaborations, and exposure to diverse perspectives and experiences to develop a global outlook, cross-cultural understanding, and a sense of global citizenship.

The National Education Policy (NEP) 2020 of India also emphasizes comprehensive value education, the value of practical skills and hands-on learning, and the and the value of communication and expression. It also focuses on value-based activities, which are based on the participation and individual performance of the students.

VALUE EDUCATION IN SCHOOL AND ROLL OF TEACHER:

A teaching strategy that incorporates values is called values-based education. It establishes a solid learning environment that improves students' academic performance and helps them acquire lifelong social and interpersonal skills. The good values that staff members throughout the school model help to create a positive learning environment. Significant amounts of teaching and learning time are freed up as it rapidly releases educators and learners from the strain of antagonistic interactions.

Teachers are required to make radical changes in their leadership, involvement, interaction, new ideas, and beliefs because they are the architects of society.

It is necessary for teachers to develop appropriate methods, strategies, and abilities in order to foster choice values. It is common for educators to believe that pupils should learn values through curriculum and well crafted materials. They shouldn't end up becoming obstacles to the teaching and learning of important education. It is possible to create, nurture, copy, and borrow values. It is also a skill that can be learned. The

human and spiritual ideals that the community and parents have developed must be instilled in students.

In "India 2020: A Vision of the New Millennium," Dr. A. P. J. Abdul Kalam makes the accurate observation that "teachers, in whatever capacity, have a very special role to play because more than anybody else, it is you who are shaping the future generation."

Teachers model values for their students via their actions rather than words. During a student's formative years, the teacher has the most influence on their personality. Pupils absorb morals and vices from these role models both consciously and unconsciously. Teachers provide an example for their students' proper behavior by acting accordingly. Teachers need to be morally grounded and have a positive outlook. Teaching is all about having a positive or negative attitude about their work of providing high-quality. Teacher should act as a friend, philosopher and guide.

CONCLUSION:

People are rising more and more selfish. Our youth lack discipline, and even when they do, they show little regard for their elders. The impact of values education has to be ascertained with regard to changes in the behaviour of students. This will help principal/ teachers to know the impact of values education on students. Speaking gently, politely, kindly without shouting, complaining and expressing negative feelings in different ways and taking responsibility for completion of assigned duties in time, regularity and punctuality, doing one's own work, abilities to pay close attention to and listen to one another can be grew through values through education.

REFERENCE

- Gandhi,M.K.(1993). An Autobiography or the Story of My Experiments with Truth. Ahmedabad: Navajivan Trust
- Kalam,A. P. J. Abdul .(2002),"India 2020: A Vision of the New Millennium," PENGUIN BOOKS , New Delhi 110 017.
- Dhanalakshmi, A. (2007). Value based personal and business life: An exploratory attempt based on certain Indian Sacred text. A

doctoral thesis of PG Department of Commerce, Voohrees College, Vellore.

- YOGI, C. M. (2009). Value-Based Education. In a Workshop organized by Save The Children and Curriculum Development Centre on 29th December.
- Mohanty, Vijaya Lakshmi. (2012) , Ancient Indian Value System and Awareness of Human Values in Present Generation Students- An Empirical Study in Odisha ,Journal of Management and Innovation. ISSN 2319-7587 Vol:1.
- Patil, Y. Y. (2013). Role of Value–Based Education in Society. In International Conference on Leadership and Management Through Spiritual Wisdom, Varanasi, India.
- Biswal ,B.K.(2016)- A study on selfconcept and values and their relationship with academic achievement of adolescent student
- Chakrabarti,Mohit, 'Value Education: Changing Perspectives', Kanishka Publishers, Distriutors, New Delhi-110002.
- Sanjeevankarpavithra , Sanjeevankarvitta. (2017), International Journal of Engineering and Management Research, Vandana Publications ,ISSN (ONLINE): 2250-0758, ISSN (PRINT):. Volume-7, Issue-2,
- International journal of Multidisciplinary educational research,(2021) Issn:2277-7881; Value:5.16; Isi Value:2.286 Peer Reviewed And Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:2(1),
- Bania ,Apu. Hazarika, Balin, (2022), A case study on value crisis and education and their relationship with academic achievement of elementary students of Assam, Journal of Positive School Psychology Vol. 6, No. 4, ISSN 8853 – 8863, .http://journalppw.com

WEBLINK

- 131POs_NEP.pdf
- 3.VALUE-CRISIS.pdf
- https://www.researchgate.net/publication/376071658_Value_Education_in_India-Need_and_Importance
- Guidelines for Value based activities Under NEP-2020.pdf

- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1520505#:~:text=The%20many%20ills%20that%20our,cultural%2C%20economic%20and%20political%20values.
- https://sim.edu.in/wp-content/uploads/2019/09/I-YEAR-I-SEMESTER-HVPE-STUDY-MATERIAL.pdf
- https://acs.dypvp.edu.in/NAAC/Value-Education.pdf

Cartesian Dualism and Category Mistake : A Critical Analysis of Mind-Body Problem

Pranab Ghosh
Assistant Professor, Department of Philosophy
Jatindra Rajendra Mahavidyalaya, West Bengal, India

Abstract: In western philosophy, the relationship between the mind and body is a complicated topic, especially in light of Rene Descartes' Substance Dualism. Substance, according to him, is an existing object that needs nothing else to exist but itself, and the Mind's fundamental quality is awareness. A theory is referred to as dualistic if it acknowledges the existence of two different kinds of entities, such as the physical (*res extensa*) and the mental (*res cogitans*) or bodies and souls, or matter and mind, or the idea that the body and mind are separate and distinct things, that are combine to become humans. In western philosophy, there is much discussion and complexity around the connection between the mind and body. It is important to understand the differences between the mind and body and to question the presumptions of Cartesian dualism, even though Descartes' idea of substance dualism may have some value.

Gilbart Ryle critiqued Cartesian dualism in The Concept of Mind for categorizing the body and mind as two separate entities. According to Ryle, it is impossible to know of any other minds but one's own because of the Cartesian notion that the mind is fundamentally private. Additionally, He maintained that awareness of mental states as they are happening entails awareness of consciousness itself as well as the initial condition. In response, Ryle argues that we are not reporting on our inner thoughts when we use phrases like 'I want', 'I hope', 'I dislike', 'I am depressed', 'I feel hungry', and 'I wonder' to convey our mental states. According to Ryle, terminology used to describe an agent's behaviour are mental terms rather than labels for personal internal states. The Cartesian perspective of humans is characterized by him as including the notion of the 'Ghost in the Machine'. He opposes the two-world view, which postulates the existence of two types of stuff: the physical and immaterial.

Key Words: Body, Category, Descartes, Dualism, Mind, Ryle, Substance.

Rene Descartes' philosophy is related to one of the most contentious issues in western philosophy: the relationship between the mind and body (1596-1650). Descartes asserts in *Meditation-II* that humans are composed of two distinct attributes, namely, physical (e.g., brain activity and bodily movements) and mental attributes (e.g., thoughts, feelings, and perceptions), which he refers to as the body and the mind. These physical characteristics include things like weight, size, colour, form, motion in space and time, and so on. However, they also possess mental qualities that ordinary physical things do not have. These qualities are held by a subject or a self and include consciousness, beliefs, desires, etc. Physical attributes are considered public as everybody may observe them with equal clarity.[1] With regard to mental qualities, this is incorrect. The person has exclusive access to conscious mental events, unlike everyone else who has physical access. Your actions may indicate to someone else that you are in agony, but only you can truly experience it. In this context one may ask, Is there any connection between the body and the mind? Should the body and mind be considered two distinct things with separate natures?

According to dualism, the mind and the body have distinct functions, meaning that while mental processes are not physically based, some parts of the mind have received more attention than others at different points in time. The mental domain includes non–physical beings with awareness and thought processes, such minds or souls. On the other hand, deterministic laws regulate non-mental phenomena such as bodies and brains in the physical world. These two domains interact, yet they retain different ontological states, according to Descartes.[2] It was believed during the classical and mediaeval eras that the intellect was the most obviously resistant to a materialistic account: starting with Descartes, the primary obstacle to materialist monism was supposed to be 'consciousness', of which phenomenal consciousness or sensation became recognized as the archetypal instance.

In Descartes's *Meditation* is where the more contemporary forms of dualism originated. According to him, there are two different types of substance: matter, which has the fundamental quality of being spatially extended, and mind, which has the fundamental quality of having thought.[3] His perspective is known as substance dualism. According to substance dualism, both matter and mind have essentially different types of foundations. According to him, substance is "an existent thing which requires nothing but itself in order to exist."[4] This definition applies to God alone. However, Descartes uses the word 'Substance' to refer to God primarily and beings secondarily. According to him, there are two types of substances—conscious substance and extended substance—when we refer to beings as substances. Extension is the essential quality of matter, while consciousness is the essential attribute of mind. So, what, one may wonder at this point? What does this demonstrate about how the body and mind interact?

In Meditation 6, Descartes is quite clear about this in paragraph 9:

> "And, firstly, because I know that all which I clearly and distinctly conceive can be produced by God exactly as I conceive it, it is sufficient thatI am able clearly and distinctly to conceive one thing apart from another, in order to be certain that the one is different from the other, seeing they may at least be made to exist separately, by the omnipotence of God; and it matters not by what power this separation is made, in order to be compelled to judge them different; and, therefore, merely because I know with certitude that I exist, and because, in the meantime, I do not observe that aught necessarily belongs to my nature or essence beyond my being a thinking thing, I rightly conclude that my essence consists only in my being a thinking thing or a substance whose whole essence or nature is merely thinking]. And although I may, or rather, as I will shortly say, although I certainly do possess a body with which I am very closely con- joined; nevertheless, because, on the one hand, I have a clear and distinct idea of myself, in as far as I am only a thinking and un-extended thing, and as, on the other hand, I possess a distinct idea of body, in as far as it is only an

extended and unthinking thing, it is certain that I, that is, my mind, by which I am what I am], is entirely and truly distinct frommy body, and may exist without it."[5]

The body is matter, or material substance, and it exists in the space and is visible to all individuals. Its 'extension' is its main characteristic. Descartes interprets this to suggest that bodies are made of length, width, and height. In addition, matter possesses motion, size, and shape. On the other hand, the immaterial substance—souls—is the mind. It exists in time rather than space and is only visible to him. One can credit knowledge, desire, emotion, and other mental processes to the mind. According to Descartes, "The mind or soul of man is entirely different from the body."[6]

According to Ryle, some non-mechanical rules regulate the mind while mechanical laws govern the body. As a result, each individual has two collateral histories—one made up of events that occur in and through his mind. While the second is private, the first is open to the public.[7] These two substances—matter and mind—had a causal relationship with one another, according to Descartes. We are aware of the ways in which our bodies influence our thoughts and our minds influence our bodies. For instance, your heart starts to beat when you fall in love with someone (a mental state or a biological condition). You flush when you are embarrassed, grin when you are happy, and quiver when you are afraid. These are examples of the mind's causal impact on the body. Thus, it appears that there is a casual relationship of such closeness between mental and physical states.[8] However, this poses a challenge to Cartesian dualism. The issue is in understanding how an ethereal mind may alter a material body and vice versa. It is obvious that a pin pricking the body results in mental pain perception. Similarly, the body moves when the mind commands it to. Thus, the mind and body are interdependent. Now question is: how is it possible.

Descartes proposes that the pineal gland, a tiny gland located in the centre of the brain between the two hemispheres, is the 'kernel' through which the mind and body connect. Descartes refers to this gland as the 'principal seat' of the soul because it has the ability to activate the nerves that extend from it via fluids, or 'animal spirits', which may then

convey impulses to any region of the body. Descartes was quoted as saying that:

> 'The machine of the body is so formed that from the simple fact that this gland is diversely moved by the soul, or by such other cause, whatever it is, it thrusts the spirits which surround it towards the pores of the brain, which conduct them by the nerves into the muscles by which means it causes them to move the limbs.'[9]

Descartes, however, never truly explains how the mind, which is a non-physical and non-material entity in and of itself, can have a physical material impact in nerves. He states unequivocally that the mind can 'will it' and it will happen. He writes,

> "All the action of the soul consists in this, that he merely by willing anything can make the little kernel, whereunto she is strictly joined, move in the manner requisite to produce the effect relating to this will."[10]

Gilbart Ryle (1900-1976) criticises Cartesian dualism. These beliefs are sarcastically referred to by Ryle as 'the dogma of the Ghost in the Machine.'[11] Ryle's primary goal is to the aforementioned hypothesis to be completely wrong. He makes the argument that, in principle, the entire idea is false. This theory is flawed not by many different kinds of small errors compounded together, but rather by a single, major error that Ryle refers to as a 'Category Mistake.' Descartes treated mental and physical states as distinct things or substances, which Ryle claimed was a misinterpretation of the relationship between them. Ryle argues that mental states are more like bents or inclinations to act in particular ways than actual states. He maintained that Descartes's dualism unjustly treats abstract ideas as physical things, hence reifying mental experiences. For whereas Ryle maintains that the facts of mental life and the physical body belong to two distinct categories, Descartes thinks that they belong to the same logical kind or category. Ryle's criticism of Cartesian dualism is the foundation of his idea of category mistakes. He maintained that Descartes erroneously classified mental states as belonging to a different class or domain from physical states. Misconceptions and uncertainty regarding the mind-body connection result from this misunderstanding. In contrast, Ryle argued that mental states are only inclinations or tendencies to

behave in particular ways that are inextricably associated with bodily behaviour. He states,

> "The theoretically interesting category mistake are those made by people who are perfectly competent to apply concepts to apply concepts, at least in the situations with which they are familiar, but are still liable in their abstract thinking to allocate those concepts to logical types to which they do not belong."[12]

Ryle gives us several examples of category mistakes so that we may comprehend this idea. For instance, when someone comes to our university for the first time, he is given a tour of all the departments, administrative offices, playgrounds, libraries, and scientific departments. He believes he hasn't visited the university after seeing all of this. He acknowledges that he has watched every one of these, but he queries the location of the university. He fails to see that the university is nothing more than the seeing university, which is the ordered whole of everything displayed. Therefore, when a visitor asks, 'Where is the university?' he is misclassifying the institution because he believes that all of its departments, libraries, playgrounds, museums, administrative offices, and other units, etc., are included in the same category. But such units are not what the institution is in reality. It just has to do with how those units are set up. The university is the coordinate of such units.

In the same way, Ryle claims that Cartesian dualism makes the same mistake by confusing the categories of thought and body, leading to the following conclusions:

1. Mind like body is a substance;
2. Mind like body is a field of cause and effect.

The dualists are unable to recognize that mind and body are distinct entities; mind is simply the manner in which human behaviour is carried out (much as the university is the manner in which various organized units' function).

Philosophical behaviourism views as logically absurd the entire notion that mental states are inherently private to their owners, a state that each of us is incorrigibly aware of in our own circumstances. According to Ryle, it is impossible to be aware of the presence of any mind other than one's own because of the Cartesian concept that the mind is

fundamentally private. However, he also contends that the entire Cartesian concept of consciousness is inherently illogical. This is because, if I am required to be aware of my mental states as they happen, then, since awareness is a mental state in and of itself, I also have to be aware of my consciousness of the initial state, and that consciousness, and so on, *ad infinitum.*

According to Ryle, mental terms are terms we use to characterize an agent's behaviour rather than names for private inner states. However, it’s important to realize that, a lot of the time, what we’re really doing is implicitly predicting a man's behaviour rather than characterizing his actual behaviour or making an assumption about how that person might be expected to behave in a given situation.

Such a claim clearly implies that we should reject the idea that we have any unique access to our own mental states if discussions about minds are only ever discussions about behaviour. Ryle is too happy to reject this view, arguing that although we can directly and reliably access our own minds, we can only deduce what is happening in other people's minds. This raises the classic problem of our minds: if I cannot directly access the minds of others, and if minds are logically private to each individual, how can I be certain that minds other than my own exist? According to Ryle, we are not reporting on our inner thoughts when we say things like ‘I want’, ‘I hope’, ‘I dislike’, ‘I am depressed’, ‘I feel hungry’, or ‘I wonder’. These are expressions of our mental states.[13] We are bringing our emotions into reality. His stance appears to be that a condition such as depression may be comprehended as the inclination to act in a manner typical of depression, which includes a tendency to declare publicly that one is depressed. Therefore, it would be incorrect to assume that these situations demonstrate our unique ability to access our own mental states, which is not available to others.

The idea that there are two types of things—physical and immaterial—is rejected by Ryle, who scornfully refers to the Cartesian view of people as including the idea of the ‘Ghost in the Machine’. Cartesian dualism is criticized by Ryle primarily for the following reasons:

1. Reifies mental states: treating mental states not as inclinations or dispositions but as things or beings.

2. Misunderstands the connection between the mind and body, treating them as distinct phenomena rather than as interrelated facets of human behaviour.

3. Does not take embodiment into account, ignoring the body's fundamental influence on mental and behavioural states.

There have been disagreements on Descartes' hypothesis of the mind–body paradox, despite the lack of credible scientific studies or competing theories to resolve the issue. Despite a plethora of evidence both in favour of and against this idea, the investigation can only conclude that the interaction of the two separate substances is likely. The reductionist stance of scientists suggests that the thought-system, as defined by Descartes, is only functioning through the brain, and that there are no other actual, corporeal entities, such as the body or brain. But taking the idealist stance calls into question both the function of the brain in awareness and the ability to reflect on what is thought. This is especially important when thinking about telepathy, clairvoyance, or dreaming experiences since science needs to demonstrate how the brain can do introspection.

Even though Descartes was unable to refute his pineal gland theory about the relationship between the mind and body, it caused debate and sparked a wave of research. Analytic School scholar Hiram Caton says the following about Descartes and his dualism:

> 'It used to be said that Cartesian mind was the relic of religious nonsense – a ghost in a machine, that the Cogito argument was a short compendium of logical howlers; that his doubt offended common sense to the point of being un- British; that the proof of God's existence was contemptibly circular, and so on. But the brash goblinry toward Descartes … faded as more and more metaphysics popped up in the empiricist sandbox … The rehabilitation of history of philosophy, once marked as the verist kingdom of darkness, is a nice symptom of the change. For over a decade now it has been a growth area, and Descartes' share of the market is substantial.'[14]

He thinks that Descartes will continue to have an impact on both contemporary great thinkers and those who have not yet emerged.

Despite its popularity, Cartesian dualism is not without its detractors, especially when it comes to category mistakes. The necessity to reevaluate the mind-body connection and acknowledge the connection between mental and physical experiences is highlighted by Ryle's criticism. Different viewpoints provide up fresh possibilities for comprehending the intricate and varied aspects of the human experience.

References:

1) Cf. Descartes, R., (1966), *The Meditations*, Trans by John Veitch, Illinois: The Open Court Publishing Company, p.94.
2) Cf. Anthony, K. ed., (1970) *Descartes' Philosophical Letters,* London: Oxford University Press, p.153.
3) Cf. Hart, W.D. (1996), 'Dualism' in *A Companion to the Philosophy of Mind*, edited by S. Guttenplan, Oxford: Blackwell, pp. 265–267.
4) R. Descartes, (2023), *Principal of Philosophy,* Newcomb Livraria Press, p. 51.
5) Descartes, R., (1966), *The Meditations*, Trans by John Veitch, Illinois: The Open Court Publishing Company, p.116.
6) *Euvres de Descartes,* ed. By C. Adam and P. Tanney. 13 vol. Paris, p.161.
7) Cf. L. Wittgenstein, (2009), *Philosophical Investigation*, Blackwell Publishing, pp-88-89.
8) Anthony, K. ed., (1970), *Descartes' Philosophical Letters,* London: Oxford University Press, p.192.
9) Vesey, G. N.A., (1964), ed., *Body and Mind*, London: George Allen & Unwin Ltd., p.48
10) *Euvres de Descartes,* ed. By C. Adam and P. Tanney. 13 vol. Paris, p.41.
11) G. Ryle, (2009), *The Concept of Mind,* Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, p.5.
12) Ibid., p.7.
13) Cf. Ibid., p.8.
14) Hiram, C., (1981), "Analytic History of Philosophy: The Case of Descartes," in *The Philosophical Forum*, A Quarterly, XII.

Sarvepally Radhakrishnan and the Teachers' Day

Dipankar Kaibartya
Asst. Prof., Department of Philosophy,
Serampore Girls' College

Abstract: We remember Dr. Sarvepally Radhakrishnan only on Teachers' Day. If we do that, we will definitely be wronged. If his full life history is observed well, it can be understood that his contribution to our overall society and country is outstanding. He is a great teacher, Philosopher, politician, eloquent speaker and on the one hand a guide, a good person also. As he explained the significance of the National flag, he opened new horizons for the word secularism. After the declaration of independence of Pakistan and just before our declaration of independence, he once again tied the whole of India together with his extraordinary eloquence, intelligence and wisdom. In this paper I have mainly tried to show how much he meant in the speeches of that time, the three things i.e. the condition of the teachers, importance of the national flag and meaning of secularism, and how far his philosophical views are. The methodology to be followed in this paper are basically two types- analytic and descriptive. First, I shall explain the contemporary views about conditions of teachers, National flag and secularism and then analyses the concept. The second tool is analytical which is Philosophical method.
Key-words: Teachers-day, Freedom, National-flag, Nation, secularism.

(i)

Our knowledge about the date of birth of Sarvepally Radhakrishnan is uncertain. The official version is that he was born on 5th September 1888 at Tirutani, a very small temple town to the north-west of Chennai city. However, Radhakrishnan himself was inclined to believe that his date of birth was in fact 20th September 1887. in any case, the government of India declared that his official birth-day, 5th September, would be celebrated every year as Teachers' Day. The declaration was made a few days after Radhakrishnan was elected President of India in May 1962, and since then we have been celebrating 5th September of the year as the

Teachers' Day. In order to fully discover how Radhakrishnan's name got associated with the national Teachers' Day we may go back to that historic session of the Constituent Assembly on the night of 14th August 1947.

A few months before India gained its freedom in August 1947, the Constituent Assembly was formed. The senior leaders of the Congress unhesitatingly invited Radhakrishnan to be one of the non-congress men who would be put up by the party for election to the Assembly. His credentials were, apart from an authoritative exposition of the Indian thought which strengthened the roots of nationalism, resistance to official pressure at Banaras Hindu University during the war, outspoken adherence to the viewpoint of the Congress when its leaders were in prison, and access to important figures in British public life. Radhakrishnan hoped for a great deal from the Assembly. Elected by the representatives of the people, in might succeed in holding the country together and deal with the economic and psychological problems, hunger and poverty, disease and malnutrition, the loss of human dignity, the slavery of the mind, the stunning of sensibility and shame of subjection. Radhakrishnan's speeches in the Constituent Assembly on 11th December 1946 and 20th January 1947, placing emphasis on tolerance and patience as constituting the genius of India was greatly appreciated as family. These speeches made Neheru keen on Radhakrishnan. Neheru also had heard Radhakrishnan on diverse occasions and knew his skill as a public speaker. So, two days before the historic session of the Constituent Assembly on the night of 14th August 1947, he requested Radhakrishnan to speak after him that evening with the specific direction that once he was called upon to take the floor, he should not stop till the stroke of midnight so that the Assembly could then proceed to take the pledge. Radhakrishnan therefore had to deliver on important address under conditions known only to Neheru and himself. The two speeches of Radhakrishnan and Neheru show that these men, with a sense of occasion, had matched their talents to the hours. The unthinkable partition of India became a reality, and the newly created state, Pakistan, celebrated its independence that very day, that is, 14th August 1947. This created a deep sense of humiliation and anguish and the Assembly was

emotionally charged. Indeed, one or two speakers who spoke before Neheru instead of welcoming Independence cried out for help in despair. It was for Radhakrishnan to bring normal to the house, giving to its distracted mind on integral vision and to its bewildered will an upward direction.

Radhakrishnan first paid tribute to the political sagacity and the courage of the British people. Then came a reference to the Indian methods of struggle under the leadership of one who will go down in history as perhaps the greatest man of our age, a striking contrast to 'so-called' great men – Washington, Cromwell, Lenin, Hitler and Musolini. Sorrow, he went on, at partition clouded the rejoicing, and Indian were in an essential sense, though not entirely, responsible for it. At least now there should be self-examination and correction of national faults of character, of domestic despotism, of intolerance which has assumed different forms of obscurantism, of narrow-mindedness, and of superstitious bigotry. Anger at the division of India would lead nowhere; passion and wisdom never went together. The body politics, he hoped, might be divided but the body historic would live on. Cultural ties and spiritual bonds which held the people of India together since the days immemorial should be preserved so that the lost unity of the country could be recovered.

Radhakrishnan then turned to the responsibilities of freedom and such other matters. He meticulously divided his speech into three parts, all of which are important for his mind on the role that the teachers might play in the reconstruction of India, and at the same time, he reminded the people of their obligations towards the teachers. In the second part he explained the significance of the national flag in all its elements. And in the third part he explained the meaning of 'secularism' as would apply to our nation.

(ii)

Radhakrishnan began his submission on the role of the teachers by referring to the speeches delivered by the earlier speakers who had emphasised the need of reforming and reconstructing India with a firm resolve. They wanted to see a new India emerging which is no longer haunted by the spectres of famines (like the unforgettable Bengal famines

of 1176 and of 1350), epidemics, malnutrition, sectarianism and superstitious bigotry. Before him Neheru emphasised the need of modern science, heavy industries, economic planning, irrigation and health services to be in tune with developments going elsewhere. In order to develop a new India we thus needed millions of doctors, engineers, scientists, explorers, historians, and such others. But where to find them? They needed be generated from within; they were to spring up from among those who were either toddlers or in their teens. But unfortunately, Radhakrishnan reflected, most of them were not going to schools, colleges and universities. They were toiling hard either in the rock-strewn fields, or in the factories and workshops, or begging or loitering from dawn to dusk. Radhakrishnan further pointed out that at that moment less than 8% of the total Indian population could read and write. What a sad commentary on an ancient land where people were philosophical at a time when others were tattooing their bodies and eating raw animal flesh, a land that once produced the Vedas and the Upanisads, the Ramayana and the Mahabharata, where a poet like Kalidas, a grammarian like Panini and a scientist like Aryabhatta, were born. India could not have produced all these without a sound system of education. But political slavery over a millennium had only created a blank in the field of education; the ancient system had been destroyed and no worthy second system has developed in its place. But if India had to be regenerated it should implement a modern and solid system of education; education should be its priority, and the independent India should provide education to each and every Indian child. They should be given foods, clothes, books, schools and colleges. But who would teach them? At this juncture Radhakrishnan grew a little sentimental. He reminded his audience that he was in the Assembly as a representative of the teaching community, and he knew best the position of the teachers at the moment, the disincentives they face, and the humiliations they suffer at every walk of their lives. The great teachers of ancient India like Yajnanavalka and Gautama had their affluences and social recognition, and in turn, they brought advice to the people in their own fields of learning and understanding. But the teachers under colonial rules had little for themselves, and consequently, they had little to offer to the nation. They were a depressed class of people. But if

we admit that education is our first priority, then we must also admit that teachers are our first recognition. They were to be the architects of modern and reborn India, and respected as such. The nation should give them sufficient incentives to grow, and, they, in turn, should deliver the good.

The teachers of the country were heartened as they learned the content of Radhakrishnan's speech, the way he championed the cause of education and the educationist in that important place and at that important moment, and they eagerly awaited their turn. Thus when Sarvepally Radhakrishnan was elected President of India in May 1962, the National Freedom of Teacher lost no time to send its recommendation to the govt. of India saying that the teaching community of the country regarded Radhakrishnan as an ideal teacher and they would like to see that the Government identifies his date of birth for celebration as the National Teachers Day. The government of India accepted the recommendation and the teachers and students of the country feel pleased to celebrate this beautiful Teachers Day ever since.

(iii)

Teachers of the country were certainly heartened by Radhakrishnan's deliberations on what could be the future shape of education in this country, but his deliberations on the Indian tricolour and the Indian brand of secularism were no less appealing. They were of paramount importance to our national life, and customarily we discuss them with all the seriousness they deserve.

In the second part of his speech Radhakrishnan deliberated on the flag that was adopted during a meeting of the Constituent Assembly on 22nd July 1947 as the official flag of the domain of India. He hoped that the flag would be retained, and indeed, it was retained as the flag of the Republic of India. In India, the term "tricolour"(in Hindi "triranga") almost refers to the Indian National Flag which, indeed, contains four colours. The flag is a modified form of the Swaraj Flag of the Indian National Congress, and Radhakrishnan was instrumental in bringing about the modification.

According to the flag code of India, the Indian flag has a ratio of two by three i.e. the length of the flag is 1.5 times that of the width. It has

three strips, and all three strips are of equal length and width. The first is India saffron (kesari) in colour, the second is white and the third is India's green. Inside the white strip there is the Ashoka Chakra, also known as Dharma Chakra, in blue colour with evenly spaced twenty-four spokes. Radhakrishnan explained the symbolic meaning of these four elements of the flag.

Radhakrishnan specially chose to talk on the National Flag to alleviate certain misgivings and diffuse the religious political sensibilities created during the flag–movement. The flag-movement began in the early twentieth century around the partition of Bengal in 1905. The partition of Bengal resulted in the introduction of Bandemataram flag as a part of the Swadeshi movement against the British. Two Bandemataram flags were presented in the Indian National Congress meeting in 1906, of which one was launched earlier in Calcutta bereft of any ceremony, and the other was designed and intimated by Sister Nivedita. A slightly modified version was subsequently used by Madam Bhikaji Cama, at the second Socialist International Meeting in Sturttgart. But the flag failed to create enthusiasm amongst Indian nationalist. On the other hand, it created misgivings in the minds of certain section of the country because of the "Bandemataram" caption in it.

In April 1921, Mahatma Ghandhi wrote in his Young India about the need of an Indian flag, proposing the flag with Charkha or spinning wheel at the centre. The idea of the spinning wheel was put forth by Lala Hansraj, and Gandhi commissioned Pingali Venkayya to design a flag on a red and green banner, the red colour signifying the Hindus and the green standing for Muslims. But a little later he realised that people other than Hindus and Muslims live in India, and they were not represented in the flag. So he added white to the banner colours, to represent all other religions. Yet people did not like the interpretation of flag-colours in terms of proposed religious faiths. Consequently, Gandhi moved towards a more secular interpretation of flag-colours, stating that red stood for the sacrifice of the people, white for purity, and green for hope. Subsequently the colour-scheme was further modified. Saffron, instead of the previous red, white and green were chosen for the three bands, representing courage and sacrifice, peace and truth, and faith and chivalry

respectively. The spinning wheel in the centre symbolised Gandhi's goal of making Indians self-reliant by fabricating their outer clothing. Gandhi's flag came to be known as Swaraj flag, and on April 13, 1923, during a procession by local Congress-volunteers in Nagpur commemorating the Jallianwallabag massacre, the Swaraj flag was hoisted. The swaraj flag was however officially adopted by the Congress in 1931, and ever after it remained an integral element of the swaraj movement.

Before India gained its freedom, the Constituent Assembly set up an ad hoc committee on June 23, 1947, to select a national flag for independent India. The committee was represented by Rajendra Prasad, and its others members were Abdul Kalam Azad, Sarojini Naidu, Rajagopalachari, K.M. Munshi and B.R.Ambedkar. On 14th July 1947 the committee recommended that the flag of the Indian National Congress be adopted as the National Flag of India with suitable modifications, so as to make it acceptable to all parties and communities. It was also resolved that the flag should not have any communal undertone. Radhakrishnan and Neheru stated working on it. Radhakrishnan suggested that the spinning wheel of the Congress flag might be replaced by the Chakra (wheel) from the lion capital of Ashoka, and Neheru accepted the suggestion. According to Radhakrishnan, the chakra was chosen as it was representative of dharma and law. However, Neheru explained that the change was practical in nature, as unlike the flag with spinning wheel, the design would appear aesthetically more elegant. Gandhi was not very pleased with the changes, but came around to accepting it. The newly worked out flag was proposed by Neheru at the Constituent Assembly on 22nd July 1947, and the Assembly unanimously approved the proposal. Now, it was for Radhakrishnan to explain the meaning of the flag with all its symbols in the Constituent Assembly just at the eve of Indian independence.

Radhakrishnan clarified the adopted flag and described its significance as follows. Bhagwa or the saffron colour denotes the spirits of renunciation or disinterestedness. Our leaders must be indifferent to material gains and dedicate themselves to their work. They should follow the ideal of Bharata of the Ramayana, the Philosopher King of Plato's

Republic, and Swami Ramdas, the preceptor of Shivajimaharaja. Indeed, it was Swami Ramdas who gave his saffron robe to Shivajimaharaj to be used as his flag. Now Shivajimaharaja's flag is restored as the top band of Indian National Flag. The white band at the centre, Radhakrishnan saw, as representing the sun's rays, the path of light, the light of truth, of transparent simplicity. But one will have to traverse this path to attain the goal of truth; and in its centre stands the wheel, Ashoka's wheel of the law or dharma. Truth or satya, dharma or virtue ought to be the controlling principle of those who may work under the flag. Again, the wheel denotes motion. There is death in stagnation. There is life in movement. India should no more resist changes; it must move and go forward. The green strip at the bottom indicates that our efforts to build a paradise has to be here, on this green earth. The message of the flag as a whole is, as Radhakrishnan had already explained earlier in the Constituent Assembly on 22nd July 1947, 'Be ever alert, be ever on the move, go forward, work for a free, flexible, compassionate, decent, democratic society in which Christians, Sikhs, Muslims, Hindus, Buddhists, will all find a safe shelter.'

(iv)

Radhakrishnan's still remains the best explanation of the symbolism of Indian tricolour. However, following Radhakrishnan's exposition of symbolism of the tricolour, the question that could have been raised by any one was raised by Radhakrishnan himself, and he also gave his own answer to the question.

The day Radhakrishnan was speaking in the Constituent Assembly i.e. 14th August 1947 was also the day Pakistan was created, and at the moment of its birth it declared itself a theocratic state. Unlike Pakistan, India, Radhakrishnan reiterated, prefer to go the secular way. But strange it would appear, that a state whose national flag contains dharmachakra at the heart of it, was yet a secular state. Then, what is the meaning of secularism in the Indian context? Gandhiji advocated for secular Indian state. In his opinion, secularism is sarvadharmasadbhava. But sadbhava is, purely a cultural concept, an attitude of a cultural mind, which can hardly be deal with by any positive law that the state is capable of promulgating. So, Radhakrishnan explained its meaning as

sarvadharmasamabhava, or equal respect, or equal treatment for all religions. The state does not favour any particular religion but does not disrespect any religion either. But does it simply mean neutrality towards and every religion? Not really so, as Radhakrishnan explained, It may appear strange that our government should be a secular one while our culture is rooted in spiritual value. Secularism here does not mean irreligion or atheism or even stress on material comforts. It proclaims that it lays stress on universality of spiritual values.

Keeping in consonance with India's avowed secularism, and as interpreted by Radhakrishnan, Part III, Articles 25-28, of the Indian Constitution, as was originally adopted by the Constituent Assembly in 1949, guaranteed right to freedom of religion to all persons residing in India; they were equally entitled to the freedom of conscience, and the right freely to profess, practise and propagate religion, subject to public order, morality and health. However, these constitutional provisions regarding secularism relate to the exotics of religion which include religious gatherings and religious practices, and needless to say, in respect of religious practices religions not only differ from one another, they also sometimes clash with one another. However, as Radhakrishnan furthers explained, secularism as dharmasamabhava also relates to the esoteric of religion, according to which the ultimate truth is one and every religion shows some traces of it. Thus a man who has religion in his heart is an honorary member of every religion, and it is a matter of indifference to which religion he adheres or in which religion he is baptised. Thus politically speaking Indian secularism is Radhakrishnan's dharmasamabhava, and spiritually and aesthetically it is Gandhi's dharmasadbhava. In spite of occasional conflicts among the adherents of this and that religion we, the people of India, instead of growing irreligious are marching ahead in the path of dharmasamabhava and there lies the future of India.

Bibliography:

1. Radhakrishnan, Savepally, Eastern Religion and Western Thought, Oxford University Press, Delhi, Second Edition 1940.

2. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan: Philosopher, Statesman, and Visonary, Chronicle Publications, Kindle Edition, 31st August, 2023.
3. Gopal, Sarvepalli, Radhakrishnan: A Biography, Oxford University Press, 20th August, 1992.
4. Bhargava, Rajeev(edited). Secularism and Its Critics, Oxford University Press, New Delhi, India, First Published in 1998.
5. Debnath, Sailen. Secularism Western and Indian, Atlantic Publishers & Distributors(P) LTD, 2010.
6. Lal, Basant Kumar, Contemporary Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 9th reprint 2013.
7. Masih, Y. A comparative Study of Religions, Matilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, Reprint 2012.

Journals

1. Ali, Md Musa, Secularism In India: Concepts, Historical Perspective And Challenges, Asia Pacific Journal of Research(A peer reviewed international journal), Vol: I Issue XXIV, February 2015.
2. Constituent Assembly of India debates (Proceedings), Volume-IV, Tuesday, the 22nd July 1947.
3. Khan, G. C. On The Concept Of Secularism, The Journal of the Indian Academy of Philosophy, Calcutta, 2001.

Causes of Crimes and Punishment : A Fervent Inquiry

Rana Das
Research Scholar, Department of Philosophy
University of North Bengal

Abstract: In this article, I intend to explore the root causes of crimes, which have two factors : personal and environmental defects. If people commit any crime, they are involved in these two factors. I have analysed the causes of crime as mental, physical, and environmental. After analysing those causes of crimes, I have tried to investigate which punishment would be applicable to punish criminals. I also discussed the different theories of punishment in detail. After that, I intend to show the acceptability of punishment. Hence, based on the analysis, I have shown that reformative punishment will be fruitful for punishing criminals because it does not degrade humans' moral values.
Keywords: Punishment, Crime, IQ (Intelligence Quotient), Realisation, Personality defect and Behaviour.

Introduction:

We are going through a social contract and belong to a democratic system. Within a democratic system, we choose a leader who can hold leadership and ensure societal peace, prosperity, and happiness. When the state makes vital decisions, e.g., war, capital punishment, and emergencies, we are collectively responsible, whether right or wrong. In a democratic system, when a state provides capital punishment to offenders, it is collective violence. We are all responsible for that violence. Some people claim that capital punishment is fruitful for enhancing public security. However, it is a big issue. This issue raises some questions of morality: Is capital punishment able to deter crime? Is capital punishment morally permissible? Before answering these questions, we need to analyse why people commit crimes and what the root causes of crime are.

Causes of Crimes

It is impossible to acquire complete knowledge regarding the causes of crime. There are many debates about the causes of crime. The causes of crime vary from one offence to another and from individual to individual. Some renowned thinkers hold that the causes of crimes are personal and environmental defects.

Personality Defects:

Every individual feels frustrated in many ways in their life. For frustration, those who try to achieve their goals hold a substitutive unfair means of satisfaction. Those people are under emotional disturbance and gradually come across to deviant activities. When a person slowly goes towards becoming a teenager due to this physical or mental development, new needs arise among him. The person depends on another person to satisfy his needs. When a person fails to maintain and continue social relationships and cannot satisfy his needs, that person becomes frustrated. This frustration is the cause of personality conflicts. Personality conflicts are the cause of environmental and personal obstacles. Personality conflicts result from conflict between two wishes, whether to side with the mother or wife. If one is supported, another may become more negging. If we escape such behaviour, then a person assaults the negging individual. The assault here is deviant behaviour, which is the reason for personality conflict. Ram Ahuja has given an example in this context to the conflict between two opposite wishes, such as a person getting money to keep a secret place country military from the enemy or a person giving money to get a job as a sub-inspector in the police. Some people face such problems realistically by accepting help from other people. Sometimes, most people try to solve this conflict by blaming others for their lack of fate and belittling themselves. Some people fail to cope with this effort and commit crimes because of personality conflicts. If someone does not adopt such behaviour, the conflicts will dominate their personality as well as push them towards mental imbalance.[i]

Mental deficiency implies weak-minded intelligence, i.e., lack of cognitive development or low intelligence level. A person’s intelligence quotient (IQ) level of more than seventy-five (75) is considered a mentally average person. IQ between 50 to 70 is called a moron. IQ

between 20 to 50 is called an imbecile, and if a person's IQ level is less than 20, it is called an idiot. If a person's IQ belongs to a low IQ, then he will be considered a mentally deficient person because this person has incomplete development of intelligence. To develop or maintain social relationships, one needs an average IQ level. However, those who are Idiot or have low IQs are incapable of managing themselves, and they become dangerous when frustration comes into their life. Though morons have a normal appearance despite that they need care and supervision, the absence of proper maintenance or management, morons involve different types of crime such as theft, granny, drunkenness, sexual offence etc. They fall within this type of offence because they (morons) are confused, emotionally unstable and easily influenced by others. However, some thinkers say that all mentally deficient persons are not involved in the crime of offence. In 1951, Manual Shulman showed that a small proportion of mentally defective people bear delinquent or criminal behaviour. However, mental deficiency or low intelligence is a part of the cause of crime. [ii]Bomber in 1937 showed a survey of prisoners that only 20% were psychotic criminals and also psychopathic and neurotic prisoners, not a huge number. Though mental disease is not the whole cause of crime, we can say mental diseases (neurotic, psychosis and psychopathic) are one of the reasons for committing crime in society.[iii]

Personality Traits:

Aggressiveness and assertiveness are personality traits that affect individuals' social behaviour. Sometimes, because of these traits, individuals fail to manage their problems. When people accumulate issues they cannot solve or manage, e.g., a young girl has taken a loan to fulfil her necessity but fails to pay the loan's instalment. To pay instalments, she sells her wristwatch and steals friends' money. And also, because of paying instalments, she chose unfair means, i.e., developing illicit relations and becoming pregnant. After getting pregnant, she goes for an illegal abortion and gradually loses love. The shame of her parents is that she runs away from home. A boy promises to marry her, but he cheats with her. Ultimately, she chooses a life as a call girl.So, for a single reason, she took several offensive steps. Personality traits are one of the solid reasons for crime or offence.

EnvironmentalReasons for Committing Crime

All sociologists agree that family has a significant influence on an individual's life. Family situations vary from one individual to another. For many reasons, individuals cannot lead better lives or continue interpersonal relations. Now, we will see different environmental causes of committing crime.

Broken Home

The meaning of a broken home is the separation of parents. In a broken home, one parent is absent (it may be both husband and wife) because of death, divorce, separation or imprisonment. Due to the absence of parents, bad habits grow among children. With a lack of control and supervision of parents, children fall into bad company, such as drinking, smoking, and gambling. Numerous studies reveal that the cause of delinquency or criminality is a broken home. Between 1939 to 1950 Sutherland, a study was conducted and told that 30 to 6o per cent of juvenile delinquency come from broken homes. Hely and Broner conducted another survey in two cities in the US. They said that among 4000 delinquents, 50 per cent were from the background broken home. In 1950, Glueck studied 500 delinquent and 500 non-delinquency boys. The study showed that delinquent boys' parents used unsuitable methods for disciplining their children, such as lax, over-strict or erratic, and used hostile or indifferent punishment against children.[iv]

Poor Home:

Poor homes are related to poverty and economic weakness. A low-income family is unable to provide financial security to its members. A low-income family fails to serve the basic needs of family members and cannot provide economic security during an emergency or crisis. A teenage boy from a low-income family can easily be left from home for a better living life. Also, he can easily fall under the influence of others, such as delinquent gangs and terrorist gangs. In 1952, Stephan Hurwitz said the great majority of criminals and delinquents come from low-income families, and those families' economic conditions are deplorable.[v]

Movies:

Movies have an eager harmful mental influence on young minds. Present-day movies are full of sex and violence. Films provide vicarious

experiences among young minds. This experience helps them (young minds) convert their unsocial tendencies into imaginary adventures. Numerous cases are reported in the newspaper that young people commit crimes by following movies' horrible scenes. In January 1996 in Kolkata, when a boy murdered his parents by taking the help of another two boys. Some days ago, this boy committed that murder after watching an English movie. He murdered his parents by influencing English films. Middle-class children or young people mostly commit this type of crime by watching movies. Children are more susceptible to the influence of film than adults. Children and adolescents imitate the actor's behaviour and conduct. Herbert Blumer and Philip Hauser said that in their studies of offenders, the motion picture plays a significant role in delinquent and criminal careers. They found these studies by examining about 10 % of male and 25 % of female offenders studied.[vi] Movies display criminal patterns of behaviour that arise from a desire for money and lust. This type of desire influences people's sexual desire and manipulates people's intentions, for which they accept daydreaming criminality.

From general observation, I will say the root causes of becoming criminals are family situations, faulty upbringing, disease, environment, etc. A minor crime can take the shape of a bigger crime. If we deeply think about it, we will see that the reasons for all crime, whether small or big, will stay among those causes. I think before punishing criminals, we need to explore the root causes of crime instead of punishing them. We cannot get a permanent solution to eradicate crime from society by punishing criminals. Moreover, we must mitigate the root causes of crime. Even if the state wants to punish criminals, which punishment will be fruitful? We will see it in the discussion of different theories of punishment as follows.

Punishment

In Western ethical discourse, there are three theories of punishment: Retributive, Preventive, and Reformative. We will see which punishment system is more convincing in addressing crimes and criminals.

Retributive Punishment:

The prime objective of the Retributive theory of punishment is to punish wrongdoers for their offences, which must be proportional to the crime.

This theory emphasised tit-for-tat justice. According to this theory, if a person inflicts harm on another, then the person must be paid back for his misdeed because the consequences of his wrong act are not merely evil to others but also himself. This theory endorses capital punishment as a severe penalty for heinous crimes. The retributive theory supports the law of ‘an eye for an eye and tooth for a tooth.’

Deterrent or Preventive Punishment:

According to the deterrent theory, punishing a culprit is to deter the crime. The deterrent theories aim to show offenders as an example to other people and discourage them from committing the same crime. Deterrent theorists say you are not punished for stealing a ship, but others may not. Supporters of this theory accept harsh punishment for lesser crimes and uphold capital punishment for severe crimes. This theory is interpreted as a normative theory of punishment because it focuses on outcomes.

Reformative Punishment:

According to the Reformative theory, the purpose of punishment is not to inflict harm on the offenders but to reform them in different ways. The reformative discipline emphasises improving the fundamental behaviour and attitude of criminals. The supporters of this theory say that persons commit crimes under the sway of emotion. The reformative approach is closely related to rehabilitation because this theory claims that crime is like a disease, and we can cure criminals through proper treatment. Inflicting harm on offenders is not a prime solution for reducing crime; instead, awarding harsh punishment to criminals can enhance the gravity of offences or problems.

Acceptability of punishment:

However, the three approaches to punishment provide different types of provisions to punish criminals. Now, the question is which punishment will be suitable for criminals. We have seen people commit crimes for various reasons. After profoundly considering those causes, which form of punishment needs to be inflicted on offenders? Finding a solution is a challenging task. The retributivists try to heal criminals and crime by inflicting retribution. Retribution means punishment must be proportional to the crime. However, its implementation would be very harmful to

civilised society. On the other hand, the deterrent theory claims that prevention is better than cure. Also, this theory holds criminal punishment as a means by which others will be restrained from doing unpleasant acts for the fairness of punishment. So, the deterrent theory holds criminals as a means for the benefit of others. The deterrent theory always instructs us to do revengeful acts to prevent crime because punishment is often considered heinous, i.e., the death penalty. However, the reformative approach takes a stand against deterrent theory and retributive theory. According to reformative theory, reform of offenders is possible. Mahatma Gandhi was a social reformer who said that an eye for an eye makes the whole world blind. He also said we should treat every person as an end, not as a means, whether criminals or good persons. I think reformative punishment would be suitable for punishing criminals.

Critical Appraisal:

We can assume that reform will be possible if the state follows the reformative method of punishment. Punishment is required in society, and that must be non-violent punishment. With educative sentences, society can run smoothly. If the state inflicts harsh punishment instead of reformative punishment, it would be moral degradation because Inflicting severe punishment on offenders is nothing but collective violence. Reform of offenders is possible because we know that the author of *Ramayana* Valmiki *Muni* became a saint by the following path of realisation. So, realisation is a significant process. Also, Gopal Krishna Gandhi said that punishment should enter into the offender’s experience by which realisation will be produced in his mind and not just in his body as I have been punished. When a state or authority punishes an offender by awarding the death penalty, the perpetrator just feels that it (punishment) is coming, but he cannot know its end.[vii] After execution, one cannot say I have been punished. There is no chance of realisation. Everybody needs to realise their acts, whether they are good or evil. When the realisation of the difference between good and bad awakens, crime will be eradicated. Moreover, it is the responsibility of the state, educated people, family, friends, teachers, and many others to awaken moral values among people.

End Notes:

---

[i] Ahuja, Ram. (2000). *Criminology*. Jaipur: Rawat Publications, P. 84.
[ii] Ibid., P. 86.
[iii] Ibid., P. 87.
[iv] Ibid., PP. 89-90.
[v] Ibid.
[vi] Ibid., PP. 94-95.
[vii] Gandhi, Gopalkrishna. (2016). *Abolishing the Death Penalty: Why India Should Say No to Capital Punishment*. New Delhi: Rupa Publications India, P. 96.

References:

Siddique, Ahmad. (2005). *Criminology,Problems&Perspectives*. Lucknow: Eastern Book Company.

Gandhi, Gopalkrishna. (2016). *Abolishing the Death Penalty: Why India Should Say No to Capital Punishment.* New Delhi: Rupa Publications India.

Pal, Jaladhar. (2016). *The Moral Philosophy of Gandhi.* New Delhi: Gyan Publishing House.

Greenawalt, Kent. (1973) "Punishment." *Journal of Criminal Law and Criminology.*

Mitchel, Roth P. (2014)*An Eye for An Eye*. London:Reaktion Books Ltd.

Ahuja, Ram. (2000). *Criminology*. Jaipur: Rawat Publications.

Martin, W. Mike. (2006). *From Morality to Mental Health: Virtue and Vice in a Therapeutic Culture*. New York: Oxford University Press.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik
2582 3841

Ebong Prantik
2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182, 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 850/-